শরদিন্দু অম্নিবাস

শরদিন্দু অম্নিবাস

দ্বিতীয় খণ্ড

ব্যো ম কে শ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত
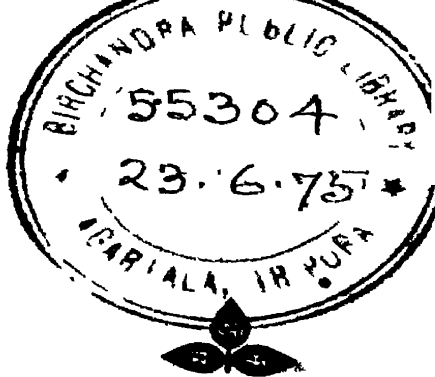
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : শ্রীঅজিত গুপ্ত

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৫৮
অগস্ট ১৯৫১

মূল্য : ২০·০০

নিবেদন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাবলী—গোয়েন্দা কাহিনী ঐতিহাসিক গল্প ও উপন্যাস, প্রেমের গল্প, হাসির গল্প, নাটক, কবিতা ও কিশোরদের জন্য লেখা কাহিনী—কয়েক খণ্ডে শরদিন্দু অম্নিবাস নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রথম দুইটি খণ্ড ব্যোমকেশের সমস্ত গোয়েন্দা-কাহিনীর কালানুক্রমিক সংকলন।

প্রথম খণ্ডে বারোটি গল্প ও একটি উপন্যাস মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে কুড়িটি গল্প-উপন্যাসে ব্যোমকেশ-কাহিনী সমাপ্ত হল। এই সিরিজের শেষ লেখাটি শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের শেষ রচনা, লেখাটি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

প্রকাশক

সূচী

ব্যোমকেশ, সত্যবতী, সত্যবতীর গাড়ি

গত চল্লিশ বছরে ইংলণ্ডে গোয়েন্দা কাহিনীর পরিচিত রীতির পরিবর্তন হয়েছে: জনপ্রিয় কাহিনীতে যে পরিচিত গোয়েন্দাদের মুখ ঘন ঘন চোখে পড়ত এখন তাঁদের চেহারার বদল হয়েছে। এই সাম্রাজ্যের যাঁরা পুরনো অধীশ্বর কিম্বা অধীশ্বরী তাঁরা গোয়েন্দা সম্রাটদের পরিত্যাগ না করলেও রহস্য সমাধান করবার জন্য নতুন মুখের আমদানী করেছেন। তাঁরা কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অথবা ডীন, কেউ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, কেউ গ্রামের বৃদ্ধা মহিলা, লর্ড অমুক বা লর্ড অমুকের আত্মীয়। যুদ্ধ ফেরৎ প্রায়-বেকার ও তাঁর প্রণয়িনীও গোয়েন্দাগিরির যৌথ কারবার খুলেছেন। আগে লেখকরা প্রায়ই বেসরকারী গোয়েন্দাই পছন্দ করতেন। প্রসঙ্গক্রমে সরকারী গোয়েন্দাদের অকর্মণ্যতার কথা বলে এক হাত নেওয়া যেত। এখন উপন্যাস জগতের যাঁরা নামী গোয়েন্দা তাঁদের মধ্যে সরকারী বেসরকারী দু' রকমই আছেন। লেখক বা পাঠকদের পক্ষপাত নেই। আমেরিকান ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসে আরও কিছু রকমফের দেখতে পাওয়া যায়। তবে যাকে নিছক গোয়েন্দা কাহিনী বলে অর্থাৎ রহস্য উন্মোচন যার প্রধান কাজ, সে ধরনের লেখা কমে এসেছে। প্রায়ই বলা হয় গোয়েন্দা কাহিনীর দিন ফুরিয়ে এসেছে। এখন 'ক্রাইম ফিকশনের' যুগ।

ষাট সত্তর বছর আগে বাংলাদেশে গোয়েন্দা কাহিনীর শৈশব অবস্থা ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তরের নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সে তার সাহিত্যগুণের জন্য নয়, প্রাচীনত্বের জন্য। এক সময় পাঁচকড়ি দে এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর বহু গ্রন্থ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। পাঁচকড়ি দে অনেক কাহিনী বিদেশী লেখকদের রচনা থেকে গ্রহণ করেছেন, কিম্বা অনুবাদ করেছেন। এখন তাঁর উপন্যাসের বিজ্ঞাপনও বিরল হয়ে এসেছে। কিছুদিন পূর্বে তাঁর একজন পাঠক সাময়িক পত্রিকায় পাঁচকড়ি দের বইয়ের পুনর্মুদ্রণের অনুরোধ করেছিলেন। এক সময় যে বইয়ের প্রচুর ভক্ত ছিল পরবর্তীকালে তার অনুরাগী পাঠক পাওয়া অনেক সময় কঠিন হয়। কোন মন্ত্রে এই সব বই একদিন হৃদয় জয় করেছিল তার উত্তর পাওয়া যায় না। পাঁচকড়িবাবু বিদেশী গোয়েন্দাকে অনেক সময় বাঙালীর বেশে উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন। অন্ততঃ একটি গ্রন্থে শার্লক হোমস বাঙালী পোষাকে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু যে-লেখক সবচেয়ে বেশী সংখ্যক তরুণ পাঠক আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি দীনেন্দ্রকুমার রায়। তিনিও বিদেশী গ্রন্থ কিম্বা পত্রিকা থেকে আখ্যায়িকা গ্রহণ বা প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। পাঁচকড়িবাবুর সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে তিনি বিদেশীদের দেশী সাজ কিম্বা নাম পরাননি এবং ঘটনাস্থলও অবিকৃত রেখেছেন। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রবার্ট ব্লেক সিরিজের দোষগুণ যাই থাক ছেলেবয়সে লণ্ডনের এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভূগোল শিক্ষার এমন সহজ উপায় আর ছিল না। টেমস নদীর বাঁধ, শহরের দক্ষিণে ফুলহাম পল্লী, ক্রয়ডনের বিমানঘাঁটি, সোহোপাড়া কিম্বা পিকাডেলির সঙ্গে তরুণ বয়সে প্রথম রুদ্ধনিশ্বাস পরিচয় রবার্ট ব্লেকের সৌজন্যে সম্ভব হয়েছিল। তাঁর গোয়েন্দা কাহিনীর জনপ্রিয়তার ফলে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সাহিত্যকীর্তি 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীবৈচিত্র্য' তাঁর জীবদ্দশাতেই দেশবাসী বিস্মৃত হয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে পাঠকেরা খুব

সহিষ্ণু ছিলেন, সহজে বিচলিত হতেন না। একটি বহু পঠিত উপন্যাসে আছে একজন গোয়েন্দা হাওড়া স্টেশন ছাড়বার এক ঘণ্টা পরেই ট্রেন থেকে পর্বতমালা ও ঝরণার শুভ্র রেখা দেখতে পেলেন। অন্য একজন প্রাচীন লেখকের একটি উপন্যাসে আছে একজন গোয়েন্দা "বৃক্ষকোটরে অনুবীক্ষণ লাগাইয়া" দূরবর্তী বাড়িতে ডাকাতদের দুষ্কৃতি দেখতে পেলেন। আজকালকার পাঠকরা হলে মার্জনা করতেন না।

এখনকার বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কয়েকটি অদ্ভুত-রসের এবং রহস্যের গল্প লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে সায়েন্স ফিকশন-এর জন্মদাতা বলতে গেলে তিনিই। তাঁর রহস্যসৃষ্টি করতে অরুচি ছিল না। কিন্তু তিনি গোয়েন্দা কাহিনী লেখেননি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অন্ততঃ একটি, যাকে ক্রাইম স্টোরি বলা হয়, খুব গুছিয়ে লিখেছেন। আর একটি গল্পে একটি রেল স্টেশনের গুদামঘরে একদল বরযাত্রী এবং গোবর্ধন নামে একজন গোয়েন্দা কাহিনীর লেখককে নিয়ে পরিহাস করেছেন; কিন্তু গোয়েন্দা কাহিনী লিখবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। গোয়েন্দা কাহিনী তখনও অপাংক্তেয়। 'ভারতী'র দল ও 'কল্লোল' গোষ্ঠির কেউ কেউ ছোটদের জন্য য়্যাডভেঞ্চার, রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনী লিখতেন। সেগুলি খুব জনপ্রিয়ও হয়েছিল। কিন্তু বড়দের কথা তাঁরা ভাবেননি।

রবীন্দ্রনাথ কোনও গল্পে একটি চরিত্রের ডিটেকটিভ বৃত্তির প্রবণতার প্রতি কৌতুক কটাক্ষপাত করেছেন। জানতে ইচ্ছা হয় তিনি ডিটেকটিভ বই কখনও পড়তেন কিনা। কোনান ডয়েলের কোনও কোনও লেখা পড়ে থাকতে পারেন। এডগার য়্যালেন পোর লেখার সঙ্গেও তাঁর নিশ্চয় পরিচয় ছিল। কিন্তু অন্য কিছু? তাঁর চিঠিপত্রেও বোধহয় এর উল্লেখ নেই।

ব্যোমকেশ বক্সীর প্রথমদিকের গল্পগুলি তাঁর বন্ধু অজিতের মুখ থেকে শোনা। সন ১৩৩১ সাল, অর্থাৎ এখন থেকে সাতচল্লিশ বছর আগে ব্যোমকেশের সঙ্গে তার পরিচয়। দুজনেই হ্যারিসন রোডের একই মেসের বাসিন্দা। পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পরিণত হতে দেরী হয়নি। অজিতের সাহিত্যচর্চার অভ্যাস বরাবরই ছিল। ব্যোমকেশের কাহিনী প্রথমদিকে আমরা তার কলমের মারফৎ শুনেছি। কিন্তু অজিত ঠিক ডাক্তার ওয়াটসন কিম্বা ক্যাপ্টেন হেস্টিংস নয়। ওয়াটসনের প্রতি শার্লক হোমসের এবং হেস্টিংসের প্রতি পোয়ারোর কিঞ্চিৎ স্নেহমিশ্রিত করুণার ভাব ছিল। ওয়াটসন এবং হেস্টিংস মনে করি শেষ পর্যন্ত কোনান ডয়েল কিম্বা পোয়ারোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। অজিতের সঙ্গেও ব্যোমকেশের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু দুটি কথা বলা দরকার। প্রথমতঃ, কয়েক বছর পরে অজিতকে সরিয়ে দিয়ে শরদিন্দুবাবু নিজে কথকের আসন গ্রহণ করেছেন। সম্ভবতঃ অজিতের সাহিত্যচর্চার ফল ব্যোমকেশকে খুশি করতে পারেনি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ব্যোমকেশ বক্সীর জীবনে সহসা একটি মহিলার আবির্ভাব। শার্লক হোমস কোনও মহিলার জন্য উদ্বেলিত-হৃদয় হয়েছেন, কিম্বা পোয়ারোর হৃদয় বিচলিত হয়েছে এ কথা ভাবা যায় না। কিন্তু সবাই একরকম নন। লর্ড পিটার উইম্‌সিও আছেন। একটি খুনের মামলা তদন্ত করতে গিয়ে একটি কৃশাঙ্গী কালো মেয়ের সঙ্গে ব্যোমকেশের দেখা হয়। মেয়েটির দাদাকে পুলিস একটি মামলায় ভুল করে জড়িয়েছিল। লর্ড পিটার উইম্‌সির সঙ্গে হ্যারিয়েট ভেনের পরিচয়ও একটি খুনের মামলাকে উপলক্ষ্য করে।

বিয়ের পরেও ব্যোমকেশ-সত্যবতী হ্যারিসন রোডের মেসের তিনতলার অংশে কয়েক বছর বসবাস করেছিলেন। সঙ্গে অজিতও। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কলকাতা শহরের চরিত্র বদলে গেল। হ্যারিসন রোড অঞ্চল তখন আর সত্যবতীর পছন্দ হবার কথা নয়। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার কয়েক বছর পর ব্যোমকেশ আর অজিত লেকের

কাছে কেয়াতলায় এক টুকরো জমি কিনে বাড়ি করেছে। ব্যোমকেশের নামডাক যতই হোক পশার তত সুবিধার হয়নি। তাছাড়া বয়স হচ্ছে। অজিত তখন বইয়ের ব্যবসায় মন দিয়েছে। ব্যোমকেশের কাহিনী লিখে তার কি রকম আয় হত জানবার উপায় নেই। শরদিন্দুবাবুর জন্য সে রোজগারের পথও বন্ধ হয়েছে। গল্প বলার ভঙ্গীরও একটু বদল হয়েছে।

১৯৬৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসের শরদিন্দুবাবুর একটি চিঠিতে এই কথার উল্লেখ আছে—"ব্যোমকেশকে এবার একটু নতুন বেশে দেখবেন। আপনাদের হুকুমে কেয়াতলায় ব্যোমকেশের বাড়ি তৈরি হচ্ছে, গৃহপ্রবেশও অনতিবিলম্বে হবে। অজিতকে বক্তার আসন থেকে সরিয়ে দিয়েছি এবং চলিত ভাষার প্রবর্তন করেছি।" কিছুদিন পরের আর একটি চিঠিতে আছে—"অজিতকে বক্তার গদি থেকে নামিয়ে দেবার জন্যে কেউ কেউ চটেছেন। তবে ভরসা রাখি নতুন পরিবেশ ক্রমে অভ্যাস হয়ে যাবে।" এ আশঙ্কা অমূলক। অজিতের অপসারণে পাঠকরা যে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন তা মনে হয় না।

গোয়েন্দা কাহিনীর মধ্যে যা সাহিত্যপদবাচ্য তাব কোনও কোনও চরিত্র পাঠকদের কাছে সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে, তার নজির আছে। সত্যবতী-ব্যোমকেশ নতুন বাড়িতে আসবার পরে তারা কোনও কোনও পাঠকের কাছে কেবল আর গল্পের চরিত্র হয়ে নেই। কেয়াতলা পাড়ার কেউ কেউ তাঁদের প্রতিবেশী বলে ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন।

কলকাতায় তখন ট্যাক্সির খুব দুর্ভিক্ষ। শরদিন্দুবাবুকে লিখলুম "ওদের নিশ্চয় খুব অসুবিধা হচ্ছে। আপনি যখন বাড়ি করে দিয়েছেন, এবার সত্যবতীকে একটি গাড়ি কিনে দিন। আমি দেখেছি বিয়েব নিমন্ত্রণে যাবে বলে ওরা দুজনে গোলপার্কের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার অবহেলা করে চলে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সত্যবতীর প্রসাধন বাসী হয়ে এসেছে। আর একদিন দেখলুম গড়িয়াহাট থেকে বাজার করে সত্যবতী রিক্সা করে বাড়ি যাচ্ছে। গ্রন্থকারের পাষাণহৃদয় গলল না। আমাকে লিখলেন—"সত্যবতীর ডিমাণ্ড ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে। বাড়ি পেয়েছে তাতেও তৃপ্তি নেই। এখন গাড়ি চাই। বেচারা ব্যোমকেশ কোথা থেকে পায় বলুন দেখি। সত্যবতীকে একটা অটো-রিক্সা কিনে দিলে হয় না? কথাটা বিবেচনা করে দেখবেন।"

কলকাতা পুণা নয়। এখানে অটো-রিক্সার লাইসেন্স পাওয়া যাবে না। তাছাড়া কে শুনেছে বিখ্যাত গোয়েন্দা কিম্বা তাঁদের পত্নী রিক্সা চড়ে ঘুরে বেড়ান? ষাট বছর আগেও গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয় ছ্যাকড়া গাড়ি ছাড়া বের হতেন না। একটা ফর্দও তৈরি করে পাঠিয়েছিলাম বিদেশের নামকরা গোয়েন্দাদের কি ধরনের গাড়ি থাকে। কারুর কারুর এরোপ্লেনও আছে। শরদিন্দুবাবুর হৃদয়ে রেখাপাত হল না। তিনি ফলিত জ্যোতিষের চর্চা করতে ভালবাসতেন। আমাকে লিখলেন—"আমি ব্যোমকেশের হাত দেখেছি। তার বরাতে গাড়ি নেই।"

একটি চিঠিতে শরদিন্দুবাবুকে লিখেছিলাম ব্যোমকেশের আয় ভদ্রমত নয়, ফি বাড়ানো উচিত। তাঁর উত্তরে তিনি লিখেছেন—"'চিড়িয়াখানায়' ব্যোমকেশের ফি আপনার কম মনে হয়েছে! মনে রাখতে হবে গল্পের ঘটনাকাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে; টাকার মূল্য হ্রাস হয়েছিল বটে, কিন্তু এমন 'হাড়ির হাল' হয়নি। সেই সময়ে একদিনের কাজের জন্য ৫০।৬০ টাকা মন্দ মনে হয় না। এটাও মনে রাখতে হবে যে ব্যোমকেশের অর্থ-ভাগ্য ভাল নয়; এতদিন পরে অজিতের সহযোগিতায় একটা বাড়ি করেছে বটে, কিন্তু সত্যবতীকে একটা অটো-রিক্সা কিনে দেবার সঙ্গতি তার নেই। সত্যবতীর প্রতি আপনার পক্ষপাত আছে জানি, কিন্তু আমি কি করতে পারি? ভাগ্যং

ফলাতি সর্বত্র।"

বিদেশী ডিটেকটিভদের তুলনায় ব্যোমকেশের আয় নিশ্চয় কিছু নয়। সত্তর বছর আগে ইয়োরোপের নৃপতিরা গোয়েন্দাদের কাছে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে রাজকোষ প্রায় উন্মোচন করে দিতেন। এখন আর সেরকম হবার উপায় নেই। ইয়োরোপে, বিশেষ করে আমেরিকায় নামী গোয়েন্দাদের টাকার খাঁই কিছু কম নয়। আমাদের দেশে পূর্বকালে দেবেন্দ্রবিজয় কখনও টাকার অভাব বোধ করেছেন বলে মনে হয় না। বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় থাকতেন। তখন গাড়ির রেওয়াজ ছিল না। থাকলেও দেবেন্দ্রবিজয়ের অসুবিধা হত না। শরদিন্দুবাবু বলেছেন ব্যোমকেশের সংগতির অভাব। এই চিঠি ১৯৬৭ সালে লেখা। তারপরে কলকাতায় লোকের ভীড় আরও বেড়েছে। গাড়ির দামও অনেক বেড়েছে। ব্যোমকেশেরও গাড়ি কেনবার টাকা হয়নি। ইতিমধ্যে সত্যবতী ও ব্যোমকেশের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে, শরদিন্দুবাবুর ভ্রূকুটি সত্ত্বেও। তিনি বলতেন, আমি গাড়ির লোভ দেখিয়ে সত্যবতীর মনের শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছি এবং ব্যোমকেশের সুখের সংসারে অশান্তি হচ্চে।

কিন্তু শরদিন্দুবাবুর হৃদয় গলতে আরম্ভ করেছিল। আমি জানিয়েছিলাম গাড়ির অভাবে সত্যবতী-ব্যোমকেশ ভাল করে গড়িয়াহাটে বাজার করতে পারছে না, বৌভাতের নিমন্ত্রণে ঠিক সময়ে যেতে পারে না। আমার চিঠিতে সত্যবতীব প্রসাধনের একটু দীর্ঘ বর্ণনা ছিল। শরদিন্দুবাবু এত উৎসাহ পছন্দ করেননি, কিন্তু গাড়ির ব্যাপারে রাজী হয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে ২১শে ডিসেম্বর আমাকে লিখলেন—"অবশ্য আপনি যখন অকলঙ্কচরিত্র মানুষ তখন বিপদের আশঙ্কা বেশী নেই। তবু সাবধানে থাকা ভাল। ব্যোমকেশ যদিও বুড়ো হয়েছে, তবু এখনও সত্যবতীকে ভীষণ ভালবাসে, 'ওসমান'-এর আবির্ভাব সহ্য করবে না।

"আপনি সত্যবতীর মানসিক অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে পাষাণও বিগলিত হয়। আপনি তাকে মোটরকারের লোভ দেখিয়ে তার মানসিক যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।..একটা মতলব ঠাউরেছি, কিন্তু সেকথা এখন থাক।" কি মতলব পরের কয়েকটি পংক্তি থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে। "..অজিত মোটর ড্রাইভিং শিখছে। পুস্তক ব্যবসায়ের যে-রকম দুরবস্থা চলেছে ট্যাক্সি চালানো ছাড়া ভদ্রসন্তানদের আর কোনও পেশা নেই। বুঝ লোক যে জান সন্ধান।"

বুঝতে খুব অসুবিধা হবার কথা নয়। মাসখানেক পরে ১৯৬৯ সালে ২৫শে জানুয়ারী আমাকে আবার লিখছেন—"একটা গোপন খবর দিচ্চি—ওদের বইয়ের দোকান ভাল চলছে না। অজিত লুকিয়ে লুকিয়ে মোটর চালানো শিখছে। সন্দেহ হয় যে সে এবার ট্যাক্সি চালাবে। ভদ্রলোকের ছেলের কি দুরবস্থা বলুন তো। ব্যোমকেশ বোধহয় জানে না। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। হয়তো এই ফাঁকে সত্যবতীর মোটর লাভ হয়ে যাবে।" শরদিন্দুবাবু কিছুদিন পরে মতলবটি পরিত্যাগ করেছিলেন। অজিত ড্রাইভার, সত্যবতী আরোহিণী—এই চিত্র তাঁর মনে বেশী দিন স্থান পায়নি।

ইতিমধ্যে শরদিন্দুবাবুর জন্মদিনের সময় এসে গেল। এই সময় একটি ঘটনা হয়েছিল শরদিন্দুবাবু জানতেন না। সেটি আমার চিঠি থেকে তুলে দিচ্চি—"দশটার সময় বিশ্ববিদ্যালয় যাবার মুখে যাদবপুর ডাকঘরে গিয়েছি। বক্সী দম্পতির সঙ্গে দেখা। আপনাকে জন্মদিনের টেলিগ্রাম পাঠাতে এসেছেন। খসড়াটা আমাকে দেখালেন। আমি তো দেখে স্তম্ভিত। খসড়াটা এই রকম—Byomkesh and Satyabati Send Greetings to Ungrateful Father। বললাম, ছি ছি, এ সব কি কাণ্ড। এ কথা কি কেউ লেখে? কোনান ডয়েলকে কেউ কেউ Ungrateful father বলেছেন। শরদিন্দুবাবু কি সেই রকম? কোনান ডয়েল তো শার্লক হোমসকে মেরেই ফেলেছিলেন।

আর শরদিন্দুবাবু তোমাদের বহাল তবিয়তে রেখেছেন। কেঁয়াতলায় বাড়ি পর্যন্ত করে দিয়েছেন। এই কথা শুনে ব্যোমকেশের মনে কি হল জানি না। কিন্তু সত্যবতীর বড় বড় চোখে জল এলো। মনে হল কাকচক্ষু দীঘি জল, দীঘি ছাপিয়ে পড়ছে। বোধহয় একটু চেঁচিয়ে কথা হচ্ছিল। যাদবপুরের রাস্তায় আপিসের ভীড়। তাছাড়া সুন্দরীর চোখে জল দেখে ভীড় জমে গেল। ব্যোমকেশ এক পা দু পা করে স্ত্রীর হাত ধরে ডাকঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। সে টেলিগ্রাম আপনি পাননি। ওরা বুদ্ধি করে খসড়া বদল করে দিয়েছিল।

"ভাবছি এইবার বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়ি ঝামেলায় আর কাজ নেই। এমন সময় পেছন থেকে মোটা গলায় কে একজন বললেন "কি ব্যাপার, মহিলাটি কাঁদছিলেন কেন?" তাকিয়ে দেখি এ রকম চেহারা কখনও দেখিনি। ভদ্রলোকের গায়ে প্লেট দেওয়া শার্ট, শার্টের হাতে শক্ত 'কফ্', তার উপরে চায়না সিল্কের বুক খোলা কোট। কালোপাড় শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি। পায়ে সিল্কের মোজা ও ডার্বি জুতো। এ রকম চেহারা ষাট বছর আগে দেখা যেত। ভদ্রলোক বললেন, "আমাকে চেনেন?" আমার কি রকম চেনাচেনা মনে হতে লাগল। কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে করতে পারলাম না। কি রকম জানেন, খানিকটা সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড, খানিকটা শেখ ফসিউল্লা কৃত গোলাপ নির্যাসের মোড়কে যেমন ছবি থাকত সেই রকম। ভদ্রলোক বললেন, "আমি কে জানেন? আমি বিখ্যাত ডিটেকটিভ দেবেন্দ্রবিজয়বাবু।" তৎক্ষণাৎ সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ছেলেবেলায় পড়া 'হরতনের নওলা', 'মায়াবিনী', 'নীলবসনা সুন্দরী' আর সেই পরিচিত ছবি: দেবেন্দ্রবিজয় সিল্কের কোট, কফ দেওয়া সার্ট, শান্তিপুরী ধুতি আর ডার্বি জুতো পরে জলে ভাসছেন। গাছের শিকড় ধরে তীরে উঠবার চেষ্টা করছেন আর সুন্দরী পাপিষ্ঠা জুমেলিয়া ছুরি দিয়ে শিকড় কেটে দিচ্ছে। দেবেন্দ্রবিজয়বাবু অসহায়। আর কিছুক্ষণ জলে থাকলে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।

"বললাম, "কিছু মনে করবেন না স্যার, অনেকদিন আগের পরিচয় কিনা চিনতে দেরী হচ্ছিল।" ভদ্রলোক একটু খুশি হলেন মনে হল, কিন্তু সত্যান্বেষীরা কর্তব্য ভোলে না। আমাকে বললেন, "মহিলাটি কাঁদছিলেন কেন বললেন না তো।" বলে ফেললাম "আর কিছু নয়, শরদিন্দুবাবু মহিলাটিকে গাড়ি কিনে দেবেন বলে গাড়ি কিনে দেননি। তাই উনি কাঁদছিলেন। কথার খেলাপ করেছেন কিনা।" দেবেন্দ্রবিজয়বাবু দাড়িতে হাত দিয়ে বললেন, "শরদিন্দুবাবু মেয়েছেলেটিকে গাড়ি দেবেন কেন?" বললাম, "ঠিক ওঁকে না স্যার, ওঁর স্বামীকে। তিনি ডিটেকটিভ কিনা—বিখ্যাত ব্যক্তি—ব্যোমকেশ বক্সী।" দেবেন্দ্রবিজয়বাবু বললেন, "নাম শুনিনি।" আপনি শুনলে হয়তো ব্যথা পাবেন। কিন্তু সত্য গোপন করা উচিত নয়। দেবেন্দ্রবাবু বললেন, "ডিটেকটিভের আবার মোটর গাড়ির দরকার কি? এই যে আমি এত চোরডাকাত ধরেছি, আমার গাড়ি ছিল? তবে হ্যাঁ, পাঁচকড়িবাবুর দয়ার শরীর, থার্ড ক্লাশ ছ্যাকড়া গাড়ি হলেও চড়তে দিয়েছেন। আমি সেই গাড়িতে চড়ে বেহালা, বরানগর, কলকাতার দক্ষিণে হাজরা রোডে ঠ্যাঙগাড়েদের ধরেছি। আমার গাড়ি ছিল?". এই সব কথা শুনে হকচকিয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখি দেবেন্দ্রবিজয়বাবু আর সেখানে নেই। কি করে তিনি অন্তর্ধান করলেন ভাবতে ভাবতে ক্লাশের ঘণ্টা পড়ে গেল।

"সেই রাত্রে ভীষণ বিভীষিকার স্বপ্ন দেখলাম। আমি যেন পুণায় বেড়াতে গিয়েছি। সন্ধ্যাবেলায় লাকড়ি ব্রিজের কাছে পা ফসকে জলে পড়ে গেলাম। জোরে হাত পা ছুঁড়তে লাগলাম। কিন্তু জলে একটুও শব্দ হল না। একটা ঢেউ উঠল না, একটা বুদ্বুদও নয়। মনে হল একটা বড় কাচের টুকরোর মতন জল আমাকে চারদিক থেকে চেপে রেখেছে। যখন একেবারে ডুবে যাচ্ছি, তখন কয়েকটা শিকড়ের সঙ্গে হাত আটকে

গেল। কোনও রকমে সেটা ধরে উঠবার চেষ্টা করছি, এমন সময় উপরের দিকে তাকিয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। পরণে কালো শাড়ি পরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। তার মুখ ভাল করে দেখতে পেলাম না। মনে হল ছেলেবেলায় জুমেলিয়ার যে ছবি দেখেছিলাম তার সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে। আমি যতবার শিকড় ধরে উঠবার চেষ্টা করছি মেয়েটি ছুরি বার করে শিকড় কেটে দিচ্চে। আমি হঠাৎ চীৎকার করে উঠলাম। ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিন্তু তার আগে তার মুখের কাপড় সরে গিয়েছিল। এক সেকেণ্ডের জন্য দেখতে পেলাম সে মুখ জুমেলিয়ার নয়, সে মুখ সত্যবতীর।"

এই চিঠি পেয়ে শরদিন্দুবাবু আমাকে লিখলেন—"ব্যোমকেশ আমাকে Ungrateful father বলে 'তার' করতে যাচ্ছিল - জেনে ভীষণ রাগ হয়েছিল। ভেবেছিলাম ওকে ত্যাজ্যপুত্র করব, নেহাৎ সত্যবতীর কথা ভেবে নিরস্ত হয়েছি। মেয়েটা বড় ভাল। ভাগ্যদোষে অপাত্রে পড়েছে। ওর কান্না আমিও দেখেছি। কাঁদলে ওকে বড় সুন্দর দেখায়। অজিতের কথা ধরি না। ওটা গোল্লায় গেছে; বুড়ো বয়সে ট্যাক্সি চালাবে বলে মোটর ড্রাইভিং শিখছে। কিন্তু আমিও শপথ করেছি ওকে ট্যাক্সি চালাতে দেব না। বইএর ব্যবসা ছেড়ে ট্যাক্সি চালাবে। ইয়ার্কি পেয়েছে।" দেবেন্দ্র-বিজয় বসু সম্বন্ধে এই চিঠিতেই লিখছেন—"আপনি স্বনামধন্য দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। আপনি ধন্য। আমার ধারণা ছিল তিনি বহুকাল দেহ-রক্ষা করেছেন। বোধহয় কায়কল্প করে বেঁচে আছেন। কিন্তু তাঁর অসামান্য প্রতিভা যে এতটুকু ম্লান হয়নি তা তাঁর কথা থেকেই বোঝা যায়। ব্যোমকেশের নাম শোনেননি তিনি এ আর বিচিত্র কি। ঈগল পাখি কি টুনটুনি পাখির নাম জানে! আর গাড়ি কেনা সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা তাঁর মতন জ্ঞানগরিষ্ঠ লোকেরই উপযুক্ত। নেহাৎ কথা দিয়ে ফেলেছি, নইলে আমি হাত গুটোতাম।"

বোঝা গেল অজিতের ট্যাক্সির ব্যবসা হবে না। বিনা পয়সায় ট্যাক্সি চড়া সত্যবতীর কপালে নেই। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই দেখছি সত্যবতীর গাড়ি সম্বন্ধে শরদিন্দু বাবুর মত বদলে গিয়েছে। প্রথমে অটো-রিক্সায় রাজী হয়েছিলেন, অটো-রিক্সা থেকে অজিতের ট্যাক্সি। পরে আবার একটি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি দেবার কথাও তাঁর মনে হয়েছিল। ১৯৭০ সালের প্রথমে একটি চিঠিতে তাঁকে লিখেছি—"কি গাড়ি সত্যবতীকে দিচ্ছেন? সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দেবেন না। এখন নতুন গাড়িরই যা অবস্থা। এমন গাড়ি দেবেন যাতে সত্যবতীর মন প্রসন্ন হয় এবং স্বনামধন্য পাঁচকড়িবাবুও খুঁত ধরতে না পারেন। সেবার তিনি আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।" শরদিন্দুবাবু তার উত্তরে আমাকে বলেছিলেন সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়িই দেব, কিন্তু এমনভাবে দেব সত্যবতী ঠিক বুঝতে পারবে না। এইভাবে এই সংগ্রহের শেষ গল্প বিশুপাল বধের সূচনা হয়েছিল।

১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে শরদিন্দুবাবু কলকাতায় এসে মাসখানেক ছিলেন। পুণায় ফিরে গিয়ে তিনি বিশুপাল বধ সুরু করেছিলেন। গল্পটি তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। পড়লে মনে হয় প্রায় অর্ধেক লেখা বাকি আছে। উত্তর কলকাতার একটি থিয়েটারের স্টেজে একজন অভিনেতার খুনের রহস্যভেদ করবার চেষ্টা কেবল আরম্ভ হয়েছে। এই গল্পে আমার নামের সঙ্গে মিল, শরদিন্দুবাবু হয়তো বলতেন স্বভাবের সঙ্গেও মিল, একটি চরিত্র আছে। সে ব্যোমকেশকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যাচ্চে এবং প্রসন্নচিত্তে গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে সত্যবতীর বাজারের ব্যাগ নিজের হাতে বয়ে নিয়ে আসছে। গল্পটির পাণ্ডুলিপি লেখকের জীবদ্দশায় দেখিনি। তবে তাঁর মুখে শুনেছিলাম তিনি আমার নাম ব্যবহার করেছেন। আমার ক্ষীণ আপত্তি টেঁকেনি। এই গল্পের ঘটনা বা দুর্ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ফল সত্যবতীর মোটর গাড়ি প্রাপ্তি সে সম্বন্ধেও আভাস পাওয়া গিয়েছিল। শরদিন্দুবাবু আমাকে শাসিয়ে রেখেছিলেন

গল্পটিতে প্রতুলবাবু নামের ব্যক্তিটিকে পুলিসের জেরায় নাজেহাল হতে হবে। কিন্তু গল্পটি ততদূর এগোয়নি। থিয়েটারের প্রম্পটার কালীকিংকর দাসের জবানবন্দী আরম্ভ হয়েছে মাত্র। থিয়েটারের লোকের জবানবন্দী শেষ হলে অন্য সবার পালা আসত। বঙ্কিমচন্দ্র একটি অসমাপ্ত ভূতের গল্প রেখে গিয়েছিলেন। তার নাম 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী। গল্পটির সূত্রপাত কেবল আরম্ভ হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক পরে কোনও মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সেটিকে অন্য একজনকে দিয়ে সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। শরদিন্দুবাবুর প্রকাশক সে চেষ্টা করেননি। বোধহয় ভালই করেছেন।

একটি বিষয় হয়তো লক্ষ্য করবার আছে। তাঁর পরিচিতরা জানতেন শরদিন্দুবাবুর ফলিত জ্যোতিষে অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি বারে বারে বলেছেন ব্যোমকেশের কোষ্ঠী দেখেছি, ওর গাড়ি কেনবার সম্ভাবনা নেই। আমাদের উপরোধে অবশেষে গাড়ি দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু গল্পটি শেষ হয়নি। সত্যবতীর বরাতেও শেষ পর্যন্ত গাড়ি হল না। ফলিত জ্যোতিষে তাঁর গণনা কি রকম অভ্রান্ত হয় শরদিন্দুবাবু বোধহয় তার প্রমাণ দিয়ে গেলেন।

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আদিম রিপু

এক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বাংলা দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতা শহরে, মানুষের জীবনের মূল্য খুবই কমিয়া গিয়াছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে আমরা জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তারপর জিন্না সাহেবের সম্মুখ সমর যখন আরম্ভ হইল, তখন আমরা মৃত্যুদেবতাকে একেবারে ভালবাসিয়া ফেলিলাম। জাতি হিসাবে আমরা যে টিকিয়া আছি, সে কেবল মৃত্যুর সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করিতে পারি বলিয়াই। বাঘ ও সাপের সঙ্গে আমরা আবহমানকাল বাস করিতেছি, আমাদের মারে কে?

সম্মুখ সমরের প্রথম অনলোদ্‌গার প্রশমিত হইয়াছে; কিন্তু তলে তলে অঙ্গার জ্বলিতেছে, এখানে ওখানে হঠাৎ দপ করিয়া জ্বলিয়া আবার ভস্মের অন্তরালে লুকাইতেছে। কলিকাতার সাধারণ জীবনযাত্রায় কিন্তু কোনও প্রভেদ দেখা যায় না। রাস্তায় ট্রাম বাস তেমনি চলিতেছে, মানুষের কর্মতৎপরতার বিরাম নাই। দুই সম্প্রদায়ের সীমান্ত ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে হৈ হৈ দুমদাম শব্দ ওঠে, চকিতে দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়, রাস্তায় দুই চারিটা রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। সুরাবর্দি সাহেবের পুলিস আসিয়া হিন্দুদের শাসন করে, মৃতদেহের সংখ্যা দুই চারিটা বাড়িয়া যায়। কোথা হইতে মোটর ভ্যান আসিয়া মৃতদেহগুলিকে কুড়াইয়া লইয়া অন্তর্ধান করে। তারপর আবার নগরীর জীবনযাত্রা পূর্ববৎ চলিতে থাকে।

ব্যোমকেশ ও আমি কলিকাতাতেই ছিলাম। আমাদের হ্যারিসন রোডের বাসাটা যদিও ঠিক সমর সীমানার উপর পড়ে না, তবু যথাসাধ্য সাবধানে ছিলাম। ভাগ্যক্রমে কয়েক মাস আগে ব্যোমকেশের শ্যালক সুকুমার খোকাকে ও সত্যবতীকে লইয়া পশ্চিম বেড়াইতে গিয়াছিল, তাই সম্মুখ সমর যখন আরম্ভ হইল, তখন ব্যোমকেশ 'তার' করিয়া তাহাদের কলিকাতায় ফিরিতে বারণ করিয়া দিল। তদবধি তাহারা পাটনায় আছে। ইতিমধ্যে সত্যবতীর প্রবল পত্রাঘাতে আমরা বার দুই পাটনা ঘুরিয়া আসিয়াছি; কারণ আমরা যে বাঁচিয়া আছি, তাহা মাঝে মাঝে স্বচক্ষে না দেখিয়া সত্যবতী বিশ্বাস করিতে চাহে নাই।

যাহোক, খোকা ও সত্যবতী নিরাপদে আছে, ইহাতেই আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় নিজের প্রাণ রক্ষার চেয়ে প্রিয়জনের নিরাপত্তাই অধিক বাঞ্ছনীয় হইয়া ওঠে।

যেদিনের ঘটনা লইয়া এই কাহিনীর সূত্রপাত সেদিনটা ছিল দুর্গাপূজা এবং কালীপূজার মাঝামাঝি একটা দিন। দুর্গাপূজা অন্যান্য বারের মত যথারীতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে এবং কালীপূজাও যথাবিধি সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। আমরা দুজনে সকালবেলা খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছিলাম, এমন সময় বাঁটুল সর্দার আসিল। তাহাকে সেলামী দিলাম। বাঁটুল এই এলাকার গুণ্ডার সর্দার; বেঁটে নিটোল চেহারা, তৈলাক্ত ললাটে সিঁদুরের ফোঁটা। সম্মুখ সমর আরম্ভ হইবার পর হইতে বাঁটুলের প্রতাপ বাড়িয়াছে,

পাড়ার সজ্জনদের গুণ্ডার হাত হইতে রক্ষা করিবার ওজুহাতে সে সকলের নিকট সেলামী আদায় করে। সেলামী না দিলে হয়তো কোনদিন বাটুলের হাতেই প্রাণটা যাইবে এই ভয়ে সকলেই সেলামী দিত।

সেলামীর জুলুম সত্ত্বেও ব্যোমকেশের সহিত বাঁটুলের বিশেষ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। আদায়তসিল উপলক্ষে বাঁটুল আসিয়া উপস্থিত হইলে ব্যোমকেশ তাহাকে চা সিগারেট দিত, তাহার সহিত গল্প জমাইত; শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষের কূটনীতি সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যাইত। বাঁটুল এই ফাঁকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসঙ্গ তুলিত। যুদ্ধের পর মার্কিন সৈনিকেরা অনেক আগ্নেয়াস্ত্র জলের দরে বিক্রি করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, বাঁটুল সেই অস্ত্র কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, এখন সে তাহা আমাদের বিক্রি করিবার চেষ্টা করিত। বলিত, 'একটা রাইফেল কিনে ঘরে রাখুন কর্তা। আমরা তো আর সব সময় সব দিকে নজর রাখতে পারি না। ডামাডোলের সময় হাতে হাতিয়ার থাকা ভাল।'

আমি বলিতাম, 'না বাঁটুল, রাইফেল আমার দরকার নেই। অত বড় জিনিস লুকিয়ে রাখা যাবে না, কোন্ দিন পুলিস খবর পাবে আর হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে একটা পিস্তল কি রিভলবার যদি যোগাড় করতে পার '

বাঁটুল বলিত, 'পিস্তল যোগাড় করাই শক্ত বাবু। আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব '

বাঁটুল মাসে একবার আসিত।

সেদিন যথারীতি সেলামী লইয়া বাঁটুল আমাদের অভয় প্রদানপূর্বক প্রস্থান করিলে আমরা কিছুক্ষণ ম্রিয়মাণভাবে সাময়িক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিলাম। এভাবে আর কতদিন চলিবে? মাথার উপর খাঁড়া ঝুলাইয়া কতকাল বসিয়া থাকা যায়? স্বাধীনতা হয়তো আসিতেছে, কিন্তু তাহা ভোগ করিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিব কি? সম্মুখ সমরে যদি বা প্রাণ বাঁচে, কাঁকর ও তেঁতুল বিচির গুঁড়া খাইয়া কত দিন বাঁচিব? ব্যোমকেশের হাতে কাজকর্ম কোনও কালেই বেশী থাকে না, এখন একেবারে বন্ধ হইয়াছে। যেখানে প্রকাশ্য হত্যার পাইকারী কারবার চলিতেছে, সেখানে ব্যোমকেশের রহস্যভেদী বুদ্ধি কাহার কাজে লাগিবে?

আমি বলিলাম, 'ভারতীরে ছেড়ে ধর এইবেলা লক্ষ্মীর উপাসনা।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ রাত দুপুরে ছোরা বগলে নিয়ে বেরোও, যদি দু'চারটে কালাবাজারের মক্কেলকে সাবাড় করতে পার, তাহলে আর ভাবতে হবে না। যে সময়-কাল পড়েছে, বাঁটুল সর্দারই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কথাটা মন্দ বলোনি যুগধর্মই ধর্ম। কিন্তু কি জানো, ও জিনিসটা রক্তে থাকা চাই। খুনই বল আর কালাবাজারই বল, পূর্বপুরুষদের রক্তের জোর না থাকলে হয় না। আমার বাবা ছিলেন স্কুল মাস্টার, স্কুলে অঙ্ক শেখাতেন আর বাড়িতে সাংখ্য পড়তেন। মা ছিলেন বৈষ্ণব বংশের মেয়ে, নন্দগোপাল নিয়েই থাকতেন। সুতরাং ওসব আমার কর্ম নয়।'

ব্যোমকেশের বাল্য ইতিহাস আমার জানা ছিল। তাহার যখন সতেরো বছর বয়স, তখন তাহার পিতার যক্ষ্মা হয়, মাতাও সেই রোগে মারা যান। আত্মীয়-

স্বজন কেহ উঁকি মারেন নাই। তারপর ব্যোমকেশ জলপানির জোরে বিশ্ববিদ্যা সমুদ্র পার হইয়াছে, নিজের চেষ্টায় নূতন জীবন-পথ গাঁড়িয়া তুলিয়াছে। আত্মীয়-স্বজন এখনও হয়তো আছেন, কিন্তু ব্যোমকেশ তাঁহাদের খোঁজ রাখে না।

কিছুক্ষণ বিমনাভাবে কাটিয়া গেল। আজ সত্যবতীর একখানা চিঠি আসিতে পারে, মনে মনে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।

খট্ খট্ খট্ খট্ কড়া নাড়িয়া উঠিল। আমি উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিলাম।

ডাকপিওন নয়। তৎপরিবর্তে যিনি দ্বারের বাইরে দাঁড়াইয়া আছেন, বেশবাস দেখিয়া তাঁহাকে স্ত্রীলোকই বলিতে হয়। কিন্তু সে কী স্ত্রীলোক! পাঁচ হা লম্বা, তদনুপাতে চওড়া শালপ্রাংশু আকৃতি, পালিশ করা আবলুশ কাঠের মত গায়ের রঙ; ঘটোধ্নী, নিবিড়নিতম্বিনী, স্পষ্ট একজোড়া গোঁফ আছে; বয়স পঞ্চাশের ওপারে। তিনি আমার দিকে চাহিয়া হাস্য করিলেন, মনে হইল হার মোনিয়ামের ঢাকনা খুলিয়া গেল।

তিনি রামায়ণ মহাভারত হইতে বিনির্গত কোনও অতি-মানবী কিনা ভাবিতেছি, হারমোনিয়াম হইতে খাদের গভীর আওয়াজ বাহির হইল, 'আপনি কি ব্যোমকেশবাবু?'

আমি দৃঢ় মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিলাম। ব্যোমকেশের সহিত মহিলাটির কি প্রয়োজন জানি না, কিন্তু আমি যে ব্যোমকেশ নই তাহা অকপটে ব্যক্ত করাই সমীচীন। ব্যোমকেশ ঘরের ভিতর হইতে মহিলাটিকে দেখিতে পায় নাই, আমার অবস্থা দেখিয়া উঠিয়া আসিল। সেও অভ্যাগতকে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য থতমত খাইয়া গেল, তারপর সৎসাহস দেখাইয়া বলিল, 'আমি ব্যোমকেশ।'

মহিলাটি আবার হারমোনিয়ামের ঢাকনা খুলিলেন, বলিলেন, 'নমস্কার। আমার নাম মিস্ ননীবালা রায়। আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।'

'আসুন।'

খট্ খট্ জুতার শব্দ করিয়া মিস্ ননীবালা রায় ঘরে প্রবেশ করিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে চেয়ারে বসাইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এরূপ আকৃতি লইয়া ইনি কখনই ঘরের ঘরণী হইতে পারেন না, স্বামীপুত্র ঘরকন্না গৃহস্থালি ইঁহার জন্য নয়। বিশেষ নামের অগ্রে 'মিস্' খেতাবটি দাম্পত্য সৌভাগ্যের বিপরীত সাক্ষ্য দিতেছে। তবে ইনি কি? জেনানা ফাটকের জমাদারণী? উহুঁ, অতটা নয়। শিক্ষয়িত্রী? বোধ হয় না। লেডি ডাক্তার? হইতেও পারে -

পরক্ষণেই ননীবালা নিজের পরিচয় দিলেন। দেখিলাম বেশী ভুল করি নাই। তিনি বলিলেন, 'আমি পাটনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ধাত্রী ছিলাম, এখন রিটায়ার করে কলকাতায় আছি। একজনের কাছে আপনার নাম শুনলাম, ঠিকানাও পেলাম। তাই এসেছি।'

ব্যোমকেশ গম্ভীরমুখে বলিল, 'কি দরকার বলুন।'

মিস্ ননীবালার চেহারা যেরূপ জবরদস্ত, আচার আচরণ কিন্তু সেরূপ নয়। তাঁহার হাতে একটা কালো রঙের হ্যাণ্ডব্যাগ ছিল, তিনি সেটা খুলিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন, 'আমি গরীব মানুষ ব্যোমকেশবাবু। টাকাকড়ি বেশি আপনাকে দিতে পারব না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'টাকাকড়ির কথা পরে হবে। কি দরকার আগে বলুন।'

ননীবালা ব্যাগ বন্ধ করিলেন, তারপর সহসা কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন

'আমার ছেলের বড় বিপদ, তাকে আপনি রক্ষে করুন ব্যোমকেশবাবু—।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আপনার—ছেলে!'

ননীবালা একটু অপ্রস্তুত হইলেন, বলিলেন, 'আমার ছেলে—মানে—আমি মানুষ করেছি। অনাদিবাবু তাকে পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছেন—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বড় প্যাঁচালো ব্যাপার দেখছি। আপনি গোড়া থেকে সব কথা বলুন।'

ননীবালা তখন নিজের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গল্প বলার শৈলী ভাল নয়, কখনও দশ বছর পিছাইয়া কখনও বিশ বছর আগাইয়া বহু অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া যাহা বলিলেন, তাহার জট ছাড়াইলে এইরূপ দাঁড়ায়—

বাইশ তেইশ বছর আগে মিস্ ননীবালা রায় পাটনা হাসপাতালের ধাত্রী ছিলেন। একদিন একটি যুবতী হাসপাতালে ভর্তি হইল; অবস্থা খুবই খারাপ প্লুরিসির সহিত নানা উপসর্গ, তার উপর পূর্ণগর্ভা। যে পুরুষটি তাহাকে আনিয়াছিল, সে ভর্তি করিয়া দিয়াই অদৃশ্য হইল।

যুবতী হিন্দু নয়, বোধ হয় আদিম জাতীয় দেশী খৃষ্টান। দুই দিন পরে সে একটি পুত্র প্রসব করিয়া মারা গেল। পুরুষটা সেই যে উধাও হইয়াছিল, আর ফিরিয়া আসিল না।

এইরূপ অবস্থায় শিশুর লালন-পালনের ব্যবস্থা রাজ সরকার করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ননীবালা শিশুটির ভার লইলেন। ননীবালা অবিবাহিতা, সন্তানাদি নাই, শিশুটি বড় হইয়া তাঁহার পুত্রের স্থান অধিকার করিবে এই আশায় তিনি শিশুকে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। শিশুর নাম হইল প্রভাত রায়।

প্রভাতের বয়স যখন তিন-চার, তখন ননীবালা হঠাৎ একটি ইন্সিওর চিঠি পাইলেন। চিঠির সঙ্গে দুই শত টাকার নোট। চিঠিতে লেখা আছে, আমি জানিতে পারিয়াছি আমার ছেলে তোমার কাছে আছে। তাহাকে পালন করিও। উপস্থিত কিছু টাকা পাঠাইলাম, সুবিধা হইলে আরও পাঠাইব।—চিঠিতে নাম দস্তখত নাই।

তারপর প্রভাতের বাপের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লোকটা সম্ভবতঃ মরিয়া গিয়াছিল। ননীবালা বিশেষ দুঃখিত হইলেন না। বাপ কোনও দিন আসিয়া ছেলেকে লইয়া যাইবে এ আশংকা তাঁহার ছিল। তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

প্রভাত বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। ননীবালা নিজের ডিউটি লইয়া থাকেন, ছেলের দেখাশুনা ভাল করিতে পারেন না; প্রভাত পাড়ার হিন্দুস্থানী ছেলেদের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় খেলা করিয়া বেড়ায়। তাহার লেখাপড়া হইল না।

পাড়ায় এক মুসলমান দপ্তরীর দোকান ছিল। প্রভাতের যখন ষোল-সতরো বছর বয়স, তখন সে দপ্তরীর দোকানে কাজ করিতে আরম্ভ করিল। প্রভাত লেখাপড়া শেখে নাই বটে, কিন্তু সে বয়াটে উচ্ছৃংখল হইয়া গেল না। মন দিয়া নিজের কাজ করিত, ধাত্রীমাতাকে গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা করিত।

এইভাবে তিন চার বছর কাটিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে অনাদি হালদার নামে এক ভদ্রলোক পাটনায় আসিলেন। অনাদিবাবু ধনী ব্যবসাদার। তাঁহার ব্যবসায়ের বহু খাতা বহি বাঁধাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তিনি দপ্তরীকে

ডাকিয়া পাঠাইলেন। দপ্তরী প্রভাতকে তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দিল। অনেক খাতা পত্র, দপ্তরীর দোকানে সব বহন করিয়া লইয়া যাওয়া সুবিধাজনক নয়। প্রভাত নিজের যন্ত্রপাতি লইয়া অনাদিবাবুর বাসায় আসিল এবং কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহার খাতা বহির মলাট বাঁধিয়া দিল।

অনাদিবাবু অকৃতদার ছিলেন। প্রভাতকে দেখিয়া বোধ হয় তাহার ভাল লাগিয়া গিয়াছিল, তিনি একদিন ননীবালার বাসায় আসিয়া প্রস্তাব করিলেন তিনি প্রভাতকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে চান।

এতবড় ধনী ব্যক্তির পোষ্যপুত্র হওয়া ভাগ্যের কথা; কিন্তু ননীবালা এক কথায় প্রভাতকে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না। প্রভাতও মাকে ছাড়িতে চাহিল না। তখন রফা হইল, প্রভাতের সংগে ননীবালাও অনাদিবাবুর সংসারে থাকিবেন, নারীবর্জিত সংসারে ননীবালাই সংসার পরিচালনা করিবেন।

ননীবালা হাসপাতালের চাকরি হইতে অবসর লইলেন। অনাদি হালদারও কর্মজীবন হইতে প্রায় অবসর লইয়াছিলেন, তিনজনে কলিকাতায় আসিলেন। সে আজ প্রায় দেড় বছর আগেকার কথা। সেই অবধি তাঁহারা বহুবাজারের একটি ভাড়াটে বাড়ির দ্বিতলে বাস করিতেছেন। যুদ্ধের বাজারে ভাল বাসা পাওয়া যায় না। কিন্তু অনাদিবাবু তাঁহার বাসার পাশেই একটি পুরাতন বাড়ি কিনিয়াছেন এবং তাহা ভাঙিয়া নূতন বাড়ি তৈরি করাইতেছেন। বাড়ি তৈরি হইলেই তাঁহারা নূতন বাড়িতে উঠিয়া যাইবেন।

অনাদিবাবুর এক বড় ভাই ছিলেন তিনি কলিকাতায় সাবেক বাড়িতে বাস করিতেন। ভায়ের সহিত অনাদিবাবুর সদ্ভাব ছিল না কোনও সম্পর্কই ছিল না। ভাই প্রায় দশ বছর পূর্বে মারা গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দুই পুত্র আছে—নিমাই ও নিতাই। অনাদিবাবু কলিকাতায় আসিয়া বাসা লইলে তাহারা কোথা হইতে সন্ধান পাইল এবং তাঁহার কাছে যাতায়াত শুরু করিল।

ননীবালার মতে নিমাই ও নিতাই পাকা শয়তান মিটমিটে ডান, ছেলে খাওয়ার রাক্ষস। কাকা পোষ্যপুত্র লইলে কাকার অতুল সম্পত্তি বেহাত হইয়া যাইবে, তাই তাহারা কাকাকে বশ করিয়া দত্তক গ্রহণ নাকচ করাইতে চায়। অনাদিবাবু ভ্রাতুষ্পুত্রদের মতলব বুঝিয়া কিছুদিন আমোদ অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে তিনি উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। মাস কয়েক আগে তিনি ভাইপোদের বলিয়া দিলেন তাহারা যেন তাঁহার গৃহে পদার্পণ না করে।

নিমাই ও নিতাই কাকার বাসায় আসা বন্ধ করিল বটে, কিন্তু আশা ছাড়িল না। অনাদিবাবু প্রভাতকে একটি বইয়ের দোকান করিয়া দিয়াছিলেন; কলেজ স্ট্রীটের এক কোণে ছোট্ট একটি দোকান। প্রভাত লেখাপড়া শেখে নাই বটে কিন্তু সে বই ভালবাসে; এই দোকানটি তাহার প্রাণ। সে প্রত্যহ দোকানে যায়, নিজের হাতে বই বিক্রি করে। নিতাই ও নিমাই তাহার দোকানে যাতায়াত আরম্ভ করিল। বই কিনিত না, কেবল চক্ষু মেলিয়া প্রভাতের পানে চাহিয়া থাকিত; তারপর নীরবে দোকান হইতে বাহির হইয়া যাইত।

তাহাদের চোখের দৃষ্টি বাঘের দৃষ্টির মত ভয়ানক। তাহারা মুখে কিছু বলিত না, কিন্তু তাহাদের মনের অভিপ্রায় প্রভাতের জানিতে বাকী থাকিত না। প্রভাত ভালমানুষ ছেলে, সে ভয় পাইয়া ননীবালাকে আসিয়া বলিল; ননীবালা অনাদিবাবুকে বলিলেন। অনাদিবাবু এক গুর্খা নিয়োগ করিলেন, যতক্ষণ দোকান

খোলা থাকবে, ততক্ষণ গুর্খা কুকরি লইয়া দোকান পাহারা দিবে।

ভ্রাতুষ্পুত্র যুগলের দোকানে আসা বন্ধ হইল। কিন্তু তবু প্রভাত ও ননীবালার ভয় দূর হইল না। সর্বদাই যেন দুজোড়া অদৃশ্য চক্ষু তাঁহাদের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছে, তাঁহাদের গতিবিধি অনুসরণ করিতেছে।

তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার লইয়া বাড়িতে অশান্তি দেখা দিয়াছে। একটি মেয়েকে দেখিয়া প্রভাতের ভাল লাগিয়াছিল; মেয়েটি পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু একটি পরিবারের মেয়ে, খুব ভাল গান বাজনা জানে, দেখিতে সুন্দরী। কোন এক সভায় প্রভাত মেয়েটিকে গান গাহিতে শুনিয়াছিল এবং তাহার কথা ননীবালাকে বলিয়াছিল। অনাদিবাবু প্রভাতের জন্য পাত্রী খুঁজিতেছিলেন, ননীবালার মুখে এই মেয়েটির কথা শুনিয়া বলিলেন, তিনি নিজে মেয়ে দেখিয়া আসিবেন এবং পছন্দ হইলে বিবাহ দিবেন।

অনাদিবাবু মেয়ে দেখিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, এ মেয়ের সঙ্গে প্রভাতের বিবাহ হইতে পারে না। তিনি কোনও কারণ প্রদর্শন করিলেন না, কিন্তু ননীবালার বিশ্বাস এ ব্যাপারে নিমাই ও নিতাইয়ের হাত আছে। সে যাই হোক, ইহার পর হইতে ভিতরে ভিতরে যেন একটা নূতন গণ্ডগোল শুরু হইয়াছে। ননীবালা ভীত হইয়া উঠিয়াছেন। বর্তমান ডামাডোলের সময় প্রভাতের যদি কোনও দুর্ঘটনা হয়? যদি গুণ্ডা ছুরি মারে? নিমাই ও নিতাইয়ের অসাধ্য কাজ নাই। এখন ব্যোমকেশবাবু কোনও প্রকারে প্রভাতের জীবনরক্ষা করুন।

দুই

ব্যোমকেশ চোখ বুজিয়া ননীবালার অসংবদ্ধ বাক্যবহুল উপাখ্যান শুনিতেছিল, উপাখ্যান শেষ হইলে চোখ মেলিল। বিরক্তি চাপিয়া যথাসম্ভব শিষ্টভাবে বলিল, 'মিস্ রায়, এ ধরনের ব্যাপারে আমি কি করতে পারি? আপনার সন্দেহ যদি সত্যিও হয়, আমি তো আপনার ছেলের পেছনে সশস্ত্র প্রহরীর মত ঘুরে বেড়াতে পারি না। আমার মনে হয় এ অবস্থায় পুলিসের কাছে যাওয়াই ভালো।'

ননীবালা বলিলেন, 'পুলিসের কথা অনাদিবাবুকে বলেছিলুম, তিনি ভীষণ রেগে উঠলেন; বললেন—এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির দরকার নেই, তোমাদের যদি এতই প্রাণের ভয় হয়ে থাকে পাটনায় ফিরে যাও।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আর কি করা যেতে পারে আপনিই বলুন।'

ননীবালার স্বর কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল, 'আমি কি বলব, ব্যোমকেশবাবু! আপনি একটা উপায় করুন। প্রভাত ছাড়া আমার আর কেউ নেই—আমি অবলা স্ত্রী-লোক—' বলিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন।

ননীবালার চেহারা দেখিয়া যদিও কেহই তাঁহাকে অবলা বলিয়া সন্দেহ করিবে না, তবু তাঁহার হৃদয়টি যে অসহায়া রমণীর হৃদয় তাহা স্বীকার করিতে হয়। পালিত পুত্রকে তিনি গর্ভের সন্তানের মতই ভালবাসেন এবং তাহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অতিমাত্রায় ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। আশঙ্কা হয়তো অমূলক, কিন্তু তবু তাহা উপেক্ষা করা যায় না।

কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ চক্ষে ননীবালার অশ্রু-বিসর্জন নিরীক্ষণ করিয়া ব্যোম-

কেশ হঠাৎ রুক্ষস্বরে বলিল, 'ভাইপো দুটো থাকে কোথায়?'

ননীবালা আঁচল হইতে আশান্বিত চোখ বাহির করিলেন, 'তারা নেবুতলায় থাকে। আপনি কি- ?'

'ঠিকানা কি? কত নম্বর?'

'তা তো আমি জানি না, প্রভাত জানে। আপনি কি তাদের কাছে যাবেন, ব্যোমকেশবাবু? যদি আপনি ওদের খুব করে ধমকে দেন তাহলে ওরা ভয় পাবে -'

'আমি তাদের ধমকাতে গেলে তারাই হয়তো উল্টে আমাকে ধমকে দেবে। আমি তাদের একবার দেখব। দেখলে আন্দাজ করতে পারব তাদের মনে কিছু আছে কিনা। তাদের ঠিকানা প্রভাত জানে? প্রভাতের ঠিকানা, অর্থাৎ আপনাদের বাড়ির ঠিকানা কি?'

'বাড়ির নম্বর ১৭২।২, বৌবাজার স্ট্রীট। কিন্তু সেখানে—বাড়িতে আপনি না গেলেই ভাল হয়। অনাদিবাবু -'

'অনাদিবাবু পছন্দ না করতে পারেন। বেশ, তাহলে প্রভাতের দোকানের ঠিকানা বলুন।'

'প্রভাতের দোকান ঠিকানা জানি না কিন্তু নাম জীবন-প্রভাত। ওই যে গোলদীঘির কাছে, দোরের ওপর মস্ত সাইনবোর্ড টাঙানো আছে—'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্লান্ত শুষ্ক স্বরে বলিল, 'বুঝেছি। আপনি এখন আসুন তাহলে। যদি কিছু খবর থাকে জানতে পারবেন।'

ননীবালা বোধ করি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ একবার কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল, 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিণী!'

সেদিন সায়ংকালে ব্যোমকেশ একটি শারদীয়া পত্রিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, হঠাৎ পত্রিকা ফেলিয়া বলিল, 'চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।'

সম্মুখ সমর আরম্ভ হইবার পর হইতে আমরা সন্ধ্যার পর বাড়ির বাহির হওয়া বন্ধ করিয়াছিলাম, নেহাৎ দায়ে না ঠেকিলে বাহির হইতাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় বেড়াতে যাবে?'

সে বলিল, 'জীবন-প্রভাতের সন্ধানে।'

দুটি মোটা লাঠি যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলাম, হাতে লইয়া দু'জনে বাহির হইলাম। ননীবালার উপর ব্যোমকেশের মন যতই অপ্রসন্ন হোক তাঁহার কাহিনী ভিতরে ভিতরে তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে।

গোলদীঘি আমাদের বাসা হইতে বেশী দূর নয়, সেখানে পৌঁছিয়া ফুটপাথের উপর এক পাক দিতেই মস্ত সাইনবোর্ড চোখে পড়িল। দোকানটি কিন্তু সাইনবোর্ডের অনুপাতে ছোটই বলিতে হইবে, সাইনবোর্ডের তলায় প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। রাস্তার ধারে একটি ঘর, তাহার পিছনে একটি কুঠুরি। সদরে দ্বারের পাশে বেঁটে এবং বঙ্কিমচক্ষু গুর্খা দণ্ডায়মান।

দোকানে প্রবেশ করিলাম; গুর্খা একবার তির্যক নেত্রপাত করিল, কিছু বলিল না। দেখিলাম ঘরের দেয়ালগুলি কড়িকাঠ পর্যন্ত বই দিয়া ঠাসা; তাহাতে ঘরের

আয়তন আরও সংকীর্ণ হইয়াছে। তাকের উপর একই বই দশ বারোটা করিয়া পাশাপাশি সাজানো। বিভিন্ন প্রকাশকের বই, নিজের প্রকাশন বোধ হয় কিছু নাই। আমার বইও দুই তিনখানা রহিয়াছে।

কিন্তু দোকানদারকে ঘরে দেখিতে পাইলাম না, কাউন্টারে কেহ নাই।

কাউন্টারের পিছনে কুঠুরির দরজা ঈষৎ ফাঁক হইয়া আছে। ফাঁক দিয়া যতটুকু দেখা যায় দেখিলাম, তাহার মধ্যে একটি ছোট তক্তপোশ পাতা রহিয়াছে এবং তক্তপোশের উপর বসিয়া একটি যুবক হেঁটমুখে বইয়ের মলাট বাঁধিতেছে। মাথার উপর আবরণহীন বৈদ্যুতিক বাল্ব, চারিদিকে কাগজ পিজবোর্ড লেইয়ের মালসা কাগজ কাটিবার ভীষণদর্শন ছোরা প্রভৃতি ছড়ানো। তাহার মধ্যে বসিয়া যুবক তন্ময়চিত্তে মলাট বাঁধিতেছে।

ব্যোমকেশ একটু জোরে গলা খাঁকারি দিল। যুবক ঘাড় তুলিল, ছেঁড়া ন্যাকড়ায় আঙুলের লেই মুছিতে মুছিতে আসিয়া কাউন্টারের পিছনে দাঁড়াইল, কোনও প্রশ্ন করিল না, জিজ্ঞাসু নেত্রে আমাদের পানে চাহিয়া রহিল।

এইবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। বাংলা দেশের শত সহস্র সাধারণ যুবক হইতে তাহার চেহারায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। দেহের দৈর্ঘ্য আন্দাজ সাড়ে পাঁচ ফুট, গায়ের রঙ তামাটে ময়লা; মুখ ও দেহের কাঠামো একটু শীর্ণ। ঠোঁটের উপর গোঁফের রেখা এখনও পুষ্ট হয় নাই; দাঁতগুলি দেখিতে ভাল কিন্তু তাহাদের গঠন যেন একটু বন্য ধরনের, হয়তো আদিম মাতৃরক্তের নিদর্শন। চোখের দৃষ্টিতে সামান্য একটু অন্যমনস্কতার আভাস, কিন্তু ইহা মনের অভিব্যক্তি নয় চোখের একটা বিশেষ গঠনভঙ্গী। মাথার চুল ঈষৎ রুক্ষ ও ঝাঁকড়া, চুলের যত্ন নাই। পরিধানে গলার বোতাম-খোলা ঢিলা আস্তিনের পাঞ্জাবি। সব মিলিয়া যে চিত্রটি তৈয়ারি হইয়াছে তাহা নিতান্ত মামুলী এবং বিশেষত্বহীন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি জীবন-প্রভাতের মালিক প্রভাত কুমার রায়?'

যুবক বলিল, 'আমার নাম প্রভাত হালদার।'

'ও—হ্যাঁ—ঠিক কথা। আপনি যখন অনাদিবাবুর—' ব্যোমকেশ একটু ইতস্তত করিল।

'পুষ্যিপুত্তুর।' প্রভাত নির্লিপ্তকণ্ঠে ব্যোমকেশের অসমাপ্ত কথা পূরণ করিয়া দিল, তারপর ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিল, 'আপনি কে?'

'আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী।'

প্রভাত এতক্ষণে একটু সজীব হইয়া ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিল, তারপর আমার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

'আপনি তাহলে অজিতবাবু?'

'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া প্রভাত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সসম্ভ্রম আগ্রহে বলিল, 'নমস্কার। আমি আপনার কাছে একবার যাব।'

'আমার কাছে!'

'হ্যাঁ। আমার একটু দরকার আছে। আপনার ঠিকানা—?'

ঠিকানা দিয়া বলিলাম, 'আসবেন। কিন্তু আমার সঙ্গে কী দরকার থাকতে পারে ভেবে পাচ্ছি না।'

'সে কথা তখন বলব।—তা এখন কি চাই বলুন। আমার কাছে নতুন বই

ছাড়াও ভালো ভালো পুরনো বই আছে; পুরনো বই বাঁধিয়ে বিক্রি করি। সে সব বই অন্য দোকানে পাবেন না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপাতত আপনার কাছে নিমাই আর নিতাইয়ের ঠিকানা নিতে এসেছি।'

প্রভাত ব্যোমকেশের দিকে ফিরিল, কয়েকবার চক্ষু মিটিমিটি করিয়া যেন এই নূতন প্রসঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল; তারপর বলিল, 'নিমাই নিতাইয়ের ঠিকানা? তারা থাকে—' প্রভাত ঠিকানা দিল, মধু বড়াল লেনের একটা নম্বর। কিন্তু আমরা কেন নিতাই ও নিমাইয়ের ঠিকানা চাই সে বিষয়ে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করিল না।

'ধন্যবাদ।'

'আসুন। আমি কিন্তু একদিন যাব।'

'আসবেন।'

দোকান হইতে বাহিব হইলাম। এখনও বেশ বেলা আছে, শীতের সন্ধ্যা নারিকেল ছোবড়াব আগুনের মত ধীরে ধীরে জ্বলে, সহজে নেভে না। ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, নিমাই নিতাইকে দেখে যাই। কাছেই তো।' কিছুক্ষণ চলিবার পর বলিল, 'প্রভাত নিজেই বই বাঁধে, পুরনো বিদ্যে ছাড়তে পারেনি। ছেলেটা কেমন যেন মেদামারা। কিছুতেই চাড় নেই।'

বলিলাম, 'আমার সঙ্গে কী দরকাব কে জানে?'

ব্যোমকেশ চোখ বাঁকাইয়া আমার পানে চাহিল বলিল, 'তা এখনও বোঝোনি? তোমাব বই ছাপতে চায়। বোধ হয় প্রোথিতযশা কোন লেখক ওকে বই দেননি। এখন তুমি ভরসা।'

বলিলাম, 'প্রোথিতযশা নয়—প্রথিতযশা।'

সে মুখ টিপিয়া হাসিল, বুঝিলাম ভুলটা ইচ্ছাকৃত। বলিলাম, 'যাহোক তবু ওর বই ছাপার দিকে ঝোঁক আছে। লেখাপড়া না জানলেও সাহিত্যের কদর বোঝে। সেটা কম কথা নয়।'

ব্যোমকেশ খানিক চুপ করিয়া রহিল, তারপর যেন বিমনাভাবে বলিল, 'প্যাঁচা কয় প্যাঁচানী, খাসা তোর চ্যাঁচানি।'

আজকাল ব্যোমকেশ আচমকা এমন অসংলগ্ন কথা বলে যে তাহার কোনও মানে হয় না।

মধু বড়ালের গলিতে উপস্থিত হইলাম। গলিটি আজিকার নয়, বোধ করি জব চার্নকের সমসাময়িক। দু' পাশের বাড়িগুলি ইষ্টক-দন্তুর, পরস্পরের গায়ে ঠেস দিয়া কোনওক্রমে খাড়া আছে।

একটি বাড়ির দরজার মাথায় নম্বর দেখিয়া বুঝিলাম এই বাড়ি। জীর্ণ বটে কিন্তু বাঁধানো-দাঁত চুলে-কলপ-দেওয়া বৃদ্ধের মত বাহিরের ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টা আছে। সদর দরজা একটু ফাঁক হইয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া সরু গলির মত একটা স্থান দেখা গেল। লোকজন কেহ নাই।

আমাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া ব্যোমকেশ ভিতরে প্রবেশ করিল। সুড়ঙ্গের মত পথটি যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেখানে ডান দিকে একটি ঘরের

দরজা। আমরা দরজার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

আবছায়া একটি ঘর। তাহাতে অসংখ্য আসবাব ঠাসা; আলমারি টেবিল চেয়ার সোফা তক্তপোশ, নড়িবার ঠাঁই নাই। সমস্ত আসবাব পুরনো, একটিরও বয়স পঞ্চাশের কম নয়; দেখিলে মনে হয় ঘরটি পুরাতন আসবাবের গুদাম। তাহার মাঝখানে রঙ-চটা জাজিম-পাতা তক্তপোশের উপর বসিয়া দুইটি মানুষ বন্দুক পরিষ্কার করিতেছে। দু'নলা ছর্‌রা বন্দুক, কুঁদার গায়ে নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র আঁকা দেখিয়া মনে হয় বন্দুকটিও সাবেক আমলের। একজন তাহার যন্ত্রে তেল লাগাইতেছে, অন্য ব্যক্তি নলের ভিতর গজ চালাইয়া পরিষ্কার করিতেছে।

মানুষ দুটির চেহারা একরকম, বয়স একরকম, ভাবভঙ্গী একরকম; একজনের বর্ণনা করিলে দু'জনের বর্ণনা করা হইয়া যায়। বয়স ত্রিশের আশে পাশে, দোহারা ভারী গড়নের নাড়ুগোপাল চেহারা, মেটে মেটে রঙ, চোখের চারিপাশে চর্বির বেষ্টনী মুখে একটা মোঙ্গলীয় ভাব আনিয়া দিয়াছে, মাথার চুল ছোট এবং সমান করিয়া ছাঁটা। পরিধানে লুঙ্গি ও ফতুয়া। তফাত যে একেবারে নাই তা নয়, কিন্তু তাহা যৎসামান্য। ইহারাই যে নিমাই নিতাই তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না।

আমরা দ্বার পর্যন্ত পৌঁছিতেই তাহারা একসঙ্গে চোখ তুলিয়া চাহিল। দুই জোড়া ভয়ংকর চোখের দৃষ্টি আমাদের যেন ধাক্কা দিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিল। তারপর যুগপৎ প্রশ্ন হইল, 'কি চাই?'

কড়া সুর, শিষ্টতার লেশমাত্র তাহাতে নাই। আমি অসহায়ভাবে ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিলাম। ব্যোমকেশ সহজ সৌজন্যের সহিত বলিল, 'এটা কি অনাদি হালদারের বাড়ি?'

ক্ষণকালের জন্য দুই ভাই যেন বিমূঢ় হইয়া গেল। পরস্পরের প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'না।'

ব্যোমকেশ আবার প্রশ্ন করিল, 'অনাদিবাবু এখানে থাকেন না?'

কড়া উত্তর—'না।'

ব্যোমকেশ যেন লজ্জিত হইয়া বলিল, 'দেখছি ভুল ঠিকানা পেয়েছি। এ বাড়িতে কি অনাদিবাবুর কোনও আত্মীয় থাকেন? আপনারা কি—'

দুই ভাই আবার দৃষ্টি বিনিময় করিল। একজন বলিল, 'সে খবরে কী দরকার?'

'দরকার এই যে আপনারা যদি তাঁর আত্মীয় হন তাহলে তাঁর ঠিকানা দিতে পারবেন।'

উত্তর হইল 'এখানে কিছু হবে না। যেতে পারেন।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর একটু বাঁকা সুরে বলিল, 'আপনাদের বন্দুক আছে দেখছি। আশা করি লাইসেন্স আছে।'

আমরা ফিরিয়া চলিলাম। দুই ভ্রাতার নির্নিমেষ দৃষ্টি আমাদের অনুসরণ করিল।

বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িলাম—'কি অসভ্য লোক দুটো।'

বাসার দিকে ফিরিয়া চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'অসভ্য নয়, সাবধানী। এখানে এক জাতের লোক আছে তারা কলকাতার পুরানো বাসিন্দা; আগে বড় মানুষ ছিল এখন অবস্থা পড়ে গেছে; নিজেদের উপার্জনের ক্ষমতা নেই, পূর্ব-

পুরুষেরা যা রেখে গিয়েছিল তাই আঁকড়ে বেঁচে আছে। পচা বাড়ি ভাঙা আসবাব ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে সাবেক চাল বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। তাদের সাবধানতার অন্ত নেই; বাইরে লোকের সঙ্গে মেশে না, পাছে ছেঁড়া কাঁথাখানি কেউ ফাঁকি দিয়ে নেয়। দু চারটি সাবেক বন্ধু ও আত্মীয় ছাড়া কারুর সঙ্গে ওরা সম্পর্ক রাখে না; কেউ যদি যেচে আলাপ করতে যায় তাকে সন্দেহ করে, ভাবে বুঝি কোনও কু-মতলব আছে। তাই অপরিচিত লোকের প্রতি ওদের ব্যবহার স্বভাবতই রূঢ়। ওরা এক সঙ্গে ভীরু এবং কটুভাষী, লোভী এবং সংযমী। ওরা অদ্ভুত জীব।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ দুটি ভাইকে কেমন দেখলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ননীবালা দেবী মিথ্যা বলেননি। এক জোড়া বেড়াল; তবে শুকনো বেড়াল নয় ভিজে বেড়াল।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওদের দ্বারা প্রভাতের অনিষ্ট হতে পারে তোমার মনে হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঘরের বেড়াল বনে গেলে বন-বেড়াল হয়। স্বার্থে ঘা লাগলে ওরাও নিজ মূর্তি ধারণ করতে পারে।'

সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিতেছে, রাস্তার আলো জ্বলিয়াছে। আমরা দ্রুত বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম।

তিন

পরদিন সকালবেলা ব্যোমকেশ সংবাদপত্র পাঠ শেষ করিয়া কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া বেড়াইল, তারপর বলিল, 'নেই কাজ তো খৈ ভাজ। চল, অনাদি হালদারকে দর্শন করে আসা যাক। ভাইপোদের দর্শন পেলাম, আর খুড়োকে দর্শন করলাম না, সেটা ভাল দেখায় না।'

বলিলাম, 'ভাইপোদের কাছে তো খুড়োর ঠিকানা চেয়েছিলে। খুড়োর কাছে কি চাইবে?'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'একটা কিছু মাথায় এসেই যাবে।'

বেলা সাড়ে ন'টা নাগাদ বাহির হইলাম। বৌবাজারের নম্বরের ধারা কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে গিয়াছে জানা ছিল না, নম্বর দেখিতে দেখিতে শিয়ালদহের দিকে চলিয়াছি। কিছুদূর চলিবার পর ফুটপাথে বাঁটুল সর্দারের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'কি বাঁটুল এ পাড়াটাও কি তোমার এলাকা?'

বাঁটুল তৈলাক্ত মুখে কেবল হাসিল, তারপর পাল্টা প্রশ্ন করিল, 'আপনারা এ পাড়ায় এলেন যে কর্তা? কিছু দরকার আছে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। –১৭২।২ নম্বরটা কোন্ দিকে বলতে পার?'

বাঁটুলের চোখে চকিত সতর্কতা দেখা দিল। তারপর সে সামলাইয়া লইয়া বলিল, '১৭২।২ নম্বর? ওই যে নতুন বাড়িটা তৈরি হচ্ছে, ওর পাশেই।'

আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া দেখি বাঁটুল তখনও ফুটপাথে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে, আমাকে ফিরিতে দেখিয়া সে উল্টা মুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

আমি বলিলাম, 'ওহে ব্যোমকেশ, বাঁটুল '

সে বলিল, 'লক্ষ্য করেছি। বোধ হয় ওদের চেনে।'

আরও খানিকদূর অগ্রসর হইবার পর নূতন বাড়ির সম্মুখীন হইলাম। চারিদিকে ভারা বাঁধা, মিস্ত্রীরা গাঁথুনীর কাজ করিতেছে। একতলার ছাদ ঢালা হইয়া গিয়াছে, দোতলায় দেয়াল গাঁথা হইতেছে। সম্মুখে কন্ট্রাকটরের নাম লেখা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড। কন্ট্রাকটরের নাম গুরুদত্ত সিং। সম্ভবতঃ শিখ।

বাড়ি পার হইয়া একটি সঙ্কীর্ণ ইট-বাঁধানো গলি, গলির ওপারে ১৭২।২ নম্বর বাড়ি। দোতলা বাড়ি, সদর দরজার পাশে সরু এক ফালি দাওয়া; তাহার উপরে তাহারই অনুরূপ রেলিংঘেরা ব্যালকনি। নীচের দাওয়ায় বসিয়া এক জীর্ণকায় পলিতকেশ বৃদ্ধ থেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছেন। আমাদের দেখিয়া তিনি হুঁকা হইতে ওষ্ঠাধর বিমুক্ত না করিয়াই চোখ বাঁকাইয়া চাহিলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এটা কি অনাদি হালদারের বাসা?'

বৃদ্ধ হুঁকার ছিদ্র হইতে অধর বিচ্ছিন্ন করিয়া খিঁচাইয়া উঠিলেন, 'কে অনাদি হালদার আমি কি জানি! এ আমার বাসা—নীচের তলায় আমি থাকি।'

ব্যোমকেশ বিনীত স্বরে বলিল, 'আর ওপরতলায়?'

বৃদ্ধ পূর্ববৎ খিঁচাইয়া বলিলেন, 'আমি কি জানি! খুঁজে নাও গে। অনাদি হালদার! যত সব--' বৃদ্ধ আবার হুঁকায় অধরোষ্ঠ জুড়িয়া দিলেন।

বৃদ্ধ হঠাৎ এমন তেরিয়া হইয়া উঠিলেন কেন বোঝা গেল না। আমরা আর বাক্যব্যয় না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। লম্বাটে গোছের একটি ঘর, তাহার একপাশে একটি দরজা, বোধ হয় নীচের তলার প্রবেশদ্বার, অন্য দিকে এক প্রস্থ সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিব কিনা ইতস্তত করিতেছি, এমন সময় সিঁড়িতে দুম্ দুম্ শব্দ শুনিয়া চোখ তুলিয়া দেখি, ইয়া-লম্বা-চওড়া এক সর্দারজী বাঁকের মোড় ঘুরিয়া নামিয়া আসিতেছেন। অনাদি হালদারের বাসা সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কারণ ইনি নিশ্চয় কন্ট্রাকটর গুরুদত্ত সিং। তাঁহার পরিধানে মখ্মলী কর্ডুরয়ের পাৎলুন ও গ্যাবার্ডিনের কোট, দাড়ি বিনুনি করা, মাথায় কান-চাপা পাগ্ড়ি। দুই বাহু মুগুরের মত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি নামিতেছেন, চক্ষু দুটিও ঘুরিতেছে। আরও কাছে আসিলে তাঁহার দাড়ি-গোঁফে অবরুদ্ধ বাক্যগুলিও আমাদের কর্ণগোচর হইল। বাক্যগুলি বাঙলা নয়, কিন্তু তাহার ভাবার্থ বুঝিতে কষ্ট হইল না—'বাংগালী আমার টাকা দেবে না! দেখে নেব কত বড় অনাদি হালদার, গলা টিপে টাকা আদায় করব। আমিও পাঞ্জাবী, আমার সংগে লারে-লাপ্পা চলবে না—' সর্দারজী সবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ব্যোমকেশ আমার পানে চাহিয়া একটু হাসিল, নিম্নস্বরে বলিল, 'অনাদিবাবু দেখছি জনপ্রিয় লোক নয়। এস, দেখা যাক।'

সিঁড়ির ঊর্ধ্বপ্রান্তে একটি দরজা, ভিতর দিকে অর্গলবদ্ধ। ব্যোমকেশ কড়া নাড়িল।

অল্পকাল পরে দরজা একটু ফাঁক হইল, ফাঁকের ভিতর দিয়া একটি মুখ বাহির হইয়া আসিল। ভেট্কি মাছের মত মুখ, রাঙা রাঙা চোখ, চোখের নীচের পাতা শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। শিথিল অধরের ফাঁকে নীচের পাটির দাঁতগুলি দেখা যাইতেছে।

রাত্রিকালে এরূপ অবস্থায় এই মুখখানি দেখিলে কি করিতাম বলা যায় না,

কিন্তু এখন একবার চমকিয়া স্থির হইলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'অনাদিবাবু— ?'

মুখটিতে হাসি ফুটিল, চোয়ালের অসংখ্য দাঁত আরও প্রকটিত হইল। ভাঙা ভাঙা গলায় ভেট্‌কি মাছ বলিল, 'না, আমি অনাদিবাবু নই, আমি কেষ্টবাবু। আপনারাও পাওনাদার নাকি?'

'না, অনাদিবাবুর সঙ্গে আমাদের একটু কাজ আছে।'

এই সময় ভেট্‌কি মাছের পশ্চাতে আর একটি দ্রুত কণ্ঠস্বর শোনা গেল,— 'কেষ্টবাবু, সরুন সরুন—'

কেষ্টবাবুর মুণ্ড অপসৃত হইল, তৎপরিবর্তে দ্বারের সম্মুখে একটি যুবককে দেখা গেল। ডিগ্‌ডিগে রোগা চেহারা, লম্বা ছুঁচালো চিবুক, মাথার কুড়া কোঁক্‌ড়া চুলগুলি মাথার দুই পাশে যেন পাখা মেলিয়া আছে। মুখে একটা চট্‌পটে ভাব।

'কি চান আপনারা?'

'অনাদিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কিছু দরকার আছে কি? অনাদিবাবু বিনা দরকারে কারুর সঙ্গে দেখা করেন না।'

'দরকার আছে বৈ কি। পাশে যে বাড়িটা তৈরি হচ্ছে সেটা বোধ হয় তাঁরই। ওই বাড়ি সম্বন্ধে কিছু জানবার আছে। আপনি— ?'

'আমি অনাদিবাবুর সেক্রেটারী। আপনারা একটু বসুন, আমি খবর দিচ্ছি। এই যে, ভেতরে বসুন।'

আমরা সিঁড়ি হইতে উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। যুবক চলিয়া গেল।

ঘরটি নিরাভরণ, কেবল একটি কেঠো বেঞ্চি আছে। আমরা বেঞ্চিতে বসিয়া চারিদিকে চাহিলাম। সিঁড়ির দরজা ছাড়া ঘরে আরও গুটিতিনেক দরজা আছে, একটি দিয়া সদরের ব্যালকনি দেখা যাইতেছে, অন্য দুইটি ভিতর দিকে গিয়াছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর দেখিলাম ভিতর দিকের একটি দরজা একটু ফাঁক করিয়া একটি স্ত্রীলোক উঁকি মারিল। চিনিতে কষ্ট হইল না—ননীবালা দেবী। তিনি বোধ হয় রান্না করিতেছিলেন, বাহিরে লোক আসার সাড়া পাইয়া খুন্তি হাতে তদারক করিতে আসিয়াছেন। আমাদের দেখিয়া তিনি সভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন। ব্যোমকেশ নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া তাঁহাকে অভয় দিল। ননীবালা ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন।

অন্য দরজা দিয়া যুবক বাহির হইয়া আসিল।

'আসুন।'

যুবকের অনুগামী হইয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একটি ঘরের দরজা ঠেলিয়া যুবক বলিল, 'এই ঘরে অনাদিবাবু আছেন, আপনারা ভিতরে যান।'

ঘরে ঢুকিয়া প্রথমটা কিছু ঠাহর হইল না। ঘরে আলো কম, আসবাব কিছু নাই, কেবল এক কোণে গদির উপর ফরাস পাতা। ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া একটি লোক আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে। আধা অন্ধকারে মনে হইল একটা ময়াল সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া অনিমেষ চক্ষে শিকারকে লক্ষ্য করিতেছে।

চক্ষু অভ্যস্ত হইলে বুঝিলাম, ইনিই অনাদি হালদার বটে; ভাইপোদের সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ; বেঁটে মজবুত চেহারা, চোখে মেদমণ্ডিত মোঙ্গলীয় বক্রতা। গায়ে বেগুনি রঙের বালাপোশ জড়ানো।

আমরা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনাদিবাবু স্তিমিত নেত্রে চাহিয়া

রহিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর ব্যোমকেশ নিজেই কথা কহিল 'আমরা একটু কাজে এসেছি। ইনি অজিত বুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ববঙ্গ থেকে সম্প্রতি এসেছেন, কলকাতায় বাড়ি কিনে বাস করতে চান।'

অনাদিবাবু এবার কথা বলিলেন। আমাদের বসিতে বলিলেন না, স্বভাব-রুক্ষ স্বরে ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কে?'

ব্যোমকেশের চক্ষু প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু সে সহজভাবে বলিল, 'আমি এঁর এজেন্ট। জানতে পারলাম আপনি পাশেই বাড়ি তৈরি করাচ্ছেন, ভাবলাম হয়তো বিক্রি করতে পারেন। তাই

অনাদিবাবু বলিলেন, 'আমি নিজে বাস করব বলে বাড়ি তৈরি করাচ্ছি, বিক্রি করবার জন্যে নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা তো বটেই। তবে আপনি ব্যবসাদার লোক, ভেবেছিলাম লাভ পেলে ছেড়ে দিতে পারেন।'

'আমি দালালের মারফতে ব্যবসা করি না।'

'বেশ তো, আপনি অজিতবাবুর সঙ্গে কথা বলুন, আমি সরে যাচ্ছি।'

'না, কারুর সঙ্গে বাড়ির আলোচনা করতে চাই না। আমি বাড়ি বিক্রি করব না। তোমরা যেতে পারো।'

অতঃপর আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। এই অত্যন্ত অশিষ্ট লোকটার সঙ্গ আমার অসহ্য বোধ হইতেছিল, কিন্তু ব্যোমকেশ নির্বিকার মুখে বলিল, 'কিছু মনে করবেন না বাড়িটা তৈরি করাতে আপনার কত খরচ হবে বলতে বাধা আছে কি?'

অনাদিবাবুর রুক্ষ স্বর আরও কর্কশ হইয়া উঠিল, 'বাধা আছে।– ন্যাপা! ন্যাপা! বিদেয় কর, এদের বিদেয় কর–'

সেক্রেটারী যুবকের নাম বোধ করি ন্যাপা, সে দ্বারের বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিল, মুণ্ড বাড়াইয়া ত্বরান্বিত স্বরে বলিল, 'আসুন, চলে আসুন '

মানসিক গলা-ধাক্কা খাইয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। যুবক সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত আমাদের আগাইয়া দিল, একটু লজ্জিত হ্রস্বকণ্ঠে বলিল, কিছু মনে করবেন না, কর্তার আজ মেজাজ ভাল নেই।'

ব্যোমকেশ তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'কিছু না। -এসো অজিত।'

রাস্তায় বাহির হইয়া আসিলাম। ব্যোমকেশ মুখে যতই তাচ্ছিল্য দেখাক, ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায়। কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর সে আমার দিকে চাহিয়া ক্লিষ্ট হাসিল, বলিল, 'দু'রকম ছোটলোক আছে–অসভ্য ছোটলোক আর বজ্জাত ছোটলোক। যারা বজ্জাত ছোটলোক তারা শুধু পরের অনিষ্ট করে; আর অসভ্য ছোটলোক নিজের অনিষ্ট করে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'অনাদি হালদার কোন্ শ্রেণীর ছোটলোক?'

'অসভ্য এবং বজ্জাত দুইই--।'

সেদিন দুপুরবেলা আহারাদির পর একটু দিবানিদ্রা দিব কিনা ভাবিতেছি, দ্বারের কড়া নড়িয়া উঠিল। দ্বার খুলিয়া দেখি ননীবালা দেবী।

ননীবালা শঙ্কিত মুখ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। ব্যোমকেশ ইজিচেয়ারে ঝিমাইতেছিল, উঠিয়া বসিল। ননীবালা বলিলেন, 'আজ আপনাদের ও বাড়িতে দেখে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছল। অনাদিবাবু যদি জানতে পারেন যে আমি—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বসুন। অনাদিবাবুর জানবার কোনও সম্ভাবনা নেই। আমরা গিয়েছিলাম, তাঁর নতুন বাড়ির খরিদ্দার সেজে। সে যাক, আপনি এখন একটা কথা বলুন তো, অনাদি হালদার কি রকম লোক? সোজা স্পষ্ট কথা বলবেন, লুকো-ছাপার দরকার নেই।'

ননীবালা কিছুক্ষণ ড্যাবডেবে চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মত শব্দের স্রোত তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল,—'কি বলব আপনাকে, ব্যোমকেশবাবু, চামার! চামার! চোখের চামড়া নেই, মুখের রাশ নেই। একটা মিষ্টি কথা ওর মুখ দিয়ে বেরোয় না, একটা পয়সা ওর ট্যাঁক থেকে বেরোয় না। টাকার আণ্ডিল, কিন্তু আঙুল দিয়ে জল গলে না। এদিকে উন থেকে চুন খসলে আর রক্ষে নেই, দাঁতে ফেলে চিবোবে। আগে একটা বামুন ছিল, আমি আসবার পর সেটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে, এই দেড় বছর হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে আমার গতরে আর কিছু নেই। কি কুক্ষণে যে প্রভাতকে ওর পুষ্যি-পুত্তুর হতে দিয়েছিলুম! যদি উপায় থাকত হতচ্ছাড়া মিনসের মুখে নুড়ো জেবলে দিয়ে পাটনায় ফিরে যেতুম।' এই পর্যন্ত বলিয়া ননীবালা রণক্লান্ত যোদ্ধার মত হাঁপাইতে লাগিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'কতকটা এইরকমই আন্দাজ করেছিলাম। প্রভাতের সঙ্গে ওর ব্যবহার কেমন?'

ননীবালা একটু থমকিয়া বলিলেন, 'প্রভাতকে বেশী ঘাঁটায় না। তাছাড়া প্রভাত বাড়িতে থাকেই বা কতক্ষণ। সকাল আটটায় দোকানে বেরিয়ে যায়, দুপুরবেলা আধঘণ্টার জন্য একবারটি খেতে আসে, তারপর বাড়ি ফেরে একেবারে রাত নটায়। বুড়োর সঙ্গে প্রায় দেখাই হয় না।'

'বুড়ো দোকানের হিসেবপত্র দেখতে চায় না?'

'না, হিসেব চাইবার কি মুখ আছে, দোকান যে প্রভাতের নামে। বুড়ো প্রথম প্রথম খুব ভালমানুষী দেখিয়েছিল। প্রভাতকে জিজ্ঞেস করল—কী কাজ করবে? প্রভাত বলল—বইয়ের দোকান করব। বুড়ো অমনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দোকান করে দিলে।'

'হুঁ। ন্যাপা কে? বুড়োর সেক্রেটারী?'

ননীবালা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, 'সেক্রেটারী না আরও কিছু—বাজার সরকার। ফড়্‌ফড়্‌ করে ইংরিজি বলতে পারে তাই বুড়ো ওকে রেখেছে। বুড়ো নিজে একবর্ণ ইংরিজি জানে না, ব্যবসার কথাবার্তা ওকে দিয়ে করায়, চিঠিপত্র লেখায়। তাছাড়া বাজার করায়, হাত-পা টেপায়। সব করে ন্যাপা।'

'ভারি কাজের লোক দেখছি।'

'ভারি ধূর্ত লোক, নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। দু'পাতা ইংরিজি পড়েছে কিনা।'

বুঝিলাম, প্রভাত ইংরিজি জানে না, ন্যাপা ইংরিজি জানে তাই ননীবালা তাহার প্রতি প্রসন্ন নয়।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আর কেষ্টবাবু? তিনি কে?'

'তিনি কে তা কেউ জানে না। বুড়োর আত্মীয় কুটুম্ব নয়, জাত আলাদা। আমরা আসবার আগে থাকতে আছে। মাতাল, মদ খায়।'

'তাই নাকি? নিজের পয়সাকড়ি আছে বুঝি?'

'কিচ্ছু নেই। বুড়ো জুতো জামা কিনে দেয় তবে পরে।'

'তবে মদ পায় কোথা থেকে?'

'মদের পয়সাও বুড়ো দেয়।'

'আশ্চর্য! এদিকে বলছেন আঙুল দিয়ে জল গলে না—'

'কি জানি ব্যোমকেশবাবু, আমি কিছু বুঝতে পারি না। মনে হয় বুড়ো ওকে ভয় করে। কেষ্টবাবু মাঝে মাঝে মদ খেয়ে মেজাজ দেখায়, বুড়ো কিন্তু কিছু বলে না।'

'বটে।' ব্যোমকেশ চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

ননীবালা তখন সাগ্রহে বলিলেন, 'কিন্তু ওদিকের কি হল ব্যোমকেশবাবু? নিমাই নিতাইকে দেখতে গিছলেন নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গিয়েছিলাম। ওরা লোক ভাল নয়। খুড়ো আর ভাইপোদের এ বলে আমায় দ্যাখ ও বলে আমায় দ্যাখ। উচ্ছের ঝাড়, ঝাড়ে মূলে তেতো।'

ননীবালা ভীতকণ্ঠে বলিলেন, 'তবে কি হবে? ওরা যদি প্রভাতকে--।'

ব্যোমকেশ ধীরস্বরে বলিল, 'ওরা প্রভাতকে ভালবাসে না তার অনিষ্ট চিন্তাও করতে পারে। কিন্তু আজকালকার এই অরাজকতার দিনেও একটা মানুষকে খুন করা সহজ কথা নয়, নেহাৎ মাথায় খুন না চাপলে কেউ খুন করে না। নিমাই আর নিতাইকে দেখে মনে হয় ওরা সাবধানী লোক, খুন করে ফাঁসির দড়ি গলায় জড়াবে এমন লোক তারা নয়। আর একটা কথা ভেবে দেখুন। অনাদি হালদার যদি পুষ্যিপুত্তুর নেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে তাহলে একটা পুষ্যিপুত্তুরকে মেরে লাভ কি? একটা গেলে অনাদি হালদার আর একটা পুষ্যিপুত্তুর নিতে পারে, নিজের সম্পত্তি উইল করে বিলিয়ে দিতে পারে। এ অবস্থায় খুন-খারাপি করতে যাওয়া তো ঘোর বোকামি। বরং—'

ননীবালা বিস্ফারিত চক্ষে প্রশ্ন করিলেন—'বরং কী?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বরং অনাদিবাবুর ভালমন্দ কিছু হলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়।'

ননীবালা কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন, মনে হইল এই সম্ভাবনার কথা তিনি পূর্বে চিন্তা করেন নাই। তারপর তিনি উৎসুক মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'তাহলে, প্রভাতের কোনও ভয় নেই?'

'আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, এ ধরনের বোকামী নিমাই নিতাই করবে না। তবু সাবধানের মার নেই। আমি একটা প্ল্যান ঠিক করেছি, এমনভাবে ওদের কড়কে দেব যে ইচ্ছে থাকলেও কিছু করতে সাহস করবে না।'

'কি—কি প্ল্যান ঠিক করেছেন ব্যোমকেশবাবু?'

'সে আপনার শুনে কি হবে। আপনি আজ বাড়ি যান। যদি বিশেষ খবর কিছু থাকে আমাকে জানাবেন।'

ননীবালা তখন গদ্গদ মুখে ব্যোমকেশকে প্রচুর ধন্যবাদ জানাইয়া প্রস্থান করিলেন। অনাদি হালদারের দ্বিপ্রহরে দিবানিদ্রা দিবার অভ্যাস আছে, সেই ফাঁকে

ননীবালা বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছেন; বুড়া যদি জাগিয়া উঠিয়া দেখে তিনি বহির্গমন করিয়াছিলেন তাহা হইলে কৈফিয়তের ঠেলায় ননীবালাকে অন্ধকার দেখিতে হইবে।

অতঃপর আমি ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী প্ল্যান ঠিক করেছ? আমাকে তো কিছু বলনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বাড়িতে পোস্টকার্ড আছে?'

'আছে।'

'বেশ, পোস্টকার্ড নাও, একখানা চিঠি লেখ। শ্রীহরিঃ শরণং লিখতে হবে না, সম্বোধনেরও দরকার নেই। লেখ—'আমি তোমাদের উপর নজর রাখিয়াছি।'—ব্যাস্, আর কিছু না। এবার নিমাই কিংবা নিতাই হালদারের ঠিকানা লিখে চিঠিখানা পাঠিয়ে দাও।'

চার

কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে।

ননীবালা আর আসেন নাই। প্রভাত ঘটিত ব্যাপার অঙ্কুরেই শুকাইয়া গিয়াছে মনে হয়। কেবল বাঁটুল সর্দারের সঙ্গে একবার দেখা হইয়াছিল। বাঁটুল আসিয়াছিল একটি রিভলবার আমাদের গছাইবার জন্য। উচিত মূল্যে পাইলে হয়তো কিনিতাম, কিন্তু ছয়শত টাকা দিয়া ফ্যাসাদ কিনিবার শখ আমাদের ছিল না। ব্যোমকেশ বাঁটুলকে সিগারেট দিয়া অন্য কথা পাড়িয়াছিল।

'১৭২।২ বৌবাজার স্ট্রীটের কাউকে চেনো নাকি বাঁটুল?'

'আজ্ঞে চিনি।'

'অনাদি হালদারকে জানো?'

'আজ্ঞে।'

'সেও কি তোমার -মানে--খাতক নাকি?'

বাঁটুল একটু হাসিয়াছিল, অর্ধদগ্ধ সিগারেটটি নিভাইয়া সযত্নে পকেটে রাখিয়া একটু গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিল, 'অনাদি হালদার আগে চাঁদা দিত, কয়েক মাস থেকে বন্ধ করে দিয়েছে; এখন যদি ওর ভাল-মন্দ কিছু হয় আমাদের দায়-দোষ নেই।—কিন্তু আপনারা ওকে চিনলেন কি করে? আগে থাকতে জানা শোনা আছে নাকি?'

'না, সম্প্রতি পরিচয় হয়েছে।'

বাঁটুল অতঃপর আর কৌতূহল প্রকাশ করে নাই, কেবল অপ্রাসঙ্গিকভাবে একটি প্রবাদ-বাক্য আমাদের শুনাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিয়াছিল—'জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করলে ভাল হয় না কর্তা।'

কালীপূজার দিন আসিয়া পড়িল। সকাল হইতেই চারিদিকে দুম্‌দাম্ শব্দ শোনা যাইতেছে। সেগুলি উৎসবের বাদ্যোদ্যম কিংবা সম্মুখ সমরের রণদামামা তাহা নিঃসংশয়ে ঠাহর করিতে না পারিয়া আমরা বাড়িতেই রহিলাম।

সন্ধ্যার পর দীপমালায় নগর শোভিত হইল। রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে বাজি পোড়ানো আরম্ভ হইল; তুবড়ি আতস বাজি ফানুস রঙমশাল, সঙ্গে সঙ্গে চীনে পট্‌কা দোদমা। পথে পথে অসংখ্য মানুষ নগর পরিদর্শনে বাহির হইয়াছে; কেহ পদব্রজে, কেহ গাড়ি মোটরে। মাথার উপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খাঁড়া ঝুলিতেছে, কিন্তু কে তাহা গ্রাহ্য করে! হেসে নাও দু'দিন বইতো নয়।

আমরা বাড়ির বাহির হইলাম না, জানালা দিয়া উৎসব শোভা নিরীক্ষণ করিলাম। এজন্য যদি কেহ আমাদের কাপুরুষ বলিয়া বিদ্রূপ করেন আপত্তি করিব না, কিন্তু বলির ছাগশিশুর ন্যায় গলায় ফুলের মালা পরিয়া নির্বোধ আনন্দে নৃত্য করিতে আমাদের ঘোর আপত্তি।

রাত্রি গভীর হইতে লাগিল। মধ্য-রাত্রে কালীপূজার উৎসব পুরাদমে চলিয়াছে। আমরা যদিও শক্তির উপাসক নই, বুদ্ধির উপাসক, তবু মা কালীকে অসন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। রাত্রে পলান্ন সহযোগে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া শয়ন করিলাম।

রাত্রি শেষ হইবার পূর্বে যে প্রভাত ঘটিত ব্যাপার সাপের মত আবার মাথা তুলিবে তাহা তখনও জানিতাম না।

একেবারে ঘুম ভাঙিল রাত্রি সাড়ে তিনটার সময়। চারিদিক নিস্তব্ধ, জানালা দিয়া বেশ ঠাণ্ডা আসিতেছে। আমি পায়ের তলা হইতে চাদরটা গায়ে জুত করিয়া জড়াইয়া আর এক ঘুম দিবার ব্যবস্থা করিতেছি এমন সময় উৎকট শব্দে ঘুমের নেশা ছুটিয়া গেল।

কে দুদ্দাড় শব্দে দরজা ঠেঙাইতেছে। শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ভাবিলাম, সম্মুখ সমরের সীমানা আমাদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, আজ আর রক্ষা নাই। মোটা লাঠিটা ঘরের কোণে দণ্ডায়মান ছিল, সেটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইলাম। যদি মরিতেই হয় লড়িয়া মরিব।

ওদিকে ব্যোমকেশও লাঠি হাতে নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। সদর দরজা মজবুত বটে কিন্তু আর বেশীক্ষণ নয়, এখনই ভাঙিয়া পড়িবে। আমরা দরজার দু'পাশে লাঠি বাগাইয়া দাঁড়াইলাম।

দুদ্দাড় শব্দ ক্ষণেকের জন্য একবার থামিল, সেই অবকাশে একটি ব্যগ্র কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—'ও ব্যোমকেশবাবু—একবারটি দরজা খুলুন—'

আমরা বিস্ফারিত চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিলাম। পুরুষের গলা, কেমন যেন চেনা-চেনা। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'কে তুমি? নাম বল।'

উত্তর হইল—'আমি—আমি কেষ্ট দাস—শীগ্‌গির দরজা খুলুন—'

কেষ্ট দাস! সহসা স্মরণ হইল না, তারপর মনে পড়িয়া গেল। অনাদি হালদারের বাড়ির কেষ্টবাবু!

ব্যোমকেশ বলিল, 'এত রাত্রে কী চান? সঙ্গে কে আছে?'

'সঙ্গে কেউ নেই, আমি একা—।'

মাত্র একটা লোক এত শব্দ করিতেছিল! সন্দেহ দূর হইল না। ব্যোমকেশ আবার প্রশ্ন করিল, 'এত রাত্রে কী দরকার?'

'অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে। দয়া করে দরজা খুলুন। আমার বড় বিপদ।'

হতভম্ব হইয়া আবার দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। অনাদি হালদার—!

ব্যোমকেশ আর দ্বিধা করিল না, দ্বার খুলিয়া দিল। কেষ্টবাবু টলিতে টলিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। কেষ্টবাবুর চেহারা আলুথালু, ভেট্‌কি মাছের মত মুখে ব্যাকুলতা। তদুপরি মুখ দিয়া তীব্র মদের গন্ধ বাহির হইতেছে। তিনি থপ্‌ করিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, 'অনাদিকে কেউ গুলি করে মেরেছে। সত্যি বলছি আমি কিছু জানি না। আমি বাড়িতে ছিলাম না—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'ও কথা পরে হবে। আগে আমার একটা কথার জবাব দিন। আমাকে আপনি চিনলেন কি করে? ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে?'

কেষ্টবাবু কিছুক্ষণ জবুথবু হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার ভাবভঙ্গীতে একটু ভিজা-বিড়াল ভাব প্রকাশ পাইল। অবশেষে তিনি জড়িত স্বরে বলিলেন, 'সেদিন আপনারা আমাদের বাসায় গিছলেন, আপনাদের দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। তাই আপনারা যখন ফিরে চললেন তখন আমি আপনাদের পিছু নিয়েছিলাম। এখানে এসে নীচের হোটেলে আপনার পরিচয় পেলাম।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'হুঁ, আপনি দেখছি ভারি হুঁশিয়ার লোক। অনাদি হালদারের কাঁধে চেপে থাকেন কেন?'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'আমি অনাদির ছেলেবেলার বন্ধু—দুরবস্থায় পড়েছি—তাই—'

'তাই অনাদি হালদার আপনাকে খেতে পরতে দিচ্ছিল, এমন কি মদের পয়সা পর্যন্ত যোগাচ্ছিল। খুব গাঢ় বন্ধুত্ব বলতে হবে।—যাক, এবার আজকের ঘটনা বলুন। গোড়া থেকে বলুন।'

কেষ্টবাবু কিছুক্ষণ অপলক চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ঈষৎ করুণ স্বরে বলিলেন, 'আপনি দেখছি সবই জানেন। কিন্তু সত্যি বলছি আমি অনাদিকে খুন করিনি। আজ বিকেলবেলা—মানে কাল বিকেলবেলা অনাদির সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছিল। আমি বলেছিলুম, আজ কালীপুজো, আজ আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে। এই নিয়ে তুমুল ঝগড়া। অনাদি আমাকে দশটা টাকা দিয়ে বলেছিল—এই নিয়ে বেরিয়ে যাও, আর আমার বাড়িতে মাথা গলিও না।'

'কে কে আপনাদের ঝগড়া শুনেছিল?'

'বাড়িতে ননীবালা আর ন্যাপা ছিল। নীচের তলার ষষ্ঠীবাবুও ঝগড়া শুনেছিল। বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছিল, আমি নেমে আসতে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল—মাথার ওপর দিনরাত শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ চলেছে—কবে যে পাপ বিদেয় হবে জানি না।'

'তারপর বলুন।'

'তারপর রাত্রি আন্দাজ একটার সময় আমি ফিরে এলাম। এসে দেখি—'

'রাত্রি একটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?'

'আপনার কাছে লুকোব না, শুঁড়ির দোকানে বসে মদ খেয়েছিলাম—জুয়ার আড্ডায় জুয়া খেলে তিরিশ টাকা জিতেছিলাম--তারপর একটু এদিক ওদিক—'

'হুঁ। বাসায় ফিরে কী দেখলেন?'

'বাসায় ফিরে প্রথমেই দেখি নীচের তলায় ষষ্ঠীবাবু হুঁকো হাতে সিঁড়ির ঘরে পায়চারি করছে। আমাকে দেখে বলে উঠল—ধম্মের কল বাতাসে নড়ে। কিছু বুঝতে পারলাম না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখি—সিঁড়ির দরজা ভাঙা!

'ঘরে ঢুকে দেখলাম বেঞ্চির ওপর প্রভাত আর ন্যাপা বসে আছে, ননীবালা দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝেয় বসেছে। আমাকে দেখে তিনজনে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল, যেন আগে কখনও দেখেনি। আমি তো অবাক। বললাম—একি, তোমরা বসে আছ কেন? কারুর মুখে কথা নেই। তারপর ন্যাপা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল—কেষ্টবাবু, এ আপনার কাজ। আপনি কর্তাকে খুন করেছেন।

'খুন! আমার তো মাথা ঘুরে গেল। জিজ্ঞেস করলাম—কে? কোথায়? কেন? কেউ উত্তর দিল না। শেষে প্রভাত বলল—ঐ ব্যালকনিতে গিয়ে দেখুন।

'রাস্তার ধারের ব্যালকনিতে উঁকি মারলাম। অনাদি পড়ে আছে, রক্তারক্তি কাণ্ড। বুকে বন্দুকের গুলি লেগেছে। দেখে আমার ভির্মি যাওয়ার মত অবস্থা, মেঝেয় বসে পড়লাম। মাথায় মধ্যে সব গুলিয়ে যেতে লাগল।

'তারপর কতক্ষণ কেটে গেল জানি না। ওরা তিনজনে চাপা গলায় কথা কইছে, কি করা উচিত তাই নিয়ে তর্ক করছে। ওদের কথা থেকে বুঝতে পারলাম, সন্ধ্যের পর ওরা কেউ বাড়ি ছিল না, একা অনাদি বাড়িতে ছিল। রাত্রি বারোটা নাগাদ ওরা ফিরে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সাড়া পেল না। অনেকক্ষণ ধাক্কা-ধাক্কির পর ওদের ভয় হল, হয়তো কিছু ঘটেছে। ওরা তখন দরজা ভেঙে বাসায় ঢুকে দেখল ব্যালকনিতে অনাদি মরে পড়ে আছে।

'আমার মাথাটা একটু পরিষ্কার হলে আমি বললাম—তোমরা আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন—আমি অনাদিকে খুন করব কেন? অনাদি আমার অন্নদাতা বন্ধু—। ন্যাপা লাফিয়ে উঠে বলল—ন্যাকামি করবেন না। আমি যাচ্ছি পুলিসে খবর দিতে। এই বলে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

'আমার ভয় হল। পুলিস এসে আমাকেই ধরবে। ওরা সাক্ষী দেবে আমার সঙ্গে অনাদির ঝগড়া হয়েছিল। আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না, উঠে পালিয়ে এলাম। কোথায় যাব কিছুই জানি না; রাস্তায় নেমে আপনার কথা মনে পড়ল।'—

কিছুক্ষণ কথা হইল না, কেষ্টবাবু যেন ঝিমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম ঝিমানোর মধ্যে তাঁহার অর্ধনিমীলিত চক্ষু দুটি বার বার ব্যোমকেশের মুখের উপর যাতায়াত করিতেছে।

ব্যোমকেশ হঠাৎ বলিল, 'আপনি তাহলে অনাদি হালদারকে খুন করেননি।'

কেষ্টবাবু চমকিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন, 'আঁ্যা! না ব্যোমকেশবাবু, আমি খুন করিনি। আপনিই ভেবে দেখুন, অনাদিকে খুন করে আমার লাভ কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অনাদি হালদার আপনাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'সে ওর মুখের কথা, রাগের মুখে বলেছিল। আমাকে সত্যি সত্যি তাড়িয়ে দেবার সাহস অনাদির ছিল না।'

'সাহস ছিল না! অর্থাৎ আপনি অনাদি হালদারের জীবনের কোনও গুরুতর গুপ্তকথা জানেন।'

কেষ্টবাবু কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, 'অনাদির সব গুপ্তকথা আমি জানি, ওকে আমি ফাঁসিকাঠে লটকাতে পারতাম। কিন্তু ও কথা এখন থাক, যদি দরকার হয় পরে বলব, ব্যোমকেশবাবু। এখন আমাকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচাবার একটা ব্যবস্থা করুন।'
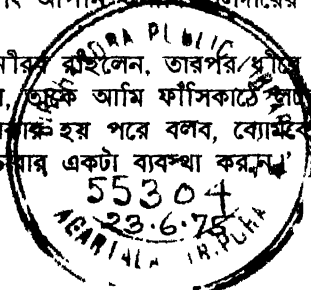
ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'আপনাকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে কে সত্যি খুন করেছে সেটা জানা দরকার। ঘটনাস্থলে যেতে হবে।'

কেষ্টবাবু শঙ্কিত হইলেন, স্খলিতস্বরে বলিলেন, 'আমাকেও যেতে হবে?'

'তা যেতে হবে বৈ কি। আপনি না গেলে আমি কোন্ সূত্রে যাব?'

'কিন্তু, সেখানে পুলিস বোধহয় এতক্ষণ এসে পড়েছে—'

ব্যোমকেশ কড়া সুরে বলিল, 'আপনি যদি খুন না করে থাকেন আপনার ভয়টা কিসের?—অজিত, তৈরি হয়ে নাও, আমরা তিনজনেই যাব।'

কেষ্টবাবু বিহ্বলভাবে বসিয়া রহিলেন, আমরা বেশবাস পরিধান করিয়া তৈয়ার হইলাম। বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলে কেষ্টবাবু চেয়ার হইতে কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার বাড়িতে একটু—হে হে, মদ পাওয়া যাবে? একটু হুইস্কি কিম্বা ব্র্যান্ডি, হাতে পায়ে যেন বল পাচ্ছি না।'

ব্যোমকেশ বিরক্ত হইয়া বলিল, 'আমি বাড়িতে মদ রাখি না। আসুন।'

পাঁচ

অনাদি হালদারের বাসায় যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি সাড়ে চারটা। কলিকাতা শহর দুপুর রাত্রি পর্যন্ত মাতামাতি করিয়া শেষ রাত্রির গভীর ঘুম ঘুমাইতেছে।

নীচের তলায় সদর দরজা খোলা। সিঁড়ির ঘরে কেহ নাই। ষষ্ঠীবাবু বোধ করি ক্লান্ত হইয়া শুইতে গিয়াছেন। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, দরজার হুড়কা ভাঙা, কবাট ভাঙে নাই, হুড়কাটা ভাঙিয়া একদিকে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। আমরা ব্যোমকেশকে অগ্রে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম।

আমরা প্রবেশ করিতেই ঘরে যেন একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ঘরে কিন্তু মাত্র তিনটি লোক ছিল, ননীবালা, প্রভাত ও ন্যাপা। তাহারা একসঙ্গে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ন্যাপা বলিয়া উঠিল, 'কে? কে? কি চাই?' বলিয়াই আমাদের পশ্চাতে কেষ্টবাবুকে দেখিয়া থামিয়া গেল। ননীবালা থলথলে মুখে প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই উচ্চকণ্ঠে স্বগতোক্তি করিলেন, 'অ্যাঁ, ব্যোমকেশবাবু!' তিনি আমাদের দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছেন মনে হইল না। প্রভাত বুদ্ধিহীনের মত চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া ননীবালার উদ্দেশ্যে বলিল, 'কেষ্টবাবু আমাকে ডেকে এনেছেন। পুলিস এখনও আসেনি?'

ননীবালা মাথা নাড়িলেন। ব্যোমকেশ ন্যাপার দিকে চক্ষু ফিরাইলে সে বিহ্বলভাবে বলিয়া উঠিল, 'আপনি—ব্যোমকেশবাবু, মানে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। ইনি আমার বন্ধু অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন আমরা এসেছিলাম মনে আছে বোধহয়। আপনি পুলিস ডাকতে গিয়েছিলেন না? কী হল?'

ন্যাপা কেমন, যেন বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'পুলিস—হ্যাঁ, থানায় গিয়েছিলাম। থানায় কেউ ছিল না, একটা জমাদার টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমার কথা শুনে রেগে উঠল, বললে, যাও যাও, একটা হিন্দু মরেছে তার আবার এত হৈ-চৈ কিসের। লাশ রাস্তায় ফেলে দাওগে।

আমি চলে আসছিলাম, তখন আমাকে ডেকে বললে—ঠিকানা রেখে যাও, সকাল-বেলা দারোগা সাহেব এলে জানাবো। আমি অনাদিবাবুর নাম আর ঠিকানা দিয়ে চলে এলাম।'

ক্ষেত্রবিশেষে পুলিসের অবজ্ঞাপূর্ণ নির্লিপ্ততা এবং ক্ষেত্রান্তরে অতিরিক্ত কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে কোনও নূতনত্ব ছিল না; বস্তুতঃ অভ্যাসবশেই আশা করিয়া-ছিলাম যে, পুলিস সংবাদ পাইবামাত্র ছুটিয়া আসিবে। ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল, 'কেষ্টবাবুকে আপনারা অনাদিবাবুর হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেন। আমি তাঁর পক্ষ থেকে এই ব্যাপারের তদন্ত করতে চাই। কারুর আপত্তি আছে?'

কেহ উত্তর দিল না, ব্যোমকেশের চক্ষু এড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। তখন ব্যোমকেশ বলিল, 'লাশ ব্যালকনিতে আছে, আপনারা কেউ ছুঁয়েছেন কি?'

সকলে মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

আমরা তখন ব্যালকনিতে প্রবেশ করিলাম। দেয়ালের গায়ে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিতেছিল, তাহার নির্নিমেষ আলোতে দেখিলাম অনাদি হালদারের মৃতদেহ কাত হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া আছে, মুখ রাস্তার দিকে। গায়ে শাদা রঙের গরম গেঞ্জি, তাহার উপর বালাপোশ। বুকের উপর হইতে বালাপোশ সরিয়া গিয়াছে, গেঞ্জিতে একটি ছিদ্র; সেই ছিদ্রপথে গাঢ় রক্ত নির্গত হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়াছে। মৃতের মুখের উপর পৈশাচিক হাসির মত একটা বিকৃতি জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ নত হইয়া পিঠের দিক হইতে বালাপোশ সরাইয়া দিল। দেখিলাম এদিকেও গেঞ্জির উপর একটি সুগোল ছিদ্র। এদিকে রক্ত বেশী গড়ায় নাই, কেবল ছিদ্রের চারিদিক ভিজিয়া উঠিয়াছে। বন্দুকের গুলি দেহ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

মৃতদেহ ছাড়িয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, অন্যমনস্কভাবে বাহিরে রাস্তার দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি হ্রস্বকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, 'কি মনে হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ অন্যমনে বলিল, 'এই লোকটাই সেদিন আমার সঙ্গে অসভ্যতা করেছিল, আশ্চর্য নয়?......মৃতদেহ শক্ত হতে আরম্ভ করেছে......বোধহয় অনাদি হালদার রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তায় বাজি পোড়ানো দেখছিল—' ব্যোমকেশ রাস্তার পরপারে বড় বাড়িটার দিকে তাকাইল, 'কিন্তু গুলিটা গেল কোথায়? শরীরের মধ্যে নেই, শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে—'

ব্যোমকেশের অনুমান যদি সত্যি হয় তাহা হইলে গুলিটা ব্যালকনির দেয়ালে বিঁধিয়া থাকিবার কথা। কিন্তু ব্যালকনির দেয়াল ছাদ মেঝে কোথাও গুলি বা গুলির দাগ দেখিতে পাইলাম না। বন্দুকের গুলি দেহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার সময় কখনও কখনও তেরছা পথে বাহির হয়; কিম্বা অনাদি হালদার হয়তো তেরছাভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, গুলি ব্যালকনির পাশের ফাঁক দিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু লাশ যেভাবে পড়িয়া আছে, তাহাতে মনে হয়, অনাদি হালদার রাস্তার দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বুকে গুলি খাইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িয়াছে, তারপর পাশের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

সামনে রাস্তার ওপারে ওই বাড়িটা। মাঝে ৭০।৮০ ফুটের ব্যবধান। হয়তো ওই বাড়ির দ্বিতল বা ত্রিতলের কোনও জানালা হইতে গুলি আসিয়াছে।

ব্যালকনিতে গুলির কোনও চিহ্ন না পাইয়া ব্যোমকেশ আর একবার নত হইয়া মৃতদেহ পরীক্ষা করিল। বালাপোশ সরাইয়া লইলে দেখিলাম, নিম্নাঙ্গে ধুতির কষি আল্‌গা হইয়া গিয়াছে, কোমরে ঘুন্‌সির মত একটি মোটা কালো সুতা দেখা যাইতেছে। ঘুন্‌সিতে ফাঁস লাগানো একটি চাবি। ব্যোমকেশ চাবিটি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল, তারপর সন্তর্পণে খুলিয়া লইয়া মৃতদেহের উপর আবার বালাপোশ ঢাকা দিয়া বলিল, 'চল, দেখা হয়েছে।'

বাহিরে তখনও রাত্রির অন্ধকার কাটে নাই। রাস্তা দিয়া শাকসব্জি বোঝাই লরী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতা শহরের বিরাট ক্ষুধা মিটাইবার আয়োজন চলিতেছে।

ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম, যে চারিজন লোক ঘরের মধ্যে ছিল তাহারা আগের মতই দাঁড়াইয়া আছে, কেহ নড়ে নাই। ব্যোমকেশ হাতের চাবি দেখাইয়া বলিল, 'মৃতদেহের কোমরে ছিল। কোথাকার চাবি?'

একে একে চারিজনের মুখ দেখিলাম। সকলেই একদৃষ্টে চাবির পানে চাহিয়া আছে, কেবল ন্যাপাব মুখে ভয়ের ছায়া। অবশেষে ননীবালা বলিলেন, 'অনাদিবাবুর শোবার ঘরে লোহার আলমারি আছে, তারই চাবি।'

'লোহার আলমারিতে কি আছে? টাকাকড়ি?'

সকলেই মাথা নাড়িল, কেহ জানে না। ননীবালা বলিলেন, 'কি করে জানব। অনাদিবাবু কি কাউকে আলমারি ছুঁতে দিত? কাছে গেলেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠত—' প্রভাতের চোখের দিকে চাহিয়া ননীবালা থামিয়া গেলেন।

ন্যাপা অধর লেহন করিয়া বলিল, 'আলমারিতে টাকাকড়ি বোধহয় থাকত না। কর্তা ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন।'

ব্যোমকেশ চাবি পকেটে রাখিয়া বলিল, 'আলমারিতে কি আছে পরে দেখা যাবে। এখন আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।—বাড়িতে ঢোকবার বেরুবার রাস্তা ক'টা?'

সকলে ভাঙা দ্বারের দিকে নির্দেশ করিল, 'মাত্র ওই একটা।'

'অন্য দরজা নেই?'

'না।'

ব্যোমকেশ বেঞ্চির একপাশে বসিয়া বলিল, 'বেশ। তার মানে অনাদিবাবুর যখন মৃত্যু হয় তখন বাড়িতে কেহ ছিল না, বাইরে থেকে গুলি এসেছে। প্রভাতবাবু, আপনি বলুন দেখি, আপনি কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন?'

প্রভাত মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কিছুক্ষণ তাহার অগোছালো চুলে হাত বুলাইল, তারপর চোখ তুলিয়া বলিল, 'আমি মাকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম আন্দাজ সাড়ে আটটার সময়।'

'ও, আপনারা দু'জনে এক সঙ্গে বেরিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, মা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি?' বলিয়া ব্যোমকেশ ননীবালার পানে চাহিল।

ননীবালা বলিলেন, 'আমার তো আর সিনেমা দেখা হয়ে ওঠে না, ন' মাসে ছ' মাসে একবার। কাল ঐ যে কি বলে শেয়ালদার কাছে সিনেমা আছে সেখানে 'জয় মা কালী' দেখাচ্ছিল, তাই দেখতে গিছলুম। এ বাড়ির রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া আটটার মধ্যেই চুকে যায়, তাই রাত্তিরের শো'তে গিয়েছিলুম। প্রভাত বলল—'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, 'আপনারা যখন বেরিয়েছিলেন তখন বাড়িতে কে কে ছিল?'

প্রভাত বলিল, 'কেবল অনাদিবাবু ছিলেন। নৃপেনবাবু আটটার পরই বেরিয়ে গিয়েছিলেন।'

ব্যোমকেশ ন্যাপার দিকে ফিরিল, কিন্তু কোথায় ন্যাপা! সে এতক্ষণ ভিতর দিকের একটা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, কখন অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

ব্যোমকেশ সবিস্ময়ে ননীবালার দিকে ফিরিয়া হাত উল্টাইয়া প্রশ্ন করিল. ননীবালা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নীরবে দেখাইয়া দিলেন--ন্যাপা ওই দ্বার দিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছে। ব্যোমকেশ তখন বিড়াল-পদক্ষেপে সেই দিকে চলিল; আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

খানিকটা সরু গলির মতন, তারপর একটা ঘর। আলো জ্বলিতেছে। আমরা উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের দেরাজ খুলিয়া ন্যাপা ভিতরে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছে এবং অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে কিছু খুঁজিতেছে। আমাদের দ্বারের কাছে দেখিয়া সে তড়িদ্বেগে খাড়া হইল এবং দেরাজ বন্ধ করিয়া দিল।

আমরা প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশ অপ্রসন্ন স্বরে বলিল, 'এটা আপনার ঘর?'

ন্যাপা কিছুক্ষণ বোকার মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, আমার ঘর।'

'আপনি না বলে চলে এলেন কেন? কি করছেন?'

ন্যাপা পাংশুমুখে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'কিছু না—এই—একটা সিগারেট খাব বলে ঘরে এসেছিলাম-তা খুঁজে পাচ্ছি না-'

খুঁজিয়া না পাওয়ার কথা নয়, সিগারেটের প্যাকেট টেবিলের এক কোণে রাখা রহিয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা কি? সিগারেটের প্যাকেট বলেই মনে হচ্ছে।'

ন্যাপা যেন আঁতকাইয়া উঠিল—'অ্যাঁ-! ও—হ্যাঁ দেশলাই-দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি না--'

ব্যোমকেশ একবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া নিজের পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া দিল--'এই নিন।' ন্যাপা কম্পিত হস্তে দেশলাই জ্বালিয়া সিগারেট ধরাইল।

আমি ঘরের চারিদিকে একবার তাকাইলাম। ক্ষুদ্র ঘর, আসবাবের মধ্যে তক্তপোশের উপর বিছানা, একটি দেরাজযুক্ত টেবিল ও তৎসংলগ্ন চেয়ার। ঘরে একটি গরাদ লাগানো জানালা আছে।

জানালাটা খোলা রহিয়াছে। ব্যোমকেশ তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল, আমিও গেলাম। আকাশ ফরসা হইয়া আসিতেছে। জানালা দিয়া অর্ধ-সমাপ্ত নূতন বাড়িটা দেখা গেল। মাঝখানে গভীর খাদের মত গলি গিয়াছে।

'নৃপেনবাবু, আপনার বাড়ি কোথায়?'

ব্যোমকেশের এই আকস্মিক প্রশ্নে নৃপেন প্রায় লাফাইয়া উঠিল। সে টেবিলের কিনারায় ঠেস দিয়া সিগারেটে লম্বা টান দিতেছিল, বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'বাড়ি—?'

'হ্যাঁ, দেশ। নিবাস কোথায়? কোন জেলায়?'

নৃপেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া বলিল, 'নিবাস? চব্বিশ পরগণা, ডায়মণ্ডহারবার লাইনের খেজুরহাটে।'

ব্যোমকেশ জানালার দিক হইতে ফিরিয়া নৃপেনের পানে চাহিয়া রহিল, বলিল, 'খেজুরহাট! আপনি খেজুরহাটের রমেশ মল্লিককে চেনেন?'

নৃপেন দগ্ধাবশেষ সিগারেট ফেলিয়া দিয়া যেন ধূমরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'চিনি। আমাদের পাড়ায় থাকেন।'

'খেজুরহাটে আপনার কে আছেন?'

'খুড়ো।'

'বাপ নেই?'

'না।'

'ভাল কথা, আপনার পুরো নামটা কী?'

'নৃপেন দত্ত।'

ব্যোমকেশ নৃপেনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, একটু ঘনিষ্ঠতার সুরে বলিল 'নৃপেনবাবু, আপনাকে দেখে কাজের লোক বলে মনে হয়। আপনি কতদিন অনাদিবাবুর সেক্রেটারীর কাজ করছেন?'

নৃপেন একটু ভাবিয়া বলিল, 'প্রায় চার বছর।'

'চার বছর? এতদিন টিকে ছিলেন?'

নৃপেন চুপ করিয়া রহিল।

'অনাদিবাবুর কেউ শত্রু ছিল কিনা আপনি নিশ্চয় জানেন?'

নৃপেন অসহায় মুখ তুলিল, 'কার নাম করব? যার সঙ্গে কর্তার পরিচয় ছিল তার সঙ্গেই শত্রুতা ছিল। ঝগড়া করা ছিল ওঁর স্বভাব।'

'বাড়ির সকলের সঙ্গেই ঝগড়া চলত?'

'সকলকেই উনি গালমন্দ করতেন। কিন্তু আমরা ওঁর অধীন, আমাদের চুপ করে থাকতে হত। কেবল কেষ্টবাবু মাঝে মাঝে -'

'প্রভাতকে অনাদিবাবু গালমন্দ করতেন?'

'ঠিক গালমন্দ নয়, সুবিধে পেলেই খোঁচা দিতেন। প্রভাতবাবু কিন্তু গায়ে মাখতেন না।'

'আচ্ছা, ওকথা থাক। বলুন দেখি কাল রাত্রে আপনি কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন?'

'আটটার পরই বেরিয়েছিলাম।'

'ফিরলেন কখন?'

'আন্দাজ একটায়। ফিরে দেখলাম, ননীবালা দেবী আর প্রভাতবাবু দোর ঠেলাঠেলি করছেন।'

'আপনি আটটা থেকে একটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?'

'সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।'

'আপনিও 'জয় মা কালী' দেখতে গিয়েছিলেন?'

'না, আমি একটা ইংরিজি ছবি দেখতে গিছলাম।'

'ও! অত রাত্রে ফিরলেন কি করে?'

'হেঁটে।'

লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে নৃপেন অনেকটা ধাতস্থ হইয়াছে, আগের মত ভীত বিচলিত ভাব আর নাই। ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন, এবার ও ঘরে যাওয়া যাক।'

ছয়

তিনজনে ও ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম, কেষ্টবাবু এবং প্রভাত বেঞ্চির দুই কোণে উপবিষ্ট। কেষ্টবাবু হাই তুলিতেছেন এবং আড়চক্ষে প্রভাতকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। প্রভাত করতলে চিবুক রাখিয়া চিন্তামগ্ন। ননীবালা মেঝেয় পা ছড়াইয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের দেখিয়া সকলে সিধা হইলেন। প্রভাত বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, 'বসুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বসব না। ভোর হয়ে এল, এবার বাড়ি ফিরতে হবে। এখনি হয়তো পুলিস এসে পড়বে। আমাকে দেখলে পুলিসের মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে পারে। আপনাদের একটা কথা বলে রাখি মনে রাখবেন। কারুর ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করবেন না, তাতে নিজেরই অনিষ্ট হবে, পুলিস হয়তো সকলকেই ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরবে।'

সকলে চুপ করিয়া রহিল।

'প্রভাতবাবু, এবার আপনার কথা বলুন। কাল আপনি আপনার মাকে সিনেমায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, নিজে সিনেমা দেখেননি?'

প্রভাত বলিল, 'না। আমি টিকিট কিনে মাকে সিনেমায় বসিয়ে দিয়ে নিজের দোকানে গিয়েছিলাম।'

'ও। রাত্রি সাড়ে আটটার পর দোকানে গেলেন?'

'হ্যাঁ। দেয়ালীর রাত্রে দোকান আলো দিয়ে সাজিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপর পৌনে বারোটার সময় দোকান বন্ধ করে আবার সিনেমায় গেলাম, সেখান থেকে মাকে নিয়ে ফিরে এলাম।'

'তাহলে আন্দাজ ন'টা থেকে পৌনে বারোটা পর্যন্ত আপনি দোকানেই ছিলেন। দোকানে আর কেউ ছিল?'

'গুরুং ছিল, দোরের সামনে পাহারা দিচ্ছিল।'

'গুরুং—মানে গুর্খা দরোয়ান। খদ্দের কেউ আসেননি?'

'না।'

'সারাক্ষণ দোকানে বসে কি করলেন?'

'কিছু না। পিছনে কুঠরিতে বসে বই বাঁধলাম।'

'আচ্ছা, ও কথা যাক।—অনাদিবাবুর সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল?'

প্রভাত ক্ষুব্ধ চোখ তুলিল, 'না। উনি আমাকে পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিলেন, প্রথম প্রথম ভাল ব্যবহার করতেন। তারপর—ক্রমশ—'

'ক্রমশ ওঁর মন বদলে গেল? আচ্ছা, উনি আপনাকে পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিলেন কেন?'

'তা জানি না।'

'প্রথম প্রথম ভাল ব্যবহার করতেন, তারপর মন-মেজাজ বদলে গেল; এর কোনও কারণ হয়েছিল কি?'

'হয়তো হয়েছিল। আমি জ্ঞানতঃ কোনও দোষ করিনি।'

প্রভাত ক্লান্তভাবে আবার বেঞ্চিতে বসিল। ব্যোমকেশ তাহাকে সদয়-চক্ষে

নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আপনি বরং কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন গিয়ে। পুলিস একবার এসে পড়লে আর বিশ্রাম পাবেন কি না সন্দেহ।'

প্রভাত কিন্তু কেবল মাথা নাড়িল। ব্যোমকেশ তখন ননীবালার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আপনার সঙ্গেও তো অনাদিবাবুর সদ্ভাব ছিল না।'

ননীবালা যুগপৎ মুখ এবং গো-চক্ষু ব্যাদিত করিয়া প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়া উঠিলেন, 'আপনাকে তো সবই বলেছি, ব্যোমকেশবাবু। আমি ছিলুম বুড়োর চক্ষুশূল। প্রভাতকে বুড়ো ভালবাসত, কিন্তু আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। রাতদিন ছুতো খুঁজে বেড়াতো; একটা কিছু পেলেই শুরু করে দিত দাঁতের বাদ্যি। এমন নীচ অন্তঃকরণ—' ননীবালা থামিয়া গেলেন। অনাদি হালদার মরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মৃতদেহ অদূরেই পড়িয়া আছে, এই কথা সহসা স্মরণ করিয়াই বোধ করি আত্মসংবরণ করিলেন। অধিকন্তু অনাদিবাবুর সহিত তাঁহার অসদ্ভাবের প্রসঙ্গ অপ্রকাশ থাকাই বাঞ্ছনীয়, তাহা কিঞ্চিৎ বিলম্বে উপলব্ধি করিলেন।

কেষ্টবাবুও সেই ইঙ্গিত করিলেন, হেঁচ্‌কি তোলার মত একটা হাসির শব্দ করিয়া বলিলেন, 'তাহলে শুধু আমার সঙ্গেই অনাদির ঝগড়া ছিল না!'

প্রভাত একবার ঘাড় ফিরাইয়া তাহার দিকে তাকাইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'ও কথার কোনও মানে হয় না। দেখা যাচ্ছে সকলের সঙ্গেই অনাদি হালদারের ঝগড়া ছিল; তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। খুন করতে হলে যেমন খুন করার ইচ্ছে থাকা চাই, তেমনি খুন করার সুযোগও দরকার।' ব্যোমকেশ ননীবালার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'কাল সিনেমা কেমন দেখলেন?'

ননীবালা আবার হাঁ করিয়া চাহিলেন।

'অ্যাঁ- সিনেমা—'

'ছবিটা শেষ পর্যন্ত দেখেছিলেন?'

এতক্ষণে ননীবালা বোধহয় প্রশ্নের মর্মার্থ অনুধাবন করিলেন, বলিলেন, 'ওমা, তা আবার দেখিনি! গোড়া থেকে শেষ অবধি দেখেছি, ছবি শেষ হয়েছে তবে বাইরে এসেছি। আমিও বাইরে এসে দাঁড়ালাম, আর প্রভাত এল। ওর সঙ্গে বাসায় চলে এলুম। এসে দেখি—'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'জানি। এবার চলুন অনাদি হালদারের শোবার ঘরে যাওয়া যাক। লোহার আলমারিটা দেখা দরকার।'

আমরা ছয়জন একজোট হইয়া অনাদি হালদারের শয়নকক্ষের দিকে চলিলাম। কয়েকদিন আগে যে ঘরে অনাদি হালদারের সহিত দেখা হইয়াছিল, তাহারই পাশের ঘর। নৃপেন দ্বারের পাশে সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল।

ঘরটি আকারে প্রকারে নৃপেনের ঘরের মতই, তবে বাড়ির অন্য প্রান্তে। একটি গরাদযুক্ত জানালা খোলা রহিয়াছে। ঘরে একটি খাট এবং তাহার শিয়রে একটি স্টীলের আলমারি ছাড়া আর কিছু নাই।

আমরা সকলে ঘরে প্রবেশ করিলে ঘরে স্থানাভাব ঘটিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাদের সকলকে এ ঘরে দরকার নেই। কেষ্টবাবু, আপনি বরং ও ঘরে থাকুন গিয়ে। সিঁড়ির দরজা ভাঙা, এখুনি হয়তো পুলিস এসে পড়বে।'

আলমারির ভিতর কি আছে, তাহা জানিবার কৌতূহল অন্যান্য সকলের মত কেষ্টবাবুরও নিশ্চয় ছিল, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'কুছ পরোয়া নেই, আমিই মড়া

আগ্‌লাবো। কিন্তু, এই সময় অন্তত এক পেয়ালা গরম চা পাওয়া যেত।' বলিয়া তিনি সস্পৃহভাবে হাত ঘষিতে লাগিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চা হলে মন্দ হত না', সে ননীবালার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি ফিরাইল।

ননীবালা অনিচ্ছাভাবে বলিলেন, 'চা আমি করতে পারি। কিন্তু দুধ নেই যে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুধের বদলে লেবুর রস চলতে পারে।'

কেষ্টবাবু গাঢ়স্বরে বলিলেন, 'আদা! আদা! আদার রস দিয়ে চা খান, শরীর চাঙ্গা হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আদার রসও চলবে।'

ননীবালা ও কেষ্টবাবু প্রস্থান করিলে নৃপেন একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'আমাকে দরকার হবে কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাকেই দরকার। প্রভাতবাবু বরং নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন।'

প্রভাত একবার যেন দ্বিধা করিল, তারপর কোনও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। ঘরে রহিলাম আমরা দু'জন ও নৃপেন।

ঘরে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নাই। খাটের উপর বিছানা পাতা; পরিষ্কার বিছানা, গত রাত্রে ব্যবহৃত হয় নাই। দেয়ালে আলনায় একটি কাচা ধুতি পাকানো রহিয়াছে। এক কোণে গেলাস-ঢাকা জলের কুঁজা। ব্যোমকেশ এদিকে ওদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া পকেট হইতে চাবি বাহির করিল।

আলমারিটা নূতন। বার্নিশ করা কাঠের মত রঙ, লম্বা সরু আকৃতি, অত্যন্ত মজবুত। ব্যোমকেশ চাবি ঘুরাইয়া জোড়া কবাট খুলিয়া ফেলিল। আমি এবং নৃপেন সাগ্রহে ভিতরে উঁকি মারিলাম।

ভিতরে চারিটি থাক। সর্বোচ্চ থাকের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এক সারি বই; মাঝে মাঝে ভাঙা দাঁতের মত ফাঁক পড়িয়াছে। কয়েকটি বইয়ের পিঠে সোনার জলে নাম লেখা, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মহাজন পদাবলী। ব্যোমকেশ আরও কয়েকখানি বই বাহির করিয়া দেখিল, অধিকাংশই বটতলার বই, কিন্তু বাঁধাই ভাল। হয়তো প্রভাত বাঁধিয়া দিয়াছে।

ব্যোমকেশ নৃপেনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'অনাদি হালদার কি খুব বই পড়ত?'

নৃপেন শুষ্কস্বরে বলিল, 'কোন দিন পড়তে দেখিনি।'

'বাড়িতে আর কেউ বই পড়ে?'

'প্রভাতবাবু পড়েন। আমিও পেলে পড়ি। কিন্তু কর্তার আলমারিতে যে বই আছে, তা আমি কখনও চোখে দেখিনি।'

'অথচ বইয়ের সারিতে ফাঁক দেখে মনে হচ্ছে কয়েকখানা বই বার করা হয়েছে। কোথায় গেল বইগুলো?'

নৃপেন ঘরের এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'তা তো বলতে পারি না। এঘরে দেখছি না। প্রভাতবাবুকে জিজ্ঞেস করব?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন থাক, এমন কিছু জরুরী কথা নয়।—আচ্ছা, বাইরে অনাদি হালদারের কোথায় বেশী যাতায়াত ছিল?'

নৃপেন বলিল, 'কর্তা বাড়ি থেকে বড় একটা বেরুতেন না। যখন বেরুতেন,

হয় সলিসিটারের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, নয়তো ব্যাঙ্কে যেতেন। এ ছাড়া আর বড় কোথাও যাতায়াত ছিল না।'

ব্যোমকেশ দ্বিতীয় থাকের প্রতি দৃষ্টি নামাইল।

দ্বিতীয় থাকে অনেকগুলি শিশি-বোতল রহিয়াছে। শিশিগুলি পেটেণ্ট ঔষধের, বোতলগুলি বিলাতী মদ্যের। একটি বোতলের মদ্য প্রায় তলায় গিয়া ঠেকিয়াছে, অন্যগুলি সীল করা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অনাদি হালদার মদ খেত?'

নৃপেন বলিল, 'মাতাল ছিলেন না। তবে খেতেন। মাঝে মধ্যে গন্ধ পেয়েছি।'

ঔষধের শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল অধিকাংশই টনিক জাতীয় ঔষধ, অতীত যৌবনকে পুনরুদ্ধার করিবার বিলাতী মুষ্টিযোগ। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সন্ধ্যের পর বেড়াতে বেরুনোর অভ্যেস অনাদি হালদারের ছিল না?'

নৃপেন বলিল, 'খুব বেশী নয়, মাসে দু-তিন দিন বেরুতেন।'

'বাঃ! অনাদি হালদারের গোটা চরিত্রটি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। খাসা চরিত্র!' ব্যোমকেশ আলমারির তৃতীয় থাকে মন দিল।

তৃতীয় থাকে অনেকগুলি মোটা মোটা খাতা এবং কয়েকটি ফাইল। খাতাগুলি কার্ডবোর্ড দিয়া মজবুত করিয়া বাঁধানো। খুলিয়া দেখা গেল ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাবের খাতা। ব্যবসায়ের রীতি প্রকৃতি জানিতে হইলে খাতাগুলি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করা প্রয়োজন; কিন্তু তাহার সময় নাই। ব্যোমকেশ নৃপেনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'অনাদি হালদার কিসের ব্যবসা করত আপনি জানেন?

নৃপেন বলিল, 'আগে কি ব্যবসা করতেন জানি না, উনি নিজের কথা কাউকে বলতেন না। তবে যুদ্ধের গোড়ার দিকে জাপানী মাল কিনেছিলেন। কটন মিলে যেসব কলকব্জা লাগে, তাই। সস্তায় কিনেছিলেন—'

'তারপর কালাবাজারের দরে বিক্রি করেছিলেন। বুঝেছি।' ব্যোমকেশ একখানা ফাইল তুলিয়া লইয়া মলাট খুলিয়া ধরিল।

ফাইলে নানা জাতীয় দলিলপত্র রহিয়াছে। নূতন বাড়ির ইস্টাম্বর দস্তাবেজ, সলিসিটারের চিঠি, বাড়ি ভাড়ার রসিদ ইত্যাদি। কাগজপত্রের উপর লঘুভাবে চোখ বুলাইতে বুলাইতে ব্যোমকেশ পাতা উল্টাইতে লাগিল, তারপর এক জায়গায় আসিয়া থামিল। একটি রুলটানা কাগজে কয়েক ছত্র লেখা, নীচে স্ট্যাম্পের উপর দস্তখত।

কাগজখানা ব্যোমকেশ ফাইল হইতে বাহির করিয়া লইল, মুখের কাছে তুলিয়া মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিল। আমি গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একটি হ্যাণ্ডনোট। অনাদি হালদার হাতচিঠির উপর দয়ালহরি মজুমদার নামক এক ব্যক্তিকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়াছে।

ব্যোমকেশ হ্যাণ্ডনোট হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, 'দয়ালহরি মজুমদার কে?'

নৃপেন কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'দয়ালহরি, ও, মনে পড়েছে—' একটু কাছে সরিয়া আসিয়া খাটো গলায় বলিল, 'দয়ালহরিবাবুর মেয়েকে প্রভাতবাবু বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, তারপর কর্তা মেয়ে দেখে অপছন্দ করেন—'

'মেয়ে বুঝি কুচ্ছিৎ?'

'আমরা কেউ দেখিনি।'

'কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা ধার দেওয়ার মানে কি?'

'জানি না; হয়তো ওই জন্যেই—'

'ওই জন্যেই কী?'

'হয়তো, যাকে টাকা ধার দিয়েছেন, তার মেয়ের সঙ্গে কর্তা প্রভাতবাবুর বিয়ে দিতে চাননি।'

'হতে পারে। অনাদি হালদার কি তেজারতির কারবার করত?'

'না। তাঁকে কখনও টাকা ধার দিতে দেখিনি।'

'হ্যান্ডনোটে তারিখ দেখছি ১১।৯।১৯৪৬, অর্থাৎ মাসখানেক আগেকার। অনাদি হালদার মেয়ে দেখতে গিয়েছিল কবে?'

'প্রায় ওই সময়। তারিখ মনে নেই।'

'দয়ালহরি মজুমদার সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?'

'কিছু না। বাইরে শুনেছি মেয়েটি নাকি খুব ভাল গাইতে পারে, এরি মধ্যে খুব নাম করেছে। ওরা পূর্ববঙ্গের লোক, সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে।'

'তাই নাকি! অজিত, দয়ালহরি মজুমদারের ঠিকানাটা মনে করে রাখ তো-' হাতচিঠি দেখিয়া পড়িল—'১৩।৩, রামতনু লেন, শ্যামবাজার।'

মনে মনে ঠিকানাটা কয়েকবার আবৃত্তি করিয়া লইলাম। ব্যোমকেশ আলমারির নিম্নতম থাকটি তদারক করিতে আরম্ভ করিল।

নীচের থাকে কেবল একটি কাঠের হাত-বাক্স আছে, আর কিছু নাই। হাত-বাক্সের গায় চাবি লাগানো। ব্যোমকেশ চাবি ঘুরাইয়া ডালা তুলিল। ভিতরে একগোছা দশ টাকার নোট, কিছু খুচরা টাকা-পয়সা এবং একটি চেক বহি।

ব্যোমকেশ নোটগুলি গণিয়া দেখিল। দুইশত ষাট টাকা। চেক বহিখানি বেশ পুরু, একশত চেকের বহি; তাহার মধ্যে অর্ধেকের অধিক খরচ হইয়াছে। ব্যোমকেশ ব্যবহৃত চেকের অর্ধাংশগুলি উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে প্রশ্ন করিল, 'ভারত ব্যাঙ্ক ছাড়া আর কোনও ব্যাঙ্কে অনাদি হালদার টাকা রাখত?'

নৃপেন বলিল, 'তিনি কোন্ ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন তা আমি জানি না।'

'আশ্চর্য! নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, কন্ট্রাকটরকে টাকা দিত কি করে?'

'ক্যাশ দিতেন। আমি জানি, কারণ আমি রসিদের খসড়া তৈরি করে কন্ট্রাকটরকে দিয়ে সই করিয়ে নিতাম। যেদিন টাকা দেবার কথা, সেদিন বেলা ন'টার সময় কর্তা বেরিয়ে যেতেন, এগারটার সময় ফিরে আসতেন। তারপর কন্ট্রাকটরকে টাকা দিতেন।'

'অর্থাৎ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনতে যেতেন?'

'আমার তাই মনে হয়।'

'হুঁ। বাড়ির দরুন কন্ট্রাক্টরকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে, আপনি জানেন?'

নৃপেন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল, 'প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রসিদগুলো বোধহয় ফাইলে আছে। যদি জানতে চান—'

ব্যোমকেশ চেক বহি রাখিয়া দিয়া অর্ধ-স্বগত বলিল, 'ভারি আশ্চর্য!—না, চুলচেরা হিসেব দরকার নেই। চল অজিত, এ ঘরে দ্রষ্টব্য যা কিছু দেখা হয়েছে।' বলিয়া সযত্নে আলমারি বন্ধ করিল।

এই সময় ননীবালা একটি বড় থালার উপর চার পেয়ালা চা লইয়া ঘরে

প্রবেশ করিলেন—'এই নিন।—প্রভাত নিজের ঘরে শুয়ে আছে; তার চা দিয়ে এসেছি।'

নৃপেন আলো নিভাইয়া দিল। জানালা দিয়া দেখা গেল বাহিরে বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

আমরা তিনজনে চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া বাহিরের ঘরে আসিলাম, কেষ্টবাবুর চায়ের পেয়ালা থালার উপর লইয়া ননীবালা আমাদের সঙ্গে আসিলেন।

বেঞ্চের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া কেষ্টবাবু ঘুমাইতেছেন। ঘর্ঘর শব্দে তাঁহার নাক ডাকিতেছে।

ব্যালকনিতে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, অনাদি হালদারের মৃত মুখের উপর সকালের আলো পড়িয়াছে। মাছিরা গন্ধ পাইয়া আসিয়া জুটিয়াছে।

সাত

চা শেষ করিয়া পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়াছি, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের সমবেত শব্দ শোনা গেল। এতক্ষণে বুঝি পুলিস আসিতেছে।

কিন্তু আমার অনুমান ভুল, পুলিসের এখনও ঘুম ভাঙে নাই। যাঁহারা প্রবেশ করিলেন তাঁহারা সংখ্যায় তিনজন; একটি অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক; সঙ্গে নিমাই ও নিতাই। ভাগাড়ে মড়া পড়িলে বহু দূরে থাকিয়াও যেমন শকুনির টনক নড়ে, নিমাই ও নিতাই তেমনি খুল্লতাতের মহাপ্রস্থানের গন্ধ পাইয়াছে।

পায়ের শব্দে কেষ্টবাবুর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল তিনি চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিলেন। ভিতর দিক হইতে প্রভাতও প্রবেশ করিল।

প্রথমে দুই পক্ষ নির্বাকভাবে দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। নিমাই ও নিতাই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দুই পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের চক্ষু একে একে আমাদের পর্যবেক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া থামিয়া গেল; দৃষ্টি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। বোধহয় তাহারা ব্যোমকেশকে চিনিতে পারিয়াছে।

প্রথমে ব্যোমকেশ কথা বলিল, 'আপনারা কি চান?'

নিমাই ও নিতাই অমনি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দুই কানে ফুসফুস করিয়া কথা বলিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ক্ষৌরিত মুখে কাঁচা-পাকা দাড়িগোঁফ কণ্টকিত হইয়াছিল; অসময়ে ঘুম ভাঙানোর ফলে মেজাজও বোধকরি প্রসন্ন ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ চক্ষে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিয়া বিকৃতস্বরে বলিলেন, 'আপনি কে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পারিবারিক বন্ধু বলতে পারেন। আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী।'

তিনজনের চোখেই চকিত সতর্কতা দেখা দিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটু দম লইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'ডিটেক্‌টিভ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সত্যান্বেষী।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক গলার মধ্যে অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিলেন, তারপর প্রভাতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমরা খবর পেয়েছি অনাদি হালদার মশায়ের মৃত্যু হয়েছে। এরা দুই ভাই নিমাই এবং নিতাই হালদার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। এঁরা মৃতের সম্পত্তি দখল নিতে এসেছেন। এ বাড়ি আপনাদের ছেড়ে দিতে হবে।'

প্রভাত কিছুক্ষণ অবুঝের মত চাহিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই নাকি? বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে! কিন্তু আপনি কে তা তো জানা গেল না।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, 'আমি এদের উকিল কামিনীকান্ত মুস্তফী।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উকিল। তাহলে আপনার জানা উচিত যে অনাদি হালদারের ভাইপোরা তাঁর উত্তরাধিকারী নয়। তিনি পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন।'

উকিল কামিনীকান্ত নাকের মধ্যে একটি শব্দ করিলেন, ব্যোমকেশকে নিরতিশয় অবজ্ঞার সহিত নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'আপনি যখন পারিবারিক বন্ধু আপনার জানা উচিত যে অনাদি হালদার মশায় পোষ্যপুত্র নেননি। মুখের কথায় পোষ্যপুত্র নেওয়া যায় না। দলিল রেজিস্ট্রি করতে হয়, যাগযজ্ঞ করতে হয়। অনাদি হালদার মশায় এসব কিছুই করেননি।—আপনাদের এক বস্ত্রে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, একটা কুটো নিয়ে যেতে পাবেন না। এখানে যা-কিছু আছে সমস্ত আমার মক্কেলদের সম্পত্তি।'

ব্যোমকেশ ক্ষণকালের জন্য যেন হতভম্ব হইয়া প্রভাতের পানে তাকাইল; তারপর সে সামলাইয়া লইল। মুখে একটা বঙ্কিম হাসি আনিয়া বলিল, 'বটে? ভেবেছেন হুমকি দিয়ে অনাদি হালদারের সম্পত্তিটা দখল করবেন। অত সহজে সম্পত্তি দখল করা যায় না উকিলবাবু। পোষ্যপুত্র নেয়া যে আইনসঙ্গত নয় সেটা আদালতে প্রমাণ করতে হবে, সাক্‌সেশন সার্টিফিকেট নিতে হবে, তবে দখল পাবেন। বুঝেছেন?'

উকিলবাবু বলিলেন, 'আপনারা যদি এই দণ্ডে বাড়ি ছেড়ে না যান, আমি পুলিস ডাকব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পুলিস ডাকবার দরকার নেই, পুলিস নিজেই এল বলে।—ভাল কথা, অনাদিবাবু যে মারা গেছেন এটা আপনারা এত শীগ্‌গির জানলেন কি করে? এখনও দু'ঘণ্টা হয়নি—'

হঠাৎ নিমাই নিতাইয়ের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, 'দু'ঘণ্টা! কাকা মারা গেছেন রাত্তির এগারোটার সময়—' বলিয়াই অর্ধপথে থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ মধুর স্বরে বলিল, 'এগারোটার সময় মারা গেছেন? আপনি জানলেন কি করে? মৃত্যুকালে আপনি উপস্থিত ছিলেন বুঝি? হাতে বন্দুক ছিল?'

নিমাই নিতাই একেবারে নীল হইয়া গেল। উকিলবাবু নিমাই (কিম্বা নিতাই)-কে ধমক দিয়া বলিলেন, 'তোমরা চুপ করে থাকো, বলাকওয়া আমি করব। আপনারা তাহলে দখল ছাড়বেন না। আচ্ছা, আদালত থেকেই ব্যবস্থা হবে।' বলিয়া তিনি মক্কেলদের বাহু ধরিয়া সিঁড়ির দিকে ফিরিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চললেন? আর একটু সবুর করবেন না? পুলিস এসে ভাইপোদের বয়ান নিশ্চয় শুনতে চাইবে। আপনারা কাল রাত্রি এগারোটার সময়

কোথায় ছিলেন–'

ব্যোমকেশের কথা শেষ হইবার পূর্বেই ভ্রাতুষ্পুত্রযুগল উকিলকে পিছনে ফেলিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া অন্তর্হিত হইল। উকিল কামিনীকান্ত মুস্তফী ব্যোমকেশের প্রতি একটি গরল-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের অনুগমন করিলেন।

তাহাদের পদশব্দ নীচে মিলাইয়া যাইবার পর ব্যোমকেশ প্রভাতের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনি যে আইনত অনাদিবাবুর পোষ্যপুত্তুর নন্‌ একথা আগে আমাকে বলেননি কেন?'

প্রভাত ক্ষুব্ধ মুখে দাঁড়াইয়া ঘাড় চুলকাইতে লাগিল। এইবার ননীবালা দেবী সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, তাঁহার মুখ শুকাইয়া যেন চুপ্‌সিয়া গিয়াছে, চোখে ড্যাব্‌ডেবে ব্যাকুলতা। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, ওরা যা বলে গেল তা কি সত্যি? প্রভাত অনাদিবাবুর পুষ্যিপুত্তুর নয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সেই কথাই তো জানতে চাইছি।---প্রভাতবাবু–'

প্রভাত ঠোঁট চাটিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল, 'আমি--আইন জানি না। প্রথমে কলকাতায় আসবার পর অনাদিবাবু আমাকে নিয়ে সলিসিটারের অফিসে গিয়েছিলেন। সেখানে শুনেছিলাম পুষ্যিপুত্তুর নিতে হলে দলিল রেজিস্ট্রি করতে হয়, হোম-যজ্ঞ করতে হয়। কিন্তু সে সব কিছু হয়নি।'

'তাহলে আপনি জানতেন যে আপনি অনাদিবাবুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নন?'

'হ্যাঁ, জানতাম। কিন্তু ভেবেছিলাম–'

'ভেবেছিলেন মৃত্যুর আগে অনাদিবাবু দলিল রেজিস্ট্রি করে আপনাকে পুষ্যিপুত্তুর করে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর ননীবালা দীর্ঘকম্পিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'তাহলে তাহলে প্রভাত কিছুই পাবে না। সব ওই নিমাই নিতাই পাবে!' ননীবালার বিপুল দেহ যেন সহসা শিথিল হইয়া গেল, তিনি মেঝেয় বসিয়া পড়িলেন।

প্রভাত ত্বরিতে গিয়া ননীবালার পাশে বসিল, গাঢ় হ্রস্ব স্বরে বলিল, 'তুমি ভাবছ কেন মা! দোকান তো আছে। তাতেই আমাদের দু'জনের চলে যাবে।'

ননীবালা প্রভাতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। যাহোক তবু অনাদি হালদারের মৃত্যুর পর একজনকে কাঁদিতে দেখা গেল।

ব্যোমকেশ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া তাহাদের নিরীক্ষণ করিল, তারপর ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'নৃপেনবাবু কোথায়?'

এতক্ষণ নৃপেনের দিকে কাহারও নজর ছিল না, সে আবার নিঃসাড়ে অদৃশ্য হইয়াছে।

ব্যোমকেশ আমাকে চোখের ইশারা করিল। আমি নৃপেনের ঘরের দিকে পা বাড়াইয়াছি এমন সময় সে নিজেই ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'এই যে আমি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'আমি—একবার ছাতে গিয়েছিলাম।' নৃপেনের মুখ দেখিয়া মনে হয় সে কোনও কারণে নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ছাতে! তেতলার ছাতে?'

'না, দোতলাতেই ছাত আছে।'

'তাই নাকি? চলুন তো দেখি কেমন ছাত।'

যে গলি দিয়া নৃপেনের ঘরে যাইবার রাস্তা তাহারই শেষ প্রান্তে একটি দ্বার; দ্বারের ওপারে ছাত। আলিসা দিয়া ঘেরা দাবার ছকের মত একটু স্থান। পিছন দিকে অন্য একটি বাড়ির দেয়াল, পাশে গলির পরপারে অনাদি হালদারের নূতন বাড়ি।

ছাতে দাঁড়াইয়া নূতন বাঁড়ির কাঠামো স্পষ্ট দেখা যায়, এমন কি দীর্ঘ-লম্ফের অভ্যাস থাকিলে এ বাড়ি হইতে ও বাড়িতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। নূতন বাড়ির দেয়াল দোতলার ছাত পর্যন্ত উঠিয়াছে, সর্বাঙ্গে ভারা বাঁধা।

আলিসার ধারে ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'ছাতের দরজা রাত্তিরে খোলা থাকে?'

নৃপেন বলিল, 'খোলা থাকবার কথা নয়, কর্তা রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে নিজের হাতে দরজা বন্ধ করতেন।'

'কাল রাত্রে বন্ধ ছিল?'

'তা জানি না।'

'আপনি খানিক আগে যখন এসেছিলেন তখন খোলা ছিল, না, বন্ধ ছিল?'

নৃপেন আকাশের দিকে তাকাইয়া গলা চুলকাইল, শেষে বলিল, 'কি জানি, মনে করতে পারছি না। মনটা অন্যদিকে ছিল--'

'হুঁ।'

আমরা ঘরে ফিরিয়া গেলাম। ননীবালা দেবী তখনও সর্বহারা ভঙ্গীতে মেঝেয় পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, প্রভাত মৃদুকণ্ঠে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছে। কেষ্টবাবু বিলম্বিত চায়ের পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া নামাইয়া রাখিয়াছেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'পুলিসের এখনও দেখা নেই। আমরা এবার যাই।- এস অজিত, যাবার আগে চাবিটা যথাস্থানে রেখে দেওয়া দরকার, নইলে পুলিস এসে হাঙ্গামা করতে পারে।'

ব্যালকনিতে গেলাম। মাছিরা দেহটাকে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। ব্যোমকেশ নত হইয়া চাবিটা মৃতের কোমরে ঘুনসিতে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল, 'ওহে অজিত, দ্যাখো।'

আমি ঝুঁকিয়া দেখিলাম কোমরের সুতার কাছে একটা দাগ, আধুলির মত আয়তনের লাল্চে একটা দাগ, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিসের দাগ?'

ব্যোমকেশ দাগের উপর আঙুল বুলাইয়া বলিল, 'রক্তের দাগ মনে হয় কিন্তু রক্ত নয়। জড়ুল।'

মৃতদেহ ঢাকা দিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা চললাম। পুলিস এসে যা-যা প্রশ্ন করবে তার উত্তর দেবেন, বেশী কিছু বলতে যাবেন না। আমি যে আলমারি খুলে দেখেছি তা বলবার দরকার নেই। নিমাই নিতাই যদি আসে তাদের বাড়ি ঢুকতে দেবেন না।—কেষ্টবাবু, ওবেলা একবার আমাদের বাসায় যাবেন।'

কেষ্টবাবু ঘাড় কাত করিয়া সম্মতি জানাইলেন। আমরা নীচে নামিয়া চলিলাম। সূর্য উঠিয়াছে, শহরের সোরগোল শুরু হইয়া গিয়াছে।

আট

নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম সিঁড়ির ঘরে বৃদ্ধ ষষ্ঠীবাবু থেলো হুঁকা হাতে বিচরণ করিতেছেন, আমাদের দেখিয়া বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিলেন। প্রথম দিন তাঁহার যে উগ্রমূর্তি দেখিয়াছিলাম এখন আর তাহা নাই, বরং বেশ একটু সাগ্রহ কৌতূহলের ব্যঞ্জনা তাঁহার তোবড়ানো মুখখানিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ব্যোমকেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনার নাম ষষ্ঠীবাবু?'

তিনি সতর্কভাবে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিলেন, 'হ্যাঁ। আপনি - আপনারা - ?'

ব্যোমকেশ আত্মপরিচয় দিল না, সংক্ষেপে বলিল, 'আর বলবেন না মশায়ঃ অনাদি হালদারের কাছে টাকা পাওনা ছিল, তা দেখছি টাকাটা ডুবল। লোকটা মারা গেছে শুনেছেন বোধ হয়।'

ষষ্ঠীবাবুর সন্দিগ্ধ সতর্কতা দূর হইল। তিনি পরম তৃপ্তমুখে বলিলেন 'শুনেছি। কাল রাত্তির থেকেই শুনছি।—কিসে মারা গেল?' শেষোক্ত প্রশ্ন তিনি গলা বাড়াইয়া প্রায় ব্যোমকেশের কানে কানে করিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'শোনেননি? কেউ তাকে খুন করেছে। —আপনি তো কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় বসে ছিলেন শুনলাম '

মুখে বিরক্তিসূচক চুমকুড়ি দিয়া ষষ্ঠীবাবু বলিলেন, 'কি করি, পাড়ার ছোঁড়াগুলো ঠিক বাড়ির সামনেই বাজি পোড়াতে শুরু করল। ওই দেখুন না, কত তুবড়ির খোল পড়ে রয়েছে। শুধু কি তুবড়ি! চীনে পটকা দোদমার আওয়াজে কান ঝালাপালা। ভাবলাম ঘুম তো আর হবে না, বাজি পোড়ানোই দেখি।—তা কি করে খুন হল? ছোরা-ছুরি মেরেছে নাকি?'

ব্যোমকেশ প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া বলিল, 'তাহলে আপনি সন্ধ্যের পর থেকে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় বসে ছিলেন। সে সময়ে কেউ অনাদি হালদারের কাছে এসেছিল?'

'কেউ না। একেবারে রাত বারোটার পর ওই ছেলেটা আর তার মা এল, এসেই দোর ঠ্যাঙাতে শুরু করল। তারপর এল ন্যাপা। তারপর কেষ্ট দাস।'

'ইতিমধ্যে আর কেউ আসেনি?'

'বাড়িতে কেউ ঢোকেনি। তবে—অনাদি হালদারের একটা ভাইপোকে একবার ওদিকে ফুটপাথের হোটেলের সামনে ঘুর-ঘুর করতে দেখেছি।'

'তাই নাকি? তারপর?'

'তারপর আর দেখিনি। অন্তত এ বাড়িতে ঢোকেনি।'

'ক'টার সময় তাকে দেখেছিলেন?'

'তা কি খেয়াল করেছি। তবে গোড়ার দিকে তখনও হোটেলের দোতলায় বাবুরা জানলার ধারে বসে পাশা খেলছিল। দশটা কি সাড়ে দশটা হবে।—আচ্ছা,

কে মেরেছে কিছু জানা গেছে নাকি?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ হেঁটমুখে চিন্তা করিল, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'অনাদি হালদারের সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল?'

ষষ্ঠীবাবু চমকিয়া উঠিলেন, 'অ্যাঁ! সদ্ভাব, মানে, অসদ্ভাবও ছিল না।'

'আপনি কাল রাত্রে ওপরে যাননি?'

'আমি! আমি ওপরে যাব! বেশ লোক তো আপনি? মতলব কি আপনার?' ষষ্ঠীবাবু ক্রমশ তেরিয়া হইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

'অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে আপনি জানেন না?'

'আমি কি জানি! যে খুন করেছে সে জানে, আমি কি জানি। আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই! আমি বুড়ো মানুষ, কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই, আমাকে ফাঁসাতে চান?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া ফেলিল, 'আমি আপনাকে ফাঁসাতে চাই না, আপনি নিজেই নিজেকে ফাঁসাচ্ছেন। অনাদি হালদারের মৃত্যুতে এত খুশী হয়েছেন যে চেপে রাখতে পারছেন না।—চল অজিত, ওই হোটেলটাতে গিয়ে আর এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক।'

ষষ্ঠীবাবু থ হইয়া রহিলেন, আমরা ফুটপাথে নামিয়া আসিলাম। রাস্তার ওপারে হোটেলের মাথার উপর মস্ত পরিচয়-ফলক, শ্রীকান্ত পান্থনিবাস। শ্রীকান্ত বোধহয় হোটেলের মালিকের নাম। নীচের তলায় রেস্তোরাঁয় চা-পিয়াসীর দল বসিয়া গিয়াছে, দ্বিতলে জানালার সারি, কয়েকটা খোলা। ব্যোমকেশ পথ পার হইবার জন্য পা বাড়াইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল, বলিল, 'দাঁড়াও, গলির মধ্যেটা একবার দেখে যাই।'

'গলির মধ্যে কী দেখবে?'

'এসই না।'

অনাদি হালদারের বাসা ও নূতন বাড়ির মাঝখান দিয়া গলিতে প্রবেশ করিলাম। একেই গলিটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত, তার উপর নূতন বাড়ির স্খলিত বিক্ষিপ্ত ইট-সুরকি এবং ভারা বাঁধার খুঁটি মিলিয়া তাহাকে আরও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। ব্যোমকেশ মাটির দিকে নজর রাখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

গলিটি কানা গলি, বেশি দূর যায় নাই। তাহার শেষ পর্যন্ত গিয়া ব্যোমকেশ ফিরিল, আবার মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চলিতে লাগিল। তারপর অনাদি হালদারের বাসার পাশে পৌঁছিয়া হঠাৎ অবনত হইয়া একটা কিছু তুলিয়া লইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি পেলে?'

সে মুঠি খুলিয়া দেখাইল, একটি চকচকে নূতন চাবি। বলিলাম, 'চাবি! কোথাকার চাবি?'

ব্যোমকেশ একবার ঊর্ধ্বে জানালার দিকে চাহিল, চাবিটি পকেটে রাখিয়া বলিল, 'হলফ নিয়ে বলতে পারি না, তবে সন্দেহ হয় অনাদি হালদারের আলমারির চাবি।'

'কিন্তু—'

'আন্দাজ করেছিলাম গলির মধ্যে কিছু পাওয়া যাবে। এখন চল, চা খাওয়া যাক।'

'কিন্তু, আলমারির চাবি তো—'

'অনাদি হালদারের কোমরে আছে। তা আছে। কিন্তু আর একটা চাবি থাকতে বাধা কি?'

'কিন্তু, গলিতে চাবি এল কি করে?'

'জানলা দিয়ে।—এস।' ব্যোমকেশ আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

শ্রীকান্ত পান্থনিবাসে প্রবেশ করিয়া একটি টেবিলে বসিলাম। ভৃত্য চা ও বিস্কুট দিয়া গেল। ভৃত্যকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল হোটেলের মালিক শ্রীকান্ত গোস্বামী পাশেই একটি ঘরে আছেন। চা বিস্কুট সমাপ্ত করিয়া আমরা নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকিলাম।

ঘরটি শ্রীকান্তবাবুর অফিস মাঝখানে টেবিল ও কয়েকটি চেয়ার। শ্রীকান্তবাবু মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, চেহারা গোলগাল, মুণ্ডিত মুখ, বৈষ্ণবোচিত প্রশান্ত ভাব। তিনি গত রাত্রির বাসি ফাউল কাটলেট সহযোগে চা খাইতেছিলেন আমাদের আকস্মিক আবির্ভাবে একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

ব্যোমকেশ সবিনয়ে বলিল, 'মাফ করবেন, আপনিই কি হোটেলের মালিক শ্রীকান্ত গোস্বামী মশায়

গোস্বামী মহাশয়ের মুখ ফাউল কাটলেটে ভরা ছিল তিনি এক চুমুক চা খাইয়া কোনও মতে তাহা গলাধঃকরণ করিলেন বলিলেন আসুন। আপনারা

ব্যোমকেশ বলিল 'একটু দরকারে এসেছি। সামনের বাড়িতে কাল রাত্রে খুন হয়ে গেছে শুনেছেন বোধহয়?'

'খুন! শ্রীকান্তবাবু ফাউল কাটলেটের প্লেট পাশে সরাইয়া দিলেন কে খুন হয়েছে?'

'১৭২।২ নম্বর বাড়িতে থাকত অনাদি হালদার।

শ্রীকান্তবাবু চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন অনাদি হালদার খুন হয়েছে! বলেন কি!

'তাকে আপনি চিনতেন?'

'চিনতাম বৈকি। সামনের বাড়ির দোতলায় থাকত নতুন বাড়ি তুলছিল। প্রায়ই আমার হোটেলে এসে চপ কাটলেট খেত। কাল রাত্তিরেও যে তাকে দেখেছি।'

'তাই নাকি! কোথায় দেখলেন?'

'ওর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বাস্তার বাজি পোড়ানো দেখছিল। যখনই জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছি তখনই দেখেছি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যোমকেশ বলিল কখন কোথা থেকে কি দেখলেন সব কথা দয়া করে বলুন। আমি অনাদি হালদারের খুনের তদন্ত করছি। আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী।'

শ্রীকান্ত বিস্ময়াপ্লুত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন 'আপনি ব্যোমকেশবাবু! কি সৌভাগ্য।' তিনি ভৃত্য ডাকিয়া আমাদের জন্য চা ও ফাউল কাটলেট হুকুম দিলেন। আমরা এইমাত্র চা বিস্কুট খাইয়াছি বলিয়াও পরিত্রাণ পাওয়া গেল না।

তারপর শ্রীকান্তবাবু বলিলেন 'আমার হোটেলের দোতলায় দুটো ঘর নিয়ে

আমি থাকি, বাকি তিনটে ঘরে কয়েকজন ভদ্রলোক মেস করে আছেন। সবসুদ্ধ এগারজন। তাঁর মধ্যে তিনজন কালীপুজোর ছুটিতে দেশে গেছেন, বাকি আটজন বাসাতেই আছেন। কাল সন্ধ্যের পর ১ নম্বর আর ৩ নম্বর ঘরের বাবুরা ঘরে তালা দিয়ে শহরে আলো দেখতে বেরুলেন। ২ নম্বর ঘরের যামিনীবাবুরা তিনজন বাসাতেই রইলেন। ওঁদের খুব পাশা খেলার শখ। আমিও খেলি। কাল সন্ধ্যে সাতটার পর ওঁরা আমাকে ডাকলেন, আমরা চারজন যামিনীবাবুর তক্তপোশে পাশা খেলতে বসলাম। যামিনীবাবুর তক্তপোশ ঠিক রাস্তার ধারে জানলার সামনে। সেখানে বসে খেলতে খেলতে যখনই বাইরের দিকে চোখ গেছে তখনই দেখেছি অনাদি হালদার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বাজি পোড়ানো দেখছে। আমরা তিন দান খেলেছিলাম, প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত খেলা চলেছিল।'

'তারপর আর অনাদি হালদারকে দেখেননি?'

'না, তারপর আমরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম, অনাদি হালদারকে আর দেখিনি।'

'যে বাবুরা আলো দেখতে বেরিয়েছিলেন তাঁরা কখন ফিরলেন?'

'তাদের মধ্যে দু'জন ফিরেছিলেন রাত বারোটার সময়, বাকি বাবুরা এখনও ফেরেননি।'

'এখনও আলো দেখছেন।'

শ্রীকান্তবাবু অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, মনুষ্য জাতির ধাতুগত দুর্বলতা সম্বন্ধে বোধকরি নীরবে খেদ প্রকাশ করিলেন।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে কাটলেট চিবাইল, তারপর বলিল, 'দেখুন, অনাদি হালদারের লাশ পাওয়া গেছে ওই ব্যালকনিতেই, বুকে বন্দুকের গুলি লেগে পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। তা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে আপনার হোটেল থেকে কেউ বন্দুক ছুঁড়ে অনাদি হালদারকে মেরেছে।'

শ্রীকান্তবাবু আবার চক্ষু কপালে তুলিলেন—'আমার হোটেল থেকে! সে কি কথা! কে মারবে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা আন্দাজ মাত্র। আপনি বলছেন সন্ধ্যে সাতটা থেকে আপনারা চারজন ছাড়া দোতলায় আর কেউ ছিল না। এ বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ?'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন, 'মেসের বাসিন্দা আর কেউ ছিল না এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তবে- দাঁড়ান। একটা চাকর দোতলার কাজকর্ম করে, সে বলতে পারবে। হরিশ! ওরে কে আছিস হরিশকে ডেকে দে।'

কিছুক্ষণ পরে হরিশ আসিল, ছিটের ফতুয়া পরা আধ-বয়সী লোক। শ্রীকান্তবাবু বলিলেন, 'কাল সন্ধ্যে থেকে তুই কোথায় ছিলি?'

হরিশ বলিল, 'আজ্ঞে, ওপরেই তো ছিলুম বাবু, সারাক্ষণ সিঁড়ির গোড়ায় বসেছিলুম। আপনারা শতরঞ্চি খেলতে বসলেন—'

'কতক্ষণ পর্যন্ত ছিলি?'

'আজ্ঞে, রাত দুপুরে ধীরুবাবু আর মানিকবাবু ফিরলেন, তখন আমি সিঁড়ির পাশেই কম্বল পেতে শুয়ে পড়লুম। কোথাও তো যাইনি বাবু।'

শ্রীকান্তবাবু ব্যোমকেশের দিকে তাকাইলেন, ব্যোমকেশ হরিশকে প্রশ্ন করিল,

'বাবুরা পাশা খেলতে আরম্ভ করবার পর থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তুমি সারাক্ষণ সিঁড়ির কাছে বসেছিলে, একবারও কোথাও যাওনি?'

হরিশ বলিল, 'একবারটি পাঁচ মিনিটের জন্যে নীচে গেছলুম যামিনীবাবুর জন্যে দোক্তা আনতে।'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, যামিনীবাবু ওকে একবার দোক্তা আনতে পাঠিয়েছিলেন বটে।'

'সে কখন? ক'টার সময়?'

'আজ্ঞে, রাত্তির তখন ন'টা হবে।'

'হুঁ। রাত্রি ন'টা থেকে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত দোতলায় কেউ আসেনি?'

'দোতলায় কেউ আসেনি বাবু। দশটা ন্যগাদ তেতলার ভাড়াটে বাবু এসেছিলেন, কিন্তু তিনি দোতলায় দাঁড়াননি, সটান তেতলায় উঠে গেছলেন।'

ব্যোমকেশ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শ্রীকান্তবাবুর পানে চাহিল। তিনি বলিলেন, 'ওহো, তেতলার ভাড়াটের কথা বলা হয়নি। তেতলায় একটা ছোট ঘর আছে, চিলেকোঠা বলতে পারেন। এক ভদ্রলোক ভাড়া নিয়েছেন। ঘরে পাকাপাকি থাকেন না, খাওয়া-দাওয়াও করেন না। তবে রোজ সকাল-বিকেল আসেন, ঘরের মধ্যে দোর বন্ধ করে কি করেন জানি না, তারপর আবার তালা লাগিয়ে চলে যান। একটু অদ্ভুত ধরনের লোক।'

'নাম কি ভদ্রলোকের?'

'নাম? দাঁড়ান বলছি ' শ্রীকান্তবাবু একখানা বাঁধানো খাতা খুলিয়া দেখিলেন 'নিত্যানন্দ ঘোষাল।'

'নিত্যানন্দ ঘোষাল!' ব্যোমকেশ একবার আড়চোখে আমার পানে চাহিল—'রোজ দু'বেলা যখন আসেন তখন কলকাতার লোক বলেই মনে হচ্ছে। কতদিন আছেন এখানে?'

'প্রায় ছ' মাস। নিয়মিত ভাড়া দেন, কোনও হাঙ্গামা নেই।'

'কি রকম চেহারা বলুন তো?'

'মোটাসোটা গোলগাল।'

ব্যোমকেশ আবার আমার পানে কটাক্ষপাত করিয়া মুচকি হাসিল—'চেনা-চেনা ঠেকছে ' হরিশকে বলিল, 'নিত্যানন্দবাবু দশটা নাগাদ এসেছিলেন? তোমার সঙ্গে কোনও কথা হয়েছিল?'

হরিশ বলিল, 'আজ্ঞে না, উনি কথাবার্তা বলেন না। ব্যাগ হাতে সটান তেতলায় উঠে গেলেন।'

'ব্যাগ!'

'আজ্ঞে। উনি যখনই আসেন সঙ্গে চামড়ার ব্যাগ থাকে।'

'তাই নাকি! কত বড় ব্যাগ?'

'আজ্ঞে, লম্বা গোছের ব্যাগ; সানাই বাঁশী রাখার ব্যাগের মত।'

'ক্ল্যারিওনেট রাখার ব্যাগের মত? ভদ্রলোক তেতলার ঘরে নিরিবিলি বাঁশী বাজানো অভ্যেস করতে আসেন নাকি?'

'আজ্ঞে, কোনও দিন বাজাতে শুনিনি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল। তারপর মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, 'কাল রাত্রে উনি কখন ফিরে গেলেন?'

'ঘণ্টাখানেক পরেই। খুব ব্যস্তসমস্তভাবে তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।'

'ও!—আচ্ছা, তুমি এবার যেতে পারো।' হরিশ শূন্য পেয়ালা প্লেট প্রভৃতি লইয়া প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ শ্রীকান্তবাবুকে বলিল, 'ওপরতলাগুলো একবার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। আপত্তি আছে কি?'

'বিলক্ষণ, আপত্তি কিসের? আসুন।' শ্রীকান্তবাবু আমাদের উপরতলায় লইয়া চলিলেন।

দ্বিতলে পাশাপাশি পাঁচটি বড় বড় ঘর, সামনে টানা বারান্দা। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই প্রথম দুটি ঘর শ্রীকান্তবাবুর। দ্বারে তালা লাগানো ছিল। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি একলা থাকেন?'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন, 'আপাতত একলা। স্ত্রীকে ছেলেপুলে নিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। যা দিনকাল।'

'বেশ করেছেন।'

এক নম্বর ঘরে তালা লাগানো, বাবুরা এখনও ফেরেন নাই। দু' নম্বর ঘরে তিনটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক রহিয়াছেন। একজন মেঝেয় বসিয়া জুতা পালিশ করিতেছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দাড়ি কামাইতেছেন, তৃতীয় ব্যক্তি খোলা জানালার ধারে বিছানায় কাত হইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। জানালা দিয়া রাস্তার ওপারে অনাদি হালদারের বাসা সোজাসুজি দেখা যাইতেছে। ব্যালকনির ভিতর দৃষ্টি প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঢালাই লোহার ঘন রেলিং এর ভিতর দিয়া কিছু দেখা গেল না।

তিন নম্বর ঘরে ধীরুবাবু ও মানিকবাবু সবেমাত্র বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন এবং তুড়ি দিয়া হাই তুলিতেছেন। শ্রীকান্তবাবু সহাস্যে বলিলেন 'কী ঘুম ভাঙল?'

দুজনে বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া আড়মোড়া ভাঙিলেন।

ব্যোমকেশ কাহাকেও কোনও প্রশ্ন করিল না, দ্বিতল পরিদর্শন করিয়া সিঁড়ির দিকে ফিরিয়া চলিল। একই সিঁড়ি ত্রিতলে গিয়াছে, তাহা দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। শ্রীকান্তবাবু ও আমি পিছনে রহিলাম।

ত্রিতলে একটি ঘর, বাকি ছাদ খোলা। ঘরের দরজায় তালা লাগানো।

ব্যোমকেশ শ্রীকান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার কাছে চাবি আছে নাকি?'

'না। তবে—' তিনি পকেট হইতে চাবির একটা গোছা বাহির করিয়া বলিলেন, 'দেখুন যদি কোন চাবি লাগে। ভাড়াটের অবর্তমানে তার ঘর খোলা বোধহয় উচিত নয়, কিন্তু বর্তমান অবস্থায়

চাবির গোছা লইয়া ব্যোমকেশ কয়েকটা চাবি লাগাইয়া দেখিল। সস্তা তালা, বেশী চেষ্টা করিতে হইল না, খুট করিয়া খুলিয়া গেল।

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরের একটিমাত্র জানালা রাস্তার দিকে খোলা রহিয়াছে। আসবাবের মধ্যে একটি উলঙ্গ তক্তপোশ ও একটি লোহার চেয়ার। আর কিছু নাই।

ব্যোমকেশ কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া প্রথমেই জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। নীচে প্রশস্ত রাস্তার উপর মানুষ ও যানবাহনের স্রোত বহিয়া

চলিয়াছে। ওপারে অন্যান্য বাড়ির সারির মধ্যে অনাদি হালদারের ব্যালকনি।

ব্যোমকেশ সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া কতকটা আপন মনেই বলিল, 'কাল রাত্রি আন্দাজ এগারোটার সময়...রাস্তায় ছেলেরা বাজি পোড়াচ্ছে.......চারিদিকে দুমদাম শব্দ—অনাদি হালদার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বাজি পোড়ানো দেখছে. সেই সময় জানলা থেকে তাকে গুলি করা কি খুব শক্ত? গুলির আওয়াজ শোনা গেলেও বোমা ফাটার আওয়াজ বলেই মনে হবে।'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন, 'তা বটে। কিন্তু হোটেলে এত লোকের চোখে ধুলো দিয়ে বন্দুক আনা কি সহজ?'

'আপনার ভাড়াটে হাতে ব্যাগ নিয়ে হোটেলে আসে। ব্যাগের মধ্যে একটা পিস্তল কিম্বা রিভলবার সহজেই আনা যায়।'

'কিন্তু রাইফেল কিম্বা বন্দুক আনা যায় কি? আমাকে মাফ করবেন, আমি অদ্বৈত বংশের সন্তান, গোলাগুলি বন্দুক পিস্তলের ব্যাপার কিছুই বুঝি না। তবু মনে হয়, পিস্তল কিংবা রিভলবার দিয়ে এতদূর থেকে মানুষ মারা সহজ কাজ নয়।'

উত্তরে ব্যোমকেশ কেবল গলার মধ্যে একটা শব্দ করিল। তারপর নিরাভরণ ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, 'চলুন, যাওয়া যাক, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম—' বলিতে বলিতে থামিয়া গেল। দেখিলাম তাহার দৃষ্টি দেয়ালের একটা স্থানে আটকাইয়া গিয়াছে।

জানালার ঠিক উল্টা পিঠে দেয়ালের ছাদের কাছে খানিকটা চুন বালি খসিয়া গিয়াছে। তাহার নীচে মেঝের উপর খসিয়া-পড়া চুন বালি পড়িয়া আছে। ব্যোমকেশ ত্বরিতে গিয়া চুন বালি পরীক্ষা করিল. বলিল, 'নতুন খসেছে মনে হচ্ছে। শ্রীকান্তবাবু, এ ঘর রোজ ঝাঁটপাট দেওয়া হয়?'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন, 'না। ঘর খোলা থাকে না—'

ব্যোমকেশ দু' পা সরিয়া আসিয়া ঊর্ধ্ব মুখে চাহিয়া রহিল।

'দেয়ালের এই চুন-বালি কবে খসেছে আপনি বলতে পারেন না?'

'না। এইটুকু বলতে পারি, ছ' মাস আগে যখন ঘর ভাড়া দিয়েছিলাম তখন প্ল্যাস্টার ঠিক ছিল।'

'হুঁ। অজিত, চৌকিটা ধরতো, একবার দেখি'

দুজনে চৌকি ধরিয়া দেয়াল ঘেঁষিয়া রাখিলাম; তাহার উপর লোহার চেয়ার রাখিয়া ব্যোমকেশ তদুপরি আরোহণ করিল। সেখান হইতে হাত বাড়াইয়া দেয়ালের ক্ষতস্থানটার নাগাল পাওয়া যায়। ব্যোমকেশ আঙুল দিয়া স্থানটা হাতড়াইল, তারপর একটি ক্ষুদ্র বস্তু হাতে লইয়া নামিয়া আসিল। পেন্সিলের ক্যাপের মত লম্বাটে আকৃতির একটি ধাতব পদার্থ, তাহার গায়ে রাইফেলের পেঁচানো রেখাচিহ্ন।

রাইফেলের টোটা। ব্যোমকেশ সেটি ঘুরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, 'এ বস্তু এখানে এল কি করে? কবে এল?- ঘরের মধ্যে কেউ রাইফেল ছুঁড়েছিল? কিম্বা -' ব্যোমকেশ জানালার দিকে চাহিল, 'অনাদি হালদার যদি ব্যালকনি থেকে জানালা লক্ষ্য করে রাইফেল ছুঁড়ে থাকে তাহলে গুলিটা দেয়ালের ওই জায়গায় লাগা সম্ভব। অথবা –

বাসায় ফিরিতে দেরি হইল। রাত্রি সাড়ে তিনটা হইতে বেলা সাড়ে আটটা পর্যন্ত কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গিয়াছে জানিতে পারি নাই।

ফিরিয়া আসিয়াই ব্যোমকেশ খবরের কাগজ লইয়া বসিয়া গেল। আমি কয়েকবার অনাদি-প্রসঙ্গ আলোচনার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে গায়ে মাখিল না। একবার অন্যমনস্কভাবে চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, 'আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ?'

আমি রাগ করিয়া নিরুত্তর হইলাম। কুক্ষণে খোকাকে একখানি আবোল-তাবোল কিনিয়া দিয়াছিলাম, ব্যোমকেশ বইখানি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে এবং সময়ে অসময়ে তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছে।

গত রাত্রে নিদ্রার ঘাটতি পড়িয়াছিল, দুপুর বেলা তাহা পূরণ করিয়া লইলাম। বৈকালে চা পান করিতে বসিয়া ব্যোমকেশ নিজেই কথা পাড়িল, 'কেষ্টবাবুর এখনও দেখা নেই। মনে হচ্ছে সবাই গা এলিয়ে দিয়েছে।'

বলিলাম, 'কেষ্টবাবুর যখন গলায় কাঁটা বিঁধেছিল, তখন ছুটে এসেছিল। এখন বোধহয় কাঁটা বেরিয়ে গেছে তাই গা-ঢাকা দিয়েছে।'

'তাই হবে। কিন্তু ওরা যদি না আসে, আমিই বা কি করতে পারি। কেসটা বেশ রহস্যময়—'

'কে খুন করেছে এখনও বুঝতে পারনি?'

'উঁহু। কিন্তু যেই করুক, খুব ভেবেচিন্তে আটঘাট বেঁধে করেছে। কালীপুজোর রাত্তির, চতুর্দিকে বোমা ফাটার শব্দ, তার মধ্যে একটি বন্দুকের আওয়াজ। প্ল্যান করে খুন না করলে এমন যোগাযোগ হয় না।'

'কে এমন প্ল্যান করতে পারে?

'কে না করতে পারে। সকলেরই স্বার্থ রয়েছে, সকলেরই সুযোগ রয়েছে।'

'সকলে কারা?'

'একে একে ধর। প্রথমে ধর নিমাই নিতাই। খুড়ো পুষ্যিপুত্তুর নিলেই খুড়োর সম্পত্তি বেহাত হয়ে যায়, অতএব খুড়োকে পুষ্যিপুত্তুর নেবার আগেই সবানো দরকার। নিমাই নিতাইয়ের মধ্যে একজন শ্রীকান্ত হোটেলের চূড়োয় আড্ডা গাড়ল, বন্দুক নিয়ে ওত পেতে রইল। কালীপুজোর রাত্রে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে বন্দুকে গুলি ছুটল। খুড়ো কুপোকাৎ। কাম ফতে।'

'তাহলে ভাইপোরাই খুন করেছে, অন্য কারুর ওপর সন্দেহের কারণ নেই।'

'কারণ যথেষ্ট আছে। শ্রীকান্ত হোটেলের তেতলার ঘরে রাইফেলের গুলি এল কোথা থেকে? ওই ঘর থেকে বন্দুক ছোঁড়া হয়েছিল এটা একটা অনুমান বটে, কিন্তু অনিবার্য অনুমান নয়। ভেবে দেখ, অনাদি হালদার ব্যালকনিতে যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তার পেছনেই দরজা। পিছন থেকে গুঁড়ি মেরে এসে কেউ যদি তাকে গুলি করে, তাহলে গুলিটা তার শরীর ফুঁড়ে শ্রীকান্ত হোটেলের তেতলার ঘরের জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকবে এবং দেয়ালে আটকে যাবে।'

'সম্ভব বটে। কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ। অনাদি হালদারের বাসায় সে ছাড়া আর কেউ ছিল না, দরজা ভিতর দিক থেকে বন্ধ ছিল। তাছাড়া আর একটা কথা, গুলিটা অনাদি হালদারের বুকের দিক দিয়ে ঢুকে পিঠের দিক দিয়ে

বেরিয়েছিল, না পিঠের দিক দিয়ে ঢুকে বুকের দিক দিয়ে বেরিয়েছিল?'

'সেটা পোস্ট-মর্টেম না হওয়া পর্যন্ত জানা যাবে না। কিন্তু যেদিক দিয়েই গুলি ঢুকুক, ব্যালকনিতে গুলিটা পাওয়া যায়নি। তা থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, বাসার ভিতর দিক থেকেই অনাদি হালদারকে গুলি করা হয়েছে।'

'আচ্ছা, তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যাক যে, বাসার ভিতর থেকেই কেউ গুলি চালিয়েছে। কিন্তু লোকটা কে?'

'সেইটেই আসল প্রশ্ন। দেখা যাক কার স্বার্থ আছে। কেষ্ট দাসের কোনও স্বার্থ আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। কিন্তু লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত এবং পাজি, হয়তো দোষ কাটাবার জন্যেই শেষ রাত্রে আমার কাছে ছুটে এসেছিল। সুতরাং তাকেও বাদ দেওয়া যায় না। দ্বিতীয় হল ননীবালা দেবী।'

'ননীবালা!'

'ননীবালা দেবীটি জবরদস্ত মহিলা। পালিত পুত্রের প্রতি তাঁর স্নেহ খাঁটি মাতৃস্নেহের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। তিনি জানতেন না যে প্রভাতের পোষ্যপুত্র গ্রহণের ব্যাপারে আইনঘটিত খুঁত আছে। সুতরাং তিনি ভাবতে পারেন যে অনাদি হালদারকে সরাতে পারলেই প্রভাত সম্পত্তি পাবে। এবং তাকে মারবার চেষ্টা আর কেউ করবে না। তোমার মনে আছে কিনা জানি না, ননীবালা যেদিন দ্বিতীয়বার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, সেদিন আমি বলেছিলাম, অনাদি হালদারের মৃত্যুতে অনেকের সুবিধে হতে পারে। হয়তো সেই কথাটাই ননীবালার প্রাণে গেঁথে গিয়েছিল।'

'কিন্তু মেয়েমানুষ বন্দুক চালাবে?'

'কেন চালাবে না? বন্দুক চালানোর মধ্যে শক্তটা কোন্‌খানে? হারমোনিয়াম যেমন টিপলেই সুর বেরোয়, বন্দুক তেমনি টিপলেই গুলি বেরোয়। ওর চেয়ে কুমড়ো-ছেঁচকি রাঁধা ঢের বেশী কঠিন কাজ।'

'কিন্তু ননীবালা তো 'জয় মাকালী' দেখছিলেন।'

'তিনি 'জয় মাকালী' দেখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সারাক্ষণ প্রেক্ষাগৃহে ছিলেন, তার প্রমাণ কৈ? তাঁর সঙ্গে পরিচিত কেউ ছিল না, হয়তো ছবি আরম্ভ হবার পর তিনি অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়েছিলেন, তারপর কাজকর্ম সেরে আবার গিয়ে বসেছিলেন।'

'তিনি বন্দুক কোথায় পেলেন?'

'হায় মূর্খ! বাঁটুল সর্দারের মত গণ্ডাগণ্ডা গুণ্ডা যেখানে চোরাই বন্দুক পাচার করবার জন্যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, সেখানে বন্দুকের অভাব? পাঁচ টাকা খরচ করলে বন্দুক ভাড়া পাওয়া যায়।'

'হুঁ। তারপর?'

'তারপর প্রভাত। প্রভাত অবশ্য জানত যে সে অনাদি হালদারের পুষ্যিপুত্তুর নয়, কিন্তু তার অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তার নিজস্ব দোকান আছে, অনাদি হালদার মরে গেলেও তার মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। সে ভাবতে পারে অনাদি হালদারের মৃত্যুর পর তার ভাইপো'রা আর তার কোনও অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে না। ভাইপোদের হাত থেকে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই হয়তো সে অনাদি হালদারকে মেরেছে।'

'এটা খুব জোরালো মোটিভ তুমি মনে কর?'

'খুব জোরালো মোটিভ না হতে পারে, কিন্তু তিল কুড়িয়ে তাল হয়। প্রভাত একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, অনাদি হালদার সে সম্বন্ধ ভেঙে দেয়। এটাও সামান্য মোটিভ নয়।'

আমি হাসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'হেসো না। তোমার কাছে যা তুচ্ছ, অন্যের কাছে তা পর্বতপ্রমাণ হতে পারে। কখনও প্রেমে পড়নি, প্রেম কি বস্তু জান না। প্রেমের জন্যে মানুষ খুন করতে পারে, ফাঁসি যেতে পারে, সর্বস্ব খোয়াতে পারে—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, মেনে নিলাম প্রভাতও খুন করতে পারে।'

'তবে একটা কথা আছে। প্রভাত সারাক্ষণ তার দোকানে ছিল, দোকানের দরজায় গুর্খা দরোয়ান ছিল। তার এই অ্যালিবাই যদি পাকা হয়'

'পাকা হওয়াই সম্ভব। প্রভাত এমন মিথ্যে কথা বলবে না যা সহজেই ধরা যায়। তারপর বল।'

'তারপর ন্যাপা।' ব্যোমকেশ পকেট হইতে কুড়াইয়া পাওয়া চাবিটি বাহির করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল, 'দুটো খবর নিশ্চয়ভাবে জানা দরকার ঃ এটা অনাদি হালদরের চাবি কি না এবং এটা গলিতে কে ফেলেছিল।'

বলিলাম, 'ন্যাপার ওপরই তোমার সন্দেহ, কেমন? মনে করা যাক, এটা অনাদি হালদারের আলমারির চাবি এবং ন্যাপা এটা গলিতে ফেলেছিল। তাতে কী প্রমাণ হয়?'

'প্রমাণ হয়তো কিছুই হয় না, কিন্তু ন্যাপার ওপর সন্দেহ হয়। আলমারিতে হয়তো অনেক নগদ টাকা ছিল'

এ আবার এক নূতন সম্ভাবনা। প্রশ্ন করিলাম, 'দাঁড়ালো কি? আসামী কে? নিমাই নিতাই? কেষ্টবাবু? ননীবালা? প্রভাত? ন্যাপা? না আর কেউ?'

'আর একজন হতে পারে।'

'আবার কে?'

'বাঁটুল সর্দার।'

'বাঁটুল! সে কেন অনাদি হালদারকে খুন করবে?'

'প্রাণরক্ষার ওজুহাতে চাঁদা আদায় করা বাঁটুলের পেশা। অনাদি হালদার চাঁদা দেওয়া বন্ধ করেছিল। তার দেখাদেখি যদি অন্য সকলে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে? তাই অনাদি হালদারকে শাস্তি দেওয়া দরকার, তার পরিণাম দেখে অন্য সকলে শায়েস্তা থাকবে।'

পুঁটিরাম আসিয়া চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইয়া গেল। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'বাঁশ বনে ডোম কানা। শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী কারে রেখে কারে ফেলি।'

দুইজনে নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলাম। ঘড়িতে যখন সওয়া চারটে, তখন দ্বারের কড়া নড়িয়া উঠিল।

দ্বার খুলিয়া দেখিলাম কেষ্টবাবু। শেষ পর্যন্ত কেষ্টবাবু আসিয়াছেন। কিন্তু এ কেষ্টবাবু সকাল বেলার ভয়বিমূঢ় মদ্যবিহ্বল কেষ্টবাবু নয়, চটপটে স্মার্ট কেষ্টবাবু। গায়ে ধোপদস্ত জামাকাপড়, দন্তুর মুখে আত্মপ্রসন্ন মৃদুমন্দ হাসি। মানুষটা যেন আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে।

তিনি ব্যোমকেশের সম্মুখের চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন। ব্যোমকেশ চাবিটি হাতে তুলিয়া ধরিয়া নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করিতেছিল, চোখ তুলিয়া বলিল, 'খবর কি? পুলিস এসেছিল?'

কেষ্টবাবু চাবিটি দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে-চোখে কোনও প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ পাইল না। প্রশ্নের উত্তরে তিনি মুখে চটকার শব্দ করিয়া বলিলেন, 'এগারোটার সময় এসেছিল। কী রামরাজত্বে বাস করছি আমরা।'

চাবি পকেটে রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তারপর কি হল?'

'কি আর হবে। দারোগা সকলকে হুমকি দিলে, অনাদির আলমারিটা খুলে দেখলে, একগোছা নোট ছিল পকেটে পুরলে, তারপর লাশ তুলে নিয়ে চলে গেল।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, 'আপনাদের কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে না?'

'কাল রাত্রে কে কোথায় ছিলাম জিজ্ঞেস করেছিল, আর কিছু নয়। একছত্র লিখেও নিলে না। দুম দুম করে এল, দুম দুম করে চলে গেল।'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক, অনাদি হালদারের বেশ সদ্গতি হল। কে মেরেছে তা জানা যাবে না, পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ভালই হল, আপনাদের ভুগতে হবে না।'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'ভাল যাদের হবার তাদের হল, আমার আর কি ভাল হল ব্যোমকেশবাবু? আমাকে বেশিদিন ওখানে টিকতে হবে না।'

'কেন?'

'ননীবালা পেছনে লেগেছে, আমাকে তাড়াতে চায়। এখন তো আর অনাদি নেই, মাগীর বিক্রম বেড়েছে। দেখুন না, বেরুবার সময় বললাম, এক পেয়ালা চা করে দেবে? তা মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠল, চা-টা এখন হবে না, দোকানে গিয়ে চা খাওগে।'

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আপনি এখন কি করবেন মনে করেছেন?'

'কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কাজকর্ম তো আর এ-বয়সে পোষাবে না।' বলিয়া কেষ্টবাবু দুই সারি দাঁত বাহির করিয়া হাসিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার বয়স এমন কী বেশি হয়েছে- কাজ করবার বয়স যায়নি।'

'কাজ করার অভ্যেস ছেড়ে গেছে, ব্যোমকেশবাবু। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, আজ উঠি তাহলে।' বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন।

'বসুন, বসুন, চা খেয়ে যান।'

কেষ্টবাবু আবার বসিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশ পুঁটিরামকে ডাকিয়া চা ও জলখাবার আনিতে বলিল।

কেষ্টবাবু হৃষ্টমুখে বলিলেন, 'আপনি ভদ্রলোক, তাই দরদ বুঝলেন। সবাই কি বোঝে? দুনিয়া স্বার্থপর, গলা টিপে না ধরলে কেউ কিছু দেয় না। অনাদি যে আমাকে একেবারে ডুবিয়া দিয়ে গেছে-' তিনি ব্যোমকেশের পানে আড়নয়নে চাহিলেন, 'চা খুবই ভাল জিনিস, তবে কি জানেন, আমার একটা বদ্অভ্যেস হয়ে গেছে, বিকেল বেলার দিকে শুধু চায়ে আর মৌতাত জমে না।'

বলিয়া হ্যা হ্যা করিয়া হাসিলেন।

ইঙ্গিতটা ব্যোমকেশ এড়াইয়া গেল। বলিল, 'পুলিস ছাড়া আর কেউ এসেছিল নাকি? নিমাই নিতাই?'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'নিমাই নিতাই আর আসেনি। তবে গুরুদত্ত সিং এসে খুব খানিকটা চেঁচামেচি করে গেল।'

'গুরুদত্ত সিং, কনট্রাকটর—'

'হ্যাঁ। পুলিস চলে যাবার পরই সে এসে হাজির। চেঁচাতে লাগল, আমি পঞ্চাশ হাজার টাকার কাজ করেছি, মোটে ত্রিশ হাজার পেয়েছি, আজ অনাদি হালদার দশ হাজার টাকা দেবে বলেছিল, সে মরে গেছে, এখন কে দেবে টাকা। আমি বললাম, বাপু, কে টাকা দেবে তা আমরা কি জানি। অনাদির ওয়ারিশের কাছে যাও, থানায় যাও, আদালতে যাও, এখান থেকে বিদেয় হও। যেতে কি চায়? অনেক কষ্টে বিদেয় করলাম।'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'অনাদি হালদার কনট্রাকটরকে আজ দশ হাজার টাকা দেবে বলেছিল ..কাল ছিল ব্যাঙ্ক-হলিডে, তার মানে পরশু ব্যাঙ্ক থেকে টাকা এনে রেখেছিল, অর্থাৎ—'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'ব্যাঙ্ক থেকে?'

'হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক থেকে ছাড়া অত টাকা কোথা থেকে আসবে?'

কেষ্টবাবু সুর পাল্টাইয়া বলিলেন, 'তা তো বটেই। আমি ওসব কিছু জানি না। আদাব ব্যাপারী, হ্যা হ্যা—'

ব্যোমকেশ তখন বলিল, 'ও কথা থাক। আপনি ওদের ঘরের লোক, নাড়ীর খবর রাখেন, কে খুন করেছে আন্দাজ করতে পারেন না?'

কেষ্টবাবু কিয়ৎকাল নতনেত্রে থাকিয়া চোখ তুলিলেন, 'আপনাকে ধম্মকথা বলব, বাড়ির কেউ এ-কাজ করেনি।'

'কারুর ওপর আপনার সন্দেহ হয় না?'

'সন্দেহ সকলের ওপরেই হয়, কিন্তু বিশ্বাস হয় না। এ ওই ভাইপো দুটোর কাজ। ভেবে দেখুন, বাড়ির লোকের অনাদিকে মেরে লাভ কি? সকলেই ছিল অনাদির অন্নদাস। এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, দু'দিন বাদে হাঁড়ি চড়বে না।'

'হাঁড়ি চড়বে না কেন? নৃপেন মাইনের চাকর ছিল সে অন্যত্র চাকরি খুঁজে নেবে। আর প্রভাত? তার তো দোকান রয়েছে।'

'দোকান থাকবে কি? ভাইপোরা মোকদ্দমা করে কেড়ে নেবে।'

'যদি কেড়েও নেয়, তবু ওদের অন্নাভাব হবে না। প্রভাত আর কিছু না পারুক, দপ্তরীর কাজ করে নিজের পেট চালাতে পারবে।'

'দপ্তরীর কাজ!' কেষ্টবাবু চকিতে চোখ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন।

'আপনি জানেন না? প্রভাত দপ্তরীর কাজ জানে, ছেলেবেলায় দপ্তরীর দোকানে কাজ শিখেছে।'

পুঁটিরাম চা ও জলখাবার লইয়া আসিল। কেষ্টবাবু জলখাবারের রেকাবি তুলিয়া লইয়া আহারে মন দিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুটি অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিল। একবার শুধু অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'কি আশ্চর্য! আমি জানতাম না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না-জানা আর আশ্চর্য কী! দপ্তরীর কাজ এমন কিছু মহৎ কাজ নয় যে কেউ ঢাক পেটাবে।'

কেষ্টবাবু একবার ধূর্ত চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, 'তা বটে।'

পানাহার শেষ হইলে ব্যোমকেশ তাঁহাকে সিগারেট দিয়া বলিল, 'আজ সকালে আপনি বলেছিলেন, অনাদি হালদারের সব গুপ্ত কথা আপনি জানেন, ইচ্ছে করলে তাকে ফাঁসিকাঠে লটকাতে পারেন—'

কেষ্টবাবু ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, 'গুপ্ত কথা! না না, আমি অনাদির গুপ্ত কথা কোত্থেকে জানব? মদের মুখে কি বলেছিলাম তার কি কোনও মানে হয়? আচ্ছা, আজ চললাম, অসংখ্য ধন্যবাদ।' তিনি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল, 'শুনুন, কেষ্টবাবু'—তিনি দ্বারের কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, 'গুপ্ত কথা না বলতে চান না বলবেন, আমার বেশি আগ্রহ নেই। কিন্তু আজ রাত্তিরে এখানে খাওয়া-দাওয়া করতে তো দোষ নেই। ওখানে হয়তো আজ আপনার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হবে '

কেষ্টবাবু সাগ্রহে দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিলেন, 'খাওয়া-দাওয়া— !'

'হ্যাঁ। আপনার খাতিরে আজ না-হয় একটু তরল পদার্থের ব্যবস্থা করা যাবে।'

'সত্যি বলছেন। আপনারও তাহলে অভ্যেস আছে। মোদ্দা দিদিমণি না জানতে পারে, কেমন? হ্যা হ্যা। ক'টার সময় আসব বলুন।'

'সন্ধ্যের পরই আসবেন। আমাকে বোধহয় একবার বেরুতে হবে। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যদি ফিরতে দেরি হয় চাকর আপনাকে বসাবে।'

'বেশ বেশ, আমি সন্ধ্যার পরই আসব।' দ্রংষ্ট্রাবিকট হাস্য করিতে করিতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

ব্যোমকেশ আমার প্রতি চোখ নাচাইয়া বলিল, 'সাদা চোখে কেষ্ট দাস কিছু বলবে না। -অজিত, তুমি শুঁড়ি বাড়ি যাও, একটি পাঁট বোতল কিনে নিয়ে এস। নাসিক হুইস্কি হলেই চলবে। এদিকে আমি পুঁটিরামকে তালিম দিয়ে রাখছি।'

দশ

পাঁচটার সময় দুইজনে বাহির হইলাম।

পুঁটিরামকে তালিম দেওয়া হইয়াছে। বসিবার ঘরে টেবিলের উপর বোতল কর্ক-স্ক্রু ও কাচের গেলাস রাখা হইয়াছে। বাহিরের দ্বারে কড়া নাড়িলে পুঁটিরাম আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিবে এবং ভেট্‌কি মাছের মত মুখ দেখিলে বলিবে—'আসুন বাবু, কর্তারা বেরিয়েছেন, এখুনি ফিরবেন।' ভেট্‌কি মাছকে টেবিলের নিকট বসাইয়া পুঁটিরাম ডিম ভাজিয়া আনিয়া দিবে এবং নিজে গা-ঢাকা দিবে। তারপর—

ফুটপাথে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় চলেছি আমরা?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থান নেই। কেষ্ট দাস এসে বোতলটা সাবাড় করবে তারপর আমরা ফিরব।'

'তা বুঝেছি। কিন্তু ততক্ষণ করব কী?'

'ততক্ষণ চল গোলদীঘিতে বায়ু সেবন করা যাক।'

গোলদীঘিতে গিয়া পাক খাইতে লাগিলাম। বেশী কথাবার্তা হইল না; ব্যোমকেশ একবার বলিল, 'কেষ্ট দাস গলিতে চাবি ফেলেনি।'

এক সময় চোখে পড়িল য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটুটে অনেক লোক প্রবেশ করিতেছে, বোধহয় কোনও অনুষ্ঠান আছে। ঘুরপাক খাইয়া খাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ব্যোমকেশকে বলিলাম, 'চল না, দেখা যাক ওখানে কি হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চল। সম্ভবতঃ কোনও বিখ্যাত লোকের মৃত্যু উপলক্ষে উৎসব-সভা বসেছে।'

য়ুনিভারসিটি ইনস্টিটুটে প্রবেশ করিতে গিয়া ইন্দুবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি সিনেমার লোক, তার উপর সংগীতজ্ঞ; অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিয়াছেন। ব্যোমকেশের অনুমান মিথ্যা নয়, সিনেমার এক দিক্‌পালের মৃত্যুমন্দিরে তাঁহার সহধর্মীরা নৃত্য গীত দ্বারা শোক প্রকাশ করিতেছেন। ইন্দুবাবুর সহিত ব্যোমকেশের পরিচয় করাইয়া দিলাম। তিনি আমাদের লইয়া গিয়া সামনের দিকের একটা সারিতে বসাইয়া দিলেন, নিজেও পাশে বসিলেন।

মঞ্চের উপর কয়েকটা পর্দায়-দেখা মুখ চোখে পড়িল, অন্য মুখও আছে। সভাপতি একজন পলিতকেশ চিত্রাভিনেতা।

মঞ্চস্থ লোকগুলির মধ্যে একটি মেয়ের মুখ বিশেষ করিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অপরিচিত মুখ; সুন্দর নয়, কিন্তু চিত্তাকর্ষক। তন্বী নয়, পূর্ণাঙ্গী, রঙ ফর্সা বলা চলে, একরাশ চুল ঘাড়ের কাছে কুণ্ডলিত হইয়া লুটাইতেছে। যাহাকে যৌন আবেদন বলা হয়, যুবতীর তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। একটি ষণ্ডা গোছের যুবক তাহর গা ঘেঁষিয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে তাহার কানে কানে কথা বলিতেছে।

যে গানটা চলিতেছিল তাহা শেষ হইল। সভাপতি একটি চিরকুট হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'এবার কুমারী শিউলী মজুমদার গাইবেন কোথা যাও ফিরে চাও দূরের পথিক।'

যে যুবতীকে আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহারই নাম শিউলী মজুমদার। সে সংযত মন্থরপদে সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিল, ষণ্ডা যুবক বাঁয়াতবলা লইয়া বসিল। গান আরম্ভ হইল।

গলাটি মিষ্ট, নিটোল, কুহক-কলিত। চোখ বুজিয়া শুনিতে লাগিলাম। তারপর ব্যোমকেশের কনুইয়ের গুঁতা খাইয়া চমক ভাঙিল। ব্যোমকেশ কানে কানে বলিল, 'ওহে, বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখ।'

বাঁ দিকে সন্তর্পণে চক্ষু ফিরাইলাম। কয়েকখানা চেয়ার বাদে প্রথম সারিতে প্রভাত বসিয়া আছে। তন্ময় সমাহিত মুখের ভাব, একাগ্র দৃষ্টি গায়িকার উপর বিন্যস্ত। প্রভাত বোধহয় আমাদের দেখিতে পায় নাই, পাইলে এতটা একাগ্র হইতে পারিত না। ব্যোমকেশের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম মুখে একটু বাঁকা হাসি লইয়া সে গান শুনিতেছে।

আমার মাথার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। শিউলী মজুমদার, যাহাকে প্রভাত বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, এ কি সেই?...

শিউলী মজুমদারের গান শেষ হইল। তারপর আরও কয়েকজন গাহিলেন। লক্ষ্য করিলাম, শিউলী মজুমদারের গান শেষ হইবার পর প্রভাত অলক্ষিতে উঠিয়া গেল।

সভা শেষ হইবার পূর্বে আমরাও উঠিলাম। ইন্দুবাবু আমাদের সঙ্গে দ্বার পর্যন্ত আসিলেন।

ব্যোমকেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঐ শিউলী মজুমদার নামে মেয়েটি— খাসা গায়। ও কি সিনেমার মেয়ে?'

ইন্দুবাবু বলিলেন, 'না, এখনও ঢোকেনি। তবে গদানন্দ যখন জুটেছে তখন আর দেরী নেই।'

'গদানন্দ?'

'ওই যে তবলা বাজাচ্ছিল। লোকটা সিনেমার দালাল। ভদ্রঘরেব মেয়েদের গান বাজনা শেখানো ওর পেশা .কিন্তু জুৎসই মেয়ে পেলে সিনেমায় টেনে নিয়ে যায়।

'তাই নাকি! ওর সত্যি নাম গদানন্দ?'

'নাম জগদানন্দ। সিনেমায় সবাই গদানন্দ বলে। অনেক মেয়ের মাথা খেয়েছে।'

'শিউলীর বাপের নাম আপনি জানেন?'

'নামটা যেন শুনেছিলাম, হ্যাঁ, দয়ালহরি মজুমদার। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে।'

বাসায় ফিরিলাম সাতটার সময়।

দরজা ভেজানো ছিল, প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কেষ্টবাবু তক্তপোশের উপব হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছেন, ডান হাতের তর্জনীকে বন্দুকে পরিণত করিয়া ঘরের কোণে লক্ষ স্থির করিতেছেন। মদের বোতলটা শূন্য উদরে এক পাশে পড়িয়া আছে। কেষ্টবাবু আমাদের প্রবেশ জানিতে পারিলেন না, ঘরের ঊর্ধ্ব কোণ তাগ করিয়া বন্দুক ছুঁড়িলেন—'গুড়ুম—ফিস্।'

আওয়াজটা অবশ্য তিনি মুখেই উচ্চারণ করিলেন।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'কেষ্টবাবু, কি হচ্ছে?'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'চুপ, পাখী উড়ে যাবে।—গুড়ুম—ফিস্।'

ব্যোমকেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, 'ও, পাখী শিকার করছেন। তা ক'টা পাখী মারলেন?'

কেষ্টবাবু বন্দুক নামাইয়া সহজভাবে বলিলেন, 'তিনটে হর্তেল ঘুঘু মেরেছি।' তাঁহার শিথিল মুখমণ্ডলে একটু তৃপ্তির হাসি খেলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ বেশ। কিন্তু গুড়ুম—ফিস্ কেন? গুড়ুম না হয় বুঝলাম, ফিস্ কী?'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'ফিস্ বুঝলেন না? গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ হল, আর ফিস্ করে পাখীর প্রাণ বেরিয়ে গেল।'

কেষ্টবাবু শয়ন করিলেন। দেখিলাম তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

ঘণ্টা দেড়েক পরে তাঁহার ঘুম ভাঙাইলাম, তারপর আহার শেষ করিয়া আবার তক্তপোশে আসিয়া বসিলাম। কেষ্টবাবুর অবস্থা এখন অনেকটা ধাতস্থ, পক্ষী শিকারের আগ্রহ আর নাই।

কেষ্টবাবুকে সিগারেট দিয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, 'কেষ্টবাবু, আপনাকে দেখে মনে হয় বয়সকালে আপনি ভারি জোয়ান ছিলেন।'

কেষ্টবাবু মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, 'কী শরীর যে ছিল ব্যোমকেশ-বাবু, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ইয়া ছাতি, ইয়া হাতের গুলি, একটা আস্ত পাঁঠা একলা খেয়ে ফেলতে পারতাম। লোকে ডাকতো— ভীম কেষ্ট।'

'নিশ্চয় খুব মারামারি করতেন? অনেক সায়েব ঠেঙিয়েছেন?'

'সায়েব কি বলছেন, জাহাজী গোরা পর্যন্ত ঠেঙিয়েছি। ব্যাটারা মদ খাবার জন্যে জাহাজ থেকে নামত। গলিঘুঁজিতে ঘুরে বেড়াত। আমি ওৎ পেতে থাকতাম, কাউকে একলা পেলে দু' চার ঘা দিয়েই লম্বা। হ্যা হ্যা।'

'আপনি দেখছি আমার মনের মতন মানুষ।--আচ্ছা, কখনও মানুষ খুন করেছেন?' ব্যোমকেশ অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার পাশে ঘেঁষিয়া বসিল।

'মানুষ খুন -!' কেষ্টবাবু ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে তাকাইলেন।

-'আরে মশাই, ভয় কিসের? ইয়ার বন্ধুর কাছে বলতে দোষ কি? এই তো আমি তিনটে মানুষ খুন করেছি। অজিত জানে, ওকে জিজ্ঞেস করুন।'

কেষ্টবাবু আশ্বস্ত হইলেন,—'ঠিক নিজের হাতে খুন করিনি, তবে দলে ছিলাম। ওই অনাদিটা -'

'অনাদি হালদারের সঙ্গে বুঝি আপনার অনেক দিনের পরিচয়?'

'ইস্কুল থেকে। অনাদিটা ছিল পগেয়া শয়তান। কিন্তু গায়ে জোর ছিল না, তাই আমাকে দলে টানত। আমি ইস্কুলে ভাল ছেলে ছিলাম মশাই, ওই অনাদির পাল্লায় পড়ে বিগড়ে গেলাম।'

'তারপর?'

'একটা ডেপুটির ছেলে সাইকেল চড়ে ইস্কুলে আসত। একদিন আমি আর অনাদি সাইকেল নিয়ে সট্‌কান্‌ দিলাম, চোরাবাজারে দিলাম বেচে। কিন্তু ডেপুটির ছেলের সাইকেল, পুলিস লাগল। ধরা পড়ে গেলাম। হেডমাস্টার দুজনকে রাস্টিকেট করে দিলে।'

'ঐ তো। হেডমাস্টারগুলো বড় পাজি হয়।-তারপর কি হল?'

'তারপর আর কি! নাম কাটা সেপাই! বছর দুই পরে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। আর আমাদের পায় কে? একেবারে মেসোপোটেমিয়া। বাসরা কুট এল্‌-আমারা--ভারি ফুর্তিতে কেটেছিল ক'টা বছর!

'সেই সময় বুঝি রাইফেল চালাতে শিখেছিলেন?

'হ্যাঁ। অব্যর্থ টিপ্‌ ছিল। কুট্‌-এল্‌-আমারায় যখন আটকা পড়েছিলাম তখন আমাদের রসদে টান পড়েছিল, ঘোড়ার মাংস খেতে হয়েছিল। তখন আমি রাইফেল দিয়ে উড়ন্ত পাখী শিকার করতাম। ক্যাপ্টেন আমার নাম দিয়েছিল—উইলিয়াম টেল্‌! সে এক দিন ছিল।' নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'যুদ্ধের পর দেশে ফিরে এলাম। আবার পুনর্মূষিক.. তার কিছুদিন পরে অনাদি এক কান্ড করে বসল। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাপকে ঠেঙিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাল। এমন ঠেঙিয়েছিল যে বাপটা পরের দিনই টেঁসে গেল। বাড়ির লোকেরা অবশ্য ব্যাপারটা চাপাচুপি দিয়ে দিল, কিন্তু অনাদি সেই যে পালাল, পাঁচ বছর আর তার দেখা নেই।

'পাঁচ বছর পরে একদিন গভীর রাত্রে অনাদি চুপিচুপি আমার কাছে এসে হাজির। বললে—ব্যবসা করবি তো চল্ আমার সঙ্গে, খুব লাভের ব্যবসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কিসের ব্যবসা? কোথায় যেতে হবে? সে বললে বেহারের একটা ছোট্ট শহরে। মারোয়াড়ীর সঙ্গে ব্যবসা। একলা সে ব্যবসা হয় না, তাই তোকে নিতে এসেছি। রাতারাতি বরাত ফিরে যাবে। যাবি তো চল্।—আমার তখন সময়টা খারাপ যাচ্ছে, রাজী হয়ে গেলাম।

'বেহারের নগণ্য একটা জায়গা, নাম লালনিয়া। সামনে দিয়ে রেলের লাইন গেছে। পিছনদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। আমরা ইস্টিশানে নেমে শহরে গেলাম না, দিনের বেলায় জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রইলাম। সেখানে অনাদি আসল কথা খুলে বলল শহরের একটেরে জঙ্গলের গা ঘেঁষে এক মারোয়াড়ীর গদি আছে, বুড়ো মারোয়াড়ীটা রাত্তিরে একলা থাকে। বুড়োর অনেক টাকা, গদিতে ডাকাতি করতে হবে।

'দুপুর রাত্রে মারোয়াড়ীর গদিতে গেলাম। আমার হাতে লোহার ডাণ্ডা অনাদির হাতে ইলেক্‌ট্রিক টর্চ, কোমরে ভোজালি। মারোয়াড়ীটা চোরাই মালের কারবার করত, রাত্রে চোরেরা তার কাছে আসত। অনাদি দরজায় টোকা দিতেই সে দরজা খুলে দিলে, আমি লাগালাম তার মাথায় এক ডাণ্ডা। বুড়োটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

'গদি লুঠ করলাম। বেশী কিছু পাওয়া গেল না, হাজার তিনেক নগদ আর কিছু সোনার গয়না। তাই নিয়ে বেরুচ্ছি, মারোয়াড়ীটা দোরগোড়ায় পড়েছিল, হঠাৎ অনাদির ঠ্যাং জড়িয়ে ধরল। অনেক ধস্তাধস্তি করেও অনাদি ঠ্যাং ছাড়াতে পারল না, মারোয়াড়ী মরণকামড়ে কামড়ে ধরেছে। তখন সে কোমর থেকে ভোজালি বার করে মারল বুড়োর ঘাড়ে এক কোপ। বুড়োটা ক্যাঁক করে মরে গেল।

'রক্তমাখা ভোজালি সেইখানে ফেলে আমরা পালালাম। শেষরাত্রে ইস্টিশানে গিয়ে ট্রেন ধরলাম। লুঠের মাল অনাদির কাছে ছিল; সে বলল তুই এক গাড়িতে ওঠ্, আমি অন্য গাড়িতে উঠি। দুজনে এক কামরায় উঠলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। উঠে পড়্, উঠে পড়্, পরের স্টেশনে আবার দেখা হবে। আমি একটা কামরায় উঠে পড়লাম, অনাদি পাশের কামরায় উঠল।

'ব্যাস্, সেই যে অনাদি লোপাট হল, বিশ বছরের মধ্যে আর তার টিকি দেখতে পেলাম না বেইমান! বিশ্বাসঘাতক!'

পুরাতন টাকার শোকে কেষ্টবাবু ফুঁসিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে আর একটি সিগারেট দিয়া বলিল, 'অনাদি হালদার বেইমান ছিল তাই তো তার আজ এই দুরবস্থা। কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন ইচ্ছে করলে অনাদিকে ফাসিকাঠে লটকাতে পারেন তার মানে কি? তাকে ফাঁসাতে গেলে আপনি নিজেও যে ফেঁসে যেতেন।'

কেষ্টবাবু বলিলেন, 'মারোয়াড়ী-খুনের ব্যাপারে খুব হৈ চৈ হয়েছিল, কাগজে লেখালেখি হয়েছিল। পুলিস ভোজালির গায়ে অনাদির আঙুলের ছাপ পেয়েছিল। কিন্তু অনাদিকে তো তারা চেনে না, তাকে ধরবে কি করে? একমাত্র আমি যদি পুলিসকে একটি বেনামী চিঠি ঝাড়তাম—লালনিয়ার খুনীর নাম অনাদি হালদার, সে অমুক ঠিকানায় থাকে, আঙুলের ছাপ মিলিয়ে নাও—তাহলে কী হত?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝেছি। তারপর আবার কবে অনাদি হালদারকে পেলেন?'

কেষ্টবাবু দন্তপংক্তি কোষমুক্ত করিলেন -'বছর দুই আগে, এই কলকাতা শহরে। ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি অনাদি বৌবাজারের বাসায় ঢুকছে। আর যাবে কোথায়! খোঁজখবর নিয়ে জানলাম অনাদি পয়সা করেছে, দুধে-ভাতে আছে। একবার ভাবলাম দিই পুলিসকে বেনামী চিঠি। কিন্তু আমার সময়টা তখন খারাপ যাচ্ছে—একদিন গিয়ে দেখা করলাম। অনাদি ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠল। আমি বললাম—আজ থেকে আমাকেও দুধে-ভাতে রাখতে হবে, নইলে লালুনিয়ার মারোয়াড়ীকে কে খুন করেছে পুলিস জানতে পারবে। খুনের মামলা তামাদি হয় না।'...

রাত হইয়া গিয়াছিল, কেষ্টবাবু আমাদের তক্তপোশেই রাত্রি কাটাইলেন।

এগার

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিতে দেরি হইল। তাড়াতাড়ি বসিবার ঘরে গিয়া দেখি, ব্যোমকেশ বসিয়া চিঠি লিখিতেছে, কেষ্টবাবু নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শিকারী কোথায়?'

ব্যোমকেশ সহাস্য চোখ তুলিয়া বলিল, 'রাত না পোয়াতে কখন উঠে পালিয়েছে।'

কাল রাত্রে মদের মুখে যে-সব কথা প্রকাশ পাইয়াছে আজ সকালে তাহা স্মরণ করিয়াই বোধহয় কেষ্ট দাস সরিয়াছে।

তক্তপোশে বসিলাম—'সাত সকালে কাকে চিঠি লিখতে বসলে?'

ব্যোমকেশ চিঠিখানা আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া আর একখানা চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। চিঠি পড়িয়া দেখিলাম—

ভাই রমেশ, এতদিন পরে আমাকে কি তোমার মনে আছে। এক সঙ্গে বহরমপুরে পড়েছি। প্রফেসারেরা আমাকে bomb-case বলে ডাকতেন। মনে পড়ছে?

নৃপেন দত্ত নামে একজনের মুখে খবর পেলাম, তুমি তোমার গ্রামেই আছ। নৃপেনকে তুমি চেনো, তোমার পাড়ার ছেলে। তার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

কলকাতায় তোমার আসা যাওয়া নিশ্চয় আছে। একবার এসো না আমার বাসায়। ঠিকানা দিলাম।

কবে আসছ? ভালবাসা নিও।

ইতি
তোমার পুরনো বন্ধু
ব্যোমকেশ বক্সী

দ্বিতীয় পত্রখানি নিমাই নিতাইকে লেখা—

নিমাইবাবু, নিতাইবাবু, শ্রীকান্ত পান্থনিবাসের তেতলার ঘরের কথা জানিতে পারিয়াছি। আমার সঙ্গে অবিলম্বে আসিয়া দেখা করুন, নচেৎ খবরটি পুলিস জানিতে পারিবে।

ব্যোমকেশ বক্সী

চিঠি দু'খানি খামে পুরিয়া ঠিকানা লিখিয়া ব্যোমকেশ পুঁটিরামকে ডাকিল। পুঁটিরাম বাজারে যাইবার জন্য বাহির হইতেছিল, তাহার হাতে চিঠি দুইখানি ডাকে দিবার জন্য দিয়া ব্যোমকেশ আমাকে বলিল, 'চল, আজ সকালেই বেরুতে হবে।'

'কোথায় ?'

'দয়ালহরি মজুমদারের বাসার ঠিকানা মনে আছে তো ?'

'১৩।৩, রামতনু লেন, শ্যামবাজার।'

আধ ঘণ্টা পরে আমরা বাহির হইলাম। শ্যামবাজারে গিয়া রামতনু লেন খুঁজিয়া বাহির করিতে সময় লাগিল। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে গলিটি ক্ষুদ্র, দুই ধারের দুইটি বড় রাস্তার মধ্যে যোগসাধন করিয়াছে। আমরা একদিক হইতে নম্বর দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম।

গলির প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছিয়াছি হঠাৎ ও-প্রান্তের একটা বাড়ি হইতে একজন লোক বাহির হইয়া আসিল, ঝড়ের মত আমাদের দিকে অগ্রসর হইল। চিনিলাম প্রভাত। সে আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল, আমাদের দেখিতে পাইল না। উস্কখুস্ক চুল, আরক্ত মুখ চোখ, আগুনের হল্কার মত সে আমাদের পাশ দিয়া বহিয়া গেল।

আমরা ভ্রূ তুলিয়া পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলাম, তারপর যে দ্বার দিয়া প্রভাত বাহির হইয়াছিল সেই দিকে চলিলাম। নম্বর খুঁজিবার আর প্রয়োজন নাই। ব্যোমকেশ মৃদুগুঞ্জনে বলিল, 'অনাদি হালদার সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছিল...এখন সে নেই, তাই প্রভাত আবার এসেছিল কিন্তু সুবিধে হল না।'

১৩।৩ নম্বর বাড়ির দরজা বন্ধ। আমরা ক্ষণেক দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতেছি, বাড়ির ভিতর হইতে মেয়েলী গলার গান আরম্ভ হইল। মিষ্ট নিটোল কুহক-কলিত কণ্ঠস্বর, সঙ্গে তবলার সংগত।

ব্যোমকেশ দ্বারে ধাক্কা দিল। ভিতরে গান বন্ধ হইল। একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি দ্বার খুলিলেন। একজোড়া কঠিন চক্ষু আমাদের আপাদমস্তক পরিদর্শন করিল।

'কি চাই ?' লোকটির আকৃতি যেমন বেউড় বাঁশের মত পাকানো, কণ্ঠস্বরও তেমনি শুষ্ক রুক্ষ। একটু পূর্ববঙ্গের টান আছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার নাম কি দয়ালহরি মজুমদার ?'

'হাঁ। কি দরকার ?' ভিতরে প্রবেশ করিবার আহ্বান আসিল না, বরং গৃহস্বামী দুই কবাট ধরিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অনাদি হালদার মারা গেছে, শুনেছেন বোধহয়। তার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই---'

'কে অনাদি হালদার! আমি জানি না।' দয়ালহরিবাবুর শুষ্ক স্বর উগ্র হইয়া উঠিল।

'জানেন না ? তার আলমারিতে আপনার হ্যাণ্ডনোট পাওয়া গেছে। আপনি পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছেন।'

'কে বলে আমি ধার নিয়েছি! মিথ্যা কথা। কারুর এক পয়সা আমি ধারি না।'

'হ্যাণ্ডনোটে আপনার দস্তখত আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'জাল দস্তখত।' দড়াম্‌ শব্দে দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

আমরা কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম, তারপর ফিরিয়া চলিলাম। পিছনে গান ও সঙ্গত আবার আরম্ভ হইল। ভৈরবী একতালা।

ট্রামরাস্তার দিকে চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল, 'দয়ালহরি মজুমদার লোকটি সামান্য লোক নয়। অনাদি হালদার মরেছে শুনে ভাবছে পাঁচ হাজার টাকা হজম করবে। হ্যাণ্ডনোটে যে দস্তখত করেছে সেটা হয়তো ওর আসল দস্তখত নয়, বেঁকিয়ে চুরিয়ে দস্তখত করেছে, মামলা যদি আদালতে যায় তখন অস্বীকার করবে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়, প্রশ্ন হচ্ছে, অনাদি হালদার ওকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিলে কেন?'

বলিলাম, 'অনাদি হালদারের তেজারতির ব্যবসা ছিল হয়তো।'

'তাই বলে বিনা জামিনে শুধু হাতে পাঁচ হাজার টাকা ধার দেবে! অনাদি হালদার কি এতই কাঁচা ছেলে ছিল? বানরে সঙ্গীত গায় শিলা জলে ভেসে যায় দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।'

'তবে কি হতে পারে?'

'জানি না। কিন্তু জানতে হবে।—আমার কি সন্দেহ হয় জানো?'

'কী?'

বলিবার জন্য মুখ খুলিয়া ব্যোমকেশ থামিয়া গেল। তারপর আকাশের পানে চোখ তুলিয়া বলিল, 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্‌।'

অতঃপর আমি আর প্রশ্ন করিলাম না।

সেদিন বৈকালে আবার আমরা বাহির হইলাম। এবার গন্তব্যস্থান প্রভাতের দোকান।

দোকানের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছি, দেখি আর পাঁচজন লোকের মধ্যে বাঁটুল সর্দার আমাদের আগে আগে চলিয়াছে। প্রভাতের দোকানের সামনে আসিয়া বাঁটুলের গতি হ্রাস হইল, মনে হইল সে দোকানে প্রবেশ করিবে। কিন্তু প্রবেশ করিবার পূর্বে সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া পিছন দিকে চাহিল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। অমনি বাঁটুল আবার সিধা পথে চলিতে আরম্ভ করিল।

আমি আড়চোখে ব্যোমকেশের পানে তাকাইলাম। তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত, চোয়ালের হাড় শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, 'বাঁটুল কি এবার প্রভাতকে খদ্দের পাকড়াতে চায় নাকি?'

ব্যোমকেশ গলার মধ্যে শুধু আওয়াজ করিল।

দোকানে প্রবেশ করিলাম।

খরিদ্দার নাই কেবল প্রভাত কাউণ্টারে কনুই রাখিয়া কপালে হাত দিয়া বসিয়া আছে, তাহার মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না। আমাদের পদশব্দে সে চোখ তুলিল। চোখ দুইটি জবাফুলের মত লাল। ক্ষণকাল অচেনা চোখে চাহিয়া থাকিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আসুন।'

আমরা কাউণ্টারের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। পুস্তকালয়ের রাশি রাশি বই আমার মনে মোহ বিস্তার করে, আমি চারিদিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশের ওসব বালাই নাই। সে বলিল, 'সামান্য একটা কাজে

এসেছিলাম। দেখুন তো, এই চাবিটা চিনতে পারেন?'

প্রভাত ব্যোমকেশের হাত হইতে চাবি লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। বলিল, 'না। কোথাকার চাবি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা আমি জানি না। আপনাদের বাসার পাশে গলিতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।'

'কি জানি, আমি কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। নতুন চাবি দেখছি। হয়তো রাস্তার কোনও লোকের পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

প্রভাত চাবি ফেরত দিল। ব্যোমকেশ তাহা পকেটে রাখিয়া বলিল, 'কেষ্টবাবুর খবর কি? তিনি আজ সকালবেলা আপনার বাসায় ফিরে গিয়েছিলেন?'

প্রভাত ক্ষীণ হাসিল,-'হ্যাঁ। কাল রাত্রে কোথায় গিয়েছিলেন।'

কোথায় গিয়েছিলেন ব্যোমকেশ তাহা বলিল না, জিজ্ঞাসা করিল, 'কেষ্টবাবু তাহলে আপনার স্কন্ধেই রইলেন?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। কি করা যায়? গলাধাক্কা তো দেয়া যায় না।'

'তা বটে। নৃপেনবাবু কোথায়? চলে গেছেন?'

'না, এখনও যায়নি। তার দু'মাসের মাইনে বাকি..গরীব মানুষ ভাবছি ওকে রেখে দেব। দোকানে একজন লোক রাখলে ভাল হয়, ওকেই রেখে দেব ভাবছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মন্দ কি। আচ্ছা, নিমাই নিতাই বোধহয় আর আসেনি? আলমারি কি পুলিসের পক্ষ থেকে সীল করে দিয়ে গেছে?'

'না, পুলিস আর আসেনি। তবে অনাদিবাবুর কোমরে যে চাবি ছিল সেটা ওরা নিয়ে গেছে। আলমারির বোধহয় ঐ একটাই চাবি ছিল।'

'তা হবে। আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। দয়ালহরি মজুমদার নামে একজনকে অনাদি হালদার পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছিল আপনি জানেন?'

প্রভাত কিছুক্ষণ অবিশ্বাস-ভরা বিহ্বল চক্ষে চাহিয়া রহিল—'পাঁচ হাজার টাকা! আপনি ঠিক জানেন?'

'অনাদি হালদারের আলমারিতে আমি হ্যান্ডনোট দেখেছি। তাতে দয়ালহরি মজুমদারের সই আছে।'

প্রভাতের শীর্ণ মুখ যেন আরও শুষ্ক ক্লান্ত হইয়া উঠিল, সে অর্ধস্ফুট স্বরে বলিল, 'আমি জানতাম না। কখনও শুনিনি।' সে টুলের উপর বসিতে গিয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। ব্যোমকেশ হাত বাড়াইয়া টপ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

'প্রভাতবাবু! আপনার জ্বর হয়েছে—গা গরম।'

'জ্বর! না-ও কিছু নয়। ঠান্ডা লেগেছে'

'হয়তো বুকে ঠান্ডা বসেছে। আপনি দোকানে এলেন কেন? যান, বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকুন। ডাক্তার ডাকান—'

'ডাক্তার!' প্রভাত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—'না না, ওসব হাঙ্গামায় দরকার নেই। আপনিই সেরে যাবে।'

'আমার কথা শুনুন, কাছেই আমার চেনা একজন ডাক্তার আছেন, তাঁর কাছে

চলুন। রোগকে অবহেলা করা ভাল নয়। আসুন।'

প্রভাত আরও কয়েকবার আপত্তি করিয়া শেষে রাজী হইল। দোকানে তালা লাগাইয়া বাহির হইবার সময় ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার গুর্খা দারোয়ানটিকে দেখছি না। তাকে কি ছাড়িয়ে দিয়েছেন?'

প্রভাত বলিল, 'হ্যাঁ। অনেকদিন দেশে যায়নি, কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আমারও আর পাহারাওলার দরকার নেই—' বলিয়া ফিকা হাসিল।

দুই তিন মিনিটে ডাক্তার তালুকদারের ডাক্তারখানায় পৌঁছিলাম। তিনি ডাক্তারখানায় উপস্থিত ছিলেন; ব্যোমকেশ তাঁহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কথাবার্তা বলিল। তারপর তিনি প্রভাতকে ঘরে লইয়া গিয়া টেবিলের উপর শোয়াইয়া পরীক্ষা করিলেন। আমরা সরিয়া আসিলাম।

পরীক্ষার শেষে ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, 'বুকে পিঠে কিছু পেলাম না। তবে স্নায়ুতে গুরুতর শক্ লেগেছে। একটা ওষুধ দিচ্ছি, এক শিশি খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

ডাক্তার প্রেস্ক্রিপ্শন লিখিতে গেলেন, ব্যোমকেশও তাঁহার সঙ্গে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঔষধের শিশি হাতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'চলুন। ডাক্তারের প্রাপ্য আমি চুকিয়ে দিয়েছি।'

প্রভাত বিব্রত হইয়া বলিল, 'সে কি, আপনি কেন দিলেন? আমার কাছে টাকা রয়েছে—'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে। এখন চলুন আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

প্রভাতের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল—'আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করছেন—'

ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া বলিল, 'সংসারে থাকতে গেলে পরস্পরের জন্যে একটু কষ্ট করতে হয়। আসুন।'

ভাড়াটে গাড়িতে প্রভাতকে লইয়া আমরা তাহার বাসার উদ্দেশ্যে চলিলাম। ব্যোমকেশের এই পরহিতব্রতের অন্তরালে কোনও অভিসন্ধি আছে কিনা, এই প্রশ্নটা বার বার মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগিল।

বাসায় পৌঁছিলে ননীবালা দেবী প্রভাতের জ্বরের সংবাদ শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। তিনি অভিজ্ঞ ধাত্রী। ঔষুধ-পথ্য সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু বলিতে হইল না। আমরা বিদায় লইলাম।

বাহিরের ঘরে আসিয়া ব্যোমকেশ দাঁড়াইয়া পড়িল। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, তাহার যাইবার ইচ্ছা নাই। আমি ভ্রূ তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম, উত্তরে সে বাম চক্ষু কুঞ্চিত করিল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। নৃপেন প্রবেশ করিল, আমাদের দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, 'আপনারা?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রভাতবাবুর শরীর খারাপ হয়েছিল, তাই তাঁকে পৌঁছে দিতে এসেছি।'

'প্রভাতবাবুর শরীর খারাপ!' নৃপেন ভিতর দিকে পা বাড়াইল।

'একটা কথা,' ব্যোমকেশ চাবি বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল, 'এ চাবিটা চিনতে পারেন?'

নৃপেনের চোখের চাহনি এতক্ষণ সহজ ও সিধা ছিল, মুহূর্তে তাহা চোরা চাহনিতে পরিণত হইল। একবার ঢোঁক গিলিয়া সে স্বরযন্ত্র সংযত করিয়া লইল, তারপর বলিল, 'চাবি? কার চাবি আমি কি করে চিনব? মাফ করবেন, প্রভাতবাবুর জ্বর'—কথা শেষ না করিয়াই সে প্রভাতের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ আমার কানে কানে বলিল, 'অজিত, তুমি দাঁড়াও, আমি এখনি আসছি।' সে লঘুপদে অনাদি হালদারের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

একলা দাঁড়াইয়া আছি; ভাবিতেছি কেহ যদি আসিয়া পড়ে এবং ব্যোমকেশ সম্বন্ধে সওয়াল আরম্ভ করে, তখন কি বলিব! কিন্তু মিনিটখানেক পরে ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিল, বলিল, 'চল, এবার যাওয়া যাক।'

নীচে দাওয়ায় বসিয়া ষষ্ঠীবাবু হুঁকা টানিতেছিলেন, আমাদের পানে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইলেন। রাস্তায় আলো জ্বলিয়াছে। আমরা দ্রুত বাসার দিকে পা চালাইলাম। চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'অনাদি হালদারের আলমারির চাবিই বটে এবং কে গলিতে ফেলেছিল, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।'

বার

হপ্তাখানেক কাটিয়া গেল। কোনও দিক হইতে আর কোনও সাড়া শব্দ নাই। নিতাই-নিমাইকে ব্যোমকেশ অবিলম্বে আসিয়া দেখা করিতে বলিয়াছিল, তাহারাও নিশ্চুপ। আবার যেন সব ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। ইস্টিশন হইতে ট্রেন ছাড়িয়া গেলে যেমন হয়, এ যেন অনেকটা সেইরকম অবস্থা।

তারপর ট্রেন আসিল। একটার পর একটা ট্রেন আসিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত এত ট্রেন আসিল যে নিশ্বাস ফেলিবার সময় রহিল না।

সকালবেলা ডাকে দুটি চিঠি আসিল। একটি চিঠি সত্যবতীর। সে দীর্ঘকাল আমাদের না দেখিয়া আমাদের বাঁচিয়া থাকা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে দর্শন চায়। দ্বিতীয় চিঠিখানি খেংরাপট্টির বৌবাজারের রমেশ মল্লিকের। তিনি লিখিয়াছেন—

ভাই ব্যোমকেশ, তুমি তাহলে আমাকে ভোলনি? তোমার চিঠি পেয়ে কী আনন্দ যে হল বলতে পারি না। সেই পুরনো ভুলে যাওয়া কলেজ-জীবনের কথা আবার মনে পড়ে যাচ্ছে।

ভাই, আমি তোমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করতে যেতাম, কিন্তু কিছুদিন থেকে বাতে শয্যাশায়ী হয়ে আছি, নড়বার ক্ষমতা নেই। তোমার কীর্তিকলাপ বইয়ে পড়েছি, তুমি কলকাতায় থাকো তাও জানি। কিন্তু ঠিকানা জানা ছিল না বলে এতদিন যেতে পারিনি। এবার সেরে উঠেই যাব।

তুমি যার কথা জানতে চেয়েছ তার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানি, দেখা হলে সব বলব। ভারি গুণী লোক। একবার জেল খেটেছে। ওর প্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে, যে-কোনও তালার চাবি একবার দেখলে অবিকল নকল চাবি তৈরি করতে পারে। গুণধর ছেলে, খুড়ো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। খুড়োর সিন্দুকের চাবি তৈরি করেছিল, মাঝে মাঝে পাঁচ দশ টাকা সরাতো। খুড়ো

তাড়িয়ে দেবার পর কলকাতায় গিয়ে চাকরি করত, সেখানেও ক্যাশ-বাক্সর চাবি তৈরি করেছিল। ধরা পড়ে জেলে গেল। সে আজ চার পাঁচ বছরের কথা। তুমি কোন্ সূত্রে তার সম্পর্কে এসেছ জানি না, কিন্তু সাবধানে থেকো।

তোমাকে দেখবার জন্যে মন ছট্ফট্ করছে। আজ এই পর্যন্ত। ভালবাসা নিও। ইতি—তোমার রমেশ।

ব্যোমকেশ বলিল, 'গুণী লোক তাতে সন্দেহ কি। এমন গুণী লোক পৃথিবীতে অল্পই আছে। যা হোক, ন্যাপার কার্য-পান্ধতি এবার বেশ বোঝা যাচ্ছে। অনাদি হালদার আলমারির চাবি কোমরে বাঁধত, দেখার সুবিধে ছিল না। কোনও সময় ন্যাপা একবার চাবিটা দেখে ফেলেছিল, সে চাবি তৈরি করল। আলমারিতে মাল আছে সে জানত, সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর কালীপুজোর রাত্রে—' বলিয়া ব্যোমকেশ থামিল।

'কালীপুজোর রাত্রে কী?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার পূর্বেই দ্বারের কড়া নড়িয়া উঠিল। দ্বার খুলিয়া দেখি অপূর্ব দৃশ্য। উকিল কামিনীকান্ত মুস্তফী দুই পাশে দুই মক্কেল লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কামিনীকান্তর মুখে সুধাবিগলিত হাসি। নিমাই ও নিতাইকে দেখিয়া মানুষ বলিয়া চেনা যায় না, সত্য সত্যই দুটি ভিজা বিড়াল খালি পা, গায়ে গরদের দোছোট, মুখে অক্ষৌরিত দাড়ি, অশৌচের বেশ।

তিনজনে ঘরে প্রবেশ করিলেন। ব্যোমকেশ আরাম-কেদারা হইতে একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তাহার মুখের তাচ্ছিল্য-ভাব ক্রমে ব্যঙ্গহাস্যে পরিণত হইল। সে বলিল, 'আপনারা শেষ পর্যন্ত এলেন তাহলে? -বসুন।'

তিনজনে তক্তপোশের কিনারায় বসিলেন। কামিনীকান্ত বলিলেন, 'একটু দেরি হয়ে গেল। আপনি চিঠিতে যে-রকম ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলেন, ওরা একলা আসতে সাহস করেনি, আমার কাছে ছুটে গিয়েছিল। তা আমি হলাম গিয়ে উকিল, একটু খোঁজ-খবর না নিয়ে তো আসতে পারি না। তাই –'

'কোথায় খোঁজ-খবর নিলেন? শ্রীকান্ত পান্থনিবাসে? সেখানে বুঝি সুবিধে হল না? সাক্ষী ভাঙাতে পারলেন না? শ্রীকান্তবাবু সত্যের অপলাপ করতে রাজী হলেন না?'

কামিনীকান্ত আহত স্বরে বলিলেন, 'ছি ছি, এ আপনি কি বলছেন, ব্যোমকেশবাবু! সাক্ষী ভাঙানো আমার পেশা নয়, মক্কেলের পক্ষ থেকে সত্য আবিষ্কার করাই আমার কাজ।'

'সত্য আবিষ্কার করবার জন্যে শ্রীকান্ত হোটেলে যাবার দরকার ছিল না, মক্কেল দুটিকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারতেন।'

'ওরা ছেলেমানুষ, তার ওপর অশৌচ চলছে। যাহোক, আপনি কি জানতে চান বলুন, কোনও কথাই ওরা আপনার কাছে লুকোবে না। ওদের বয়ান শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, ওরা সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

ব্যোমকেশ নিতাই ও নিমাইকে পর্যায়ক্রমে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'এঁদের মধ্যে শ্রীকান্ত হোটেলে যাতায়াত করতেন কে?'

কামিনীকান্ত বলিলেন, 'ওরা দু'জনেই যেত। তবে ওদের চেহারা অনেকটা একরকম, তাই বোধহয় হোটেলের লোকেরা বুঝতে পারেনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। শ্রীকান্ত হোটেলের তেতলায় ঘর ভাড়া নেবার

উদ্দেশ্য কি?'

কামিনীকান্ত বলিলেন, 'তাহলে গোড়া থেকেই সব খুলে বলি -'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওদের কথা ওঁরা নিজের মুখে বললেই ভাল হত না?'

'হেঁ হেঁ', সে তো ঠিক কথা। তবে কি জানেন, ওরা ছেলেমানুষ, তার ওপর ব্যাপারস্যাপার দেখে খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছে। হয়তো বলতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলবে আপনি সন্দেহ করবেন ওরা মিছে কথা বলছে -'

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ, আপনিই বলুন তাহলে। বুঝতে পারছি আপনার বলা আর ওদের বলায় কোনও তফাৎ হবে না। মিছে সময় নষ্ট করে লাভ কি?'

ছেলেমানুষ দুটি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, কামিনীকান্ত তাদের জবানীতে কাহিনী বিবৃত করিলেন। মোটামুটি কাহিনীটি এই -

বছর দুই আগে অনাদি হালদার মহাশয় যখন কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন তখন নিমাই নিতাই খবর পাইয়া কাকার কাছে ছুটিয়া আসে। তাহারা পিতৃহীন, কাকাই তাহাদের একমাত্র অভিভাবক, কাকাকে তাহারা সাবেক বাড়িতে লইয়া যাইবার জন্য নির্বন্ধ করে।

অনাদি হালদার অতিশয় সজ্জন এবং ভালো মানুষ ছিলেন, ভাইপোদের প্রতি তাঁহার স্নেহেরও সীমা ছিল না। কিন্তু একদল দুষ্ট লোক তাঁহার ভালমানুষীর সুযোগ লইয়া ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছিল, তাহারা তাঁহার কানে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল, ভাইপোদের উপর তাঁহার মন বিরূপ করিয়া তুলিল। তিনি নিতাই নিমাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।

নিমাই নিতাই ন্যায়তঃ ধর্মতঃ অনাদিবাবুর উত্তরাধিকারী। তাহাদের ভয় হইল, এই দুষ্ট লোকগুলো কাকাকে ঠকাইয়া সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবে হয়তো তাঁহাকে খুন করিতেও পারে। নিমাই নিতাই তখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া শ্রীকান্ত হোটেলে ঘর ভাড়া করিল এবং জানালা দিয়া অনাদি-বাবুর বাসার উপর নজর রাখিতে লাগিল। তাহাদের বাড়িতে একটা পুরনো আমলের দূরবীন আছে, সেই দূরবীন চোখে লাগাইয়া অনাদিবাবুর বাসার ভিতরকার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিত। এই দেখুন সেই দূরবীন।

- নিমাই নিতাইয়ের একজন চাদরের ভিতর হইতে দূরবীন বাহির করিয়া দেখাইল। চামড়ার খাপের মধ্যে চোঙের মত দূরবীন, টানিলে লম্বা হয়; ব্যোমকেশ নাড়িয়া চাড়িয়া ফেরৎ দিল। কামিনীকান্ত আবার আরম্ভ করিলেন। -

নিমাই নিতাই পালা করিয়া হোটেলে যাইত এবং চোখে দূরবীন লাগাইয়া জানালার কাছে বসিয়া থাকিত। অবশ্য ইহা নিতান্তই ছেলেমানুষী কাণ্ড। কামিনীকান্ত কিছু জানিতেন না, জানিলে এমন হাস্যকর ব্যাপার ঘটিতে দিতেন না। যাহোক, এইভাবে কয়েকমাস কাটিবার পর কালীপুজোর রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাত্রি দশটা আন্দাজ নিমাই হোটেলে গিয়া দূরবীন লাগাইয়া বসিল। অনাদিবাবু ব্যালকনিতে দাঁড়াইয়া বাজি পোড়ানো দেখিতেছিলেন। এগারোটার সময় এক ব্যাপার ঘটিল। অনাদিবাবু হঠাৎ পিছনের দরজার দিকে ফিরিলেন, যেন পিছনে কাহারও সাড়া পাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ হইল

এবং বন্দুকের গুলি নিমাইয়ের কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। ওদিকে ব্যালকনিতে অনাদিবাবু ধরাশায়ী হইলেন। কিন্তু ঘরের অন্ধকার হইতে কে গুলি চালাইয়াছে নিমাই তাহা দেখিতে পাইল না।

নিমাই ব্যাপার বুঝিতে পারিল। বন্দুকের গুলি অনাদিবাবুর শরীর ভেদ করিয়া আর একটু হইলে নিমাইকেও বধ করিত; ভাগ্যক্রমে গুলিটা তাহার রগ ঘেঁষিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরিয়া গেল এবং দুই ভাইয়ে পরামর্শ করিয়া সেই রাত্রেই কামিনীকান্তর কাছে উপস্থিত হইল। তারপর যাহা যাহা ঘটিয়াছে ব্যোমকেশবাবু তাহা ভালভাবেই জানেন।

ইহাই সত্য পরিস্থিতি, ইহাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নাই। ব্যোমকেশবাবু বিবেচক ব্যক্তি, তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছেন যে পূজ্যপাদ খুল্লতাতকে বধ করা কোনও ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব তিনি যেন পুলিসে খবর না দেন। পুলিস—বিশেষতঃ বর্তমানকালের পুলিস—যদি এমন একটা ছুতা পায় তাহা হইলে নিতাই-নিমাইকে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িবে, নিরপরাধের প্রতি জুলুম করিবে। ইহা কদাচ বাঞ্ছনীয় নয়। একেই তো অবিচার অত্যাচারে দেশ ছাইয়া গিয়াছে।

কামিনীকান্ত শেষ করিলে ব্যোমকেশ আড়মোড়া ভাঙিয়া হাই তুলিল, অলসকণ্ঠে বলিল, 'এঁরা succession certificate -এর জন্যে দরখাস্ত করেছেন নিশ্চয়? তার কি হল?'

কামিনীকান্ত বলিলেন, 'দরখাস্ত করা হয়েছে। তবে আদালতের ব্যাপার সময় লাগবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার বিশ্বাস প্রভাত কোনও আপত্তি তুলবে না। তবে বইয়ের দোকানটা তার নিজের নামে; আপনারা যদি সেদিকে হাত বাড়ান তাহলে সে লড়বে।'

'না না, অনাদিবাবু যা দান করে গেছেন তার ওপর ওদের লোভ নেই। —তাহলে ব্যোমকেশবাবু, আপনি শ্রীকান্ত হোটেলের কথাটা প্রকাশ করবেন না আশা করতে পারি কি?'

'এ বিষয়ে আমি বিবেচনা করে দেখব। নিমাইবাবু নিতাইবাবু যদি নির্দোষ হন তাহলে নির্ভয়ে থাকতে পারেন। আচ্ছা, আজ আসুন তাহলে।'

তিনজনে গাত্রোত্থান করিয়া পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন, চোখে চোখে কথা হইল। তারপর কামিনীকান্ত একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, 'আজ আমরা আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। ক্ষতিপূরণস্বরূপ সামান্য কিছু—' বলিয়া পকেট হইতে পাঁচটি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া বাড়াইয়া ধরিলেন।

ব্যোমকেশের অধর ব্যঙ্গ-বঙ্কিম হইয়া উঠিল—'আমার সময়ের দাম অত বেশী নয়। তাছাড়া, আমি ঘুষ নিই না।'

কামিনীকান্ত তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'না না, সে কি কথা। আপনি অনাদিবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করেছেন, তার তো একটা খরচ আছে। সে খরচ এদেরই দেবার কথা। আচ্ছা, আর আপনার সময় নষ্ট করব না। নমস্কার।' নোটগুলি টেবিলে রাখিয়া তিনি মক্কেল সহ ক্ষিপ্রবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ব্যোমকেশ নোটগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিল,

'ঘুষ কি করে দিতে হয় শিখলাম।' তারপর ভ্রূ বাঁকাইয়া আমার পানে চাহিল—'কেমন গল্প শুনলে?'

বলিলাম, 'আমার তো নেহাৎ অসম্ভব মনে হল না।'

'এরকম গল্প তুমি লিখতে পারো? সাহস আছে?'

'এমন অনেক সত্য ঘটনা আছে যা গল্পের আকারে লেখা যায় না, লিখলে বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তবু যা সত্য তা সত্যই। Truth is stranger than fiction.'

তর্ক বেশ জমিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় দ্বারে আবার অতিথি সমাগম হইল। দরজা ভেজানো ছিল; একজন দরজার ফাঁকে মুণ্ড প্রবিষ্ট করাইয়া বলিল, 'আসতে পারি স্যার?' বলিয়া দাঁত খিঁচাইয়া হাসিল।

অবাক হইয়া দেখিলাম, বিকাশ দত্ত! বছরখানেক আগে চিড়িয়াখানা প্রসঙ্গে তাহার সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল। তাহার হাসিটি অটুট আছে। কিন্তু বেশভূষা দেখিয়া মনে হয় ধন-ভাগ্যে ভাঙন ধরিয়াছে।

ব্যোমকেশ সমাদর করিয়া বিকাশকে বসাইল, হাসিয়া বলিল, 'তারপর খবর কি?'

বিকাশ বলিল, 'খবর ভাল নয় স্যার। চাকরি গেছে, এখন ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছি।'

ব্যোমকেশের মুখ গম্ভীর হইল—'চাকরি গেল কোন্ অপরাধে?'

বিকাশ বলিল, 'অপরাধ করলে তো ফাঁসি যেতাম স্যার। অপরাধ করিনি তাই চাকরি গেছে।'

'হুঁ। তা এখন কি করছেন?'

'কাজের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনার হাতে যদি কিছু থাকে তাই খবর নিতে এলাম।'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'কাজ—? আচ্ছা, কাজের কথা পরে হবে, আজ বেলা হয়ে গেছে, এখানেই খাওয়া-দাওয়া করুন।'

বিকাশের মুখে কৃতজ্ঞতার একটি ক্লিষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল 'না স্যার, আমাকে দুপুরবেলা বাসায় ফিরতে হবে। যদি কিছু কাজ থাকে, ওবেলা আবার আসব।'

বিকাশের মুখ দেখিয়া মনে হইল তাহার বাসায় কোনও অভুক্ত প্রিয়জন তাহার পথ চাহিয়া আছে।

ব্যোমকেশ আবার একটু ভাবিয়া বলিল, 'আমার হাতে একটা কাজ আছে। সে কাজে আপনার মতন হুঁশিয়ার লোক চাই। একটি লোকের হাঁড়ির খবর যোগাড় করতে হবে?'

বিকাশ পকেট হইতে ডায়েরীর মত একটি খাতা ও পেন্সিল বাহির করিল—'নাম?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শিউলী মজুমদারের নাম শুনেছেন?'

'শিউলী মজুমদার? গান গায়?'

'হ্যাঁ। তার বাপের নাম দয়ালহরি মজুমদার, ঠিকানা ১৩।৩, রামতনু লেন, শ্যামবাজার। ওদের বাড়ির সব খবর সংগ্রহ করতে হবে।'

লিখিয়া লইয়া বিকাশ বলিল, 'কবে খবর চান?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একদিনের কাজ নয়। অনেকদিন ধরে একটু একটু করে খবর যোগাড় করতে হবে। অতীতের খবর, বর্তমানের খবর, বাড়িতে কারা আসে যায়, কী কথা বলে সব খবর চাই। অনাদি হালদার আর প্রভাত - এই দুটো নাম মনে রাখবেন। যখনই কিছু খবর পাবেন আমাকে এসে জানাবেন।'

'বেশ, আজ তাহলে উঠি।' খাতা পেন্সিল পকেটে পুরিয়া বিকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ একটি একশত টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'আজ একশো টাকা রাখুন। কাজ হয়ে গেলে আরও পাবেন।'

নোট হাতে লইয়া বিকাশ কিছুক্ষণ অপলক চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া রহিল, তারপর চোখ তুলিয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, পেটে ভাত না থাকলে মুখ দেখে ধরা যায়--না . আপনি ঠিক ধরেছো।' খপ্ করিয়া ব্যোমকেশের পায়ের ধুলো লইয়া বিকাশ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশ দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া খামখেয়ালী গোছের হাসিল- 'কিছু টাকার সদ্গতি হল। চল, আর দেরি নয়, নেয়ে খেয়ে নেওয়া যাক। নৈলে এখনি হয়তো আবার নতুন অতিথি এসে হাজির হবে।'

তের

অপরাহ্ণে পুঁটিরাম যখন চা লইয়া আসিল তখন লক্ষ্য করিলাম, তাহার মুখখানা শীর্ণ ও বেদনাক্লিষ্ট। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি রে, কি হয়েছে?'

পুঁটিরাম বলিল, 'আবার অম্বলের ব্যথা ধরেছে বাবু।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি ওষুধ দিচ্ছি, তুই শুয়ে থাকগে যা। এ বেলা আর তোকে রাঁধতে হবে না।'

কিছুদিন হইতে পুঁটিরামকে অম্লশূলে ধরিয়াছে, বিশুদ্ধ কাঁকর এবং তেঁতুল বিচির গুঁড়া তাহার সহ্য হইতেছে না। ব্যোমকেশ তাহাকে যোয়ানের জল দিয়া ফিরিয়া আসিলে বলিলাম, 'নীচে খবর পাঠাই, মেসেই আজ আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হোক।'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'না, চল আজ কোনও হোটেলে খেয়ে আসি। আজ পাঁচশো টাকা হাতে এসেছে, বর্বরস্য ধনক্ষয়ং হওয়া দরকার।'

আমি তাহার এই লঘুতায় সায় দিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'ব্যোমকেশ কিছু মনে করো না। ওই পাঁচশো টাকা যে ঘুষ তা যখন বুঝতে পেরেছ তখন ও টাকা নেওয়া কি তোমার উচিত হয়েছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এ প্রশ্নের উত্তরে অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে পারি কিন্তু তা করব না। টাকা আমার চাই তাই নিয়েছি, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।'

'কিন্তু ধরো—যদি শেষ পর্যন্ত জানা যায় যে, নিমাই নিতাই খুন করেছে, তখন কি করবে? ঘুষ খেয়ে কথাটা চেপে যাবে?'

'না, চেপে যাব না, ওদেরই ধরিয়ে দেব। অবশ্য যদি পুলিস ধরতে চায়। মনে রেখো, অনাদি হালদারের খুনের তদন্ত করবার জন্যই ওরা আমাকে টাকা

দিয়েছে, ঘুষ বলে দেয়নি।'

'তা যদি হয় তাহলে স্বতন্ত্র কথা।'

'তোমার ভয় নেই, ঘুষ খেয়ে আমি অধর্ম করব না। অধর্ম করার মতলব যদি থাকত তাহলে পাঁচশো টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট হতাম না, রীতিমত আখেরের রেস্ত করে নিতাম।' বলিয়া ব্যোমকেশ হাসিল।

চা শেষ করিয়া সিগারেট ধরাইলাম। এ বেলা বোধহয় আর অতিথি অভ্যাগতের শুভাগমন হইবে না ভাবিতেছি, প্রভাত আসিয়া উপস্থিত। তাহার হাতে একটি বোঁচ্‌কা, চেহারা দেখিয়া বোঝা যায়, সম্প্রতি রোগ হইতে উঠিয়াছে, চোখের মধ্যে দুর্বলতার চিহ্ন এখনও লুপ্ত হয় নাই। ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন। এখন শরীর কেমন?'

লজ্জিত হাসিয়া প্রভাত বলিল, 'সেরে গেছে। সেদিন অনেক কষ্ট দিলাম আপনাদের।'

'কিছু না। হাতে ওটা কি?'

'একটু মিষ্টি। ভীম নাগের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম কিছু নিয়ে যাই।'

বোঁচ্‌কা খুলিলে দেখা গেল, মিষ্টি অল্প নয়, প্রায় কুড়ি পঁচিশ টাকার কড়া পাকের সন্দেশ। সেদিন ব্যোমকেশ তাহার উপকার করিয়াছিল, ডাক্তার গাড়ি-ভাড়া প্রভৃতির খরচ লয় নাই, তাই প্রভাত অত্যন্ত শিষ্টভাবে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে চায়। ব্যোমকেশ উল্লসিত হইয়া বলিল, 'আরে আরে, এ যে স্বর্গীয় ব্যাপার। অজিত, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম বল তো?'

বলিলাম, 'যতদূর মনে পড়ে তুমি আমার মুখ দেখেছিলে এবং আমি তোমার মুখ দেখেছিলাম।'

'তবেই বোঝো, আমাদের মুখ দুটো সামান্য নয়। যাহোক, খাবারগুলো সরিয়ে রাখা ভাল, বাইরে ফেলে রাখা কিছু নয়।' ব্যোমকেশ সন্দেশগুলি ভিতরে রাখিয়া আসিয়া বলিল, 'প্রভাতবাবু, চা খাবেন নাকি?'

'আজ্ঞে না, আমি চা খেয়ে এসেছি।' সে ঘরের এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, 'এখানে কেবল আপনারা দু'জনে থাকেন বুঝি?'

ব্যোমকেশ বলিল, উপস্থিত দুজনেই আছি। আমার স্ত্রী এবং ছেলে এখন পাটনায়।'

প্রভাতের চোখ দুইটি যেন নৃত্য করিয়া উঠিল—'পাটনায়!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, যা হাঙ্গামা চলেছে, তাদের বাইরে রেখেছি। আপনি বুঝি পাটনা এখনও ভুলতে পারেননি?'

'পাটনা ভুলব!' প্রভাতের স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল 'জন্মে অব্দি পাটনাতেই কাটিয়েছি। কত বন্ধু আছে সেখানে। ইশাক সাহেব আছেন।'

'ইশাক সাহেব?'

'আমার ওস্তাদ। তাঁর দোকানে চাকরি করতাম, তিনি হাতে ধরে আমাকে দপ্তরীর কাজ শিখিয়েছিলেন এমন ভাল লোক হয় না, দেবতুল্য লোক। এখন বুড়ো হয়েছেন কে তাঁর দোকানে কাজ করছে কে জানে.. হয়তো তিনি একাই কাজ করছেন।' প্রভাত নিশ্বাস ফেলিল।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'পাটনায় কোন্ পাড়ায় থাকেন তিনি?'

'সিটিতে থাকেন। সেখানে সকলেই তাঁকে চেনে। আমার আর ওদিকে যাওয়া হয়নি, সেই যে পাটনা থেকে এসেছি, আর যাইনি। ব্যোমকেশবাবু, আপনি নিশ্চয় মাঝে মাঝে পাটনা যান? এবার যখন যাবেন ইশাক সাহেবকে দেখে আসবেন? কেমন আছেন তিনি—বড় দেখতে ইচ্ছে করে।'

'নিশ্চয় দেখা করব। তারপর এদিকের খবর কি? কেষ্টবাবু কেমন আছেন?'

প্রভাত বলিল, 'কেষ্টবাবু চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ। আমার বাসায় ও'র পোষাল না। মার সঙ্গে দিনরাত খিটিমিটি লাগত। তারপর একদিন নিজেই চলে গেলেন।'

'যাক, আপনার ঘাড় থেকে একটা বোঝা নামল। আর নৃপেনবাবু? তিনি কি আপনার দোকানে কাজ করছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি কাজ করেন?'

'বইয়ের দোকানে অনেক ছুটোছুটির কাজ আছে। অন্য দোকান থেকে বই আনতে হয়, ভি পি পাঠাবার জন্যে পোস্ট অফিসে যেতে হয়। এসব কাজ আগে আমাকেই করতে হত। এখন নৃপেনবাবু করেন।'

'ভাল।'

প্রভাত এতক্ষণ ব্যোমকেশের সঙ্গে কথা বলিতেছিল, মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাইতেছিল; এখন সে আমার দিকে ফিরিয়া বসিয়া বলিল, 'অজিতবাবু, আমি আপনার কাছে আসব বলেছিলাম মনে আছে বোধহয়। এইসব গণ্ডগোলে আসতে পারিনি। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।'

'কি অনুরোধ বলুন।'

'আপনার একখানি উপন্যাস আমাকে দিতে হবে। আমি গরীব প্রকাশক, নতুন দোকান করেছি। তবু অন্য প্রকাশকদের কাছ থেকে আপনি যা পান আমিও তাই দেব।'

নূতন প্রকাশককে বই দেওয়ায় বিপদ আছে, কখন লালবাতি জ্বালিবে বলা যায় না। একবার এক অর্বাচীনকে বই দিয়া ঠকিয়াছি। আমি ইতস্তত করিয়া বলিলাম, 'তা, এখন তো আমার হাতে কিছু নেই—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কেন, যে উপন্যাসটা ধরেছ সেটা দিতে পারো। প্রভাতবাবু, আপনি ভাববেন না, অজিতের বই আপনি পাবেন।'

প্রভাত উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'যখন আপনার বই শেষ হবে তখন দেবেন। এখন আমার দোকান ভাল চলছে না, পরের বই কমিশনে বিক্রি করে কতটুকুই বা লাভ থাকে। আপনাদের আশীর্বাদ পেলে আমি দোকান বড় করে তুলব, প্রাণপণে খাটব, কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এই তো চাই। আপনাদের বয়সে কাজে উৎসাহ থাকা চাই। তবে উন্নতি করতে পারবেন।'

প্রভাত গদগদ মুখে পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া তাহা হইতে দুইটি নোট লইয়া আমার সম্মুখে রাখিল। দেখিলাম দুইশত টাকা। সত্যই আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম!

প্রভাত বলিল, 'অগ্রিম প্রণামী দিলাম। বই লেখা শেষ হলেই বাকি টাকা

দিয়ে যাব।' সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিলাম, 'রসিদ নিয়ে যান।'

সে বলিল, 'না না, এখন রসিদ থাক, সব টাকা দিয়ে রসিদ নেব। আজ যাই, সন্ধ্যে হয়ে এল, এখনও দোকান খোলা হয়নি।'

প্রভাত প্রস্থান করিলে আমরা কিছুক্ষণ বিস্ময়-পুলকিত নেত্রে পরস্পর চাহিয়া রহিলাম। তারপর নোট দু'টি সস্নেহে পকেটে রাখিয়া বলিলাম, 'কাণ্ডখানা কি! এ যে শ্রাবণের ধারার মত ক্রমাগত একশো টাকার নোট বৃষ্টি হচ্ছে!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। এত সুখ সইলে হয়!'

এই সময় দ্বারদেশে বাঁটুলের আবির্ভাব হইল। তাহার অথাব চাঁদা আদায়ের সময় হইয়াছে। সে ভক্তিভরে আমাদের প্রণাম করিয়া বলিল, 'চাঁদাটা নিতে এলাম কর্তা।'

ব্যোমকেশ আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির অর্থ ঃ জীবন-ব্যবসায়ে শুধু আমদানি নয়, রপ্তানিও আছে।

বাঁটুলকে বসাইয়া ব্যোমকেশ টাকা আনিতে গেল। কামিনীকান্তর দেওয়া নোটগুলি হইতে একটি আনিয়া বাঁটুলকে দিল—'ভাঙানি আছে বাঁটুল?'

'আজ্ঞে, আছে।'

বাঁটুল কোমর হইতে গেঁজে বাহির করিল। বেশ পরিপুষ্ট গেঁজে: তাহাতে খুচরা রেজগি হইতে নানা অংকের নোট পর্যন্ত রহিয়াছে। কয়েকটি একশত টাকার নোটও চোখে পড়িল। বাঁটুল হিসাব করিয়া ভাঙানি ফেরত দিল, তারপর গেঁজে আবার কোমরে বাঁধিল। বাঁটুলের ব্যবসা যে লাভের ব্যবসা তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যোমকেশ বাঁটুলকে সিগারেট দিল—'বাঁটুল, অনাদি হালদার মারা গেছে শুনেছ বোধহয়?'

বাঁটুল চোখ তুলিল না, সযত্নে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'আজ্ঞে, শুনেছি।'

'কেউ তাকে গুলি করে মেরেছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই তো গুজব।'

'তুমি তো অনেক খবর-টবর রাখো, কে মেরেছে আন্দাজ করতে পারো না?'

'কলকাতায় লাখ লাখ লোক আছে কর্তা, তার মধ্যে কে মেরেছে কি করে আন্দাজ করব। তবে এ কথাও বলতে হয়, উনি চুল্‌কে ঘা করলেন। আমার চাঁদা বন্ধ না করলে বেঘোরে প্রাণটা যেত না। আমি রক্ষে করতাম।'

'বটেই তো! জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা কি উচিত! অনাদি হালদারের দুর্বুদ্ধি হয়েছিল। তা সে যাক। বাঁটুল, তোমরা রাইফেল ভাড়া দাও?'

'আজ্ঞে, দিই।'

'কি রকম শর্তে ভাড়া দাও?'

'আজ্ঞে, ভাড়া একদিনের জন্যে কুল্লে পঁচিশ টাকা; রাইফেল আর দুটি টোটা পাবেন। তবে ভাড়া নেবার সময় তিনশো টাকা জমা দিতে হয়, রাইফেল ফেরত দিলে ভাড়া কেটে নিয়ে টাকা ফেরত দিই। আপনাদের চাই নাকি কর্তা?'

'না, উপস্থিত দরকার নেই, দরটা জেনে রাখলাম। আচ্ছা বাঁটুল, যে রাত্রে অনাদি হালদার খুন হয় সে রাত্রে কাউকে রাইফেল ভাড়া দিয়েছিলে?'

বাঁটুল উঠিয়া দাঁড়াইল 'আজ্ঞে কর্তা, সে কথা বলতে পারব না। একজন খদ্দেরের কথা আর একজনকে বললে বেইমানী হয়, আমাদের ব্যবসা চলে না। আচ্ছা, আজ আসি। পেন্নাম হই।'

বাঁটুল চলিয়া গেল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় লম্বা হইয়া বোধকরি ঝিমাইয়া পড়িল। আমার মনটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া দুইশত টাকার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। টাকা যখন লইয়াছি তখন উপন্যাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করিতে হইবে। অথচ তাড়াহুড়া করিয়া আমার লেখা হয় না; মনটা যখন নিশ্চিন্ত নিস্তরঙ্গ হয় তখনই কলম চলে। উপন্যাসের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। তাহার মধ্যে নিমাই নিতাই প্রভাত বাঁটুল সকলেই মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

ঘণ্টা দুই পরে পেটে ক্ষুধার উদয় হইলে বলিলাম, 'চল, এবার বেরুনো যাক। হোটেলের খরচ আজ না হয় আমিই দেব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সাধু সাধু।'

আমাদের বাসার অনতিদূরে একটি হোটেল আছে। দোতলার উপর হোটেল, সরু সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়; সিঁড়ির মাথায় স্থূলকায় ম্যানেজার টেবিলের উপর ক্যাশ-বাক্স লইয়া বসিয়া থাকেন। আশেপাশে ছোট ছোট কুঠুরীতে টেবিল পাতা। বিশেষ জাঁক জমক নাই, কিন্তু রান্না ভাল।

হোটেলে উপস্থিত হইলে ম্যানেজার বলিলেন, 'পাঁচ নম্বর।' অমনি একজন ভৃত্য আসিয়া আমাদের পাঁচ নম্বর কুঠুরীর দিকে লইয়া চলিল। একটি গলির দুই পাশে সারি সারি কুঠুরী; যাইতে যাইতে একটি কুঠুরীর সম্মুখে গিয়া পা আপনি থামিয়া গেল। আমি ব্যোমকেশের গা টিপিলাম। পর্দার ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছে, কেষ্টবাবু একাকী বসিয়া আহার করিতেছেন। তাঁহার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবির উপর পাট করা শাল, মুখে ধনগর্বের গাম্ভীর্য। তাঁহার সামনে শ্বেতবস্ত্রাবৃত টেবিলের উপর অনেকগুলি প্লেটে রাজসিক খাদ্যদ্রব্য সাজানো, একটি প্লেটে আস্ত রোস্ট্ মুরগি উত্তানপাদ অবস্থায় বিরাজ করিতেছে। পাশে একটি বোতল।

কেষ্টবাবু পানাহারে মগ্ন, দরজার বাহিরে আমাদের লক্ষ্য করিলেন না। আমরা পাশের প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলাম।

ভৃত্যকে অর্ডার দিলে সে খাবার লইয়া আসিল; আমরা খাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশের প্রাক্তন প্রসন্নতা আর নাই, সে যেন ভাল ভাল খাদ্যগুলি উপভোগ করিতেছে না।

আধ ঘণ্টা পরে ভোজন শেষ করিয়া কোটর হইতে নির্গত হইলাম। ম্যানেজারের টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেষ্টবাবু হোটেলের ঋণ শোধ করিতেছেন। রাজকীয় ভঙ্গীতে পকেট হইতে একশত টাকার নোট লইয়া তিনি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন।

এই লইয়া আজ চারবার একশত টাকার নোট দেখিলাম। দেশটা সম্ভবতঃ রাতারাতি বড়মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, ইংরেজ বিদায় লইবার পূর্বেই আমাদের কপাল ফিরিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের আর দেরি নাই।

ম্যানেজার ভাঙানি ফেরত দিলেন, কেষ্টবাবু তাহা অবজ্ঞাভরে পকেটে ফেলিয়া পিছন ফিরিলেন। আমরা পিছনেই ছিলাম।

চোখাচোখি হইল। কেষ্টবাবুর চোয়াল ঝুলিয়া পড়িল। তারপর তিনি পাকশাট্ খাইয়া ঝটিতি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন।

আমরা যখন হোটেলের প্রাপ্য চুকাইয়া পথে নামিলাম কেষ্টবাবু তখন অদৃশ্য হইয়াছেন।

বাসার দিকে চলিতে চলিতে বলিলাম, 'আজকের দিনটা ঘটনাবহুল বলা চলে, এমন কি টাকাবহুল বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ যেন চারিদিকে একশো টাকার নোটের হরির লুট হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না।

আরও খানিক দূর চলিবার পর বলিলাম, 'কী ভাবছ এত?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চল অজিত, পাটনা যাই। সকালে একটা ট্রেন আছে।'

আমি ফুটপাথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িলাম—'পাটনা যাবে! আর এদিকে?'

'এদিকে আর কিছু করবার নেই।'

'তার মানে অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে তা বুঝতে পেরেছ!'

'বোধহয় পেরেছি। কিন্তু তাকে ধরবার উপায় নেই।'

আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম—'কে খুন করেছে?'

ব্যোমকেশ আকাশের দিকে চোখ তুলিল ঃ বুঝিলাম আবোল-তাবোল আবৃত্তি করিবার উদ্যোগ করিতেছে। বলিলাম, 'বলতে না চাও বোলো না। কিন্তু বিকাশ দত্তকে খবর সংগ্রহ করবার জন্যে টাকা দিয়েছ তার কি হবে?'

'বিকাশ ওস্তাদ ছেলে, জানাবার মত খবর থাকলে সে ঠিক আমাকে জানাবে।'

'কিন্তু আসল খবর যখন জানতেই পেরেছ তখন আর খবরে দরকার কি?'

'দরকার হয়তো নেই, কিন্তু অধিকন্তু ন দোষায়। সুন্দরী যুবতীরা প্রসাধন করেন কেন? বল্কল পরে থাকলেই পারেন। থাকেন না তার কারণ, অধিকন্তু ন দোষায়।'

'তুমি কি সুন্দরী যুবতী?'

'না, আমি সুন্দর যুবক। আমার জন্যে আমার বউয়ের মন কেমন করছে। সুতরাং আর দেরি নয়। কাল সকালেই—পাটনা।'

চৌদ্দ

আমাদের পাটনা যাত্রার পর হইতে স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত এই কয় মাস আমাদের জীবনের ধারাবাহিকতা অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে পড়িয়া অনাদি হালদার ঘটিত ব্যাপারের খেই হারাইয়া গিয়াছিল। এই কাহিনীতে সে সকল অবান্তর ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি অনাবশ্যক, কেবল সংক্ষেপে এই আট-নয় মাস কি করিয়া কাটিল তাহার একটা আন্দাজ দিয়া নির্দিষ্ট বিষয়ে ফিরিয়া যাইব।

পাটনায় পৌঁছিয়া দশ বারোদিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিল; তারপর একদিন পুরন্দর পাণ্ডের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। পাণ্ডেজী বছরখানেক হইল বদলি

হইয়া পাটনায় আসিয়াছেন। সেই যে দুর্গরহস্য সম্পর্কে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, তারপর দেখা হয় নাই। পাণ্ডেজী খুশী হইলেন, আমরাও কম খুশী হইলাম না। পাণ্ডেজী মৃত্যু-রহস্যের অগ্রদূত, আমাদের সহিত দেখা হইবার দু' একদিন পরেই একটি রহস্যময় মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শেষ পর্যন্ত ব্যোমকেশকেই সে রহস্য ভেদ করিতে হইল। একদিন সে কাহিনী বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শুধু যে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হইতেছিল তাহা নয়, সারা ভারতবর্ষের জীবনে এক মহা সন্ধিক্ষণ দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। স্বাধীনতা আসিতেছে, রক্তাক্ত দেহে বিক্ষত চরণে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ভেদ করিয়া আসিতেছে। স্বাধীনতা যখন আসিবে হয়তো মুমূর্ষু রক্তহীন দেহে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাকে বাঁচাইতে তুলিতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে হৃদয়রক্ত নিঙড়াইয়া দিতে হইবে। তবু স্বাধীনতা আসিতেছে; স্বার্থ-নিষ্ঠুর বিদেশী শাসকের খড়্গে দ্বিখণ্ডিত হইয়াও হয়তো বাঁচিয়া থাকিবে। আশা আশঙ্কায় কম্পমান সেই দিনগুলির কথা স্মরণ হইলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

একদিন বৈকালে ময়দানে বেড়াইতে বেড়াইতে কৈশোরের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। পরিধানে শেরওয়ানী পায়জামা সত্ত্বেও চিনিতে পারিলাম—স্কুলে যাহার সহিত প্রাণের বন্ধুত্ব ছিল সেই ফজলুর রহমান। দু'জনে প্রায় এক সঙ্গেই পরস্পরকে চিনিতে পারিলাম এবং সবেগে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলাম।

'ফজলু!'

'অজিত!'

কিছুক্ষণ পরে বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমি দুই পা পিছাইয়া আসিলাম, ফজলুর দিকে গলা বাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, 'নে ফজলু, ছুরি বার কর্। এই গলা বাড়িয়ে রয়েছি।'

ফজলু নিজের হাতের মোটা লাঠিটা আমার হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিল, 'এই নে লাঠি, বসিয়ে দে আমার মাথায়। তোদের অসাধ্য কাজ নেই।'

তারপর আমরা ঘাসের উপর বসিলাম, ব্যোমকেশের সহিত ফজলুর পরিচয় করাইয়া দিলাম। ফজলু এখন পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছে, প্রচণ্ড পাকিস্তানী। সুতরাং তুমুল তর্ক বাধিয়া উঠিল, কেহই কাহাকেও রেয়াৎ করিলাম না। শেষে ফজলু বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, অজিতের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, ওর ঘটে কিছু নেই। কিন্তু আপনি তো বুদ্ধিজীবী মানুষ, আপনি বলুন দেখি দোষ কার—হিন্দুর, না, মুসলমানের?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।'

সেদিন বেড়াইয়া ফিরিতে দেরি হইয়া গেল। তারপর আরও কয়েকদিন ফজলুর সহিত দেখা হইয়াছিল। সে নিমন্ত্রণ করিয়া আমাদের খাওয়াইয়াছিল। তারপর—

উন্মত্ত হিংসার পিশাচ-নৃত্য আবার শুরু হইয়া গেল। প্রথমে নোয়াখালি, তারপর বিহার। এ লইয়া বাক্-বিস্তারের প্রয়োজন নাই। ফজলু এই হিংসা-যজ্ঞে প্রাণ দিল। সে সত্যনিষ্ঠ সাহসী পুরুষ ছিল, যাহা বিশ্বাস করিত তাহা গলা ছাড়িয়া প্রচার করিত; তাই বোধহয় তাহাকে প্রাণ দিতে হইল। কিছুদিন পরে বাতাস একটু ঠাণ্ডা হইলে আমরা পাটনা সিটিতে ইশাক সাহেবের খোঁজ

লইতে গিয়াছিলাম। তিনিও গিয়াছেন; কেবল তাঁহার দোকানটা অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে। এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।

কিন্তু যাক। এবার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাই। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে বিকাশ দত্তর চিঠি আসিয়াছিল; বিকাশ লিখিয়াছিল -

'প্রণাম শতকোটি, পুঁটিরামের কাছে আপনার ঠিকানা যোগাড় করে চিঠি লিখছি। আশা করি আপনি শীঘ্রই ফিরবেন।

আমি এখন মাস্টারি করছি। দয়ালহরি মজুমদারের একটা আট-নয় বছরের অকালপক্ক ছেলে আছে, তাকে পড়াই। মাইনে পাঁচ টাকা, সকাল বিকেল পড়াতে যাই। ছেলেটা হাড় বজ্জাৎ; এমন ইঁচড়ে পাকা মিট্‌মিটে শয়তান আমিও আজ পর্যন্ত দেখিনি। বাড়িতে কে কি করছে, কোথায় কি ঘটছে, সব খবর-সে রাখে।

দয়ালহরি মজুমদার ঢাকার লোক, সেখানে বীমার দালালী এবং আরও কি কি করত। বছর খানেক আগে রাজনৈতিক গণ্ডগোলের আঁচ পেয়ে আগে ভাগেই কলকাতা পালিয়ে এসেছিল। মেয়ে এবং ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। লোকটা সন্দিগ্ধ এবং ধাড়িবাজ।

মেয়ে শিউলী শান্ত এবং ভাল মানুষ গোছের। বাইরে থেকে মনে হয় বিদ্যেধরী, কিন্তু আসলে তা নয়। ভাল গাইতে পারে, রাতদিন গান বাজনা নিয়ে আছে। গ্রামোফোনে গান দিয়েছে, তা ছাড়া টাকা নিয়ে সভাসমিতিতে গাইতে যায়। শিউলীর উপার্জন থেকে বোধহয় সংসার চলে। বুড়োটা কিছু কাজকর্ম করে না।

আপনি অনাদি হালদার আর প্রভাত এই দুটো নাম মনে রাখতে বলেছিলেন। অনাদি হালদারের খবর পাইনি, প্রভাতের খবর পেয়েছি। কয়েক মাস আগে প্রভাতের সঙ্গে শিউলীর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, তারপর সম্বন্ধ ভেঙে যায়। কেন ভেঙে যায় তা জানতে পারিনি, তবে সন্দেহ হয় কোনও গুপ্ত কথা আছে। বিয়ে ভেঙে যাবার আগে প্রভাত ঘন ঘন আসত, বিয়ে ভেঙে যাবার পরও একবার এসেছিল। দয়ালহরি মজুমদার তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়।

উপস্থিত বাড়িতে একজন লোকের খুব যাতায়াত আছে, তার নাম জগদানন্দ অধিকারী। শিউলীকে গান শেখাবার ছুতো করে আসে। লোকটার মতলব ভাল নয়। গান শেখানো ছাড়া অন্যভাবে ঘনিষ্ঠতা করতে চায়।

আপাতত এই পর্যন্ত। নতুন খবর পেলে জানাবো। আপনি কবে ফিরবেন? আমার ঠিকানা নীচে দিলাম।

প্রণামান্তে বিকাশ দত্ত।'

বিকাশের চিঠিতে নূতন কথা বিশেষ কিছু নাই। আমাদের জানা কথাই পরিকীর্ণ হইয়াছে।

এদিকে পাটনায় আমাদের অনেকদিন হইয়া গেল। কলিকাতায় ফিরিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় দিল্লী হইতে ব্যোমকেশের নামে 'তার' আসিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাহার সহিত দেখা করিতে চান।

সর্দার বল্লভভাই কি করিয়া ব্যোমকেশের নাম জানিলেন, কেন তাহার সাক্ষাৎ চান, কিছুই জানা গেল না। রাজনৈতিক আকাশে তখন ঘন ঘটা, অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে বজ্রবিদ্যুৎ। ব্যোমকেশ আমাকে পাটনায় ফেলিয়া একাকী দিল্লী চলিয়া গেল।

দিল্লী গিয়া ব্যোমকেশ কি করিয়াছিল তাহা পুরোপুরি জানা আমার পক্ষে

সম্ভব হয় নাই। সে ফিরিয়া আসিবার পর ইশারা ইঙ্গিতে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করার এ স্থান নয়। দেশ তখনও নিজের হাতে আসে নাই, ইহারই মধ্যে গুপ্ত ঘরভেদীরা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, কে দেশের শত্রু, কে মিত্র নিশ্চয়ভাবে জানার প্রয়োজন হইয়াছিল।

ব্যোমকেশ চলিয়া গেলে আমি একলা পড়িয়া গেলাম। দূরে রণবাদ্য শুনিয়া আস্তাবলে বাঁধা লড়ায়ে-ঘোড়ার যে অবস্থা হয় আমার অবস্থাও কতকটা সেই রকম দাঁড়াইল। এইভাবে পাটনায় যখন আর মন টিকিল না তখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু কলিকাতার বাসা শূন্য। ভাবিয়াছিলাম, নিরিবিলিতে উপন্যাসে মন বসাইতে পারিব, কিন্তু মন বসিতে চাহিল না। প্রভাতের নিকট হইতে টাকা লইয়াছি, একটা কিছু করা দরকার; এই সংকল্পটাই মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল।

একদিন প্রভাতের দোকানে গেলাম। আমাকে দেখিয়া সে গলা উঁচু করিয়া বলিল, 'পাটনা থেকে কবে ফিরলেন? আমি মাঝে আপনাদের বাসায় গিয়েছিলাম। ইশাক সাহেবের খবর নিয়েছিলেন?'

ইশাক সাহেবের খবর বলিলাম। প্রভাত কিছুক্ষণ অচল হইয়া বসিয়া রহিল, তারপর কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে লাগিল। আমি সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলাম না, আবার দেখা হইবে বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রভাতের চিঠি লইয়া নৃপেন আসিল। চিঠিতে দু' ছত্র লেখা

মাননীয়েষু, কাল কোনও কথা হইল না, সেজন্য লজ্জিত। ব্যোমকেশবাবু কি ফিরিয়াছেন?

উপন্যাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আশা করি অগ্রসর হইতেছে। ইতি নিবেদক প্রভাত রায়।

নৃপেনকে বলিলাম, 'ব্যোমকেশ এখনও ফেরেনি।—আপনি এখনও প্রভাত বাবুর দোকানেই কাজ করছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আছেন কোথায়?'

'পুরানো বাসাতেই আছি। প্রভাতবাবু থাকতে দিয়েছেন।'

'ননীবালা দেবীর সঙ্গে বেশ বনিবনাও হচ্ছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন।'

'ওদিকের খবর কি? নিমাই নিতাই?'

'ওরা আদালতের হুকুম পেয়েছে। আমাদের বাসায় অনাদিবাবুর যে সব জিনিস ছিল সব তুলে নিয়ে গেছে। আলমারিও নিয়ে গেছে।'

'পুলিসের দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ পেয়েছেন?'

'কিছু না।'

'কেষ্টবাবুর খবর কি?'

'জানি না। সেই যে বাসা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তারপর আর দেখিনি।'

নৃপেন চলিয়া গেল।

উপন্যাস লইয়া বসিলাম। কিন্তু মন বিক্ষিপ্ত, তাহাকে কলমের ডগায় ফিরাইয়া আনিতে পারিলাম না। আরও কয়েকদিন ছটফট করিয়া পাটনায়

ফিরিয়া গেলাম।

ব্যোমকেশ দিল্লী হইতে ফিরে নাই। গোটা দুই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পোস্টকার্ড আসিয়াছে, ভাল আছি, ভাবনা করিও না। কবে ফিরিব স্থিরতা নাই।

এদিকে স্বাধীনতা দিবস অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সমস্ত দেশ অভাবনীয় সম্ভাবনার আশায় যেন দিশাহারা হইয়া গিয়াছে।

আগস্ট মাসের দশ তারিখে হঠাৎ ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিল।

রোগা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শুষ্ক মুখে বিজয়ীর হাসি। বলিল, 'আর না, চল কলকাতায় ফেরা যাক। পুঁটিরামকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে দাও।'

পনেরো

ইচ্ছা ছিল সত্যবতী ও খোকাকে লইয়া একসঙ্গে কলিকাতায় ফিরিব, সত্যবতীও এতদিন বাহিরে বাহিরে থাকিয়া ঘরে ফিরিবার জন্য দড়িছেঁড়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। পাটনায় দীর্ঘকাল থাকার ফলে বেশ একটি সংসার গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা গুটাইয়া লইবার ভার একা সুকুমারের ঘাড়ে চাপাইয়া চলিয়া যাইতে পারিলাম না। কথা হইল হপ্তাখানেক পরে সুকুমার সত্যবতীদের লইয়া ফিরিবে, আমরা আগে গিয়া বাসাটা সাজাইয়া গুছাইয়া সত্যবতীর উপযোগী করিয়া রাখিব।

১৩ই আগস্ট প্রত্যূষে আমি ও ব্যোমকেশ কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

তখনও সূর্যোদয় হয় নাই। বাসার সম্মুখে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া দেখি আমাদের সদর দরজার সামনে ভিড় জমিয়াছে। ভিড়ের মধ্যে পুঁটিরামকেও দেখা গেল। ব্যাপার কি! আমরা ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একটি মৃতদেহ ফুটপাথে পড়িয়া আছে, পিঠের বাঁ দিকে রক্তের দাগ শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। দৃষ্টিহীন চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া খোলা।

চিনিতে কষ্ট হইল না, কেষ্টবাবু।

এখনও পুলিস আসিয়া পৌঁছে নাই। আমরা ভিড়ের বাহিরে আসিলাম, পুঁটিরামকে ডাকিয়া লইয়া উপরে চলিলাম। ব্যোমকেশের মুখ লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চোখে চাপা আগুন।

নিজেদের বসিবার ঘরে গিয়া দুজন উপবিষ্ট হইলাম। কেষ্টবাবুর হঠাৎ ভাগ্যোন্নতি যে এইরূপ পরিণতি লাভ করিবে তাহা কে ভাবিয়াছিল। আমি বলিলাম, 'আমার ধারণা হয়েছিল কলকাতায় সম্মুখ-সমর বন্ধ হয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা সম্মুখ-সমর নয়, কেষ্ট দাসকে পিছন থেকে ছুরি মেরেছে। পুঁটিরাম, তুই চিনতে পারলি?'

পুঁটিরাম বলিল, 'আজ্ঞে চিনেছি, উনি সেই ভেট্কিমুণ্ডবাবু। কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছিলেন, আপনার কথা জিজ্ঞেস করলেন।'

'কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছিল?'

'আজ্ঞে। আমি বললাম, চিঠি পেয়েছি বাবুরা কাল সকালে আসবেন। তখন তিনি চলে গেলেন।'

'হুঁ। আচ্ছা পুঁটিরাম, তুই চা তৈরি কর গিয়ে।'

ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় পা ছড়াইয়া কড়িকাঠের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া রহিল। আমি জানালায় গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম ফুটপাথে পুলিসের আবির্ভাব হইয়াছে, ভিড় সরিয়া গিয়াছে। কেষ্টবাবুকে একটা মোটর ভ্যানে তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। পুলিস কেষ্টবাবুর নাম ধাম জানিতে পারিল কিনা বোঝা গেল না। তাহারা লাশ লইয়া চলিয়া গেল।

চা আসিল। ব্যোমকেশ চায়ে এক চুমুক দিয়া বলিল, 'লাশ দেখে মনে হয় শেষরাত্রির দিকে—রাত্রি তিনটে-চারটের সময়, কেষ্ট দাস খুন হয়েছে। প্রথম যেদিন কেষ্টবাবু আমার কাছে আসে সেও রাত্রি তিনটে-চারটের সময়। কিন্তু তখন একটা কারণ ছিল, আজ এতরাত্রে কি জন্যে আসছিল?'

বলিলাম, 'তোমার কাছেই আসছিল তার প্রমাণ কি? মাতাল দাতাল মানুষ—হয়তো এই দিক দিয়ে যাচ্ছিল, গুণ্ডা ছুরি মেরেছে।'

'না, এতবড় সমাপতন সম্ভব নয়, কেষ্ট দাস আমার কাছেই আসছিল। কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছিল, আমি নেই শুনে ফিরে গিয়েছিল। তারপর রাত্রে এমন কিছু ঘটল যে সে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না।' ব্যোমকেশ হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'ভেবেছিলাম অনাদি হালদারের ব্যাপারটা ভুলে যাব, কিন্তু এরা ভুলতে দিলে না।'

'অনাদি হালদারের সঙ্গে কেষ্টবাবুর মৃত্যুর সম্বন্ধ আছে নাকি?'

ব্যোমকেশ আমার প্রতি একটি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর আরাম-কেদারায় লম্বা হইল।

বেলা আটটা নাগাদ বিকাশ দত্ত আসিল। তাহার আর সেই অণ্ডঃশূন্য চুপসানো ভাব নাই; আমাদের দেখিয়া দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, 'এই যে আপনারা এসে গেছেন স্যার! আমি পাটনায় চিঠি লিখতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার দেখে যাই। কিছু নতুন খবর আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বসুন, খবর শুনব। নিজের কথা আগে বলুন। আট-নয় মাস বাইরে ছিলাম, আপনার অসুবিধে হয়নি তো?'

বিকাশ বলিল, 'অসুবিধে একটু হয়েছিল স্যার। কিন্তু সে কিছু নয়। এখন সামলে নিয়েছি। তিন মাইল ঘাস কিনেছি, তাতেই চলে যাচ্ছে।'

'তিন মাইল ঘাস!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

বিকাশ তিন মাইল ঘাসের রহস্য প্রকাশ করিল। রেল লাইনের দুধারে যে ঘাস জন্মায়, রেলের কর্তৃপক্ষ নাকি তাহা প্রতি বৎসর জমা দিয়া থাকেন। বিকাশ তিন মাইল ঘাস জমা লইয়াছে এবং গোয়ালাদের সেই ঘাস বিক্রয় করিতেছে। বিকাশের কোন কষ্ট নাই, গোয়ালারা অগ্রিম পয়সা দিয়া গরু মোষ চরায়; বিকাশের কিছু লাভ থাকে।

বিকাশ বলিল, 'তাছাড়া চাকরিটা বোধহয় এবার ফিরে পাব স্যার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ বেশ, এবার কি নতুন খবর আছে বলুন। আপনার ছাত্রকে আজ সকালে পড়াতে যাননি?'

বিকাশ বলিল, 'পড়াব কাকে স্যার? পাখী উড়েছে।'

'সে কি!'

'সেই খবরই তো দিতে এলাম। গোড়ার দিক থেকে বলব, না শেষের দিক থেকে?'

'গোড়ার দিক থেকে বলুন।'

বিকাশ তখন তক্তপোশের উপর ভাবিযুক্ত হইয়া বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, 'চিঠিতে আপনাকে যে সব খবর দিয়েছিলাম তারপর আর নতুন খবর কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। ঢিমে-তেতালায় চলছিল, তবু লেগে রইলাম। বসে না থাকি বেগার খাটি। মাসখানেক আগে জানতে পারলাম দয়ালহরি মজুমদারের নামে একজন পাঁচ হাজার টাকার মামলা ঠুকে দিয়েছে। দয়ালহরি বুড়োর ভাবগতিক দেখে মনে হল সে কেটে পড়বার মতলবে আছে। দিন কয়েক পরে হঠাৎ একদিন প্রভাত এসে উপস্থিত। প্রভাতকে আগে দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম। বুড়ো তাকে ঢুকতেই দিচ্ছিল না, তারপর ঘরে এনে বসালো। দোর বন্ধ করে কথাবার্তা হল, আমি জানলায় কান লাগিয়ে শুনলাম। প্রভাত বলছে আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি, দোকান বাঁধা রেখে যেখান থেকে হোক পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করব, আপনি হ্যান্ডনোটের টাকা শোধ করে দিন। বুড়ো পাঁচ হাজার টাকার বদলে প্রভাতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হল।

'এদিকে গদানন্দর সঙ্গে ভাল কথা, জগদানন্দ অধিকারীর ডাক-নাম গদানন্দ শিউলীর ভেতরে ভেতরে কিছু চলছিল। গদানন্দ সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি, মেয়ে ধরা ওর পেশা, বেটা দালাল। সে যাহোক, হপ্তাখানেক পরে প্রভাত এসে, ছোট্ট অ্যাটাচি কেস্ হাতে নিয়ে এল, বুঝলাম টাকা এনেছে। তারপর জানলায় কান লাগিয়ে শুনলাম বুড়ো বলছে, তুমি ভাল ছেলে, অনাদি হালদার তোমার নামে মিছে কথা বলেছিল। আমি তোমার সঙ্গে শিউলীর বিয়ে দেব। কিন্তু শ্রাবণ মাসে আর বিয়ের দিন নেই, অঘ্রাণ মাসে বিয়ে হবে। প্রভাত খুশী হয়ে চলে গেল।

'তারপর কি ব্যাপার হল জানি না ৭ই আগস্ট পড়াতে গিয়ে শুনলাম গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে উধাও হয়েছে। বুড়োর সাজিশ ছিল কিনা বলতে পারি না, আমার বিশ্বাস বুড়োই নাটের গুরু। যাহোক, সেদিন সন্ধ্যেবেলা প্রভাত এল। খুব খানিকটা চেঁচামেচি হল। প্রভাত টাকা ফেরং চাইল, বুড়ো হাত উল্টে বলল, টাকা কোথায় পাব, শিউলী আর গদানন্দ টাকা নিয়ে পালিয়েছে। প্রভাত রাগে ধুকতে ধুকতে ফিরে গেল। বেচারার তাতেও গেল যে টও ভবল না।

'কাল সকালবেলা পড়াতে গিয়ে দেখি বাড়ির দরজা খোলা, বাড়িতে কেউ নেই। বুড়ো ছেলেটাকে নিয়ে কেটে পড়েছে।'

গল্প শেষ করিয়া বিকাশ একটা বিড়ি ধরাইয়া ফেলিল, বলিল 'এসব খবর আপনার কাজে লাগবে কিনা জানি না স্যার কিন্তু এর বেশী আর কিছু যোগাড় করা গেল না।'

'সব খবর কাজের খবর' ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল, তারপর চোখ খুলিয়া বলিল, 'গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে কোথায় গেছে আপনি জানেন না বোধহয়?'

'না। যদি বলেন খুঁজে বার করতে পারি।'

ব্যোমকেশ একটু মৌন থাকিয়া বলিল, 'আর একটা কাজ আপনাকে করতে হবে—'

এই সময় দরজায় টোকা পড়িল।

দ্বার খুলিয়া দেখি প্রভাত। তাহার চুল উষ্কখুষ্ক, মুখ শীর্ণ, চোখভরা

ক্লান্তি। তাহাকে দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন, প্রভাতবাবু, আমরা ফিরেছি খবর পেলেন কোত্থেকে?'

প্রভাত চেয়ারে বসিল। বিকাশকে সে লক্ষ্যই করিল না; বিকাশও তক্তপোশের এক কোণে এমনভাবে গুটিসুটি হইয়া বসিল যে প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রভাত বলিল, 'খবর পাইনি, দেখতে এলাম যদি এসে থাকেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ। কেষ্টবাবু মারা গেছেন আপনি শোনেননি বোধহয়।'

প্রভাত কিছুক্ষণ নির্লিপ্ত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল, যেন কেষ্টবাবুর মরা-বাঁচা সম্বন্ধে তাহার তিলমাত্র কৌতূহল নাই।

'না, শুনিনি। কি হয়েছিল?'

'কাল রাত্রে কেউ তাকে ছুরি মেরেছিল।'

উদাসীনকণ্ঠে প্রভাত বলিল, 'ও—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক ও কথা। দয়ালহরিবাবুর নামে নিমাই নিতাই পাঁচ হাজার টাকার হ্যান্ডনোটের উপর নালিশ করেছে জানেন নিশ্চয়।'

প্রভাতের মুখ বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, 'জানি। কিন্তু ও কথাও যেতে দিন, ব্যোমকেশবাবু। মানুষের অ-মনুষ্যত্ব দেখে দেখে আমার মন বিষিয়ে গেছে। আমি আপনাকে জানাতে এসেছিলাম যে, আর আমার এখানে মন টিকছে না, আমি শীগ্গিরই চলে যাব।'

'সে কি, কোথায় যাবেন?'

'তা এখনও ঠিক করিনি পাটনায় ফিরে যেতে পারি। যেখানেই যাই দু' মুঠো জুটে যাবে। কলকাতায় আর নয়!'

'কিন্তু—আপনার দোকান?'

'দোকান বিক্রি করে দেব—' প্রভাতের মুখ ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল, সে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'অজিতবাবু, আপনার জানাশোনা কেউ আছে, যে বইয়ের দোকান কিনতে পারে? বেশী দাম আমি চাই না। তিন হাজার—আড়াই হাজার পেলেও আমি বিক্রি করে দেব।'

ভাবিতে লাগিলাম, জানাশোনার মধ্যে এমন কে আছে যে, বইয়ের দোকান কিনিতে পারে। হঠাৎ ব্যোমকেশ এক অদ্ভুত কথা বলিয়া বসিল, 'আমরা কিনতে পারি। আমি আর অজিত কিছুদিন থেকে পরামর্শ করছি একটা বইয়ের দোকান খুলব। অজিত নিজে লেখক, ও চালাতে পারবে। আপনার দোকানটা যদি পাওয়া যায় তাহলে তো ভালোই হয়।'

প্রভাতের মুখে একটু সজীবতা দেখা দিল, সে বলিল, 'আপনারা নেবেন? তার চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? আপনারা নিলে দোকান বিক্রি করেও আমার দুঃখ হবে না। তাহলে—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কত টাকার বই আছে আপনার দোকানে?'

প্রভাত বলিল, 'হিসেব না দেখে কিছু বলতে পারি না, কিন্তু চার হাজার টাকার কম হবে না।'

'বেশ, কাল সকালে গিয়ে আমরা আপনার হিসেবপত্র দেখব। দোকানের ওপর মর্টগেজ নেই তো?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে কথা রইল, কাল আমরা আপনার কাগজপত্র দেখব, স্টক মিলিয়ে নেব। যা ন্যায্য দাম তাই আপনি পাবেন। কিন্তু একটা কথা। ১৫ই আগস্ট সকালে আমাদের দখল দিতে হবে। স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে ব্যবসা আরম্ভ করতে চাই।'

'তাই হবে। যখন দখল চাইবেন তখনই দেব। আজ উঠি, হিসেবের কাগজপত্র ঠিক করে রাখতে হবে।'

'আচ্ছা। ভাল কথা, নৃপেনবাবু এখনও আছেন?'

'আছেন। তাঁকে অবশ্য বলে দিয়েছি যে আমি দোকান রাখব না। তিনি অন্য চাকরি খুঁজছেন, পেলেই চলে যাবেন। আপনারা কি তাকে রাখবেন?'

'রাখতেও পারি। তাকে একবার এখানে পাঠিয়ে দেবেন।'

'দোকানে গিয়েই পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা, নমস্কার।'

প্রভাত দ্বারের বাহিরে যাইবামাত্র ব্যোমকেশ এক লাফ দিয়া বিকাশকে ধরিল, দ্রুত-হ্রস্ব কণ্ঠে তাহার কানে কানে কথা বলিয়া তাহার হাতে কয়েকটা নোট গুঁজিয়া দিল। আমি কেবল তাহার শেষ কথাগুলি শুনিতে পাইলাম, 'মনে থাকে যেন, কাল রাত্রি বারোটা পর্যন্ত এক মিনিট আপনার ছুটি নেই।'

বিকাশ একবার দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িল, তারপর জ্যা-মুক্ত তীরের মত সাঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘর খালি হইয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাণ্ডকারখানা কি?'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া চেয়ারে অংগ প্রসারিত করিল, ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'একটা মস্ত সুযোগ হাতে এসেছে অজিত, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।'

'কোন্ সুযোগের কথা বলছ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এই ধরো বইয়ের দোকানটা। যদি পাওয়া যায়, ছাড়া উচিত কি? বইয়ের ব্যবসা খুব লাভের ব্যবসা; তুমিও মনের মতন একটা কাজ পাবে। শুধু বই লিখে আজকাল কিছু হয় না। দেখছ তো, তোমাদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান সাহিত্যিক তাঁরা দুটি দুটি ব্যবসায়ে ঢুকে পড়েছেন এবং বেশ দুধে-ভাতে আছেন।'

কথাটা সত্য। বইয়ের ব্যবসায় পয়সা আছে, বিশেষতঃ যদি স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের বাজার কোণ-ঠাসা করা যায়। তবু মৌখিক আপত্তি তুলিয়া বলিলাম, 'কিন্তু এই দুঃসময়ে হঠাৎ এতগুলো টাকা বার করা কি ভাল?'

সে বলিল, 'দুজনে ভাগাভাগি করে দিলে গায়ে লাগবে না। তুমি হবে খাটিয়ে অংশীদার, আর আমি ঘুমন্ত অংশীদার।'

আধঘণ্টা পরে নৃপেন আসিল। বলিল, 'প্রভাতবাবু পাঠালেন। আপনি আমায় ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ, বসুন ঐ চেয়ারে।' ব্যোমকেশ কঠিন চক্ষে কিয়ৎকাল তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আপনার সব কীর্তিই আমি জানতে পেরেছি। রমেশ মল্লিক আমার বন্ধু।'

ন্যাপা চমকিয়া কাষ্ঠমূর্তিতে পরিণত হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'অনাদি হালদারের আলমারির চাবি আপনি তৈরি করেছিলেন। আলমারিতে অনেক টাকা ছিল, সে টাকা কোথায় গেল? আমি যদি পুলিসকে খবর দিই তারা জানতে চাইবে। আপনি কী উত্তর দেবেন?'

ন্যাপা অধর লেহন করিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি কথাটা পুলিসের কানে না তুলতে পারি, যদি আপনি আমার একটা কাজ করেন।'

ন্যাপার কণ্ঠ হইতে ভাঙা-ভাঙা আওয়াজ বাহির হইল, 'কি কাজ?'

'আর একটা চাবি তৈরি করে দিতে হবে।'

ষোলো

কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, পোহায় আগস্ট নিশি একত্রিশা বাসরে। তারপর কতকাল কাটিয়া গিয়াছে, প্রথম পৌর স্বয়ংপ্রভুতার সেই দিনটিকে স্মরণ করিয়া রাখে এমন কেহ বাঁচিয়া নাই। আবার আর একটি আগস্ট নিশি পোহাইল। এবারও পর্ব ঘরে ঘরে, এবারও বাসাড়ে বাসিন্দা বেওয়া বেশ্যা করে সোর। কেবল পটভূমিকা আরও বিস্তৃত হইয়াছে, আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সকালে ঘুম ভাঙিয়া চিন্তা করিতে বসিলাম। এই যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইল ইহাতে আমার কৃতিত্ব কতটুকু? একটা পতাকা নাড়িয়াও তো সাহায্য করি নাই। (ব্যোমকেশ দিল্লীতে গিয়া সাত মাস ধরিয়া কিছু কাজ করিয়াছে।) আমার মত শত সহস্র মানুষ আছে যাহারা কিছুই করে নাই, অথচ তাহারা স্বাধীনতার ফল উপভোগ করিবে। একজন নৌকার দাঁড় টানে দশজন নদী পার হয়। ইহাই যদি সংসারের রীতি, তবে কর্ম ও কর্মফলের যোগাযোগ কোথায়?

ব্যোমকেশকে আমার আধ্যাত্মিক সমস্যার কথা বলিলাম। সে বলিল, 'স্বাধীনতা পরের চেষ্টায় পেয়েছি, কিন্তু নিজের চেষ্টায় তাকে সার্থক করে তুলতে হবে। কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

বেলা সাড়ে ন'টার সময় ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, এবার বেরুনো যাক্। প্রভাতের বাসা হয়ে তার দোকানে যাব।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'প্রভাতের বাসায় কী দরকার?'

মৃদু হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ননীবালা দেবীকে বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

বৌবাজারের বাসার নিম্নতলে অনিবার্য ষষ্ঠীবাবু হুঁকা-হাতে বিরাজমান। আমাদের দেখিয়া চকিতভাবে হুঁকা হইতে মুখ সরাইলেন। ব্যোমকেশ মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওপরতলার সঙ্গে এখন আর কোনও গণ্ডগোল নেই তো?'

ষষ্ঠীবাবু উদ্বেগপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'না—হ্যাঁ—না, গণ্ডগোল আমার কোনও কালেই ছিল না, আমি বুড়ো মানুষ, কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই—'

ব্যোমকেশ হাসিল, আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম।

সিঁড়ির দরজা খুলিয়া দিল একটি দাসী। অপরিচিত দু'জন লোক দেখিয়া সে সরিয়া গেল, আমরা প্রবেশ করিলাম। যে ঘরটিতে পূর্বে একটি কেঠো বেঞ্চি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, সেই ঘরটিকে কয়েকটি আরামপ্রদ চেয়ার দিয়া সাজানো হইয়াছে, দেয়ালে রবি বর্মার ছবি। ননীবালা দেবী একটি বৃহৎ চেয়ারে বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া একটি প্রখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা

দেখিতেছেন; তাঁহার হাতে পেন্সিল।

ননীবালা দেবীর বেশভূষা দেখিয়া তাক্ লাগিয়া যায়। চক্‌চকে পাটের শাড়ির উপর লতা-পাতা কাটা ব্লাউজ, দুই বাহুতে মোটা মোটা তাগা ও চুড়ি; সোনার হইতে পারে, গিল্‌টি হওয়াও অসম্ভব নয়। মুখে গৃহিণী-সুলভ গাম্ভীর্য। ননীবালা যে অনাদি হালদারের রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া নিজ মূর্তি ধারণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ননীবালা আমাদের দেখিয়া একটু থতমত হইলেন, তারপর হারমোনিয়ামের ঢাকনি খুলিয়া সম্ভাষণ করিলেন, 'আসুন আসুন। কেমন আছেন?—ওরে চিনিবাস, দু' পেয়ালা চা নিয়ে আয়। ব্যোমকেশবাবু, একটু মিষ্টিমুখ—?'

'না না, ও সব কিছু দরকার নেই। আমরা প্রভাতবাবুর খোঁজে এসেছিলাম।'

'প্রভাত! সে তো আটটার সময় দোকানে চলে গেছে।--একটু বসবেন না?'

চেয়ারে নিতম্ব ঠেকাইয়া বসিলাম। শুধু ঝি নয়, চিনিবাস নামধারী ভৃত্যও আছে, সম্ভবতঃ রাঁধুনীও নিযুক্ত হইয়াছে। শুক্রের মহাদশা না পড়িলে হঠাৎ এতটা বাড়্-বাড়ন্ত দেখা যায় না।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা কি করছেন?'

ননীবালা বলিলেন, 'ক্রস্‌ওয়ার্ড পাজ্‌ল্ ভাঙছি। জানেন, আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি, একুশ হাজার টাকা।' তাঁহার কণ্ঠে হারমোনিয়ামের সপ্তসুর গিট্‌কিরি খেলিয়া গেল।

গয়নাগুলা তবে গিল্‌টির নয়। আমরাও কিছুদিন ক্রস্‌ওয়ার্ডের ধাঁধা ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু আমাদের ভাঙা কপাল, ধাঁধা ভাঙিতে পারি নাই।

অভিনন্দন জানাইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ তাহলে উঠি। নৃপেনবাবুও কি দোকানে গেছেন?'

ননীবালা অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন, 'না। কাল থেকে ওর কি হয়েছে, ঘরে দোর বন্ধ করে আছে। কী যে করছে ওই জানে, খাওয়া দাওয়ার সময় নেই, দোকানে যাওয়া নেই - ওকে দিয়ে আর দেখছি আমাদের চলবে না।'

আমরা বিদায় লইলাম। পথে যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রভাত যে দোকান বিক্রি করে দিচ্ছে এ খবর বোধহয় ননীবালা জানেন না।'

দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ব্যোমকেশ একবার এদিক ওদিক চাহিল, তারপর বলিল, 'তুমি দোকানে যাও, আমি আসছি। জুতোর একটা পেরেক উঠেছে।'

দোকানের সামনা-সামনি রাস্তার অপর পারে গোলদীঘির দেয়াল ঘেঁষিয়া এক ছোকরা জুতা মেরামত করার সরঞ্জাম লইয়া বসিয়াছিল, ব্যোমকেশ তাহার কাছে গিয়া জুতা মেরামত করাইতে লাগিল। আমি দোকানে প্রবেশ করিলাম। প্রভাত হিসাবের খাতাপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, বলিল, 'এই যে! ব্যোমকেশবাবু এলেন না?'

'আসছে। আপনার হিসেব তৈরি?'

'হ্যাঁ। এই দেখুন না।'

আমি হিসাব দেখিতে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে ব্যোমকেশ আসিয়া যোগ দিল। হিসাব পরীক্ষা শেষ করিতে বেলা দুপুর হইয়া গেল। আমরা উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা তিন হাজার টাকাই দেব। কাল সকাল আটটার সময়

চেক পাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দখল দিতে হবে।'

'যে আজ্ঞে।'

সেদিন অপরাহ্ণে ব্যোমকেশ বলিল, 'ইন্দুবাবুকে টেলিফোন কর না, গদানন্দর সাম্প্রতিক খবর যদি কিছু পাওয়া যায়।'

বলিলাম, 'গদানন্দ তো পালিয়েছে, তাকে ইন্দুবাবু কোথায় পাবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে পালিয়েছে, কিন্তু ফেরারী হয়নি। শিউলী সাবালিকা, সে যদি কারুর সঙ্গে বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে, তাতে ফৌজদারী হয় না। গদানন্দ খুব সম্ভব তাকে নিজের বাসায় তুলেছে।'

'আচ্ছা দেখি—'

ইন্দুবাবুকে ফোন করিলাম। তিনি আমার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, 'গদানন্দর খবর জানি বৈকি। তাকে নিয়ে সিনেমা-মহল এখন সরগরম। সেদিন আপনাদের বলেছিলাম কিনা। গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে ভেগেছে, তারপর তাকে রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে করেছে। এই নিয়ে গদানন্দর তিনবার হল।'

'তিনবার! তিনবার কী?'

'তিনবার বিয়ে।'

'বলেন কি, আরও দুটো বউ আছে?'

'এখন আর নেই। প্রথম বউটা দেখতে খুব সুন্দরী ছিল, কিন্তু সিনেমায় সুবিধে হল না; ক্যামেরায় তার চেহারা ভাল এল না। সে হঠাৎ একদিন হার্ট ফেল করে মারা গেল। তারপর গদানন্দ আর একটা মেয়েকে ফুস্‌লে এনে বিয়ে করল। এ মেয়েটা অভিনয় ভালই করত কিন্তু personality ছিল না, দেখা গেল তাকে দিয়ে হিরোইনের পার্ট চলবে না। সেটাও বেশীদিন টিকল না।'

'কি সর্বনাশ! আপনার কি মনে হয় গদানন্দ বৌ দুটোকে—আঁা!'

'ভগবান জানেন। শিউলীর অবশ্য মাইকের গলা ভাল এই যা ভরসা।'

ব্যোমকেশকে বার্তা শুনাইলাম। সে আপন মনে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, তারপর বলিল, 'গদানন্দর বংশপরিচয় জানতে ইচ্ছে করে। এক পুরুষে এতটা হয় না।'

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। নগর দীপাবলীতে সজ্জিত হইয়া আর একটি দীপান্বিতা রাত্রিকে স্মরণ করাইয়া দিল। ঘরে ঘরে দোকানে দোকানে রেডিওর জলদমন্দ্র স্বর অন্য সব শব্দকে ডুবাইয়া দিল। সকলেরই কান পড়িয়া আছে দিল্লীর পানে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে স্বাধীনতার উদ্বোধন হইবে।

সাতটার সময় চকিতের ন্যায় নৃপেন আসিল, দ্বারের নিকট হইতে ব্যোমকেশের হাতে একটি চক্‌চকে চাবি দিয়া আলাদীনের জিনের মত অদৃশ্য হইল।

দশটার সময় আমরা আহার শেষ করিলাম।

সাড়ে এগারটার সময় ব্যোমকেশ পুঁটিরামকে বলিল, 'আমরা এখনি বেরুব, কখন ফিরব ঠিক নেই। তুই জেগে থাকিস। আর একটা আংটায় কাঠকয়লা দিয়ে আগুন করবার যোগাড় করে রাখিস। আমরা ফিরে এলে আগুন জ্বালবি।'

পুঁটিরাম 'যে-আজ্ঞে' বলিয়া প্রস্থান করিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাঠকয়লার আগুন কি হবে?'

সে বলিল, 'অতীতকে ভস্মীভূত করে ফেলতে হবে।'

মধ্যরাত্রির কিছু আগে আমরা বাহির হইলাম। ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজিতেছে—

গোলদীঘির চারি পাশের দোকানগুলি কিন্তু বন্ধ। দোকানদারেরা বোধকরি নিজ নিজ ঘরে গিয়া রেডিও যন্ত্র আঁকড়াইয়া বসিয়া আছেন। এত রাত্রে এদিকের রাস্তাগুলিও জনবিরল হইয়া আসিয়াছে।

একটি ল্যাম্পপোস্টের ছায়াতলে একজন লোক দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছিল, আমরা নিকটবর্তী হইলে বাহির হইয়া আসিল। দেখিলাম বিকাশ।

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছু খবর আছে নাকি?'

বিকাশ বলিল, 'না। প্রভাতবাবু সাড়ে ন'টার সময় দোকান বন্ধ করে চলে গেছেন।'

'হাতে কিছু ছিল?'

'না।'

'তারপর আর কেউ আসেনি?'

'না।'

'আচ্ছা, আসুন তাহলে।'

তিনজনে রাস্তা পার হইয়া প্রভাতের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ব্যোমকেশ চাবি দিয়া দ্বারের তালা খুলিল; বেশ অনায়াসে তালা খুলিয়া গেল। তারপর চাবি বিকাশের হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা দু'জনে ভেতরে যাচ্ছি, আপনি তালা বন্ধ করে দিন। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলা যায় না। আপনি যেমন ছিলেন তেমনি থাকবেন। যদি কেউ দোর খুলে ভেতরে ঢোকে, আপনার কিছু করবার দরকার নেই।'

'আচ্ছা স্যার।'

আমরা অন্ধকার দোকানে প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশের পকেটে বৈদ্যুতিক টর্চ ছিল, সে তাহা জ্বালিয়া ঘরের চারিদিকে ফিরাইল। সারি সারি বইগুলো যেন দাঁত বাহির করিয়া নীরবে হাসিল। আমরা পিছনের কুঠুরীতে প্রবেশ করিয়া তক্তপোশের কিনারায় বসিলাম, মাঝের দরজা একপাট খোলা রহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'এ ঘরে বই নেই, এ ঘরে বোধহয় আসবে না।'

আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ রাতদুপুরে আমরা প্রভাতের দোকানে কি করছি জানতে পারি কি?'

ব্যোমকেশ আমার কানে কানে বলিল, 'গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়িয়ে হামা, খাপ পেতেছেন গোষ্ঠমামা।'

বইয়ের দোকানের একটা গন্ধ আছে, নূতন বইয়ের গন্ধ। এই গন্ধ সাধারণতঃ টের পাওয়া যায় না, কিন্তু গভীর রাত্রে দোকানের মধ্যে বন্ধ থাকিলে ধীরে ধীরে অনুভব হয়। একটু ঝাঁজালো, নাক সুড় সুড় করে, হাঁচি আসে।

তার উপর নিজেদের নিশ্বাসের কার্বন-ডায়ক্সাইড আছে। ঘণ্টাখানেক প্রতীক্ষা করিবার পর অনুভব করিলাম, ঘরের বাতাস ভারী হইয়া আসিতেছে।

গরমে প্রাণ আনচান করিয়া উঠিল। বলিলাম, 'ব্যোমকেশ–'

ব্যোমকেশ বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিল, তাহার গলা হইতে চাপা শীৎকার বাহির হইল, 'স্ স্ স্—!'

আর একটি শব্দ কানে আসিল, কেহ চাবি দিয়া দ্বারের তালা খুলিতেছে।.....দরজা একটু ফাঁক হইল, বাহিরের আলো অচ্ছাভ পর্দার মত ধীরে ধীরে প্রসারিত হইল। একটি ছায়ামূর্তি প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। আমরা রুদ্ধশ্বাসে কুঠুরীর ভিতর হইতে দেখিতে লাগিলাম।

হঠাৎ দোকানঘরের মাঝখানে দপ্ করিয়া টর্চের আলো জ্বলিয়া উঠিল। আলোর দৃষ্টি ঊর্ধ্ব দিকে, সার্চ-লাইটের মত দেয়ালের উপর দিকে পড়িয়াছে। টর্চের পিছনে মানুষটিকে দেখা গেল না।

টর্চ হাতে লইয়া মানুষটি কাউন্টারের উপর লাফাইয়া উঠিল। আমরা পা টিপিয়া টিপিয়া কুঠুরীর দ্বারের নিকট হইতে উঁকি মারিলাম। টর্চের আলো বইয়ের সর্বোচ্চ তাকের উপর পড়িয়াছে। মানুষটি হাত বাড়াইয়া একটি বই বাহির করিয়া লইল; আকারে আয়তনে অনেকটা 'চলন্তিকা'র মত। তারপর আর একটি বই বাহির করিল, তারপর আর একটি। এমনিভাবে পাঁচখানি বই লইয়া মানুষটি লাফাইয়া নীচে নামিল, কাউন্টারের উপর জ্বলন্ত টর্চ রাখিয়া একটি বাজার-করা থলিতে বইগুলি ভরিতে লাগিল।

থলিতে বইগুলি ভরা হইয়াছে, এমন সময় ব্যোমকেশ গিয়া মানুষটির কাঁধে হাত রাখিল, বলিল, 'থলিটা আমায় দিন।'

মানুষটির গলায় করাতের মত দ্রুত নিশ্বাস টানার শব্দ হইল। তারপর ব্যোমকেশ তাহার মুখের উপর নিজের টর্চের আলো ফেলিল।

মুখখানা ভয়ে ও বিস্ময়ে বিকৃত হইলেও চেনা শক্ত নয়, প্রভাতের মুখ।

তাহার চোখের শাদা অংশই অধিক দেখা যাইতেছে। সে মিনিটখানেক চাহিয়া থাকিয়া অভিভূত স্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু!'

'হ্যাঁ, আমি আর অজিত। থলিটা দিন।'

প্রভাত একটু ইতস্তত করিল, তারপর থলি ব্যোমকেশের হাতে দিল।

ব্যোমকেশ থলিটা আমার হাত দিয়া বলিল, 'অজিত, এটা রাখ। বইগুলো ভারি দামী।—প্রভাতবাবু, এবার চলুন।'

প্রভাত আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'কোথায় যেতে হবে? থানায়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, আপাতত আমার বাসায়। আগে বইগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

তিনজনে দোকানের বাহিরে আসিলাম। ব্যোমকেশের ইঙ্গিতে প্রভাত দ্বারে তালা লাগাইল। ফিরিয়া দেখি বিকাশ অলক্ষিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'বিকাশবাবু, অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আপনার ছুটি। কাল সকালে একবার বাসায় আসবেন।'

'যে আজ্ঞে স্যার–' বিকাশ অন্তর্হিত হইল। আমি ও ব্যোমকেশ প্রভাতকে মাঝখানে লইয়া বাসার দিকে চলিলাম।

সতেরো

তিনজনে আসিয়া আমাদের বসিবার ঘরে উপবিষ্ট হইয়াছি। প্রভাত ও আমি দুইটি চেয়ারে বসিয়াছি, ব্যোমকেশ তক্তপোশের উপর বইয়ের থলিটি লইয়া বসিয়াছে। রাত্রি প্রায় দুইটা; বাহিরে নগর-গুঞ্জন শান্ত হইয়াছে।

ব্যোমকেশের মুখ গম্ভীর, একটু বিষণ্ণ। সে চোখ তুলিয়া একবার প্রভাতের পানে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, প্রভাতের মুখে কিন্তু অপরাধের গ্লানি নাই, ধরা পড়িবার সময় যে চকিত ভয় ও বিস্ময় তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহা তিরোহিত হইয়াছে। সে এখন সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ, সকল প্রকার সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত।

ব্যোমকেশ একে একে বইগুলি থলি হইতে বাহির করিল। বোর্ডের বাঁধাই বাদামী রঙের বইগুলি, বাহির হইতে দৃষ্টি-আকর্ষক নয়। কিন্তু ব্যোমকেশ যখন তাহাদের পাতা মেলিয়া ধরিল, তখন উত্তেজনায় হঠাৎ দম আটকাইবার উপক্রম হইল। প্রত্যেক বইয়ের প্রত্যেকটি পাতা এক একটি একশত টাকার নোট।

ব্যোমকেশ বইগুলি একে একে পর্যবেক্ষণ করিয়া পাশে রাখিল, প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সবসুদ্ধ কত আছে বইগুলোতে?'

প্রভাত বলিল, 'প্রায় দু'লাখ। কিছু আমি খরচ করেছি।'

'দয়ালহরি মজুমদারকে যে টাকা দিয়েছেন তা ছাড়া আর কিছু খরচ হয়েছে?'

প্রভাতের চোখের দৃষ্টি চকিত হইল, ব্যোমকেশ এত কথা কোথা হইতে জানিল এই প্রশ্নটাই যেন তাহার চক্ষু হইতে উঁকি মারিল। কিন্তু সে কোনও প্রশ্ন না করিয়া বলিল, 'আরও কিছু খরচ হয়েছে, সব মিলিয়ে চৌদ্দ পনেরো হাজার।'

ব্যোমকেশ তখন বইগুলির উপর হাত রাখিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, 'প্রভাতবাবু, এইগুলোর জন্যেই কি আপনি অনাদি হালদারকে খুন করেছিলেন?'

প্রভাত দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িল, 'না, ব্যোমকেশবাবু।'

'তবে কি জন্যে একাজ করলেন বলবেন কি?'

প্রভাত একবার যেন বলিবার জন্য মুখ খুলিল, তারপর কিছু না বলিয়া মুখ বন্ধ করিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি যদি না বলেন, আমিই বলছি।- শিউলীর সঙ্গে আপনার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে অনাদি হালদার নিজে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। এইজন্যে কেমন?'

প্রভাত কিছুক্ষণ বুকে ঘাড় গুঁজিয়া যখন মুখ তুলিল, তখন তাহার রগের শিরাগুলো উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দাঁতের গড়নে যে হিংস্রতা আগে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কথা বলিবার সময় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল; সে অবরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'হ্যাঁ। অনাদি হালদার শিউলীর বাপকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে রাজী করিয়েছিল- ' এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামিয়া গেল, নীরবে বসিয়া যেন অন্তরের আগুনে ফুলিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম তাহলে।—কিন্তু আপনি কেষ্টবাবুকে মারতে গেলেন কেন?'

ক্রোধ ভুলিয়া প্রভাত সবিস্ময়ে ব্যোমকেশের পানে চোখ তুলিল। বলিল,

'সে কি! কেষ্টবাবুর কথা আমি তো কিছু জানি না!'

ব্যোমকেশ সন্দেহ-কণ্টকিত দৃষ্টিতে প্রভাতকে বিদ্ধ করিল—'আপনি কেষ্ট দাসকে খুন করেননি?'

প্রভাত বলিল, 'না, ব্যোমকেশবাবু। কেষ্টবাবু গত আট মাসে আমার কাছ থেকে আট হাজার টাকা নিয়েছে। তার মরার খবর পেয়ে আমি খুশী হয়েছিলাম; কিন্তু আমি তাকে খুন করিনি। বিশ্বাস করুন, আমি যদি খুন করতাম, আজ আপনার কাছে অস্বীকার করতাম না।'

ব্যোমকেশের মুখখানা ধীরে ধীরে প্রফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল, যে বিষণ্ণতা কুয়াশার মত তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন কাটিয়া গেল। সে বলিল, 'কিন্তু, কেষ্ট দাসকে তাহলে খুন করলে কে?'

'তা জানি না। তবে—' প্রভাত ইতস্তত করিল।

'তবে?'

প্রভাত একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল, 'দশ-বারোদিন আগে বাঁটুল সর্দার আমার কাছে এসেছিল। বাঁটুলকে আপনারা বোধহয় চেনেন না—'

'খুব চিনি। এমন কি আপনার সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ তাও জানি। তারপর বলুন।'

'বাঁটুল আমাকে কেষ্টবাবুর কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল; কেষ্টবাবু কে, অনাদিবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে কী জানে, এই সব। আমি বাঁটুলকে সব কথাই বললাম। তারপর—'

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'যাক, এবার বুঝেছি। আপনাকে ব্ল্যাকমেল করে কেষ্ট দাসের টাকার ক্ষিদে মেটেনি, সে গিয়েছিল বাঁটুলকে ব্ল্যাকমেল করতে। অতিলোভে তাঁতী নষ্ট।'—ব্যোমকেশ হাঁক দিল, 'পুঁটিরাম!'

পুঁটিরাম ভিতর দিকের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'পুঁটিরাম, তিন পেয়ালা চা হবে?'

পুঁটিরাম বলিল, 'আজ্ঞে, দুধ নেই বাবু।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কুছ পরোয়া নেই, আদা দিয়ে চা তৈরি কর। আর কয়লার আংটা ঠিক করে রেখেছ?'

'আজ্ঞে।'

'বেশ, এবার তাতে আগুন দিতে পার।'

পুঁটিরাম প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রভাতবাবু, আপনার মা ননী-বালা দেবী বোধহয় কিছু জানেন না?'

'আজ্ঞে না।' প্রভাত কিছুক্ষণ বিস্ময়-সম্ভ্রমভরা চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আপনি কি সবই জানতে পেরেছেন, ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'বোধহয় পেরেছি। তবে বলা যায় না, কিছু ভুলচুক থাকতে পারে। যেমন কেষ্ট দাসের মৃত্যুটা আপনার ঘাড়ে চাপিয়েছিলাম। আমার বোঝা উচিত ছিল, ছুরি আপনার অস্ত্র নয়।'

আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, কি করে সব বুঝলে বল না, আমি তো এখনও কিছু বুঝিনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ, বলছি। অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে, তা আমি পাটনা যাবার আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তখন ভেবেছিলাম

অনাদি হালদারের মৃত্যু সম্বন্ধে কারুরই যখন কোনও গরজ নেই, তখন আমারই বা কিসের মাথা ব্যথা। কিন্তু ফিরে এসে যখন দেখলাম কেষ্ট দাসও খুন হয়েছে, তখন আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। যে লোক মানুষ খুন করে নিজের জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চায়, তাকে শাসন করা দরকার। যা হোক, এখন দেখছি আমি ভুল করেছিলাম, প্রভাতবাবু কেষ্ট দাসকে খুন করেননি। আমি একটা কঠোর কর্তব্যের হাত থেকে মুক্তি পেলাম।--এবার গল্পটা শোনো। প্রভাতবাবু, যদি কোথাও ভুলচুক হয় আপনি বলে দেবেন।'

ব্যোমকেশ অনাদি হালদারের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। বিস্ময়ের সহিত অনুভব করিলাম, আজিকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নূতন। ব্যোমকেশ হত্যাকারীকে বন্ধুর মতন ঘরে বসাইয়া হত্যার কাহিনী শুনাইতেছে, এরূপ ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটে নাই।

—'অনাদি হালদার গত যুদ্ধের সময় কালাবাজারে অনেক টাকা রোজগার করেছিল। বোধহয় আড়াই লাখ কি তিন লাখ। প্রভাতবাবু, আপনি ক'খানা বই বেঁধেছিলেন?'

প্রভাত বলিল, 'ছ'খানা। প্রত্যেকটাতে চারশো নোট ছিল।'

'অর্থাৎ দু'লাখ চল্লিশ হাজার।—বেশ ধরা যাক অনাদি হালদার পৌনে তিন লাখ কালো টাকা রোজগার করেছিল। প্রশ্ন উঠল, এ টাকা সে রাখবে কোথায়? ব্যাঙ্কে রাখা চলবে না, তাহলে ইনকাম ট্যাক্সের ডালকুত্তারা এসে টুঁটি টিপে ধরবে। অনাদি হালদার এক মতলব বার করল।

'অনাদি হালদার যেমন পাজি ছিল, তেমনি ছিল তার কুচুটে বুদ্ধি। আজ পর্যন্ত ইনকাম ট্যাক্সের পেয়াদাকে ফাঁকি দেবার অনেক ফন্দি-ফিকির বেরিয়েছে, সব আমার জানা নেই। কিন্তু অনাদি হালদার যে ফন্দি বার করল, সেটাও মন্দ নয়। প্রথমে সে টাকাগুলো একশো টাকার নোটে পরিণত করল। সব এক জায়গায় করল না; কিছু কলকাতায়, কিছু দিল্লীতে, কিছু পাটনায়, যাতে কারুর মনে সন্দেহ না হয়।

'পাটনায় যাবার হয়তো অন্য কোনও উদ্দেশ্যও ছিল। যা হোক, সেখানে সে দপ্তরীর খোঁজ নিল; প্রভাতবাবু তার বাসায় এলেন বই বাঁধতে। বিদেশে বাঙালীর ছেলে, প্রভাতবাবুকে দেখে অনাদি হালদারের পছন্দ হল। এই ধরনের দপ্তরী সে খুঁজছিল, সে প্রভাতবাবুকে আসল কথা বলল; এও বলল যে, সে তাঁকে পুষ্যিপুত্তুর নিতে চায়। পুষ্যিপুত্তুর নেবার কারণ, এত বড় গুপ্তকথা জানবার পর প্রভাতবাবু চোখের আড়াল না হয়ে যান।

'প্রভাতবাবু বই বেঁধে দিলেন। পুষ্যিপুত্তুর নেবার প্রস্তাব পাকাপাকি হল। অনাদি হালদার প্রভাতকে আর ননীবালা দেবীকে নিয়ে কলকাতায় এল। নোটের বইগুলো অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে আলমারিতে উঠল। স্টীলের আলমারি, তার একমাত্র চাবি থাকে অনাদি হালদারের কোমরে। সুতরাং কেউ যে আলমারি খুলবে, সে সম্ভাবনা নেই। যদি-বা কোনও উপায়ে কেউ আলমারি খোলে, সে কী দেখবে? কতকগুলো বই রয়েছে, মহাভারত রামায়ণ ইত্যাদি। টাকাকড়ি সামান্যই আছে। বই খুলে বইয়ের পাতা পরীক্ষা করার কথা কারুর মনে আসবে না। এছাড়া বাইরের লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে ব্যাংকেও কয়েক হাজার টাকা রইল।

'অনাদি হালদারের কলকাতার বাসায় আরও দু'জন লোক ছিল—কেষ্ট দাস আর নৃপেন। নৃপেন ছিল তার সেক্রেটারী। অনাদি হালদার ভাল লেখাপড়া জানত না, তাই ব্যবসার কাজ চালাবার জন্যে নৃপেনকে রেখেছিল। আর কেষ্ট দাস জোর করে তার ঘাড়ে চেপে বসেছিল। কেষ্ট দাস ছিল অনাদি হালদারের ছেলেবেলার বন্ধু, অনাদির অনেক কুকীর্তির খবর জানত, নিজেও তার অনেক কুকীর্তির সঙ্গী ছিল।

'অনাদি হালদার সতরো-আঠারো বছর বয়সে নিজের বাপকে এমন প্রহার করেছিল যে, পরদিনই বাপটা মরে গেল। পিতৃহত্যার বীজ ছিল অনাদির রক্তে। জীবজগতে বাপ আর ছেলের সম্পর্ক হচ্ছে আদিম শত্রুতার সম্পর্ক; সেই আদিম পাশবিকতার বীজ ছিল অনাদি হালদারের রক্তে। বাপকে খুন করে সে নিরুদ্দেশ হল। আত্মীয়স্বজনেরা অবশ্য কেলেঙ্কারীর ভয়ে ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিলে।

'অনেকদিন পরে অনাদির সঙ্গে কেষ্ট দাসের আবার দেখা; দু'জনে মিলে এক মারোয়াড়ীর ঘরে ডাকাতি করতে গেল। অনাদি মারোয়াড়ীকে খুন করে টাকাকড়ি নিয়ে ফেরারী হল, কেষ্ট দাস লুটের বখরা কিছুই পেল না।

'এবার কুড়ি বছর পরে অনাদিব সঙ্গে আবার কেষ্ট দাসের দেখা। অনাদি তখন বৌবাজারের বাসা নিয়ে বসেছে; কেষ্ট দাস তাকে বলল, তুমি খুন করেছ, যদি আমাকে ভরণপোষণ না কর, তোমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেব। নিরুপায় হয়ে অনাদি কেষ্ট দাসকে ভরণপোষণ করতে লাগল।

'এদিকে অনাদি হালদারের দুই ভাইপো নিমাই আর নিতাই খবর পেয়েছিল যে, খুড়ো অনেক টাকার মালিক হয়ে কলকাতায় এসে বসেছে। তাবা অনাদির কাছে যাতায়াত শুরু করল। অনাদি ভারি ধূর্ত, সে তাদের মতলব বুঝে কিছুদিন তাদের ল্যাজে খেলালো, তারপর একদিন তাড়িয়ে দিলে। নিমাই নিতাই দেখল, খুড়োর সম্পত্তি বেহাত হয়ে যায়, তারা খুড়োর ভাবী পুষ্যিপুত্তুরকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না। গুর্খা দারোয়ান দেখে তারা প্রভাতবাবুর দোকানে যাওয়া বন্ধ করল।

'কিন্তু এত টাকার লোভ তাবা ছাড়তে পারছিল না। কোনও দিকে কিছু না পেয়ে তারা অনাদি হালদারের বাসার সামনে হোটেলে ঘর ভাড়া করল, অষ্টপ্রহব বাড়ির ওপব নজর রাখতে লাগল। এতে অবশ্য কোনও লাভ ছিল না, কিন্তু মানুষ যখন কোনও দিকেই রাস্তা খুঁজে না পায়, তখন যা হোক একটা করেই মনকে ঠাণ্ডা রাখে। নিমাই-নিতাই পালা করে হোটেলে আসত, আর চোখে দূরবীন লাগিয়ে জানালায় বসে থাকত। অজিত, তোমার মনে আছে বোধহয়, ননীবালা যেদিন প্রথম এসেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, সর্বদাই যেন অদৃশ্য চক্ষু তাঁদের লক্ষ্য করছে। সে অদৃশ্য চক্ষু নিমাই নিতাইয়ের।

'যা হোক, দিন কাটছে। অনাদি হালদার জমি কিনে বাড়ি ফেঁদেছে। প্রভাতবাবুকে সে পুষ্যিপুত্তুর নেবার আশ্বাস দিয়ে এনেছিল, প্রথমটা তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করল। তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দোকান করে দিলে; অ্যাটর্নীর কাছে গিয়ে পুষ্যিপুত্তুর নেবার বিধি-বিধান জেনে এল। কিন্তু বাঁধা-বাঁধির মধ্যে পড়বার খুব বেশী আগ্রহ তার ছিল না, সে পাকাপাকি লেখাপড়া করতে দেরি করতে লাগল। প্রভাতবাবু দোকান নিয়ে নিশ্চিন্ত

আছেন, ননীবালা দেবী জানেন না যে পুষ্যিপুত্তুর নিতে হলে লেখাপড়ার দরকার। তাই এ নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করল না।

'তারপর এক ব্যাপার ঘটল। প্রভাতবাবু শিউলী মজুমদারকে দেখে এবং তার গান শুনে মুগ্ধ হলেন। তিনি শিউলীদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করলেন। দয়ালহরি মজুমদার ঘুঘু লোক, সে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারল যে প্রভাতবাবু বড়লোকের পুষ্যিপুত্তুর; প্রভাতবাবুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তার আপত্তি হল না। দয়ালহরি মজুমদারের চালচুলো নেই, সে ভাবল ফাঁকতালে যদি মেয়ের বিয়েটা হয়ে যায়, মন্দ কি!

'প্রভাতবাবু ননীবালা দেবীকে শিউলীর কথা বললেন। ননীবালা অনাদি হালদারকে বললেন। প্রভাতবাবুর বিয়ে দিতে অনাদি হালদারের আপত্তি ছিল না, সে বলল, মেয়ে দেখে যদি পছন্দ হয় তো বিয়ে দেব।

'তখন পর্যন্ত অনাদি হালদারের মনে কোনও বদ্-মতলব ছিল না, নেহাৎ বরকর্তা সেজেই সে মেয়ে দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু শিউলীকে দেখে সে মাথা ঠিক রাখতে পারল না। মানুষের চরিত্রে যতরকম দোষ থাকতে পারে, কোনটাই অনাদি হালদারের বাদ ছিল না। সে ঠিক করল, শিউলীকে নিজে বিয়ে করবে।

'বাসায় ফিরে এসে সে বলল, মেয়ে পছন্দ হয়নি। তারপর তলে তলে নিজের ঘটকালি আরম্ভ করল। দয়ালহরি মজুমদার দেখল, দাঁও মারবার এই সুযোগ; সে ঝোপ বুঝে কোপ মারল। অনাদি হালদারকে বলল, তুমি বুড়ো, তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব কেন? তবে যদি তুমি দশ হাজার টাকা দাও—

'এইভাবে কিছুদিন দর-কষাকষি চলল, তারপর রফা হল, অনাদি হালদার পাঁচ হাজার টাকা হ্যান্ডনোটের ওপর ধার দেবে। বিয়ের পর হ্যান্ডনোট ছিঁড়ে ফেলা হবে।

'বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে নিয়ে অনাদি হালদার ভাবতে বসল, কি করে প্রভাতবাবুকে তাড়ানো যায়। পুষ্যিপুত্তুর নেবার আগ্রহ কোনওকালেই তার বেশী ছিল না, এখন তো তার পক্ষে প্রভাতবাবুকে বাড়িতে রাখাই অসম্ভব। প্রভাতবাবুর প্রতি তার ব্যবহার রূঢ় হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ সে তাকে তাড়িয়ে দিতেও পারল না। প্রভাতবাবু বই বাঁধানো নোটের কথা যদি পুলিসের কাছে ফাঁস করে দেন, অনাদি হালদারকে ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে জেলে যেতে হবে।

'প্রভাতবাবু ভিতরের কথা কিছুই জানতেন না। সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়াতে তিনি খুবই মুষড়ে পড়লেন, তারপর ঠিক করলেন অনাদিবাবুর অমতেই শিউলীকে বিয়ে করবেন, যা হবার হবে। তিনি দয়ালহরির বাসায় গেলেন। দয়ালহরি তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে এবং জানিয়ে দিলে যে, অনাদি হালদারের সঙ্গে শিউলীর বিয়ে ঠিক হয়েছে।'

এই পর্যন্ত বলিয়া ব্যোমকেশ থামিল। টিন হইতে সিগারেট বাহির করিতে করিতে বলিল, 'এই হচ্ছে অনাদি হালদারের মৃত্যুর পটভূমিকা। এর মধ্যে খানিকটা অনুমান আছে, কিন্তু ভুল বোধহয় নেই। প্রভাতবাবু, কি বলেন?'

প্রভাত বলিল, 'ভুল নেই। অন্তত যতটুকু আমার জ্ঞানের মধ্যে, তাতে ভুল নেই।'

পুঁটিরাম চা লইয়া প্রবেশ করিল।

আঠারো

তিনজনে নীরবে বসিয়া আদা-গন্ধী চা সেবন করিলাম। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে।

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, 'ননীবালা দেবী যখন প্রথম আমার কাছে এলেন তখন সমস্ত ব্যাপারটা আমি উল্টো দিক থেকে দেখলাম। প্রভাতবাবুর জীবনের কোনও আশঙ্কা আছে কিনা এইটেই হল প্রশ্ন। ননীবালা যা বললেন তা থেকে ভয়ের কারণ আমি কিছু দেখতে পেলাম না। তবু বলা যায় না। দিনকাল খারাপ, নরহত্যা সম্বন্ধে মানুষের মন থেকে অনেক দ্বিধাসঙ্কোচ সরে গেছে; একটা আদিম বর্বরতার মনোভাব আমাদের চেপে ধরেছে। আমি তদারক করতে বেরুলাম।

'প্রভাতবাবুকে দেখলাম; নিমাই নিতাই; অনাদি হালদার, নৃপেন, কেষ্ট দাস, সকলকেই দেখলাম। ননীবালা আবার এলেন, তাঁকে বললাম, প্রভাতবাবুকে মেরে কারুর কোনও লাভ নেই, বরং অনাদি হালদারকে মেরে লাভ আছে। তারপর কালীপুজোর রাত্রে সত্যিই অনাদি হালদার খুন হল।

'শেষ রাত্রে কেষ্ট দাস এসে আমাকে নিয়ে গেল। সকলের বিশ্বাস কেষ্ট দাসই খুন করেছে। আমি গিয়ে সব দেখেশুনে বুঝলাম, এ রাগের মাথায় খুন নয়, প্ল্যান করে খুন: কেষ্ট দাস যদি খুন করত তাহলে খুন করবার আগেই অনাদি হালদারের সঙ্গে ঝগড়া করত না। তাছাড়া, যত ঝগড়াই হোক, যে-হংস স্বর্ণ-ডিম্ব প্রসব করে তাকে খুন করবে এমন আহাম্মক কেষ্ট দাস নয়।

'তবে একটা কথা আছে। কেষ্ট দাস যদি অনাদি হালদারকে খুন করে এক-সঙ্গে মোটা টাকা হাতাতে পারে তাহলে সে খুন করবে। কিন্তু এ যুক্তি বাড়ির অন্য লোকগুলির সম্বন্ধেও খাটে। এ যুক্তি মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে অনাদি হালদারের বাড়িতে অনেক নগদ টাকা ছিল।

'অনাদি হালদার বাড়িতে মোটা টাকা রাখলে স্টীলের আলমারিতেই রাখত। আলমারির চাবি সর্বদা তার কোমরে থাকত। আমি যখন আলমারি খুললাম তখন তাতে মাত্র শ' আড়াই টাকা পাওয়া গেল। তবে কি এই সামান্য টাকা রাখবার জন্যে অনাদি হালদার স্টীলের আলমারি কিনেছিল?

'আলমারিতে টাকা পাওয়া গেল না বটে কিন্তু দেখা গেল বইয়ের থাক্ থেকে কয়েকটা বই অদৃশ্য হয়েছে। বাকি বইগুলো রামায়ণ মহাভারত জাতীয়। প্রশ্নঃ স্টীলের আলমারিতে এই জাতীয় নিতান্ত সাধারণ বই রাখার মানে কি?

'আলমারিতে ব্যাঙ্কের চেক্ বই ছিল, তা থেকে জানা গেল যে ব্যাঙ্ক থেকে যে-পরিমাণ টাকা বার করা হয়েছে তার চেয়ে বেশী টাকা অনাদি হালদার তার নতুন বাড়ির কনট্রাকটর গুরুদত্ত সিংকে দিয়েছে। বাকি টাকা এল কোথা থেকে? অনাদি হালদার নিশ্চয় কালো টাকা রোজগার করেছিল এবং তা আলমারিতে রেখেছিল। বর্তমানে টাকা যখন আলমারিতে নেই তখন হত্যাকারীই তা সরিয়েছে।

'হত্যার মোটিভ পাওয়া গেল। কিন্তু হত্যাকারী লোকটা কে? এবং কেমন করে সে বাড়িতে ঢুকল? মৃত্যুর সময় অনাদি হালদার বাড়িতে একলা ছিল এবং বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।

'অনাদি হালদার গুলি খেয়েছিল সদরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। শ্রীকান্ত

হোটেলের জানলা থেকে সহজেই গুলি করে মারা যায় কিন্তু তার আলমারি থেকে টাকা সরানো যায় না। সুতরাং শ্রীকান্ত হোটেল থেকে মেরে কোনও লাভ নেই।

'নিমাই নিতাই যখন উকিল নিয়ে হাজির হল এবং দাবী করল যে তারাই অনাদি হালদারের ওয়ারিশ, প্রভাতবাবু আইনত পুষ্যিপুত্তুর নয়, তখন আর একটা মোটিভ পাওয়া গেল। অনাদি হালদার পাকাপাকি পুষ্যি নেবার আগে যদি তাকে সরানো যায় তাহলে সব সম্পত্তি ভাইপোদের অর্শাবে। অনাদি হালদার নিশ্চয় উইল করেনি। এ দেশের অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত লোকেরা উইল করে না।

'নিমাই নিতাইয়ের পক্ষে খুড়োর গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করা নেহাৎ অবিশ্বাস্য নয়। এখন দেখা যাক তাদের কার্যকলাপ। হত্যার ছ' মাস আগে তারা শ্রীকান্ত হোটেলের ঘর ভাড়া নিয়েছিল এবং নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করত। হোটেলের চাকরদের সঙ্গে তাদের মুখ চেনাচেনি হয়েছিল। যারা খুড়োকে খুন করতে উদ্যত হয়েছে তাদের পক্ষে এতটা খোলাখুলি ভাব কি স্বাভাবিক? আগেই বলেছি, এ প্ল্যান করে খুন; খুনী ঠিক করেছিল কালীপুজোর রাত্রে খুন করবে, বাজি পোড়ানোর শব্দে যাতে বন্দুকের আওয়াজ চাপা পড়ে যায়। তাই যদি হয় তবে ছ' মাস আগে থেকে ঘর ভাড়া নেবার অর্থ কি? তাছাড়া কালীপুজোর রাত্রে খুড়ো যে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াবে তার নিশ্চয়তা কি? এ রকম অনিশ্চিতের ওপর নির্ভর করে কেউ প্ল্যান করে না। আবার গুলিটা অনাদি হালদারের শরীর ভেদ করে গিয়েছিল, অথচ সেটা ব্যালকনিতে পাওয়া গেল না। এও ভাববার কথা।

'সুতরাং শ্রীকান্ত হোটেলের জানলা থেকে নিমাই নিতাই খুড়োকে মেরেছিল এ প্রস্তাব টেঁকসই নয়। যেই মারুক বাড়ির ভেতর থেকে মেরেছে। দেখা যাক বাড়ির ভেতর থেকে মারা সম্ভব কিনা।

'সদর দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু বাড়ির পিছন দিকে ছাদে যাবার দরজাটা খোলা থাকত, অনাদি হালদার রাত্রে শুতে যাবার আগে নিজের হাতে সেটা বন্ধ করত। তাছাড়া দরজার ছিট্‌কিনি খুব শক্ত ছিল না, দু' চারবার দরজায় নাড়া দিলে ছিট্‌কিনি খুলে পড়ত। মনে করা যাক, সেদিন রাত্রি আন্দাজ এগারোটার সময় একজন চুপিচুপি এসে অনাদি হালদারের নতুন বাড়িতে ঢুকল। নতুন বাড়ির একতলার ছাদ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে, চারিদিকে ভারা বাঁধা। হত্যাকারী ছাদে উঠল, দুই বাড়ির মাঝখানে সরু গলি আছে, হত্যাকারী ভারা থেকে একটা লম্বা তক্তা নিয়ে দুই বাড়ির মাঝখানে পুল বাঁধল, তারপর সেই পুল দিয়ে পুরনো বাড়িতে পেরিয়ে এল। ছাদের দরজা খোলা থাকবার কথা, কারণ অনাদি হালদার তখনও শুতে যায়নি।

'দেখা যাচ্ছে, একজন চট্‌পটে লোকের পক্ষে বাড়িতে ঢোকা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কে সেই চট্‌পটে লোকটি? নিমাই নিতাই নয়, কারণ আলমারিতে অনেক কালো টাকা আছে একথা তাদের জানবার কথা নয়, একথা কেবল বাড়ির লোকই জানতে পারে কিম্বা আন্দাজ করতে পারে।

'বাড়িতে চার জন লোক আছে—ননীবালা, কেষ্ট দাস, নৃপেন আর প্রভাতবাবু। এদের মধ্যেই কেউ অনাদি হালদারকে খুন করেছে। যদি বল, নিমাই নিতাই বাড়িতে ঢুকে খুন করেছে এবং আলমারি থেকে মাল নিয়ে সট্‌কেছে, তাহলে

প্রশ্ন ওঠে, তারা সাত-সকালে এসে বাড়ি দখল করতে চেয়েছিল কেন? চুপ করে বসে থাকাই তো তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। যথাসময়ে আদালতের মারফত দখল তারা পেতই। তারা খুন করেনি বলেই তাড়াতাড়ি এসে বাসার দখল নিতে চেয়েছিল, যাতে আলমারির জিনিসপত্র এরা সরিয়ে ফেলতে না পারে।

'যাহোক, রইল বাড়ির চার জন। এরা সকলেই অবশ্য বাইরে ছিল, কিন্তু কারুর পাকা অ্যালিবাই নেই। ননীবালা দেবীকে বাদ দেওয়া যেতে পারে, কারণ তিনি মোটা মানুষ, তাঁকে চট্‌পটেও বলা চলে না। তক্তার ওপর দিয়ে গলি পার হওয়া তাঁর সাধ্য নয়।

'বাকি রইল কেষ্ট দাস প্রভাতবাবু আর নৃপেন। গোড়ার দিকে নৃপেনের ওপরেই সবচেয়ে বেশী সন্দেহ হয়, চালচলন খুবই সন্দেহজনক। আলমারিতে যে অনেক টাকা আছে এটা তার পক্ষে জানা সবচেয়ে বেশী সম্ভব, কারণ সে অনাদি হালদারের সেক্রেটারী, টাকাকড়ির হিসেব রাখে। কিন্তু যখন জানতে পারলাম সে আলমারির চাবি তৈরি করেছিল তখন তাকেও বাদ দিতে হল। অনাদি হালদারকে খুন করবার মতলব যদি তার থাকত তবে সে চাবি তৈরি করতে যাবে কেন? অনাদি হালদারের কোমরেই তো চাবি রয়েছে।

'ভেবে দেখ। নৃপেনের স্বভাবটা ছিঁচ্‌কে চোরের মত। সে চাবি তৈরি করেছিল, মতলব ছিল অনাদি হালদার যখন বাড়ি থাকবে না তখন আলমারি খুলে দু'চার টাকা সরাবে। কিন্তু সরাবার সুযোগ বোধহয় তার হয়নি। চাবিটা তার টেবিলের দেরাজে রেখেছিল। সে-রাত্রে সিনেমা থেকে ফিরে এসে যখন দেখল অনাদি হালদার খুন হয়েছে তখন সে চাবির কথা সাফ ভুলে গেল। তারপর আমি অনাদি হালদারের কোমর থেকে চাবি নিয়ে সবাইকে দেখালাম তখন নৃপেনের মনে পড়ে গেল। সর্বনাশ! পুলিস এসে যদি তার দেরাজে চাবি পায় তাহলে তাকেই খুনী বলে ধরবে। সে কোনও মতে চাবিটাকে বিদেয় করবার চেষ্টা করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত এক ফাঁকে চাবিটা জানলা দিয়ে গলিতে ফেলে দিলে।

'চাবিটা আমি সকালবেলা গলিতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তখনই বুঝেছিলাম নৃপেন খুন করেনি। তারপর আমার বন্ধু রমেশ মল্লিকের চিঠি পেয়ে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। নৃপেন ছিঁচ্‌কে চোর, মানুষ খুন করবার সাহস তার নেই।

'বাকি রইল কেষ্ট দাস আর প্রভাতবাবু।

'সেদিন সন্ধ্যেবেলা কেষ্ট দাস এখানে এল। রাত্রে তাকে মদ খাইয়ে অনাদি হালদারের পুরনো ইতিহাস জেনে নিলাম। কেষ্ট দাসও সেদিন আমার কাছে একটা কথা জানতে পেরেছিল। আমি তাকে কথায় কথায় বলেছিলাম যে প্রভাতবাবু দপ্তরীর কাজ জানেন। কথাটা সে আগে জানত না।

'যা হোক, তারপর কয়েক দিন কেটে গেল। দেখলাম নৃপেন আর কেষ্ট দাস পুরনো বাসাতেই রয়েছে। তারা যদি টাকা মেরে থাকে তাহলে পুরনো বাসা কামড়ে পড়ে আছে কেন? তাদের চলে যাবার যথেষ্ট ওজুহাত রয়েছে, অনাদি হালদার মরে যাবার পর ওদের ওবাড়িতে থাকার আর কোনও ছুতো নেই। টাকা-গুলোই বা রাখল কোথায়? ব্যাঙ্কে নিশ্চয় রাখবে না, অন্য কোনও লোকের হাতেও দেবে না। তবে?

'কলকাতায় ওদের অন্য কোনও আস্তানা নেই, যেখানে টাকা লুকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু প্রভাতবাবুর একটা আস্তানা আছে—দোকান। তিনি যদি খুন করে টাকা সরিয়ে থাকেন তাহলে টাকা লুকিয়ে রাখার কোনও অসুবিধা নেই।

'দোকান—বইয়ের দোকান। বিদ্যুৎ চমকের মত সমস্ত ব্যাপারটা আমার মাথার মধ্যে জ্বলজ্বল করে উঠল, প্রভাতবাবু পাটনায় হিসেবের খাতা বাঁধেননি, বেঁধেছিলেন একশো টাকার নোট—অনাদি হালদার তাঁর বাঁধানো বইগুলোকে রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে মিশিয়ে আলমারিতে রেখেছিল—প্রভাতবাবু অনাদি হালদারকে মারবার পর তার কোমর থেকে চাবি নিয়ে আলমারি থেকে নোটের বইগুলো বার করে নিজের দোকানে এনেছিলেন- দোকানের হাজারখানা বইয়ের মধ্যে নোটের বইগুলো প্রকাশ্যে সাজানো আছে- বাইরে থেকে বই দেখে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না-

'আগাগোড়া প্ল্যানটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

'কিন্তু—

'প্রভাতবাবু টাকার লোভে এমন কাজ করবেন? প্রভাতবাবুর চরিত্র যতখানি বুঝেছিলাম তাতে তাঁকে অর্থলোভী বলে মনে হয়নি। উপরন্তু অনাদি হালদারের মৃত্যুতে প্রভাতবাবুর ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী; সে বেঁচে থাকলে তাঁকে পুষ্যিপুত্তুর নেবে, সমস্ত সম্পত্তি পাবার সম্ভাবনা। নগদ টাকার লোভে সেই সম্ভাবনা তিনি নষ্ট করবেন?

'তবে কি টাকাটা গৌণ, তার চেয়ে বড় কারণ কিছু ছিল? অনাদি হালদার শিউলীর সঙ্গে প্রভাতবাবুর বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল; কিন্তু সেটা কি এতবড় অপরাধ যে তাকে খুন করতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেরিতে পেয়েছিলাম। দয়ালহরি মজুমদারের বাসা থেকে ফেরবার সময় হঠাৎ আসল কথাটা মাথায় খেলে গিয়েছিল।

'অনাদি হালদার এমন কাজ করেছিল যাতে নিতান্ত নিরীহ লোকেরও মাথায় খুন চেপে যায়। সে দয়ালহরিকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে নিজে শিউলীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। প্রভাতবাবুর রক্তে আগুন ধরে গেল। আগুন ধরা বিচিত্র নয়, আগুনের ফুলকি তাঁর রক্তের মধ্যেই ছিল।

'আবার একটা বরফের মত ঠান্ডা কূট বুদ্ধি তাঁর ছিল, সেটাও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। তিনি অনাদি হালদারকে ধনেপ্রাণে মারবার প্ল্যান ঠিক করলেন। বাঁটুল সর্দারকে তিনি আগে থাকতেই চিনতেন, রাইফেল ভাড়া করা কঠিন হল না। কালীপুজোর রাত্রে বুড়ো পাঁঠাকে বলি দেবার ব্যবস্থা হল।

'সে-রাত্রে প্রভাতবাবু ননীবালা দেবীকে সিনেমায় পৌঁছে দিয়ে দোকানে গেলেন। দোকান আলো দিয়ে সাজিয়ে সাড়ে দশটার সময় আবার বেরুলেন, এবার একটা কাপড়ের থলি পকেটে নিলেন। দোকান খোলাই রইল, গুর্খা দারোয়ান দরজায় পাহারায় রইল।

'বাসার কাছে এসে প্রভাতবাবু দেখলেন বাসার সামনে বাজি পোড়ানো হচ্ছে। কেউ তাঁকে লক্ষ্য করল না, তিনি নতুন বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। নতুন বাড়ির মধ্যে বাঁটুল সর্দার রাইফেল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। বাঁটুল অনাদি হালদারের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, সুতরাং তার এ ব্যাপারে উৎসাহ থাকাই স্বাভাবিক।

'ছাদের ওপর তক্তা ফেলে প্রভাতবাবু বাসায় ঢুকলেন। ছাদের দরজা

সম্ভবতঃ খোলাই ছিল; না থাকলেও ক্ষতি নেই, তিনি দু'চারবার দরজায় নাড়া দিয়ে ছিট্‌কিনি খুলে ফেললেন। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অনাদি হালদার বাজি পোড়ানো দেখছিল, পিছন দিকে শব্দ শুনে সে ফিরে দাঁড়াল। প্রভাতবাবু সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলেন। গুলিটা অনাদি হালদারের শরীর ভেদ করে রাস্তার ওপারে শ্রীকান্ত হোটেলের জানলা দিয়ে ঢুকে দেয়ালে আটকালো। হাই ভেলসিটি মিলিটারি রাইফেল, তার গুলি যদি নিমাই কিম্বা নিতাইকে সামনে পেতো তাকেও ফুটো করে যেত।

'তারপর প্রভাতবাবু মৃতের কোমর থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুললেন। নোটের বইগুলো থলিতে পুরে, চাবি আবার যথাস্থানে রেখে যে পথে এসেছিলেন সেই পথে ফিরে গেলেন। ঘাটুল অপেক্ষা করছিল, রাইফেল নিয়ে অদৃশ্য হল। প্রভাতবাবু দোকানে ফিরে গিয়ে বইগুলো উঁচু একটা তাকে সাজিয়ে রেখে দিলেন। তারপর যথাসময়ে সিনেমায় গিয়ে মা'কে সঙ্গে নিয়ে বাসায় ফিরলেন।

'গুর্খা দারোয়ানটা জানত যে প্রভাতবাবু সে-রাত্রে সারাক্ষণ দোকানে ছিলেন না। আমি যখন গুর্খার খোঁজ নিলাম তখন সে কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেছে।

'সেদিন আমি আর অজিত প্রভাতবাবুর দোকানে যাচ্ছিলাম, দেখলাম বাঁটুল আমাদের আগে আগে যাচ্ছে। সে প্রভাতবাবুর দোকানে ঢুকতে গিয়ে পিছনে আমাদের দেখে দোকানে ঢুকল না, সোজা চলে গেল। আমরা দোকানে গিয়ে দেখলাম প্রভাতবাবুর জ্বর হয়েছে, তাড়সের জ্বর। তাঁকে নিয়ে আমার জানা এক ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার প্রভাতবাবুকে পরীক্ষা করলেন এবং পরীক্ষার ফল আমাকে আড়ালে জানালেন। তখন আর সন্দেহ রইল না।

'প্রভাতবাবু যে অনাদি হালদারকে খুন করেছেন একথা আমার আগে আর একজন বুঝতে পেরেছিল—সে কেষ্ট দাস। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, কেষ্ট দাস জানত যে অনাদি হালদারের আলমারিতে কালো টাকা আছে: তাই সে যখন আমার মুখে শুনল যে প্রভাতবাবু দপ্তরীর কাজ জানেন তখন চট্‌ করে সমস্ত ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিলে। সে প্রভাতবাবুকে শোষণ করতে আরম্ভ করল। অজিত, তোমার মনে আছে কি, একদিন ক্রমাগত একশো টাকার নোট দেখে দেখে আমাদের চোখ ঠিকরে গিয়েছিল? এমন কি রাত্রে হোটেলে খেতে গিয়েও নিস্তার ছিল না, সেখানে কেষ্ট দাস একশো টাকার নোট বার করল। সেই নোটগুলির বেশীর ভাগই এসেছিল অনাদি হালদারের বাঁধানো নোটের বই থেকে।'

'যাহোক, পাটনা যাবার আগে অনাদি হালদার ঘটিত ব্যাপার মন থেকে একরকম মুছে ফেলেই চলে গেলাম। কেবল বিকাশ দত্তকে বলে গেলাম দয়ালহরি মজুমদার সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করতে।'

'তারপর পাটনা থেকে ফিরে এসে দেখি—এক নতুন পরিস্থিতি। কেষ্ট দাস খুন হয়েছে। কেষ্ট দাস প্রভাতবাবুকে দোহন করছিল, তাই বিশ্বাস হল তিনিই তাকে খুন করেছেন। তখন আবার আসামীকে ধরবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু শুধু অপরাধীকে ধরলেই চলবে না, টাকাগুলোও উদ্ধার করা চাই।'

'টাকাগুলো সহজে উদ্ধার করবার জন্যে একটু চাতুরীর আশ্রয় নিতে হল, নইলে সারা দোকান হাতড়ে নোটের বইগুলো বার করা কষ্টকর হত। হয়তো প্রভাতবাবু তল্লাশী করতে দিতেন না, পুলিস ডাকতে হত; আমার হাত থেকে

সব বেরিয়ে যেত। তাই প্রভাতবাবু যখন দোকান বিক্রি করার কথা বললেন তখন ভারি সুবিধে হয়ে গেল। আমি বললাম, আমরা দোকান কিনব। সঙ্গে সঙ্গে বিকাশকে পাঠালাম নজর রাখবার জন্যে, প্রভাতবাবু দোকান থেকে কোনও জিনিস সরান কিনা।

'দোকান কেনার ব্যবস্থা পাকা হল, স্বাধীনতা দিবসের সকালে দখল দিতে হবে। জানতাম দখল দেবার আগে কোনও সময় বইগুলো প্রভাতবাবু সরাবেন। বিকাশ খবর দিলে, দিনের বেলা তিনি কিছু সরাননি। রাত্রে আমরা দোকানে ঢুকে প্রতীক্ষা করে রইলাম। ন্যাপা চাবি তৈরি করে দিয়েছিল--'

হঠাৎ বাহির হইতে বিপুল শব্দতরঙ্গ আমাদের কর্ণপটহে আঘাত করিল—রেডিও যন্ত্রের ঘুম ভাঙার আওয়াজ। আমরা চমকিয়া জানালার দিকে তাকাইলাম। বাহিরে দিনের আলো ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

উনিশ

ব্যোমকেশ নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

'পুঁটিরাম!'

পুঁটিরাম দরজা দিয়া মুণ্ড বাড়াইল।

'আগুনের আংটা নিয়ে এস।'

আমি বলিলাম, 'অনেকক্ষণ ধরে আংটার কথা শুনছি, কিন্তু আংটা কি হবে এখনও জানতে পারিনি। হোম টোম করবে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, হোম করব। এই নোটগুলো আগুনে আহুতি দেব।'

'মানে!'

'মানে নোটগুলো পুড়িয়ে ফেলব।'

আর্তনাদ করিয়া উঠিলাম—'অ্যাঁ! দু' লাখ টাকা পুড়িয়ে ফেলবে!'

'হ্যাঁ। এই নোটগুলো কালো টাকা, অভিশপ্ত টাকা; এর ন্যায্য মালিক কেউ নেই। আজকের পুণ্য দিনে দেশমাতৃকার চরণে এই হবে আমাদের অঞ্জলি।'

'কিন্তু--কিন্তু, পুড়িয়ে ফেললে দেশমাতৃকা পাবেন কি? তার চেয়ে যদি ওই টাকা আমাদের নতুন গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া যায়--'

'একই কথা অজিত। পুড়িয়ে ফেললেও রাষ্ট্রকেই দেওয়া হবে। ভেবে দেখ, নোটগুলো তো সত্যিকারের টাকা নয়, গভর্ণমেণ্টের হ্যাণ্ডনোট মাত্র। হ্যাণ্ডনোট পুড়িয়ে ফেললে গভর্ণমেণ্টকে আর টাকা শোধ দিতে হবে না, দু'লাখ টাকা তার লাভ হবে। কিন্তু এখন যদি নোটগুলো ফেরত দিতে যাও, অনেক হাঙ্গামা বাধবে। গভর্ণমেণ্ট জানতে চাইবে কোথা থেকে টাকা এল, তখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। তার দরকার কি! এই ভাল, আগুনে যা আহুতি দেব তা দেবতার কাছে পৌঁছবে।--প্রভাতবাবু, আপনি কি বলেন?'

প্রভাত বুদ্ধিভ্রষ্টের মত ফ্যালফ্যাল চক্ষে চাহিয়া বসিয়া ছিল, কণ্টে আত্ম-সম্বরণ করিয়া বলিল, 'আমার কিছু বলবার নেই, আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।'

পুঁটিরাম গনগনে আগুনের আংটা আনিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে রাখিল।

ব্যোমকেশ তাহাকে বলিল, 'তুই এবার ঘুমোগে যা।'

পুঁটিরাম চলিয়া গেল। ব্যোমকেশ আমাদের মুখের পানে চাহিয়া হাসিল। তারপর বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া আগুনে ফেলিতে লাগিল। মন্দ্রস্বরে বলিল, 'স্বাহা, স্বাহা, স্বাহা—'

আমি আর বসিয়া দেখিতে পারিলাম না, উঠিয়া গিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। ব্যোমকেশ আমার বন্ধু, তাহাকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি: কিন্তু আজ তাহার চরিত্রের একটা নূতন দিক দেখিতে পাইলাম। সে যাহা করিল আমি তাহা পারিতাম না, নিজের হাতে দুই লক্ষ টাকা পুড়াইয়া ফেলিতে পারিতাম না।

'স্বাহা; স্বাহা—'

ঘণ্টাখানেক পরে ব্যোমকেশ ও প্রভাত আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সূর্য উঠিয়াছে, চারিদিকে মঙ্গলবাদ্য বাজিতেছে। পিছন ফিরিয়া দেখিলাম আংটার চারিপাশে কাগজ-পোড়া ছাই স্তূপীভূত হইয়াছে। কালো টাকার কালো ছাই।

তিনজনে জানালার ধারে কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রভাত প্রথমে কথা কহিল, কম্পিত স্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আমি—আমার সম্বন্ধে—আপনি যদি আমাকে খুনের অপরাধে ধরিয়ে দেন আমি অস্বীকার করব না।'

ব্যোমকেশ তাহার দিকে ফিরিল, অনুকম্পা দ্রবিত স্বরে বলিল, 'আপনাকে আমি ধরিয়ে দেব না। সব সভ্য দেশেই প্রথা আছে পর্ব দিনে বন্দীরা মুক্তি পায়, আপনিও মুক্তি পেলেন। আপনার দোকান আমরা কিনব বলেছিলাম, যদি আপনি বিক্রি করে চলে যেতে চান আমরা দোকান নেব। কিম্বা যদি আমাদের কাছে দোকানের অর্ধাংশ বিক্রি করে অংশীদার করে নিতে চান তাতেও আপত্তি নেই।'

প্রভাত ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। শেষে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, এ আমার কল্পনার অতীত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা যে কালে বাস করছি সেটাই যে কল্পনার অতীত। আমরা বেঁচে থেকে ভারতের স্বাধীনতা দেখে যাব এ কি কেউ কল্পনা করেছিল? কিন্তু ও কথা যাক। আপনি প্রাণদণ্ড থেকে মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু একেবারে মুক্তি পাবেন না। কিছু দণ্ড আপনাকে ভোগ করতে হবে। এ সংসারে কর্মফল একেবারে এড়ানো যায় না।'

প্রভাত বলিল, 'কি দণ্ড বলুন, আপনি যে দণ্ড দেবেন আমি মাথা পেতে নেব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাকে নিজের পরিচয় জানতে হবে।'

প্রভাত চক্ষু বিস্ফারিত করিল—'নিজের পরিচয়!'

'হ্যাঁ। নিজের পরিচয় আপনি জানেন কি?—পিতৃনাম?'

প্রভাত মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না। মার কাছে শুনেছি, হাসপাতালে আমার জন্ম হয়েছিল। আর কিছু জানি না।'

'আমি জানি। আপনার পিতৃনাম, অনাদি হালদার।'

প্রভাতের উপর এই সংবাদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব না, কারণ আমি নিজেই হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম। অবশেষে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, 'ব্যোমকেশ! এ কী বলছ তুমি! এর কোনও প্রমাণ আছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আছে বৈকি। প্রভাতবাবুর গায়েই প্রমাণ আছে।'

'গায়ে!'

'হ্যাঁ। প্রভাতবাবুর কোমরে একটা আধুলির মত লাল জড়ুল আছে। প্রভাতবাবু, জড়ুলটা দেখতে পারি কি?'

যন্ত্রের মত প্রভাত কামিজ তুলিল। ডানদিকে কাপড়ের কষির কাছে জড়ুল দেখা গেল। ব্যোমকেশ আমাকে বলিল, 'ঠিক এইরকম জড়ুল আর কোথায় দেখেছ মনে আছে বোধহয়।'

মনে ছিল। মৃত অনাদি হালদারের কোমরে চাবি পরাইবার সময় ব্যোমকেশ দেখাইয়াছিল। কিন্তু বিস্ময় ঘুচিল না, অভিভূতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিন্তু তুমি জানলে কি করে যে প্রভাতবাবুর কোমরে জড়ুল আছে?'

'প্রভাতবাবুকে যেদিন ডাক্তার তালুকদারের কাছে নিয়ে যাই সেদিন ডাক্তারকে ওঁর কোমরটা দেখতে বলেছিলাম।'

তবু মন দ্বিধাক্রান্ত হইয়া রহিল। বলিলাম, 'কিন্তু, একে কি প্রমাণ বলা চলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রমাণ না বলতে চাও বোলো না, কিন্তু যুক্তিসংগত অনুমান, Legitimate inference বলতেই হবে। অনাদি হালদার খামকা পাটনায় গিয়েছিল কেন? দপ্তরীর সহকারীকে পুষ্যিপুত্তুর নিতে গেল কেন? প্রভাতবাবুকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দোকান করে দেবার কি দরকার ছিল? সব মিলিয়ে দেখো, সন্দেহ থাকবে না।'

প্রভাত টলিতে টলিতে গিয়া আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িল, অনেকক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, সমস্তই ঠিক-ঠিক মিলিয়া যাইতেছে বটে। অনাদি হালদার জানিত প্রভাত তাহার ছেলে, ননীবালা তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। কালাবাজারে অনেক টাকা রোজগার করিয়া সে গোপনে ছেলেকে দেখিতে গিয়াছিল। যখন দেখিল ছেলে দপ্তরীর কাজ করে তখনই হয়তো নোটগুলাকে বই বাঁধাইয়া রাখিবার আইডিয়া তাহার মাথায় আসে। ছেলেকে ছেলে বলিয়া স্বীকার করার চেয়ে পোষ্যপুত্র নেওয়াই অনাদি হালদারের কুটিল বুদ্ধিতে বেশী সমীচীন মনে হইয়াছিল।...তাহার দুরন্ত প্রবৃত্তি মাঝখানে পড়িয়া সমস্ত ছারখার না করিয়া দিলে প্রভাতের জন্মরহস্য হয়তো চিরদিন অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।—

প্রভাত মড়ার মত মুখ তুলিয়া উঠিয়া বসিল, ভগ্নস্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশ-বাবু, এর চেয়ে আমার ফাঁসি দিলেন না কেন? রক্তের এ কলঙ্কের চেয়ে সে যে ঢের ভাল ছিল।'

ব্যোমকেশ তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, 'সাহস আনুন, প্রভাতবাবু। রক্তের কলঙ্ক কার নেই? ভুলে যাবেন না যে মানুষ জাতটার দেহে পশুর রক্ত রয়েছে। মানুষ দীর্ঘ তপস্যার ফলে তার রক্তের বাঁদরামি কতকটা কাটিয়ে উঠেছে; সভ্য হয়েছে, ভদ্র হয়েছে, মানুষ হয়েছে। চেষ্টা করলে রক্তের প্রভাব জয় করা অসাধ্য কাজ নয়। অতীত ভুলে যান, অতীতের বন্ধন ছিঁড়ে গেছে। আজ নতুন ভারতবর্ষের নতুন মানুষ আপনি, অন্তরে বাহিরে আপনি স্বাধীন।'

প্রভাত অন্ধভাবে হাত বাড়াইয়া ব্যোমকেশের পদস্পর্শ করিল—'আশীর্বাদ করুন।'

বহ্নি-পতঙ্গ

এক

'পাটনায় পৌঁছিয়া দশ-বারো দিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিল। তারপর একদিন পুরন্দর পাণ্ডের সহিত দেখা হইয়া গেল। পাণ্ডেজি বছরখানেক হইল বদলি হইয়া পাটনায় আসিয়াছেন। সেই যে দুর্গরহস্য সম্পর্কে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, তারপর আর দেখা হয় নাই। পাণ্ডেজি খুশী হইলেন, আমরাও কম খুশী হইলাম না। পাণ্ডেজি মৃত্যু-রহস্যের অগ্রদূত, আমাদের সহিত দেখা হইবার দু' একদিন পরেই একটি রহস্যময় মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং—'

আদিম রিপুতে যে মৃত্যু-রহস্যের উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহাই এখন সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিতেছি।—

একদিন সন্ধ্যার পর পাণ্ডেজির বাসায় আড্ডা বসিয়াছিল। বাহিরেব লোক কেহ ছিল না, কেবল ব্যোমকেশ, পাণ্ডেজি ও আমি। চা, কাবুলী মটরেব ঘুগ্‌নি, মনেরের লাড্ডু এবং গয়ার তামাক—এই চতুর্বর্গের সহযোগে পুবাতন স্মৃতিকথার রোমন্থন চলিতেছিল। ভৃত্য মাঝে মাঝে আসিয়া গড়গড়ার কলিকা বদলাইয়া দিয়া যাইতেছিল।

পাণ্ডেজির সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে প্রায় রোজই আমাদের আড্ডা জমিতেছে, কখনও আমাদের বাসায় কখনও পাণ্ডেজির বাসায়। আজ পাণ্ডেজির বাসায় আড্ডা জমিয়াছে। তিনি আগামীকল্য আমাদের নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, মুর্গীর কাশ্মীরী কোর্মা খাওয়াইবেন। আমাদের কর্মহীন পাটনা প্রবাস মধুময় হইয়া উঠিয়াছে।

পাটনায় বদ্‌লি হইয়া পাণ্ডেজির পদোন্নতি হইয়াছে বটে কিন্তু দেখিলাম তাঁহার চিত্তে সুখ নাই। মহাযুদ্ধের চিতা নিভিলেও আকাশ বাতাস চিতাভস্মে আচ্ছন্ন, তদুপরি স্বাধীনতার প্রসব যন্ত্রণা। আমাদের স্মৃতি-রোমন্থন ঐতিহাসিক রীতিতে বর্তমান কালে নামিয়া আসিল। পাণ্ডেজি সাম্প্রতিক কয়েকটি লোমহর্ষণ সত্যঘটনা আমাদের শুনাইলেন। অবশেষে বলিলেন, –

'এই মহাযুদ্ধের সময় থেকে পৃথিবীতে ঠগ-জোচ্চোর-খুনী-বদমায়েসেব সংখ্যা বেড়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশেরও কাজ বেড়েছে। আগে যে-সব অপরাধ আমরা কল্পনা করতে পারতাম না সেইসব অপরাধ নিত্য-নিয়ত ঘটছে। বিদেশী সিপাহীরা এসে নানা রকম বিজাতীয় বজ্জাতি শিখিয়ে গেছে। কত রকম নেশার জিনিস, কত রকম বিষ যে দেশে ঢুকেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এই সেদিন পাটনার এক অতি সাধারণ ছিঁচকে চোরের কাছ থেকে এক শিশি ওষুধ বেরুল, পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটা একটা সাংঘাতিক বিষ, দক্ষিণ আমেরিকায় তার জন্মস্থান।'

ব্যোমকেশ গড়গড়ার নল মুখের নিকট হইতে সরাইয়া অলস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কী বিষ? কিউরারি?'

'হ্যাঁ। আপনি নাম জানেন দেখছি। এমন সাংঘাতিক বিষ যে রক্তের সঙ্গে এক বিন্দু মিশলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। যে শিশিটা পাওয়া গেছে তা দিয়ে সমস্ত পাটনা শহরটাকে শেষ করে দেওয়া যায়। ভেবে দেখুন এই রকম কত শিশি আমদানি হয়েছে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ও বিষটা কোথাও ব্যবহার হয়েছে তার প্রমাণ পেয়েছেন নাকি?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আমাদের দেশে কোথায় কাকে বিষ খাইয়ে মারা হচ্ছে সব খবর কি পুলিশের কানে পৌঁছয়? মড়া পোড়াবার জন্য একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট পর্যন্ত দরকার হয় না। নেহাৎ যারা গণ্যমান্য লোক তাদের বিষ খাওয়ালে হয়তো একটু হৈ-চৈ হয়। তাও আত্মীয়-স্বজনেরা চাপা দিয়ে দেয়। অথচ আমার বিশ্বাস এ দেশে বিষ খাইয়ে মারার সংখ্যা খুব কম নয়।'

ব্যোমকেশ নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ গড়গড়া টানিয়া বলিল, 'আচ্ছা, আপনারা যে এই সব বিষ আর মাদক দ্রব্য উদ্ধার করেন কোথায় যায় বলুন তো?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কোথায় আর যাবে? কিছুদিন আমাদের কাছে থাকে, তারপর হেড অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাঁরা ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সে কতটুকু? বেশির ভাগই তো চোরাবাজারে চারিয়ে আছে। যার দরকার সে কিনে ব্যবহার করছে।' পাণ্ডেজি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন—'যুদ্ধ আর রাষ্ট্রবিপ্লব সভ্য মানুষকে অসভ্য করে তোলে। তখন বিবেকবুদ্ধির মুখোশ পড়ে খসে, কাঁচা খেকো জানোয়ারটি বেরিয়ে আসে। কী ঠুনকো আমাদের সভ্যতা! আসলে আমরা বর্বর।'

ব্যোমকেশ কথাটা যেন একটু তলাইয়া দেখিয়া বলিল, 'আসলে আমরা বর্বরই বটে। কিন্তু যখন সভ্যতা থেকে বর্বরতায় ফিরে যাই তখন সভ্যতার একটা গুণ সঙ্গে নিয়ে যাই। মুখোশ অত সহজে খসে না পাণ্ডেজি, কাঁচা-খেকো জন্তুটিকে খুঁজে বার করতে সময় লাগে। বাইরে শান্ত শিষ্ট নিরীহ জীব আর ভিতরে তীক্ষ্ন নখ দন্ত—এইটেই সব চেয়ে ভয়াবহ।'

ঘড়িতে আটটা বাজিল। শীতের রাত্রি, কিন্তু আমাদের গৃহে ফিরিবার বিশেষ তাড়া ছিল না। তাই পাণ্ডেজি যখন আর এক কিস্তি চায়ের প্রস্তাব করিলেন তখন আমরা আপত্তি করিলাম না। এই সময় ভৃত্য প্রবেশ করিয়া বলিল, 'ইন্সপেক্টর চৌধুরী এসেছেন।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কে রতিকান্ত? নিয়ে এস।—আর চার পেয়ালা চা তৈরি কর।'

ভৃত্য চলিয়া গেল। ক্ষণেক পরে পুলিশের পোশাক পরা একটি যুবক প্রবেশ করিল। দীর্ঘ-দৃঢ় আকৃতি, টক্‌টকে রঙ, কাটালো মুখ, নীল চোখ, হঠাৎ সাহেব বলিয়া ভ্রম হয়। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। সে আসিয়া স্যালুটের ভঙ্গীতে ডান হাতটা একবার তুলিয়া পাণ্ডেজির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কি খবর রতিকান্ত?'

রতিকান্ত বলিল, 'হুজুর, একটা নেমন্তন্ন চিঠি আছে।' বলিয়া ওভার-কোটের পকেট হইতে একটি খাম বাহির করিল। রতিকান্তর ভাষা উত্তর ভারতের বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষা, বিহারের ভেজাল হিন্দী নয়।

পাণ্ডেজি স্মিতমুখে বলিলেন, 'কিসের নেমন্তন্ন? তোমার বিয়ে নাকি?'

রতিকান্ত করুণ মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, 'আমার বিয়ে কে দেবে হুজুর? দীপনারায়ণ সিং নেমন্তন্ন করেছেন।'

পাণ্ডেজি খামখানা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, 'কিন্তু দীপনারায়ণ সিংয়ের নেমন্তন্ন চিঠি তুমি নিয়ে এলে যে?'

রতিকান্ত কৌতুকচ্ছলে মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, 'কি করি স্যার, বড়মানুষ কুটুম্ব, কোনদিন মিনিস্টার হয়ে যাবেন, তাই খাতির রাখতে হয়। মাঝে মাঝে যাই সেলাম বাজাতে। আজ গিয়েছিলাম, তা পুলিশ অফিসারদের নেমন্তন্ন চিঠিগুলো আমাকেই বিলি করতে দিলেন।'

পাণ্ডেজি খাম হইতে সোনালী জলে ছাপা তক্‌তকে কার্ড বাহির করিয়া পড়িলেন, বলিলেন, 'হুঁ, গুরুতর ব্যাপার দেখছি। রীতিমত ডিনার।—কিন্তু উপলক্ষটা কি?'

রতিকান্ত বলিল, 'অনেকদিন রোগভোগ করে সেরে উঠেছেন তাই বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াচ্ছেন। শহরের গণ্যমান্য সকলকেই নেমন্তন্ন করেছেন।'

পাণ্ডেজি কার্ডখানা আবার খামে পুরিতে পুরিতে বলিলেন, 'কাল রাত্তিরে নেমন্তন্ন। কিন্তু আমি তো যেতে পারব না, রতিকান্ত।'

'কেন স্যার, কাল কি আপনি ইন্‌সপেকশনে বেরুচ্ছেন?'

'না। আমার এই বন্ধু দুটি কলকাতা থেকে এসেছেন, কাল রাত্তিরে ওঁদের খেতে বলেছি।'

ব্যোমকেশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'মুর্গীর কাশ্মীরী কোর্মা।'

রতিকান্ত চকিত হাস্যে আমাদের পানে চাহিল। এতক্ষণ সে থাকিয়া থাকিয়া আমাদের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল; আমরা তাহার অপরিচিত অথচ পাণ্ডেজির সহিত বসিয়া গড়গড়া টানিতেছি দেখিয়া বোধহয় কৌতূহলী হইয়াছিল, কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ করে নাই। এখন হাসিমুখে ডান হাতখানা কপালের কাছে লইয়া গিয়া স্যালুট করিল। তারপর পাণ্ডেজিকে বলিল, 'হুজুর, কাশ্মীরী কোর্মার খবর আগে জানলে আমিও কাল এসে আপনার বাড়িতে আড্ডা গাড়তাম। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। আচ্ছা, আজ চলি।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'বোসো, চা খেয়ে যাও।'

রতিকান্ত বলিল, 'চা আর একদিন হবে হুজুর। আর, যদি কাশ্মীরী কোর্মা খাওয়ান তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু আজ আর বসতে পারব না। এখনও দু'তিনখানা চিঠি বিলি করতে বাকি আছে। তাছাড়া দীপনারায়ণজিকে গিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে। নিমন্ত্রণ পত্রে আর এস ভি পি লেখা আছে দেখেছেন তো।'

'আচ্ছা, তাহলে এস।'

রতিকান্ত স্মিতমুখে আমাদের সকলকে এক সঙ্গে স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'বাঃ, খাসা চেহারা ছোকরার! যেন রাজপুত্তুর!'

পাণ্ডেজি কহিলেন, 'নেহাৎ মিথ্যে বলেননি। ওর পূর্বপুরুষেরা প্রতাপগড়ের মস্ত তালুকদার ছিল। প্রায় রাজারাজড়ার সামিল। এখন অবস্থা একেবারে পড়ে গেছে, তাই রতিকান্তকে চাকরি নিতে হয়েছে। ভারি বুদ্ধিমান ছেলে;

নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে, বি, এস-সি পাস করেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজকাল বড় ঘরের ছেলেরা পুলিশে ঢুকছে এটা সুলক্ষণ বলতে হবে।'

চা আসিল। কিছুক্ষণ অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনার পর ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'দীপনারায়ণ সিং কে?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'দীপনারায়ণ সিংএর নাম শোনেন নি? বিহারের একজন প্রচণ্ড জমিদার, সালিয়ানা আয় দশ লাখ টাকা, তার ওপর তেজারতির কারবার আছে। লোকটি কিন্তু ভাল। রাজনৈতিক আন্দোলনে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এখন বয়স হয়েছে, পঞ্চাশের কাছাকাছি--' গড়গড়ায় কয়েকটি টান দিয়া বলিলেন, 'বুড়ো বয়সে একটি ভুল করে ফেলেছেন, তরুণী ভার্যা গ্রহণ করেছেন।'

'সাবেক গৃহিণী বিদ্যমান?'

'না, অতটা নয়। সাবেক গৃহিণী বছর কয়েক হ'ল গত হয়েছেন, তারপর তরুণী ভার্যাটি এসেছেন। ভদ্রলোককে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, ছেলেপুলে নেই, এক ভাইপো আছে জমিদারীর শরিক, কিন্তু সেটা ঘোর অপদার্থ। এই রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ করবার একটা লোক চাই তো।'

'তাহলে দীপনারায়ণ সিং আবার বিয়ে করে ভুলটা কী করেছেন? বংশরক্ষা তো হবে।'

'বংশরক্ষা এখনও হয়নি। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা দীপনারায়ণ সিং রূপে মুগ্ধ হয়ে জাতের বাইরে বিয়ে করেছেন। সিভিল ম্যারেজ।'

'তরুণীটি বুঝি সুন্দরী?'

'সুন্দরী এবং বিদুষী। কলানিপুণা, নাচতে গাইতে জানেন, ছবি আঁকতে জানেন, তার ওপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তেজস্বিনী ছাত্রী, বি. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।'

'দীপনারায়ণ সিং দেখছি ভাগ্যবান ব্যক্তি এবং প্রগতিশীলও বটে।'

'আগে এতটা প্রগতিশীল ছিলেন না। এতদিন ও'র বাড়িতে মেয়েদের পর্দা ছিল। এখন একেবারে পর্দা ফাঁক।'

'ভালই তো। তাতে দোষটা কি?'

'দোষ নেই। কিন্তু অনভ্যাসের ফোঁটা, কপাল চড় চড় করে। বিহারের লোক এখনও মন থেকে পর্দা প্রথা ত্যাগ করতে পারেনি, তাই মেয়েদের একটু স্বাধীনতা দেখলেই কানাঘুষো করে, চোখ ঠারাঠারি করে—'

অতঃপর আমাদের আলোচনা স্ত্রী-স্বাধীনতার পথ ধরিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে উপনীত হইল। ঘড়ির কাঁটাও ক্রমশ ন'টার দিকে যাইতেছে। রাত্রে বাড়ি ফিরিতে বেশি দেরি করিলে সত্যবতী হাঙ্গামা করে। তাই আমরা অনিচ্ছাভরে উঠিবার উপক্রম করিলাম।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'চলুন, আপনাদের মোটরে করে পৌঁছে দিয়ে আসি।' পাণ্ডেজির আগে মোটর সাইকেল ছিল, এখন একটি ছোট মোটর কিনিয়াছেন।

আমরা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি এমন সময় ঘরের কোণে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। পাণ্ডেজি গিয়া ফোন ধরিলেন—'হ্যালো...হ্যাঁ, আমি পুরন্দর পাণ্ডে...দীপনারায়ণ

সিং কথা বলতে চান?...নমস্তে নমস্তে...আপনার পার্টিতে যাবার খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু...বন্ধুদেরও নিয়ে যাব?...তা—ওঁরা এখনও এখানেই আছেন, ওঁদের জিগ্যেস করে বলছি--'

টেলিফোনের মুখে হাত চাপা দিয়া পাণ্ডেজি আমাদের দিকে ফিরিলেন, 'দীপনারায়ণ সিং আপনাদেরও পার্টিতে নিয়ে যেতে বলছেন। কি বলেন?'

ব্যোমকেশ একবার আমার দিকে তাকাইল, বলিল, 'মন্দ কি! একটা নূতনত্ব হবে। আপনার কাশ্মীরী কোর্মা না হয় আপাতত ধামাচাপা রইল।'

পাণ্ডেজি হাসিয়া টেলিফোনের মধ্যে বলিলেন, 'বেশ, ওঁরা যাবেন...ওঁদের কার্ড আমার কাছেই পাঠিয়ে দেবেন...আচ্ছা, কাল আবার দেখা হবে। নমস্তে।'

পাণ্ডেজি টেলিফোন রাখিয়া বলিলেন, 'চলুন, এবার আপনাদের পেঁৗছে দিয়ে আসি।'

দুই

পরদিন সন্ধ্যা আন্দাজ সাতটার সময় পাণ্ডেজি আসিয়া আমাদের মোটরে তুলিয়া দীপনারায়ণ সিংএর বাড়িতে লইয়া গেলেন।

দীপনারায়ণ সিংএর বাড়ি শহরের প্রাচীন অংশে। সাবেক কালের বিরাট দ্বিতল বাড়ি, জেলখানার মত উঁচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা। আমরা উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বাড়ি ও বাগানে জাপানী ফানুসের ঝাড় জ্বলিতেছে, অতি মৃদু শানাই বাজিতেছে, বহু অতিথির সমাগম হইয়াছে। এক তলার বড় হল-ঘরটিতেই সমাগম বেশি, আশেপাশের ঘরগুলিতেও অতিথিরা বসিয়াছেন। কোনও ঘরে ব্রিজের আড্ডা বসিয়াছে, কোনও ঘরে বয়স্থ হাকিম শ্রেণীর অতিথিরা নিজেদের মধ্যে একটু স্বতন্ত্র গণ্ডী রচনা করিয়া গল্পগুজব করিতেছেন। তক্মা আঁটা ভৃত্যেরা চা, কফি ও বলবত্তর পানীয় লইয়া ঘোরাঘুরি করিতেছে।

হল-ঘরটি বৃহৎ, বিলাতি প্রথায় স্থানে স্থানে সোফা-সেট দিয়া সজ্জিত। প্রত্যেক সোফা-সেটে একটি দল বসিয়াছে। ঘরের মধ্যস্থলে সদর দরজার সম্মুখে একটি পালঙ্কের মত আসন। তাহার উপর তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছেন একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, ইনিই গৃহস্বামী দীপনারায়ণ সিং। গায়ে লম্বা গরম কোট, গলায় পশমের গলাবন্ধ। চেহারা ভাল, পঞ্চাশ বছর বয়সে এমন কিছু স্থবির হইয়া পড়েন নাই; কিন্তু মুখের পাণ্ডুর শীর্ণতা হইতে অনুমান করা যায় দীর্ঘ রোগ-ভোগ করিয়া সম্প্রতি আরোগ্যের পথে পদার্পণ করিয়াছেন। পরম সমাদরে দুই হাতে আমাদের করমর্দন করিলেন।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আপনার রোগমুক্তির জন্যে অভিনন্দন জানাই।'

দীপনারায়ণ শীর্ণ মুখে মিষ্ট হাসিলেন, 'বহুৎ ধন্যবাদ। বাঁচবার আশা ছিল না পাণ্ডেজি নেহাৎ ডাক্তার পালিত ছিলেন তাই এ যাত্রা বেঁচে গেছি।' বলিয়া ঘরের কোণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

ঘরের কোণে একটি সোফায় কোট-প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক একাকী বসিয়া ছিলেন; দোহারা গড়ন, বেশভূষার বিশেষ পারিপাট্য নাই, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। অঙ্গুলি নির্দেশ লক্ষ্য করিয়া তিনি আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরিচয়

হইল। দীপনারায়ণ সিং বলিলেন, 'এঁরই গুণে আমার পুনর্জন্ম হয়েছে।'

ডাক্তার পালিত যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ডাক্তারের যা কর্তব্য তার বেশি তো কিছুই করিনি।--তাছাড়া, চিকিৎসা আমি করলেও শহরের বড় বড় ডাক্তার সকলেই দেখেছেন। ত্রিদিববাবু—'

পাণ্ডেজি প্রশ্ন করিলেন, 'রোগটা কি হয়েছিল?'

ডাক্তার পালিত বিলাতি নিদানশাস্ত্র সম্মত রোগের যে সকল লক্ষণ বলিলেন তাহা হইতে অনুমান করিলাম, নানা জাতীয় দুষ্ট বীজাণু স্বভাবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া রক্তাল্পতা ঘটাইয়াছিল এবং হৃদপিণ্ডকে জখম করিবার তালে ছিল, ইন্‌জেকশন প্রভৃতি আসুরিক চিকিৎসার দ্বারা তাহাদের বশে আনিতে হইয়াছে। এখন অবশ্য রোগীর অবস্থা খুবই ভাল, তবু তাঁহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে।

এই সময় পিছন দিকে নাক ঝাড়ার মত একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখি, একটি যুবক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং নাকের মধ্যে শব্দ করিয়া বোধকরি উপেক্ষা জ্ঞাপন করিতেছে। যুবকের চেহারা কৃকলাসের মত, অঙ্গে ফ্যাশন-দুরস্ত বিলাতি সাজপোশাক, মুখে ব্যঙ্গ দম্ভ। দীপনারায়ণ পরিচয় করাইয়া দিলেন—'ইনি ডাক্তার জগন্নাথ প্রসাদ, একজন নবীন বিহারী ডাক্তার।' ডাক্তার অবজ্ঞাভরে আমাদের দিকে ঘাড় নাড়িলেন এবং যে কয়টি কথা বলিলেন তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, প্রবীণ ডাক্তারদের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধার অন্ত নাই, বিশেষত যদি তাঁহারা বাঙালী ডাক্তার হন। দীপনারায়ণ সিংএর চিকিৎসার ভার কয়েকজন বুড়া বাঙালী ডাক্তারকে না দিয়া তাঁহার হাতে অর্পণ করিলে তিনি পাঁচ দিনে রোগ আরাম করিয়া দিতেন। তাঁহার কথা শুনিয়া দীপনারায়ণ সিং মুখ বাঁকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। ডাক্তার পালিত বিরক্ত হইয়া আবার পূর্বস্থানে গিয়া বসিলেন। ডাক্তার জগন্নাথ আরও কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিয়া, অদূরে পানীয়বাহী একজন ভৃত্যকে দেখিয়া হ্রেষাধ্বনি করিতে করিতে সেইদিকে ধাবিত হইলেন।

দীপনারায়ণ সিং লজ্জা ও ক্ষোভ মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, 'এরাই হচ্ছে নতুন যুগের বিহারী। এদের কাছে গুণের আদর নেই, সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলে এরা শুধু নিজের সুবিধা করে নিতে চায়। আজ বিহারে বাঙালীর কদর কমে যাচ্ছে, এরাই তার জন্য দায়ী।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হয়তো বাঙালীরও দোষ আছে।

দীপনারায়ণ বলিলেন, 'হয়তো আছে। কিন্তু পরিহাস এই যে, এরা যখন রোগে পড়ে, যখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়, তখন এরাই ছুটে যায় বাঙালী ডাক্তারের কাছে।'

এই অপ্রীতিকর প্রাদেশিক প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় আমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িতেছিলাম, কিন্তু পাণ্ডেজি তাহা সরল করিয়া দিলেন, দুই চারিটা অন্য কথা বলিয়া আমাদের লইয়া গিয়া যেখানে ডাক্তার পালিত বসিয়া ছিলেন সেইখানে বসাইলেন।

আমরা উপবিষ্ট হইলে ডাক্তার পালিত একটু অল্প হাসিয়া বলিলেন, 'ঘোড়া জগন্নাথ আর কি কি বললে?'

পাণ্ডেজি হাসিয়া উঠিলেন, 'ওর নাম বুঝি ঘোড়া জগন্নাথ? খাসা নাম, ভাবি

লাগ-সৈ হয়েছে। কিন্তু ওদের কথায় আপনি কান দেবেন না ডাক্তার। ওদের কথা কে গ্রাহ্য করে?'

পালিত বলিলেন, 'কান না দিয়ে উপায় কি? ওরা যে দল বেঁধে প্রচার কার্য করে বেড়াচ্ছে। যারা বুদ্ধিমান তারা হয়তো গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সাধারণ লোকে ওদের কথাই শোনে।'

আমাদের আলোচনা হয়তো আর কিছুক্ষণ চলিত কিন্তু হঠাৎ পাশের দিকে একটা অদ্ভুত ধরনের হাসির শব্দে তাহাতে বাধা পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, অদূরে অন্য একটি সোফা-সেটে তিনটি লোক আসিয়া বসিয়াছে; তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে হাস্য করিতেছে তাহার দেহায়তন এতই বিপুল যে সে একাই সমস্ত সোফাটি জুড়িয়া বসিয়াছে। ব্যূঢ়োরস্ক গজস্কন্ধ যুবক, চিবুক হইতে নিতম্ব পর্যন্ত থরে থরে চর্বির তরঙ্গ নামিয়াছে। তাহার কণ্ঠ হইতে যে বিচিত্র হাস্যধ্বনি নির্গত হইতেছে তাহা যে একই কালে একই মানুষের কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করা কঠিন। এক সঙ্গে যদি গোটা দশেক শৃগাল হুক্কাহুয়া করিয়া ডাকিয়া ওঠে এবং সেই সঙ্গে কয়েকটা পেঁচোয় পাওয়া আঁতুড়ে ছেলে কান্না জুড়িয়া দেয় তাহা হইলে বোধহয় এই শব্দ-সংগ্রামের কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

অন্য লোক দুটি নীরবে বসিয়া মুচকি হাসিতেছিল। আশ্চর্য এই যে মোটা যুবকটি যে-পরিমাণে মোটা, তাহার সঙ্গী দুটি ঠিক সেই পরিমাণে রোগা। ইহাদের তিনজনের দেহের মেদ মাংস সমানভাবে বাঁটিয়া দিলে বোধকরি তিনটি হৃষ্টপুষ্ট সাধারণ মানুষ পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য হাসির এই অট্টরোলে ঘরসুদ্ধ লোকের সচকিত দৃষ্টি সেইদিকে ফিরিয়াছিল। একটি বেশমী পাগড়ি-পরা কৃশকায় বৃদ্ধ কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়া দ্রুত সেইদিকে অগ্রসর হইলেন।

ব্যোমকেশ ডাক্তার পালিতকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'গজকচ্ছপটি কে?'

ডাক্তার পালিত মুখ টিপিয়া বলিলেন, 'দীপনারায়ণবাবুর ভাইপো দেবনারায়ণ। একটি আস্ত—' কথাটা ডাক্তার শেষ করিলেন না, কিন্তু তাঁহার অনুচ্চারিত বিশেষ্যটি স্পষ্টই বোঝা গেল। ইহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া কাল পাণ্ডেজি বলিয়াছিলেন—ঘোর অপদার্থ। শুধু অপদার্থই নয়, বুদ্ধিসুদ্ধিও শরীরের অনুরূপ। পাগড়ি-পরা বৃদ্ধটি আসিয়া রোগা যুবক দুটিকে কানে কানে কিছু বলিলেন, মনে হইল তিনি তাহাদের মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন। রোগা লোক দুটিও যেন অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছে এইভাবে ভিজা বিড়ালের মত চক্ষু নত করিয়া রহিল। গজকচ্ছপের হাসি তখনও থামে নাই, তবে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধ তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং কানের কাছে নত হইয়া কিছু বলিলেন। হঠাৎ ব্রেককষা গাড়ির মত গজকচ্ছপের হাসি হেঁচকা দিয়া থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ পূর্ববৎ ডাক্তার পালিতকে জিজ্ঞাসা করিল, 'রোগা লোক দুটি কে?'

পালিত বলিলেন, 'ওই যেটির কোঁকড়া চুল কোঁকড়া গোঁফ ও হচ্ছে দেবনারায়ণের বিদূষক, মানে ইয়ার। নাম বেণীপ্রসাদ। অন্যটির নাম লীলাধর বংশী—দীপনারায়ণবাবুর স্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এবং দেবনারায়ণের অ্যাসিস্ট্যান্ট বিদূষক।'

'আর বৃদ্ধটি?'

'বৃদ্ধটি লীলাধরের বাবা গঙ্গাধর বংশী, স্টেটের বড় কর্তা, অর্থাৎ ম্যানেজার। গভীর জলের মাছ।'

গভীর জলের মাছটি একবার চক্ষু তুলিয়া আমাদের পানে চাহিলেন এবং মন্দমধুর হাস্যে আমাদের অভিসিঞ্চিত করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। দেবনারায়ণ নিজ ঝকমকে শার্কস্কিনের গলাবন্ধ কোটের পকেট হইতে একটি সুবৃহৎ পানের ডিবা বাহির করিয়া কয়েকটা পান গালে পুরিয়া গুরু গম্ভীর মুখে চিবাইতে লাগিল। এই লোকটাই কিছুক্ষণ পূর্বে হট্টগোল করিয়া হাসিতেছিল তাহা আর বোঝা যায় না।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'হাসির কারণটা কী কিছু বুঝতে পারলেন?'

পালিত বলিলেন, 'বোধহয় বিদূষকেরা রসের কথা কিছু বলেছিল' তাই এত হাসি।'

একজন ভৃত্য রূপার থালায় সোনালী তবক মোড়া পান ও সিগারেট লইয়া উপস্থিত হইল। আমরা সিগারেট ধরাইলাম। ব্যোমকেশ এদিকে ওদিকে চাহিয়া পাণ্ডেজিকে বলিল, 'ইন্সপেক্টর রতিকান্তকে দেখছি না।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'হয়তো অন্য ঘরে আছে। কিম্বা হয়তো থানায় আটকে গেছে। আসবে নিশ্চয়। আপনারা বসুন, আমি একবার কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দুটো কথা বলে আসি।'

পাণ্ডেজি উঠিয়া গেলেন। আমরা তিনজনে বসিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে ঘরের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অতিথিগুলিকে দর্শন করিতে লাগিলাম। অতিথিদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশি, দু' একটি স্ত্রীলোক আছেন।

এই সময় ঘরের অন্য প্রান্তের একটি দ্বার দিয়া এক মহিলা প্রবেশ করিলেন। ঘরে বেশ উজ্জ্বল আলো ছিল, এখন মনে হইল কেবলমাত্র এই মহিলাটির আবির্ভাবে ঘরটি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। তিনি কোন্ রংয়ের শাড়ী পরিয়াছেন, কী কী গহনা পরিয়াছেন কিছুই চোখে পড়িল না, কেবল দেখিলাম, আলোকের একটি সঞ্চরমাণ উৎস ধীরে ধীরে আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ঘরের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন সকলেই সচকিত হইয়া উঠিলেন, কেহ কেহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলেন। মহিলাটি হাসিমুখে লীলায়িত ভঙ্গিমায় সকলকে অভ্যর্থনা করিতে করিতে আমাদের দিকেই আসিতে লাগিলেন।

ডাক্তার পালিত অ্যাশ-ট্রের উপর সিগারেট ঘষিয়া নিভাইলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, 'মিসেস্ দীপনারায়ণ শকুন্তলা।'

রূপসী বটে। বয়স চব্বিশ-পঁচিশের কম হইবে না, কিন্তু সর্বাঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবনের মদোদ্ধত লাবণ্য যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। আমাদের দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এইরূপ লাবণ্যবতী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা রমণী হয়তো দুই চারিটি দেখা যায়, কিন্তু এদিকে বেশী দেখা যায় না। শকুন্তলা নামটিও যেন রূপের সঙ্গে ছন্দ রক্ষা করিয়াছে। শকুন্তলা অপ্সরাকন্যা শকুন্তলা— যাহাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত ভুলিয়াছিলেন। দীপনারায়ণ সিং প্রৌঢ় বয়সে কেন অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না।

শকুন্তলা আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আমরা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলাম। ডাক্তার পালিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। শকুন্তলা অতি মিষ্ট স্বরে দুই চারিটি সাদর সম্ভাষণের কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার গৃহিণীসুলভ

সৌজন্য এবং তরুণীসুলভ শালীনতা দুইই প্রকাশ পাইল। তারপর তিনি অন্যদিকে ফিরিলেন।

এই সময় লক্ষ্য করিলাম, শকুন্তলা একা নয়, তাঁহার পিছনে আর একটি যুবতী রহিয়াছেন। সূর্যের প্রভায় যেমন শুকতারা ঢাকা পড়িয়া যায়, এতক্ষণ এই যুবতী তেমনি ঢাকা পড়িয়া ছিলেন; এখন দেখিলাম তাঁহার কোলে একটি বছর দেড়েকের ছেলে। বস্তুত এই ছেলেটি হঠাৎ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াই যুবতীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যুবতী শকুন্তলার চেয়ে বোধ-হয় দু এক বছরের ছোটই হইবেন; সুশ্রী গৌরাঙ্গী, মোটাসোটা ঢিলাঢালা গড়ন, মহার্ঘ বস্ত্র ও গহনার ভারে যেন নড়িতে পারিতেছেন না। তাঁহার বেশবাসের মধ্যে প্রাচুর্য আছে কিন্তু নিপুণতা নাই। তাছাড়া মনে হয় প্রকাশ্যভাবে পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করিতে তিনি অভ্যস্ত নন, পর্দার ঘোর এখনও কাটে নাই।

শিশু কাঁদিয়া উঠিতেই শকুন্তলা পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহার মুখে একটু অপ্রসন্নতার ছায়া পড়িল, তিনি বলিলেন, 'চাঁদনী, খোকাকে এখানে এনেছ কেন? যাও, ওকে নার্সের কাছে রেখে এস।'

প্রভুভক্ত কুকুর প্রভুর ধমক খাইয়া যে ভাবে তাকায়, যুবতীও সেইভাবে শকুন্তলার মুখের পানে চাহিলেন, তারপর নম্রভাবে ঘাড় হেলাইয়া শিশুকে লইয়া যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে ফিরিয়া চলিলেন।

দীপনারায়ণ দূর হইতে স্ত্রীকে আহ্বান করিলেন 'শকুন্তলা'! কয়েকজন হোমরাচোমরা অতিথি আসিয়াছেন।

শকুন্তলা সেই দিকে গেলেন। পাশের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া দেখিলাম, দেবনারায়ণ কোলা ব্যাঙের মত ড্যাবডেবে চোখ মেলিয়া শকুন্তলার পানে চাহিয়া আছে।

আমরা আবার সিগারেট ধরাইলাম। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'দ্বিতীয় মহিলাটি কে?'

ডাক্তার পালিত অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, 'দেবনারায়ণের স্ত্রী। ছেলেটিও দেবনারায়ণের।'

লক্ষ্য করিলাম ডাক্তার পালিতের কপালে একটু ভ্রূকুটির চিহ্ন। তাঁহার চক্ষুও শকুন্তলাকে অনুসরণ করিতেছে।

তারপর আমরা অনেকক্ষণ বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে সময় কাটাইলাম। ডাক্তার পালিত অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন এবং তাঁহার চক্ষু দুটি ঈষৎ উদ্বিগ্ন-ভাবে শকুন্তলাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

সাড়ে আটটার সময় আহারের আহ্বান আসিল।

অন্য একটি হল-ঘরে টেবিল পাতিয়া আহারের ব্যবস্থা। রাজকীয় আয়োজন। কলিকাতার কোন বিলাতী হোটেল হইতে পাচক ও পরিবেশক আসিয়াছে। আহার শেষ করিয়া উঠিতে পৌনে দশটা বাজিল।

বাহিরের হল-ঘরে আসিয়া পান সিগারেট সেবনে যত্নবান হইলাম। ডাক্তার পালিত একটি পরিতৃপ্ত উদ্গার তুলিয়া বলিলেন, 'মন্দ হ'ল না।— আচ্ছা, আজ চলি, রাত্তিরে বোধহয় একবার রুগী দেখতে বেরুতে হবে। আবার কাল সকালেই দীপনারায়ণবাবুকে ইন্‌জেকশন দিতে আসব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখনও ইন্‌জেকশন চলছে নাকি?'

পালিত বলিলেন, 'হ্যাঁ, এখনও হপ্তায় একটা করে দিচ্ছি। আর গোটা দুই দিয়ে বন্ধ করে দেব। আচ্ছা—নমস্কার। আপনারা তো এখনও আছেন, দেখা হবে নিশ্চয়'

তিনি প্রস্থানের জন্য পা বাড়াইয়াছেন এমন সময় দেখিলাম সদর দরজা দিয়া ইন্সপেক্টর রাতিকান্ত চৌধুরী প্রবেশ করিতেছে। তাহার পরিধানে পুলিশের বেশ, কেবল মাথায় টুপি নাই। একটু ব্যস্তসমস্ত ভাব। দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সে একবার ঘরের চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল, তারপর ডাক্তার পালিতকে দেখিতে পাইয়া দ্রুত আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

'ডাক্তার পালিত, একটা খারাপ খবর আছে। আপনার ডিসপেন্সারিতে চুরি হয়েছে।'

'চুরি!'

রাতিকান্ত বলিল, 'হ্যাঁ। আন্দাজ ন'টার সময় আমি থানা থেকে বেরিয়ে এখানে আসছিলাম, পথে নজর পড়ল আপনার ডিসপেনসারির দরজা খোলা রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখি দরজার তালা ভাঙা। ভেতরে গিয়ে দেখলাম আপনার টেবিলের দেরাজ খোলা, চোর দেরাজ ভেঙে টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়েছে। আমি একজন কনেস্টবলকে বসিয়ে এসেছি। আপনি যান। দেরাজে কি টাকা ছিল?'

পালিত হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, 'টাকা! রাত্রে বেশি টাকা তো থাকে না, বড় জোর দু'চার টাকা ছিল।'

'তবু আপনি যান। টাকা ছাড়া যদি আর কিছু চুরি গিয়ে থাকে আপনি বুঝতে পারবেন।'

'আমি এখনি যাচ্ছি।'

'আর, টাকা ছাড়া যদি অন্য কিছু চুরি গিয়ে থাকে আজ রাত্রেই থানায় এত্তালা পাঠিয়ে দেবেন।'

শকুন্তলা ও পাণ্ডেজি দূরে দাঁড়াইয়া বাক্যালাপ করিতেছিলেন, আমাদের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পাণ্ডেজি প্রশ্ন করিলেন, 'কি হয়েছে?'

ডাক্তার পালিত দাঁড়াইলেন না, তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। রাতিকান্ত চুরির কথা বলিল। তারপর শকুন্তলার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আমার বড় দেরি হয়ে গেল- খেতে পাবো তো?'

শকুন্তলা একটু হাসিয়া বলিলেন, 'পাবেন। আসুন আমার সঙ্গে।'

গৃহস্বামী পূর্বেই বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করিয়াছিলেন, আমরা শকুন্তলার নিকট বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

তিন

পরদিন সকাল আন্দাজ ন'টার সময় একখানা মোটর আসিয়া আমাদের বাসার সম্মুখে থামিল। ব্যোমকেশ খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, 'পাণ্ডেজি এত সকালে!'

পরক্ষণেই পাণ্ডেজি আমাদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। পরিধানে পুলিশ ইউনিফর্ম, মুখ গম্ভীর। ব্যোমকেশের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে বলিলেন, 'দীপনারায়ণ সিং মারা গেছেন।'

আমরা ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম, কথাটা ঠিক যেন হৃদয়ঙ্গম হইল না।

'মারা গেছেন!'

'এইমাত্র রতিকান্ত টেলিফোন করেছিল। সকাল বেলা ডাক্তার পালিত এসেছিলেন দীপনারায়ণ সিংকে ইন্‌জেকশন দিতে। ইন্‌জেকশন দেবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। আমি সেখানেই যাচ্ছি। আপনারা যাবেন?'

ব্যোমকেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া আলোয়ানখানা কাঁধে ফেলিল। আমিও উঠিলাম।

'চলুন।'

মোটরে যাইতে যাইতে কাল রাত্রির দৃশ্যগুলি মনে পড়িতে লাগিল। দীপনারায়ণ সিংকে একবারই দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে ভাল লাগিয়াছিল; শিষ্ট সহাস্য ভদ্রলোক, রোগ হইতে সারিয়া উঠিতেছিলেন। হঠাৎ কী হইল? আর শকুন্তলা—

শকুন্তলা বিধবা হইয়াছেন...অন্তর হইতে যেন এই নিষ্ঠুর সত্য স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। ফটকের কাছে গোটাতিনেক মোটর দাঁড়াইয়া আছে। পাণ্ডেজি গাড়ি থামাইয়া অবতরণ করিলেন। দেউড়ি পার হইয়া আমরা বাড়ির সদর দরজায় উপস্থিত হইলাম। বাগানে কেহ নাই, চারিদিক যেন থমথম করিতেছে।

সদর দরজার সম্মুখে ইন্সপেক্টর রতিকান্ত গম্ভীর মুখে পাণ্ডেজিকে স্যালুট করিল। আমাদের দেখিয়া তাহার ভ্রূ ঈষৎ উত্থিত হইল, কিন্তু সে কিছু না বলিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

হল-ঘরের দ্বারের সম্মুখে পালঙ্কের মত আসনটি পূর্ববৎ রহিয়াছে, তাহার উপর দীপনারায়ণ সিংএর মৃতদেহ। মৃতদেহের পাশে বসিয়া ডাক্তার পালিত এক দৃষ্টে মৃতের মুখের পানে চাহিয়া আছেন। ঘরে আর কেহ নাই, কেবল আসবাব-গুলি গত রাত্রির মতই সাজানো রহিয়াছে।

আমরা পা টিপিয়া টিপিয়া পালঙ্কের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। দীপনারায়ণ সিংকে কাল রাত্রে যেমন দেখিয়াছিলাম, আজ মৃত্যুর স্পর্শে তাঁহার আকৃতির কোনও পরিবর্তন হয় নাই। চক্ষু মুদ্রিত, মুখের স্নায়ু পেশী শিথিল, যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

ডাক্তার পালিত এমন তন্ময় হইয়া মৃতের মুখের পানে চাহিয়াছিলেন যে আমাদের আগমন বোধহয় জানিতে পারেন নাই। পাণ্ডেজির লঘু করস্পর্শে তাঁহার চমক ভাঙিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া একে একে আমাদের মুখের পানে চাহিলেন, তারপর বলিলেন, 'পোস্ট-মর্টেম হওয়া দরকার। আর-এই শিশিটা রাখুন।' তাঁহার হাতের কাছে একটি রবারের স্টপার দেওয়া ক্ষুদ্র বাদামী রঙের শিশি ছিল, সেটি পাণ্ডেজিকে দিলেন। পাণ্ডেজি শিশি চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া দেখিলেন তখনও তাহাতে প্রায় আধ শিশি তরল পদার্থ রহিয়াছে। তিনি

শিশিটি রতিকান্তের হাতে দিয়া শান্তকণ্ঠে ডাক্তারকে বলিলেন, 'আসুন, ওদিকে গিয়ে বসা যাক।'

ডাক্তার পালিত তাঁহার হ্যান্ডব্যাগটি পালঙ্কের উপর হইতে তুলিয়া লইলেন। আমরা সকলে অদূরে একটি সোফা-সেটে গিয়া বসিলাম। রতিকান্ত দাঁড়াইয়া রহিল। পাণ্ডেজি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাড়ির আর সকলে কোথায়?'

রতিকান্ত বলিল, 'তাদের সব ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছি। মিস্ মান্না শকুন্তলা দেবীর কাছে আছেন।'

'মিস্ মান্না কে? লেডি ডাক্তার?'

পালিত বলিলেন, 'হ্যাঁ। তিনিও এ বাড়ির বাঁধা ডাক্তার। শকুন্তলার অবস্থা দেখে তাঁকে টেলিফোন করে আনিয়ে নিয়েছি।'

'বেশ করেছেন। দেবনারায়ণের খবর কি?'

'দেবনারায়ণটা ইডিয়ট—ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কাঁদছে। দেওয়ান গঙ্গাধর বংশী তার কাছে আছে। বেচারী চাঁদনীরই বিপদ, নিজে কাঁদছে, একবার স্বামীর কাছে ছুটে আসছে, একবার শকুন্তলার কাছে ছুটে যাচ্ছে।' তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন।

পাণ্ডেজি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'ডাক্তার পালিত, এবার গোড়া থেকে সব কথা বলুন।'

ডাক্তার তাঁহার ব্যাগটি কোলের উপর হইতে নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, 'বলবার বেশি কিছু নেই। আন্দাজ আটটার সময় আমি এসে দেখলাম দীপনারায়ণবাবু ওই পালঙ্কে বসে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন - এই শীতে আপনি এত শীগ্‌গির আসবেন ভাবিনি, চা খান। আমি বললাম আচ্ছা, আগে ইন্‌জেকশনটা দিই। চাঁদনী উপস্থিত ছিলেন, শকুন্তলা আজ উপস্থিত ছিলেন না। আমি দীপনারায়ণবাবুর নাড়ী দেখলাম, নাড়ী বেশ ভাল। তখন সিরিঞ্জে লিভার এক্সট্রাক্ট ভরে তাঁর বাহুতে ইন্‌জেকশন দিলাম। ইন্‌ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশন, হাঙ্গামা কিছু নেই, কিন্তু দীপনারায়ণবাবু আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লেন। দেখলাম তাঁর চোখের পাতা ভারী হয়ে বুজে আসছে; তিনি কথা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু বলতে পারলেন না। আমি তখনই তাঁকে এড্রেনালিন্ দিলাম, তারপর আর্টিফিসিয়াল রেস্‌পিরেশন দিতে লাগলাম। কিন্তু কোনও ফল হল না, তিন-চার মিনিটের মধ্যে তাঁর ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল।'

ডাক্তার একবার নিজের বুকের উপর আঙুল বুলাইয়া নীরব হইলেন। তিনি প্রবীণ ডাক্তার, আকস্মিক মৃত্যু তাঁহার কাছে নূতন নয়। কিন্তু তিনি যে ভিতরে ভিতরে কত বড় ধাক্কা খাইয়াছেন তাহা তাঁহার কঠিন সংযম ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'মৃত্যুর কারণ কী তা আপনি বুঝতে পারেন নি?'

ডাক্তার বলিলেন, 'লক্ষণ দেখে মনে হয়েছিল - এনাফিলেকটিক শক্‌। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়।'

'তবে কী হতে পারে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়তো কোনও বিষ।'

পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, ব্যোমকেশ বলিল, 'কিউরারি

বিষ হতে পারে কি?'

ডাক্তার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তারপর কতকটা নিজ মনেই বলিলেন, 'কিউরারি! হতে পারে। তবে পোস্ট-মর্টেম না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চয় বলা যায় না।'

'যদি কিউরারি বিষে মৃত্যু হয়ে থাকে পোস্ট-মর্টেমে কিউরারি পাওয়া যাবে?'

'যাবে। কিডনীতে পাওয়া যাবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তারবাবু, আপনি যে শিশিটা এখনি পাণ্ডেজিকে দিলেন ওটা কি?'

ডাক্তার বলিলেন, 'ওটা লিভার এক্সট্র্যাক্টের ভায়াল। ওতে দশ শিশি ওষুধ থাকে, ভায়ালের মুখ রবার দিয়ে সীল করা থাকে। সিরিঞ্জের ছুঁচ রবারে ঢুকিয়ে ভায়াল থেকে দরকার মতো ওষুধ বের করে নেওয়া যায়। আজ আমি ওই ভায়াল থেকেই ওষুধ বের করে ইন্‌জেকশন দিয়েছিলাম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ইন্‌জেকশন দেবার সঙ্গে সঙ্গে যখন মৃত্যু হয়েছে তখন অনুমান করা যেতে পারে যে ইনজেকশনই মৃত্যুর কারণ। তাহলে ওই ভায়ালে বিষ আছে?'

ডাক্তার বলিলেন, 'তাছাড়া আর কি হতে পারে? অথচ—কাল সন্ধ্যেবেলা ওই ভায়াল থেকেই একজন রুগীকে ইন্‌জেকশন দিয়েছি, সে দিব্যি বেঁচে আছে।'

'ভায়ালটা আপনার ব্যাগের মধ্যেই থাকে?'

'হ্যাঁ। ফুরিয়ে গেলে একটা নতুন ভায়াল রাখি।'

'আচ্ছা, বলুন দেখি, কাল রাত্তিরে আপনার ব্যাগ কোথায় ছিল?'

'ডিস্‌পেনসারিতে ছিল।'

'রাত্তিরে যখন কল আসে তখন কি করেন, ডিস্‌পেনসারি থেকে ব্যাগ নিয়ে রুগী দেখতে যান?'

'না, আমার বাড়িতে আর একটা ব্যাগ থাকে, রাত্তিরে কল এলে সেটা নিয়ে বেরুই।'

'বুঝেছি। কাল রাত্তিরে যখন আপনার ডিস্‌পেনসারিতে চোর ঢুকেছিল তখন এ ব্যাগটা সেখানেই ছিল?'

'হ্যাঁ।' ডাক্তার চকিত হইয়া উঠিলেন—'কাল রাত্রি আন্দাজ সাতটার সময় আমি রুগী দেখে ডিস্‌পেনসারিতে ফিরে আসি। তখন আর বাড়ি ফেরবার সময় ছিল না, ব্যাগ রেখে কম্পাউন্ডারকে বন্ধ করতে বলে সটান এখানে চলে এসে-ছিলাম।'

'ও'—ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিল, 'কম্পাউন্ডার কখন ডিস্‌পেনসারি বন্ধ করে চলে গিয়েছিল আপনি জানেন?'

'জানি বৈকি। কাল রাত্রে চুরির খবর পেয়ে এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি কম্পাউন্ডারকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, সাতটার পরই সে ডাক্তারখানা বন্ধ করে নিজের বাড়ি চলে গিয়েছিল।'

'ভাল কথা, ডিস্‌পেনসারি থেকে আর কিছু চুরি গিয়েছিল কিনা জানতে পেরেছেন?'

'আর কিছু চুরি যায়নি। শুধু টেবিলের দেরাজ থেকে কয়েকটা টাকা আর সিকি আধুলি গিয়েছিল।'

ব্যোমকেশ পাণ্ডেজির দিক হইতে রতিকান্তের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল, 'তাহলে চুরির আসল উদ্দেশ্য বোঝা গেল।'

রতিকান্ত এতক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া ব্যোমকেশের সওয়াল জবাব শুনিতেছিল। যে প্রশ্ন পুলিশের করা উচিত তাহা একজন বাহিরের লোক করিতেছে ইহা বোধহয় তাহার ভাল লাগে নাই। কিন্তু ব্যোমকেশ পাণ্ডেজির বন্ধু, তাই সে নীরব ছিল। এখন সে একটু নীরস স্বরে বলিল, 'কী বোঝা গেল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝতে পারলেন না? চোর টাকা চুরি করতে আসেনি। সে লিভার এক্সট্র্যাক্টের ভায়ালটা বদলে দিয়ে গেছে।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'বদলে দিয়ে গেছে?'

'কিম্বা ডাক্তারবাবুর ভায়ালে কয়েক ফোঁটা তরল কিউরারি সিরিঞ্জের সাহায্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। ফল একই। চোর জানত আজ সকালবেলা দীপনারায়ণ সিংকে ইন্‌জেকশন দেওয়া হবে। -এবার ব্যাপারটা বুঝেছেন?'

কিছুক্ষণ সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তারপর পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আজ সকালে ইন্‌জেকশন দেওয়া হবে কে কে জানত?'

ডাক্তার বলিলেন, 'বাড়ির সকলেই জানত রবিবার সকালে ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়, আমি প্রথমে ওঁকে ইন্‌জেকশন দিয়ে তারপর রুগী দেখতে বেরুই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল রাত্তিরে আমিও জানতে পেরেছিলাম, ডাক্তারবাবু বলেছিলেন। সুতরাং ওদিক থেকে কাউকে ধরা যাবে না।'

ইন্সপেক্টর রতিকান্ত কথা বলিল, পিছন হইতে পাণ্ডেজির চেয়ারের উপর ঝুঁকিয়া বলিল, 'স্যার, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো অপঘাত মৃত্যু, ডাক্তার পালিত ভুল করে অন্য ওষুধ ইন্‌জেকশন দিয়েছেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—। আমি এ কেসের চার্জ নিতে চাই।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'নিশ্চয়, তোমারই তো এলাকা। তুমি চার্জ নাও। এখনি লাশ পোস্ট-মর্টেমের জন্য পাঠাও। আর ওই ওষুধের ভায়ালটা পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটারিতে পাঠিয়ে দাও। এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি হওয়া চাই।'

রতিকান্তের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার, নিষ্পত্তি আমি করব। দীপনারায়ণবাবু আমার মুরুব্বি ছিলেন, কুটুম্ব ছিলেন, তাঁকে যে খুন করেছে সে আমার হাতে ছাড়া পাবে না।'

তাহার কথাগুলা একটু নাটুকে ধরনের হইলেও ভিতরে খাঁটি হৃদয়াবেগ ছিল। সে স্যালুট করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, পাণ্ডেজি বলিলেন, 'রতিকান্ত, আমার বন্ধু শ্রীব্যোমকেশ বক্সীকে তুমি বোধহয় চেনো না। উনি বিখ্যাত ব্যক্তি, আমাদের লাইনের লোক। উনিও তোমাকে সাহায্য করবেন।'

রতিকান্ত ব্যোমকেশের পানে চাহিল। ব্যোমকেশ সম্বন্ধে তাহার মনে খানিকটা বিস্ময়ের ভাব ছিল, এখন সত্য পরিচয় পাইয়া সে সুখী হইতে পারে নাই তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল। সে ধীরে ধীরে বলিল, 'আপনি বিখ্যাত ব্যোমকেশ বক্সী? আপনার কয়েকটি কাহিনী আমি পড়েছি, হিন্দীতে অনুবাদ হয়েছে। তা আপনি যদি অনুসন্ধানের ভার নেন—'

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলিল, 'না না, তদন্ত আপনি করবেন। আমার পরামর্শ যদি দরকার হয় আমি সাধ্যমত সাহায্য করব—এর বেশি কিছু নয়।'

রতিকান্ত বলিল, 'ধন্যবাদ। আপনার সাহায্য পাওয়া তো ভাগ্যের,

কথা।—আচ্ছা স্যার, আমি এবার যাই, লাশের ব্যবস্থা করতে হবে।' স্যালুট করিয়া রতিকান্ত চলিয়া গেল।

আমরাও উঠিলাম। এখানে বসিয়া থাকিয়া আর লাভ নাই। ডাক্তার পালিত ইতস্তত করিয়া বলিলেন, 'আমি শকুন্তলাকে একবার দেখে যাই। অবশ্য, তার কাছে মিস্ মান্না আছেন—'

এই সময় বাড়ির ভিতর দিক হইতে একটি মহিলা প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘাঙ্গী, আঁট-সাঁট শাড়ী পরা, চোখে চশমা, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, ভাব ভঙ্গীতে চরিত্রের দৃঢ়তা পরিস্ফুট। তাঁহাকে দেখিয়া ডাক্তার পালিত সেই দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। দুইজনে নিম্ন স্বরে কথা হইতে লাগিল।

ব্যোমকেশ পাণ্ডেজির পানে চাহিয়া ভ্রূ তুলিল, পাণ্ডেজি হ্রস্বকণ্ঠে বলিলেন, 'মিস্ মান্না।'

মিস্ মান্না কিছুক্ষণ কথা বলিয়া আবার ভিতর দিকে চলিয়া গেলেন, ডাক্তার পালিত আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলাম তাঁহার কপালে গভীর ভ্রূকুটি।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'নতুন খবর কিছু আছে নাকি?'

ডাক্তার বলিলেন, 'খবর আছে, কিন্তু নতুন নয়। কাল রাত্রেই সন্দেহ করেছিলাম।'

'কি সন্দেহ করেছিলেন?'

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ডাক্তার বলিলেন, 'শকুন্তলা অন্তঃসত্ত্বা।'

চার

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ফটকের দিকে যাইতে যাইতে গত রাত্রির কথা মনে পড়িল। ডাক্তার পালিতের উদ্বিগ্ন অনুসন্ধিৎসু চক্ষু শকুন্তলাকে অনুসরণ করিয়াছিল। তিনি অভিজ্ঞ ডাক্তার, অন্যের কাছে যাহা লক্ষণীয় নয়, তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চোখে উদ্বেগ ও সংশয়ের ছায়া দেখিলাম কেন? কিসের উদ্বেগ?

ফটকের বাহিরে আসিয়া ডাক্তার নিজের মোটরে উঠিবার উপক্রম করিলেন, তারপর কি ভাবিয়া আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পাণ্ডেজিকে বলিলেন, 'আমার হাতেই দীপনারায়ণবাবুর মৃত্যু হয়েছে। আমাকে যদি আপনারা অ্যারেস্ট করতে চান আমার কিছু বলবার নেই। এখন আমি রুগী দেখতে চললাম। যখনই তলব করবেন থানায় হাজির হব।'

পাণ্ডেজি কিছু বলিলেন না, কেবল একটু হাসিলেন। ডাক্তার নড করিয়া মোটরে উঠিলেন এবং মোটর হাঁকাইয়া প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডেজি হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, 'এখনও সাড়ে দশটা বাজেনি। চলুন আমার বাসায়।'

আমরা মোটরে উঠিতে যাইতেছি এমন সময় আর একটি মোটর আসিয়া থামিল। পুরানো হাড়-নড়বড়ে মরিস গাড়ি, তাহা হইতে অবতরণ করিল নবীন ডাক্তার জগন্নাথ প্রসাদ। আমাদের দেখিয়া সে নাক-ঝাড়ার শব্দ করিল, তারপর

পাণ্ডেজির দিকে ভ্রূভঙ্গ করিয়া বলিল, 'সকালবেলা আপনি এখানে?'

জগন্নাথকে দেখিয়া পাণ্ডেজির মুখ গম্ভীর হইয়াছিল, তিনি পালটা প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি এখানে?'

জগন্নাথ হাল্কা সুরে বলিল, 'এদিক দিয়ে রুগী দেখতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দীপনারায়ণজিকে দেখে যাই। কেমন আছেন তিনি?'

পাণ্ডেজি হিম-কঠিন কণ্ঠে বলিলেন, 'কেমন আছেন তিনি তা আপনি ভাল ভাবেই জানেন। ন্যাকামি করবার দরকার কি?'

ক্ষণেকের জন্য জগন্নাথ ডাক্তার থতমত খাইয়া গেল তারপর অসভ্যের মত দাঁত বাহির করিয়া বলিল, 'তাহলে যা শুনেছি তা সত্যি—পান্নালাল পালিত দীপবাবুকে ইন্‌জেকশন দিয়ে মেরেছে।'

পাণ্ডেজি অতি কষ্টে ধৈর্য রক্ষা করিয়া ধীর স্বরে কহিলেন, 'দীপনারায়ণ-বাবু মারা গেছেন। কী করে মারা গেছেন তা আপনার জানবার দরকার নেই, আপনি এ বাড়ির ডাক্তার নন। এ বাড়ি এখন পুলিশের দখলে, আপনি ইন্সপেক্টর রতিকান্ত চৌধুরীর অনুমতি না নিয়ে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করবেন না।'

জগন্নাথ একবার আমাদের দিকে ধৃষ্ট নেত্রপাত করিল, বলিল, 'আপনিও দেখছি বাঙালীদের দলে ভিড়েছেন। তা ভিড়ুন, কিন্তু অসুখে পড়লে বাঙালী ডাক্তারের কাছে যাবেন না। দীপবাবুর দৃষ্টান্তটা মনে রাখবেন।'

পাণ্ডেজি উত্তর দিবার আগেই জগন্নাথ নিজের মোটরে গিয়া উঠিল এবং ঝড়্‌ঝড়্‌ শব্দ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

পাণ্ডেজিকে আগে কখনও রাগিতে দেখি নাই, এখন দেখিলাম তাঁহার গৌরবর্ণ মুখ রাগে রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি গলার মধ্যে একটা অবরুদ্ধ শব্দ করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। আমরাও উঠিলাম।

মিনিট দশেকের মধ্যে পাণ্ডেজির বাসায় পৌঁছানো গেল। পাণ্ডেজি চায়ের হুকুম দিলেন, কারণ পশ্চিমের শীতে চা-পানের কোনও নির্ধারিত সময় নাই। তারপর আমরা বসিবার ঘরে গিয়া অধিষ্ঠিত হইলাম। পাণ্ডেজি প্রশ্ন করিলেন, 'কী মনে হল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুনই বটে, আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। যিনি এই কার্যটি করেছেন তিনি অতি কৌশলী ব্যক্তি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দীপনারায়ণ সিংকে খুন করে কার লাভ।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'লাভ একমাত্র দেবনারায়ণের। দীপনারায়ণ অপুত্রক মারা গেছেন, সুতরাং সব সম্পত্তিই এখন তার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অপুত্রক কিনা এখনও ঠিক বলা যায় না, শকুন্তলা দেবীর ছেলে হতে পারে। কিন্তু দেবনারায়ণ হয়তো খবরটা জানত না।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'না জানাই সম্ভব। মৃত্যুর পূর্বে কেবল দীপনারায়ণ সিং বোধহয় খবরটা জানতে পেরেছিলেন।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তিনি জানতে পারলে কি চুপ করে থাকতেন? যা হোক, ধরা যাক তিনি জানতেন না, শকুন্তলা স্বামীকে বলেন নি। তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে কী? দেবনারায়ণ সমস্ত সম্পত্তির লোভে খুড়োকে খুন করিয়েছে। নিজের হাতে এ কাজ করেনি, করবার মত বুদ্ধি তার নেই।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কাল রাত্রি সওয়া সাতটার সময় আমরা যখন দীপ-

নারায়ণের বাড়িতে গিয়েছি তখন দেবনারায়ণ বাড়িতেই ছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অত বড় হাতীর মত শরীর নিয়ে সে নিজে ডাক্তারখানায় যায়নি নিশ্চয়। কিন্তু অন্য কেউ যেতে পারে, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তার মোসাহেবরা—'

চা আসিল। ব্যোমকেশ পেয়ালায় একটি ক্ষুদ্র চুমুক দিয়া সিগারেট ধরাইল, কতকটা মানসিক জল্পনার সুরে বলিল, 'কিন্তু দেবনারায়ণ যদি খুড়োর গঙ্গাযাত্রা না করিয়ে থাকে, তাহলে আর কে করতে পারে? কার লাভ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আর কারুর লাভ আছে বলে তো মনে হয় না। তবে ওই ব্যাটা ঘোড়া জগন্নাথের অসাধ্য কাজ নেই। বাঙালী ডাক্তারদের অপদস্থ করবার-জন্যে ওরা সব পারে।'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'ঘোড়া জগন্নাথের ওপর আপনি ভীষণ চটে গেছেন। ও'রা সব ছুঁচো-প্যাঁচা, খুন করার সাহস ওদের নেই। যে খুন করেছে তার চরিত্র অন্য রকম; সে মহা দুঃসাহসী অথচ কূটবুদ্ধি, শিক্ষিত অথচ নৃশংস; বিজ্ঞান জানে, ডাক্তারি বিদ্যেও আছে-'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'ঘোড়া জগন্নাথের সঙ্গে আপনার বর্ণনা খাসা মিলে যাচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঘোড়া জগন্নাথের মোটিভ খুব জোরালো নয়। অবশ্য তার যদি অন্য কোনও মোটিভ থাকে তাহলে আলাদা কথা। আচ্ছা, একটা কথা জিগ্যেস করি কিছু মনে করবেন না। শকুন্তলা দেবী সুন্দরী এবং আধুনিকা, পাটনা শহরে তাঁর অনুরাগী এডমায়ারার নিশ্চয় আছে?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'তা আছে। শুনেছি রোজ সন্ধ্যেবেলা দু'চারজন পয়সাওয়ালা আধুনিক ছোকরা দীপনারায়ণের বাড়িতে আড্ডা জমাত। ব্রিজ খেলা, চা-কেক খাওয়া, হাসি গল্প গান—এই সব চলত। ঘোড়া জগন্নাথ বড়-মানুষের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে, সেও ওদের দলে থাকত। তবে মাস ছয়েক আগে দীপনারায়ণ যখন অসুখে পড়লেন তখন ওদের আড্ডা ভেঙে গেল। দু'এক জন মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নিতে যেত। নর্মদাশঙ্কর

'নর্মদাশঙ্কর কে?'

'বড়মানুষের অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে। এলাহাবাদের লোক। বিহারে জমিদারী আছে। শুধু অকালকুষ্মাণ্ড নয়—পাজি। পুলিশের খাতায় নাম আছে। একবার শিকার করতে গিয়ে একটা দেহাতি মেয়েকে নিয়ে লোপাট হয়েছিল। ব্যাপার খুব ঘোরালো হয়ে উঠেছিল, তারপর মেয়ের বাপকে টাকাকড়ি দিয়ে মোকদ্দমা ফাঁসিয়ে দিলে-'

'নর্মদাশঙ্কর দীপনারায়ণ সিংএর বাড়িতে যাতায়াত করত?'

'হ্যাঁ, নর্মদাশঙ্কর বাইরে খুব চোস্ত কেতা-দুরস্ত লোক, চেহারা ভাল, মিষ্টি কথা। কিন্তু আসলে পাজির পাঝাড়া।'--পাণ্ডেজি মুখের অরুচি-সূচক একটা ভঙ্গী করিলেন- 'স্ত্রী-স্বাধীনতা খুবই বাঞ্ছনীয় বস্তু, অসুবিধা এই যে ভদ্রবেশী লুচ্চাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় না।'

'হুঁ। শকুন্তলা দেবী কি এদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা করতেন?'

'তা করতেন। কিন্তু তাঁর সত্যিকার বদনাম কখনও শুনিনি। যারা অত উঁচুতে নাগাল পেত না তারা নিজেদের মধ্যে হাসি-মস্করা করত, টিটকিরি

দিত—এই পর্যন্ত।'

'ওটা আমাদের স্বভাব—দ্রাক্ষাফল অতি বিস্বাদ ও অম্লরসে পরিপূর্ণ।' ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—'এখন তাহলে ওঠা যাক। আপনি কি আর ওদিকে যাবেন?'

'বিকেলবেলা যাব। আপনারাও যদি আসেন—।'

'নিশ্চয় যাব। বাড়ির লোকগুলিকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখা দরকার।'

পাঁচ

বৈকালে চারটে বাজিবার পূর্বেই পাণ্ডেজি গাড়ি লইয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'চলুন, একবার থানা হয়ে যাব। হয়তো পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এসেছে।'

তিনজনে থানায় উপস্থিত হইলাম। শহরের মাঝখানে থানা। রতিকান্ত উপস্থিত ছিল, আমাদের সসম্ভ্রমে লইয়া গিয়া নিজের অফিস ঘরে বসাইল বলিল, 'এইমাত্র পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট পেলাম, কিউরারি পাওয়া গেছে। মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।'

পাণ্ডেজি রিপোর্টের উপর একবার চোখ বুলাইয়া বলিলেন, 'আর ওষুধ পরীক্ষার রিপোর্ট?'

'সেটা এখনও আসেনি। আমি জরুরী তাগাদা দিয়ে এসেছি। বোধহয় আজ রাত্রেই পাওয়া যাবে। ওষুধের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত ভালভাবে তদন্ত আরম্ভ করা যাচ্ছে না। তবে লোক লাগিয়েছি, কিউরারি নিয়ে কেউ চোরা কারবার করে কিনা খবর নিতে।'

পাণ্ডেজি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'ঠিক করেছ। যে চোরটার কাছে কিউরারির শিশি পাওয়া গিয়েছিল সে তো এখন জেলেই আছে। তাকে দম দিলে হয়তো খবর পাওয়া যেতে পারে কারা কিউরারির চোরাকারবার করে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। খবর নিয়েছি সে কয়েদীটা এখন পাটনা জেলে নেই, বক্সার জেলে আছে। তার সঙ্গে মুলাকাতের ব্যবস্থা করছি। ইতিমধ্যে ডাক্তার পালিতের কম্পাউন্ডারকে জেরা করেছি।'

'কিছু পেলে?'

'কিছু না।—ওদিকে দীপনারায়ণজির বাড়ির সকলকে বাড়িতেই থাকতে বলেছি। বাইরের লোকের বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি, কেবল ম্যানেজার গঙ্গাধর আর তার ছেলে লীলাধর ছাড়া।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমরা এখন সেখানেই যাচ্ছি। তুমি আসবে নাকি?'

রতিকান্ত একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'আপনারা এগোন, আমি একটা জরুরী কাজ সেরে যাচ্ছি'।' তারপর হাসিয়া ব্যোমকেশকে বলিল—'আপনি কিছু ঠাহর করতে পারলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উঁহু। কিন্তু মনে হচ্ছে বাড়ির কাউকেই সন্দেহ থেকে বাদ দেওয়া যায় না।'

রতিকান্ত বলিল, 'শুধু বাড়ির লোক নয় স্টেটের কর্মচারিদেরও বাদ দেওয়া যায় না। সকলকেই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় ফেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।'

ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে বলিল, 'ডাক্তার পালিতকে আপনার কেমন মনে হয়?'

রতিকান্ত চকিতে ব্যোমকেশের পানে চাহিল, 'ডাক্তার পালিত! কিন্তু তিনি—যদি তাঁর কোনও মোটিভ থাকত, তিনি নিজের হাতে একাজ করতেন কি?'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিল, 'তিনি নিজের হাতে একাজ করেছেন বলেই তার ওপর সন্দেহ কম হবে।—'

মোটরে ফিরিয়া গিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাক্তার পালিতের ডিস্‌পেনসারি কি কাছেই?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'এই তো খানিক দূর, রাস্তাতেই পড়বে। যাবেন নাকি সেখানে?'

'চলুন, আসল অকুস্থলটা দেখে যাওয়া যাক।'

দু'তিন মিনিটের মধ্যে ডাক্তার পালিতের ডাক্তারখানায় পৌঁছিলাম। এটিও বড় রাস্তার উপর, চারিদিকে দোকানপাট, বসতবাড়ি নাই। শীতের রাত্রে আটটার মধ্যে দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়, তখন চোরের তালা ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার কোনই অসুবিধা নাই।

ডাক্তারখানাটি নিতান্তই মামুলী। সামনে পিছনে দুটি ঘর, সামনের ঘরে রুগী আসিয়া বসে, ভিতরের ঘরে ডাক্তার বসেন। কম্পাউন্ডার ভিতরের ঘরেই ঔষধ তৈয়ার করে।

কম্পাউন্ডার ও ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, বাহিরের ঘরে কয়েকটি রুগীও বসিয়াছিল। আমরা গিয়া দেখিলাম, ভিতরের ঘরে ডাক্তার একটি রোগীকে লম্বা সরু টেবিলের উপর শোয়াইয়া তাহার পেট টিপিতেছেন। ঘাড় ফিরাইয়া আমাদের দেখিয়া একটু হাসিলেন, 'কী, অ্যারেস্ট করতে এসেছেন নাকি?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'না না, দেখতে এলাম।'

'বসুন।'

আমরা ডাক্তারের টেবিল ঘেরিয়া বসিলাম। ডাক্তার রোগীর পরীক্ষা শেষ করিয়া টেবিলে আসিয়া বসিলেন, ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া কম্পাউন্ডারকে দিলেন। ইতিমধ্যে আমরা কম্পাউন্ডারটিকে দেখিলাম। রোগা গাল-বসা বিহারী ছোকরা, নাম যদিও খুবলাল, কিন্তু গায়ের রঙ খুব কালো। ইউনিফর্ম পরা পাণ্ডেজিকে দেখিয়া তাহার মুখের কৃষ্ণতা আরও গাঢ় হইয়াছে।

ডাক্তার বলিলেন, 'কি দেখবেন বলুন।'

পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের দিকে চাহিলেন, ব্যোমকেশ বলিল, 'যে তালা ভেঙে চোর ঢুকেছিল সেটা কোথায়?'

ডাক্তার বলিলেন, 'খুবলাল, তালা নিয়ে এস।'

খুবলাল ঘরের একপ্রান্তে শিশি-বোতল-ভরা শেলফের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঔষধ তৈয়ার করিতেছিল, আমরা তাহার পশ্চাদভাগ দেখিতে পাইতেছিলাম। কিন্তু মুখ দেখিতে না পাইলেও সে যে উৎকর্ণ হইয়া আমাদের কথা শুনিতেছে তাহা তাহার দেহের ভঙ্গী হইতে ধরা যাইতেছিল। ডাক্তারের আদেশে সে আসিয়া কম্পিত-হস্তে তালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া আবার ফিরিয়া গিয়া ঔষধ তৈয়ার করিতে লাগিল।

তালাটা সস্তা এবং মামুলী, তাহাতে একটা লোহার শিক ঢুকাইয়া মোচড় দিলে তৎক্ষণাৎ ভাঙিয়া যাইবে, বেশি গায়ের জোরেরও দরকার নাই। হইয়াছেও

তাই, তালার কব্জাটা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ তালা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, তারপর রাখিয়া দিল।

'আপনার দেরাজের চাবিও তো ভেঙেছে।'

'দেরাজ ভাঙবার দরকার হয়নি, ওটা খোলাই থাকে। চাবি অনেকদিন হারিয়ে গেছে।'

পালিত দেরাজ খুলিয়া দেখাইলেন, তাহাতে দুই চারিটা কাগজপত্র ছাড়া কিছুই নাই। পালিত বলিলেন, 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। সাবধান হয়েছি, আজ থেকে একজন লোক রাত্তিরে এখানে শোবে। পুরনো ওষুধগুলো সব ফেলে দিয়ে নতুন ওষুধ আনিয়েছি। বলা তো যায় না।'

পাণ্ডেজি অনুমোদনসূচক ঘাড় নাড়িলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার খুবলালকে দু' একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

ডাক্তার বলিলেন, 'করুন না। ওর অবশ্য একবার হয়ে গেছে, ইন্সপেক্টর চৌধুরী এক দফা জেরা করেছেন। খুবলাল!'

খুবলাল নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। অধর লেহন করিয়া ভাঙা গলায় বলিল, 'হুজুর, আমার কোনও কসুর নেই।'

ব্যোমকেশ আশ্বাসের সুরে বলিল, 'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? যদি দোষ না করে থাকো ভয় কিসের? কেউ তোমার অনিষ্ট করবে না।'

খুবলাল বলিল, 'জি, আমি গরীব মানুষ—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি কত টাকা মাইনে পাও?'

খুবলাল ডাক্তারের দিকে চোরা চাহনি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'জি, ষাট টাকা। আর দশ টাকা ভাতা।'

'উপরি কিছু নেই?'

খুবলাল সভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিল, 'জি—না।'

'তোমার বাড়িতে কে কে আছে?'

'স্ত্রী আর একটা বাচ্ছা।'

'কত টাকা বাড়িভাড়া দাও?'

'সাড়ে বারো টাকা।'

'সত্তর টাকায় তোমার চলে?'

খুবলাল আবার ডাক্তারের পানে গুপ্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,—'পেট চলে যায় হুজুর। ডাক্তারবাবু বলেছেন জানুআরি মাস থেকে পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দেবেন।'

ব্যোমকেশ ডাক্তারের পানে চাহিল, ডাক্তার ঘাড় নাড়িলেন। ব্যোমকেশ তখন বলিল, 'আচ্ছা, ও কথা থাক। কাল রাত্রে ক'টার সময় তুমি ডাক্তারখানা বন্ধ করেছিলে?'

'জি, ঘড়ি দেখিনি। ডাক্তারবাবু রুগী দেখে ফিরে এলেন, ব্যাগ রেখে তখনি বেরিয়ে গেলেন। তখন বোধহয় সাতটা। তার পাঁচ-দশ মিনিট পরে আমিও ডাক্তারখানা বন্ধ করে বাড়ি গেলাম।'

'তখন এখানে কোনও রুগী ছিল?'

'না হুজুর!'

'আচ্ছা, কাল রাত্রে দেরাজে কত টাকা পয়সা ছিল তুমি জানো?'

খুবলালের মুখে আবার আশঙ্কার ছায়া পড়িল। সে বলিল, 'গুনিনি হুজুর,

বোধহয় তিন টাকা কয়েক আনা ছিল। ডাক্তারবাবুর অনুপস্থিতিতে কয়েকটা পুরনো প্রেস্‌ক্রপশন নিয়ে রুগী এসেছিল, তাদের ওষুধ দিয়েছিলাম আর পয়সা নিয়ে দেরাজে রেখেছিলাম।'

'দোর বেশ ভাল করে বন্ধ করেছিলে?'

'জি, হাঁ।'

'রাত্রে চাবি তোমার কাছে থাকে?'

'জি, হাঁ। সকালে আমি আগে এসে ডাক্তারখানা খুলি।'

'তুমি ডাক্তার জগন্নাথ প্রসাদকে চেনো?'

খুবলাল থতমত খাইয়া গেল, শেষে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, 'জি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, 'জগন্নাথের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা আছে?'

খুবলাল ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'জি, না। আমি গরীব মানুষ, তিনি ডাক্তার। তবে—তবে—'

'তবে কি?'

'তিনি কিছুদিন আগে আমাকে তাঁর বাসায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন—'

'তারপর?'

'তিনি—তিনি আমাকে এখানকার চাকরি ছেড়ে দিতে বললেন।'

ডাক্তার বিস্মিতভাবে বলিলেন, 'এটা তো নতুন শুনছি। তুমি আমাকে বলনি কেন?'

খুবলাল অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা তুমি চাকরি ছাড়লে না কেন? জগন্নাথ ডাক্তার তোমাকে অন্য চাকরি দিত।'

খুবলাল বলিল, 'তিনি আমাকে অন্য চাকরি দেবেন বলেন নি, খালি এ চাকরি ছেড়ে দেবার কথা বলেছিলেন। আমি রাজী হলাম না, তখন আমাকে ধমক-চমক করলেন, বললেন- চাকরি না ছাড়লে বিপদে পড়বে।'

'তবু তুমি চাকরি ছাড়লে না?'

খুবলাল ছলছল চক্ষে অবরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'হুজুর, ডাক্তার পালিত আমার মা-বাপ, উনি যতদিন আমায় রাখবেন ততদিন আমি ওঁকে ছাড়ব না। ওঁর মত দয়ালু লোক—' খুবলাল চোখ মুছিতে লাগিল। ব্যোমকেশ সদয় কণ্ঠে বলিল, 'আচ্ছা, এবার তুমি যাও, কাজ কর গিয়ে।'

আমরা উঠিলাম। ডাক্তার পালিত আমাদের সঙ্গে মোটর পর্যন্ত আসিলেন, বলিতে বলিতে আসিলেন, 'খুবলাল ছেলেটা ভাল। তবে মাঝে মাঝে দু'চার পয়সা চুরি করে, দুটো ভিটামিনের বড়ি কি দু' পুরিয়া কুইনিন পকেটে পুরে বাড়ি নিয়ে যায়; ওটা ধর্তব্য নয়, সব কম্পাউন্ডারই করে। এ সব গুরুতর ব্যাপারে ও আছে বলে মনে হয় না।'

ব্যোমকেশ গাড়িতে বসিয়া হঠাৎ গলা বাড়াইয়া বলিল, 'ডাক্তারবাবু, শকুন্তলা দেবী ক'মাস অন্তঃসত্ত্বা?'

ডাক্তার পালিত পূর্ণদৃষ্টিতে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'তিন মাস।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি খুবই আশ্চর্য হয়েছেন।'

'আশ্চর্য হবারই কথা'।—বলিয়া তিনি ফিরিয়া চলিলেন।

ছয়

ডাক্তারখানা হইতে দীপনারায়ণ সিংএর বাড়ি মোটরে পাঁচ মিনিটের রাস্তা: এই পাঁচ মিনিট আমাদের মধ্যে একটিও কথা হইল না। সকলেই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিলাম।

ফটকের বাহিরে গাড়ি থামাইয়া অবতরণ করিলাম। দেউড়িতে টুলের উপর একটা কনেস্টবল বসিয়া ছিল, তড়াক করিয়া উঠিয়া পাণ্ডেজিকে স্যালুট করিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন, কম্পাউণ্ডের বাইরেটা ঘুরে দেখা যাক।'

পূর্বে বলিয়াছি বাড়ির চারিদিকে জেলখানার মত উঁচু পাঁচিল। আমরা পাঁচিলের ধার ঘেঁষিয়া একবার প্রদক্ষিণ করিলাম। সামনের দিকে সদর রাস্তা, দুই পাশে ও পিছনে আম-কাঁঠালের বাগান। এই অঞ্চলে আম-কাঁঠালের বাগানই বেশি এবং সব বাগানই দীপনারায়ণের সম্পত্তি। পূর্বকালে এদিকে বোধহয় লোক-বসতি ছিল, কিন্তু দীপনারায়ণের পূর্বপুরুষেরা সমস্ত পাড়াটা ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিয়া ফলের বাগানে পরিণত করিয়াছেন। পাড়ায় এখন একমাত্র বাড়ি দীপনারায়ণের বাড়ি। তবু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সুখ-সুবিধার ত্রুটি নাই: ইলেকট্রিক ও টেলিফোনের তার পাঁচিল ডিঙাইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে। এমন কি একটি ডাক-বাক্স লাল কুর্তা-পরা সিপাহীর মত পাঁচিলের এক কোণে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। চিঠিপত্র ডাকে দিতে হইলে বেশি দূরে যাইতে হইবে না।

প্রাচীর প্রদক্ষিণ করিয়া ব্যোমকেশ কী দেখিল জানি না: দ্রষ্টব্য বস্তু কিছুই নাই। পাশে ও পিছনে আম-কাঁঠালের গাছ দেয়াল পর্যন্ত ভিড় করিয়া আসিয়াছে, দেয়াল ঘেঁষিয়া মাঠের উপর একটি পায়ে-হাঁটা সরু রাস্তা। ডাক-বাক্সের দিক হইতে পাশের দিকে যাইলে একটি খিড়কি দরজা পড়ে, বোধকরি চাকর-বাকরদের যাতায়াতের পথ। এটি ছাড়া পাশের বা পিছনের দেয়ালে যাতায়াতের অন্য পথ নাই।

খিড়কি দরজা খোলা ছিল, আমরা সেই পথেই ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশ প্রবেশ করিবার সময় দরজাটিকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। সেকেলে ধরনের খর্বকায় মজবুত কবাট, কবাটের পুরু তক্তার উপর মোটা মোটা পেরেক দিয়া গুল বসানো; কিন্তু তা সত্ত্বেও কবাট দুটি নড়বড়ে হইয়া গিয়াছে। কবাটের মাথার কাছে শিকল ঝুলিতেছে, বোধহয় রাত্রিকালে শিকল লাগাইয়া দ্বার বন্ধ করা হয়।

খিড়কি দরজা সম্বন্ধে ব্যোমকেশের অনুসন্ধিৎসা একটু আশ্চর্য মনে হইল: তাহার মন কোন পথে চলিয়াছে ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। যাহোক, ভিতরে প্রবেশ করিয়া পাশেই পাঁচিলের লাগাও একসারি ঘর চোখে পড়িল। ঘরগুলি দপ্তরখানা, জমিদারীর কেরানীরা এখানে বসিয়া সেরেস্তার কাজকর্ম করে। আমাদের দেখিতে পাইয়া একটি লোক সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। লোকটিকে কাল রাত্রে দেখিয়াছি, মাথায় পাগড়ি-বাঁধা ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী।

তিনি ত্বরিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, খিড়কি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আলাপ হইল। পাণ্ডেজি বলিলেন, 'জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখছি।'

ম্যানেজারের অভিজ্ঞ চোখে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিলেও তিনি মুখে বলিলেন, 'বেশ তো, বেশ তো, আসুন না আমি দেখাচ্ছি।'

ব্যোমকেশ খিড়কি দরজার দিকে আঙুল দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, এ দরজাটা কি সব সময়েই খোলা থাকে?'

ম্যানেজার একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, ঘাড় চুলকাইয়া বলিলেন, 'এ'—ঠিক বলতে পারছি না, বোধহয় রাত্রে বন্ধ থাকে। কেন বলুন দেখি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'নিছক কৌতূহল।'

এই সময় একজন ভৃত্যকে বাড়ির পিছন দিকে দেখা গেল। ম্যানেজার হাত তুলিয়া তাহাকে ডাকিলেন। ভৃত্য আসিলে বলিলেন, 'বিষ্ণু, রাত্রে খিড়কি দরজা বন্ধ থাকে?'

বিষ্ণুও ঘাড় চুলকাইল, 'তা তো ঠিক জানি না হুজুর। বোধ হয় শিকল তোলা থাকে। চৌকিদার বলতে পারবে।'

'ডাক চৌকিদারকে।' বিষ্ণু চৌকিদারকে ডাকিতে গেল।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'রাত্রে চৌকিদার বাড়ি পাহারা দেয়?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। দেউড়িতে দরোয়ান থাকে, আর দু'জন চৌকিদার পালা করে পাহারা দেয়।'

অল্পক্ষণ মধ্যে বিষ্ণু একটি চৌকিদারকে আনিয়া উপস্থিত করিল। চৌকিদার দেখিতে তালপাতার সেপাই, কিন্তু বিপুল গোঁফ ও গালপাট্টার দ্বারা কঙ্কালসার মুখে চৌকিদার সুলভ ভীষণতা আরোপ করিবার চেষ্টা আছে, চোখ দুটি রাত্রি-জাগরণ কিম্বা গঞ্জিকার প্রসাদে করমচার মত লাল। ম্যানেজার তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'গজাধর সিং, রাত্রে খিড়কির দরজা খোলা থাকে না বন্ধ থাকে?'

গজাধর ভাঙা গলায় বলিল, 'ধর্মাবতার, কখনও খোলা থাকে, কখনও জিঞ্জির লাগানো থাকে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তালা লাগানো থাকে না?'

গজাধর বলিল, 'না হুজুর, অনেক দিন আগে তালা ছিল, এখন ভুৎলা গিয়া। কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই, আমরা দু'ভাই এমন পাহারা দিই যে, একটা চুহা পর্যন্ত হাতায় ঢুকতে পারে না।'

'বটে! কি ভাবে পাহারা দাও?'

'রাত্রি দশটা থেকে পাহারা শুরু হয় হুজুর। দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত একজন পাহারা দিই, আর দুটো থেকে ছ'টা পর্যন্ত আর একজন। দেউড়িতে ঘণ্টা বাজে আর আমরা উঠে একবার চক্কর দিই, আবার ঘণ্টা বাজে আবার চক্কর দিই। এইভাবে সারা রাত চক্কর লাগাই ধর্মাবতার।'

'তাহলে ঘণ্টা বাজার মাঝখানে কেউ যদি ভিতর থেকে বাইরে যায় কিম্বা বাইরে থেকে ভিতরে আসে তোমরা জানতে পার না?'

'বাইরে থেকে কে আসবে হুজুর, কার ঘাড়ে দশটা মাথা?'

'বুঝেছি। তুমি এখন যেতে পার।'

গজাধর প্রস্থান করিলে ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী সাফাইয়ের সুরে বলিলেন, 'এ বাড়িতে খুব কড়া পাহারার দরকার হয় না; চোর-ছ্যাঁচড়েরা জানে এখানে দারোয়ান চৌকিদার আছে, ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। তাই তারা এদিকে আসে না। আমি আঠারো বছর এই এস্টেটে আছি, কখনো একটা কুটো চুরি যায়নি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি চুরির কথা ভাবছিলাম না। যাহোক, আসুন এবার ওদিকটা দেখা যাক।'

অতঃপর গঙ্গাধর বংশী আমাদের লইয়া চারিদিক ঘুরিয়া দেখাইলেন। দেখানোর ফাঁকে ফাঁকে মৃত প্রভুর উদ্দেশে শোক প্রকাশ করিলেন; প্রশ্ন না করিয়া মৃত্যুর কারণ জানিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহার কৌতূহলের প্রশ্রয় দিলাম না, গভীর মনঃসংযোগে সরেজমিনে তদারক করিলাম।

বাড়ির সামনের দিকে ফুলের বাগান, পিছনে শাকসব্জীর ক্ষেত। বাড়িটি দ্বিতল এবং চক্-মেলানো, প্রায় সাত-আট কাঠা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাড়ির দুই পাশে দ্বিতলে উঠিবার দুইটি লোহার পাকানো সিঁড়ি আছে। এই পথে মেথর ঝাড়ুদার উপর তলা পরিষ্কার রাখে, কারণ পাটনায় এখনও ড্রেনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

পরিদর্শন শেষ করিয়া সদরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম ইতিমধ্যে ইন্সপেক্টর রতিকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ব্যোমকেশের পানে একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, 'বাগানে কী দেখছিলেন? কিছু পেলেন নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিশেষ কিছু না। কেবল এইটুকু জানা গেল যে রাত্তিরে বাড়ির যে-কেউ খিড়কির দরজা খুলে বাইরের লোককে ভিতরে আনতে পারে।'

রতিকান্ত কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, 'কিন্তু- বর্তমান ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক আছে কি?'

'থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। চলুন, এবার বাড়ির লোকগুলির সঙ্গে আলাপ করা যাক--'

বাড়িতে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছি, ফট্‌ফট্ শব্দে ঘাড় ফিরাইয়া দেখি ফটকের দিক হইতে একটি মোটর বাইক আসিতেছে। আরূঢ় ব্যক্তিটি অপরিচিত: চেহারাটা সুশ্রী, বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। পরিধানে সাদা ফ্ল্যানেলের প্যান্ট, গাঢ় নীল রঙের গরম ক্রিকেট কোট, গলায় লাল পশমের মাফলার, মাথায় রঙচটা ক্রিকেট ক্যাপ। পুরাদস্তুর খেলোয়াড়ের সাজ, দেখিলে মনে হয় এইমাত্র ক্রিকেটের মাঠ হইতে ফিরিতেছেন।

ঝকঝকে নূতন 'সান-বীম্' আমাদের কাছে আসিয়া থামিল, আরোহী আস্তে-ব্যস্তে অবতরণ করিলেন। পাণ্ডেজি ও রতিকান্তের ললাটে গভীর ভ্রূকুটি দেখিয়া অনুমান করিলাম, ইনি যতবড় খেলোয়াড়ই হোন, পুলিশের প্রীতিভাজন নন। পরক্ষণেই পাণ্ডেজির সম্ভাষণ শুনিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না যে এই ব্যক্তিই কুখ্যাত নারীহরণকারী নর্মদাশংকর।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'নর্মদাশংকরবাবু, আপনার এখানে কী দরকার?'

নর্মদাশংকর সবিনয়ে নমস্কার করিয়া বলিল, 'ক্রিকেটের মাঠে খবর পেলাম দীপনারায়ণবাবু হঠাৎ মারা গেছেন। শুনলাম নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। শুনে আর থাকতে পারলাম না। ছুটে এলাম। কী হয়েছিল মিঃ পাণ্ডে?'

পাণ্ডেজি নীরস কণ্ঠে বলিলেন, 'মাফ করবেন, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কোন আলোচনা হতে পারে না। কিন্তু আপনার কি দরকার তা তো বললেন না?'

নর্মদাশংকর মুখখানিকে বিষণ্ণ করিয়া বলিল, 'দরকার আর কি, বন্ধুর বিপদে আপদে খোঁজ-খবর নিতে হয়। শকুন্তলা যে কী দারুণ শোক পেয়েছেন তা তো বুঝতেই পারছি। কাল রাত্রে তাঁকে দেখেছিলাম আনন্দের প্রতিমূর্তি! তখন কে ভেবেছিল যে—তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হবে কি?'

'দেখা করতে চান কেন?'

'তাঁকে সহানুভূতি জানানো, দুটো সান্ত্বনার কথা বলা, এছাড়া আর কি? আপনারা নিশ্চয় জানেন শকুন্তলার সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে।' শকুন্তলার নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে নর্মদাশঙ্করের চোখে যে ঝিলিক খেলিয়া যাইতে লাগিল তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না।

পাণ্ডেজি চাপা বিরক্তির স্বরে বলিলেন, 'মাফ করবেন, শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে কারুর দেখা সাক্ষাৎ হবে না, এখন ওসব লৌকিকতার সময় নয়।—রতিকান্ত, ফটকের কনেস্টবলকে বলে দাও, আমাদের অনুমতি না নিয়ে যেন কাউকে ভেতরে আসতে না দেয়।'

পাণ্ডেজির ইঙ্গিতটা এতই স্পষ্ট যে নর্মদাশঙ্করের চোখে আর এক ধরনের ঝিলিক খেলিয়া গেল, কুটিল ক্রোধের ঝিলিক। কিন্তু সে বিনীত ভাবেই বলিল, 'বেশ, আপনারাই তাহলে শকুন্তলাকে আমার সমবেদনা জানিয়ে দেবেন। আচ্ছা, আজ চলি। নমস্তে।'

নর্মদাশঙ্করের মোটর বাইক ফট্‌ফট্‌ করিয়া চলিয়া গেল। রতিকান্ত তাহার বিলীয়মান পৃষ্ঠের দিকে বিরাগপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া গলার মধ্যে বলিল, 'মিটমিটে শয়তান!' তারপর ফটকের কনেস্টবলকে হুকুম দিতে গেল।

ব্যোমকেশ ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাল রাত্রে নর্মদাশঙ্করবাবু কখন নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলেন আপনি লক্ষ্য করেছিলেন কি?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'উনি কখন এসেছিলেন তা ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু আমি সাড়ে ছটার সময় এসে দেখলাম, উনি শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে বসে গল্প করছেন। তখনও অন্য কোনও অতিথি আসেন নি।'

'মাফ করবেন, আপনি কোথায় থাকেন?'

ম্যানেজার সম্মুখে রাস্তার ওপারে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন, 'ওই আম-বাগানের মধ্যে একটা বাড়ি আছে, এস্টেটের বাড়ি, আমি তাতেই থাকি।'

'আশেপাশের আম-বাগানে আরও বাড়ি আছে নাকি?'

'আজ্ঞে না। এ তল্লাটে আর বাড়ি নেই।'

'আচ্ছা, আজ সকালে মৃত্যুর পূর্বে দীপনারায়ণবাবুকে আপনি দেখেছিলেন কি?'

ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী ক্ষুব্ধ ভাবে মাথা নাড়িলেন,—'আজ্ঞে না, ডাক্তারবাবু আমার আগেই এসেছিলেন। রবিবারে সেরেস্তা বন্ধ থাকে, আমি একটু দেরি করে আসি। এসে দেখি সব শেষ হয়ে গেছে।'

সাত

রতিকান্ত ফিরিয়া আসিলে আমরা সকলে মিলিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। হল-ঘরের মধ্যে ছায়ান্ধকার, মানুষ কেহ নাই। আমরা পাঁচজনে প্রবেশ করিয়া পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ম্যানেজারবাবু, আপনাকে আমরা অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। আপনার নিশ্চয় অন্য কাজ আছে—'

ম্যানেজার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আমার আজ কোনই কাজ নেই। আজ

রবিবার, সেরেস্তা বন্ধ। নেহাৎ অভ্যাসবশেই এসেছিলাম।'

বোঝা গেল তিনি আমাদের সঙ্গ ছাড়িবেন না। তিনি গভীর মনঃসংযোগে আমাদের কথা শুনিতেছেন এবং তাহার তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু দুটি মধুসঞ্চয়ী ভ্রমরের মত আমাদের মুখের উপর পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু তিনি নিজে বাক্যব্যয় করিতেছেন না। গভীর জলের মাছ।

পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের পানে একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'ভাল কথা বংশীজি, আপনার সেরেস্তায় টাকাকড়ির হিসেব সব ঠিক আছে তো? হয়তো আমাদের পরীক্ষা করে দেখবার দরকার হতে পারে।'

বংশীজি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'সব হিসেব ঠিক আছে, আপনারা যখন ইচ্ছে দেখতে পারেন।' তারপর একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, 'কেবল একটা হিসেবের চুক্তি হয়নি—'

'কোন্ হিসেব?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আট-দশদিন আগে দীপনারায়ণজি আমাকে ডেকে হুকুম দিয়েছিলেন ডাক্তার পালিতকে বারো হাজার টাকা দিতে। টাকাটা ডাক্তারবাবুকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু রসিদ নেওয়া হয়নি।'

'রসিদ নেওয়া হয়নি কেন?'

'ডাক্তারবাবু টাকাটা ধার হিসেবেই চেয়েছিলেন, কিন্তু দীপনারায়ণজি ঠিক করেছিলেন টাকাটা ডাক্তারবাবুকে পুরস্কার দেবেন, তাই রসিদ নিতে মানা করে-ছিলেন।'

'ও' ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নীরব রহিল, তারপর রতিকান্তকে বলিল, 'এবার তাহলে বাড়ির সকলকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক। তাঁরা কোথায়?'

রতিকান্ত বলিল, 'তাঁরা সবাই উপর তলায়। শোবার ঘর সব ওপরে। আপনারা বসুন, আমি একে একে ওঁদের ডেকে নিয়ে আসি। কাকে আগে ডাকব- শকুন্তলা দেবীকে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শকুন্তলা দেবীকে কষ্ট দেবার দরকার নেই, আমরাই ওপরে যাচ্ছি। দু'চারটে মামুলী কথা জিজ্ঞাসা করা বৈ তো নয়। দেবনারায়ণবাবুও বোধহয় ওপরে আছেন?'

'হ্যাঁ। চাঁদনী দেবীও আছেন।'

'তবে চলুন।' পাশের একটি ছোট ঘর হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম।

সিঁড়ির উপরে একটি ঘর, তাহার দুইদিকে দুইটি দরজা। উপর তলাটি দুই ভাগে বিভক্ত। আমরা উপরে উঠিলে রতিকান্ত বলিল, 'কোন্ দিকে যাবেন? এদিকটা দেবনারায়ণবাবুর মহল, ওদিকটা দীপনারায়ণবাবুর।'

ব্যোমকেশ কোনদিকে যাইবে ইতস্তত করিতেছে এমন সময় দেবনারায়ণের দিকের দ্বার দিয়া চাঁদনী বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতে এক বাটি দুধ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেখিয়া সে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া পড়িল, স্বভাববশতঃ মাথার কাপড় টানিতে গেল, তারপর বাড়ির সাম্প্রতিক কায়দা স্মরণ করিয়া থামিয়া গেল। আমাদের মধ্যে ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া জড়িতস্বরে বলিল, 'চাচাজি আজ

সারাদিন এক ফোঁটা জল মুখে দেননি...তাই যাচ্ছি আর একবার চেষ্টা করতে যদি একটু দুধ খাওয়াতে পারি। চাচাজি তো গেছেন, উনিও যদি না খেয়ে প্রাণটা দেন, কি হবে বলুন দেখি?' বলিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমরা থতমত খাইয়া গেলাম। এই একান্ত ঘরোয়া সেবার মূর্তিটিকে দেখিবার জন্য কেহই যেন প্রস্তুত ছিলাম না। গঙ্গাধর বংশী বিচলিতভাবে গলা ঝাড়া দিয়া বলিলেন, 'যাও বেটি, ওঁকে আগে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা কর। কিছু না খেলে কি করে চলবে।'

চাঁদনী দুধ লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন, দেবনারায়ণবাবুর কাছেই আগে যাওয়া যাক।'

আমরা দেবনারায়ণের মহলে প্রবেশ করিলাম, ম্যানেজার আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন।

ঘরের পর ঘর, সবগুলিই দেশী বিদেশী আসবাবে ঠাসা; কিন্তু কিছুরই তেমন ছিরি ছাঁদ নাই, সবই এলোমেলো বিশৃঙ্খল। অবশেষে বাড়ির শেষ প্রান্তে একটি পর্দা-ঢাকা দরজার সম্মুখীন হইলাম।

ঘরের ভিতর কে আছে তখনও দেখি নাই, আমাদের সমবেত পদশব্দে আকৃষ্ট হইয়া একটি লোক পর্দা সরাইয়া উঁকি মারিল, তারপর চকিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি বেশ বড়, তিনদিকে জানালা। মেঝের অর্ধেক জুড়িয়া পুরু গদীর উপর ফরাস পাতা, তাহার উপর কয়েকটা মোটা মোটা তাকিয়া। দেবনারায়ণ মাঝখানে তাকিয়া পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছে, তাহার পাশে একটু পিছনে কোঁকড়া-চুল কোঁকড়া-গোঁফ বিদূষক বেণীপ্রসাদ। আমাদের দেখিয়া বেণীপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ম্যানেজার দেবনারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'এঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' দেবনারায়ণ কোনও কথা না বলিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্যাঙের মত চাহিয়া রহিল।

ম্যানেজার আমাদের বসিতে বলিলেন। আমি ও ব্যোমকেশ বিছানার পাশে বসিলাম, আর সকলে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, 'ঘরে আর একজন ছিলেন যিনি পর্দা ফাঁক করে উঁকি মেরেছিলেন—তিনি কোথায় গেলেন?'

বেণীপ্রসাদ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, 'তিনি—মানে লীলাধর'—ম্যানেজারের দিকে একটি ক্ষিপ্ত চকিত চাহনি হানিয়া সে কথা শেষ করিল—'সে পাশের ঘরে গেছে।'

ব্যোমকেশ ভাল মানুষের মত জিজ্ঞাসা করিল, 'পাশের ঘরে কী আছে?

বেণীপ্রসাদ বলিল, 'মানে—গোসলখানা!'

ব্যোমকেশ ফিক্ করিয়া হাসিল, 'বুঝেছি। গোসলখানার লাগাও পাকানো লোহার সিঁড়ি আছে, লীলাধরবাবু সেই দিক দিয়ে বাড়ি গেছেন। কেমন?'

বেণীপ্রসাদ উত্তর দিল না, নিতম্ব চুলকাইতে চুলকাইতে ম্যানেজারের দিকে আড় চোখে চাহিতে লাগিল।

লীলাধর যে ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশীর পুত্র এবং দেবনারায়ণের সহকারী বিদূষক তাহা আমরা কাল রাত্রে জানিতে পারিয়াছিলাম। দেখিলাম, গঙ্গাধর বংশীর মুখ কালো হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি উদ্গত হৃদয়াবেগ যথাসাধ্য

সংযত করিয়া বেণীপ্রসাদকে প্রশ্ন করিলেন, 'তোমরা এখানে কি করছ?'

নিতম্ব ছাড়িয়া বেণীপ্রসাদ এক হাত তুলিয়া বগল চুল্‌কাইতে আরম্ভ করিল, বলিল, 'আজ্ঞে- ছোট-মালিকের মন খারাপ হয়েছে তাই আমরা ওঁকে একটু--'

মন খারাপের উল্লেখে দেবনারায়ণের বোধহয় খুড়ার মৃত্যুর কথা মনে পড়িয়া গেল, সে হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আকাশ-পাতাল হাঁ করিয়া হাতীর মত লোকটা কাঁদিতে লাগিল।

কাল দেবনারায়ণের হাসি শুনিয়াছিলাম, আজ কান্না শুনিলাম। আওয়াজ প্রায় একই রকম, যেন এক পাল শেয়াল ডাকিতেছে।

পাঁচ মিনিট চলিবার পর হঠাৎ কান্না আপনিই থামিয়া গেল। দেবনারায়ণ রুমালে চোখ মুছিয়া পানের ডাবা হইতে এক খাম্‌চা পান মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল। ব্যোমকেশ এতক্ষণ নির্বিকারভাবে দেয়ালে টাঙানো রবি বর্মার ছবি দেখিতেছিল, কান্না থামিলে সহজ স্বরে বলিল, 'দেবনারায়ণবাবু, আপনি মদ খান?'

দেবনারায়ণ বলিল, 'নাঃ। আমি ভাঙ্‌ খাই।'

'তবে তাকিয়ার তলায় ওটা কি?' বলিয়া ব্যোমকেশ অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

বেণীপ্রসাদ ইতিমধ্যে তেরছাভাবে গোসলখানার দ্বারের দিকে যাইতেছিল, এখন সুট করিয়া অন্তর্হিত হইল। আমি নির্দিষ্ট তাকিয়া উল্টাইয়া দেখিলাম, তলায় একটি ছিপি-আঁটা বোতল রহিয়াছে; বোতলের মধ্যে শ্বেতবর্ণ তরলদ্রব্য।

দেবনারায়ণ বোকাটে মুখে বোতলের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, 'ও তো তাড়ি। লীলাধর আর বেণীপ্রসাদ খাচ্ছিল।'

বোতলে তাড়ি! এই প্রথম দেখিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'ও--আপনার মন প্রফুল্ল করবার জন্য ওঁরা তাড়ি খাচ্ছিলেন! তা সে যাক। বলুন তো, আপনি ভাঙ্‌ ছাড়া আর কি কি নেশা করেন?'

দেবনারায়ণ খানিকটা জর্দা মুখে দিয়া বলিল, 'আর কিছু না।'

'কোকেন?'

'বুকনি? নাঃ।'

'গাঁজা?'

'নাঃ। গজাধর গাঁজা খায়।'

'আচ্ছা যেতে দিন।--আপনার বোধ হয় অনেক বন্ধু আছে?'

'বন্ধু-আছে। লাখো লাখো বন্ধু আছে।'

'তাই নাকি? তাদের দু'চারটে নাম করুন তো।'

'নাম? লীলাধর--বেণীপ্রসাদ--গজাধর সিং-'

'কোন্‌ গজাধর সিং?'

'চৌকিদার। খুব ভাল ভাঙ্‌ ঘুঁটতে পারে।'

'আর কে?'

'আর বদ্রিলাল। রোজ আমার পা টিপে দেয়।'

দেবনারায়ণের বন্ধুরা কোন শ্রেণীর লোক তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝলাম। ডাক্তার পালিতের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব নেই?'

দেবনারায়ণের বিপুল-শরীর একবার ঝাঁকানি দিয়া উঠিল; সে বিহ্বলকণ্ঠে

বলিল, 'ডাক্তার পালিত। ওকে আমি রাখব না, তাড়িয়ে দেব। চাচাকে ও খুন করেছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকাইয়া মুদিত চক্ষে বসিয়া রহিল, তারপর চোখ খুলিয়া বলিল, 'আপনার কাকার মৃত্যুর পর আপনি ষোল আনা সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। এখন কি করবেন?'

'কি করব?'—দেবনারায়ণ যেন পূর্বে একথা চিন্তাই করে নাই এমনিভাবে ইতি-উতি তাকাইতে লাগিল। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম, দেবনারায়ণ কি সত্যই এতবড় গবেট?

ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল, বলিল, 'চলুন, এর কাছে আর কিছু জানবার নেই।'

দরজার দিকে ফিরিতেই দেখিলাম, চাঁদনী কখন পর্দার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মুখে উদ্বেগ ও আশঙ্কার ব্যঞ্জনা। আমাদের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িতেই সে চকিতে সরিয়া গেল।

আমরা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। রতিকান্ত পাণ্ডেজিকে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল, 'চাঁদনী দেবীকে সওয়াল করা হবে নাকি?'

পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের দিকে চাহিলেন। ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'পরে দেখা যাবে। এখন চলুন, শকুন্তলা দেবীর মহলে।'

আট

দেবনারায়ণের মহল হইতে শকুন্তলার মহলে যাইবার পথে ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী হঠাৎ আমাদের নিকট বিদায় লইলেন। পুত্র লীলাধর সম্পর্কে তাঁহার মন বোধহয় বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, নহিলে এত সহজে আমাদের ছাড়িয়া যাইতেন না। বলিলেন, 'আমার সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় হ'ল, আমি এবার যাই। আপনারা কাজ করুন।'

তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন। আমরা শকুন্তলা দেবীর মহলে প্রবেশ করিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, রতিকান্ত সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিতে জ্বালিতে আমাদের আগে আগে চলিল।

প্রথমে একটি মাঝারি গোছের ঘর। দেশী প্রথায় চৌকির উপর ফরাসের বিছানা, কয়েকটি গদি-মোড়া নীচু কেদারা, ঘরের কোণে উঁচু টিপাইয়ের মাথায় রূপার পাত্রে ফুল সাজানো। দেয়ালে যামিনী রায়ের আঁকা একটি ছবি। এখানে বাড়ির লোকেরা বসিয়া গল্প-গুজবে সন্ধ্যা কাটাইতে পারে, আবার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব আসিলেও বসানো যায়।

ঘরে কেহ নাই। আমরা এঘর উত্তীর্ণ হইয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিলাম। এটি বেশ বড় ঘর, দুটি পালঙ্ক দু'পাশের দেয়ালে সংলগ্ন হইয়া আছে। একটি বড় ওআর্ডরোব রহিয়াছে, একটি আয়না-দার টেবিলে কয়েকটি ওষুধের শিশি। মনে হয় এটি দীপনারায়ণের শয়নকক্ষ ছিল। বর্তমান শয্যা দুটির উপর সুজনি ঢাকা রহিয়াছে। এ ঘরটিও শূন্য। ব্যোমকেশ মৃদুকণ্ঠে বলিল,—'এটি বোধ হচ্ছে দীপনারায়ণবাবুর শোবার ঘর ছিল। দুটো খাট কেন?'

রতিকান্ত একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—'দীপনারায়ণজির অসুখের যখন

খুব বাড়াবাড়ি যাচ্ছিল তখন একজন নার্স রাত্রে থাকত।'

'ঠিক ঠিক, আমার বোঝা উচিত ছিল।'

• অতঃপর আমরা তৃতীয় কক্ষে প্রবেশ করিলাম এবং চারিদিকে চাহিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলাম। এ ঘরটি আরও বড় এবং নীলাভ নিঅন-লাইট দ্বারা আলোকিত। পিছনের দিকের দেয়ালে সম ব্যবধানে তিনটি জানালা, জানালার ব্যবধানস্থলে সুচিত্রিত মহার্ঘ মিশরী গালিচা ঝুলিতেছে। ঘরের এক পাশে একটি অর্গান এবং তাহার আশে পাশে দেয়ালে টাঙানো নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র। ঘরের অপর পাশে ছবি আঁকার বিবিধ সরঞ্জাম, দেয়ালের গায়ে আঁকা একটি প্রশস্ত তৈলচিত্র। মেঝের উপর পুরু মখমলের আস্তরণ বিছানো, তাহার মাঝখানে গুরু নিতম্বিনী রাজকন্যার মত একটি তানপুরা শুইয়া আছে। বুঝিতে বিলম্ব হয় না কলা-কুশলী শকুন্তলার এটি শিল্পনিকেতন। দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। একই বাড়ির দুই অংশে রুচি-নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য-বোধের কতখানি তফাৎ, চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না।

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রথমেই দেয়ালে আঁকা তৈলচিত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে কোনও দিকে না চাহিয়া ছবির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ছবিটির খাড়াই তিন ফুট, পাশাপাশি পাঁচ ফুট। বিষয়বস্তু নূতন নয়, বল্কলধারিণী শকুন্তলা তরু আলবালে জল-সেচন করিতেছে এবং দুষ্মন্ত পিছনের একটি বৃক্ষকাণ্ডের আড়াল হইতে চুরি করিয়া শকুন্তলাকে দেখিতেছেন। •ছবিখানির অঙ্কন-শৈলী ভাল, শকুন্তলার হাত পা খ্যাংরা কাটির মত নয়, দুষ্মন্তকে দেখিয়াও যাত্রাদলের দুঃশাসন বলিয়া ভ্রম হয় না। চিত্রের বাতাবরণ পুরাতন, কিন্তু মানুষ দুটি সর্বকালের। ছবি দেখিয়া মন তৃপ্ত হয়।

ব্যোমকেশের দিকে চোখ ফিরাইয়া দেখিলাম সে তন্ময় হইয়া ছবি দেখিতেছে। তাহার দেখাদেখি রতিকান্ত ও পাণ্ডেজি আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যোমকেশ তখন তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া উৎসাহ ভরে বলিল, 'চমৎকার ছবি। কে এঁকেছে?'

পাণ্ডেজি রতিকান্তের দিকে চাহিলেন, রতিকান্ত দ্বিধাভরে বলিল, 'বোধহয় শকুন্তলা দেবীর আঁকা। ঠিক বলতে পারি না।'

ব্যোমকেশ আবার ছবির দিকে ফিরিয়া বলিল, 'তাই হবে। একালের শকুন্তলা সেকালের শকুন্তলার ছবি এঁকেছেন। দেখেছ অজিত, তপোবনকন্যা শকুন্তলার মুখে কী শান্ত সরলতা, দুষ্মন্তের চোখে কী মোহাচ্ছন্ন অনুরাগ, সহকার তরুগুলির কী সজীব শ্যামলতা। সব মিলিয়ে সংসার ও আশ্রমের একটি অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে। যদি সম্ভব হ'ত ছবিটি তুলে নিয়ে যেতাম।'

একটু অবাক হইলাম। ব্যোমকেশের মনে শিল্পরস বোধ থাকিতে পারে কিন্তু তাহা কোনও কালেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে দেখি নাই। আমি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার পানে তাকাইয়া আছি দেখিয়া সে সামলাইয়া লইল: ছবির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া ঘরের চারিদিকে চোখ বুলাইল। শকুন্তলা দেবীর বর্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া একটু ব্যথিত স্বরে বলিল, 'এটা দেখছি শকুন্তলা দেবীর গান-বাজনা ছবি-আঁকার ঘর...সাজানো বাগান.. ভুলে থাকার উপকরণ—' একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'চলুন।'

অতঃপর আমরা আরও একটা শূন্যঘর এবং একটা বারান্দা পার হইয়া

শকুন্তলার শয়নকক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দরজা ভেজানো ছিল, রতিকান্ত টোকা দিলে একটি মধ্যবয়স্কা দাসী দ্বার খুলিয়া দিল। রতিকান্ত ঘরের ভিতর গলা বাড়াইয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, 'আমরা পুলিশের পক্ষ থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।'

কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভিতর হইতে অস্ফুট আওয়াজ আসিল,—'আসুন।'

আমরা সসঙ্কোচে ঘরে প্রবেশ করিলাম। রতিকান্ত দাসীকে মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিত করিল, দাসী বাহিরে গেল।

শকুন্তলা দেবীর শয়নকক্ষের বর্ণনা দিব না। অনবদ্য রুচির সহিত অপরিমিত অর্থবল সংযুক্ত হইলে যাহা সৃষ্টি হয় এ ঘরটি তাহাই। শকুন্তলা পালঙ্কের উপর বসিয়া ছিলেন, আমরা প্রবেশ করিলে একটি ক্রীম রঙের কাশ্মীরী শাল গায়ে জড়াইয়া লইলেন। কেবল তাঁহার মুখখানি খোলা রহিল। মোমের মত অচ্ছাভ বর্ণ, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে। চুলগুলি শিথিল ও অবিন্যস্ত। যেন হিম-ক্লিন্ন ঝরা শেফালি।

'বসুন'—শকুন্তলা ক্লান্তি-বিনত চক্ষু দুটি একবার আমাদের পানে তুলিলেন।

ঘরে কয়েকটি চামড়ার গদি-মোড়া নীচু চৌকি ছিল, আমি ও ব্যোমকেশ দুইটি চৌকি খাটের কাছে টানিয়া লইয়া বসিলাম। রতিকান্ত ও পাণ্ডেজি খাটের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ পাণ্ডেজির দিকে দৃষ্টি তুলিয়া নীরবে অনুমতি চাহিল, পাণ্ডেজি একটু ঘাড় নাড়িলেন। ব্যোমকেশ তখন অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে শকুন্তলাকে বলিল, 'আপনাকে এ সময়ে বিরক্ত করতে এসেছি, আমাদের ক্ষমা করবেন। মানুষের জীবনে কখন যে কী দুর্দৈব ঘটবে কেউ জানে না, তাই আগে থাকতে প্রস্তুত থাকবার উপায় নেই। আপনার স্বামীকে আমি একবার মাত্র দেখেছি, কিন্তু তিনি যে কি রকম সজ্জন ছিলেন তা জানতে বাকি নেই। তাঁর মৃত্যুর জন্যে যে দায়ী সে নিষ্কৃতি পাবে না এ আশ্বাস আপনাকে আমরা দিচ্ছি।' শকুন্তলা উত্তর দিলেন না, কাতর চোখ দুটি তুলিয়া নীরবে ব্যোমকেশকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাকে দু'একটা প্রশ্ন করব। নেহাৎ প্রয়োজন বলেই করব, আপনাকে উত্যক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।—কিন্তু আসল প্রশ্ন করার আগে একটা অবান্তর কথা জেনে নিই, ও ঘরের দেয়ালে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার ছবিটি কি আপনার আঁকা?'

শকুন্তলার চোখে চকিত বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল, তিনি কেবল ঘাড় হেলাইয়া জানাইলেন -হাঁ, ছবি তাঁহারই রচনা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চমৎকার ছবি, আপনার সত্যিকার শিল্পপ্রতিভা আছে। কিন্তু ওকথা যাক। দীপনারায়ণবাবু উইল করে গেছেন কিনা আপনি জানেন?'

এবার শকুন্তলা অবুঝের মত চক্ষু তুলিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তারপর স্তিমিত স্বরে বলিলেন, 'এ সব আমি কিছু জানি না। উনি আমার কাছে বিষয় সম্পত্তির কথা কখনও বলতেন না।'

'আপনার নিজস্ব কোনও সম্পত্তি আছে কি?'

'তাও জানি না। তবে—'

'তবে কি—?'

'বিয়ের পর আমার স্বামী আমার নামে পাঁচ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে

দিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি! সে টাকা এখন কোথায়?'

'ব্যাঙ্কেই আছে। আমি কোনও দিন সে টাকায় হাত দিইনি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল।

'তাহলে এই পাঁচ লাখ টাকা আপনার নিজস্ব স্ত্রীধন। তারপর যদি আপনার পুত্রসন্তান জন্মায় তাহলে সে এজমালি সম্পত্তির অর্ধেক ভাগ পাবে।'

শকুন্তলা চোখ তুলিলেন না, নতনেত্রে রহিলেন। মনে হইল তাঁহার মুখখানা আরও পাণ্ডুর রক্তহীন হইয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভাল কথা, আপনি যে সন্তান-সম্ভবা একথা আপনার স্বামী জানতেন?'

নতনয়না শকুন্তলার ঠোঁট দুটি একটু নড়িল, 'জানতেন। কাল রাত্রে তাঁকে বলেছিলাম।'

'কাল রাত্রে! খাওয়া-দাওয়ার আগে না পরে?'

'পরে। উনি তখন শুয়ে পড়েছিলেন।'

'খবর শুনে উনি নিশ্চয় খুব খুশী হয়েছিলেন!'

'খুব খুশী হয়েছিলেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন—'

এই পর্যন্ত বলিয়া শকুন্তলার মুখের ভাব হঠাৎ পরিবর্তিত হইল। এতক্ষণ তিনি ক্লান্ত ম্রিয়মাণভাবে কথা বলিতেছিলেন, এখন ভয়ার্ত বিহ্বলতায় একে একে আমাদের মুখের পানে চাহিলেন, তারপর একটি অবরুদ্ধ কাতরোক্তি করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

আমরা ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেলাম। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, দ্বারেব কাছে চাঁদনী কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন সে ছুটিয়া আসিয়া শকুন্তলার মাথা কোলে লইয়া বসিল, আমাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'আপনারা কি রকম মানুষ, মেরে ফেলতে চান ওঁকে? যান, শীগ্‌গির যান এ ঘর থেকে। শরীরে একটু দয়ামায়া কি নেই আপনাদের? এখুনি মিস মান্নাকে খবর পাঠান।'

আমরা পালাইবার পথ পাইলাম না। নীচে নামিতে নামিতে শুনিতে পাইলাম চাঁদনী উচ্চকণ্ঠে দাসীকে ডাকিতেছে--'সোমরিয়া, কোথায় গেলি তুই—শীগ্‌গির জল আন—'

নীচে নামিয়া পাণ্ডেজি প্রথমেই মিস্ মান্নাকে টেলিফোন করিলেন--'শীগ্‌গির চলে আসুন, আপনি না আসা পর্যন্ত আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।'

তারপর আমরা হল-ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। রাত্রি হইয়া গিয়াছে, ঘড়িতে সাতটা বাজিয়া গেল।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'রতিকান্ত, দেখে এস শকুন্তলা দেবীর জ্ঞান হল কিনা।'

রতিকান্ত চলিয়া গেল। ব্যোমকেশ বিমর্ষ মুখে বসিয়াছিল, চোখ তুলিয়া বলিল, 'পাণ্ডেজি, মিস্ মান্নাকে এখন কিছুদিন শকুন্তলা দেবীর কাছে রাখা দরকার, তার ব্যবস্থা করুন। তিনি সর্বদা শকুন্তলার কাছে থাকবেন, একদণ্ডও তাঁর কাছ-ছাড়া হবেন না।'

'বেশ।'

ম্যানেজার গঙ্গাধর এই সময় ফিরিয়া আসিলেন এবং শকুন্তলার মূর্ছার কথা

শুনিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন। পাণ্ডেজি বলিলেন, 'মিস্ মান্নাকে এখানে কিছুদিন রাখার ব্যবস্থা করুন। শকুন্তলা দেবী অন্তঃসত্ত্বা, তার ওপর এই দুর্দৈব। ওঁর কাছে অষ্টপ্রহর ডাক্তার থাকা দরকার।'

ম্যানেজারের মুখখানা কেমন একরকম হইয়া গেল। তারপর তিনি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়।'

মিস্ মান্না আসিলেন, হাতে ওষুধের ব্যাগ। তাঁহাকে সংক্ষেপে সব কথা বলা হইলে তিনি বলিলেন, 'বেশ, আমি থাকব। আমার কিছু জিনিসপত্র আনিয়ে নিলেই হবে।'

তিনি দ্রুতপদে উপরে চলিয়া গেলেন।

দশ মিনিট পরে রতিকান্ত নামিয়া আসিয়া বলিল, 'জ্ঞান হয়েছে। ডাক্তার মান্না বললেন ভয়ের কোনও কারণ নেই।'

পাণ্ডেজি গাত্রোত্থান করিলেন।

'আমরা এখন উঠলাম। রতিকান্ত, তুমি এখানকার কাজ সেরে একবার আমার বাসায় যেও।' আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'চলুন, আমার ওখানে চা খাবেন।'

নয়

মোটরে যাইতে যাইতে শকুন্তলার শয়নকক্ষের দৃশ্যটাই চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল। মনে হইল যেন একটি মর্মস্পর্শী নাটকের নিগূঢ় দৃশ্যাভিনয় প্রত্যক্ষ করিলাম। শকুন্তলা যদি মূর্ছিত হইয়া না পড়িতেন এবং চাঁদনী আসিয়া যদি রসভঙ্গ না করিত—

শকুন্তলা হঠাৎ মূর্ছিত হইলেন কেন? অবশ্য এরূপ অবস্থায় যে-কোনও মুহূর্তে মূর্ছা যাওয়া বিচিত্র নয়, তবু শোকের প্রাবল্যই কি তাহার একমাত্র কারণ?

ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে চিন্তার অতলে তলাইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শকুন্তলার মূর্ছার কথা ভাবছ নাকি?'

সে সচেতন হইয়া বলিল, 'মূর্ছা! না - আমি ভাবছিলাম ডাক-বাক্সর কথা।'

অবাক হইয়া বলিলাম, 'ডাক-বাক্সর কথা ভাবছিলে!'

সে বলিল, 'হ্যাঁ, দীপনারায়ণের বাড়ির কোণে যে ডাক-বাক্স আছে তারই কথা। ভারি লাগসৈ জায়গায় সেটা আছে। দেখলে মনে হয় লাল কুর্তা-পরা গোলগাল একটি সেপাই রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু আসলে তা নয়।'

'আসলে তবে কি?'

'আসলে শ্রীরাধিকার দূতী।'

'বুঝলাম না। ব্যাসকূট ছেড়ে সিধে কথা বল।'

ব্যোমকেশ কিন্তু সিধা কথা বলিল না, মুখে একটা এক পেশে হাসি আনিয়া কতকটা নিজ মনেই বলিল, 'অভিসারের আইডিয়াটি ভারি মিষ্টি, অবশ্য যদি অভিসারিকা পরস্ত্রী হয়। নিজের স্ত্রী অভিসার করলে বোধহয় তত মিষ্টি লাগে না।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ 'রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্'।'

'কি আবোল-তাবোল বকছ!'

ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে বলিল, 'আবোল-তাবোল নয়, এটা গীতগোবিন্দ। যদি আবোল-তাবোল শুনতে চাও শোনাতে পারি, ছন্দ একই। বাবুরাম সাপুড়ে কোথা যাস বাপুরে--'

পাণ্ডেজি মোটর চালাইতে চালাইতে হাসিয়া উঠিলেন। আমি হতাশ হইয়া আপাতত আমার কৌতূহল সম্বরণ করিলাম।

পাণ্ডেজির বাসায় পৌঁছিয়া দেখা গেল চা প্রস্তুত। তার সঙ্গে গরম গরম বেগুনি, পকৌড়ি, ডালের ঝালবড়া। ব্যোমকেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া বসিয়া গেল। আমরাও যোগ দিলাম।

বেশ খানিকটা রসদ আত্মসাৎ করিবার পর ব্যোমকেশ তৃপ্তস্বরে বলিল, 'এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, আমার অন্তরাত্মা এই জিনিসগুলির পথ চেয়ে ছিল।'

পাণ্ডেজি হাসিয়া বলিলেন, 'এখন তো পথ চাওয়া শেষ হ'ল, এবার বলুন কি দেখলেন শুনলেন।'

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় লম্বা একটি চুমুক দিয়া সযত্নে পেয়ালা নামাইয়া রাখিল, গড়গড়ার নলে কয়েকটা বুনিয়াদী টান দিল, তারপর চিন্তা-মন্থরকণ্ঠে বলিল, 'দেখলাম শুনলাম অনেক কিছু, কিন্তু এখনও শেষ দেখা যাচ্ছে না।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'তবু?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুটো মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে। এক--টাকা, দুই--স্মরগরল। কোনদিকের পাল্লা ভারী এখনও বুঝতে পারছি না। হতে পারে, দুটো মোটিভ জড়াজড়ি হয়ে গেছে।'

আমি বলিলাম, 'মোটিভ যেমনই হোক, লোকটা কে?'

ব্যোমকেশ একটু অধীরভাবে বলিল, 'তা কি করে বলব? যে-ব্যক্তি ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়েছিল সে ভাড়াটে লোক হতে পারে। যে তাকে নিয়োগ করেছিল তাকেই আমরা খুঁজছি।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমরা যাদের চিনি তাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিয়োগ করতে পারে। এক আছে দেবনারায়ণ। কিন্তু সে কি--'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ, প্রথমে দেবনারায়ণকে ধরুন। দেবনারায়ণকে দেখলে মনে হয় নিরেট আহাম্মক; কিন্তু এটা তার ছদ্মবেশ হতে পারে। সেই হয়তো লোক লাগিয়ে খুড়োকে মেরেছে। তার আজ্ঞাবহ মোসাহেবের অভাব নেই, লীলাধর বংশী বা বেণীপ্রসাদ যে-কেউ পুরস্কারের আশ্বাস পেলে খুন করবে। এখানে মোটিভ হ'ল, সম্পত্তির একাধিপত্য।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু--'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া আমাকে নিবারণ করিল--'তারপর ধরা যাক--চাঁদনী।'

'চাঁদনী!'

'হ্যাঁ, চাঁদনী। শকুন্তলার প্রতি তার এত দরদ স্বাভাবিক মনে হয় না, যেন একটু বাড়াবাড়ি। সে হয়তো মনে মনে তাঁকে হিংসে করে, তাঁর প্রাধান্য খর্ব করতে চায়। দীপনারায়ণের মৃত্যুর পর শকুন্তলা আর সংসারের কর্ত্রী থাকবেন না, কর্ত্রী হবে চাঁদনী। দেবনারায়ণ যদি সত্যি সত্যিই ন্যালা-ক্যাবলা হয়, সে চাঁদনীর মুঠোর মধ্যে থাকবে, চাঁদনী হবে বিপুল সম্পত্তির একচ্ছত্র অধীশ্বরী--'

'কিন্তু—'

ব্যোমকেশ আবার হাত তুলিয়া আমাকে নিবৃত্ত করিল।

'তারপর ধরুন—ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী। ডাক্তার পালিতের মতে ইনি গভীর জলের মাছ। সেটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়, গভীর জলের মাছ না হ'লে এতবড় স্টেটের ম্যানেজার হওয়া যায় না। কিন্তু উনি যদি কুমীর হন তবেই ভাবনার কথা। ভেবে দেখুন দীপনারায়ণ সিং বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, বিষয় সম্পত্তির ওপর নজর রাখতেন। তিনি বেঁচে থাক্‌তে পুকুর চুরি সম্ভব নয়, অল্পসল্প চুরি হয়তো চলে। কিন্তু তিনি যদি মারা যান তাহলে সমস্ত সম্পত্তি অর্শাবে দেবনারায়ণকে। তখন দু'হাতে চুরি করা চলবে। সুতরাং ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশীরও মোটিভ্‌ আছে স্বীকার করতে হবে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গড়গড়া টানিল, আমরা নীরব রহিলাম। তারপব সে গড়গড়ার নল আমার হাতে দিয়া বলিল, 'সর্বশেষে ধরুন—শকুন্তলা দেবী।'

এইটুকু বলিয়া সে চুপ করিল। আমরা প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। সে একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল, 'কোনও মহিলার চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা ভদ্রলোকের কাজ নয়, কিন্তু যেখানে একটা খুন হয়ে গেছে সেখানে আলোচনা না করেও উপায় নেই। শকুন্তলা দেবী তিন মাস অন্তঃসত্ত্বা, অথচ তিন মাস আগে দীপনারায়ণ সিং শয্যাগত ছিলেন, সে সময়ে তাঁর দীর্ঘ রোগের একটা ক্রাইসিস যাচ্ছিল।..শকুন্তলা আজ আমাদের বললেন, কাল রাত্রে তিনি স্বামীকে সন্তান সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, শুনে দীপনাবায়ণ সিং আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন।...কথাটা বোধহয় সত্যি নয়।'

প্রশ্ন করিলাম, 'সত্যি নয় কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দীপনারায়ণ সিং যদি আনন্দে আত্মহারা হয়েই পড়েছিলেন তবে এই মহা আনন্দের সংবাদ কাউকে দিলেন না কেন? রাত্রে না হোক, সকাল-বেলা ডাক্তার পালিতকে তো বলতে পারতেন, শুভসংবাদ পাকা কিনা জানবার জন্য মিস্‌ মান্নাকে ডাকাতে পারতেন। শকুন্তলা স্বামীকে বলেন নি, কারণ স্বামীকে বলবার মত কথা নয়। দীপনারায়ণ সিং জানতে পাবলে শকুন্তলাকে খুন করতেন, নচেৎ বাড়ি থেকে দূর কবে দিতেন। তাই জানাজানি হবার আগেই দীপনারায়ণ সিংকে সরানো দবকার হয়েছিল।'

বলিলাম, 'কিন্তু ধরো, ডাক্তার পালিত যদি ভুল করে থাকেন?'

ব্যোমকেশ শুষ্ক স্ববে বলিল, 'ডাক্তার পালিত এবং মিস্‌ মান্না দু'জনেই যদি ভুল করে থাকেন,, যদি শকুন্তলা নিষ্কলঙ্ক হন, তাহলে দীপনারায়ণকে খুন করার তাঁর কোনও মোটিভ নেই। কিন্তু ডাক্তার পালিত বা মিস্‌ মান্না দায়িত্বহীন ছেলেমানুষ নয়, তাঁরা ভুল করেন নি। ইচ্ছে করেও মিছে কথাও বলেন নি, যে মিছে কথা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে তেমন মিথ্যে কথা বলবার লোক ও'রা নন।'

বলিলাম, 'আমি ও কথা বলছি না। শকুন্তলা যে অন্তঃসত্ত্বা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু দীপনারায়ণ যে—'

'তুমি যা বলতে চাও আমি বুঝেছি। কিন্তু সে দিকেও বাড়িসুদ্ধ লোক সাক্ষী আছে, ডাক্তার পালিত মিছে কথা বলে পার পাবেন না।' ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে গড়গড়ার নল লইয়া আবার টানিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'বেশ, তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যাক যে শকুন্তলার একটি

দুষ্মন্ত আছে। কিন্তু সে লোকটা কে?'

ব্যোমকেশ একটু চকিতভাবে আমার পানে চাহিল, অর্ধ ব্যক্ত স্বরে বলিল, 'শকুন্তলার দুষ্মন্ত! বেশ বলেছ।—ওই দুষ্মন্তকেই আমরা খুঁজছি। ডাক্তার পালিতের ব্যাগে যে ওষুধের বদলে বিষ রেখে গিয়েছিল সে ওই দুষ্মন্ত ছাড়া আর কে হতে পারে?'

'দুষ্মন্তটি তবে কে?'

'সেটা শকুন্তলার রুচির ওপর নির্ভর করে। তিনি মার্জিত রুচির আধুনিকা মহিলা, সুতরাং দুষ্মন্তও আধুনিক শিক্ষিত লোক হওয়া সম্ভব। নর্মদাশঙ্কর বা তাদের দলের কেউ হতে পারে। আবার এমন লোক হতে পারে যার প্রকাশ্য-ভাবে ও বাড়িতে যাতায়াত নেই।'

পাণ্ডেজি কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, বলিলেন, 'কিম্বা মনে করুন, যদি এমন কেউ হয় যে শকুন্তলাকে বিপদে ফেলে সরে পড়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুষ্মন্তদের পক্ষে সেটা খুবই স্বাভাবিক। তখন শকুন্তলাকে অন্য চেষ্টা করতে হবে, অর্থাৎ অন্য সহকারী যোগাড় করতে হবে।'

'সে-রকম সহকারী তিনি পাবেন কোথায়?'

'কেন, সহকারীর অভাব কিসের? স্বয়ং গঙ্গাধর বংশী রয়েছেন, তস্য পুত্র লীলাধর আছে বেণীপ্রসাদ আছে, উপযুক্ত দক্ষিণা পেলে সকলেই রাজী হবে। এমন কি ডাক্তার পালিত আর মিস্ মান্নাকেও বাদ দেওয়া যায় না। ঠক বাছতে গাঁ উজোড়।' আমরা নির্বাক হইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের গড়গড়ার আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নাই। তারপর সে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলিল, 'দেয়ালে আঁকা ছবিটার কথা বার বার মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে ওটা শুধু ছবি নয়, ওর মধ্যে শিল্পীর অন্তরতম কথাটি লুকিয়ে আছে। ছবিটি দিনের আলোয় আর একবার ভাল করে দেখতে হবে।'

ভৃত্য আসিয়া জানাইল, ইন্সপেক্টর চৌধুরী আসিয়াছেন।

দশ

রতিকান্ত ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'এই মাত্র কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের রিপোর্ট দিয়ে গেল। ওষুধে বিষ পাওয়া যায় নি।'

আমরা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। লিভারের ভায়ালে কিউরারি পাওয়া যাইবে এ বিষয়ে আমরা এতই নিশ্চিন্ত ছিলাম যে কথাটা হঠাৎ বোধগম্য হইল না।

'বিষ পাওয়া যায় নি?'

'না। এই দেখুন রিপোর্ট।' রতিকান্ত ব্যোমকেশের হাতে এক টুকরো কাগজ দিল।

রিপোর্টে কোন বিষের নামগন্ধ নাই, নিতান্ত সহজ স্বাভাবিক লিভারের আরক। ব্যোমকেশ কুঞ্চিতচক্ষে পাণ্ডেজি ও রতিকান্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

'ভারি আশ্চর্য।'

রতিকান্ত একবার গলা ঝাড়া দিয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, এ থেকে আপনার কি মনে হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আগে আপনি বলুন আপনার কি মনে হয়।'

বোধ হইল রতিকান্ত মনে মনে খুশী হইয়াছে। সে একটি চেয়ারের কিনারায় বসিল, কিছুক্ষণ একাগ্রভাবে একদিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'দীপনারায়ণজি কিউরারি বিষে মারা গেছেন তাতে সন্দেহ নেই। পোস্ট মর্টেমে বিষ পাওয়া গেছে। তাঁর শরীরে বিষ প্রবেশ করল কি করে? ইন্‌জেকশন ছাড়া অন্য উপায়ে প্রবেশ করতে পারে না। অথচ যে ভায়াল থেকে ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়েছিল তাতে বিষ পাওয়া গেল না—' রতিকান্ত একটু ইতস্তত করিল 'এ থেকে একমাত্র অনুমান করা যায়, ডাক্তার পালিত যে ভায়াল থেকে ইন্‌জেকশন দিয়েছিলেন সে ভায়াল আমাদের দেন্‌নি, অন্য ভায়াল দিয়েছিলেন।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কিন্তু কেন? তাতে ওঁর লাভ কি?'

রতিকান্ত একটু উদ্বিগ্নভাবে বলিল, 'লাভ এই হতে পারে যে, আমরা মনে করব ইন্‌জেকশনের জন্য মৃত্যু হয়নি।'

'ডাক্তার ছাড়া আর কেউ হতে পারে না কি? দীপনারায়ণের মৃত্যুর পর ঘরে অনেক লোক এসেছিল, গোলমালের মধ্যে হয়তো অন্য কেউ ভায়ালটা সরিয়েছে।'

'অসম্ভব নয়, কিন্তু –'

ব্যোমকেশ আস্তে আস্তে বলিল, 'আপনি মনে করেন ডাক্তার পালিতই প্রকৃত অপরাধী?'

রতিকান্ত একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'আজ থানায় আপনি ডাক্তার পালিত সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করলেন সেটা আমার মাথায় ঘুরছিল, তারপর অ্যানালিসিসের রিপোর্ট পেয়ে মনে হল, ডাক্তার পালিত যদি নির্দোষ হন তবে সিধা পথে চলছেন না কেন? এ অবস্থায় তাঁর ওপর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য দীপনারায়ণজির মৃত্যুতে ওঁর ব্যক্তিগত কোনও লাভ নেই। কিন্তু যাদের লাভ আছে তারা ওঁকে টাকা খাইয়ে নিজেদের কাজ উদ্ধার করিয়ে নিতে পারে। হয়তো ওঁকে পঞ্চাশ হাজার কি এক লাখ টাকা খাইয়েছে। টাকার জন্যে মানুষ কি না করে।'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িল, 'ঠিক কথা, টাকার জন্যে মানুষ কি না করে। ডাক্তার পালিত যদি টাকা খেয়ে একাজ করে থাকেন তাহলে শুধু ডাক্তার পালিতকে ধরলেই চলবে না, যে টাকা খাইয়েছে তাকেও ধরতে হবে। কে তাঁকে টাকা খাইয়েছে আপনি কিছু আন্দাজ করেছেন?'

'আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দেবনারায়ণ ছাড়া আর কে হতে পারে।'

'আপাতত তাই মনে হয় বটে, কিন্তু প্রমাণ কৈ? প্রমাণ কিছু পাওয়া গেছে কি?'

'প্রমাণ এখনও কিছু পাওয়া যায় নি।'

রতিকান্ত পাণ্ডেজির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আজ রাত্রি একটার ট্রেনে আমি বম্বার যাচ্ছি। কয়েদীটাকে জেরা করে যদি জানতে পারা যায় যে ডাক্তার পালিত কিউরারি কিনেছেন—'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'তাহলে অনেকটা সুরাহা হতে পারে। তুমি ফিরবে কবে?'

'কাল সন্ধ্যে নাগাদ ফিরতে পারব বোধহয়।—সাব-ইন্সপেক্টর তিওয়ারীকে থানার চার্জে রেখে যাচ্ছি।'

'বেশ। –এদিকের কি ব্যবস্থা করলে?'

'দীপনারায়ণজির বাড়িতে একজন হেড কনেস্টবলের অধীনে চারজন কনেস্টবল বসিয়ে যাচ্ছি, তারা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় থাকবে। আপনি তো মিস্ মান্নাকে শকুন্তলা দেবীর কাছে রাত্রে থাকতে বলে এসেছেন।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'হ্যাঁ, মিস্ মান্না এখন কিছুদিন শকুন্তলার কাছেই থাকবেন। তুমি তো শুনেছ শকুন্তলা অন্তঃসত্ত্বা।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রতিকান্ত ঈষৎ গাঢ়স্বরে বলিল, 'শুনেছি। দীপনারায়ণজি সন্তানের জন্যে বড় ব্যাকুল হয়েছিলেন। তিনি দেখে যেতে পেলেন না।'

ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া আটটা বাজিল। রতিকান্ত উঠিয়া পড়িল, 'যাই, আমাকে আবার তৈরি হতে হবে। আপনারা এদিকে একটু নজর রাখবেন।' হাসিমুখে স্যালুট করিয়া রতিকান্ত চলিয়া গেল।

দেখিলাম রতিকান্তের ব্যবহার এবেলা অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে। সে প্রথমটা একটু আড়ষ্ট হইয়াছিল। তাহার এলাকার মধ্যে ব্যোমকেশের আবির্ভাব মনে মনে পছন্দ করে নাই, এখন বোধহয় সে বুঝিয়াছে ব্যোমকেশ তাহার কৃতিত্বে ভাগ বসাইতে চায় না, তাই নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া বসিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার পালিতের ব্যবহারে সংগতি পাওয়া যাচ্ছে না। তিনিই প্রথম বলেছিলেন, মৃত্যুর কারণ কিউরারি এবং তাঁর ইন্‌জেকশনের ফলেই মৃত্যু হয়েছে। তবে আবার তিনি ওষুধের ভায়াল বদলে দিলেন কেন?' ব্যোমকেশ আবার চক্ষু মুদিত করিল।

বাহিরে মোটরের শব্দ হইল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, ডাক্তার পালিত আসিয়াছেন। ব্যোমকেশের চট্ করিয়া সমাধিভঙ্গ হইল, সে মৃদুকণ্ঠে পাণ্ডেজিকে বলিল, 'ডাক্তারকে এ সব বলে কাজ নেই।'

ডাক্তার পালিত আসিলে পাণ্ডেজি তাঁহাকে সমুচিত শিষ্টতা সহকারে বসাইলেন।

ডাক্তার ক্লান্তভাবে বলিলেন, 'প্রাণে শান্তি নেই পাণ্ডেজি। ডিস্‌পেনসারি বন্ধ করবার পর ভাবলাম খোঁজ নিয়ে যাই যদি কিছু খবর থাকে।'

পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের পানে কটাক্ষপাত করিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'খবর তো আমরাও খুঁজে বেড়াচ্ছি, ডাক্তারবাবু, কিন্তু পাচ্ছি কৈ? আপনি শকুন্তলা দেবী সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেছিলেন তা যদি সত্য হয়—'

ডাক্তারের মুখ একটু অপ্রসন্ন হইল, 'সত্যি কিনা অন্য যে-কোনও ডাক্তার শকুন্তলাকে পরীক্ষা করলেই জানতে পারবেন।'

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলিল, 'না না, সে-কথা আমি বলছি না, সে-কথা শকুন্তলা নিজেই স্বীকার করেছেন। আমরা ভাবছি দীপনারায়ণ সিং সে সময়ে মরণাপন্ন ছিলেন -'

ডাক্তার বলিলেন, 'তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তিন মাস আগে দীপনারায়ণ সিংয়ের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল, শহরের অনেক ডাক্তার তাঁকে দেখেছিলেন,

তাঁরা বলতে পারবেন। তাছাড়া একজন নার্স তখন অষ্টপ্রহর তাঁর কাছে থাকত। সে বলতে পারবে।'

'তাই নাকি! কি নাম নার্সের?'

'মিস্ ল্যাম্বার্ট। মেডিকেল কলেজের কাছে থাকে।'

ব্যোমকেশ পাণ্ডেজিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি চেনেন?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'চিনি না, কিন্তু বাসাটা দেখেছি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া কি ভাবিল, তারপর ডাক্তার পালিতের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'ডাক্তারবাবু, এবার আপনাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি, কিছু মনে করবেন না। আপনি দীপনারায়ণ সিংএর স্টেট থেকে বারো হাজার টাকা ধার নিয়েছেন কেন?'

ডাক্তার পালিত আকাশ হইতে পড়িলেন, চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন, 'টাকা ধার নিয়েছি! সে কি, কে বললে আপনাকে?'

'ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশীর মুখে শুনলাম। তবে কি একথা সত্যি নয়?'

'সর্বৈব মিথ্যে। বারো হাজার টাকা! গঙ্গাধর বংশী তো দেখছি সাংঘাতিক লোক। দীপনারায়ণবাবু মারা গেছেন এই ফাঁকে বারো হাজার টাকা হজম করতে চায়। দাঁড়ান ব্যাটাকে আমি দেখাচ্ছি, এখনি গিয়ে টুঁটি টিপে ধরব। আমার নামে মিথ্যে অপবাদ দেবে, এত বড় আস্পর্ধা।'

ডাক্তার পালিত উঠিবার উপক্রম করিতেই ব্যোমকেশ বলিল, 'বসুন বসুন, ম্যানেজারের সঙ্গে বোঝাপড়া পরে করবেন।—কিন্তু কিছু সত্যি যদি না থাকে একথা উঠলো কি করে?'

ডাক্তার একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'কি করে উঠলো তা বুঝতে পেরেছি। হপ্তা দুই আগে একদিন সকালে দীপনারায়ণবাবুকে ইন্জেকশন দিতে গেছি, তিনি আমার মোটর দেখে বললেন ডাক্তার, তোমার গাড়িটা ঝড়্ঝড়ে হয়ে গেছে, ওটা বদলে ফ্যালো। আমি বললাম, আজকাল নতুন গাড়ি কিনতে গেলে দশ-বারো হাজার টাকা খরচ, অত টাকা আমি কোথায় পাব! আমি এক পয়সা বাঁচাতে পারিনি, যা রোজগার করি সব খেয়ে ফেলি। শুনে তিনি আর কিছু বললেন না, একটু হাসলেন। আমার বিশ্বাস তিনি ওই টাকাটা আমায় দেবেন ঠিক করেছিলেন, হয়তো ম্যানেজারকে বলেও ছিলেন। তারপর তিনি যখন হঠাৎ মারা গেলেন তখন ম্যানেজারের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, বারো হাজার টাকা পকেটস্থ করার এই সুযোগ। দাঁড়ান না আমি ওর ভুঁড়ি বার করে ছেড়ে দেব, আমার সঙ্গে চালাকি।'

ডাক্তার পালিত শান্তশিষ্ট গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু দেখিলাম তিনি চটিয়া আগুন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আর বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখা গেল না; তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং আজ রাত্রেই একটা হেস্তনেস্ত করিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ কান পাতিয়া শুনিল, ডাক্তার পালিতের মোটর চলিয়া গেল। তখন সে লাফাইয়া উঠিয়া পাণ্ডেজিকে বলিল, 'চলুন, এখনি মিস্ ল্যাম্বার্টের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

বিস্মিত পাণ্ডেজি বলিলেন, 'এখন—এই রাত্রে!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যেতে হলে আজ রাত্রেই যেতে হয়। ডাক্তার পালিত যে-রকম তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, মিস্ ল্যাম্বার্টকে তালিম দিতে গেলেন কিনা বুঝতে

পারছি না। চলুন।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'চলুন।'

মিস্ ল্যাম্বার্ট ইঙ্গ-ভারতীয় মহিলা। বয়স হইয়াছে। তাঁহার চেহারায় ইঙ্গ ভাবই প্রবল, চোখ কটা, রঙ ফর্সা। কিন্তু মনটি বোধ হয় ভারতীয়। ডিনারের পর পান খাইয়া ঠোঁট দুটি লাল করিয়া বসিয়া রেডিও শুনিতেছিলেন, আমাদের পরিচয় পাইয়া সমাদর সহকারে ড্রইংরুমে বসাইলেন। ছোট্ট বাড়ির ছোট্ট ড্রইংরুম, বেশ ছিমছাম। মানুষটিও ছিমছাম। ডাক্তার পালিত এদিকে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইল না।

মিস্ ল্যাম্বার্ট হাসিয়া বলিলেন, 'এত রাত্রে আপনাদের কি দিয়ে অতিথি সৎকার করব? পান খান।' বলিয়া পানের বাটা আমাদের সামনে খুলিয়া ধরিলেন। আমরা পান লইলাম। পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আপনার রাত্রে কোথাও যাবার নেই তো?'

মিস্ ল্যাম্বার্ট বলিলেন, 'না, আজ আমি ফ্রী আছি।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমরা আপনার কাছ থেকে একটা কথা জানতে এসেছি। দীপনারায়ণ সিং মারা গেছেন শুনেছেন কি?'

মিস্ ল্যাম্বার্টের মুখ গম্ভীর হইল, 'শুনেছি। ডক্টর পালিতের হাতে এরকম ব্যাপার ঘটবে কল্পনা করাও যায় না।'

'আপনি কার কাছে শুনলেন?'

'ডক্টর জগন্নাথ প্রসাদের কাছে। তারপর অন্য ডক্টরদের মুখেও শুনলাম। সো স্যাড। বলুন আমি কি করতে পারি।'

পাণ্ডেজি তখন আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়টি প্রাঞ্জল করিয়া বলিলেন। মিস্ ল্যাম্বার্ট গভীর মনোযোগের সহিত শুনিয়া দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িলেন, 'ইম্পসিবল। আমি দেড় মাস মিস্টার দীপনারায়ণের শুশ্রূষা করেছিলাম, তার মধ্যে কখনও দশ মিনিটের জন্যেও রুগীকে চোখের আড়াল করিনি।'

'আপনি একাই তাঁর শুশ্রূষা করতেন?'

'না, আমার একজন সহকারিণী ছিলেন মিস্ দস্তুর। তিনি দিনের বেলা থাকতেন, আর রাত্রিতে আমি। আমাদের অনুপস্থিতি কালে কাউকে রুগীর কাছে যেতে দেওয়া হ'ত না, এমন কি ঝি চাকরকে পর্যন্ত না।'

'হুঁ। কবে থেকে কবে পর্যন্ত আপনারা শুশ্রূষা করেছিলেন?'

'এক মিনিট, আমার ডায়েরি আপনাকে দেখাচ্ছি।'

মিস্ ল্যাম্বার্ট পাশের ঘর হইতে ডায়েরি আনিয়া পাণ্ডেজির হাতে দিলেন। ডায়েরিতে দিনের পর দিন মিস্ ল্যাম্বার্টের কর্মসূচী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে দেড় মাস দীপনারায়ণ সিংয়ের জীবন লইয়া যমে মানুষে টানাটানি চলিয়াছিল তাহার বিবরণ রহিয়াছে।

রোগীর অবস্থার বর্ণনা পড়িয়া সন্দেহ থাকে না যে ওই দেড় মাস অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন ছিল। তাঁহার জীবনশক্তি এতই হ্রাস হইয়াছিল যে বিছানায় উঠিয়া বসিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। তারিখ মিলাইয়া দেখা গেল, মিস্ ল্যাম্বার্টের শুশ্রূষার কাল চার মাস আগে আরম্ভ হইয়া আজ হইতে আড়াই মাস আগে শেষ হইয়াছে। তার পরেও দীপনারায়ণ সিং অসুস্থ ছিলেন কিন্তু জীবনের আশঙ্কা তখন আর ছিল না।

ডায়েরি মিস্ ল্যাম্বার্টকে ফেরত দিয়া এবং তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া আমরা বিদায় লইলাম।

রাত্রি সাড়ে ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। বাজারের দোকানপাট বন্ধ। আজ বাড়ি ফিরিয়া সত্যবতীর কাছে বকুনি খাইতে হইবে ভাবিতে ভাবিতে বাড়ি ফিরিলাম। পাণ্ডেজি আমাদের নামাইয়া দিয়া গেলেন।

এগার

পরদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে জানা গেল, রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশ কুয়াশায় আচ্ছন্ন; সূর্যদেব কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। সুতরাং আমাদেরও শয্যাত্যাগ করিয়া লাভ নাই।

সাড়ে আটটার সময় সত্যবতী চা দিতে আসিয়া বলিল, 'আজ আবার অমাবস্যা। আজ কেউ বাড়ির বার হতে পাবে না।'

এমন দিনে কে বাহির হইতে চায়? কিন্তু পাণ্ডেজি শুনিলেন না, ঠিক ন'টার সময় পুলিশ-বেশে সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা কম্পিত কলেবরে লেপের ভিতর হইতে নির্গত হইলাম। পাণ্ডেজি আমাদের অবস্থা দেখিয়া হাসিলেন। বলিলেন, 'কাল রাত্রে একটা ব্যাপাব ঘটেছে।'

কি ব্যাপার ঘটিয়াছে ব্যোমকেশ জানিতে চাহিল, পাণ্ডেজি সংক্ষেপে ঘটনা বলিলেন--

কাল রাত্রি বারোটা হইতে আকাশে কুয়াশা জমিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তারপর টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি শুরু হয়। পাণ্ডেজির দেরীতে ঘুমানো অভ্যাস; রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় তিনি শয়নের উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। দীপনারায়ণের বাড়ি হইতে টেলিফোন, যে জমাদারকে রতিকান্ত চারজন কনেস্টবল সঙ্গে পাহারায় রাখিয়াছিল সে টেলিফোন করিতেছে। জমাদার জানাইল—কিছুক্ষণ আগে দুইজন লোক খিড়কির দরজা দিয়া হাতায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সিপাহীরা সতর্ক ছিল, তাই প্রবেশ করিতে গিয়া সিপাহীদের দেখিয়া পলায়ন করিয়াছে। একজন সিপাহী দূর হইতে তাহাদের উপর টর্চের আলো ফেলিয়াছিল, দুজনেই কোট-প্যাণ্ট পরা ভদ্রশ্রেণীর লোক, কিন্তু তাহাদের সনাক্ত করা যায় নাই। মনে হয় তাহারা মোটর বাইকে চড়িয়া আসিয়াছিল, কারণ কিছুক্ষণ পরে দূরে মোটর বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ শুনা গিয়াছিল।

পাণ্ডেজি রাত্রে আর কিছু করেন নাই, জমাদারকে সতর্কভাবে পাহারা দিবার উপদেশ দিয়া টেলিফোন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তারপর আজ সকালে খোঁজ লইয়া জানিয়াছেন যে রাত্রে আর কোনও উপদ্রব হয় নাই।

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া কিছুক্ষণ পাণ্ডেজির মুখের পানে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'নর্মদাশঙ্কর।'

ব্যোমকেশ আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, 'আমি ভাবছি অন্য লোকটা কে? নর্মদাশঙ্করই যদি দুষ্মন্ত হয় তাহলে সে কি একজন বয়স্যাকে সঙ্গে নিয়ে শকুন্তলার কুঞ্জে যাবে?—পাণ্ডেজি, আপনার কি মনে হয়?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কিছু বুঝতে পারছি না। আমি দুটো ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসেছি, ওয়ারেণ্টে আসামীর নাম নেই, দরকার হলে বসিয়ে দেওয়া যাবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে চলুন, নর্মদাশংকরের বাড়িতে হানা দেওয়া যাক। হঠাৎ আমাদের দেখলে ঘাবড়ে গিয়ে সত্যি কথা বলে ফেলতে পারে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা তৈরি হইয়া বাহির হইলাম। সত্যবতী কিছু বলিল না, কেবল কটমট করিয়া তাকাইল।

মোটরে উঠিতে গিয়া দেখিলাম ভিতরে একজন পুষ্টকায় সাব-ইন্সপেক্টর বসিয়া আছে। পাণ্ডেজি পরিচয় করাইয়া দিলেন - সাব-ইন্সপেক্টর তিওয়ারী।

তিওয়ারীর চেহারা সাবেক আমলের দারোগার মত। সে পোকা-ধরা দাঁত বাহির করিয়া স্যালুট করিল। বুঝিলাম রতিকান্ত তাহাকেই থানার চার্জে রাখিয়া গিয়াছে।

এদিকে আকাশের অশ্রুবাষ্প ক্রমশ অপসৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সদ্য-জাগ্রত সূর্যদেব শাণিত খড়্গ দিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছিলেন। এতক্ষণ যাহা ভারী মেঘের মত আকাশের বুকে চাপিয়া ছিল তাহা ধূম্রকুণ্ডলীর মত মিলাইয়া যাইতে লাগিল। আমরা নর্মদাশংকরের বাড়িতে পৌঁছিতে পৌঁছিতে কাঁচা সোনালী রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করিয়া উঠিল।

নর্মদাশংকরের বাড়ি শহরের নূতন অংশে। ঢালাই লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা, সামনে টেনিস কোর্ট। আমরা বাহিরে মোটর রাখিয়া যথাসম্ভব নিঃশব্দে প্রবেশ করিলাম। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল এখনও এ বাড়ির ভাল করিয়া ঘুম ভাঙে নাই। সম্মুখের বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া একটা নিদালু চাকর কয়েক জোড়া জুতা বুরুশ করিতেছে। আমাদের দেখিয়া কিছুক্ষণ মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ তাহার কাছে গিয়া টপ করিয়া এক জোড়া জুতা তুলিয়া লইল এবং উল্টাইয়া দেখিল। চাকরকে প্রশ্ন করিল, 'এ জুতো কার?'

চাকরটা হাঁ-করা অবস্থায় বলিল, 'মালিকের।'

ব্যোমকেশ জুতা জোড়ার তলদেশ আমাদের দেখাইল। তলায় কাদা লাগিয়া আছে। রাত্রি বারোটার পর যে এই জুতা ব্যবহার হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সময় বাড়ির ভিতর দিক হইতে একজন উচ্চশ্রেণীর উর্দিপরা বেয়ারা বাহির হইয়া আসিল। সেও দুজন পুলিশ অফিসারকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল। পাণ্ডেজি কড়া সুরে তাহাকে বলিলেন, 'নর্মদাশংকরবাবু কোথায়?'

বেয়ারা ভয় পাইয়া বলিল, 'আজ্ঞে তিনি বাড়িতেই আছেন।'

'নিয়ে চল আমাদের তাঁর কাছে।'

বেয়ারা একবার একটু ইতস্তত করিল, তারপর পথ দেখাইয়া আমাদের লইয়া চলিল। বাড়ির অভ্যন্তর যতদূর দেখিলাম সুরুচির সহিত সজ্জিত। বেয়ারা আমাদের একটি দরজার সম্মুখে আনিয়া পর্দা সরাইয়া দাঁড়াইল। আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ঘরের জানালা দরজা বন্ধ, বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিতেছে। ঘরটিকে শিকারের ঘর বলা চলে। মেঝেয় বাঘ ও হরিণের চামড়া ছড়ানো, দেয়ালে বাঘ ও হরিণের মুণ্ড। একটি কাচের আলমারিতে রাইফেল বন্দুক পিস্তল প্রভৃতি সাজানো রহিয়াছে। ঘরের মাঝখানে একটি গোল টেবিল, তাহাকে ঘিরিয়া

কয়েকটি গদি-মোড়া আরাম-কেদারা।

আমরা প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দুটি লোক মুখোমুখি দুটি কেদারায় বসিয়া আছে; তাহাদের হাতে কাঁচের গেলাসে রঙীন তরল পদার্থ। পাশের টেবিলে সোডা ও হুইস্কির বোতল। সুতরাং গেলাসের তরল পদার্থ যে কী বস্তু তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। বোধহয় মধ্য রাত্রে যে সোমযাগ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এখনও চলিতেছে।

আমাদের দিকে মুখ করিয়া যে লোকটি বসিয়া ছিল সে ঘোড়া জগন্নাথ। ঘোলাটে চোখে আমাদের দেখিতে পাইয়া তাহার সমস্ত শরীর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঝাঁকানি দিয়া উঠিল; হাতের গেলাস হইতে তরল পদার্থ চল্‌কাইয়া পড়িল। তখন নর্মদাশঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল। তাহার আরক্ত মুখে ভ্রূকুটি দেখা দিল। সে রূঢ় স্বরে বলিল, 'কি চাই?'

মদের বিচিত্র প্রভাব, পেটে মদ পড়িলে মানুষের চরিত্র বদলাইয়া যায়। কেহ কাঁদে, কেহ গান গায়, কেহ বা যুযুৎসু হইয়া ওঠে। নর্মদাশঙ্করের বিনীত বশংবদ ভাব আর নাই, সে উগ্র স্পর্ধিত চক্ষে আমাদের পানে চাহিয়া রহিল।

পাণ্ডেজি তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে পুলিশী কঠোরতা ফুটিয়া উঠিল, 'আপনাদের দু'জনের নামে ওয়ারেণ্ট আছে।'

নর্মদাশঙ্কর মদের গেলাস হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল, উদ্ধত বিস্ময়ে বলিল, 'ওয়ারেণ্ট!-আমার নামে? কিসের ওয়ারেণ্ট?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আপনারা দু'জনে কাল রাত্রি একটার সময় দীপনারায়ণ সিংয়ের বাড়িতে ট্রেস্‌পাস করেছিলেন।'

'প্রমাণ আছে?'

পাণ্ডেজি অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, 'আছে। পুলিশের লোকে আপনাদের দেখেছে।'

নর্মদাশঙ্করের রক্ত-রাঙা চোখে কুটিল বজ্জাতি খেলিয়া গেল, সে ঠোঁটের একটা তেরছা ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'যদি বলি শকুন্তলা আমাকে ডেকেছিল তাহলেও কি ট্রেস্‌পাস হবে?'

'সে কথা আদালতে বলবেন।--সাব-ইন্সপেক্টর তিওয়ারী!' পাণ্ডেজি তিওয়ারীকে ইঙ্গিত করিলেন, তিওয়ারী পকেট হইতে দুই জোড়া হাতকড়া বাহির করিল।

হাতকড়া দেখিয়া ঘোড়া জগন্নাথ হাউমাউ করিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে চুপটি করিয়া ছিল, নাক ঝাড়ার শব্দ পর্যন্ত করে নাই। এখন মদের গেলাস টেবিলে রাখিয়া দু'হাতে পাণ্ডেজির হাত চাপিয়া ধরিল, ব্যগ্র মিনতির কণ্ঠে বলিল, 'পাণ্ডেজি, দোহাই আপনার, হাতে হাতকড়া পরাবেন না। আমরা সত্যিকারের দোষ কিছু করিনি, আপনাকে সব কথা বলছি- না না নর্মদাশঙ্কর, তুমি চুপ কর, গোঁয়ার্তুমি কোরো না—এ সব কেচ্ছা জারি হয়ে পড়লে শহরে আর মুখ দেখানো যাবে না। পাণ্ডেজি, আমার বয়ান শুনুন—'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আপনি যদি সত্যি কথা বলেন শুনতে রাজী আছি।'

'সত্যি কথা বলব, কোনও কথা লুকোব না।'

'বেশ, শুনে যদি মনে হয় আপনাদের কোনও মন্দ অভিপ্রায় ছিল না, তাহলে অ্যারেস্ট নাও করতে পারি।—নর্মদাশঙ্করবাবু, আপনি যান, অনেক মদ খেয়েছেন,

বিছানায় শুয়ে থাকুন গিয়ে। দরকার হলে ডাকব।'

এতক্ষণে নর্মদাশঙ্করেরও কতকটা হুঁশ হইয়াছিল; সে আমাদের দিকে একটি ব্যর্থ ক্রোধের জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মদের বোতলটা তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

আমরা তখন উপবেশন করিলাম। ঘোড়া জগন্নাথ কোঁৎ কোঁৎ করিয়া গেলাসের বাকি মদ গলাধঃকরণ করিয়া যে ঘটনা বিবৃত করিল তাহার মর্মার্থ এইরূপ—

নর্মদাশঙ্করের সঙ্গে ঘোড়া জগন্নাথের বন্ধুত্ব খুব গাঢ় নয়; তবে নর্মদা-শঙ্করের বাড়িতে আসিলে বিনা পয়সায় বিলাতী মদ পাওয়া যায়, তাই জগন্নাথ তাহার সহিত একটা বাহ্যিক সৌহৃদ্য রাখিয়াছে। কাল রাত্রে জগন্নাথ আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এখানে আসিয়াছিল, তারপর এখানেই আহারাদি সম্পন্ন করে। অন্যান্য বন্ধুরা প্রস্থান করিলে জগন্নাথ ও নর্মদাশঙ্কর এই ঘরে আসিয়া মদ্য পান করিতে আরম্ভ করে। নর্মদাশংকরকে কাল সন্ধ্যাকালে পুলিশ শকুন্তলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেয় নাই, সেজন্য তাহার মনে গভীর ক্ষোভ ছিল; মদ খাইতে খাইতে এই প্রসঙ্গই আলোচনা হয়। ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল, বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ নর্মদাশঙ্কর বলিল, আজ রাত্রে যেমন করিয়া হোক শকুন্তলার সহিত দেখা করিবে। জগন্নাথ তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে শুনিল না। তখন দুইজনে মোটর বাইকে চড়িয়া বাহির হইল, জগন্নাথ মোটর বাইকের পিছনের আসনে বসিল। দীপনারায়ণের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছিয়া তাহারা আম-বাগানের মধ্যে মোটর বাইক লুকাইয়া রাখিল, তারপর খিড়কির দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কিন্তু পুলিশ পাহারায় ছিল, খিড়কির দরজা পার হইতে না হইতে তাহারা বৈদ্যুতিক টর্চের আলো ফেলিয়া আগন্তুক দুটিকে দেখিতে পাইল। দুজনে তখন আর কাল-বিলম্ব না করিয়া পলায়ন করিল এবং মোটর বাইকে চাপিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তারপর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত তাহারা এখানে বসিয়া মদ্য পান করিয়াছে। তাহাদের কোনও বে-আইনী অভিসন্ধি ছিল না, মদের ঝোঁকে একটা নির্বুদ্ধিতার কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। এখন এই সব বিবেচনা করিয়া পাণ্ডেজি নিজ গুণে তাহাদের ক্ষমা করুন।

ঘোড়া জগন্নাথের অনুনয়ান্ত বিবৃতি শেষ হইবার পর পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের দিকে ভ্রূভঙ্গ করিলেন। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে নর্মদাশঙ্করবাবুর সম্বন্ধটা ঠিক কোন ধরনের?'

জগন্নাথ সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, 'দেখুন, ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। মানে—'

'মানে—আপনি বলবেন না?'

জগন্নাথ আরও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, 'না না, বলব না কেন? তবে ও সব কথায় আমি থাকি না—আমি একজন রেস্‌পেক্টেবল ডাক্তার, কেন কি আমার পরের হাঁড়িতে কাঠি দিয়ে।'

'বটে! আপনি পরের হাঁড়িতে কাঠি দেন না! কেবল ডাক্তার পালিতের কম্পাউন্ডার খুবলালকে চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য ভয় দেখিয়েছিলেন।'

খুবলালের উল্লেখে ঘোড়া জগন্নাথ একবারে কেঁচো হইয়া গেল—'আমি- মানে আমি—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওকথা যাক। শকুন্তলার সঙ্গে নর্মদাশঙ্করের ঘনিষ্ঠতা কতদূর গড়িয়েছে তা আপনি জানেন না?'

'সত্যি বলছি নটঘটের কথা আমি কিছু জানি না।'

'কাল রাত্রে নর্মদাশঙ্কর কিছু বলেনি?'

'নর্মদাশঙ্কর ভারি মিথ্যেবাদী। ও মনে করে দুনিয়ার সব মেয়ে ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ওর কথা বিশ্বাস করা যায় না।'

'অর্থাৎ বলেছিল। কী বলেছিল?'

'বলেছিল শকুন্তলার সঙ্গে অনেক দিন ধরে ওর প্রেম চলছে। এলাহাবাদে ওরা এক কলেজে পড়ত, তখন থেকে প্রেম।'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, নীরসকণ্ঠে বলিল, 'হুঁ! আজ আপনি ছাড়া পেলেন। কিন্তু পরে হয়তো আদালতে সাক্ষী দিতে হবে। শহর ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করবেন না, তাহলেই হাতে হাতকড়া পড়বে। চলুন পাণ্ডেজি।'

বার

দীপনারায়ণ সিংয়ের বাড়িতে পৌঁছিয়া পাণ্ডেজি তিওয়ারীকে বলিলেন, 'তুমি এবার থানায় ফিরে যাও, তোমাকে এখানে আর দরকার নেই।' তিওয়ারী প্রস্থান করিলে তিনি ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলেন, 'অতঃ কিম্?'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিয়া বলিল, 'আসুন, সেরেস্তার দিকে যাওয়া যাক। মনে হ'ল যেন ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে সুট করে দপ্তরখানায় ঢুকে পড়লেন।'

ফটক অতিক্রম করিয়া আমরা সেরেস্তার দিকে চলিলাম। পথে জমাদারের সঙ্গে দেখা হইল, সে পাণ্ডেজিকে স্যালুট করিয়া জানাইল, সব ঠিক আছে।

সেরেস্তার ঘরগুলি কাল আমরা বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম। এক সারিতে গুটি তিনেক ঘর; প্রত্যেক ঘরে তক্তপোশের উপর জাজিম পাতা। কয়েকজন কেরানী বসিয়া কাজ করিতেছে। ম্যানেজার গঙ্গাধর যখন দেখিলেন আমাদের এড়াইতে পারিবেন না, তখন তিনি সেরেস্তা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার হাতে এক তাড়া বহির্গামী চিঠি। আমাদের যেন এই মাত্র দেখিতে পাইয়াছেন এমনিভাবে মুখে একটি সচেষ্ট হাসি আনিয়া বলিলেন, 'এই যে!'

ব্যোমকেশ চিঠিগুলি লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'দেওয়ানজি, আপনার সেরেস্তা থেকে রোজ কত চিঠি ডাকে যায়?'

দেওয়ানজি চিঠিগুলি একজন পিওনের হাতে দিলেন, পিওন সেগুলি লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল, বাড়ির কোণে যে ডাক-বাক্স আছে তাহাতেই ফেলিতে গেল সন্দেহ নাই। দেওয়ানজি বলিলেন, 'তা কুড়ি-পঁচিশ-খানা যায়। অনেক লোককে চিঠি দিতে হয়—উকিল মোক্তার খাতক প্রজা—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বাড়ির কোণে যে ডাক-বাক্সটা আছে তাতেই সব চিঠিপত্র ফেলা হয়?'

গঙ্গাধর বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। ও ডাক-বাক্সটা আমরা ডাক বিভাগের সঙ্গে লেখালেখি করে ওখানে বসিয়েছি। হাতের কাছে একটা ডাক-বাক্স থাকলে

সুবিধা হয়।'

'তা তো বটেই। ক'বার ক্লিয়ারেন্স হয়?'

'একবার ভোর সাতটায়, একবার বিকেল চারটেয়। কিন্তু কেন বলুন দেখি? ডাক-বাক্সের সঙ্গে আপনাদের তদন্তের কোনও সম্পর্ক আছে নাকি?'

'থাকতেও পারে। দেওয়ানজি, আমাদের ভাষায় এক বয়েৎ আছে—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার লুকানো রতন। কিন্তু যাক ও কথা। এদিকের খবর কি?

গঙ্গাধর হাত উল্টাইয়া বলিলেন, 'খবর আমি তো কিছুই জানি না। এমন কি মালিকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ পর্যন্ত এখনও জানতে পারিনি। সত্যিই কি ইন্‌জেকশনে বিষ ছিল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তারেরা তো তাই বলেছেন। ভাল কথা, ডাক্তার পালিতের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

গঙ্গাধর বংশীর মুখখানি হঠাৎ যেন চুপসিয়া গেল, চক্ষু দুটি কোটরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তিনি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ঈষৎ স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'দেখা হয়েছিল। তিনি টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করছেন।'

'আপনি কি নিজের হাতে টাকা দিয়েছিলেন?'

গঙ্গাধর আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন 'না, অ্যাসিস্‌ট্যান্ট ম্যানেজার টাকা দিয়েছিল।'

'অ্যাসিস্‌ট্যান্ট ম্যানেজার মানে—আপনার ছেলে লীলাধর বংশী?'

গঙ্গাধর বুজিয়া যাওয়া কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। মুশকিল হয়েছে, রসিদ নেওয়া হয়নি। ডাক্তার পালিত যে এ রকম করবেন—'

'সত্যিই তো—ভাবাও যায় না। তা লীলাধরবাবু এখন কোথায়?'

'সে সে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে।'

'তাই নাকি! কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানে ছিলেন, দেবনারায়ণের ঘরে বসে তাড়ি খাচ্ছিলেন, আজ একেবারে শ্বশুরবাড়ি।'

গঙ্গাধর অস্পষ্ট জড়িতস্বরে বলিলেন, 'তার স্ত্রীর অসুখ...হঠাৎ খবর পেয়ে চলে গেছে।'

'হুঁ' ব্যোমকেশের চোখে দুষ্ট-বুদ্ধি নাচিয়া উঠিল, সে তখন চিন্তা-মন্থর ভঙ্গীতে বলিল, 'টাকা তো কম নয়—বারো হাজার। স্টেটের এতগুলো টাকা মারা যাবে, দেওয়ানজি, আপনার উচিত পুলিশে এত্তেলা দেওয়া। রসিদ না দিলেও টাকা যে ডাক্তার পালিত নিয়েছেন তা পুলিশ অনুসন্ধান করে বার করতে পারবে। কি বলেন পান্ডেজি?'

পান্ডেজি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'নিশ্চয়। ম্যানেজার সাহেব বলুন, আমরা এখনি তদন্ত আরম্ভ করছি। দপ্তরের সমস্ত কাগজপত্র আমরা পরীক্ষা করে দেখব; যদি কোথাও গরমিল থাকে ধরা পড়বেই। ডাক্তার পালিত এবং লীলাধরকেও জেরা করব, তাঁদের তল্লাসী নেব—'

ব্যোমকেশ ও পান্ডেজি মিলিয়া ম্যানেজার সাহেবকে কোন অতট প্রপাতের কিনারায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছেন তাহা অনুমান করা তাঁহার মত গভীর জলের মাছের পক্ষে কঠিন নয়। তিনি উদাসভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না, ডাক্তার পালিত যখন অস্বীকার করছেন তখন আমিই ও-টাকা পুরিয়ে দেব। আমার

লোকসানের বরাত, গচ্ছা দিতে দিতেই জন্ম কেটে গেল।' বলিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিল। পাণ্ডেজি গলার মধ্যে একটা আওয়াজ করিলেন, কিন্তু আওয়াজটা সহানুভূতিসূচক নয়।

দেওয়ানজিকে সেরেস্তায় রাখিয়া আমরা বাড়ির সদরে উপস্থিত হইলাম। বাহিরের হল-ঘরে একজন সিপাহী পাহারায় ছিল; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, বাড়ির সবাই উপর তলায় আছে। আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া আছে চাঁদনী; চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ, মাথার চুল এলোমেলো। তাহার চেহারা যদি স্বভাবতই মিষ্ট এবং নরম না হইত তাহা হইলে বলিতাম, রণরঙ্গিনী মূর্তি। সে আমাদের দেখিবামাত্র কোনও প্রকার ভূমিকা না করিয়া আরম্ভ করিল, 'আপনারা নাকি চাচিজির কাছে আমার যাওয়া বারণ করে দিয়েছেন! কী ভেবেছেন আপনারা? আমি চাচিজিকে বিষ খাওয়াব?'

অতর্কিত আক্রমণে আমরা বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। ব্যোমকেশ অসহায়ভাবে পাণ্ডেজির পানে চাহিল, পাণ্ডেজি মাথা চুলকাইয়া অপ্রস্তুতভাবে বলিলেন, 'দেখুন, শুধু আপনাকেই বারণ করা হয়নি, ওঁর কাছে এখন কারুরই যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আর দু'চার দিনের মধ্যেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার আপনারা ওঁর কাছে যেতে পারবেন।'

চাঁদনী আবেগভরে বলিল, 'কিন্তু কেন? আমি ওঁর যেমন সেবা করতে পারব আর কেউ কি তেমন পারবে? তবে কেন আমাকে ওঁর কাছে যেতে দেওয়া হবে না? উনি অসুস্থ, এতবড় শোক পেয়েছেন—'

চাঁদনীর চোখ দিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল। এবার পাণ্ডেজি অসহায়ভাবে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন।

ব্যোমকেশ এতক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে, সে শান্তকণ্ঠে বলিল, 'আপনি বোধহয় জানেন না, শকুন্তলা দেবী অন্তঃস্বত্ত্বা। তার ওপর এতবড় আঘাত পেয়েছেন। ওঁর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ, তাই মিস্ মান্নাকে ওঁর কাছে রাখা হয়েছে। আপনারা ওঁর নিজের লোক, আপনারা ওঁর কাছে বেশি যাওয়া-আসা করলে ওঁর মন আরও বিক্ষিপ্ত হবে, তাতে ওঁর শরীরের অনিষ্ট হতে পারে। তাই ওঁর কাছ থেকে কিছুদিন আপনাদের দূরে থাকাই ভাল।'

ব্যোমকেশ কথা বলিতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদনী সম্মোহিতের ন্যায় স্থির চক্ষু হইয়া গিয়াছিল। ব্যোমকেশ থামিলে সে তন্দ্রাহতের মত অস্ফুট স্বরে বলিল, 'অন্তঃসত্ত্বা—' তারপর তেমনই মোহাচ্ছন্ন ভাবে নিজের মহলের দিকে ফিরিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'শুনুন। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে—' চাঁদনী ফিরিয়া দাঁড়াইল—'দীপনারায়ণবাবুকে যখন ইন্‌জেকশন দেওয়া হয় তখন আপনি উপস্থিত ছিলেন?'

প্রশ্নটা চাঁদনী পুরা শুনিতে পাইল কিনা বলা যায় না, অস্পষ্টভাবে বলিল, 'ছিলাম।'

'সেখানে আর কেউ ছিল?'

'জানি না। লক্ষ্য করিনি।'

'মন দিয়ে আমার প্রশ্ন শুনুন। ডাক্তারবাবু কি কি করলেন মনে করবার চেষ্টা করুন।'

'ডাক্তারবাবু ইন্‌জেকশন দিতেই চাচাজি এলিয়ে পড়লেন। তখন ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি আর একটা ইন্‌জেকশন দিলেন। আমি ছুটে গেলাম চাচিজিকে খবর দিতে। ফিরে এসে দেখি সব শেষ হয়ে গেছে।'

'ফিরে এসে সেখানে আর কাউকে দেখেছিলেন?'

'মনে নেই। বোধহয় দেওয়ানজি ছিলেন, আর কাউকে লক্ষ্য করিনি।' চাঁদনী আর প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া নিজের মহলে চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ মাটির দিকে তাকাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে মুখ তুলিয়া বলিল, 'চলুন, এবার শকুন্তলা দেবীর ঘরে যাওয়া যাক।'

আগে আগে ব্যোমকেশ, পিছনে আমরা চলিলাম। বসিবার ঘর শূন্য, আসবাবগুলির উপর সূক্ষ্ম ধূলার আস্তরণ পড়িয়াছে। পরের ঘরটিও তাই। তৃতীয় কক্ষে, অর্থাৎ শকুন্তলার গানবাজনার ঘরের সম্মুখে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'দাঁড়ান, ছবিটা আর একবার দেখে নিই।'

ব্যোমকেশ ঘরে প্রবেশ করিল। আমরা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম, ছবি দেখিবার বিশেষ আগ্রহ আমাদের ছিল না।

যে দেয়ালে দুষ্মন্ত শকুন্তলার পূর্বরাগ চিত্রটি আঁকা ছিল ব্যোমকেশ সেই-দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। পাঁচ মিনিট আর তাহার দেখা নাই। আমি দরজা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলাম সে মগ্ন-সমাহিত হইয়া ছবি দেখিতেছে। আমি একটু শ্লেষ করিয়া বলিলাম, 'কি হে, একেবারে তন্ময় হয়ে গেলে যে! কী দেখছ এত?'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে ফিরিল। দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে, যেন একটা অভিভূত বিস্ময়াহত ভাব। সে আমার কথার উত্তর দিল না, মখমলের বিছানায় আসিয়া বসিল, উত্থিত হাঁটু দুটাকে বাহু দিয়া জড়াইয়া শূন্য পানে চাহিয়া রহিল।

তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া পাণ্ডেজি ও আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম। পাণ্ডেজি ঈষৎ উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, কি হয়েছে? ছবিতে কি দেখলেন?' ব্যোমকেশ এবারও উত্তর দিল না, পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া অতি যত্নে ধরাইল, তারপর সুদীর্ঘ টান দিয়া আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

আমি পাণ্ডেজির সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিলাম, তারপর দুজনে একসঙ্গে গিয়া ছবির সম্মুখে দাঁড়াইলাম। ছবি কাল যেমন দেখিয়াছিলাম, আজ দিনের আলোয় তাহার কোনও তফাৎ দেখিলাম না। শকুন্তলা তেমনি তরু আলবালে জল সেচন করিতেছেন, দুষ্মন্ত তেমনি গাছের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছেন। তবে ব্যোমকেশ হঠাৎ এমন বোবা হইয়া গেল কেন?

আমরা ফিরিয়া গিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে বসিলাম এবং একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। সে সিগারেট সম্পূর্ণ শেষ করিয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল, তারপর পাণ্ডেজির হাত ধরিয়া গাঢ় স্বরে বলিল 'একটি অনুরোধ রাখতে হবে।'

'কি অনুরোধ?'

'আমি একা শকুন্তলার ঘরে গিয়ে তাঁকে জেরা করব, সেখানে আর কেউ থাকবে না।'

'বেশ তো। কিন্তু কী পেলেন?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, 'সব পেয়েছি। আপনারাও তো ছবি দেখলেন, কিছু পেলেন না?'

পাণ্ডেজি ক্ষুব্ধভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'কৈ আর পেলাম। কাল রাত্রেও ছবি দেখেছি, আজও দেখলাম, কিন্তু রহস্যের চাবি তো পেলাম না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল রাত্রে নিওন-লাইটের নীল আলোতে দেখেছিলেন, কিন্তু আজ দিনের আলোয় দেখেছেন। আজ দেখতে না পাওয়ার কোনও কারণ নেই।• যাহোক, আপনারা সামনের ঘরে গিয়ে বসুন, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি।'

ব্যোমকেশ গিয়া শকুন্তলার দ্বারে টোকা দিল, দ্বার খুলিয়া মিস্ মান্না বাহিরে আসিলেন। ব্যোমকেশ নিম্নস্বরে তাঁহাকে কিছু বলিল, তিনি ঘাড় নাড়িয়া আমাদের কাছে চলিয়া আসিলেন। ব্যোমকেশ শকুন্তলার ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

তের

আমরা তিনজনে সামনের ঘরে গিয়া বসিলাম। মিস্ মান্না উৎসুক চোখে আমাদের পানে চাহিলেন। আমরা আর কী বলিব, নিজেরাই কিছু জানি না, মুখ ফিরাইয়া যামিনী রায়ের ছবি দেখিতে লাগিলাম।

পঁচিশ মিনিট পরে ব্যোমকেশ আসিল। তাহার মুখে চোখে কঠিন ক্লান্তি যেন বুদ্ধির যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অতি কষ্টে জয়ী হইয়াছে। সে মিস্ মান্নার পাশে বসিয়া নিম্ন কণ্ঠে তাঁহাকে নির্দেশ দিল। নির্দেশের মর্মার্থ ঃ আজ রাত্রি সওয়া দশটা পর্যন্ত এক লহমার জন্য তিনি শকুন্তলাকে চোখের আড়াল করিবেন না, বা অন্য কাহারও সহিত জনান্তিকে কথা বলিতে দিবেন না। সওয়া দশটার পর মিস্ মান্নার ছুটি, তিনি তখন নিজের বাসায় ফিরিয়া যাইবেন। মিস্ মান্না নির্দেশ শুনিয়া পাণ্ডেজির প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, প্রত্যুত্তরে পাণ্ডেজি ঘাড় হেলাইয়া সায় দিলেন। মিস্ মান্না তখন শকুন্তলার ঘরে চলিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ পর্যায়ক্রমে আমার ও পাণ্ডেজির মুখের পানে চাহিয়া শুষ্ক হাসিল, 'চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কিন্তু—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'এখানে নয়। বাড়ি যেতে যেতে সব বলব।'

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ি হইতে বাহির হইবার পূর্বে জলযোগ করিতে করিতে ব্যোমকেশ আড় চোখে সত্যবতীর পানে চাহিয়া বলিল, 'আজ আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে।'

সত্যবতী মুখ ভার করিয়া বলিল, 'তা তো হবেই। আজ অমাবস্যা, তার ওপর আমি বেরুতে মানা করেছি, আজ দেরি হবে না তো কবে হবে!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ অমাবস্যা নাকি! আরে খুব লাগসৈ হয়েছে তো।'

সত্যবতী বলিল, 'হয়েছে বুঝি? ভাল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত কবি মানুষ, ওকে জিগ্যেস কর, অভিসার করবার জন্যে অমাবস্যার রাত্রিই প্রশস্ত।'

'তা সারা রাত্রি ধরেই কি অভিসার চলবে?'

'আরে না না, বারোটা-একটার মধ্যেই ফিরব।'

সত্যবতী চকিত উদ্বেগ ভরে চাহিল, 'বারোটা-একটা?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে লঘুস্বরে বলিল, 'তুমি ভেবো না। ফিরে এসে তোমাকে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার উপাখ্যান শোনাব।—চল অজিত।'

সত্যবতী শঙ্কিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, আমরা বাহির হইলাম।

আমরা পাণ্ডেজির বাসায় না গিয়া সটান দীপনারায়ণের বাড়িতে গেলাম সেইরূপই কথা ছিল। পাণ্ডেজি বাহিরের হল-ঘরে গদি-মোড়া চেয়ারে বসিয়া দুই পা সম্মুখ দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন, আমাদের দেখিয়া খাড়া হইয়া বসিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'রতিকান্ত বক্সার থেকে এখনও ফেরেন নি?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'না। থানায় খবর দেওয়া আছে। ফিরেই এখানে আসবে।'

অতঃপর আমরা তিনজনে বসিয়া নীরবে সিগারেট টানিতে লাগিলাম। অন্ধকার হইলে পাণ্ডেজি উঠিয়া একটা আলো জ্বালিয়া দিলেন, তাহাতে ঘরের কিয়দংশ আলোকিত হইল মাত্র।...ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী একবার বাহির হইতে উঁকি মারিয়া নিঃসাড়ে অপসৃত হইলেন। চাঁদনী নীচে নামিয়া আসিয়া আমাদের দেখিয়া চুপি চুপি আবার উপরে উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা চাকর আসিয়া তিন পেয়ালা চা দিয়া গেল। আমরা চা পান করিলাম।...বাড়িটা যেন ভুতুড়ে বাড়ি: শব্দ নাই, ঘরের আনাচে কানাচে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা তিনটি প্রতীক্ষমান প্রেতাত্মার মত বসিয়া আছি: কেন বসিয়া আছি তাহা গভীর রহস্যে আবৃত।

পৌনে আটটার সময় রতিকান্ত আসিল। পরিধানে আগাগোড়া পুলিশ বেশ চোখে চাপা উত্তেজনা। সে পাণ্ডেজিকে স্যালুট করিয়া তাঁহার পাশের চেয়ারের কিনারায় বসিল, পাণ্ডেজির দিকে ঝুঁকিয়া বলিল, 'প্রমাণ পেয়েছি—ডাক্তার পালিতের কাজ।'

পাণ্ডেজি তীক্ষ্ন নেত্রে রতিকান্তের পানে চাহিয়া রহিলেন, বলিলেন, 'প্রমাণ পেয়েছ? কি প্রমাণ-'

রতিকান্ত বলিল, 'কয়েদীটা স্বীকার করেছে। প্রথমে কিছুই বলতে চায় না, অনেক জেরা করার পর স্বীকার করল যে, পালিত তার কাছে কিউরারি কিনেছে।'

'তাই নাকি?' পাণ্ডেজি যেন আত্ম-সমাহিত হইয়া পড়িলেন।

রতিকান্ত উৎসুকভাবে বলিল, 'তাহলে এবার বোধহয় পালিতকে অ্যারেস্ট করা যেতে পারে?'

'দাঁড়াও, অত তাড়াতাড়ি নয়। একটা ছিঁচ্কে চোরের সাক্ষীর ওপর ডাক্তার পালিতের মত লোককে অ্যারেস্ট করা নিরাপদ নয়। এদিকে আমরাও কিছু খবর সংগ্রহ করেছি—' বলিয়া পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। রতিকান্ত উচ্চকিত হইয়া ব্যোমকেশের পানে চোখ ফিরাইল, 'কি খবর?'

'বলছি'—ব্যোমকেশ একবার সতর্কভাবে বৃহৎ কক্ষের চারিদিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল, তারপর চেয়ার টানিয়া রতিকান্তের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। আবছায়া আলোয় চারিটি মাথা একত্রিত হইল। চুপি চুপি কথা হইতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ সকালবেলা শকুন্তলা দেবীকে জেরা করেছিলাম। প্রথমটা তিনি চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়লেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে অপরাধীকে তিনি চেনেন, অপরাধী তাঁর—গুপ্ত-প্রণয়ী।...' ব্যোমকেশ চুপ করিল। রতিকান্ত নির্নিমেষ চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল, 'কিন্তু মুশকিল হয়েছে, কিছুতেই অপরাধীর নাম বলছেন না।'

রতিকান্ত বলিয়া উঠিল, 'নাম' বলছেন না।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, 'না। শকুন্তলা স্ত্রীলোক, তাঁর লজ্জা সঙ্কোচ আছে, কলঙ্কের ভয় আছে, তাই তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অনেক চেষ্টা করেও অপরাধীর নাম তাঁর মুখ থেকে বার করতে পারলাম না।'

রতিকান্ত সোজা হইয়া বসিল, ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, 'আমি একবার চেষ্টা করে দেখব? আমি যদি একলা গিয়ে তাঁকে জেরা করি, তিনি হয়তো নামটা বলতে পারেন।'

পাণ্ডেজি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'এখন আর হবে না, তিনি মুখ ফুটে কিছু বলবেন না। তবে অন্য একটা উপায় হয়েছে--'

'কি উপায় হয়েছে?' রতিকান্ত পাণ্ডেজির দিক হইতে ব্যোমকেশের দিকে চক্ষু ফিরাইল।

ব্যোমকেশ গলা আরও খাটো করিয়া বলিল, 'অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর শকুন্তলা রাজী হয়েছেন, চিঠি লিখে পাণ্ডেজিকে অপরাধীর নাম জানাবেন। ব্যবস্থা হয়েছে, এখানে যে সব পুলিশ মোতায়েন আছে তাদের সরিয়ে নেওয়া হবে। শকুন্তলার কাছে থাকবেন শুধু মিস্ মান্না। আর কাউকে তাঁর কাছে যেতে দেওয়া হবে না। রাত্রি দশটা সওয়া দশটার মধ্যে মিস্ মান্না শকুন্তলাকে একলা রেখে নিজের বাসায় ফিরে যাবেন। তখন শকুন্তলা চিঠি লিখে নিজের হাতে ডাক-বাক্সে ফেলে আসবেন। লোকাল চিঠি, কাল বেলা দশটা-এগারোটার সময় আমরা সে চিঠি' পাব।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না, চারিটি মুণ্ড একত্রিত হইয়া রহিল। শেষে রতিকান্ত বলিল, 'তাহলে আপনাদের মতে ডাক্তার পালিত অপরাধী নয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার পালিতও হতে পারে, এখনও কিছু বলা যায় না। আবার নর্মদাশঙ্করও হতে পারে। কাল নিশ্চয় জানা যাবে।' বলিয়া সকালবেলা নর্মদাশঙ্করের বাড়িতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বিবৃত করিল।

শুনিয়া রতিকান্ত চুপ করিয়া রহিল। পাণ্ডেজি হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, 'আজ তাহলে ওঠা যাক। ব্যোমকেশবাবু, আপনারাও চলুন আমার বাসায়। রতিকান্ত, তুমিও চল, সবাই মিলে কেসটা আলোচনা করা যাবে। তুমি আজ সারাদিন ছিলে না, ইতিমধ্যে অনেক ব্যাপার ঘটেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা কিন্তু আজ সকাল সকাল বাড়ি ফিরব। গিন্নী ভীষণ রেগে আছেন।'

আমরা বাহিরে আসিলাম। রতিকান্ত জমাদারকে ডাকিয়া পাহারা তুলিয়া লইতে বলিল। তারপর চারজনে পাণ্ডেজির মোটরে চড়িয়া বাহির হইলাম।

বহ্নি ও পতঙ্গের কাহিনী শেষ হইয়া আসিতেছে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, এ কাহিনীর শেষ নাই, সারা সংসার জুড়িয়া আবহমান কাল এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি চলিতেছে। কখনও পতঙ্গ তিল তিল করিয়া পুড়িয়া মরে, কখনও মুহূর্তমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

বক্ষ্যমান বহ্নি ও পতঙ্গের খেলা শেষ হইয়া যাইবার পর আমি ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'আচ্ছা ব্যোমকেশ, এখানে পতঙ্গ কে? বহ্নিই বা কে?'

ব্যোমকেশ বলিয়াছিল, 'দুজনেই বহ্নি, দুজনেই পতঙ্গ।'

কিন্তু থাক। পরের কথা আগে বলিয়া রসভঙ্গ করিব না। সে রাত্রে সাড়ে আটটা বাজিতেই ব্যোমকেশ ও আমি পাণ্ডেজির বাড়ি হইতে বাহির হইলাম; পাণ্ডেজি ও রতিকান্ত বসিয়া কেস্ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। বক্সার হইতে রতিকান্ত কয়েদীর যে জবানবন্দী লিখিয়া আনিয়াছিল তাহারই আলোচনা।

বাহিরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাস্তার ধারে আলো দু' একটা আছে বটে কিন্তু তাহা রাত্রির তিমির দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পাটনার পথঘাট ভাল চিনি না, এই অমাবস্যার রাত্রে চেষ্টা করিয়া কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিব এ আশা সুদূরপরাহত। আমরা মনে মনে একটা দিক আন্দাজ করিয়া লইয়া হোঁচট খাইতে খাইতে চলিলাম। মনের এমন অগোছালো অবস্থা যে একটা বৈদ্যুতিক টর্চ আনিবার কথাও মনে ছিল না। ভাগ্যক্রমে কিছুদূর যাইতে না যাইতে ঠুন্‌ঠুন্ ঝুন্‌ঝুন্ আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। একটা ধোঁয়াটে আলো মন্থর গতিতে আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কাছে আসিলে একটি এক্কার আকৃতি অস্পষ্টভাবে রূপ পরিগ্রহ করিল। ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া হাঁকিল—'দাঁড়া। ভাড়া যাবি?'

এক্কা দাঁড়াইল। আপাদমস্তক কম্বলে মোড়া এক্কাওয়ালার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, 'না বাবু, আমার ঘোড়া থকে আছে!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশি দূর নয়, দীপনারায়ণ সিংয়ের বাড়ি। যাবি তো চল, বকশিস পাবি।'

এক্কাওয়ালা বলিল, 'আসুন বাবু, আমার আস্তাবল ওই দিকেই।'

আমরা এক্কার দুই পাশে পা ঝুলাইয়া বসিলাম। এক্কাওয়ালা চাবুক ঘুরাইয়া মুখে টকাস টকাস শব্দ করিল। ঘোড়া ঝুন্‌ঝুন্ শব্দ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

চোদ্দ

দশ মিনিট পরে ব্যোমকেশ এক্কা থামাইতে বলিল। আমি এক্কা হইতে নামিয়া ধোঁয়াটে আলোয় ঠাহর করিয়া দেখিলাম, দীপনারায়ণ সিংয়ের বাড়ির কোণে ডাক-বাক্সের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ব্যোমকেশ এক্কাওয়ালাকে ভাড়া ও বকশিস দিল।

'সালাম বাবুজি।'

অন্ধকার-সমুদ্রে ভাসমান ধোঁয়াটে আলোর একটা বুদ্বুদ ঝুন্‌ঝুন্‌ শব্দ করিতে করিতে দূরে মিশাইয়া গেল। আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরে নিমজ্জিত হইলাম।

'এবার কী? দেশলাই জ্বালব?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার পূর্বেই চোখের উপর তীব্র আলো জ্বলিয়া উঠিল, হাত দিয়া চোখ আড়াল করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'কে—সাব-ইন্সপেক্টর তিওয়ারী?'

'জি।' তিওয়ারী টর্চের আলো মাটির দিকে নামাইয়া আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাটি হইতে উত্থিত আলোর ক্ষীণ প্রতিভাস আমাদের তিনজনের মুখে পড়িল। সকলের গায়ে কালো পোশাক, তিওয়ারীর কালো কোটের পিত্তলের বোতামগুলি চিক্‌মিক্‌ করিতেছে।

'আপনার সঙ্গে ক'জন আছে?'

'দু'জন।' বলিয়া তিওয়ারী আলো একটু পিছন দিকে ফিরাইল। দুইটি লিকলিকে প্রেতাকৃতি পুলিশ জমাদার তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ, দু'জনই যথেষ্ট। কি করতে হবে ওদের বলে দিয়েছেন?'

'জি।'

'তাহলে এবার একে একে গাছে ওঠা যাক। অজিত, তুমি সামনের গাছটাতে ওঠো। চুপটি করে গাছের ডালে বসে থাকবে, সিগারেট খাবে না। বাঁশীর আওয়াজ যতক্ষণ না শুনতে পাও ততক্ষণ গাছ থেকে নামবে না।-- তিওয়ারীজি, টর্চটা আমাকে দিন।'

টর্চ লইয়া ব্যোমকেশ একটা আম গাছের উপর আলো ফেলিল। ডাক-বাক্স হইতে পাঁচ-ছয় হাত দূরে বেশ বড় আম গাছ, গুঁড়ির স্কন্ধ হইতে মোটা ডাল বাহির হইয়াছে। গাছে পিঁপড়ের বাসা আছে কিনা জল্পনা করিতে করিতে আমি গাছে উঠিয়া পড়িলাম।

'ব্যস্‌ আর উঁচুতে উঠো না।'

আমি দুইটা ডালের সন্ধিস্থলে সাবধানে বসিলাম। গাছে চড়িয়া লাফালাফি করার বয়স অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, একটু ভয়-ভয় করিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা। সব কথা মনে আছে তো?'

'আছে। বাঁশী শুনলেই বিরহিণী রাধার মত ছুটব।'

ব্যোমকেশ তখন অন্য তিনজনকে লইয়া পাঁচিলের সমান্তরালে ভিতর দিকে চলিল। দুই তিনটা গাছ বাদ দিয়া আর একটা গাছে একজন জমাদার উঠিল। তারপর তাহারা আরও দূরে চলিয়া গেল, কে কোন্‌ গাছে উঠিল দেখিতে পাইলাম

না। ঘন পত্রান্তরাল হইতে কেবল সঞ্চরমান বৈদ্যুতিক টর্চের প্রভা চোখের সামনে খেলা করিতে লাগিল।

তারপর বৈদ্যুতিক টর্চও নিভিয়া গেল।

হাতের ঘড়ি চোখের কাছে আনিয়া রেডিয়াম-নির্দেশ লক্ষ্য করিলাম—ন'টা বাজিয়া দশ মিনিট। অন্তত এক ঘণ্টার আগে কিছু ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না।

বসিয়া আছি। ভাগ্যে বাতাস নাই, শীতের দাঁত তাই মর্মান্তিক কামড় দিতে পারিতেছে না। তবু থাকিয়া থাকিয়া হাড়-পাঁজরা কাঁপিয়া উঠিতেছে দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হইয়া যাইতেছে।

আম বাগান সম্পূর্ণ নিঃশব্দ নয়। গাছের পাতাগুলো যেন উসখুস করিতেছে, ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে, অন্ধকারে শ্রবণ শক্তি তীক্ষ্ণ হইয়াছে তাই শুনিতে পাইতেছি। একবার মাথার উপর একটা পাখি—বোধহয় প্যাঁচা - চ্যাঁ চ্যাঁ শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল, সম্ভবত গাছের মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইয়াছে। চকিতে চোখ তুলিয়া দেখি গাছপালার ফাঁক দিয়া দুই চারটি তারা দেখা যাইতেছে।

বসিয়া আছি। পৌনে দশটা বাজিল। সহসা সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হইয়া উঠিল। চোখে কিছু দেখিলাম না, কানেও কোনও শব্দ আসিল না, কেবল অনুভব করিলাম, আমার গাছের পাশ দিয়া কে যেন ভিতর দিকে চলিয়া গেল' কে চলিয়া গেল। পাণ্ডেজি! কিম্বা—!

একটা ভিজা-ভিজা বাতাস আসিয়া মুখে লাগিল। ঊর্ধ্বে চাহিয়া দেখিলাম, তারাগুলি নিষ্প্রভ হইয়া আবার উজ্জ্বল হইল। বোধহয় কাল রাত্রির মত আকাশে কুয়াশা জমিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হ্যাঁ, কুয়াশাই বটে। তারাগুলিকে আর দেখা যাইতেছে না। গাছের পাতায় কুয়াশা জমিয়া জল হইয়া নীচে টোপাইতেছে—চারিদিক হইতে মৃদু শব্দ উঠিল টপ্ টপ্ টপ্ টপ্।

প্রবল ইচ্ছা হইল ধূমপান করি। দাঁতে দাঁত চাপিয়া ইচ্ছা দমন করিলাম,

ঘড়িতে সওয়া দশটা। আমি গাছের ডালের উপর খাড়া হইয়া বসিলাম। দীপনারায়ণের হাতার ভিতরে যেন একটা গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। তারপর একটা মোটর হাতা হইতে বাহির হইয়া বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। গাড়ির হেড-লাইটের ছটা কুয়াশার গায়ে ক্ষণেক তাল পাকাইল, তারপর আবার অন্ধকার।

বোধহয় মিস্ মান্না নিজের বাসায় ফিরিয়া গেলেন। •

এইবার! দশ মিনিট স্নায়ু-পেশী শক্ত করিয়া বসিয়া রহিলাম, কিছুই ঘটিল না। তারপর হঠাৎ- খিড়কির দরজার দিকে দপ্ করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পরম্পরায় তিন-চারবার পিস্তলের আওয়াজ হইল। পিস্তলের আওয়াজের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, আমি মুহূর্তকাল নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া গেলাম।

চমক ভাঙিল পুলিশ হুইসলের তীব্র শব্দে। আমি গাছের ডাল হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলাম। মাটি কত দূরে তাহা ঠাহর করিতে পারি নাই, সারা গায়ে প্রবল ঝাঁকানি লাগিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম খিড়কির কাছে গোটা তিনেক টর্চ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আমি সেই দিকে ছুটিলাম।

ছুটিতে ছুটিতে আর একবার পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তারপর পায়ে শিকড় লাগিয়া আছাড় খাইলাম। উঠিয়া আবার ছুটিলাম। হাত-পা

অক্ষত আছে কিনা অনুভব করিবার সময় নাই। যেখানে আর সকলেই দাঁড়াইয়াছিল হুড়মুড় করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম।

খিড়কি দরজার কাছে একটা স্থান ঘিরিয়া পাঁচজন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাণ্ডেজির হাতে রিভলবার, তিওয়ারী ও দুইজন জমাদারের হাতে টর্চ, ব্যোমকেশ কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া। তিনটি টর্চের আলো একই স্থানে পড়িয়াছে। পাঁচ জোড়া চক্ষুও সেই স্থানে নিবদ্ধ।

দুইটি মৃতদেহ মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে; একজন স্ত্রীলোক, অন্যটি পুরুষ। স্ত্রীলোকটি শকুন্তলা, আর পুরুষ—রতিকান্ত।

রতিকান্তের নীল চক্ষু দুটা বিস্ময় বিস্ফারিত; ডান হাতের কাছে একটা পিস্তল পড়িয়া আছে, বাঁ হাতের আঙুলগুলা একটা সাদা রঙের খাম আঁকড়াইয়া আছে। শকুন্তলার মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না। গায়ে কালো রঙের শাল জড়ানো। বুকের কাছে থোলো থোলো রক্ত-করবীর মত কাঁচা রক্ত।

ব্যোমকেশ নত হইয়া রতিকান্তের আঙুলের ভিতর হইতে খামটা বাহির করিয়া লইয়া নিজের পকেটে পুরিল।

পনের

পাণ্ডেজির বাড়িতে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ। অতিথির সংখ্যা বাড়িয়াছে; ডাক্তার পালিত, মিস্ মান্না, ব্যোমকেশ ও আমি। টেবিল ঘিরিয়া খাইতে বসিয়াছি। আহার্য দ্রব্যের মধ্যে প্রধান—মুর্গীর কাশ্মীরী কোর্মা।

ব্যোমকেশ এক টুকরা মাংস মুখে দিয়া অর্ধ-নিমীলিত চক্ষে আস্বাদ গ্রহণ করিল, তারপর গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, 'পাণ্ডেজি, আমি চুরি করব।'

পাণ্ডেজি হাসিমুখে ভ্রূ তুলিলেন, 'কী চুরি করবেন?'

'আপনার বাবুর্চিকে।'

পাণ্ডেজি হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, 'অসম্ভব।'

'অসম্ভব কেন?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমার বাবুর্চি আমি নিজেই।'

'অ্যাঁ—এই অমৃত আপনি রেঁধেছেন! তবে আর আপনার পুলিশের চাকরি করার কি দরকার? একটি হোটেল খুলে বসুন, তিন দিনে লাল হয়ে যাবেন।'

কিছুক্ষণ হাস্য-পরিহাস চলিবার পর মিস্ মান্না বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আমাকে কিন্তু আপনারা ফাঁকি দিয়েছেন। সে হবে না, সব কথা আগাগোড়া বলতে হবে। কি করে কি হ'ল সব বলুন, আমি শুনব।'

ডাক্তার পালিত বলিলেন, 'আমিও শুনব। এ ক'দিন আমি আসামী কিনা এই ভাবনাতেই আধমরা হয়ে ছিলাম। এবার বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন মুখ চলছে। খাওয়ার পর বলব।'

আকণ্ঠ আহার করিয়া আমরা বাহিরে আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ গড়গড়ার নল হাতে লইল, ডাক্তার পালিত একটি মোটা চুরুট ধরাইলেন।

মিস্ মান্না পান জর্দা মুখে দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, 'এবার আরম্ভ করুন!'

ব্যোমকেশ গড়গড়ার নলে কয়েকটি মন্দ-মন্থর টান দিয়া ধীরে ধীরে বলিতে

আরম্ভ করিল।

'এই ঘরেই রতিকান্তকে প্রথম দেখেছিলাম। পাণ্ডেজিকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। সুন্দর চেহারা, নীল চোখ। দীপনারায়ণ সিংয়ের উদ্দেশ্যে হাল্কা ব্যঙ্গ করে বলেছিল-- বড় মানুষ কুটুম্ব। তখন জানতাম না ওই হাল্কা ব্যঙ্গের আড়ালে কতখানি বীষ লুকিয়ে আছে। তখন কিছুই জানতাম না, তাই 'কুটুম্ব' কথাটাও কানে খোঁচা দিয়ে যায়নি। এখন অবশ্য জানতে পেরেছি শকুন্তলা আর রতিকান্তের মধ্যে একটা দূর সম্পর্ক ছিল; দু'জনেরই বাড়ি প্রতাপগড়ে, দু'জনেই পড়ে-যাওয়া ঘরানা ঘরের ছেলে মেয়ে, দু'জনে বাল্য প্রণয়ী।

'রতিকান্ত সে-রাত্রে আমার পরিচয় জানতে পারেনি, পাণ্ডেজি কেবল বলেছিলেন,— আমার কলকাতার বন্ধু। তাতে তার মনে কোনও সন্দেহ হয়নি। যদি সে-রাত্রে সে জানতে পারত যে অধমের নাম ব্যোমকেশ বক্সী তাহলে সে কি করত বলা যায় না, হয়তো প্ল্যান বদলে ফেলত। কিন্তু তার পক্ষে মুশকিল হয়েছিল এই যে, পেছুবার আর সময় ছিল না, একেবারে শিরে সংক্রান্তি এসে পড়েছিল।

'শকুন্তলা আর রতিকান্তর গুপ্ত-প্রণয়ের অতীত ইতিহাস যত দূর আন্দাজ করা যায় তা এই। ওদের বিয়ের পথে সামাজিক বাধা ছিল, তাই ওদের দুরন্ত প্রবৃত্তি সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে গুপ্ত-প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছিল; ওদের উগ্র অসংযত মন আধুনিক স্বৈরাচারের সুযোগ নিয়েছিল পূর্ণ মাত্রায়। কিন্তু তবু সবই চুপি চুপি। নৈতিক লজ্জা না থাক, লোক লজ্জার ভয় ছিল, তার উপর 'চোরি পিরীত লাখগুণ রঙ্গ।' লুকিয়ে প্রেম করার মধ্যে একটা তীব্র মাধুর্য আছে।

'তারপর একদিন দীপনারায়ণ শকুন্তলাকে দেখে তার রূপ-যৌবনের ফাঁদে পড়ে গেলেন। শকুন্তলা দীপনারায়ণের বিপুল ঐশ্বর্য দেখল, সে লোভ সামলাতে পারল না। তাঁকে বিয়ে করল। কিন্তু রতিকান্তকেও ছাড়ল না। রতিকান্তর বিয়েতে মত ছিল কিনা আমরা জানি না। হয়তো পুরোপুরি ছিল না, কিন্তু শকুন্তলাকে ত্যাগ করাও তার অসাধ্য। শকুন্তলা বিয়ের পর যখন পাটনায় এল তখন রতিকান্তও যোগাড়যন্ত্র করে পাটনায় এসে বসল, বোধহয় মোহান্ধ দীপনারায়ণ সাহায্য করেছিলেন। ফলে ভিতরে ভিতরে আবার রতিকান্তর আর শকুন্তলার আগের সম্বন্ধ বজায় রইল। বিয়েটা হয়ে রইল ধোঁকার টাটি।

'কুটুম্ব হিসাবে রতিকান্ত দীপনারায়ণের বাড়িতে যাতায়াত করত, কিন্তু প্রকাশ্যে শকুন্তলার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা দেখাত না। তাদের সত্যিকারের দেখা সাক্ষাৎ হ'ত সকলের চোখের আড়ালে। শকুন্তলা চিঠি লিখে গভীর রাত্রে নিজের হাতে ডাক-বাক্সে ফেলে আসত; রতিকান্ত নির্দিষ্ট রাত্রে আসত, খিড়কির দরজা দিয়ে হাতায় ঢুকত, তারপর লোহার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেত। শকুন্তলা দোর খুলে প্রতীক্ষা করে থাকত--

'এইভাবে চলছিল, হঠাৎ প্রকৃতিদেবী বাদ সাধলেন। দীপনারায়ণের যখন গুরুতর অসুখ ঠিক সেই সময় শকুন্তলা জানতে পারল সে অন্তঃসত্ত্বা। এখন উপায়? অন্য সকলের চোখে যদি বা ধুলো দেওয়া যায়, দীপনারায়ণের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। দু'জনে মিলে পরামর্শ করল তাড়াতাড়ি দীপনারায়ণকে

সরাতে হবে; নৈলে মান-ইজ্জত রাজ-ঐশ্বর্য কিছুই থাকবে না, গালে চুণ কালি মেখে ভদ্রসমাজ থেকে বিদায় নিতে হবে।

'মৃত্যু ঘটাবার এই চোস্ত ফন্দিটা রতিকান্তের মাথা থেকে বেরিয়েছিল সন্দেহ নেই। দৈব যোগাযোগও ছিল; এক শিশি কিউরারি একটা ছিঁচকে চোরের কাছে পাওয়া গিয়েছিল। সেটা যখন রতিকান্তর হাতে এল, রতিকান্ত প্রথমেই খানিকটা কিউরারি সরিয়ে ফেলল। তারপর যথাসময় -রতিকান্ত নিজেই ডাক্তারবাবুর ডিস্‌পেনসারির তালা ভেঙে লিভারের ভায়াল বদলে রেখে এল, তারপর নিমন্ত্রণ-বাড়িতে গিয়ে খবর দিলে। সকলেই ভাবল ছিঁচকে চোরের কাজ।

'সেই রাত্রেই রতিকান্ত আমার নাম জানতে পারল। অনুবাদের কল্যাণে হিন্দী শিক্ষিত সমাজে আমার নামটা অপরিচিত নয়। রতিকান্ত ঘাবড়ে গেল; কিন্তু তখন আর উপায় নেই, হাত থেকে তীর বেরিয়ে গেছে।

'পরদিন সকালে ডাক্তারবাবু ইন্‌জেকশন দিলেন, দীপনারায়ণের মৃত্যু হ'ল। রতিকান্ত ভেবেছিল, কিউরারি বিষের কথা কারুর মনে আসবে না, সবাই ভাববে লিভার ইন্‌জেকশনের শকে মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তারবাবুও প্রথমে তাই ভেবে-ছিলেন, কিন্তু যখন কিউরারির কথা উঠল তখন তাঁর খটকা লাগল। তিনি বল্‌লেন, হতেও পারে।

'রতিকান্ত আগে থাকতে ঘাবড়ে ছিল, এখন সে আরও ঘাবড়ে গিয়ে একটা ভুল করে ফেললে। এই বোধহয় তার একমাত্র ভুল। সে ভাবল, দীপনারায়ণের শরীরে নিশ্চয় কিউরারি পাওয়া যাবে; এখন যদি লিভারের ভায়ালে কিউরারি না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের সন্দেহ হবে ডাক্তার পালিতই ভায়াল বদলে দিয়েছেন। রতিকান্তের কাছে একটা নির্বিষ লিভারের ভায়াল ছিল, যেটা সে ডাক্তার পালিতের ব্যাগ থেকে বদলে নিয়েছিল। সে অ্যানালিসিসের জন্যে সেই নির্বিষ ভায়ালটা পাঠিয়ে দিলে।

'যখন জানা গেল ভায়ালে বিষ নেই তখন ভারি ধোঁকা লাগল। শরীরে বিষ পাওয়া গেছে অথচ ওষুধে বিষ পাওয়া গেল না, এ কি রকম? দীপনারায়ণের মৃত্যুর পর কেবল তিনজনের হাতে ভায়ালটা গিয়েছিল— ডাক্তার পালিত, পাণ্ডেজি আর রতিকান্ত। পাণ্ডেজি আর রতিকান্ত পুলিশের লোক; সুতরাং ডাক্তার-বাবুরই কাজ, তিনি এই রকম একটা গোলমেলে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে পুলিশের মাথা গুলিয়ে দিতে চান। কিন্ত ডাক্তার পালিতের মোটিভ কি?

'ইতিমধ্যে দুটো মোটিভ পাওয়া গিয়েছিল- টাকা আর গুপ্ত-প্রেম। গুপ্ত-প্রেমের সন্দেহটা ডাক্তার পালিতই আমাদের মনে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। যদি গুপ্ত-প্রেমই আসল মোটিভ হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে, শকুন্তলার দুষ্মন্ত কে? আর যদি টাকা মোটিভ হয় তাহলে তিনজনের ওপর সন্দেহ—দেবনারায়ণ, চাঁদনী আর গঙ্গাধর বংশী। শকুন্তলাও কলঙ্ক এড়াবার জন্যে লোক লাগিয়ে স্বামীকে খুন করতে পারে। এদের মধ্যে যে কেউ ডাক্তার পালিতকে মোটা টাকা খাইয়ে নিজের কাজ হাসিল করে থাকতে পারে। একুনে সন্দেহভাজনের সংখ্যা খুব কম হল না; দেবনারায়ণ থেকে নর্মদাশংকর, ঘোড়া জগন্নাথ সকলেরই কিছু না কিছু স্বার্থ আছে।

'রতিকান্ত কিন্তু উঠে-পড়ে লেগেছিল দোষটা ডাক্তার পালিতের ঘাড়ে চাপাবে। সে বক্সারে গিয়ে কয়েদীর কাছ থেকে জবানবন্দী লিখিয়ে নিয়ে এল;

আমরা জানি এ-ধরনের কয়েদীকে হুমকি দিয়ে বা লোভ দেখিয়ে পুলিশ যে-কোনও জবানবন্দী আদায় করতে পারে। তাই আমরা রতিকান্তের মতলব বুঝে মনে মনে হাসলাম। রতিকান্তই যে অপরাধী তা আমরা তখন জানতে পেরেছি।

'অন্যদিকে ছোটখাটো দু' একটা ব্যাপার ঘটছিল। পিতা-পুত্র গঙ্গাধর আর লীলাধর মিলে বারো হাজার টাকা হজম করবার তালে ছিল। ওদিকে নর্মদাশংকর দীপনারায়ণের মৃত্যুতে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল, ভেবেছিল শকুন্তলার হৃদয়ের শূন্য সিংহাসন সেই এবার দখল করবে। সে জানত না যে শকুন্তলার হৃদয়-সিংহাসন কোনও কালেই শূন্য হয়নি।

'হঠাৎ সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, শকুন্তলার দুষ্মন্ত কে তা জানতে পারলাম। শকুন্তলা দেয়ালে একটা ছবি এঁকে ছিল। সেকালের শকুন্তলার পূর্বরাগের ছবি। প্রথম যে রাত্রে ছবিটা দেখি সে রাত্রে কিছু বুঝতে পারিনি, নীল আলোয় ছবির নীল-রঙ চাপা পড়ে গিয়েছিল। পরদিন দিনের আলোয় যখন ছবিটা দেখলাম এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। যেন কুয়াশায় চারিদিক ঝাপসা হয়ে ছিল, হঠাৎ কুয়াশা ফুঁড়ে সূর্য বেরিয়ে এল। ছবিতে দুষ্মন্তের চোখের মণি নীল।

'প্রেম বড় মারাত্মক জিনিস। প্রেমের স্বভাব হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করা, ব্যক্ত করা, সবাইকে ডেকে জানানো আমি ওকে ভালবাসি। অবৈধ প্রেম তাই আরও মারাত্মক। যেখানে পাঁচজনের কাছে প্রেম ব্যক্ত করবার উপায় নেই সেখানে মনের কথা বিচিত্র ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে। শকুন্তলা ছবি এঁকে নিজের প্রেমকে ব্যক্ত করতে চেয়েছিল। ছবিতে দুষ্মন্তের চেহারা মোটেই রতিকান্তের মত নয়, কিন্তু তার চোখের মণি নীল। 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান।' অজিত আর পাণ্ডেজিও ছবি দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা নীলচোখের ইশারা ধরতে পারেননি।

'এই ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যত লোক আছে তাদের মধ্যে কেবল রতিকান্তেরই নীল চোখ। সুতরাং রতিকান্তই শকুন্তলার প্রচ্ছন্ন প্রেমিক। মোটিভ এবং সুযোগ, বুদ্ধি এবং কর্ম-তৎপরতা সব দিক দিয়েই সে ছাড়া আর কেউ দীপনারায়ণের মৃত্যুর জন্যে দায়ী নয়।

'কিন্তু তাকে ধরব কি করে? শুধু নীল-চোখের প্রমাণ যথেষ্ট নয়। একমাত্র উপায়, যদি ওরা নিভৃতে পরস্পর দেখা করে, যদি ওদের এমন অবস্থায় ধরতে পারি যে অস্বীকার করবার পথ না থাকে।

'ফাঁদ পাতলাম। আমি একা শকুন্তলার সঙ্গে দেখা করে স্পষ্ট ভাষায় বললাম—তোমার দুষ্মন্ত কে তা আমি জানতে পেরেছি এবং সে কি করে দীপনারায়ণকে খুন করেছে তাও প্রমাণ করতে পারি। কিন্তু আমি পুলিশ নয়; তুমি যদি আমাকে এক লাখ টাকা দাও তাহলে আমি তোমাদের পুলিশে ধরিয়ে দেব না। আর যদি না দাও পুলিশ সব কথা জানতে পারবে। বিচারে তোমাদের দু'জনেরই ফাঁসি হবে। শকুন্তলা কিছুতেই স্বীকার করে না কিন্তু দেখলাম ভয় পেয়েছে। তখন বললাম—তোমাকে আজকের দিনটা ভেবে দেখবার সময় দিলাম। যদি এক লাখ টাকা দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে রাজী থাকো তাহলে আজ রাত্রে আমার নামে একটা চিঠি লিখে, নিজের হাতে ডাক-বাক্সে দিয়ে আসবে। চিঠিতে স্রেফ একটি কথা লেখা থাকবে—হাঁ। রাত্রি দশটার পর মিস্ মান্নাকে এখান থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা আমি করব, রাত্রে হাতায় পুলিশ

পাহারাও থাকবে না। যদি কাল তোমার চিঠি না পাই, আমার সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাণ্ডেজির হাতে সমর্পণ করব।

'ভয়-বিবর্ণ শকুন্তলাকে রেখে আমি চলে এলাম, মিস্ মান্না তার ভার নিলেন। এখন শুধু নজর রাখতে হবে শকুন্তলা আড়ালে রতিকান্তের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ না পায়। তারপর আমি পাণ্ডেজির সঙ্গে পরামর্শ করে বাকি ব্যবস্থা ঠিক করলাম। রাত্রে রতিকান্ত বক্সার থেকে ফিরলে তাকে এক নতুন গল্প শোনালাম, তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডেজির এখানে এলাম।

'আমি আর অজিত সকাল সকাল এখান থেকে বেরিয়ে দীপনারায়ণের বাড়ির পাশে আমবাগানে গেলাম; তিওয়ারী দু'জন লোক নিয়ে উপস্থিত ছিল, সবাই আম গাছে উঠে লুকিয়ে রইলাম। এদিকে পাণ্ডেজি রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত রতিকান্তকে আটকে রেখে ছেড়ে দিলেন, আর নিজে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। অন্ধকারে গাছের ডালে বসে শিকারের প্রতীক্ষা আরম্ভ হ'ল।

'আমি ছিলাম খিড়কির দরজার কাছেই একটা গাছে। পাণ্ডেজি এসে আমার পাশের গাছে উঠেছিলেন। নিঃশব্দ অন্ধকারে ছয়টি প্রাণী বসে আছি। দশটা বাজল। আকাশে কুয়াশা জমতে আরম্ভ করেছিল, গাছের পাতা থেকে টপ্ টপ শব্দে জল পড়তে লাগল। তারপর মিস্ মান্না মোটরে বাড়ি চলে গেলেন।

'রতিকান্ত কখন এসেছিল আমরা জানতে পারিনি। সে বোধ হয় একটু দেরি করে এসেছিল; পাণ্ডেজির কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে সে নিজের বাসায় গিয়েছিল, সেখান থেকে পিস্তল নিয়ে আম বাগানে এসেছিল।

'রতিকান্তের চরিত্র আমরা একটু ভুল বুঝেছিলাম যেখানেই দেখা যায় দু'জন বা পাঁচজন একজোট হয়ে কাজ করছে সেখানেই একজন সর্দার থাকে, বাকি সকলে তার সহকারী। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা ভেবেছিলাম শকুন্তলাই নাটের গুরু, রতিকান্ত সহকারী। আসলে কিন্তু ঠিক তার উল্টো। রতিকান্তের মনটা ছিল হিংস্র শ্বাপদের মত, নিজের প্রয়োজনের সামনে কোনও বাধাই সে মানত না। সে যখন শুনল যে শকুন্তলা চিঠি লিখে অপরাধীর নাম প্রকাশ করে দিতে রাজী হয়েছে তখনই সে স্থির করল শকুন্তলাকে শেষ করবে। তার কাছে নিজের প্রাণের চেয়ে প্রেম বড় নয়।

'আমরা ভেবেছিলাম রতিকান্ত শকুন্তলাকে বোঝাতে আসবে যে শকুন্তলা যদি অপরাধীর নাম প্রকাশ না করে তাহলে কেউ তাদের ধরতে পারবে না, শাস্তি দিতেও পারবে না। আমাদের প্ল্যান ছিল, যে-সময় ওরা এই সব কথা বলাবলি করবে ঠিক সেই সময় গিয়ে ওদের ধরব।

'রতিকান্ত কিন্তু সে-ধার দিয়ে গেল না। সে মনে মনে সংকল্প করেছিল অনিষ্টের জড় রাখবে না, সমূলে নির্মূল করে দেবে।

'শকুন্তলা কখন চিঠি হাতে নিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরুল আমরা জানতে পারিনি, চারিদিকের টপ্ টপ্ শব্দের মধ্যে তার পায়ের আওয়াজ ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু রতিকান্ত বোধহয় দোরের পাশেই ওৎ পেতে ছিল, সে ঠিক শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে দপ্ করে টর্চ জ্বলে উঠল, সেই আলোতে শকুন্তলার ভয়ার্ত মুখ দেখতে পেলাম। ওদের মধ্যে কথা হল না, কেবল কয়েকবার পিস্তলের আওয়াজ হ'ল। শকুন্তলা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

'আমার কাছে পুলিশ হুইস্ল ছিল, আমি সেটা সজোরে বাজিয়ে গাছ থেকে

লাফিয়ে পড়লাম। পাণ্ডেজিও গাছ থেকে লাফিয়ে নামলেন। তাঁর বাঁ হাতে টর্চ, ডান হাতে রিভলবার।

'রতিকান্ত নিজের টর্চ নিভিয়ে দিয়েছিল। পাণ্ডেজির টর্চের আলো যখন তার গায়ে পড়ল তখন সে পিস্তল পকেটে রেখে হাঁটু গেড়ে শকুন্তলার হাত থেকে চিঠিখানা নিচ্ছে। আহত বাঘের মত সে ফিরে তাকাল, তারপর বিদ্যুৎ-বেগে পকেট থেকে পিস্তল বার করল।

'কিন্তু পিস্তল ফায়ার করবার অবকাশ তার হল না, পাণ্ডেজির রিভলবারে একবার আওয়াজ হল—'

ব্যোমকেশ থামিলে ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ডাক্তার পালিতের চুরুট নিভিয়া গিয়াছিল, তিনি সেটা আবার ধরাইলেন। মিস্ মান্না একটা কম্পিত নিশ্বাস ফেলিলেন।

'শকুন্তলা ভাল মেয়ে ছিল না। কিন্তু—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। সে সম্মোহন মন্ত্র জানত।—চাঁদনী এখনও বিশ্বাস করে না যে শকুন্তলা দোষী।—'

আমি বলিলাম, 'ওদের জীবিত ধরতে পারলেই বোধহয় ভাল হত—'

পাণ্ডেজি মাথা নাড়িলেন, 'না, এই ভাল।'

রক্তের দাগ

এক

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম বসন্তঋতু আসিয়াছে। দক্ষিণ হইতে ঝিরঝির বাতাস দিতে আরম্ভ করিয়াছে, কলিকাতা শহরের এখানে-ওখানে যে দুই চারিটা শহুরে গাছ আছে তাহাদের অঙ্গেও আরক্তিম নব-কিশলয়ের রোমাঞ্চ ফুটিয়াছে। শুনিয়াছি এই সময় মনুষ্যদের গ্রন্থিগুলিতেও নূতন করিয়া রসসঞ্চার হয়।

ব্যোমকেশ তক্তপোশের উপর কাত হইয়া শুইয়া কবিতার বই পড়িতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, ওরে কবি সন্ধ্যা হয়ে এল। আজকাল বসন্তকালের সমাগম হইলেই মনটা কেমন উদাস হইয়া যায়। বয়স বাড়িতেছে।

সন্ধ্যার মুখে সত্যবতী আমাদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম সে চুল বাঁধিয়াছে, খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়াইয়াছে, পরনে বাসন্তী রঙের হাল্কা শাড়ি। অনেক দিন তাহাকে সাজগোজ করিতে দেখি নাই। সে তক্তপোশের পাশে বসিয়া হাসি-হাসি মুখে ব্যোমকেশকে বলিল, "কী রাতদিন বই মুখে করে পড়ে আছ। চল না কোথাও বেড়িয়ে আসি গিয়ে।"

ব্যোমকেশ সাড়া দিল না। আমি প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় বেড়াতে যাবে? গড়ের মাঠে?"

সত্যবতী বলিল, "না না, কলকাতার বাইরে। এই ধরো কাশ্মীর-কিম্বা "

ব্যোমকেশ বই মুড়িয়া আস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া বসিল, থিয়েটারী ভঙ্গীতে ডান হাত প্রসারিত করিয়া বিশুদ্ধ মন্দাক্রান্তা ছন্দে আবৃত্তি করিল—

"ইচ্ছা সম্যক্ ভ্রমণ গমনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিকলি মন উড়ুউড়ু
একি দৈবের শাস্তি।"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম, "এটা কোত্থেকে পেলে?"

'হুঁ হুঁ—বলব কেন?" ব্যোমকেশ আবার কাত হইয়া বই খুলিল।

হাতে কাজ না থাকিলে লোকে জ্যাঠার গঙ্গাযাত্রা করে, ব্যোমকেশ বাংলা সাহিত্যের পুরানো কবিদের লইয়া পড়িয়াছিল; ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কবিকে একে একে শেষ করিতেছিল। ভয় দেখাইয়াছিল, অতি আধুনিক কবিদেরও সে ছাড়িবে না। আমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কোন দিন হয়তো নিজেই কবিতা লিখিতে শুরু করিয়া দিবে। আজকাল ছন্দ ও মিলের বালাই ঘুচিয়া যাওয়ায় কবিতা লেখার আর কোনও অন্তরায় নাই। কিন্তু সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ কবিতা লিখিলে তাহা যে কিরূপ মারাত্মক বস্তু দাঁড়াইবে ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়। সেই যে খোকাকে একখানা "আবোল তাবোল" কিনিয়া দিয়াছিলাম, ব্যোমকেশের কাব্যিক প্রেরণার মূল সেইখানে। তারপর বইয়ের দোকানের অংশীদার হইয়া গোদের উপর বিষফোড়া হইয়াছে।

সত্যবতী ব্যোমকেশের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে একটি মোচড় দিয়া বলিল, "ওঠ

না। আবার শুনলে কেন?"

ব্যোমকেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কাশ্মীর যেতে কত খরচ জান?"

"কত?"

"অন্তত এক হাজার টাকা। অত টাকা পাব কোথায়?"

সত্যবতী রাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "জানি না আমি ও সব। যাবে কি না বল।"

"বললাম তো টাকা নেই।"

এই সময় বহির্দ্বারে টোকা পড়িল। বেশ একটি উপভোগ্য দাম্পত্য কলহের সূত্রপাত হইতেছিল, বাধা পড়িয়া গেল। সত্যবতী ব্যোমকেশকে কোপ-কটাক্ষে আধ-পোড়া করিয়া দিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরের আলো জ্বালিয়া দ্বার খুলিলাম। যে লোকটি দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া সহসা কিশোরবয়স্ক মনে হয়। বেশি লম্বা নয়, ছিপছিপে পাতলা গড়ন, গৌরবর্ণ সুশ্রী মুখে অল্প গোঁফের রেখা। বেশবাস পরিপাটি, পায়ে হরিণের চামড়ার জুতা হইতে গায়ে স্বচ্ছ মলমলের পাঞ্জাবি সমস্তই অনবদ্য।

"কাকে চান?"

"সত্যান্বেষী ব্যোমকেশবাবুকে।"

"আসুন।" দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম।

লোকটি ঘরে প্রবেশ করিয়া উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর সম্মুখে দাঁড়াইলে তাহার চেহারাখানা ভাল করিয়া দেখিলাম। যতটা কিশোর মনে করিয়াছিলাম ততটা নয়, বর্ণচোরা আম। চোখের দৃষ্টিতে দুনিয়াদারির ছাপ পড়িয়াছে, চোখের কোলে সূক্ষ্ম কালির আঁচড়, মুখের বাহ্য সৌকুমার্যের অন্তরালে হাড়ে পাক ধরিয়াছে। তবু বয়স বোধ করি পঁচিশের বেশি নয়।

ব্যোমকেশ তক্তপোশের পাশে বসিয়া আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল। সামনের চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "বসুন। কী দরকার আমার সঙ্গে?"

লোকটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না, চেয়ারে বসিয়া কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, "আপনাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে।"

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিল, "তাই নাকি! কাজটা কী?"

যুবক পাশের পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিল, ব্যোমকেশের সম্মুখে অবহেলা ভরে সেগুলি ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আমার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, আপনি আমার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করবেন। এই কাজ। পরে আপনার পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব হবে না, তাই আগাম দিয়ে যাচ্ছি। এক হাজার টাকা গুনে নিন।"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ কুঞ্চিত চক্ষে যুবকের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর নোটের তাড়া গুনিয়া দেখিল। একশত টাকার দশ কেতা নোট। নোটগুলিকে টেবিলের এক পাশে রাখিয়া ব্যোমকেশ অলসভাবে একবার আমার পানে চোখ তুলিল; তাহার চোখের মধ্যে একটু হাসির ঝিলিক খেলিয়া গেল। তারপর সে যুবকের মুখের উপর গম্ভীর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "আপনাকে কয়েকটা

প্রশ্ন করতে চাই। আপনার কাজ নেব কিনা তা নির্ভর করবে আপনার উত্তরের ওপর।"

যুবক সোনার সিগারেট কেস খুলিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে ধরিল, ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া প্রত্যাখ্যান করিল। যুবক তখন নিজে সিগারেট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "প্রশ্ন করুন। কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর না দিতেও পারি।"

ব্যোমকেশ একটু নীরব রহিল, তারপর অলসকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আপনার নাম কী?"

যুবকের মুখে চকিত হাসি খেলিয়া গেল। হাসিটি বেশ চিত্তাকর্ষক। সে বলিল, "নামটা এখনও বলা হয়নি। আমার নাম সত্যকাম দাস।"

"সত্যকাম?"

"হ্যাঁ! আপনি যেমন সত্যান্বেষী, আমি তেমনি সত্যকাম।"

"এ-নাম আগে শুনিনি। সত্যকাম ছদ্মনাম নয় তো?"

"না, আসল নাম।"

"হুঁ। আপনি কোথায় থাকেন? ঠিকানা কী?"

"কলকাতায় থাকি। ৩৩।৩৪ আমহার্স্ট স্ট্রীট।"

"কী কাজ করেন।"

"কাজ? বিশেষ কিছু করি না। দাস-চৌধুরী কোম্পানির সুচিত্রা এম্পোরিয়মের নাম শুনেছেন?"

"শুনেছি। ধর্মতলা স্ট্রীটের বড় মনিহারী দোকান।"

"আমি সুচিত্রা এম্পোরিয়মের অংশীদার।"

"অংশীদার।—অন্য অংশীদার কে?"

সত্যকাম একবার দম লইয়া বলিল, "আমার বাবা--উষাপতি দাস।"

ব্যোমকেশ সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিয়া রহিল। সত্যকাম তখন ক্ষণেকের জন্য ইতস্তত করিয়া অনিচ্ছাভরে বলিল, "আমার মাতামহ সুচিত্রা এম্পোরিয়মের পত্তন করেছিলেন, পরে আমার বাবা তাঁর পার্টনার হন। এখন দাদামশাই মারা গেছেন, তাঁর অংশ আমাকে দিয়ে গেছেন। আমার মা দাদামশায়ের একমাত্র সন্তান। আমিও মায়ের একমাত্র সন্তান।"

"বুঝেছি।" ব্যোমকেশ ক্ষণকাল যেন অন্যমনস্ক হইয়া রহিল, তারপর নির্লিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি মদ খান?"

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া সত্যকাম বলিল, "খাই। গন্ধ পেলেন বুঝি?"

"আপনার বয়স কত?"

"একুশ চলছে। জন্ম-তারিখ জানতে চান? ৭ই জুলাই, ১৯২৭।" সত্যকাম ব্যঙ্গ-বঙ্কিম হাসিল।

"কতদিন মদ খাচ্ছেন?"

"চৌদ্দ বছর বয়সে মদ ধরেছি।" সত্যকাম নিঃশেষিত সিগারেটের প্রান্ত হইতে নূতন সিগারেট ধরাইল।

"সব সময় মদ খান?"

"যখন ইচ্ছে হয় তখনই খাই।" বলিয়া সে পকেট হইতে চার আউন্সের একটি ফ্ল্যাস্ক বাহির করিয়া দেখাইল।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। আমিও নির্বাকভাবে এই একুশ বছরের ছোকরাকে দেখিতে লাগিলাম। যাহারা সর্বাং লজ্জাং পরিত্যজ্য ত্রিভুবন বিজয়ী হইতে চায়, তাহারা বোধকরি খুব অল্প বয়স হইতেই সাধনা আরম্ভ করে।

ব্যোমকেশ মুখ তুলিয়া পূর্ববৎ নির্বিকার স্বরে বলিল, "আপনার আনুষঙ্গিক দোষও আছে?"

সত্যকাম মুচকি হাসিল, "দোষ কেন বলছেন ব্যোমকেশবাবু? এমন সর্বজনীন কাজ কি দোষের হতে পারে?"

আমার গা রি-রি করিয়া উঠিল। ব্যোমকেশ কিন্তু নির্বিকার মুখেই বলিল, "দার্শনিক আলোচনা থাক। ভদ্রঘরের মেয়েদের উপরেও নজর দিয়েছেন?"

"তা দিয়েছি।" সত্যকামের কণ্ঠস্বরে বেশ একটু তৃপ্তির আভাস পাওয়া গেল।

"কত মেয়ের সর্বনাশ করেছেন?"

"হিসাব রাখিনি ব্যোমকেশবাবু।" বলিয়া সত্যকাম নির্লজ্জ হাসিল।

ব্যোমকেশ মুখের একটা অরুচিসূচক ভঙ্গি করিল, "আপনি বলছেন হঠাৎ আপনার মৃত্যু হতে পারে। কেউ আপনাকে খুন করবে, এই কি আপনার আশঙ্কা?"

"হ্যাঁ।"

"কে খুন করতে পারে? যে-মেয়েদের অনিষ্ট করেছেন তাদেরই আত্মীয়-স্বজন? কাউকে সন্দেহ করেন?"

"সন্দেহ করি। কিন্তু কারুর নাম করব না।"

"প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টাও করবেন না?"

সত্যকাম মুখের একটা বিমর্ষ ভঙ্গি করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল, "চেষ্টা করে লাভ নেই ব্যোমকেশবাবু। আচ্ছা আজ উঠি, আর বোধ হয় আপনার কোন প্রশ্ন নেই। রাত্তিরে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।"

এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে ব্যবসায়ঘটিত নয় তাহা তাহার বাঁকা হাসি হইতে প্রমাণ হইল।

সে দ্বারের কাছে পৌঁছিলে ব্যোমকেশ পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে যদি কেউ খুন করে আমি জানব কী করে?"

সত্যকাম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "খবরের কাগজে পাবেন। তা ছাড়া আপনি নিজেও খোঁজ খবর নিতে পারেন। বেশি দিন বোধ হয় অপেক্ষা করতে হবে না।"

সত্যকাম প্রস্থান করিলে আমি দরজা বন্ধ করিয়া তক্তপোশে আসিয়া বসিলাম। সত্যবতী হাসি-ভরা মুখে পুনঃপ্রবেশ করিল। মনে হইল সে দরজার আড়ালেই ছিল।

"এক হাজার টাকার জন্যে ভাবছিলে, পেলে তো এক হাজার টাকা!"

ব্যোমকেশ বিরস মুখে নোটগুলি সত্যবতী দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "পিপীলিকা খায় চিনি, চিনি যোগান্ চিন্তামণি। আর কি, এবার কাশ্মীর যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করে দাও।" আমাকে বলিল, "কেমন দেখলে ছোকরাকে?"

বলিলাম, "এত কম বয়সে এমন দু-কানকাটা বেহায়া আগে দেখিনি।"

ব্যোমকেশ বলিল, "আমিও না। কিন্তু আশ্চর্য, নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায় না, মরার-পর অনুসন্ধান করাতে চায়!"

দুই

পরদিন সকালবেলা সত্যবতী বলিল, "কাশ্মীর যে যাবে, লেপ বিছানা কৈ?"

ব্যোমকেশ বলিল, "কেন, গত বছর পাটনায় তো ছিল!"

সত্যবতী বলিল, "সে তো সব দাদার। আমাদের কি কিছু আছে! নেহাত কলকাতায় শীত, তাই চলে যায়। কাশ্মীর যেতে হলে অন্তত দুটো বিলিতী কম্বল চাই আর আমার জন্যে একটা বীভার-কোট।"

"হুঁ। চল অজিত, বেরুনো যাক।"

প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় যাবে?"

সে বলিল, "চল, সুচিত্রা এম্পোরিয়মে যাই। পথ দেখা কলা বেচা দুইই হবে।"

বলিলাম, "সত্যবতীও চলুক না, নিজে পছন্দ করে কেনাকাটা করতে পারবে।"

ব্যোমকেশ সত্যবতীর পানে তাকাইল, সত্যবতী করুণ স্বরে বলিল, "যেতে তো ইচ্ছে করছে, কিন্তু যাই কী করে? খোকার ইস্কুলের গাড়ি আসবে যে।"

ব্যোমকেশ বলিল, "তোমার যাবার দরকার নেই। আমি তোমার জিনিস পছন্দ করে নিয়ে আসব। দেখো, অপছন্দ হবে না।"

সত্যবতী ব্যোমকেশের পানে সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ব্যোমকেশের পছন্দের উপর তাহার যে অটল বিশ্বাস আছে তাহাই জানাইয়া গেল। সত্যবতীর শৌখিন জিনিসের কেনাকাটা অবশ্য চিরকাল আমিই করিয়া থাকি। কিন্তু এখন বসন্তকাল পড়িয়াছে, ফাল্গুন মাস চলিতেছে—

দুজনে বাহির হইলাম। সাড়ে ন'টার সময় ধর্মতলা স্ট্রীটে পৌঁছিয়া দেখিলাম এম্পোরিয়মের দ্বার খুলিয়াছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আস্ত কাচের জানালা হইতে পর্দা সরিয়া গিয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বিশাল ঘর, মোজেয়িক মেঝের উপর ইতস্তত নানা শৌখিন পণ্যের শো-কেস সাজানো রহিয়াছে। দুই চারিজন গ্রাহক ইতিমধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মহিলা। কর্মচারীরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া ক্রেতাদের মন যোগাইতেছে। একটি প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক ঘরের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পদচারণ করিতে করিতে সর্বত্র নজর রাখিয়াছেন।

আমরা প্রবেশ করিলে প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাদের কাছে আসিয়া সসম্ভ্রম অভ্যর্থনা করিলেন, "আসতে আজ্ঞা হক। কী চাই বলুন।"

ব্যোমকেশ ঘরের এদিক ওদিক তাকাইয়া কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, "সামান্য জিনিস—গোটা দুই বিলিতী কম্বল। পাওয়া যাবে কি?"

"নিশ্চয়। আসুন আমার সঙ্গে।" ভদ্রলোক আমাদের একদিকে লইয়া চলিলেন, "আর কিছু?"

"আর একটা মেয়েদের বীভার-কোট।"

"পাবেন। এই যে লিফ্ট—ওপরে কম্বল বীভার-কোট দুইই পাবেন।"

ঘরের কোণে একটি ছোট লিফ্‌ট ওঠা-নামা করিতেছে, আমরা তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই পিছন হইতে কে বলিল, "আমি এঁদের দেখছি।"

পরিচিত কণ্ঠস্বরে পিছু ফিরিয়া দেখিলাম—সত্যকাম। সিল্কের স্যুট পরা ছিমছাম চেহারা, এতক্ষণ সে বোধহয় এই ঘরেই ছিল, বিজাতীয় পোশাকের জন্য লক্ষ্য করি নাই। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "ও—আচ্ছা। তুমি এঁদের ওপরে নিয়ে যাও, এঁরা বিলিতী কম্বল আর বীভার-কোট কিনবেন।" বলিয়া আমাদের দিকে একটু হাসিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ চকিতে একবার সত্যকামের দিকে একবার প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ইনি আপনার "

সত্যকাম মুখ টিপিয়া হাসিল, "পার্টনার।"

"অর্থাৎ - বাবা!"

সত্যকাম ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

এতক্ষণ প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়াও লক্ষ্য করি নাই, এখন ভাল করিয়া দেখিলাম। তিনি অদূরে দাঁড়াইয়া অন্য একজন গ্রাহকের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে অস্বচ্ছন্দভাবে আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছিলেন। শ্যামবর্ণ দীর্ঘাকৃতি চওড়া কাঠামোর মানুষ, চিবুকের হাড় দৃঢ়। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, রগের চুলে ঈষৎ পাক ধরিয়াছে। দোকানদারির লৌকিক শিষ্টতা সত্ত্বেও মুখে একটা তপঃকৃশ রুক্ষতার ভাব। দোকানদারির অবকাশে ভদ্রলোকের মেজাজ বোধ করি একটু কড়া।

এই সময় লিফ্‌ট নামিয়া আসিল, আমরা খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া দ্বিতলে উপস্থিত হইলাম।

সত্যকাম ব্যোমকেশের দিকে চটুল ভ্রূভঙ্গ করিয়া বলিল, "সত্যি কিছু কিনবেন? না সবেজমিন তদারকে বেরিয়েছেন?"

"সত্যি কিনব।"

উপর-তলাটি নীচের মত সাজান নয়, অনেকটা গুদামের মত। তবু এখানেও গুটিকয়েক ক্রেতা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সত্যকাম আমাদের যে দিকে লইয়া গেল সে-দিকটা গরম কাপড় চোপড়ের বিভাগ। সত্যকামের ইঙ্গিতে কর্মচারী অনেক রকম বিলিতী কম্বল বাহির করিয়া দেখাইল। এ-সব ব্যাপারে ব্যোমকেশ চিটা ও চিনির প্রভেদ বোঝে না, আমিই দুইটি কম্বল বাছিয়া লইলাম। দাম বিলক্ষণ চড়া, কিন্তু জিনিস ভাল।

অতঃপর বীভার-কোট। নানা রঙের—নানা মাপের কোট—সবগুলিই অগ্নি-মূল্য। আমরা সেগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি দেখিয়া সত্যকাম বলিল, "মাপের কথা ভাবছেন? বীভার-কোট একটু ঢিলেঢালা হলেও ক্ষতি হয় না। যেটা পছন্দ হয় আপনারা নিয়ে যান, যদি নেহাত বেমানান হয় বদলে দেব।"

একটি গাঢ় বেগুনী রঙের কোট আমার পছন্দ হইল, কিন্তু দামের টিকিট দেখিয়া ইতস্তত করিতে লাগিলাম। সত্যকাম অবস্থা বুঝিয়া বলিল, "দামের জন্যে ভাববেন না। ওটা সাধারণ খরিদ্দারের জন্য। আপনারা খরিদ দামে পাবেন।—আসুন।"

আমাদের ক্যাশিয়ারের কাছে লইয়া গিয়া সত্যকাম বলিল, "এই জিনিসগুলো খরিদ দরে দেওয়া হচ্ছে।- ক্যাশমেমো কেটে দিন।"

"যে আজ্ঞে।" বলিয়া বৃদ্ধ ক্যাশিয়ার ক্যাশমেমো লিখিয়া দিল। দেখিলাম টিকিটের দামের চেয়ে প্রায় পঞ্চাশ টাকা কম হইয়াছে। মন খুশী হইয়া উঠিল; গত রাত্রে সত্যকাম সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিয়াছিল তাহাও বেশ খানিকটা পরিবর্তিত হইল। নাঃ, আর যাই হোক, ছোকরা একেবারে চুষুণ্ডি চামার নয়।

এই সময় উপর তলায় একটি তরুণীর আবির্ভাব হইল। বরবর্ণিনী যুবতী, সাজ পোশাকে লীলা-লালিত্যের পরিচয় আছে। সত্যকাম একবার ঘাড় ফিরাইয়া তরুণীকে দেখিল; তাহার মুখের চেহারা বদলাইয়া গেল। সে এক চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া আমাদের বলিল, "আপনাদের বোধহয় আর কিছু কেনবার নেই? আমি তা হলে—নতুন গ্রাহক এসেছে—আচ্ছা নমস্কার।"

মধুগন্ধে আকৃষ্ট মৌমাছির মত সত্যকাম সিধা যুবতীর দিকে উড়িয়া গেল। আমরা জিনিসপত্র প্যাক করাইয়া যখন নীচে নামিবার উপক্রম করিতেছি, দেখিলাম সত্যকাম যুবতীকে সম্পূর্ণ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, যুবতী সত্যকামের বচনামৃত পান করিতে করিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে।

বাসায় ফিরিয়া সত্যবতীকে আমাদের খরিদ দেখাইলাম। সত্যবতী খুবই আহ্লাদিত হইল এবং নির্বাচন-নৈপুণ্যের সমস্ত প্রশংসা নির্বিচারে ব্যোমকেশকে অর্পণ করিল। বসন্তকালের এমনই মহিমা!

আমি যখন জিনিসগুলির মূল্য হ্রাসের কথা বলিলাম তখন সত্যবতী বিগলিত হইয়া বলিল, "অ্যাঁ—সত্যি। ভারী ভাল ছেলে তো সত্যকাম!"

ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বদিকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "ভারী ভাল ছেলে' সোনার চাঁদ ছেলে! যদি কেউ ওকে খুন না করে, দোকান শীগ্‌গিরই লাটে উঠবে।"

সন্ধ্যাবেলা ব্যোমকেশ আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। এবার গতি আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে। ৩৩।৪৪ নম্বর বাড়ির সম্মুখে যখন পৌঁছিলাম তখন ঘোর ঘোর হইয়া আসিয়াছে। প্রদোষের এই সময়টিতে কলিকাতার ফুটপাথেও ক্ষণকালের জন্য লোক-চলাচল কমিয়া যায়, বোধ করি রাস্তার আলো জ্বলার প্রতীক্ষা করে। আমরা উদ্দিষ্ট বাড়ির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। বেশি পথিক নাই, কেবল গায়ে চাদর জড়ানো একটি লোক ফুটপাথে ঘোরাফেরা করিতেছিল, আমাদের দেখিয়া একটু দূরে সরিয়া গেল।

৩৩।৩৪ নম্বর বাড়ি একেবারে ফুটপাথের উপর নয়। প্রথমে একটি ছোট লোহার ফটক, ফটক হইতে গলির মত সরু ইট-বাঁধানো রাস্তা কুড়ি-পঁচিশ ফুট গিয়া বাড়ির সদরে ঠেকিয়াছে। দোতলা বাড়ি, সম্মুখ হইতে খুব বড় মনে হয় না। সদর দরজার দুই পাশে দুইটি জানালা, জানালার মাথার উপর দোতলায় দুইটি গোলাকৃতি ব্যালকনি। বাড়ির ভিতরে এখনও আলো জ্বলে নাই। ফুটপাথে দাঁড়াইয়া মনে হইল একটি স্ত্রীলোক দোতলার একটি ব্যালকনিতে বসিয়া বই পড়িতেছে কিংবা সেলাই করিতেছে। ব্যালকনির ঢালাই লোহার রেলিঙের ভিতর দিয়া অস্পষ্টভাবে দেখা গেল।

"ব্যোমকেশবাবু!"

পিছন হইতে অতর্কিত আহ্বানে দুজনেই ফিরিলাম। গায়ে চাদর-জড়ানো যে লোকটিকে ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়াছিলাম, সে আমাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পুষ্টকায় যুবক, মাথায় চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, মুখখানা যেন

চেনা-চেনা মনে হইল। ব্যোমকেশ বলিল, "কে?"

যুবক বলিল, "আমাকে চিনতে পারলেন না স্যার? সেদিন সরস্বতী পুজোর চাঁদা নিতে গিয়েছিলাম। আমার নাম নন্দ ঘোষ, আপনার পাড়াতেই থাকি।"

ব্যোমকেশ বলিল, "মনে পড়েছে। তা তুমি ও পাড়ার ছেলে, ভর সংধ্যেবেলা এখানে ঘোরাঘুরি করছ কেন?"

"আজ্ঞে " নন্দ ঘোষের একটা হাত চাদরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আবার তৎক্ষণাৎ চাদরের মধ্যে লুকাইল। তবু দেখিয়া ফেলিলাম, হাতে একটি ভিন্দিপাল। অর্থাৎ দেড় হেতে খেঁটে। বস্তুটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বলবান ব্যক্তির হাতে মারাত্মক অস্ত্র। ব্যোমকেশ সন্দিগ্ধ নেত্রে নন্দ ঘোষকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "কী মতলব বল দেখি?"

"মতলব - আজ্ঞে" নন্দ একটু কাছে ঘেঁষিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "আপনাকে বলছি স্যার, এ-বাড়িতে একটা ছোঁড়া থাকে, তাকে ঠ্যাঙাব।"

"তাই নাকি! ঠ্যাঙাবে কেন?"

"কারণ আছে স্যার। কিন্তু আপনারা এখানে কী করছেন? এ-বাড়ির কাউকে চেনেন নাকি?"

"সত্যকামকে চিনি। তাকেই ঠ্যাঙাতে চাও—কেমন?"

"আজ্ঞে--' নন্দ একটু বিচলিত হইয়া পড়িল, "আপনার সঙ্গে কি ওর খুব ঘনিষ্ঠতা আছে নাকি?"

"ঘনিষ্ঠতা নেই। কিন্তু জানতে চাই ওকে কেন ঠ্যাঙাতে চাও। ও কি তোমার কোনও অনিষ্ট করেছে?"

"অনিষ্ট সে অনেক কথা স্যার। যদি শুনতে চান, আমার সঙ্গে আসুন; কাছেই ভূতেশ্বরের আখড়া, সেখানে সব শুনবেন।"

"ভূতেশ্বরের আখড়া!"

"আজ্ঞে আমাদের ব্যায়াম সমিতি। কাছেই গলির মধ্যে। চলুন।"

"চল।"

ইতিমধ্যে রাস্তার আলো জ্বলিয়াছে। আমরা নন্দকে অনুসরণ করিয়া একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম, কিছু দূর গিয়া একটি পাঁচিলঘেরা উঠানের মত স্থানে পেঁছিলাম। উঠানের পাশে গোটা দুই নোনাধরা জীর্ণ ঘরে আলো জ্বলিতেছে। উঠান প্রায় অন্ধকার, সেখানে কয়েকজন কপনিপরা যুবক ডন-বৈঠক দিতেছে, মুগুর ঘুরাইতেছে এবং আরও নানা প্রকারে দেহযন্ত্রকে মজবুত করিতেছে। নন্দ পাশ কাটাইয়া আমাদের ঘরে লইয়া গেল।

ঘরের মেঝেয় সতরঞ্চি পাতা, একটি অতিকায় ব্যক্তি বসিয়া আছেন। নন্দ পরিচয় করাইয়া দিল, ইনি ব্যায়াম সমিতির ওস্তাদ, নাম ভূতেশ্বর বাগ। সার্থকনামা ব্যক্তি, কারণ তাঁহার গায়ের রঙ ভূতের মতন এবং মুখখানা বাঘের মতন; উপরন্তু দেহায়তন হাতীর মতন। মাথায় একগাছিও চুল নাই, বয়স ষাটের কাছাকাছি। ইনি বোধহয় যৌবনকালে গুন্ডা ছিলেন অথবা কুস্তিগির ছিলেন, বয়োগতে ব্যায়াম সমিতি খুলিয়া বসিয়াছেন।

নন্দ বলিল, "ভূতেশ্বরদা, ব্যোমকেশবাবু মস্ত ডিটেক্‌টিভ, সত্যকামকে চেনেন।"

ভূতেশ্বর ব্যোমকেশের দিকে বাঘা চোখ ফিরাইয়া বলিলেন, "আপনি

পুলিশের লোক? ঐ ছোঁড়ার মুরুব্বি?"

ব্যোমকেশ সবিনয়ে জানাইল, সে পুলিশের লোক নয়, সত্যকামের সহিত তাহার আলাপও মাত্র একদিনের। সত্যকামকে প্রহার করিবার প্রয়োজন কেন হইয়াছে তাহাই শুধু জানিতে চায়, অন্য কোনও দুরভিসন্ধি নাই। ভূতেশ্বর একটু নরম হইয়া বলিলেন, "ছোঁড়া পগেয়া পাজি। পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদের কাছে নালিশ করেছেন। ছোড়া মেয়েদের বিরক্ত করে। এটা ভদ্দর-লোকের পাড়া, এ-পাড়ায় ও-সব চলবে না।"

এই সময় আরও কয়েকজন গলদঘর্ম মল্লবীর ঘরে প্রবেশ করিল এবং আমাদের ঘিরিয়া বসিয়া কটমট চক্ষে আমাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। স্পষ্টই বোঝা গেল, সত্যকামকে ঠ্যাঙাইবার সংকল্প একজনের নয়, সমস্ত ব্যায়াম সমিতির অনুমোদন ইহার পশ্চাতে আছে। নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। গতিক সুবিধার নয়, সত্যকামের ফাঁড়াটা আমাদের উপর দিয়া বুঝি যায়।

ব্যোমকেশ কিন্তু সামলাইয়া লইল। শান্তস্বরে বলিল, "পাড়ার কোনও লোক যদি বজ্জাতি করে তাকে শাসন করা পাড়ার লোকেরই কাজ, এ কাজ অন্য কাউকে দিয়ে হয় না। আপনারা সত্যকামকে শায়েস্তা করতে চান তাতে আমার কোনই আপত্তি নেই। তাকে যতটুকু জানি দু' ঘা পিঠে পড়লে তার উপকারই হবে। শুধু একটা কথা, খুনোখুনি করবেন না। আর, কাজটা সাবধানে করবেন, যাতে ধরা না পড়েন।"

নন্দ এক মুখ হাসিয়া বলিল, "সেইজন্যেই তো কাজটা আমি হাতে নিয়েছি স্যার। দু' চার ঘা দিয়ে কেটে পড়ব। আমি এ-পাড়ার ছেলে নই, চিনতে পারলেও সনাক্ত করতে পারবে না।"

ব্যোমকেশ হাসিয়া গাত্রোত্থান করিল, "তবু, যদি কোনও গণ্ডগোল বাধে আমাকে খবর দিও। আজ তা হলে উঠি। নমস্কার, ভূতেশ্বরবাবু।"

বড় রাস্তায় আমাদের পৌঁছাইয়া দিয়া নন্দ আখড়ায় ফিরিয়া গেল। ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "বাপ, একেবারে বাঘের গুহায় গলা বাড়িয়েছিলাম।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু সত্যকামকে মারধর করার উৎসাহ দেওয়া কি তোমার উচিত? তুমি ওর টাকা নিয়েছ।"

ব্যোমকেশ বলিল, "দু-চার ঘা খেয়ে যদি ওর প্রাণটা বেঁচে যায় সেটা কি ভাল নয়?"

তিন

যদিও আমি কোনও দিন অফিস-কাছারি করি নাই, তবু কেন জানি না রবিবার সকালে ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হয়। পূর্বপুরুষেরা চাকুরে ছিলেন, রক্তের মধ্যে বোধ হয় দাসত্বের দাগ রহিয়া গিয়াছে।

পরদিনটা রবিবার ছিল, বেলা সাড়ে সাতটার সময় চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখি ব্যোমকেশ দু'হাতে খবরের কাগজটা খুলিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। আমার আগমনে সে চক্ষু ফিরাইল না, সংবাদপত্র-

টাকেই যেন সম্বোধন করিয়া বলিল, "নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা রে দূত!"

তাহার ভাবগতিক ভাল ঠেকিল না, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী হয়েছে?"

সে কাগজ নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "সত্যকাম কাল রাত্রে মারা গেছে।"

"অ্যাঁ! কিসে মারা গেল?"

"তা জানি না।—তৈরি হয়ে নাও, আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরুতে হবে।"

আমি কাগজখানা তুলিয়া লইলাম। মধ্য পৃষ্ঠার তলার দিকে পাঁচ লাইনের খবর—

—অদ্য শেষ রাত্রে ধর্মতলার প্রসিদ্ধ সুচিত্রা এম্পোরিয়মের মালিক সত্যকাম দাসের সন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে। পুলিশ তদন্তের ভার লইয়াছে।

সত্যকাম তবে ঠিকই বুঝিয়াছিল, মৃত্যুর পূর্বাভাস পাইয়াছিল। কিন্তু এত শীঘ্র! প্রথমেই স্মরণ হইল, কাল সন্ধ্যার সময় নন্দ ঘোষ চাদরের মধ্যে খেঁটে লুকাইয়া বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করিতেছিল

বেলা সাড়ে আটটার সময় ব্যোমকেশ ও আমি আমহার্স্ট স্ট্রীটে উপস্থিত হইলাম। ফটকের বাহিরে ফুটপাথের উপর একজন কনেস্টবল দাঁড়াইয়া আছে, একটু খুঁতখুঁত করিয়া আমাদের ভিতরে যাইবার অনুমতি দিল।

ইট বাঁধানো রাস্তা দিয়া সদরে উপস্থিত হইলাম। সদর দরজা খোলা রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে কেহ নাই। বাড়ির ভিতর হইতে কান্নাকাটির আওয়াজও পাওয়া যাইতেছে না। ব্যোমকেশ দরজার সম্মুখে পৌঁছিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, নীরবে মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। দেখিলাম দরজার ঠিক সামনে ইট-বাঁধানো রাস্তা যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে খানিকটা রক্তের দাগ। কাঁচা রক্ত নয়, বিঘতপ্রমাণ স্থানের রক্ত শুকাইয়া চাপড়া বাঁধিয়া গিয়াছে।

আমরা একবার দৃষ্টি বিনিময় করিলাম, ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল। তারপর আমরা রক্ত-লিপ্ত স্থানটাকে পাশ কাটাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

একটি চওড়া বারান্দা, তাহার দুই পাশে দুইটি দরজা। একটি দরজায় তালা লাগান, অন্যটি খোলা; খোলা দরজা দিয়া মাঝারি আয়তনের অফিস-ঘর দেখা যাইতেছে। ঘরের মাঝখানে একটি বড় টেবিল, টেবিলের সম্মুখে ঊষাপতিবাবু একাকী বসিয়া আছেন।

ঊষাপতিবাবু টেবিলের উপর দুই কনুই রাখিয়া দুই করতলের মধ্যে চিবুক আবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। আমরা প্রবেশ করিলে দুঃস্বপ্নভরা চোখ তুলিয়া চাহিলেন, শুষ্ক নিষ্প্রাণ স্বরে বলিলেন, "কী চাই?"

ব্যোমকেশ টেবিলের পাশে গিয়া দাঁড়াইল, সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "এ-সময় আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম, মাফ করবেন। আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী।"

ঊষাপতিবাবু ঈষৎ সজাগ হইয়া পর্যায়ক্রমে আমাদের দিকে চোখ ফিরাইলেন, তারপর বলিলেন, "আপনাদের আগে কোথায় দেখেছি। বোধহয় সুচিত্রায়।—কী নাম বললেন?"

"ব্যোমকেশ বক্সী। ইনি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।—কাল আমরা আপনার দোকানে গিয়েছিলাম—"

ঊষাপতিবাবু আমাদের নাম পূর্বে শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না, কিন্তু খদ্দেরের প্রতি দোকানদারের স্বাভাবিক শিষ্টতা বোধ হয় তাঁহার

অস্থিমজ্জাগত, তাই কোনও প্রকার অধীরতা প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "কিছু দরকার আছে কি? আমি আজ একটু—বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে—"

ব্যোমকেশ বলিল, "জানি। সেই জন্যেই এসেছি। সত্যকামবাবু—"

"আপনি সত্যকামকে চিনতেন?"

"মাত্র পরশুদিন তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছে। তিনি আমার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন--"

"কী প্রস্তাব?"

'তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, হঠাৎ যদি তাঁর মৃত্যু হয় তা হলে আমি তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করব।"

ঊষাপতিবাবু এবার খাড়া হইয়া বসিলেন, কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া যেন প্রবল হৃদয়াবেগ দমন করিয়া লইলেন, তারপর সংযত স্বরে বলিলেন, "আপনারা বসুন।—সত্যকাম তা হলে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু মাফ করবেন, আপনার কাছে সত্যকাম কেন গিয়েছিল বুঝতে পারছি না। আপনি—আপনার পরিচয়--মানে আপনি কি পুলিশের লোক? কিন্তু পুলিশ তো কাল রাত্রেই এসেছিল, তারা—"

"না, আমি পুলিশের লোক নই। আমি সত্যান্বেষী। বেসরকারী ডিটেক্‌টিভ বলতে পারেন।"

"ও—" ঊষাপতিবাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, "সত্যকাম কাকে সন্দেহ করে, আপনাকে বলেছিল কি?"

"না, কারুর নাম করেননি। —এখন আপনি যদি অনুমতি করেন আমি অনুসন্ধান করতে পারি।"

"কিন্তু—পুলিশ তো অনুসন্ধানের ভার নিয়েছে, তার চেয়ে বেশি আপনি কী করতে পারবেন?"

"কিছু করতে পারব কিনা তা এখনও জানি না তবে চেষ্টা করতে পারি।"

এত বড় শোকের মধ্যেও ঊষাপতিবাবু যে বিষয়বুদ্ধি হারান নাই তাহার পরিচয় এবার পাইলাম।

তিনি বলিলেন, "আপনি প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ, আপনাকে কত পারিশ্রমিক দিতে হবে?"

ব্যোমকেশ বলিল, "কিছুই দিতে হবে না। আমার পারিশ্রমিক সত্যকামবাবু দিয়ে গেছেন।"

ঊষাপতিবাবু প্রখর চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর চোখ নামাইয়া বলিলেন, "ও। তা আপনি অনুসন্ধান করতে চান করুন। কিন্তু কোনও লাভ নেই, ব্যোমকেশবাবু।"

'লাভ নেই কেন?"

"সত্যকাম তো আর ফিরে আসবে না, শুধু জল ঘোলা করে লাভ কী?"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে ঊষাপতিবাবুর পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীর-স্বরে বলিল, "আপনার মনের ভাব আমি বুঝেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, জল ঘোলা হতে আমি দেব না। আমার উদ্দেশ্য শুধু সত্য আবিষ্কার করা।"

ঊষাপতিবাবু একটি ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিলেন, "বেশ। আমাকে কী করতে হবে বলুন।"

ব্যোমকেশ বলিল, "কাল কখন কী ভাবে সত্যকামবাবুর মৃত্যু হয়েছিল আমি কিছুই জানি না। আপনি বলতে পারবেন কি?"

উষাপতিবাবুর মুখখানা যেন আরও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল, তিনি বুকের উপর একবার হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আমিই বলি—আর কে বলবে? কাল রাত্রি একটার সময় আমি নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। দুম করে একটা আওয়াজ। মনে হল যেন সদরের দিক থেকে এল—"

'মাফ করবেন, আপনার শোবার ঘর কোথায়?"

উষাপতিবাবু ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'এর উপরের ঘর। আমি একাই শুই, পাশের ঘরে স্ত্রী শোন।"

"আর সত্যকামবাবু কোন্ ঘরে শুতেন?"

'সত্যকাম নীচে শুত। ঐ যে বারান্দার ওপারে ঘরের দোরে তালা লাগান রয়েছে ওটা তার শোবার ঘর ছিল। আমার স্ত্রীর শোবার ঘর ওর ওপরে।"

"সত্যকামবাবু নীচে শুতেন কেন?"

উষাপতিবাবু উত্তর দিলেন না, উদাসচক্ষে বাহিরের জানালার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গি হইতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, রাত্রিকালে নির্বিঘ্নে বহির্গমন ও প্রত্যাবর্তনের সুবিধার জন্যই সত্যকাম নীচের ঘরে শয়ন করিত। তাহার রাত্রে বাড়ি ফিরিবার সময়েরও ঠিক ছিল না।

এই সময় ভিতর দিকের দরজার পর্দা সরাইয়া একটি মেয়ে হাতে সরবতের গেলাস লইয়া প্রবেশ করিল এবং আমাদের দেখিয়া থমকিয়া গেল, অনিশ্চিত স্বরে একবার "মামা " বলিয়া ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া রহিল। মেয়েটির বয়স সতরো-আঠারো; সুন্দরী নয় কিন্তু পুরন্ত গড়ন, চটক আছে। বর্তমানে তাহার মুখে-চোখে শঙ্কার কালো ছায়া পড়িয়াছে।

উষাপতিবাবু তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "দরকার নেই।" মেয়েটি চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাড়িতে কে কে থাকে?"

উষাপতিবাবু বলিলেন, "আমরা ছাড়া আমার দুই ভাগনে ভাগনী থাকে।"

"এটি আপনার ভাগনী?"

"হ্যাঁ।"

"কতদিন এরা আপনার কাছে আছে?"

"বছরখানেক আগে ওদের বাপ মারা যায়। মা আগেই গিয়েছিল। সেই থেকে আমি ওদের প্রতিপালন করছি। বাড়িতে আমরা ক'জন ছাড়া আর কেউ নেই।"

"চাকর-বাকর?"

"পুরনো চাকর সহদেব বাড়িতেই থাকে। সে ছাড়া একটা ঝি আর বামনী আছে, তারা রাত্রে থাকে না।"

"বুঝেছি। তারপর কাল রাত্রির ঘটনা বলুন।"

উষাপতিবাবু চোখের উপর দিয়া একবার করতল চালাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ। আওয়াজ শুনে আমি ব্যালকনির দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচে অন্ধকার, কিছু দেখতে পেলাম না। তারপরই সদর দরজার কাছ থেকে সহদেব চিৎকার করে উঠল...ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে এলাম, দেখি সহদেব দরজা খুলেছে, আর—সত্যকাম দরজার সামনে পড়ে আছে। প্রাণ নেই, পিঠের দিক থেকে গুলী

ঢুকেছে।"

"গুলী! বন্দুকের গুলী?"

'হ্যাঁ। সত্যকাম রোজই দেরি করে বাড়ি ফিরত। সহদেব বারান্দায় শুয়ে থাকত, দরজায় টোকা পড়লে উঠে দোর খুলে দিত। কাল সে টোকা শুনে দোর খোলবার আগেই কেউ পিছন দিক থেকে সত্যকামকে গুলী করেছে।"

"গুলী! আমি ভেবেছিলাম –" ব্যোমকেশ থামিয়া বলিল, "তারপর বলুন।"

উষাপতিবাবু একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিলেন, 'তারপর আর কী? পুলিশে টেলিফোন করলাম।"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নতমুখে চিন্তা করিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল, "সত্যকামবাবুর ঘরে তালা কে লাগিয়েছে?"

উষাপতি বলিলেন, 'সত্যকাম যখনই বাড়ি থেকে বেরুত, নিজের ঘরে তালা দিয়ে যেত। কালও বোধহয় তালা দিয়েই বেরিয়েছিল, তারপর –"

"বুঝেছি। ঘরের চাবি তা হলে পুলিশের কাছে?"

'খুব সম্ভব।"

"পুলিশ ঘর খুলে দেখেনি?'

"না।"

"যাক, আপনার কাছে আর বিশেষ কিছু জানবার নেই। এবার বাড়ির অন্য সকলকে দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

"কাকে ডাকব বলুন।"

"সহদেব বাড়িতে আছে?"

'আছে নিশ্চয়। ডাকছি।"

উষাপতিবাবু উঠিয়া গিয়া অন্দরের দ্বারের নিকট হইতে সহদেবকে ডাকিলেন তারপর আবার আসিয়া বসিলেন।

সহদেব প্রবেশ করিল। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, শরীরে কেবল হাড় ক'খানা আছে। মাথায় ঝাঁকড়া পাকা চুল; ভ্রূ পাকা, এমন কি চোখের মণি পর্যন্ত ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। লোলচর্ম শিথিলপেশী মুখে হাবলার মত ভাব।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম সহদেব? তুমি কত বছর এ-বাড়িতে কাজ করছ?"

সহদেব উত্তর দিল না, ফ্যালফ্যাল করিয়া একবার আমাদের দিকে একবার উষাপতিবাবুর দিকে তাকাইতে লাগিল। উষাপতিবাবু বলিলেন, "ও আমার শ্বশুরের সময় থেকে এ-বাড়িতে আছে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর।"

ব্যোমকেশ সহদেবকে বলিল, "তুমি কাল রাত্রে—"

ব্যোমকেশ কথা শেষ করিবার আগেই সহদেব হাত জোড় করিয়া বলিল, "আমি কিছু জানিনে বাবু।"

ব্যোমকেশ বলিল, "আমার কথাটা শুনে উত্তর দাও। কাল রাত্রে সত্যকামবাবু যখন দোরে টোকা দিয়েছিলেন তখন তুমি জেগে ছিলে?"

সহদেব পূর্ববৎ জোড়হস্তে বলিল, "আমি কিছু জানিনে বাবু।"

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বলিল, "মনে করবার চেষ্টা কর। সে-সময় দুম করে একটা আওয়াজ শুনেছিলে?"

'আমি কিচ্ছু জানিনে বাবু।"

অতঃপর ব্যোমকেশ যত প্রশ্ন করিল সহদেব তাহার একটিমাত্র উত্তর দিল—আমি কিছু জানিনে বাবু। এই সর্বাঙ্গীন অজ্ঞতা কতখানি সত্য অনুমান করা কঠিন; মোট কথা সহদেব কিছু জানিলেও বলিবে না। ব্যোমকেশ বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি যেতে পার। ঊষাপতিবাবু, এবার আপনার ভাগনীকে ডেকে পাঠান।"

ঊষাপতিবাবু সহদেবকে বলিলেন, "চুমকিকে ডেকে দে।"

সহদেব চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে চুমকি প্রবেশ করিল, চেষ্টাকৃত দৃঢ়তার সহিত টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম তাহার মুখে আশঙ্কার ছায়া আরও গাঢ় হইয়াছে, আমাদের দিকে চোখ তুলিয়াই আবার নত করিল।

ব্যোমকেশ সহজ সুরে বলিল, "তোমার মামার কাছে শুনলাম তুমি বছরখানেক হল এ বাড়িতে এসেছ। আগে কোথায় থাকতে?"

চুমকি ধরা-ধরা গলায় বলিল, 'মানিকতলায়।"

"লেখাপড়া কর?"

'কলেজে পড়ি।"

"আর তোমার ভাই?"

'দাদাও কলেজে পড়ে।'

"আচ্ছা, কাল রাত্তিরে তুমি কখন জানতে পারলে?"

চুমকি একটু দম লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, 'আমি ঘুমোচ্ছিলুম। দাদা এসে দোরে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল, তখন ঘুম ভাঙল।"

"ও তুমি রাত্তিরে ঘরের দরজা বন্ধ করে শোও?"

চুমকি যেন থতমত খাইয়া গেল, বলিল, 'হ্যাঁ।"

"তোমার শোবার ঘর নীচে না ওপরে?"

'নীচে পিছন দিকে। আমার ঘরের পাশে দাদার ঘর।"

"তা হলে বন্দুকের আওয়াজ তুমি শুনতে পাওনি?"

"না।"

"ঘুম ভাঙার পর তুমি কী করলে?"

'দাদা আর আমি এই ঘরে এলুম। মামা পুলিশকে ফোন করছিলেন।"

"আর তোমার মামীমা?"

'তাঁকে তখন দেখিনি। এখান থেকে ওপরে গিয়ে দেখলুম তিনি নিজের ঘরের মেঝেয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।" চুমকির চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সদয় কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, তুমি এখন যাও। তোমার দাদাকে পাঠিয়ে দিও।"

চুমকি ঘরের বাহিরে যাইতে না যাইতে তাহার দাদা ঘরে প্রবেশ করিল; মনে হইল সে দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিয়া ছিল। ভাই বোনের চেহারায় খানিকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ছেলেটির চোখের দৃষ্টি একটু অদ্ভুত ধরনের। প্যাঁচার চোখের মত তাহার চোখেও একটা নির্নিমেষ অচঞ্চল একাগ্রতা। সে অত্যন্ত সংযত-ভাবে টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল এবং নিষ্পলক চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল।

সওয়াল জবাব আরম্ভ হইল।

"তোমার নাম কী?"

"শীতাংশু দত্ত।"

"বয়স কত?"
"কুড়ি।"
"কাল রাত্রে তুমি জেগে ছিলে?"
"হ্যাঁ।"
"কী করছিলে?"
"পড়ছিলাম।"
"কী পড়ছিলে? পরীক্ষার পড়া?"
"না। গোর্কির 'লোয়র ডেপ্‌থস' পড়ছিলাম। রাত্রে পড়া আমার অভ্যাস।"
"ও।...বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলে?"
"পেয়েছিলাম। কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ বলে বুঝতে পারিনি।"
"তারপর?"
"সহদেবের চিৎকার শুনে গিয়ে দেখলাম।"
"তারপর ফিরে এসে তোমার বোনকে জাগালে?"
"হ্যাঁ।"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চিবুকের তলায় করতল রাখিয়া বসিয়া রহিল। দেখিলাম উষাপতিবাবুও নির্লিপ্তভাবে বসিয়া আছেন, প্রশ্নোত্তরের সব কথা তাঁহার কানে যাইতেছে কিনা সন্দেহ। মনের অন্ধকার অতলে তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন।

ব্যোমকেশ আবার সওয়াল আরম্ভ করিল।
"তুমি রাত্রে শোবার সময় দরজা বন্ধ করে শোও?"
"না, খোলা থাকে।"
"চুমকির দোর বন্ধ থাকে?"
"হ্যাঁ। ও মেয়ে, তাই।"
"যাক।—কাল রাত্রে সকলে শুয়ে পড়বার পর তুমি বাড়ির বাইরে গিয়েছিলে?"
"না।"
"সদর দরজা ছাড়া বাড়ি থেকে বেরুবার অন্য কোনও রাস্তা আছে?"
"আছে। খিড়কির দরজা।"
"কাল রাত্রে খিড়কির দরজা দিয়ে কেউ বেরিয়েছিল?"
"না। বেরুলে আমি জানতে পারতাম। খিড়কির দরজা আমার ঘরের পাশেই। দোর খুললে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হয়। তা ছাড়া রাত্রে খিড়কির দরজায় তালা লাগান থাকে।"
"তাই নাকি! তার চাবি কার কাছে থাকে?"
"সহদেবের কাছে।"
"হুঁ। সত্যকামবাবু রাত্রে দেরি করে বাড়ি ফিরতেন তুমি জান?"
"জানি।"
"রোজ জানতে পারতে কখন তিনি বাড়ি ফেরেন?"
"রোজ নয়, মাঝে মাঝে পারতাম।"
"আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।"

শীতাংশু আরও কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের পানে নিষ্পলক চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ ঊষাপতিবাবুর দিকে ফিরিয়া ঈষৎ সংকুচিত স্বরে বলিল, "ঊষাপতিবাবু, এবার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে কি?"

ঊষাপতিবাবু চমকিয়া উঠিলেন, "আমার স্ত্রী! কিন্তু তিনি--তাঁর অবস্থা—"

"তাঁর অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। তাঁকে এখানে আসতে হবে না, আমিই তাঁর ঘরে গিয়ে দু-একটা কথা—"

ব্যোমকেশের কথা শেষ হইল না, একটি মহিলা অধীর হস্তে পর্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে ঊষাপতিবাবুর স্ত্রী, তাহাতে সন্দেহ রহিল না। ব্যোমকেশকে লক্ষ্য করিয়া তিনি তীব্র স্বরে বলিলেন, "কেন আপনি আমার স্বামীকে এমনভাবে বিরক্ত করছেন? কী চান আপনি? কেন এখানে এসেছেন?"

আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মহিলাটির বয়স বোধকরি চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু চেহারা দেখিয়া আরও কম বয়স মনে হয়। রঙ ফরসা, মুখে সৌন্দর্যের চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। বর্তমানে তাঁহার মুখে পুত্রশোক অপেক্ষা ক্রোধই অধিক ফুটিয়াছে। ব্যোমকেশ অত্যন্ত মোলায়েম সুরে বলিল, "আমাকে মাফ করবেন, নেহাত কর্তব্যের দায়ে আপনাদের বিরক্ত করতে এসেছি—"

মহিলাটি বলিলেন, "কে ডেকেছে আপনাকে? এখানে আপনার কোনও কর্তব্য নেই। যান আপনি, আমাদের বিরক্ত করবেন না।"

ব্যোমকেশ বলিল, "আপনি কি চান না যে সত্যকামবাবুর মৃত্যুর একটা কিনারা হয়?"

"না, চাই না। যা হবার হয়েছে। আপনি যান, আমাদের রেহাই দিন।"

"আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।"

আমরা ঊষাপতিবাবুর পানে চাহিলাম। তিনি বিস্ময়াহতভাবে স্ত্রীর পানে চাহিয়া আছেন, যেন নিজের চক্ষুকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। মহিলাটিও একবার স্বামীর প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলেন, তারপর দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

চার

আমরা সদর দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ঊষাপতিবাবুও আমাদের পিছন পিছন আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখের বিস্ময়াহত ভাব সম্পূর্ণ কাটে নাই। তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন, "আমাদের মানসিক অবস্থা বুঝে ক্ষমা করবেন। নমস্কার।"

দরজা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় ব্যোমকেশ বলিল, "ওটা কী?"

আসিবার সময় চোখে পড়ে নাই, কবাটের বাহিরের দিকে নীচের চৌকাঠ হইতে হাত খানেক উঁচুতে একটি সোনালী চাকতি চক্‌চক্ করিতেছে। ঊষাপতি-বাবু দ্বার বন্ধ করিতে গিয়া থামিয়া গেলেন। চাকতিটা আয়তনে চাঁদির টাকার চেয়ে কিছু বড়। ব্যোমকেশ নত হইয়া সেটা দেখিল, আঙুল দিয়া সেটা পরীক্ষা করিল। বলিল, "রাংতার চাকতি, গঁদ দিয়ে কবাটে জোড়া রয়েছে।" সে সোজা হইয়া ঊষাপতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কী?"

ঊষাপতিবাবু দ্বিধাভরে বলিলেন, "কী জানি, আগে লক্ষ্য করেছি বলে মনে হচ্ছে না।"

ব্যোমকেশ বলিল, "সম্প্রতি কেউ সেঁটেছে। বাড়িতে ছোট ছেলেপিলে থাকলে বোঝা যেত। কিন্তু—আপনি একবার খোঁজ নেবেন?"

ঊষাপতিবাবু সহদেবকে ডাকিলেন, সে যথারীতি বলিল, "আমি কিছু জানিনে বাবু।" চুমকিও কিছু বলিতে পারিল না। শীতাংশু বলিল, "আমি কাল সন্ধ্যের সময় যখন বাড়ি এসেছি তখন ওটা ছিল না।"

আমার মাথায় নানা চিন্তা আসিতে লাগল। সত্যকামকে যে খুন করিয়াছে সে কি নিজের পরিচয়ের ইঙ্গিত এইভাবে রাখিয়া গিয়াছে? হরতনের টেক্কা! লোমহর্ষণ উপন্যাসে এই ধরনের জিনিস দেখা যায় বটে। কিন্তু

কোনও হদিস পাওয়া গেল না। আমরা চলিয়া আসিলাম।

রাস্তায় বাহির হইয়া ব্যোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল, "এখনও দশটা বাজেনি। চল, থানাটা ঘুরে যাওয়া যাক।"

থানার দিকে চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ির লোকের এজেহার শুনলে। কী মনে হল?"

এই কথাটাই আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছিল। বলিলাম, "কাউকেই খুব বেশি শোকার্ত মনে হল না।"

ব্যোমকেশ বলিল, "প্রবাদ আছে, অল্প শোকে কাতর, বেশি শোকে পাথর।"

বলিলাম, "প্রবাদ থাকতে পারে, কিন্তু ঊষাপতিবাবু এবং তার স্ত্রীর আচরণ খুব স্বাভাবিক নয়। সত্যকাম ভাল ছেলে ছিল না, নিজের উচ্ছৃঙ্খলতায় বাপমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, সবই সত্যি হতে পারে। তবু ছেলে তো। একমাত্র ছেলে। আমার বিশ্বাস এই পরিবারের মধ্যে কোথাও একটা মস্ত গলদ আছে।"

"অবশ্য। সত্যকামই তো একটা মস্ত গলদ। সে যাক, দরজায় রাংতার চাকতির অর্থ কিছু বুঝলে?"

"না। তুমি বুঝেছ?"

সম্পূর্ণ আকস্মিক হতে পারে। কিন্তু তা যদি না হয়

থানায় পৌঁছিয়া দেখিলাম, দারোগা ভবানীবাবু আমাদের পরিচিত লোক। বয়স্থ ব্যক্তি; ক্রুশ-বেল্ট টেবিলের উপর খুলিয়া রাখিয়া কাজ করিতেছেন। আমাদের দেখিয়া খুব খুশী হইয়াছেন মনে হইল না। তবু যথোচিত শিষ্টতা দেখাইয়া শেষে খাটো গলায় বলিলেন, "আপনি আবার এর মধ্যে কেন?"

ব্যোমকেশ বলিল, "পাকেচক্রে জড়িয়ে পড়েছি।"

ভবানীবাবু পূর্ববৎ নিম্নস্বরে বলিলেন, "ছোঁড়া পাকা শয়তান ছিল। যে তাকে খুন করেছে সে সংসারের উপকার করেছে। এমন লোককে মেডেল দেওয়া উচিত।"

ব্যোমকেশ বলিল, "তা বটে। আপনারা যা করছেন করুন, আমি তার মধ্যে নাক গলাতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই -"

ভবানীবাবু তাহাকে দৃষ্টি-শলাকায় বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, "সত্যান্বেষণ? কী জানতে চান বলুন।"

"পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এখনও বোধহয় আসেনি?"

"না। সন্ধ্যে নাগাদ পাওয়া যেতে পারে।"

"সন্ধ্যের পর আমি আপনাকে ফোন করব—বন্দুকের গুলীতেই মৃত্যু হয়েছে?"

"বড় বন্দুক নয়, পিস্তল কিম্বা রিভলভার। গুলীটা পিঠের বাঁ দিকে ঢুকেছে, সামনে কিন্তু বেরোয়নি। শরীরের ভিতরেই আছে। পিঠে যে ফুটো হয়েছে সেটা খুব ছোট, তাই মনে হয় পিস্তল কিম্বা রিভলভার।"

"পিঠের দিকে ফুটো হয়েছে, তার মানে যে গুলী করেছে সে সত্যকামের পিছনে ছিল।"

"হ্যাঁ। হয়তো ফটকের ভিতর দিকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে ছিল, যেই সত্যকাম সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অমনি গুলী করেছে, তারপর ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।"

"হুঁ। এ-পাড়ায় একটা ব্যায়াম সমিতি আছে আপনি জানেন?"

"জানি। তাদের কাজ নয়। তারা দু-চার ঘা প্রহার দিতে পারে, খুন করবে না। সবাই ভদ্রলোকের ছেলে।"

ভদ্রলোকের ছেলে খুন করে না, পুলিশের মুখে একথা নূতন বটে। কিন্তু ব্যোমকেশ সেদিক দিয়া গেল না, বলিল, "ভদ্রলোকের ছেলের কথায় মনে পড়ল। সত্যকামের এক পিসতুতো ভাই বাড়িতে থাকে, তাকে দেখেছেন?"

ভবানীবাবু একটু হাসিলেন, "দেখেছি। পুলিশে তার নাম আছে।"

"তাই নাকি! কী করেছে সে?"

"ছেলেটা শান্ত ছিল, তারপর গত দাঙ্গার সময় ওর বাপকে মুসলমানেরা খুন করে। সেই থেকে ওর স্বভাব বদলে গেছে। আমাদের সন্দেহ ও কম-সে-কম গোটা তিনেক খুন করেছে। অবশ্য পাকা প্রমাণ কিছু নেই।"

"ওর চোখের চাউনি দেখে আমারও সেই রকম সন্দেহ হয়েছিল। আপনার কি মনে হয় এ-ব্যাপারে তার হাত আছে?"

"কিছুই বলা যায় না ব্যোমকেশবাবু। সত্যকামের মত পাঁঠা যেখানে আছে সেখানে সবই সম্ভব। তবে যতদূর জানতে পারলাম যখন খুন হয় তখন সে বাড়ির মধ্যেই ছিল। সহদেবের চিৎকার শুনে ওর মামা আর ও একসঙ্গে সদর দরজায় পৌঁচেছিল। সত্যকামকে পিছন থেকে যে গুলী করেছে তার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।"

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, "ছাতের ওপর থেকে গুলী করা কি সম্ভব?"

ভবানীবাবু বলিলেন, "ছাতের ওপর থেকে গুলী করলে গুলীটা শরীরের ওপর দিক থেকে নীচের দিকে যেত। গুলীটা গেছে পিছন দিক থেকে সামনের দিকে। সুতরাং—"

এই সময় টেলিফোন বাজিল। ভবানীবাবু টেলিফোনের মধ্যে দু'চার কথা বলিয়া আমাদের কহিলেন, "আমাকে এখনি বেরুতে হবে। জোর তলব—"

"আমরাও উঠি।" ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ভাল কথা, মৃত্যুকালে সত্যকামের সঙ্গে কী কী জিনিস ছিল—"

"ঐ যে পাশের ঘরে রয়েছে, দেখুন না গিয়ে।" বলিয়া ভবানীবাবু কোমরে বেল্ট বাঁধিতে লাগিলেন।

পাশের ঘরে একটি টেবিলের উপর কয়েকটি জিনিস রাখা রহিয়াছে। সোনার সিগারেট-কেসটি দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। তা ছাড়া হুইস্কির ফ্ল্যাস্ক, চামড়ার মনিব্যাগ, একটি ছোট বৈদ্যুতিক টর্চ প্রভৃতি রহিয়াছে। ব্যোমকেশ সে-গুলির উপর একবার চোখ বুলাইয়া ফিরিয়া আসিল। ভবানীবাবু এতক্ষণে বেল্ট

বাঁধা শেষ করিয়াছেন, দেরাজ হইতে পিস্তল লইয়া কোমরের খাপে পুরিতেছেন। বলিলেন, "দেখলেন? আর কিছু দেখবার নেই তো? আচ্ছা চলি।"

ভবানীবাবু চলিয়া গেলেন। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, তিনি আসামীকে ধরিবার কোনও চেষ্টাই করিবেন না। শেষ পর্যন্ত সত্যকামের মৃত্যু-রহস্য অমীমাংসিত থাকিয়া যাইবে।

আমরাও বাহির হইলাম। ব্যোমকেশ বলিল, "এতদূর যখন এসেছি, চল বাগের আখড়া দেখে যাই।"

"এখন কি কারুর দেখা পাবে?"

"দেখাই যাক না। আর কেউ না থাক বাগ মশাই নিশ্চয় গুহায় আছেন।"

বাঘ কিন্তু গুহায় নাই। গিয়া দেখিলাম দরজায় তালা লাগনো। একজন ভৃত্য শ্রেণীর লোক দাওয়ায় বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল, সে বলিল, "ভূতু সর্দারকে খুঁজতেছেন? আজ্ঞে তিনি আজ সকালের গাড়িতে কাশী গেছেন।"

ব্যোমকেশ বলিল, "বল কি! একেবারে কাশী!—তুমি কে?"

লোকটি বলিল, "আজ্ঞে আমি তেনার চাকর। ঘর ঝাঁট দি, কাপড় কাচি কলসিতে জল ভরি। আজ সকালে ঘর ঝাঁট দিতে এসে দেখনু সর্দার খবরের কাগজ পড়তেছেন। কলসিতে জল ভরে নিয়ে এনু, সর্দার সেজেগুজে তৈরি। কইলেন, আমি কাশী চন্নু, সন্ধ্যেবেলা ছেলেরা এলে কয়ে দিও।"

বুঝিতে বাকী রহিল না, ভূতেশ্বর বাগ খবরের কাগজের সংবাদ পড়িয়াছেন এবং বিলম্ব না করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।

বাসায় ফিরিলাম প্রায় সওয়া এগারোটায়। দেখি বন্ধ দরজার সামনে নন্দ ঘোষ প্রতীক্ষমানভাবে পায়চারি করিতেছে। তাহার মুখ শুষ্ক, চোখে শঙ্কিত অস্বাচ্ছন্দ্য। ব্যোমকেশ দ্বারের কড়া নাড়িয়া স্মিতমুখে নন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "কী খবর?"

"আজ্ঞে স্যার..." বলিয়া নন্দ ঠোঁট চাটিতে লাগিল।

পুঁটিরাম আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, আমরা নন্দকে লইয়া ভিতরে আসিয়া বসিলাম। নন্দ আরও দু'চার বার ঠোঁট চাটিয়া বলিল, "সত্যকামের খবর শুনেছেন?"

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, "শুনেছি। তুমি কোথায় শুনলে?"

নন্দ বলিল, 'সকালবেলায় ও-পাড়ায় এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, খবর পেলাম কাল রাত্তিরে কেউ সত্যকামকে গুলী করে মেরেছে। আমি কিন্তু কিছু জানি না স্যার। কাল সন্ধ্যেবেলা সেই যে আপনারা আখড়া থেকে চলে এলেন, তারপর আমি আর ওদিকে যাইনি।"

ব্যোমকেশ বলিল, "বোস, তোমাকে দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করি। ও-পাড়ায় তোমার জানাশোনার মধ্যে কারুর পিস্তল কিম্বা রিভলভার আছে?"

"না স্যার। থাকলেও আমি জানি না।"

"তোমাদের আখড়ায় কারুর নেই?"

"জানি না। তবে একটা লোক ভূতেশ্বরের কাছে চোরাই পিস্তল বিক্রি করতে এসেছিল।"

"চোরাই পিস্তল!"

"হ্যাঁ স্যার । শুনেছি যুদ্ধের পর অনেক চোরাই পিস্তল কিনতে পাওয়া যেত।"

"ভূতেশ্বর কিনেছিল?"

"তা জানি না। আমাদের সামনে কেনেনি।"

"আচ্ছা ও-কথা যাক। -সত্যকাম ভদ্রঘরের মেয়েদের পিছনে লাগত। কীভাবে পিছনে লাগত বলতে পার?"

নন্দ কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, "স্যার, সত্যকাম জাদুমন্ত্র জানত, দুটো কথা বলেই মেয়েগুলোকে বশ করে ফেলত। তারপর নিজের দোকানে নিয়ে যেত, ভাল ভাল জিনিস উপহার দিত, হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত—" কুণ্ঠিতভাবে সে চুপ করিল।

"বুঝেছি। মেয়েরাও নেহাত নির্দোষ নয়।" গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ সিগারেট টানিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'স্ত্রী-স্বাধীনতাও বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। যাক, কোন্ কোন্ ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে সত্যকামের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তুমি বলতে পার?"

নন্দ আবও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, "সকলের কথা জানি না স্যার, তবে ৭৩ নম্ববের অখিলবাবু আমাদের ব্যায়াম সমিতিতে নালিশ করেছিলেন, তাঁর মেয়ে শোভনা । তারপর রামেশ্বরবাবুর নাতনী—সেও কিছু দিন সত্যকামেব ফাঁদে পড়েছিল, ভীষণ কেলেঙ্কারি হবার যোগাড় হয়েছিল। যা হোক, তার বিয়ে হয়ে গেছে—"

"আর কেউ?"

"আব ভবানীবাবুর মেয়ে সলিলা—"

'কোন ভবানীবাবু?"

"ও-পাড়ার থানার দারোগা ভবানীবাবু। তিনি মেয়েকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন। তারপর এখন মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

ব্যোমকেশের সহিত আমার একবার চকিত দৃষ্টি-বিনিময় হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আড়মোড়া ভাঙিল, নন্দকে বলিল, "আচ্ছা নন্দ, তুমি আজ এস। অন্য সময় তোমার সঙ্গে আবার কথা হবে। ভাল কথা, তোমাদের ওস্তাদ পালিয়েছে। তুমি এখন কিছুদিন আব ওদিকে যেও না।"

নন্দ আবার ঠোঁট চাটিয়া বলিল, "আচ্ছা স্যাব?"

পাঁচ

সমস্ত দিন ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। বৈকালে সত্যবতী দু-একবার কাশ্মীর যাত্রার প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ব্যোমকেশ শুনিতে পাইল না, ইজি-চেয়ারে শুইয়া কড়িকাঠের পানে তাকাইয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "তাড়া কিসের? এ-ব্যাপারের আগে নিষ্পত্তি হক।"

সত্যবতী বলিল, "নিষ্পত্তি হতে বেশি দেরি নেই। মুখ দেখে বুঝতে পারছ না!"

ব্যোমকেশ সত্যবতীর কথা শুনিতে পাইল কিনা বলা যায় না, আপন মনে

"রাংতার চাকতি" বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

সত্যবতী আমার পানে অর্থপূর্ণ ঘাড় নাড়িয়া মুচকি হাসিল।

সন্ধ্যার পর থানায় ফোন করিবার কথা। আমি স্মরণ করাইয়া দিলে ব্যোমকেশ বলিল, "তুমিই ফোন কর অজিত।"

থানার নম্বর বাহির করিয়া ফোন করিলাম। ভবানীবাবু উপস্থিত ছিলেন, বলিলেন, "এইমাত্র রিপোর্ট এসেছে, মৃত্যুর সময় রাত্রি বারটা থেকে দুটোর মধ্যে। গুলীটা ·৪৫ রিভলভারের, বাঁ দিকে স্ক্যাপিউলার নীচে দিয়ে ঢুকে হৃদযন্ত্র ভেদ করে ডান দিকের তৃতীয় পঞ্জরে আটকেছে। গুলীর গতি নীচের দিক থেকে একটু ওপর দিকে, পাশের দিক থেকে মাঝের দিকে। অন্য কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।-- আর কি! পেটের মধ্যে খানিকটা মদ পাওয়া গেছে।"

ব্যোমকেশকে বলিলাম। সে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল, "গুলীর গতি--কী বললে?"

"নীচের দিক থেকে একটু ওপর দিকে, পাশের দিক থেকে মাঝের দিকে। অর্থাৎ যে গুলী করেছে সে রাস্তার বাঁ দিকে ঝোপের মধ্যে বসে ছিল, বসে বসেই গুলী করেছে।"

ব্যোমকেশ আরও কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, "উবু হয়ে বসে গুলী করেছে! কেন?"

"তা জানি না। আমার সঙ্গে পরামর্শ করে গুলী করেনি।"

ব্যোমকেশ আবার ইজি-চেয়ারে শয়ন করিয়া কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "ব্যাপারটা ভেবে দেখ। তোমাদের ধারণা আততায়ী আগে থেকে ফটকের ভিতর দিকে লুকিয়ে ছিল, সত্যকাম ফটক দিয়ে ঢুকে কুড়ি-পঁচিশ ফুট রাস্তা পার হয়ে সদর দরজার সামনে এসে কড়া নাড়ল, তখন আততায়ী তাকে গুলী করল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কেন? সত্যকাম যেই ফটক দিয়ে ঢুকল আততায়ী তখনই তাকে গুলী করল না কেন। তাতেই তো তার সুবিধে, গুলী করেই চট্ করে ফটক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত। গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার ভয়ও থাকত না।"

"প্রশ্নের উত্তর কী- তুমিই বল।"

ব্যোমকেশ বলিল, "প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত এই যে, আততায়ী ওদিক থেকে গুলী করেনি। কিন্তু তার চেয়েও ভাবনার কথা, রাংতার চাকতিটা কে লাগিয়েছিল, কখন লাগিয়েছিল, এবং কেন লাগিয়েছিল।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওটা তা হলে আকস্মিক নয়?"

"যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে ওটা আকস্মিক নয়, ওর একটা গূঢ় অর্থ আছে। সেই অর্থ জানতে পারলেই সমস্যার সমাধান হবে।"

আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম রাংতার চাকতির তাৎপর্য কী? যদি ধরা যায় আততায়ী ওটা লাগাইয়াছিল তবে তাহার উদ্দেশ্য কী ছিল? যদি আততায়ী না লাগাইয়া থাকে তবে কে লাগাইল? বাড়ির কেহ যদি না হয় তবে কে? সত্যকাম কি? কিন্তু কেন?

ব্যোমকেশ হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, "অজিত, সত্যকামের সঙ্গে কী কী জিনিস ছিল--থানায় টেবিলের ওপর দেখেছিলে--মনে আছে?"

বলিলাম, "সিগারেট-কেস ছিল, রিস্টওয়াচ ছিল, মনিব্যাগ ছিল, মদের ফ্লাস্ক

ছিল আর- একটা ইলেকট্রিক টর্চ ছিল।"

ব্যোমকেশ আবার আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িল, 'ইলেকট্রিক টর্চ—! কলকাতায় পথ চলবার জন্যে ইলেকট্রিক টর্চ দরকার হয় না।"

"না। কিন্তু ফটক থেকে সদর দরজা পর্যন্ত যেতে হলে দরকার হয়।"

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, "তা হলে সত্যকাম টর্চের আলোয় আততায়ীকে দেখতে পায়নি কেন?"

সহসা এ-প্রশ্নের উত্তর যোগাইল না। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, তারপর ব্যোমকেশ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলিল, "কাল সকালে শীতাংশুর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলা দরকার।"

আমি উচ্চকিতভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম, কিন্তু সে আর কিছু বলিল না; বোধ করি কড়িকাঠ গুণিতে লাগিল। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, তাহার মুখের বিরস অন্যমনস্কতা আর নাই, যেন সে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখি ব্যোমকেশ কাহাকে ফোন করিতেছে। আমি চায়ের পেয়ালা লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলে সেও আসিয়া বসিল। তাহার মুখ গম্ভীর।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাকে ফোন করছিলে?"

ব্যোমকেশ বলিল, "ঊষাপতিবাবুকে।"

"হঠাৎ ঊষাপতিবাবুকে -"

"শীতাংশুকে পাঠিয়ে দিতে বললাম।"

"ও। -ওদের বাড়ির খবর কী?"

"খবর পুলিশ কাল সন্ধ্যেবেলা লাশ ফেরত দিয়েছিল--ওঁরা শেষ রাত্রে শ্মশান থেকে ফিরেছেন।" ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, "কাল যদি পুলিশ খানাতল্লাসি করত তা হলে রিভলভারটা বোধ হয় বাড়িতেই পাওয়া যেত। এখন আর পাওয়া যাবে না।"

"তার মানে বাড়ির লোকের কাজ।"

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না।

আধ ঘণ্টা পরে শীতাংশু আসিল। ব্যোমকেশ বলিল, "এস-বোস। কাল তোমার মামার সামনে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারিনি।"

শীতাংশু ব্যোমকেশের সামনের চেয়ারে বসিল এবং অপলক নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ আরম্ভ করিল, "কাল থানায় খবর পেলুম তুমি নাকি দাঙ্গার সময় গোটা দুত্তিন খুন করেছ। কথাটা সত্যি?"

শীতাংশু উত্তর দিল না, কিন্তু ভয় পাইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না; নির্ভীক একাগ্র চোখে চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ বলিল, "আমাকে স্বচ্ছন্দে বলতে পার, আমি পুলিশের লোক নই।"

শীতাংশুর গলাটা যেন একটু ফুলিয়া উঠিল, সে চাপা গলায় বলিল, "হ্যাঁ। ওরা আমার বাবাকে- "

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, "জানি। কী দিয়ে খুন করেছিল?"

"ছোরা দিয়ে।"

"তুমি কখনও রিভলভার ব্যবহার করেছ?"

"না।"

"সত্যকামের রিভলভার ছিল?"

"জানি না। বোধহয় ছিল না।"

'বাড়িতে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল কিনা জান?"

"জানি না।"

"সত্যকামের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব ছিল?"

"না। দুজনে দুজনকে এড়িয়ে চলতাম।"

"সত্যকাম লম্পট ছিল তুমি জানতে?"

"জানতাম।"

"তোমার বাবাকে তুমি ভালবাসতে। তোমার বোন চুমকিকেও নিশ্চয় ভালবাস?"

শীতাংশু উত্তর দিল না, কেবল চাহিয়া রহিল। ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "সত্যকামকে খুন করবার ইচ্ছে তোমার কোনদিন হয়েছিল?"

শীতাংশু এবারও উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার নীরবতার অর্থ স্পষ্টই বোঝা গেল। ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'বলতে হবে না, আমি বুঝেছি। সত্যকামকে তুমি বোধহয় শাসিয়ে দিয়েছিলে?"

শীতাংশু সহজভাবে বলিল, "হ্যাঁ। তাকে বলে দিয়েছিলাম, বাড়িতে বেচাল দেখলেই খুন করব।"

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিল; তীক্ষ্ণ চক্ষে নয়, যেন একটু অন্যমনস্কভাবে। তারপর বলিল, "সে-রাত্রে সহদেবের চিৎকার শুনে তুমি সদরে গিয়ে কি দেখলে?"

"দেখলাম সত্যকাম দরজার বাইরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।"

"কী করে দেখলে? সেখানে আলো ছিল?"

"সত্যকামের হাতে একটা জ্বলন্ত টর্চ ছিল, তারই আলোতে দেখলাম। তারপর মামা এসে সদরের আলো জ্বেলে দিলেন।"

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল। দুই তিনটা লম্বা টান দিয়া বলিল, "ও কথা যাক। সত্যকামকে নিয়ে তোমার মামা আর মামীর মধ্যে খুবই অশান্তি ছিল বোধহয়?"

"অশান্তি—?"

"হ্যাঁ। ঝগড়া বকাবকি—এ-রকম অবস্থায় যা হয়ে থাকে।"

শীতাংশু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "না, ঝগড়া বকাবকি হত না।"

"একেবারেই না?"

"না। মামা আর মামীমার মধ্যে কথা নেই।"

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিল, "কথা নেই! তার মানে?"

"মামা মামীমার সঙ্গে কথা বলেন না, মামীমাও মামার সঙ্গে কথা বলেন না।"

"সে কি, কবে থেকে?"

"আমি যবে থেকে দেখছি। আগে যখন মানিকতলায় ছিলাম, প্রায়ই মামার বাড়ি আসতাম। তখনও মামা-মামীমাকে কথা বলতে শুনিনি।"

"তোমার মামীমা কেমন মানুষ? ঝগড়াটে?"

"মোটেই না। খুব ভাল মানুষ।"

ব্যোমকেশ আর প্রশ্ন করিল না, চোখ বুজিয়া যেন ধ্যানস্থ হইয়া পড়িল। আমার মনে পড়িয়া গেল, কাল সকালবেলা ঊষাপতিবাবুর স্ত্রী সহসা ঘরে প্রবেশ করিলে তিনি বিস্ময়াহত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া ছিলেন। তখন তাঁহার সেই চাহনির অর্থ বুঝিতে পারি নাই।...স্বামী-স্ত্রীর দীর্ঘ মনান্তর কি পুত্রের মৃত্যুতে জোড়া লাগিয়াছে?

শীতাংশু চলিয়া যাইবার পরও ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া বসিয়া রহিল, তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিল, 'বড় ট্র্যাজিক ব্যাপার।—শীতাংশুকে কেমন মনে হল?"

"মনে হল সত্যি কথা বলছে।"

"ছেলেটা বুদ্ধিমান—ভারী বুদ্ধিমান।" বলিয়া সে আবার ধ্যানস্থ হইয়া পড়িল।

আধ ঘণ্টা পরে তাহার ধ্যান ভাঙিল বহির্দ্বারের কড়া নাড়ার শব্দে। আমি উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিলাম। দেখি—ঊষাপতিবাবু।

ছয়

ব্যোমকেশের আহ্বানে ঊষাপতিবাবু চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। ক্লান্ত অবসন্ন মূর্তি, চক্ষু দুটি ঈষৎ রক্তাভ; শরীর যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

ব্যোমকেশ সিগারেটের কৌটা তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিল। দুইজনে কিছুক্ষণ অনুসন্ধিৎসু চক্ষে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তারপর ঊষাপতিবাবু বলিলেন, "থাক, আমি এখনি উঠব। আপনার ফোন পাবার পর থানায় গিয়েছিলাম, তা ওরা তো কোনও খবরই রাখে না। তাই ভাবলাম দেখি যদি আপনি কোনও খবর পেয়ে থাকেন।"

ঊষাপতিবাবুর কথায় যে প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন ছিল ব্যোমকেশ সরাসরি তাহার উত্তর দিল না, বলিল, "একদিনের কাজ নয়, সময় লাগবে। আপনার ওপর দিয়ে খুবই ধকল যাচ্ছে, আপনি আজ বাড়ি থেকে না বেরুলেই পারতেন। আপনার স্ত্রীকেও দেখা শোনা করা দরকার।"

ঊষাপতিবাবুর মুখ লক্ষ্য করিলাম, স্ত্রীর প্রসঙ্গে তাঁহার মুখের কোনও ভাবান্তর হইল না; স্ত্রীর সহিত তাঁহার যে দীর্ঘকালের বিপ্রয়োগ তাহার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। বলিলেন, "আমার স্ত্রীর জন্যেই ভাবনা। তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন।" একটু থামিয়া বলিলেন, "ভাবছি কিছুদিনের জন্যে ওঁকে নিয়ে বাইরে ঘুরে এলে কেমন হয়। কলকাতার বাইরে গেলে হয়তো ওঁর মনটা—"

"তা ঠিক। কোথায় যাবেন কিছু ঠিক করেছেন?"

"না। কলকাতা ছেড়ে যেখানে হোক গেলেই বোধহয় কাজ হবে। কাশী বৃন্দাবন আগ্রা দিল্লী—। কিন্তু পুলিশ আপত্তি করবে না তো?"

"পুলিশকে বলে যাবেন। আমার বোধ হয় আপত্তি করবে না।"

"যদি আপত্তি না করে, কাল পরশুর মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। কলকাতা যেন বিষবৎ মনে হচ্ছে।—আচ্ছা নমস্কার।" বলিয়া উষাপতিবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার দোকান কি বন্ধ রাখবেন?"

'দোকান-সুচিত্রা? না, বন্ধ রাখব কেন? দোকানের পুরনো খাজাঞ্চি ধনঞ্জয়বাবু আছেন। বিশ্বাসী লোক; তিনি চালাবেন। আমার ভাগনে শীতুকেও ভাবছি দোকানে ঢুকিয়ে নেব, পড়াশুনো করে আর কী হবে, দোকানটাই দেখুক! আর তো আমার কেউ নেই।" নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি দ্বারের পানে চলিলেন।

"আপনি কি এখন দোকানের দিকে যাচ্ছেন?"

"না, দোকানে এখন আর যাব না। ধনঞ্জয়বাবুকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি।"

"আসুন তা হলে-নমস্কার।'

উষাপতিবাবু প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ পর পর তিনটা সিগারেট নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "আমি একবার বেরুচ্ছি। তুমি বাড়িতেই থাক।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"সুচিত্রা এম্পোরিয়মে। খাজাঞ্চি ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গে আলাপ করা দরকার।'

ব্যোমকেশ যখন ফিরিল তখন দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে। আমি স্নান সারিয়া অপেক্ষা করিতেছি, সত্যবতী অস্থিরভাবে ভিতর-বাহির করিতেছে। ব্যোমকেশ পাঞ্জাবিটা খুলিয়া ফেলিল, পাখা চালাইয়া দিয়া তক্তপোশের উপর লম্বা হইল। বসন্তকাল হইলেও দুপুরবেলার রৌদ্র বেশ কড়া।

বলিলাম, "খাজাঞ্চি মশায়ের সঙ্গে আলাপ বেশ জমে উঠেছিল দেখছি।

ব্যোমকেশ বলিল, "হুঁ। লোকটি কে জান? পরশু সুচিত্রার দোতলায় যে ক্যাশিয়ার আমাদের ক্যাশমেমো কেটেছিল সেই।"

"তাই নাকি? তা কী পেলে তার কাছ থেকে

"পেলাম--" ব্যোমকেশ ঘূর্ণ্ত পাখার পানে চাহিয়া হাসিল, 'একটা প্রীতি উপহার।"

"প্রীতি-উপহার!"

"হ্যাঁ। কুড়ি পঁচিশ বছর আগে বিয়ের সময় প্রীতি-উপহার ছাপার খুব চলন ছিল, এখন কমে গেছে। ঘুড়ির কাগজের মত পিতপিতে কাগজের রুমালে লাল কালিতে ছাপা কবিতা, মাথার ওপর ডানা-মেলে-দেওয়া প্রজাপতির ছবি। দেখেছ নিশ্চয়।"

"দেখেছি। খাজাঞ্চি মশায় এই প্রীতি-উপহার তোমাকে দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। ওই যে পাঞ্জাবির পকেটে রয়েছে, বার করে দেখ না।"

"কিন্তু—কার বিয়ের প্রীতি-উপহার?"

"পড়েই দেখ না।"

পাঞ্জাবির পকেট হইতে প্রীতি-উপহার বাহির করিলাম। পিতপিতে কাগজে লাল কালিতে ছাপা কবিতা, উপরে মুক্তপক্ষ প্রজাপতি, এবং তাহাকে ঘিরিয়া রামধনুর আকারে লেখা আছে-কুমারী সুচিত্রার সঙ্গে উষাপতির শুভ পরিণয়। তারপর কবিতা। এ-কবিতা পড়িয়া মানে বুঝিতে পারে এমন দিগ্‌গজ পণ্ডিত পৃথিবীতে নাই। সর্বশেষে কাব্য-রচয়িতার নাম, শ্রীধনঞ্জয় মণ্ডল ও সুচিত্রা এম্পোরিয়মের কর্মিবৃন্দ।

বলিলাম, "এই কবিতার ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পারে। এ ছাড়া আর

কিছু পেলে না?"

"আর কিছুর দরকার নেই। এই প্রীতি-উপহারের মধ্যে সব কিছু আছে।"

"কি আছে? আমি তো কিছু দেখছি না।"

'হায় অন্ধ। ভাল করে দেখ।"

কবিতা আবার পড়িলাম। পড়িতে খুবই কষ্ট হইল, তবু পড়িলাম। তারপর বলিলাম, "এ-কবিতার মধ্যে যদি কোনও ইশারা ইঙ্গিত থাকে তার মানে বোঝা আমার কম্ম নয়। সুচিত্রা নিশ্চয় উষাপতিবাবুর স্ত্রীর নাম, তার সঙ্গে উষাপতিবাবুর বিয়ে হওয়াতে ধনঞ্জয় মণ্ডল এবং সুচিত্রা এম্পোরিয়মের কর্মিবৃন্দ খুব আহ্লাদিত হয়েছিলেন, এইটুকুই আন্দাজ করছি।"

"কবিতা নয়, তারিখ তারিখ! বিয়ের তারিখটা দেখ।"

নীচের দিকে বাঁ কোণে লেখা ছিল ঃ

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭।

বলিলাম, "তারিখ দেখলাম, কিন্তু অজ্ঞানতমসা দূর হল না।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, "সত্যকাম তার জন্ম-তারিখ বলেছিল, মনে আছে?"

"বলেছিল মনে আছে, কিন্তু তারিখটা মনে নেই।"

"আমার মনে আছে।"

অধীর হইয়া উঠিলাম, "এ সব সন-তারিখের মানে কী? সত্যকামের খুনের সঙ্গেই বা তার সম্পর্ক কী?"

"ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, ভেবে দেখ।"

"ভেবে দেখতে পারি না। তুমি যদি বুঝে থাক কে খুন করেছে পষ্টাপষ্টি বল।"

"তুমি বুঝতে পারছ না?"

'না। কে খুন করেছে সত্যকামকে?"

'উষাপতিবাবু।"

"বাপ ছেলেকে খুন করেছে?"

"করলেও অন্যায় হত না, কিন্তু সত্যকাম উষাপতিবাবুর ছেলে নয়।"

মাথা গুলাইয়া গেল, কিছুক্ষণ জবুথবু হইয়া রহিলাম। তারপর সত্যবতী ভিতরের দরজা হইতে গলা বাড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁগা, আজ কি তোমাদের উপোস?"

* * *

অপরাহ্নে চারটের সময় আবার উষাপতিবাবু আসিলেন। এবারও অনাহূত আসিয়াছেন। সকালবেলার ক্লান্ত বিষণ্ণতা আর নাই, চক্ষে সতর্ক তীক্ষ্ণতা। তিনি আসিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে বসিলেন, কিছুক্ষণ শ্যেনদৃষ্টিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আপনি ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?"

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে বলিল, "হ্যাঁ গিয়েছিলাম।"

"কী জানতে গিয়েছিলেন?"

"যা জানতে গিয়েছিলাম তা জানতে পেরেছি।"

"কী জানতে গিয়েছিলেন?"

"সবই জানতে পেরেছি উষাপতিবাবু। এমন কি দোরে আঁটা রাংতার চাকতির তত্ত্বও অজানা নেই।"

উষাপতিবাবুর প্রশ্নের তীব্রতা যেন ধাক্কা খাইয়া থামিয়া গেল। তিনি আবার

খানিকক্ষণ ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর সংবৃত স্বরে বলিলেন, "যা জানতে পেরেছেন তা আদালতে প্রমাণ করতে পারবেন?"

ব্যোমকেশ বলিল, "আপনার বিয়ের তারিখ আর সত্যকামের জন্মের তারিখ ছাড়া আর কিছু প্রমাণ করা যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাইনি উষাপতিবাবু। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম। সত্যকাম আমাকে বলেছিল তার মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে, আসামীকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার কোনও দায়িত্ব আমার নেই।"

উষাপতিবাবু স্থিরনেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহার মুখভাবের পরিবর্তন হইল। এতক্ষণ তিনি যেন যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, এখন সহসা অস্ত্র নামাইলেন। অবিশ্বাস-মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "আপনি যা জানতে পেরেছেন পুলিশকে তা বলবেন না?"

ব্যোমকেশ বলিল, "না, পুলিশ আমার সাহায্য চায় না, আমি কেন গায়ে পড়ে তাদের সাহায্য করতে যাব?"

উষাপতিবাবু পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া দুই হাতে রুমাল দিয়া মুখ ঢাকিলেন। তাঁহার শরীর দুই তিনবার অবরুদ্ধ আবেগে ঝাঁকানি দিয়া উঠিল। তারপর তিনি যখন মুখ খুলিলেন, তখন দেখিলাম তাঁহার মুখের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর মরণাপন্ন রোগী প্রথম আরোগ্যের আশ্বাস পাইলে তাহার মুখে যে ভাব ফুটিয়া ওঠে উষাপতিবাবুর মুখেও সেই ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি আরও কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইলেন, তারপর ভাঙা ভাঙা স্বরে বলিলেন, "ব্যোমকেশবাবু, সত্যকামের মৃত্যু কেন দরকার হয়েছিল আপনি শুনবেন?"

ব্যোমকেশ বলিল, "শুনব। আপনি সব কথা বলুন।"

উষাপতিবাবু একবার কাতর চক্ষে আমার পানে চাহিলেন। তাঁহার চাহনির অর্থ: ব্যোমকেশের কাছে তিনি নিজের মর্ম-কথা বলিতে রাজী থাকিলেও আর কাহারও সম্মুখে বলিতে অনিচ্ছুক। ব্যোমকেশ তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া আমাকে বলিল "অজিত, তুমি একবার হাওড়া স্টেশনে যাও, এনকোয়ারি অফিস থেকে জেনে এস কাশ্মীর যাওয়ার ব্যবস্থা কী রকম। কাশ্মীরে গন্ডগোল চলছে, আগে থাকতে খবরাখবর নিয়ে রাখা ভাল।"

মনে মনে একটু নিরাশ হইলাম, তারপর জামা কাপড় বদলাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

সাত

হাওড়া স্টেশনের কাজ সারিয়া যখন ফিরিলাম তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। সদর দরজা ভেজানো ছিল, প্রবেশ করিয়া দেখিলাম উষাপতিবাবু চলিয়া গিয়াছেন, ছায়াচ্ছন্ন ঘরের অপর প্রান্তে জানালার সামনে চেয়ার টানিয়া সত্যবতী ও ব্যোমকেশ ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়া আছে। জানালা দিয়া ফুরফুরে দক্ষিণা বাতাস আসিতেছে। আমাকে দেখিয়া সত্যবতী একটু সরিয়া বসিল।

আমি কাছে আসিয়া বলিলাম, "বেশ তো কপোত-কপোতীর মত বসে মলয়

মারুত সেবন করছ।—খোকা কোথায়?"

সত্যবতী একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "পুঁটিরাম খোকাকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে গেছে।"

ব্যোমকেশ বলিল, "দেখ অজিত, কবিদের কথা মিছে নয়। তাঁরা যে বসন্ত ঋতুর সমাগমে ক্ষেপে ওঠেন তার যথেষ্ট কারণ আছে। মলয় মারুতে যুবক যুবতীরাই বেশি ঘায়েল হয় বটে কিন্তু বয়স্থ ব্যক্তিরাও বাদ পড়েন না। আমার বিশ্বাস, এটা যদি বসন্তকাল না হত তা হলে উষাপতিবাবু সত্যকামকে খুন করতেন কিনা সন্দেহ।"

বলিলাম, "বল কি! বসন্তকালের এমন মারাত্মক শক্তির কথা কবিরা তো কিছু লেখেননি।"

ব্যোমকেশ বলিল, "স্পষ্ট না লিখলেও ইশারায় বলেছেন। শক্তিমাত্রেই মারাত্মক; যে আগুন আলো দেয় সেই আগুনই পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে।—কিন্তু যাক, কাশ্মীরের খবর কী বল।"

বলিলাম, "কাশ্মীরে লড়াই বেধেছে, সাধারণ লোককে যেতে দিচ্ছে না। যেতে হলে ভারত সরকারের পারমিট চাই।"

আমি একটা চেয়ার আনিয়া ব্যোমকেশের অন্য পাশে বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, "পারমিট যোগাড় করা শক্ত হবে না। ভারত সরকারের সঙ্গে এখন আমার গভীর প্রণয়, অন্তত যতদিন বল্লভভাই প্যাটেল বেঁচে আছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, সবাই মিলে কাশ্মীর যাওয়া কি ঠিক হবে? খোকা সবেমাত্র স্কুলে ঢুকেছে, গরমের ছুটিরও দেরি আছে। ওকে স্কুল কামাই করিয়ে নিয়ে যাওয়া আমার উচিত মনে হচ্ছে না।"

সত্যবতী বলিল, "খোকা যাবে কেন? খোকা বাড়িতেই থাকবে। ঠাকুরপো, তুমি খোকার দেখাশুনা করতে পারবে না?"

আমি কিছুক্ষণ সত্যবতীর পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম, "ও, এই মতলব। তোমরা দুটিতে হংস-মিথুনের মত কাশ্মীরে উড়ে যাবে, আর আমি খোকাকে নিয়ে বাসায় পড়ে থাকব। ভাই ব্যোমকেশ, তুমি ঠিক বলেছ, বসন্তঋতু বড় মারাত্মক ঋতু। কিন্তু কুছ পরোয়া নেই। যাও তোমরা টো টো করে বেড়াও গে, আমি খোকাকে নিয়ে মনের আনন্দে থাকব। সত্যি কথা বলতে কি, কাশ্মীর যাবার ইচ্ছে আমার একটুও ছিল না। বাংলাদেশই আমার ভূস্বর্গ, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিলাম।

সত্যবতী ঠোঁটের উপর আঁচল চাপা দিয়া হাসি গোপন করিল। ব্যোমকেশ মৃদু গুঞ্জনে কবিতা আবৃত্তি করিল, "যৌবন মধুর কাল, আও বিনাশিবে কাল, কালে পিও প্রেম-মধু করিয়া যতন।—একটা সিগারেট দাও।"

সিগারেট দিয়া বলিলাম, "কবিতা পড়ে পড়ে তোমার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু ও-কথা এখন থাক, উষাপতি যে নিজের চরিতামৃত শুনিয়ে গেলেন তা বলতে বাধা আছে কি?"

ব্যোমকেশ বলিল, "কিছুমাত্র না। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। তোমাদের দু'জনকেই শোনাতে চাই। বড় মর্মান্তিক কাহিনী।"

সিগারেট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল—

"সত্যকাম আমার কাছে এসেছিল এক আশ্চর্য প্রস্তাব নিয়ে—আমার যদি

হঠাৎ মৃত্যু হয় আপনি অনুসন্ধান করবেন। সে জানত কে তাকে খুন করতে চায়, কিন্তু তার নাম আমাকে বলল না। তখনই আমার মনে প্রশ্ন জাগল—নাম বলতে চায় না কেন? এখন জানতে পেরেছি, নাম না বলার গুরুতর কারণ ছিল, পারিবারিক কেচ্ছা বেরিয়ে পড়ত। সে যে জারজ, তার মা যে কলঙ্কিনী, এ-কথা সে প্রকাশ করতে পারেনি, নিজের মুখে নিজের কলঙ্ক-কথা কটা লোক প্রকাশ করতে পারে? সবাই তো আর সত্যযুগের সত্যকাম নয়।

"তবু একটা ইঙ্গিত সে আমাকে দিয়ে গিয়েছিল- তার জন্ম-তারিখ। কিন্তু এমনভাবে দিয়েছিল যে, একবারও সন্দেহ হয়নি তার জন্ম-তারিখের মধ্যেই তার মৃত্যু-রহস্যের চাবি আছে। সে জানত, আমি যদি অনুসন্ধান আরম্ভ করি তা হলে জন্ম-তারিখটা আমার কাজে লাগবে। সত্যকাম বিবেকহীন লম্পট ছিল, কিন্তু তার বুদ্ধির অভাব ছিল না।

"এবার গোড়া থেকে গল্পটা বলি। সত্যকামের জন্মের আগে থেকে সে-গল্পের সূত্রপাত। ঊষাপতিবাবুর মুখেই এ-গল্পের বেশির ভাগ শুনেছি, তবু গল্পটা যে সত্যি তাতে সন্দেহ নেই। তিনি নিজেকে বেয়াত করেননি, নিজের দোষ দুর্বলতা অকপটে ব্যক্ত করেছেন।

"বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রমাকান্ত চৌধুরী সুচিত্রা এম্পোরিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন। রমাকান্ত চৌধুরীর একমাত্র মেয়ের নাম সুচিত্রা, মেয়ের নামেই দোকানের নাম। চৌধুরী মশায় ভারী চতুর ব্যবসাদার ছিলেন, দু-চার বছরের মধ্যেই তাঁর দোকান ফেঁপে উঠল। ধর্মতলায় নতুন বাড়ি তৈরি হল, জমজমাট ব্যাপার। চৌধুরী মশায়ের সুচিত্রা এম্পোরিয়াম বিলাতী দোকানের সঙ্গে টেক্কা দিতে লাগল।

"ঊষাপতি দাস ১৯২৫ সনে সামান্য শপ-অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি নিয়ে সুচিত্রা এম্পোরিয়মে ঢোকেন। তখন তাঁর বয়স একুশ বাইশ; গরিবের ঘরের বাপ-মা-মরা ছেলে, লেখাপড়া বেশি শেখেননি। কিন্তু চেহারা ভাল, বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। দু চার দিনের মধ্যেই তিনি দোকানের মাল বিক্রি করার কায়দাকানুন শিখে নিলেন, খদ্দেরকে কী করে খুশী রাখতে হয় তার কৌশল আয়ত্ত করে ফেললেন। সহকর্মী-দের মধ্যে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। ক্রমে স্বয়ং কর্তার সুনজর পড়ল তাঁর ওপর। দু-চার টাকা করে মাইনে বাড়তে লাগল।

"দু-বছর কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন ঊষাপতিবাবুর চরম ভাগ্যোদয় হল। রমাকান্ত চৌধুরী তাঁকে নিজের অফিস-ঘরে ডেকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাই।' এ-প্রস্তাব ঊষাপতির কল্পনার অতীত, তিনি যেন চাঁদ হাতে পেলেন। সেই যে রূপকথা আছে, পথের ভিকিরির সঙ্গে রাজ-কন্যের বিয়ে, এ যেন তাই। সুচিত্রাকে ঊষাপতি আগে অনেকবার দেখেছেন, সুচিত্রা প্রায়ই দোকানে আসতেন। ভারী মিষ্টি নরম চেহারা। ঊষাপতির মন রোমান্সের গন্ধে ভরে উঠল।

'মাসখানেকের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল। খুব ধুমধাম হল। ঊষাপতির সহকর্মীরা প্রীতি-উপহার ছেপে বন্ধুকে অভিনন্দন জানালেন। ঊষাপতি এতদিন তাঁর বিবাহিতা বোনের বাড়িতে থাকতেন, এখন শ্বশুরবাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ি। রমাকান্ত চৌধুরী বড়মানুষ, তায় বিপত্নীক; তিনি মেয়েকে কাছ-ছাড়া করতে চান না।

"টোপের মধ্যে বঁড়শি আছে ঊষাপতি তা টের পেলেন ফুলশয্যার রাত্রে। রূপকথার স্বপ্ন-ইমারত ভেঙে পড়ল, বুঝতে পারলেন সুচিত্রা এম্পোরিয়মের কর্তা কেন দীন-দরিদ্র কর্মচারীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ফুলের বিছানায় শয়ন করা হল না, ঊষাপতিবাবু সারা রাত্রি একটা চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলেন। সকালবেলা শ্বশুরকে গিয়ে বললেন –আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, এবার আমাকে বিদায় দিন।

"রমাকান্ত চৌধুরী ঘড়েল ব্যবসাদার, তিনি বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন; মোলায়েম সুরে জামাইকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন –সুচিত্রা ছেলেমানুষ, মা মরা মেয়ে, তার ওপর আজকাল দেশে যে হাওয়া বইতে শুরু করেছে তাতে মেয়েদের সামলে রাখাই দায়। সুচিত্রা খুবই ভাল মেয়ে কেবল বর্তমান আবহাওয়ার দোষে একটু ভুল করে ফেলেছে। আজকাল ঘরে ঘরে এই ব্যাপার হচ্ছে, ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়, কিন্তু বাইরের লোক কি জানতে পারে? সবাই বৌ নিয়ে মনের সুখে ঘরকন্না করে। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে নিজের মুখেই চুন কালি পড়বে। অতএব –

"ঊষাপতি কিন্তু কথায় ভুললেন না, বললেন, 'আমায় মাপ করুন, আমি গরিব বটে কিন্তু সদ্‌বংশের ছেলে। আমি পারব না।'

"কথায় চিঁড়ে ভিজল না দেখে রমাকান্ত চৌধুরী ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন। দেরাজ থেকে ইস্টম্বারি কাগজে লেখা দলিল বার করে বললেন, 'আজ থেকে সুচিত্রা এম্পোরিয়মের তুমি আট আনা অংশীদার। এই দেখ দলিল। আমি মরে গেলে আমার যা কিছু সব তোমরাই পাবে। আমার তো আর কেউ নেই। কিন্তু আজ থেকে তুমি আমার পার্টনার হলে। দোকানে আমার হুকুম যেমন চলে তোমার হুকুমও তেমনি চলবে।'

"ঊষাপতির মাথা ঘুরে গেল। রাজকন্যাটি দাগী বটে কিন্তু হাতে হাতে অর্ধেক রাজত্ব। মোট কথা ঊষাপতি শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন, সদ্য সদ্য এত টাকার লোভ সামলাতে পারলেন না। তিনি শ্বশুরবাড়িতে থাকতে রাজী হলেন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক রইল না। সেই যে ফুলশয্যার রাত্রে দু চারটে কথা হয়েছিল, তারপর থেকে কথা বন্ধ, শোবার ব্যবস্থাও আলাদা। বাইরের লোকে অবশ্য কিছু জানল না, ধোঁকার টাটি বজায় রইল।

"রমাকান্ত যে বলেছিলেন সুচিত্রা ভাল মেয়ে, সে-কথা নেহাত মিথ্যে নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাঁধন ভাঙার একটা ঢেউ এসেছিল, উচ্চবিত্ত সমাজের অবাধ মেলা-মেশা সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুচিত্রা আলোর নেশায় বিভ্রান্ত হয়ে একটু বেশি মাতামাতি করেছিলেন। অভিভাবিকার অভাবে গণ্ডীর বাইরে যে পা দিচ্ছেন তা বুঝতে পারেননি। কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে তাঁর হুঁশ হল। বিয়ের পর তিনি বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন, শান্ত সংযতভাবে বাড়িতে রইলেন। রমাকান্তের বাড়িতে লোক কম, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, কেবল রমাকান্ত, সুচিত্রা আর ঊষাপতি। স্থায়ী চাকরের মধ্যে সহদেব, আর বাকী ঝি-চাকর শুকো। সহদেব চাকরটার বুদ্ধিসুদ্ধি বেশি নেই, কিন্তু অটল তার প্রভু-পরিবারের প্রতি ভক্তি। তাই ঘরের কথা বাইরে চাউর হতে পেল না।

"বিয়ের মাস দেড়েক পরে রমাকান্ত মেয়েকে নিয়ে বিলেত গেলেন। ওজুহাত দেখালেন, মেয়ের শরীর খারাপ, তাই চিকিৎসার জন্যে বিলেত নিয়ে যাচ্ছেন।

ঊষাপতি দোকানের সর্বময় কর্তা হয়ে কাজ চালাতে লাগলেন।

"প্রায় এক বছর পরে রমাকান্ত বিলেত থেকে ফিরলেন। সুচিত্রার কোলে ছেলে। ছেলে দেখে বোঝা যায় না তার বয়স দু-মাস কি পাঁচ মাস...

"তারপর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে ঊষাপতিবাবুর নীরস প্রাণহীন জীবন-যাত্রা আরম্ভ হল। স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, শ্বশুরের সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ। দোকানটিকে ঊষাপতি প্রাণ দিয়ে ভালবাসলেন। তবু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? অন্তরের মধ্যে ক্ষুধিত যৌবন হাহাকার করতে লাগল। ওদিকে সুচিত্রা সঙ্কুচিত হয়ে নিজেকে নিজের মধ্যে সংহরণ করে নিয়েছেন। মাঝে মাঝে ঊষাপতি তাঁকে দেখতে পান, মনে হয় সুচিত্রা যেন কঠোর তপস্বিনী। তাঁর মনটা কোমল হয়ে আসে, তিনি জোর করে নিজেকে শক্ত রাখেন।

"একটি একটি করে বছর কাটতে থাকে। সত্যকাম বড় হয়ে উঠতে লাগল। লম্পট বাপের উচ্ছৃঙ্খল রক্ত তার শরীরে, তার যত বয়স বাড়তে লাগল রক্তের দাগও তত ফুটে উঠতে লাগল। সব রকম রক্তের দাগ মুছে যায়, এ-রক্তের দাগ কখনও মোছে না। সত্যকাম কারুর শাসন মানে না, নিজের যা ইচ্ছে তাই করে; কিন্তু ভয়ানক ধূর্ত সে, কুটিল তার বুদ্ধি। দাদামশায়কে সে এমন বশ করেছে যে সব জেনেশুনেও তিনি কিছু বলতে পারেন না। সুচিত্রা শাসন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ঊষাপতি সত্যকামের কোনও কথায় থাকেন না, সব সময় নিজেকে আলাদা রাখেন...স্ত্রীর কানীন পুত্রকে কোনও পুরুষই স্নেহের চক্ষে দেখতে পারে না। সত্যকামের স্বভাব চরিত্র যদি ভাল হত তা হলে ঊষাপতি হয়তো তাকে সহ্য করতে পারতেন, কিন্তু এখন তাঁর মন একেবারে বিষিয়ে গেল। সুচিত্রার সঙ্গে ঊষাপতির একটা ব্যবহারিক সংযোগের যদি বা কোনও সম্ভাবনা থাকত তা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। ঊষাপতি আর সুচিত্রার মাঝখানে সত্যকাম ফণি-মনসার কাঁটা-বেড়ার মত দাঁড়িয়ে রইল।

"সত্যকামের যখন ঊনিশ বছর বয়স, তখন রমাকান্ত মারা গেলেন, সত্যকামকে নিজের অংশ উইল করে দিয়ে গেলেন। এই সময় সত্যকাম নিজের জন্মরহস্য জানতে পারল। বিলেতে তার জন্ম হয়েছিল, সুতরাং বার্থ-সার্টিফিকেট ছিল। দাদামশায়ের কাগজপত্রের মধ্যে সেই বার্থ-সার্টিফিকেট বোধহয় সে পেয়েছিল, তারপর পারিবারিক পরিস্থিতি দেখে আসল ব্যাপার বুঝে নিয়েছিল। সে বাইরে ভারী কেতাদুরস্ত ছেলে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীষণ কুটিল আর হিংসুক। ঊষাপতি আর সুচিত্রার প্রতি তার ব্যবহার হিংস্র হয়ে উঠল। একদিন সে নিজের মাকে স্পষ্টই বলল, 'তুমি আমাকে শাসন করতে আস কোন লজ্জায়! আমি সব জানি।' ঊষাপতিকে বলল, 'আপনি আমার বাপ নন আপনাকে খাতির করব কিসের জন্যে?'

"বাড়িতে ঊষাপতি আর সুচিত্রার জীবন দুর্বহ হয়ে উঠল। ওদিকে দোকানে গিয়ে সত্যকাম আর-একরকম খেলা দেখাতে আরম্ভ করল। সে এখন দোকানের অংশীদার, ঊষাপতির সঙ্গে তার অধিকার সমান। সে নিজের অধিকার পুরো-দস্তুর জারি করতে শুরু করল। সুচিত্রার মত শৌখিন দোকানে পুরুষের চেয়ে মেয়ে খদ্দেরেরই ভিড় বেশি; সত্যকাম তাদের মধ্যে থেকে কমবয়সী সুন্দরী মেয়ে বেছে নিত, তাদের সঙ্গে ভাব করত, দোকানের দামী জিনিস সস্তায় তাদের বিক্রি করত, হোটেলে নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়াত। দোকানের তহবিল থেকে যখন

যত টাকা ইচ্ছে বার করে দু-হাতে ওড়াত। মদ, ঘোড়দৌড়, বড় বড় ক্লাবে গিয়ে জুয়া খেলা তার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যসন হয়ে উঠল।

"রমাকান্তর মৃত্যুর পর বছরখানেক যেতে না যেতেই দেখা গেল দোকানের অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে, আর বেশি দিন এভাবে চলবে না। উষাপতিবাবু বাধা দিতে গেলে সত্যকাম বলে, 'আমার টাকা আমি ওড়াচ্ছি, আপনার কী?' উপরন্তু দোকানের একটা বদনাম রটে গেল, মেয়েদের ও-দোকানে যাওয়া নিরাপদ নয়। খদ্দের কমে যেতে লাগল। বিভ্রান্ত উষাপতিবাবু কী করবেন ভেবে পেলেন না।

"পরিস্থিতি যখন অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, তখন একটি ব্যাপার ঘটল। একদিন সন্ধ্যার পর কী একটা কাজে উষাপতি বাড়িতে এসেছেন, ওপরে নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে শুনতে পেলেন পাশের ঘর থেকে একটা অবরুদ্ধ কাতরানি আসছে। পাশের ঘরটা তাঁর স্ত্রীর ঘর। পা টিপে টিপে উষাপতি দোরের কাছে গেলেন। দেখলেন, তাঁর স্ত্রী একলা মেঝেয় মাথা কুটছেন আর বলছেন, 'এখনো কি আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি? আর যে আমি পারি না।'

"উষাপতি চুপি চুপি নীচে নেমে গেলেন। সহদেবকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, সন্ধ্যের আগে পাড়ার একটি বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, তিনি সুচিত্রাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে গেছেন। মহিলাটির মেয়েকে নাকি সত্যকাম সিনেমা দেখাচ্ছে আর বিলিতী হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াচ্ছে।

"সেই দিন উষাপতি সংকল্প করলেন, সত্যকামকে সরাতে হবে। তাকে খুন না করলে কোনও দিক দিয়েই নিস্তার নেই। এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।

"উষাপতি তৈরি হলেন। তাঁর একটা সুবিধে ছিল, সত্যকাম যদি খুন হয় তাঁকে কেউ সন্দেহ করবে না। বাইরে সবাই জানে সত্যকাম তাঁর ছেলে, বাপ ছেলেকে খুন করেছে এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সত্যকামের অনেক শত্রু, সন্দেহটা তাদের ওপর পড়বে। তবু এমনভাবে কাজ করা দরকার, যাতে কোনও মতেই তাঁর পানে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়।

"উষাপতি একটি চমৎকার মতলব বার করলেন। একজন চেনা গুণ্ডার কাছ থেকে একটি রিভলভার যোগাড় করলেন। ছেলেবেলায় কিছুদিন তিনি সন্ত্রাসবাদীদের দলে মিশেছিলেন, রিভলভার চালানোর অভ্যাস ছিল; তিনি কয়েকবার বেলঘরিয়ার একটা আম-বাগানে গিয়ে অভ্যাসটা ঝালিয়ে নিলেন। তারপর সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

"সত্যকাম ঝানু ছেলে, সে উষাপতির মতলব বুঝতে পারল; কিন্তু নিজেকে বাঁচাবার কোনও উপায় খুঁজে পেল না। পুলিশের কাছে গেলে নিজের জন্ম-রহস্য ফাঁস হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সে হতাশ হয়ে আমার কাছে এসেছিল। উষাপতিবাবু অবশ্য সে-খবর জানতেন না।

"যে-রাত্রে সত্যকাম খুন হয়, সে-রাত্রিটা ছিল শনিবার। শনিবারে সত্যকাম অন্য রাত্রির চেয়েও দেরী করে বাড়ি ফেরে, সুতরাং শনিবারই প্রশস্ত। উষাপতিবাবু একটি রাংতার চাকতি তৈরি করে রেখেছিলেন; রাত্রি সাড়ে দশটার সময় যখন সহদেব রান্নাঘরে খেতে গিয়েছে, তখন তিনি চুপি চুপি নেমে এসে সেটি সদর দরজার কপাটে জুড়ে দিয়ে আবার নিঃশব্দে উপরে উঠে গেলেন। সদর দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ রইল, বাহিরে যে রাংতার চাকতি সাঁটা হয়েছে তা কেউ জানতে

পাবল না। শ্বকো ঝি আব বাঁধ্বনী তাব অনেক আগেই বাড়ি চলে গেছে।

'সহদেব খাওয়া-দাওয়া শেষ কবে খিড়কিব দবজায তালা লাগাল, তাবপব সদব বাবান্দায গিয়ে বিছানা পেতে শ্বল। ওপবে ঊষাপতিবাব্ব নিজেব ঘবে আলো নিভিয়ে অপেক্ষা কবে বইলেন, সামনেব দিকেব ব্যালকনিব দবজা খ্বলে বাখলেন।

"দ্ব-ঘণ্টা অপেক্ষা কবাব পব ফটকেব কাছে শব্দ হল সত্যকাম আসছে। ঊষাপতি ব্যালকনিতে বেবিয়ে এসে ঘাপটি মেবে বইলেন। ফটক থেকে সদব দবজা পর্যন্ত বাস্তা অন্ধকাব সত্যকাম টর্চ জেবলে পথ দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছে। সদব দবজায টোকা মেবে হঠাৎ তাব নজবে পড়ল দবজাব নীচেব দিকে টাকাব মত একটা চাকতি টর্চেব আলোয চকচক কবছে। সে সামনেব দিকে ঝ্বকে সেটা দেখতে গেল। অমনি ঊষাপতিবাব্ব ব্যালকনি থেকে ঝ্বকে গ্বলী কবলেন। বিভল ভাবেব গ্বলী সত্যকামেব পিঠ ফ্বড়ে কবে ব্বকেব হাড়ে গিয়ে আটকাল। সত্যকাম সেইখানেই ম্বখ থ্ববড়ে পড়ল হাতেব জ্বলন্ত টর্চটা জ্বলতেই বইল।

'এই হল সত্যকামেব মৃত্যুব প্রকৃত ইতিহাস। ঊষাপতিবাব্ব এমন কৌশল কবেছিলেন যে লাশ পবীক্ষা কবে মনে হবে পিছন দিক থেকে কেউ তাকে গ্বলী কবেছে ওপব দিক থেকে গ্বলী কবা হয়েছে তা কিছ্বতেই বোঝা যাবে না। বাংতাব চাকতিটা যদি না থাকত আমিও ব্বঝতে পাবতাম না।

ব্যোমকেশ চুপ কবিল। আমবাও অনেকক্ষণ নীবব বহিলাম। তাবপব একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিযা সত্যবতী বলিল, 'তুমি প্রথম কখন ঊষাপতিবাব্বকে সন্দেহ কবলে?'

ব্যোমকেশ বলিল গোড়া থেকেই আমাব সন্দেহ হয়েছিল বাড়িব লোকেব কাজ যদি বাইবেব লোকেব কাজ হবে তা হলে সত্যকাম হত্যাকাবীব নাম বলবে না কেন? তখনই আমাব মনে হয়েছিল এই সংকল্পিত হত্যাব পিছনে এক ... গ্বহ্য পাবিবাবিক কলঙ্ক কাহিনী ল্বকিয়ে আছে।

তাবপব জানতে পাবলাম ঊষাপতি আব স্বচিত্রাব দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক নয। দীর্ঘকাল ধবে তাদেব মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ শোবাব ঘবও আলাদা। মনে খটকা লাগল। খাজাঞ্চি মহাশযেব সঙ্গে আলাপ জমালাম। লোকটি ঊষাপতিবাব্বব দবদী বন্ধ্ব তিনিই একুশ বছব আগে বন্ধ্বব বিয়েতে প্রীতি উপহাব লিখেছিলেন। প্রীতি উপহাবটি খাজাঞ্চি মশাই খ্বব যত্ন কবে বেখে দিয়েছিলেন কাবণ এটি তাঁব প্রথম এবং একমাত্র কবি-কীর্তি। আমি যখন প্রীতি উপহাবটি হাতে পেলাম তখন আব কোনও সংশয বইল না। সত্যকামেব জন্ম তাবিখ মনে ছিল—৭ই জ্বলাই, ১৯২৭। আব বিয়েব তাবিখ ১৩ই ফেব্রুয়াবি, ১৯২৭। অর্থাৎ বিয়েব পব পাঁচ মাস পূর্ণ হবাব আগেই ছেলে হয়েছে। ব্বঝতে বমাকান্ত কেন দবিদ্র কর্মচাবীব সঙ্গে মেযেব বিয়ে দিয়েছিলেন ব্বঝতে কষ্ট হয না।

'সত্যকাম ঊষাপতিব ছেলে নয, স্বতবাং তাকে খ্বন কবাব পক্ষে ঊষাপতিব কোনও বাধা নেই। কিন্তু তিনি খ্বন কবলেন কী কবে? যখন জানতে পাবলাম মৃত্যুকালে সত্যকামেব হাতে জ্বলন্ত টর্চ ছিল তখন এক মুহূর্তে বাংতাব চাকতিব উদ্দেশ্য পবিষ্কাব হয়ে গেল। সত্যকামেব টর্চেব আলো দোবেব ওপব পড়েছিল, বাংতাব চাকতিটা চকমক্ কবে উঠেছিল সত্যকাম সামনে ঝ্বকে দেখতে গিয়েছিল ওটা কী চকমক্ কবছে। ব্যাস্ '

আবাব কিছ্বক্ষণ নীববতা। আমি ব্যোমকেশকে সিগাবেট দিযা নিজে একটা

লইলাম, দু'জনে টানিতে লাগিলাম। ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, দখিনা বাতাস চুপি চুপি আমাদের ঘিরিয়া খেলা করিতেছে।

হঠাৎ ব্যোমকেশ বলিল, "আজ উষাপতিবাবু যাবার সময় আমার হাত ধরে বললেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আমি আর আমার স্ত্রী জীবনে বড় দুঃখ পেয়েছি একুশ বছর ধরে শ্মশানে বাস করেছি। আজ আমরা অতীতকে ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে চাই, একটু সুখী হতে চাই। আপনি আর জল ঘোলা করবেন না।' আমি উষাপতিবাবুকে কথা দিয়েছি, জল ঘোলা করব না। কাজটা হয়তো আইনসংগত হচ্ছে না। কিন্তু আইনের চেয়েও বড় জিনিস আছে—ন্যায়ধর্ম! তোমাদের কী মনে হয়? আমি অন্যায় করেছি?"

সত্যবতী ও আমি সমস্বরে বলিলাম, "না।"

ম ণি ম ণ্ড ন

প্রসিদ্ধ মণিকার রসময় সরকারের বাড়ি হইতে একটি বহুমূল্য জড়োয়াব নেকলেস চুরি গিয়াছে। সকালবেলা খবরের কাগজ পড়িবার সময় বিলম্বিত সংবাদের স্তম্ভে খবরটা দেখিয়াছিলাম। বেলা আন্দাজ আটটার সময় টেলিফোন আসিল।

অপরিচিত ব্যগ্র কণ্ঠস্বর, 'হ্যালো! ব্যোমকেশবাবু?'

বলিলাম, 'না, আমি অজিত। আপনি কে?'

টেলিফোন বলিল, 'আমার নাম রসময় সবকাব। ব্যোমকেশবাবুকে একবার ডেকে দেবেন?'

নাম শুনিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না যে, চোব ধবিবাব জন্য ব্যোমকেশেব ডাক আসিয়াছে। বলিলাম, 'সে বাথরুমে গিয়েছে বেরুতে দেরি হবে। কাগজে দেখলাম আপনার দোকান থেকে নেকলেস চুরি গেছে।'

উত্তর হইল, 'দোকান থেকে নয়, বাড়ি থেকে।—আপনি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশবাবুর বন্ধু?'

বলিলাম, 'হ্যাঁ। ব্যোমকেশকে যা বলতে চান, আমাকে বলতে পাবেন।'

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বসময় বলিলেন, 'দেখুন, যে নেকলেসটা চুবি গেছে তার দাম সাতান্ন হাজাব টাকা। সন্দেহ হচ্ছে বাড়ির একটা চাকব চুবি করেছে, কিন্তু কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিসে অবশ্য খবর দিয়েছি, কিন্তু আমি ব্যোমকেশবাবুকে চাই। তিনি ছাড়া নেকলেস কেউ উদ্ধাব কবতে পাববে না।'

বলিলাম, 'বেশ তো, আপনি আসুন না। আপনি আসতে আসতে ব্যোমকেশও বাথরুম থেকে বেরুবে।'

রসময় একটু কাতরভাবে বলিলেন, 'দেখুন, আমি বেতো রুগী, বেশী নড়াচড়া করতে পারি না। তার চেয়ে যদি আপনাবা আসেন তো বড় ভাল হয়।'

যাহারা বিপদে পড়ে তাহাবাই ব্যোমকেশেব কাছে আসে, সে আগে কাহারও কাছে যায় না। আমি বলিলাম, 'বেশ, ব্যোমকেশকে বলব।'

রসময়ের মিনতি আবও নির্বন্ধপূর্ণ হইয়া উঠিল, 'না না বলাবলি নয়, নিশ্চয় আসবেন। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনাদেব কোনও অসুবিধা হবে না।'

'বেশ।'

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এখনি গাড়ি পাঠাচ্ছি।'

মিনিট কয়েক পর একটি ক্যাডিল্যাক্ গাড়ি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ বাথরুম হইতে বাহির হইলে তাহাকে সকল কথা বলিলাম এবং জানলা দিয়া গাড়ি দেখাইলাম। দেখিয়া শুনিয়া সে আপত্তি করিল না। আমবা ক্যাডিলাকে চড়িয়া যাত্রা করিলাম।

কলিকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে রসময় সবকারের গোটা পাঁচেক সোনাদানা হীরা-জহরতের দোকান আছে, কিন্তু তাঁর বসতবাড়ি বৌবাজারে। অল্পকাল মধ্যে গাড়ি তাঁহার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।

রসময় সরকারের বাড়িটি সাবেক ধরনের, একেবারে ফুটপাথের কিনারা হইতে

তিনতলা উঠিয়া গিয়াছে। মাঝখানে উপরতলায় উঠিবার দ্বারমুক্ত সিঁড়ি, দুই পাশে দোকানের সারি। গৃহস্বামী উপরের দুইতলা লইয়া থাকেন।

সিঁড়ির দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, গাড়ি গিয়া থামিতেই দ্বার খুলিয়া একটি যুবক বাহির হইয়া আসিল। শৌখিন সুদর্শন চেহারা, বয়স সাতাশ আটাশ। নমস্কার করিয়া বলিল, 'আমার নাম মণিময় সরকার। বাবা ওপরে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আসুন।'

আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। দ্বিতলে আছে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, চাকরদের থাকিবার স্থান এবং তক্তপোশপাতা একটি বসিবার ঘর। আমরা দ্বিতল ছাড়াইয়া ত্রিতলে উঠিয়া গেলাম। এই ত্রিতলে গৃহস্বামী সপরিবারে বাস করেন।

তৃতীয় তলে উঠিলে গৃহস্বামীর বিত্তবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাতী তালা লাগানো ভারী দরজায় রেশমী পর্দা, মেঝেয় পুরু গালিচা; ড্রয়িংরুমটি দামী আসবাব দিয়া সাজানো, গদি-মোড়া সোফা সেটের মাঝখানে কাশ্মীরী কাঠের নিচু টেবিল; দুই জানালার মাঝখানে বইয়ের আলমারি, দেয়ালে পারসিক ছবি-আঁকা ট্যাপেস্ট্রি ইত্যাদি। উপস্থিত ঘরটি একটু অবিন্যস্ত। মণিময় আমাদের ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, 'বাবা, ব্যোমকেশবাবু এসেছেন।'

দেখিলাম রসময় সরকার একটি চেয়ারে বসিয়া ডান পা সম্মুখদিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন এবং একটি বিবাহিতা যুবতী তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার আঙুলে সেঁক দিতেছে। রসময়বাবুর বয়স অনুমান পঞ্চাশ, ভারী গড়নের শরীর, মাংসল মুখ এখনও বেশ দৃঢ় আছে। আমাদের দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন, আমার ও ব্যোমকেশের পানে পর্যায়ক্রমে চক্ষু ফিরাইয়া দুই করতল যুক্ত করিয়া ব্যোমকেশকে বলিলেন, 'আসুন ব্যোমকেশ-বাবু। আমি সব দিক দিয়েই বড় কাবু হয়ে পড়েছি। আপনি—আপনারা এসেছেন, আমি বাঁচলাম। বসুন, বসুন অজিতবাবু।'

আমাদের মধ্যে কে ব্যোমকেশ তাহা প্রশ্ন না করিয়াও তিনি বুঝিয়াছেন। রসময় সরকার বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা সোফায় পাশাপাশি বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'পায়ে বাত ধরেছে দেখছি। বাত রোগটা মারাত্মক নয়, কিন্তু বড় কষ্টদায়ক।'

রসময় বলিলেন 'আর বলবেন না। আমার শরীর বেশ ভালই, কিন্তু এই বাতে আমাকে পঙ্গু করে ফেলেছে। ছেলেবেলায় ফুটবল খেলতাম, ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা ভেঙে গিয়েছিল। এখন এমন দাঁড়িয়েছে, আকাশের এক কোণে রুমালের মত এক টুকরো মেঘ উঠলে বুড়ো আঙুলে চিড়িক্ মারতে থাকে।—কিন্তু সে যাক, বৌমা, এঁদের জন্যে চা নিয়ে এস।'

বধূটি এতক্ষণ হেঁটমুখে বসিয়া শ্বশুরের পায়ে সেঁক দিতেছিল। সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু তাহার মুখে পারিবারিক বিপদের ছায়া পড়িয়াছে। সে উঠিবার উপক্রম করিতেই ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, চায়ের দরকার নেই আমি চা খেয়ে বেরিয়েছি। উনি শ্বশুরের পদসেবা করছেন করুন।'

রসময় একটু হাসিলেন, বধূ আবার বসিয়া পড়িল। রসময় বলিলেন, 'আচ্ছা, তবে থাক। মণি, সিগারেট নিয়ে এস।'

মণিময় এতক্ষণ একটা চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল, সে চলিয়া গেলে রসময়

বধূর পানে সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'বড় লক্ষ্মী বৌমা আমার। গিন্নী ছোট ছেলেকে নিয়ে তীর্থদর্শনে বেরিয়েছেন, এখন ওর হাতেই সংসার। অবশ্য ওকে দিয়ে পদসেবা আমি করাই না, কিন্তু চাকরটা'

এই পর্যন্ত বলিয়া রসময় থামিয়া গেলেন, তারপর গলার স্বর পাল্টাইয়া বলিলেন, 'বাজে কথা থাক, কাজের কথা বলি। আপনি অনুগ্রহ করে এসেছেন, আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করব না। ব্যোমকেশবাবু, কাল রাত্রে আমার বাড়িতে অঘটন ঘটে গেছে, যা কখনও হয়নি তাই হয়েছে। একটা হীরের নেকলেস-'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সব কথা গোড়া থেকে বলুন। সংক্ষেপ করবেন না। মনে করুন আমি কিছু জানি না।'

মণিময় একটি ৫৫৫ মার্কা সিগারেটের টিন ঢাকনি ঘুরাইয়া খুলিতে খুলিতে ঘরে প্রবেশ করিল, টিন আমাদের সম্মুখে রাখিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। আমরা সিগারেট ধরাইলাম।

রসময় বলিতে আরম্ভ করিলেন

'কলকাতা শহরে আমার পাচটা জুয়েলারির দোকান আছে। বড় কারবার, বছরে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার কেনা-বেচা হয়। অনেক বিশ্বাসী প্রবীণ কর্মচারী আছেন। আমার যখন শরীর ভাল থাকে আমি দেখাশোনা করি। দু বছর থেকে মণিও যাতায়াত শুরু করেছে।

'কলকাতার বাইরে, ভারতের সর্বত্র আমাদের কাজ কারবার আছে। বোম্বাই মাদ্রাজ নয়াদিল্লি, যেখানে যত বড় জহুরী আছে, সকলের সঙ্গে আমাদের লেন দেন। কখনও আমাদের কাছ থেকে তারা হীরে জহরত কেনে, কখনও আমরা তাদের কাছ থেকে কিনি। জহুরী ছাড়া সাধারণ খরিদ্দার তো আছেই। রাজারাজড়া থেকে ছাপোষা গৃহস্থ, সবই আমাদের খদ্দের।

'মাসখানেক আগে দিল্লি থেকে রামদাস চোক্‌সী নামে একজন বড় জহুরী আমার কাছে এল। রাজস্থানের কোন্ রাজবাড়িতে মেয়ের বিয়ে, দশ লাখ টাকার গয়নার ফরমাশ পেয়েছে। কিন্তু সব গয়না সে নিজে গড়াতে পারবে না, আমাকে দিয়ে একটা হীরের নেকলেস গড়িয়ে নিতে চায়। ডিজাইন দেখে, হীরে বাছাই করে দাম কষা হল। সাতান্ন হাজার টাকা। এক মাসের মধ্যে গয়না গড়ে দিল্লিতে রামদাসের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

'গয়না তৈরি হল। আমার ইচ্ছে ছিল আমি নিজেই গিয়ে গয়নাটা দিল্লিতে পৌঁছে দিয়ে আসব, কিন্তু গত মঙ্গলবার থেকে আমার বাতের ব্যথা চাগাড় দিল। কী উপায়! অত দামী গয়না কর্মচারীদের হাতে পাঠাতে সাহস হয় না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল মণিময় যাবে আমার বদলে। আজ ওর যাবার কথা।

'আমি এ ক'দিন বাড়ি থেকে বেরুতে পারিনি, মণিই কাজকর্ম দেখছে। নেকলেসটা তৈরি হবার পর বড় দোকানের সিন্দুকে রাখা ছিল, কাল বিকেলবেলা মণি সেটা বাড়িতে নিয়ে এল।

'এখন আমার বাড়ির কথা বলি। আমার স্ত্রী ছোট ছেলে হিরণ্ময়কে নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়েছেন, অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য বেড়াতে গেছেন। বাড়িতে আছি আমি, মণিময় আর বৌমা। দোতলায় থাকে দু'জন চাকর, বামুন, ড্রাইভার, আর আমার খাস চাকর ভোলা। এই ক'জন নিয়ে বর্তমানে আমার সংসার।

'কাল বিকেলে মণি যখন নেকলেস নিয়ে বাড়ি এল, আমি তখন এই চেয়ারে

বসে ছিলাম, আমার খাস চাকর ভোলা পায়ে মালিশ করে দিচ্ছিল। মণি নেকলেসের কেস্ আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এই নাও বাবা।'

'আমি ভোলাকে ছুটি দিলাম, সে চলে গেল। তখন আমি কেস্ খুলে গয়নাটা পরীক্ষা করলাম। সব ঠিক আছে। তারপর বৌমাকে ডেকে বললাম, বৌমা, কাপড় দিয়ে এটাকে বেশ ভাল করে সেলাই করে দাও।' বৌমা এক টুকরো কাপড় এনে এখানে বসে বসে ছুঁচ-সুতো দিয়ে সেলাই করে দিলেন।'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল, এখন মুখ তুলিয়া বলিল, 'মাফ্ করবেন, গয়নার বাক্সটা আকারে আয়তনে কত বড়?'

রসময়বাবু দ্বিধাভরে এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, 'কত বড়? মোটেই বড় নয়। এই ধরুন –'

পিতা ইতস্তত করিতেছেন দেখিয়া মণিময় বইয়ের শেল্ফ হইতে একটি বই আনিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিল, বলিল, 'এই সাইজের বাক্স।'

রসময় বলিলেন, 'হ্যাঁ, ঠিক ওই সাইজের। অবশ্য বাক্সটা কুমিরের চামড়ার, তার ভেতরে মখমলের খাঁজ কাটা ঘর।'

বইখানা ষোলপেজী ক্রাউন সাইজের, পৃষ্ঠা-সংখ্যা আন্দাজ তিনশত। ব্যোমকেশ বইখানা মণিময়কে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'বুঝেছি, তারপর বলুন।'

রসময় আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন

'তারপর মণি চা খেয়ে ক্লাবে চলে গেল। আমি গয়নার কেস্‌টা হাতে করে আবার অফিস-ঘরে গেলাম। পাশেই আমার অফিস-ঘর। বাড়িতে বসে কাজকর্ম করার দরকার হলে ওখানে বসেই করি। একটা সেক্রেটেরিয়েট্ টেবিল আছে, তার দেরাজে দরকারী কাগজপত্র থাকে। আমি গয়নার কেস্ দেরাজে রেখে দিলাম। বাড়িতে একটা লোহার সিন্দুক আছে বটে, কিন্তু গিন্নী তার চাবি নিয়ে চলে গেছেন।

'আমার অন্যায় হয়েছিল, অত বেশী দামী জিনিস খোলা-দেরাজে রাখা উচিত হয়নি। কিন্তু আমার বাড়ির যে-রকম ব্যবস্থা, তাতে আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না। চাকর-বাকর দোতলায় থাকে, ডেকে না পাঠালে ওপরে আসে না; অন্য লোকেরও যাতায়াত নেই। তাই এখান থেকে গয়না চুরি যেতে পারে এ-সম্ভাবনা মনেই আসেনি।

'রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় আমি খাওয়া দাওয়া সেরে নিলাম। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য দোতলায়, কিন্তু এই বাতের ব্যথাটা হয়ে অবধি বৌমা ওপরেই আমার খাবার এনে দেন। খাওয়া সেরে আমি একটা বই নিয়ে বসলাম, বৌমাও খেয়ে নিলেন। মণির ক্লাব থেকে ফিরতে প্রায়ই দেরি হয়, তাই তার খাবার বৌমা শোবার ঘরে ঢাকা দিয়ে রাখলেন।

'দশটার সময় আমি ভোলাকে ডাকবার জন্যে ঘণ্টি বাজালাম, তারপর শুতে গেলাম। আমার বেতো শরীর, শোবার পর হাত-পা টিপে না দিলে ঘুম আসে না। ভোলাই রোজ টিপে দেয়, তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লে চলে যায়।

'ভোলা খুব কাজের চাকর। বছর দেড়েক আমার কাছে আছে; জুতো বুরুশ করা, কাপড়-জামা গিলে করা, ফাই-ফরমাশ খাটা, হাত-পা টেপা, সব কাজ ও করে। কাল বৌমা সদর দোর খুলে দিলেন, ভোলা এসে আমার হাত-পা টিপে দিতে লাগল। আমি ক্রমে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর সে কখন চলে গেছে জানতে পারিনি।

'হঠাৎ ঘুম ভাঙল মণির ডাকে। ও আমার বিছানার ওপর ঝুঁকে ডাকছে, 'বাবা! বাবা!' আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বললাম, 'কী রে?' মণি বলল, 'নেকলেসটা কোথায় রেখেছেন?' আমি বললাম, 'টেবিলের দেরাজে। কেন?' ও বলল, 'কই, সেখানে তো নেই!'

'আমি ছুটে গিয়ে দেরাজ খুললাম। নেকলেসের বাক্স নেই। সব দেরাজ হাঁটকালাম। কোথাও নেই। মনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। মণিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই এত রাত্রে কী করে জানলি?' সে বলল—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া রসময়কে নিবারণ করিল, মণিময়ের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, 'রাত্রি তখন ক'টা?'

মণিময় অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া বলিল, 'প্রায় বারটা। বারটা বাজতে পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'রাত বারটার সময় কোনও কারণে আপনার সন্দেহ হয়েছিল যে, নেকলেস চুরি গেছে। কী করে সন্দেহ হল সব কথা খুলে বলুন।'

মণিময় যেন আরও সংকুচিত হইয়া পড়িল, পিতার প্রতি একটি গুপ্ত কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ স্খলিত স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল, 'কাল আমার ক্লাব থেকে ফিরতে একটু বেশী দেরি হয়ে গিয়েছিল। ক্লাবে ব্রিজ-ড্রাইভ্ চলছে, আমি—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় ক্লাব? নাম কী?'

'ক্লাবের নাম—খেলাধুলো। খুব কাছেই, আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের রাস্তা। সবরকম ঘরোয়া খেলার ব্যবস্থা আছে, তাস পাশা পিংপং বিলিয়ার্ডস। কাল ব্রিজ-ড্রাইভ্ শেষ হতে রাত হয়ে গেল—'

'আপনি হেঁটে ক্লাবে যান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব কাছে, তাই হেঁটেই যাই। কাল যখন ক্লাব থেকে বেরুলাম তখন পৌনে বারটা। রাত নিষুতি। আমাদের বাড়ির সদর দরজার ঠিক সামনে একটা ল্যাম্পপোস্ট আছে। আমি যখন বাড়ির প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ গজের মধ্যে এসেছি তখন দেখলাম, আশেপাশের দোকান সব বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু একটা লোক ঠিক আমাদের দোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা বোধ হয় আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, তারপর চট্ করে বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

'দূর থেকে দেখে মনে হল, ভোলা চাকর। কাছে এসে দেখলাম দরজা ভেজানো রয়েছে। অন্যদিন আমি দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে বাড়ি ফিরি, কিন্তু সদর দরজা তার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। আজ খোলা রয়েছে। আমার খট্‌কা লাগল। সদর দরজায় হুড়কো লাগিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। দোতলায় চাকরেরা ঘুমোচ্ছে, কারুর সাড়া শব্দ নেই।

'তেতলায় উঠতেই স্ত্রী এসে দরজা খুলে দিলেন। আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন, তেতলার দরজায় বিলাতী গা-তালা লাগানো; ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে বিনা চাবিতে বাইরে থেকে খোলা যায় না। আমি স্ত্রীকে বললাম, বাড়ির সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। উনি বললেন, উনিও দেখেছেন -'

'উনিও দেখেছেন?' ব্যোমকেশ বধূর পানে চোখ ফিরাইল।

বধূ লজ্জা পাইল, তাহার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। রসময় তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, 'লজ্জা কী বৌমা? যা দেখেছ ব্যোমকেশবাবুকে বল।'

বধূ তখন লজ্জা-স্তিমিত কণ্ঠে থামিয়া থামিয়া বলিল, 'কাল রাত্তিরে—আমি—

ও'র ক্লাব থেকে ফিরতে দেরি হচ্ছিল—আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর—হঠাৎ দেখলুম, ঠিক আমাদের দরজার সামনে ফুটপাথের ওপর কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি ঝুঁকে দেখবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু ভাল দেখতে পেলুম না। তারপরেই লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হল দরজায় ঢুকে পড়ল। সেই সময় দেখতে পেলুম উনি আসছেন, লোকটা যেন ওঁকে দেখেই ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর আমি গিয়ে তেতলার দরজা খুলে দিলুম। উনি এলেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'লোকটাকে চিনতে পেরেছিলেন?'

বধূ মাথা নাড়িল, 'না, ওপর থেকে তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তবে মনে হয়েছিল, চাকরদের মধ্যেই কেউ হবে।'

'হুঁ,' ব্যোমকেশ মণিময়কে বলিল, 'তারপর কী হল?'

মণিময় বলিল, 'স্ত্রীর কথা শুনে সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। নেকলেসটা বিকেলবেলা এনেছি, সেটা বাবা নিশ্চয় টেবিলের দেরাজে রেখেছেন, কারণ সিন্দুকের চাবি নিয়ে মা চলে গেছেন। আমি চুপি চুপি বাবার অফিস-ঘরে গেলাম। আলো জেবলে দেরাজগুলো খুলে দেখলাম। নেকলেসের কেস নেই। আরও যেখানে যেখানে রাখা সম্ভব সব জায়গায় খুঁজলাম। কোথাও নেই। ভীষণ ভয় হল। তখন বাবাকে ডেকে তুললাম।'

মণিময় চুপ করিলে ব্যোমকেশ নিবিষ্ট মনে আর একটি সিগারেট ধরাইল, তারপর সপ্রশ্ন চক্ষে রসময়ের পানে চাহিল। রসময় আবার কাহিনীর সূত্র তুলিয়া লইলেন।—

'যখন নিঃসংশয়ে বুঝলাম নেকলেস চুরি গেছে তখন সব সন্দেহ পড়ল ভোলার ওপর। ভেবে দেখুন, আমার তেতলার সদর দরজায় ইয়েল লক লাগান; ভেতরে থেকে বাইরে যাওয়া সহজ, কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরে আসা সহজ নয়। রাত্রি দশটার পর চাকরদের মধ্যে একমাত্র ভোলাই ভেতরে ছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ভোলা কখন উঠে গেছে জানি না। হয়তো সে পৌনে বারটার সময় উঠে গেছে, দেরাজ থেকে নেকলেস নিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেছে। নিচে হয়তো তার ষড়ের লোক ছিল—'

ব্যোমকেশ মণিময়কে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি একটা লোকই দেখেছিলেন?'

মণিময় বলিল, 'হ্যাঁ। দ্বিতীয় জনপ্রাণী সেখানে ছিল না।'

ব্যোমকেশ বধূর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আপনি?'

বধূ বলিল, 'আমিও একজনকেই দেখেছিলুম। আমি সারাক্ষণ নিচের দিকেই তাকিয়ে ছিলুম, আর কেউ থাকলে দেখতে পেতুম।'

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল নীরবে সিগারেট টানিল, শেষে রসময়কে বলিল, 'তারপর আপনি কী করলেন?'

রসময় বলিলেন, 'তখন বারটা বেজে গেছে। বাপ-বেটায় পরামর্শ করে থানায় টেলিফোন করলাম। মণি নিচে নেমে গিয়ে সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল, যাতে বাড়ি থেকে কেউ বেরুতে না পারে। থানার বড় দারোগা অমরেশবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ভাগ্যক্রমে তিনি থানায় উপস্থিত ছিলেন, ফোন পেয়ে তক্ষুনি তিন-চারজন লোক নিয়ে এসে পড়লেন।

'প্রথমে দোতলার ঘরগুলো খানাতল্লাশ হল। চাকরেরা সকলেই ঘুমোচ্ছিল,

ভোলাও ছিল। পুলিস তন্নতন্ন করে তল্লাশ করল, কিন্তু নেকলেস পাওয়া গেল না।

'অমরেশবাবু তখন তেতলা খানাতল্লাশ করলেন। বলা যায় না, চোর হয়ত নেকলেসটি চুরি করে এখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। পরে তাক বুঝে সরাবে। কিন্তু এখানেও নেকলেস পাওয়া গেল না।

'অমরেশবাবু তারপর ভোলাকে জেরা আরম্ভ করলেন। ভোলা স্বীকার করল, সে নিচে নেমে গিয়েছিল। সে বলল, আন্দাজ এগারটার সময় আমি ঘুমিয়ে পড়েছি দেখে সে দোতলায় নেমে যায়। অন্য চাকরেরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোলাও শুয়ে পড়ল, কিন্তু তার ঘুম এল না। তখন সে খোলা হাওয়ার খোঁজে নিচে গিয়ে ফুটপাথে দাঁড়াল। মণিময় যে ক্লাব থেকে ফেরেনি তা সে জানত না। সে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল মণি আসছে। তখন সে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ল, কারণ রাত্তিরে চাকর-বাকরের বাইরে যাওয়ার কড়া বারণ আছে। এই তার বয়ান। নেকলেসের কথা সে জানে না।

'অমরেশবাবুর জেরায় আরও জানা গেল, ভোলার দুই ভাই কলকাতায় থাকে, মেছুয়াবাজারে তাদের বাসা। ভায়েদের সঙ্গে ভোলার বিশেষ দহরম-মহরম নেই, তবে হাতে কাজ না থাকলে মাঝে মাঝে তাদের বাসায় দেখা করতে যায়।

'অমরেশবাবু যতক্ষণ ভোলাকে সওয়াল জবাব করছিলেন ততক্ষণ তাঁর সঙ্গীরা রাস্তার দু' পাশে তল্লাশ করছিল; আনাচ কানাচ ডাস্টবিন সব খুঁজে দেখছিল। মণিও তাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। এইসব ব্যাপারে ভোর হয়ে গেল. অমরেশবাবু দোতলায় একজন লোক রেখে চলে গেলেন। ভোলাকে বলে গেলেন. এবাড়ি থেকে বেরুবার চেষ্টা করলেই গ্রেপ্তার করা হবে।

'তারপর—তারপর যত বেলা বাড়তে লাগল ততই আমার মন অস্থির হয়ে উঠল। অমরেশবাবু কাজের লোক, চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। কিন্তু আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না ব্যোমকেশবাবু। আপনাকে ফোন করলাম। আপনি আমার নেকলেস উদ্ধার করে দিন। আপনি ছাড়া এ-কাজ আর কেউ পারবে না।'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, 'আমার ওপর আপনার এত বিশ্বাস. আশা করি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারব।—ভোলা চাকর তো বাড়িতেই আছে?'

'হ্যাঁ, দোতলার ঘরে আছে।'

'তাকে একবার ডেকে পাঠালে দু-চারটে প্রশ্ন করে দেখতাম।'

'বেশ তো।' রসময় পুত্রের দিকে চাহিলেন।

মণিময় চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ভোলাকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

ভোলা চাকরের চেহারা সাধারণ ভৃত্য শ্রেণীর লোকের চেহারা হইতে পৃথক নয়। একজাতীয় মুখ আছে যাহা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীর্ণ ও অস্থিসার হইয়া পড়ে, উঁচু নাক ও ছুঁচলো চিবুক প্রাধান্য লাভ করে। ভোলার মুখ সেই জাতীয়। দেহও বেউড় বাঁশের মত পাকানো; বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তাহার চোখের দৃষ্টিতে ভয়ের চিহ্ন নাই, কিন্তু সংযত সতর্কতা আছে।

ব্যোমকেশ তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'তোমাকে দু-একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

ভোলা সহজভাবে বলিল, 'আজ্ঞে।'

'নাম কী?'
'ভোলানাথ দাস।'
'দেশ কোথায়?'
'মেদিনীপুর জেলায়।'
'কলকাতায় কতদিন আছ?'
'তা পনর বছর হবে।'
'তোমার দুই ভাই কলকাতায় থাকে?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ, মেছোবাজারে বাসা নিয়ে একসঙ্গে থাকে।'
'তুমি ভায়েদের সঙ্গে থাক না?'
'আজ্ঞে, আমি যেখানে চাকরি করি সেখানেই থাকি।'
'ভায়েদের সঙ্গে বনিবনাও আছে?'
'আজ্ঞে, বে-বনিবনাও নেই। তবে দাদারা লেখাপড়া জানা লোক। আমি মুখ্যুখ্যু—'
'তোমার দাদারা কী কাজ করে?'
'বড়দা পোস্ট-অফিসে কাজ করে, মেজদা কর্পোরেশনের জমাদার।'
'তুমি বিয়ে করনি?'
'করেছিলাম, বৌ মরে গেছে।'
'এ-বাড়িতে কতদিন কাজ করছ?'
'দেড় বছর।'
'তার আগে কোথায় কাজ করেছ?'
'অনেক জায়গায় কাজ করেছি।'
'কী কাজ?'
'আজ্ঞে পা-টেপা চাকরের কাজ। অন্য কাজ করবার বিদ্যে আমার নেই।'
বিদ্যা না থাক, বুদ্ধি যথেষ্ট আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে-বুদ্ধি নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে, সেই বুদ্ধি। ব্যোমকেশ আবার আরম্ভ করিল, 'সকলে সন্দেহ করেন তুমিই হীরের নেকলেস চুরি করেছ।'
ভোলা চেঁচামেচি করিল না, শান্তভাবে অস্বীকার করিল, 'আজ্ঞে, হীরের নেকলেস আমি চোখে দেখিনি।'
'কাল যখন মণিময়বাবু নেকলেসের বাক্স এনে রসময়বাবুকে দেন, তখন তুমি তাঁর পায়ে মালিশ করে দিচ্ছিলে।'
'একটা বাক্স এনে দিয়েছিলেন। বাক্সে কী আছে আমি জানতাম না।'
'কিছু আন্দাজ করতে পারনি? রসময়বাবু যখন বাক্স খোলবার আগে তোমাকে চলে যেতে বললেন তখনও কিছু আন্দাজ করনি?'
'আজ্ঞে না।'
ব্যোমকেশ ক্ষণেক ভ্রূকুটি করিয়া নীরব রহিল, তারপর সহসা চক্ষু তুলিয়া বলিল, 'কাল সন্ধ্যের পর তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলে?'
এতক্ষণে ভোলার চোখে একটু উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিল, কিন্তু সে সহজ সুরেই বলিল, 'আজ্ঞে বেরিয়েছিলাম। একটা গামছা কেনবার ছিল, তাই বৌদিদির কাছে ছুটি নিয়ে বেরিয়েছিলাম।'
ব্যোমকেশ বধূর দিকে চাহিল, বধূ ঘাড় হেলাইয়া সায় দিল। রসময়বাবুর

মুখ দেখিয়া মনে হইল, তিনি এ-খবর জানিতেন না। মণিময়ও জানিত না, কারণ সে তৎপূর্বেই ক্লাবে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ব্যোমকেশ জানিল কী করিয়া? অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িয়াছে?

সে ভোলাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কতক্ষণ বাইরে ছিলে?'

'ঘণ্টাখানেক।'

'গামছা কিনতে এক ঘণ্টা লাগল?'

'আজ্ঞে, গামছা কিনে খানিক এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছিলাম।'

'কারুর সঙ্গে দেখা করনি?'

'আজ্ঞে না।'

'তোমার বন্ধুবান্ধব কেউ নেই?'

'চেনাশোনা দু-চারজন আছে, বন্ধু নেই।'

'যাক।—কাল রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তুমি রসময়বাবুর পা টিপে দিয়েছিলে?'

'আজ্ঞে। রোজ টিপে দিই।'

'কাল ক'টা অবধি পা টিপে দিয়েছিলে?'

'ঘড়ি দেখিনি। আন্দাজ এগারটা হবে।'

'তুমি যখন দোতলায় নেমে গেলে, অন্য চাকরেরা জেগে ছিল?'

'আজ্ঞে না, ঘুমিয়ে পড়েছিল।'

'কেউ জেগে ছিল না?'

'কেউ না।'

ভারী আশ্চর্য। যা হক, তুমি তারপর কী করলে? শুয়ে পড়লে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তবে রাত বারটার সময় রাস্তায় বেরিয়েছিলে কেন?'

'অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে ঘুম এল না, তখন নিচে নেমে গেলাম। ভেবেছিলাম, খোলা জায়গায় খানিক দাঁড়ালে ঘুম আসবে।'

'কতক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছিলে?'

'দু-তিন মিনিটের বেশী নয়। দাদাবাবু যে কেলাব থেকে ফেরেননি তা জানতাম না। দেখলাম তিনি আসছেন, তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।'

'সিঁড়ির দরজা বন্ধ করেছিলে?'

'আজ্ঞে দাদাবাবু আসছেন, তাই বন্ধ করিনি।'

ব্যোমকেশ আর একবার ভোলার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, বোধ করি মনে মনে তাহার স্থিরবুদ্ধির প্রশংসা করিল, তারপর শুষ্কস্বরে বলিল, 'আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।'

ভোলা চলিয়া গেল। সদর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ আসিলে রসময় জিজ্ঞাসুনেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, 'কী মনে হল?'

ব্যোমকেশ বিমর্ষভাবে বলিল, 'ভারী হুঁশিয়ার লোক। তবে কাল সন্ধ্যেবেলা যে বেরিয়েছিল, তা স্বীকার করেছে।'

'তাতে কী প্রমাণ হয়?'

'প্রমাণ কিছুই হয় না। তবে ওর যদি কেউ ষড়ের লোক থাকে, চুরির আগে তার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করেছিল। নৈলে নেকলেসটা লোপাট হয়ে গেল কী করে?'

'তা বটে।'

ভোলা সম্বন্ধে আর বেশী আলোচনা হইতে পাইল না, দ্বারে টোকা পড়ায় মণিময় চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে পুলিস দারোগার পোশাক-পরা এক ভদ্রলোককে লইয়া উপস্থিত হইল। লম্বা চওড়া চেহারা, ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। দারোগা অমরেশবাবু সন্দেহ নাই।

রসময়বাবু উঠিবার উপক্রম করিয়া সবিনয়ে বলিলেন, 'এ কী অমরেশবাবু, কী খবর! আপনি আবার এলেন যে!'

অমরেশবাবু চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সনিশ্বাসে বলিলেন, 'মেছোবাজারে গিয়েছিলাম ভোলার ভায়েদের বাসা খানাতল্লাশ করতে। কিন্তু- ' এই সময় আমাদের উপর নজর পড়ায় তিনি থামিয়া গেলেন।

রসময়বাবু অপ্রতিভভাবে পরিচয় করাইয়া দিলেন, 'ইন্সপেক্টর মণ্ডল, হান—ইয়ে—ব্যোমকেশ বক্সী। বোধ হয় নাম শুনেছেন।'

অমরেশবাবু খাড়া হইয়া বসিলেন, বিস্ময়োৎফুল্ল স্বরে বলিলেন, 'বিলক্ষণ! ব্যোমকেশ বক্সীর নাম কে না শুনেছে? আপনিই! আপনার নাম প্রমোদ বরাটের কাছেও শুনেছি মশাই। প্রমোদকে মনে আছে? গোলাপ কলোনির ব্যাপারে তদন্ত করেছিল। প্রমোদ আমার বন্ধু।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'প্রমোদবাবুকে খুব মনে আছে। ভারী বুদ্ধিমান লোক।'

অমরেশবাবু বলিলেন, 'সে আপনার পরম ভক্ত। তার কাছে আপনার অদ্ভুত ক্ষমতার গল্প শুনেছি। তা আপনিও এই নেকলেস চুরির ব্যাপারে আছেন নাকি? বেশ বেশ, আপনাকে পাওয়া তো ভাগ্যের কথা, প্রমোদের মুখে শুনেছি আপনার খ্যাতির লোভ নেই, কেবল সত্যান্বেষণ করেই আপনি সন্তুষ্ট। হা হা।'

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিল, 'ইন্সপেক্টর মণ্ডল, যার যা আছে সে তা চায় না,. এই প্রকৃতির নিয়ম। এ-ব্যাপারে খ্যাতি যদি কিছু প্রাপ্য হয় আপনিই পাবেন। আমি মজুরি পেলেই সন্তুষ্ট হব।'

রসময়বাবু গাঢ়স্বরে বলিলেন, 'মজুরি বলবেন না ব্যোমকেশবাবু, সম্মান-দক্ষিণা। যদি আমার নেকলেস ফিরে পাই আপনার সম্মান রাখতে আমি ত্রুটি করব না।'

'সে যাক,' ব্যোমকেশ অমরেশবাবুর দিকে ফিরিল, 'আপনি ভোলার ভায়েদের বাসা সার্চ করেছেন, কিন্তু কিছু পেলেন না?'

অমরেশবাবু বলিলেন, 'কিচ্ছু পেলাম না। ওর ভায়েরা কাজে বেরিয়েছিল। দুই বৌ ঘরে ছিল। কিন্তু আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'তাহলে আপনার সন্দেহ ভোলা তার ভায়েদের সঙ্গে ষড় করে একাজ করেছে।'

অমরেশবাবু বলিলেন, 'ভায়েদের বদলে অন্য কেউ হতে পারে, কিন্তু ষড়ের লোক আছে। নৈলে নেকলেসটা লোপাট হয়ে গেল কী করে?'

'মণিময়বাবু এবং তাঁর স্ত্রী কিন্তু অন্য লোক দেখেন নি।'

'ওঁরা যখন ভোলাকে দেখেছেন, তার আগেই হয়ত ষড়ের লোক মাল নিয়ে সরে পড়েছে।'

'মণিময়বাবুর স্ত্রী অনেকক্ষণ ধরে জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ষড়ের লোক এলে উনি তাকে দেখতে পেতেন না কি?'

দুইজনে কিছুক্ষণ পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর অমরেশবাবু দ্বিধাভরে প্রশ্ন করিলেন, 'আপনার কি মনে হয় ভোলার কাজ নয়?'

'এখন কিছু মনে হচ্ছে না। তত্ত্বতল্লাশ যা করবার সবই আপনি করেছেন, কিছু বাকী রাখেন নি। এখন শুধু ভেবে দেখতে হবে।' সে উঠিয়া দাঁড়াইল, 'এখন উঠি। যদি ভেবে কিছু পাওয়া যায় আপনাদের জানাব।'

বাসায় ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার সন্দেহটা কার উপর।'

ব্যোমকেশ পাঞ্জাবি খুলিতে খুলিতে বলিল, 'তিনজনের ওপর।'

চমকিয়া বলিলাম, 'তিনজন কারা?'

'ভোলা, মণিময় এবং মণিময়ের স্ত্রী—' বলিয়া ব্যোমকেশ স্নান করিতে চলিয়া গেল।

বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সুযোগের দিক দিয়া তিনজনকেই সন্দেহ করা যায়। রসময়ের দেরাজ হইতে নেকলেস সরানো তিনজনের পক্ষেই সম্ভব। আর মোটিভ? বড়মানুষের ছেলেদের সর্বদাই টাকার দরকার। মণিময় ক্লাবে গিয়া তাস-পাশা খেলে, নিশ্চয় বাজি রাখিয়া খেলে। হয়তো অনেক টাকা দেনা হইয়াছে, ভয়ে বাপের কাছে বলিতে পারিতেছে না—

আর মণিময়ের স্ত্রী? মেয়েটি দেখিতে শান্ত শিষ্ট, কিন্তু তাহার মুখে উদ্বেগের ব্যঞ্জনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। গহনার প্রতি স্ত্রীজাতির লোভ অবস্থা বিশেষে দুর্নিবার হইয়া উঠিতে পারে।

কিন্তু যে-ই চুরি করুক, চোরাই মাল বেমালুম সরাইয়া ফেলিল কী করিয়া?

সেদিন দুপুরবেলা ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় লম্বা হইয়া সারাক্ষণ কড়ি-কাঠের শোভা নিরীক্ষণ করিল, কথাবার্তা বলিল না। আপরাহ্নিক চা পানের পর হঠাৎ বলিল, 'চল, একবার ঘুরে আসা যাক।'

'কোথায় ঘুরবে?'

'রসময়বাবুর বাড়ির স্যমনে ফুটপাথে। জায়গাটা ভাল করে দেখা হয় নি।'

পদব্রজে আমাদের বাসা হইতে রসময়বাবুর ফুটপাথে পৌঁছিতে কুড়ি মিনিট লাগিল। কাছাকাছি গিয়া ব্যোমকেশ এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। বাড়ির দরজার দুই পাশে দোকানগুলি খোলা রহিয়াছে। একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকান, একটি ঘড়ির দোকান, দুইটি বস্ত্রালয়। সব দোকানেই খরিদ্দারের যাতায়াত। ফুটপাথে পথচারীর ভিড়।

রসময়ের বাড়ির তেতলায় গোটা চারেক জানালা; উহাদেরই একটা হইতে মণিময়ের বৌ পথের পানে চাহিয়া ছিল। চোখ নামাইয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে এবং একদৃষ্টে রসময়ের সদর দরজার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, দরজা খুলিয়া মণিময় বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরিধানে ধুতি, গেঞ্জি, হাতে একখানা খামের চিঠি। সে দরজাব বাহিরে আসিয়াই পাশে দেওয়ালে গাঁথা পোস্ট-বক্সে চিঠি ফেলিয়া দিয়া আবার ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

'এই যে মণিময়বাবু! কাকে চিঠি লিখলেন?'

ব্যোমকেশের কণ্ঠস্বরে মণিময় চমকিয়া চাহিল। আমাদের দেখিয়া সবিনয়ে বলিল, 'এ কী, আপনারা! কিছু খবর আছে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার খবর পরে দেব। আপনি কাকে চিঠি লিখলেন?'

মণিময় একটু বিষণ্ণ স্বরে বলিল, 'মাকে খবরটা দিলাম। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে লিখলাম। কিন্তু আজ আর চিঠিখানা যাবে না, ডাক বেরিয়ে গেছে। সেই কাল ভোরের ক্লিয়ারেন্সে যাবে।—কিন্তু আপনি নিশ্চয় কিছু ভাল খবর পেয়েছেন। সত্যি বলুন না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছিলাম তখনও কিছু খবর পাই নি কিন্তু এখন পেয়েছি।'

'কী খবর? নেকলেসের সন্ধান পেয়েছেন?'

'পেয়েছি। সব কথা পরে বলব, এখন আমাকে একটা জরুরী কাজে যেতে হবে।'

'একবারটি ওপরে আসবেন না? বাবা আপনার কাছ থেকে খবর পাবার জন্যে অস্থির হয়ে রয়েছেন।'

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'না, জরুরী কাজটা আগে সারতে হবে। অজিত, তুমি বরঞ্চ ওপরে যাও। রসময়বাবুকে আমার পক্ষ থেকে বলে দিও, কাল সকালে তিনি নেকলেস ফিরে পাবেন।' বলিয়া সে হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

আমি মণিময়ের সঙ্গে উপরে গেলাম। রসময়বাবু বিলক্ষণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, ব্যোমকেশের বার্তা শুনিয়া বার বার উদ্বেগভরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'সত্যি পাব তো? ঠিক পাব তো?'

আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশকে কখনও মিথ্যে আশ্বাস দিতে শুনি নি। সে যখন বলেছে পাবেন তখন নিশ্চয় পাবেন।' অতঃপর চা, কেক ও ৫৫৫ নম্বর সিগারেট সেবন করিয়া ক্যাডিল্যাকে চড়িয়া গৃহে ফিরিলাম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ব্যোমকেশ তখনও ফেরে নাই। আরও ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গিয়েছিলে কোথায়?'

সে বলিল, 'থানায়। দারোগা অমরেশবাবুর সঙ্গে দরকার ছিল।'

'কী দরকার?'

'ভীষণ দরকার। তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়, কাল সকাল সকাল উঠতে হবে।'

আমার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা তাহার নাই দেখিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আহারে বসিলে সত্যবতী আমার মুখ লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'মুখ গোমড়া কেন?'

বলিলাম, 'তোমার পতিদেবতাটি একটি কচ্ছপ।'

সত্যবতী মুখ টিপিয়া হাসিল, 'এত জন্তু থাকতে কচ্ছপ কেন?'

'কচ্ছপ কথা কয় না।'

ব্যাপার বুঝিয়া সত্যবতীর মুখ সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে বলিল, 'সত্যি বাপু। কী রাগ যে হয়। আচ্ছা, আমাদের না হয় বুদ্ধি একটু কম। তাই বলে কৌতূহল তো কম নয়।'

তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া শুইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙিল রাত্রিশেষে, ব্যোমকেশ ঠেলা দিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দিল, 'অজিত, ওঠ ওঠ, এখনি বেরুতে হবে।'

চা প্রস্তুত ছিল, তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিয়া ব্যোমকেশের সহিত বাহির হইলাম। রাস্তার আলো তখনও নেভে নাই, ঘুমন্ত নগরকে সহস্রচক্ষু মেলিয়া পাহারা দিতেছে।

কোথায় চলিয়াছি তখনও জানি না; কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর বুঝিলাম, রসময়বাবুর বাড়ির দিকে যাইতেছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শেষরাত্রে রসময়বাবুর সঙ্গে কী দরকার?'

সে বলিল, 'রসময়বাবুর সঙ্গে দরকার নেই।'

'তবে? শেষরাত্রে বেরুবার দরকার ছিল কী?'

'ছিল। জানই তো, ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।'

'সোজা কথা বলবে, না কেবল হেঁয়ালি করবে?'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিয়া বলিল, 'রসময়বাবুর বাড়ির দেয়ালে যে ডাক-বাক্স আছে, তার প্রথম ক্লিয়ারেন্সের সময় হচ্ছে পাঁচটা। আজ যখন ডাক-বাক্স খোলা হবে তখন সেখানে উপস্থিত থাকতে চাই।'

মাথার মধ্যে দপদপ করিয়া কয়েকটা বাতি জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হইল না। বলিলাম, 'তাহলে—?'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'ধৈর্য মানো, সখা, ধৈর্য মানো।'

কয়েকটা গলিঘুঁজির ভিতর দিয়া চলিবার পর রসময়বাবুর বাড়ির সম্মুখীন হইলাম। গলি যেখানে বড় রাস্তায় মিলিয়াছে সেখানে দুটা লোক প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ব্যোমকেশ তাহাদের সহিত ফিসফিস করিয়া কথা বলিল। তারপর আমরাও গলির মুখে প্রচ্ছন্ন হইয়া দাঁড়াইলাম।

হাতঘড়িতে দেখিলাম, পাঁচটা বাজিতে দশ মিনিট। এখনও রাস্তায় লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই, মাঝে মাঝে সব্জি-বোঝাই ট্রাক গুরুগম্ভীর শব্দে চলিয়া যাইতেছে। রসময়বাবুর বাড়ির অভ্যন্তর অন্ধকার, সম্মুখস্থ ল্যাম্পপোস্ট বন্ধ সদর-দরজার উপর আলো ফেলিয়াছে। দরজার পাশে দেয়ালে-গাঁথা ডাক-বাক্সর লাল রঙ অসংখ্য ইস্তাহারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ওটা যে ডাক-বাক্স, তাহা সহজে নজরে পড়ে না।

একটি একটি করিয়া মিনিট কাটিতেছে। সঞ্চরমাণ মিনিটগুলির লঘু পদ-ধ্বনি নিজের বক্ষ-স্পন্দনে শুনিতে পাইতেছি।...পাঁচটা বাজিল; শরীরের স্নায়ুপেশী শক্ত হইয়া উঠিল।

লোকটা কখন নিঃশব্দে ডাক-বাক্সের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন ভৌতিক আবির্ভাব। গায়ে খাকি পোশাক, কাঁধে দুটো বড় বড় ঝোলা। ঝোলা দুটা ফুটপাথে নামাইয়া সে পকেট হইতে চাবির গোছা বাহির করিল, তারপর ডাক-বাক্সের তালা খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া ইশারা করিল, আমরা শিকারীর মত অগ্রসর হইলাম। গলির মুখ হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, রাস্তার দুই দিক হইতে আরও দুই জোড়া লোক আমাদেরই মত ডাক-বাক্সের দিকে অগ্রসর হইতেছে। নিঃসন্দেহে পুলিসের লোক, কিন্তু গায়ে ইউনিফর্ম নাই।

লোকটা ডাক-বাক্সের কবাট খুলিয়াছে, আমরা গিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিলাম। সে ভয়চকিতভাবে ঘাড় ফিরাইয়া আমাদের আটজনকে দেখিয়া ত্বরিতে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, ডাক-বাক্সের খোলা কবাট পিঠ দিয়া আড়াল করিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, 'কে? কী চাই?'

ব্যোমকেশ কড়া সুরে বলিল, 'তোমার নাম ভূতনাথ দাস। তুমি ভোলার বড় ভাই!'

ভূতনাথ দাসের মুখখানা ভয়ে শীর্ণ-বিকৃত হইয়া গেল, চক্ষু দুটা ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। সে থরথর কম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'কে—কে আপনারা?'

অমরেশবাবু হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, 'আমরা পুলিস।'

অমরেশবাবু যে দলের মধ্যে আছেন তাহা প্রথম লক্ষ্য করিলাম। তিনি সামনে আসিয়া দৃঢ়ভাবে ভূতনাথের কাঁধে হাত রাখিলেন। অনুভব করিলাম, একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে ভূতনাথকে ভয় পাওয়াইবার চেষ্টা হইতেছে। চেষ্টা ফলপ্রসূ হইল। ভূতনাথ একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল হঠাৎ উগ্র তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, 'ওরে ভোলা, তুই আমার এ কী সর্বনাশ করলি রে! আমার চাকরি যাবে—আমি যে জেলে যাব রে!'

সে থামিতেই অমরেশবাবু তাহার কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন, 'কোথায় রেখেছ চোরাই মাল, বের কর।'

ভূতনাথ অমরেশবাবুর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, 'হুজুর, ও পাপ জিনিস আমি ছুঁইনি। ডাক-বাক্সর মধ্যেই আছে।'

ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। পরশু মধ্যরাত্রি হইতে আজ সকাল পর্যন্ত নেকলেস রসময়বাবুর বাড়ির দেয়ালে-গাঁথা ডাক-বাক্সের মধ্যেই আছে।

অমরেশবাবু বলিলেন, 'বের কর।'

ভূতনাথ উঠিয়া ডাক-বাক্সের দিকে ফিরিল। ডাক-বাক্সে অনেক চিঠি জমা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে হাত ঢুকাইয়া বাক্সের পিছন দিকের কোণ হইতে একটি পার্সেল বাহির করিয়া আনিল। সাদা কাপড়ে সেলাই করা ক্রাউন ষোলপেজী বইয়ের মত আকার আয়তন। ভূতনাথ সেটি অমরেশবাবুর হাতে দিয়া কাতরস্বরে বলিল, 'এই নিন বাবু। ধর্ম জানে এর ভেতর কী আছে, আমি চোখে দেখিনি।

এই সময় রসময়ের সদর দরজা খুলিয়া গেল। লাঠিতে ভর দিয়া রসময় এবং তাঁহার পিছনে মণিময় ও বধূ। সকলের সদ্য-ঘুম-ভাঙা চোখে সবিস্ময় উদ্বেগ রসময় বলিলেন, 'অমরেশবাবু! ব্যোমকেশবাবু? কী হয়েছে? আমার নেকলেস—?

ব্যোমকেশ অমরেশবাবুর হাত হইতে প্যাকেট লইয়া রসময়ের হাতে দিল, 'এই নিন আপনার নেকলেস। খুলে দেখুন।'

বেলা আন্দাজ সাড়ে ন'টার সময় আমরা দুজনে আমাদের বসিবার ঘরে চৌকির উপর মুখোমুখি উপবিষ্ট ছিলাম। সত্যবতীকে আর এক প্রস্থ চায়ের ফরমাশ দেওয়া হইয়াছে। নেকলেস-পর্বের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অনর্থক হয়রানি। ডাক-বাক্সটা দোরের পাশেই আছে এটা যদি প্রথমে নজরে পড়ত তাহলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব নিষ্পত্তি হয়ে যেত' কলকাতা শহরে দেয়ালে-গাঁথা অসংখ্য ডাক-বাক্স আছে, কিন্তু হঠাৎ চোখে পড়ে না। ডাক-বাক্সের রাঙা গায়ে ইস্তাহারের কাগজ জুড়ে তাকে প্রায় অদৃশ্য করে তুলেছে। যারা জানে তাদের কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু যারা জানে না তাদের পক্ষে খুঁজে বার করা মুশকিল।

'প্রথম যখন নেকলেস চুরির বয়ান শুনলাম, তখন তিনজনের ওপর সন্দেহ হল। ভোলা, মণিময় এবং মণিময়ের স্ত্রী, এদের মধ্যে একজন চোর। কিংবা এমনও হতে পারে যে, এই তিনজনের মধ্যে দুজন ষড় করে চুরি করেছে। মণিময়

এবং ভোলার মধ্যে ষড় থাকতে পারে, আবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ষড় থাকতে পারে। ভোলা এবং মণিময়ের স্ত্রীর মধ্যে সাজশ থাকার সম্ভাবনাটা বাদ দেওয়া যায়।

'কিন্তু চুরি যে-ই করুক, চোরাই মাল গেল কোথায়? চুরি জানাজানি হবার একঘণ্টার মধ্যে পুলিস এসে বাড়ির দোতলা তেতলা খানাতল্লাশ করেছিল, কিন্তু বাড়িতে মাল পাওয়া গেল না। একমাত্র ভোলাই দুপুর রাত্রে রাস্তায় নেমেছিল। কিন্তু সে বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল, দূরে যায়নি। অন্য কোনও লোকের সঙ্গে তার দেখাও হয়নি। ভোলা যদি চুরি করে থাকে, তবে সে নেকলেস নিয়ে করল কী? মণিময় এবং তার স্ত্রীর সম্বন্ধে ওই একই প্রশ্ন– তারা গয়নাটা কোথায় লুকিয়ে রাখল?

'তিনজনের ওপর সন্দেহ হলেও প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি অবশ্য ভোলা। মণিময় যখন নেকলেস এনে বাবাকে দিল তখন সে উপস্থিত ছিল। কেসের মধ্যে দামী গয়না আছে তা অনুমান করা তার পক্ষে শক্ত নয়। সন্ধ্যের সময় সে গামছা কেনার ছুতো করে বাইরে গিয়েছিল, এইটেই তার সব চেয়ে সন্দেহজনক কাজ। সে যদি বাইরের লোকের সঙ্গে সাজশ করে চুরির মতলব করে থাকে তবে সহকারীকে খবর দিতে যাওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সে গয়না চুরি করে সহকারীকে দিল কী করে?

'তারপর ধর মণিময়ের কথা। মনে কর, মণিময় আর তার স্ত্রীর মধ্যে সাজশ ছিল। মনে কর রাত্রি এগারটার সময় মণিময় ক্লাব থেকে বাড়ি এসেছিল, বাপের দেরাজ থেকে গয়না চুরি করে আবার বেরিয়ে গিয়েছিল; তারপর গয়নাটা কোথাও লুকিয়ে রেখে পৌনে বারটার সময় বাড়ি ফিরে এসেছিল। অসম্ভব নয়, কিন্তু তা যদি হয়, তাহলে ভোলা কি জানতে পারত না? জানতে পারলে সে কি চুপ করে থাকত?'

এই সময় সত্যবতী চা লইয়া প্রবেশ করিল এবং আমাদের সামনে পেয়ালা রাখিয়া হাসি-হাসি মুখে বলিল, 'এই যে, কচ্ছপের মুখে বুলি ফুটেছে দেখছি।'

ব্যোমকেশ কটমট করিয়া চাহিল। কিন্তু সত্যবতী তাহার রোষদৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, 'বলছ বল, এখন আমার হাত জোড়া। পরে কিন্তু আবার বলতে হবে।' বলিয়া সে চলিয়া গেল।

আমরা কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া চা পান করিলাম। কচ্ছপের উপমাটা ব্যোমকেশের পছন্দ হয় নাই, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। মনে মনে আমোদ অনুভব করিলাম। এবার সুবিধা পাইলেই তাহাকে কচ্ছপ বলিব।

যা হ'ক, কিছুক্ষণ পরে সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, 'মণিময় আর বৌয়ের ওপর যে সন্দেহ হয়েছিল, সেটা স্রেফ সুযোগের কথা ভেবে। মোটিভের কথা তখনও ভাবিনি। মণিময়ের মোটা টাকার দরকার হতে পারে, তার বৌয়ের গয়নার প্রতি লোভ থাকতে পারে; কিন্তু ওদের পারিবারিক জীবন যতটা দেখলাম তাতে চুরি করার দরকার আছে বলে মনে হয় না। রসময়বাবু স্নেহময় পিতা, স্নেহময় শ্বশুর। ছেলে এবং পুত্রবধূকে তাঁর অদেয় কিছুই নেই। যা চাইলেই পাওয়া যায় তা কেউ চুরি করে না।

'ভোলার কথা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। সুযোগ এবং মোটিভ, দুই-ই তার পুরোমাত্রায় আছে। লোকটা ভারী ধূর্ত আর স্থিরবুদ্ধি। হয়ত চাকরিতে ঢুকে অবধি সে চুরির মতলব আঁটছিল এবং মনে মনে প্ল্যান ঠিক করে রেখেছিল।

কাল বিকালবেলা মস্ত দাঁও মারবার সুযোগ জুটে গেল। বাড়িতে দামী গয়না এসেছে. কিন্তু গিন্নী সিন্দুকের চাবি নিয়ে তীর্থ করতে চলে গেছেন।

'ভোলার সাজশ ছিল তার বড় ভাই ভূতনাথের সঙ্গে। ভেবে দেখ কেমন যোগাযোগ। ভূতনাথ পোস্ট-অফিসে কাজ করে; তার কাজ হচ্ছে রাস্তার ধারেব ডাক-বাক্স থেকে চিঠি নিয়ে ঝোলায় ভরে পোস্ট-অফিসে পেঁছে দেওয়া। হালফিল বৌবাজার এলাকায় তার কাজ; সকাল বিকেল দুপুরে তিনবার এসে সে ডাক-বাক্স পরিষ্কার করে নিয়ে যায়।

'ভোলা গামছা কেনার ছুতো করে ভূতনাথের কাছে গেল। তাকে বলে এল, সকালবেলা ডাক পরিষ্কার করতে গিয়ে সে ওই ডাক-বাক্সটার মধ্যে একটা প্যাকেট পাবে, সেটা যেন সে নিয়ে না যায়, ডাক-বাক্সতেই রেখে দেয়। তারপর পুলিসের হাঙ্গামা কেটে যাবার পর সেটা বাড়ি নিয়ে যাবে। সাধারণ ডাক-বাক্সে প্যাকেট কেউ ফেলে না, তাই প্যাকেট চিনতে কোনও কষ্ট নেই। বিশেষত এই প্যাকেটে সম্ভবত ঠিকানা লেখা থাকবে না।

'ভূতনাথ লোকটা ভালমানুষ গোছের। কিন্তু সে লোভে পড়ে গেল। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। চাকরি তো যাবেই, সম্ভবত শ্রীঘর বাসও হবে।

'কাল বিকেল পর্যন্ত আমি অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলাম। তারপর যেই দেখলাম মণিময় ডাক-বাক্সে চিঠি ফেলছে অমনি সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ভোলা বলে-ছিল তাব এক ভাই পোস্ট-অফিসে চাকরি করে। কে চোর, কী করে চুরি কবেছে, চোবাই মাল কোথায় আছে, কিছুই অজানা রইল না। ভোলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে টুক করে প্যাকেটটা ডাক-বাক্সে ফেলে আবার উপরে উঠে গিয়েছিল। হয়তো দরজার সামনে মিনিটখানেক দাঁড়িয়েছিল হাঁফ নেবার জন্যে। মণিময় যে ক্লাব থেকে ফেরেনি এবং মণিময়ের বৌ যে জানালায় দাঁড়িয়ে স্বামীর পথ চেয়ে আছে তা সে জানত না।

'আমি যখন ব্যাপার বুঝতে পারলাম. তখন সটান অমরেশবাবুর কাছে গেলাম। ভোলার দাদা ভূতনাথ কী কাজ করে, পোস্ট-অফিসে খবব নিয়ে জানা গেল। তখন বাকী রইল শুধু আসামীদের ফাঁদ পেতে ধরা এবং স্বীকারোক্তি আদায় করা।'

দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিয়া দ্বার খুলিলাম। মণিময় দাঁড়াইয়া আছে! হাসিমুখে বলিল, 'বাবা পাঠালেন।'

ব্যোমকেশ ভিতর হইতে বলিল, 'আসুন মণিময়বাবু।'

মণিময় ভিতরে আসিয়া বসিল, পকেট হইতে একটি ছোট্ট নীল মখমলেব কৌটা লইয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে রাখিল, 'বাবা এটি আপনার জন্যে পাঠালেন। তিনি নিজেই আসতেন. কিন্তু তাঁর পা—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, উপযুক্ত ছেলে থাকতে তিনি বুড়োমানুষ আসবেন কেন? তা—নেকলেস পেয়ে তিনি খুশী হয়েছেন?'

মণিময় হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, 'সে আর বলতে! তিনি আমাকে বলতে বলেছেন. এই সামান্য জিনিসটা আপনার প্রতিভার উপযুক্ত নয়. তবু আপনাকে নিতে হবে।'

'কী সামান্য জিনিস?' ব্যোমকেশ কৌটা লইয়া খুলিল; একটা মটরের মত হীরা ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। হীরার আংটি? ব্যোমকেশ আংটিটা সসম্ভ্রম চক্ষে

নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ। আপনার বাবাকে বলবেন আংটি আমি নিলাম। এটাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি এর উপযুক্ত নই। চললেন না কি? চা খেয়ে যাবেন না?'

মণিময় বলিল, 'আজ একটু তাড়া আছে। দুপুরের প্লেনে দিল্লি যেতে হবে। ফিরে এসে আর একদিন আসব, তখন চা খাব।'

মণিময় চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিতর দিক হইতে সত্যবতী প্রবেশ করিল। বোধ হয় পর্দার আড়ালে ছিল। ললিতকণ্ঠে বলিল, 'দেখি দেখি, কী পেলে?'

ব্যোমকেশ আংটির কৌটা লুকাইয়া ফেলিবার তালে ছিল, আমি কাড়িয়া লইয়া সত্যবতীকে দিলাম। বলিলাম, 'এই নাও। এটা ব্যোমকেশের প্রতিভার উপযুক্ত নয়, এবং ব্যোমকেশ এর উপযুক্ত নয়। সুতরাং এটা তোমার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আরে আরে, এ কী!'

আংটি দেখিয়া সত্যবতীর চক্ষু আনন্দে বিস্ফারিত হইল, 'ও মা, হীরের আংটি! ভীষণ দামী আংটি! হীরেটারই দাম হাজার খানেক।' আংটি নিজের আঙুলে পরিয়া সত্যবতী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল 'কেমন মানিয়েছে বল দেখি'—ঐ যাঃ, মাছের ঝোল চড়িয়ে এসেছি, এতক্ষণে বোধহয় পুড়েঝুড়ে শেষ হয়ে গেল।' সত্যবতী আংটি পরিয়া চকিতে অন্তর্হিতা হইল।

ব্যোমকেশ তক্তপোশে এলাইয়া পড়িয়া গভীর নিশ্বাস মোচন করিল, বলিল 'গহনা কর্মণো গতিঃ।'

বলিলাম, 'ঠিক কথা। এবং গহনার গতি গৃহিণীর দিকে।'

অমৃতের মৃত্যু

গ্রামের নাম বাঘমারি। রেল-লাইনের ধারেই গ্রাম, কিন্তু গ্রাম হইতে স্টেশনে যাইতে হইলে মাইলখানেক হাঁটিতে হয়। মাঝখানে ঘন জঙ্গল। গ্রামের লোক স্টেশন যাইবার সময় বড় একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়া যায় না, রেল-লাইনের তারের বেড়া টপ্‌কাইয়া লাইনের ধার দিয়া যায়।

স্টেশনের নাম সাঁতালগোলা। বেশ বড় স্টেশন, স্টেশন ঘিরিয়া একটি গঞ্জ গড়িয়া উঠিয়াছে। অঞ্চলটা ধান্য-প্রধান। এখান হইতে ধান-চাল রপ্তানি হয়। গোটা দুই চালের কলও আছে।

যুদ্ধের সময় একদল মার্কিন সৈন্য সাঁতালগোলা ও বাঘমারির মধ্যস্থিত জঙ্গলের মধ্যে কিছুকাল ছিল; তাহারা খালি গায়ে প্যাণ্ট পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, চাষীদের সঙ্গে বসিয়া ডাবা-হুঁকায় তামাক খাইত। তারপর যুদ্ধের শেষে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গেল, রাখিয়া গেল কিছু অবৈধ সন্তানসন্ততি এবং কিছু ক্ষুদ্রায়তন অস্ত্রশস্ত্র।

ব্যোমকেশ ও আমি যে-কর্ম উপলক্ষে সাঁতালগোলায় গিয়া কিছুকাল ছিলাম তাহার সহিত উক্ত অস্ত্রশস্ত্রের সম্পর্ক আছে, তাহার বিশদ উল্লেখ যথাসময়ে করিব। উপস্থিত যে কাহিনী লিখিতেছি তাহার ঘটনাকেন্দ্র ছিল বাঘমারি গ্রাম, এবং যাহাদের মুখে কাহিনীর গোড়ার দিকটা শুনিয়াছিলাম তাহারা এই গ্রামেরই ছেলে। বাক্‌বাহুল্য বর্জনের জন্য তাহাদের মুখের কথাগুলি সংহত আকারে লিখিতেছি।

বাঘমারি গ্রামে যে কয়টি কোঠাবাড়ি আছে তন্মধ্যে সদানন্দ সুরের বাড়িটা সবচেয়ে পুরাতন। গুটিতিনেক ঘর, সামনে শানবাঁধানো চাতাল, পিছনে পাঁচিল-ঘেরা উঠান। বাড়ির ঠিক পিছন হইতে জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে।

সদানন্দ সুর বয়স্থ ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী স্ত্রী-পুত্র কেহ নাই, একলাই পৈতৃক ভিটায় থাকেন। তাঁহার একটি বিবাহিতা ভগিনী আছে বটে, স্বামী রেলের চাকরি করে, কিন্তু তাহারা শহুরে লোক, তাহাদের সহিত সদানন্দ-বাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই। গ্রামের লোকের সঙ্গেও তাঁহার সম্পর্ক খুব গাঢ় নয়, কাহারও সহিত অসদ্ভাব না থাকিলেও বেশী মাখামাখিও নাই। বেশীর ভাগ দিন সকালবেলা উঠিয়া তিনি স্টেশনের গঞ্জে চলিয়া যান, সন্ধ্যার সময় গ্রামে ফিরিয়া আসেন। তিনি কী কাজ করেন সে সম্বন্ধে কাহারও মনে খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। কেহ বলে ধান-চালের দালালি করেন; কেহ বলে বন্ধকী কারবার আছে। মোটের উপর লোকটি অত্যন্ত সংবৃতমন্ত্র ও মিতব্যয়ী, ইহার অধিক তাঁহার বিষয়ে বড় কেহ কিছু জানে না।

একদিন চৈত্র মাসের ভোরবেলা সদানন্দ বাড়ি হইতে বাহির হইলেন; একটি মাঝারি আয়তনের ট্রাঙ্ক ও একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ বাহিরে রাখিয়া দরজায় তালা লাগাইলেন। তারপর ব্যাগ ও ট্রাঙ্ক দুই হাতে ঝুলাইয়া যাত্রা করিলেন।

বাড়ির সামনে মাঠের মতো খানিকটা খোলা জায়গা। সদানন্দ মাঠ পার হইয়া রেল-লাইনের দিকে চলিয়াছেন, গ্রামের বৃদ্ধ হীরু মোড়লের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। হীরু বলিল, 'কী গো কত্তা, সকালবেলা বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে কোথায় চলেছেন?'

সদানন্দ থামিলেন, 'দিন কয়েকের জন্য বাইরে যাচ্ছি।'

হীরু বলিল, 'অ। তিত্থিধম্ম করতে চললেন নাকি?'

সদানন্দ শুধু হাসিলেন। হীরু বলিল, 'ইরির মধ্যে তিত্থিধম্ম? বয়স কত হল কত্তা?'

'পঁয়তাল্লিশ।' সদানন্দ আবার চলিলেন।

হীরু পিছন হইতে ডাক দিয়া প্রশ্ন করিল, 'ফিরছেন কদ্দিনে?'

'দিন ছ'সাতের মধ্যেই ফিরব।'

সদানন্দ চলিয়া গেলেন।

তাঁহার আকস্মিক তীর্থযাত্রা লইয়া গ্রামে একটু আলোচনা হইল। তাঁহার প্রাণে যে ধর্মকর্মের প্রতি আসক্তি আছে এ সন্দেহ কাহারও ছিল না। গত দশ বৎসরের মধ্যে এক রাত্রির জন্যও তিনি বাহিরে থাকেন নাই। সকলে আন্দাজ করিল নীরব-কর্মা সদানন্দ সুর কোনও মতলবে বাহিরে গিয়াছেন।

ইহার দিন তিন চার পরে সদানন্দের বাড়ির সামনের মাঠে গ্রামের ছেলে-ছোকরারা বসিয়া জটলা করিতেছিল। গ্রামে পঁচিশ-ত্রিশ ঘর ভদ্রশ্রেণীর লোক বাস করে; সন্ধ্যার পর তরুণ-বয়স্কেরা এই মাঠে আসিয়া বসে, গল্পগুজব করে, কেহ গান গায়, কেহ বিড়ি-সিগারেট টানে। শীত এবং বর্ষাকাল ছাড়া এই স্থানটাই তাহাদের আড্ডাঘর।

আজ অমৃত নামধারী জনৈক যুবককে সকলে মিলিয়া ক্ষেপাইতেছিল। অমৃত গাঁয়ের একটি ভদ্রলোকের অনাথ ভাগিনেয়, একটু আধ-পাগলা গোছের ছেলে। রোগা তালপাতার সেপাইয়ের মতো চেহারা, তড়বড় করিয়া কথা বলে, নিজের সাহস ও বুদ্ধিমত্তা প্রমাণের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। তাই সুযোগ পাইলে সকলেই তাহাকে লইয়া একটু রঙ্গ-তামাশা করে।

সকালের দিকে একটা ব্যাপার ঘটিয়াছিল।—নাদু নামক এক যুবকের সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে; তাহার বৌয়ের নাম পাপিয়া। বৌটি সকালবেলা কলসী লইয়া পুকুরে জল আনিতে যাইতেছিল, ঘাটে অন্য মেয়েরাও ছিল। অমৃত পুকুরপাড়ে বসিয়া খোলামকুচি দিয়া জলের উপর ব্যাঙ-লাফানো খেলিতেছিল; নাদুর বৌকে দেখিয়া তাহার কি মনে হইল, সে পাপিয়ার স্বর অনুসরণ করিয়া ডাকিযা উঠিল—'পিউ পিউ—পিয়া পিয়া পাপিয়া—'

মেয়েরা হাসিয়া উঠিল। বৌটি অপমান বোধ করিয়া তখনই গৃহে ফিরিয়া গেল এবং স্বামীকে জানাইল। নাদু অগ্নিশর্মা হইয়া লাঠি হাতে ছুটিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া অমৃত পুকুরপাড়ের একটা নারিকেল গাছে উঠিয়া পড়িল। তারপর গাঁয়ের মাতব্বর ব্যক্তিরা আসিয়া শান্তিরক্ষা করিলেন। অমৃতের মনে যে কু-অভিপ্রায় ছিল না তাহা সকলেই জানিত, গোঁয়ার গোবিন্দ নাদুও বুঝিল। ব্যাপার বেশীদূর গড়াইতে পাইল না।

কিন্তু অমৃত তাহার সমবয়স্কদের শ্লেষ-বিদ্রূপ হইতে নিস্তার পাইল না। সন্ধ্যার সময় সে মাঠের আড্ডায় উপস্থিত হইতেই সকলে তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল।

পটল বলিল, 'হ্যাঁরে অমর্ত, তুই এতবড় বীর, নাদুর সঙ্গে লড়ে যেতে পারলি না? নারকেল গাছে উঠলি!'

অমৃত বলিল, 'হুঃ. আমি তো ডাব পাড়তে উঠেছিলাম। নেদোকে আমি ডরাই না, ওর হাতে যদি লাঠি না থাকত অ্যাযসা লেঙ্গি মারতাম যে বাছাধনকে বিছানায় পড়ে কোঁ-কোঁ করতে হত!'

গোপাল বলিল, 'শাবাশ! বাড়ি গিয়ে মামার কাছে খুব ঠেঙানি খেয়েছিলি তো?'

অমৃত হাত মুখ নাড়িয়া বলিল, 'মামা মারেনি, মামা আমাকে ভালবাসে। শুধু মামী কান মলে দিয়ে বলেছিল—তুই একটা গো-ভূত।'

সকলে হি-হি করিয়া হাসিল। পটল বলিল, 'ছি ছি, তুই এমন কাপুরুষ! মেয়েমানুষের হাতেব কানমলা খেলি?'

অমৃত বলিল. 'মামী গুরুজন, তাই বেঁচে গেল, নইলে দেখে নিতাম। আমার সঙ্গে চালাকি নয়।'

দাশু বলিল, 'আচ্ছা অমরা, তুই তো মানুষকে ভয় করিস না। সত্যি বল দেখি, ভূত দেখলে কি করিস?'

একজন নিম্নস্বরে বলিল, 'কাপড়ে-চোপড়ে—'

অমৃত চোখ পাকাইয়া বলিল, ভূত আমি দেখেছি কিন্তু মোটেই ভয় পাইনি।'

সকলে কলরব করিয়া উঠিল. 'ভূত দেখেছিস? কবে দেখলি? কোথায় দেখলি?'

অমৃত সগর্বে জঙ্গলের দিকে শীর্ণ বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল, 'ঐখানে।'

'কবে দেখেছিস? কী দেখেছিস?'

অমৃত গম্ভীব স্বরে বলিল, 'ঘোড়া-ভূত দেখেছি।'

দু'একজন হাসিল। গোপাল বলিল. 'তুই গো-ভূত কিনা, তাই ঘোড়া-ভূত দেখেছিস। কবে দেখলি?'

'পরশু রাত্তিরে।' অমৃত পরশু রাত্রের ঘটনা বলিল, 'আমাদের কৈলে বাছুরটা দড়ি খুলে গোয়ালঘর থেকে পালিয়েছিল। মামা বললে, যা অমরা, জঙ্গলের ধারে দেখে আয়। রাত্তির তখন দশটা; কিন্তু আমার তো ভয়-ডর নেই, গেলাম জঙ্গলে। এদিক ওদিক খুঁজলাম, কিন্তু কোথায় বাছুর! চাঁদের আলোয় জঙ্গলের ভেতরটা হিলি-বিলি দেখাচ্ছে—হঠাৎ দেখি একটা ঘোড়া। খুরের শব্দ শুনে ভেবেছিলাম বুঝি বাছুরটা; ঘাড় ফিরিয়ে দেখি একটা ঘোড়া বনের ভেতর দিয়ে সাঁ করে চলে গেল। কালো কুচকুচে ঘোড়া, নাক দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। আমি রামনাম করতে করতে ফিরে এলাম। রামনাম জপলে ভূত আর কিছু বলতে পারে না।'

দাশু জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে গেল ঘোড়া-ভূত?'

'গাঁয়ের দিক থেকে ইস্টিশানের দিকে।'

'ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিল?'

'অত দেখিনি।'

সকলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভূতের গল্প বানাইয়া বলিতে পারে এত কল্পনাশক্তি অমৃতের নাই। নিশ্চয় সে জ্যান্ত ঘোড়া দেখিয়াছিল। কিন্তু

জঙ্গলে ঘোড়া আসিল কোথা হইতে? গ্রামে কাহারও ঘোড়া নাই' যুদ্ধের সময় যে মার্কিন সৈন্য জঙ্গলে ছিল তাহাদের সঙ্গেও ঘোড়া ছিল না। ইস্টিশানের গঞ্জে দুই-চারিটা ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়া আছে বটে। কিন্তু ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়া রাত্রিবেলা জঙ্গলে ছুটাছুটি করিবে কেন? তবে কি অমৃত পলাতক বাছুরটাকেই ঘোড়া বলিয়া ভুল করিয়াছিল?

অবশেষে পটল বলিল, 'বুঝেছি, তুই বাছুর দেখে ঘোড়া-ভূত ভেবেছিলি।'

অমৃত সজোরে মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, 'না না; ঘোড়া। জলজ্যান্ত ঘোড়া-ভূত-আমি দেখেছি।'

'তুই বলতে চাস্ ঘোড়া-ভূত দেখেও তোর দাঁত-কপাটি লাগেনি?'

'দাঁত-কপাটি লাগবে কেন? আমি রামনাম করেছিলাম।'

'রামনাম করেছিলি বেশ করেছিলি। কিন্তু ভয় পেয়েছিলি বলেই না রামনাম করেছিলি?'

'মোটেই না, মোটেই না'—অমৃত আস্ফালন করিতে লাগিল, 'কে বলে আমি ভয় পেয়েছিলাম! ভয় পাবার ছেলে আমি নয়।'

দাশু বলিল, 'দ্যাখ্ অম্‌রা, বেশী বড়াই করিস নি। তুই এখন জঙ্গলে যেতে পারিস?'

'কেন পারব না!' অমৃত ঈষৎ শঙ্কিতভাবে জঙ্গলের দিকে তাকাইল। ইতি-মধ্যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া চাঁদের আলো ফুটিয়াছে, জঙ্গলের গাছগুলা ঘনকৃষ্ণ ছায়া রচনা করিয়াছে; অমৃত একটু থামিয়া গিয়া বলিল, 'ইচ্ছে করলেই যেতে পারি, কিন্তু যাব কেন? এখন তো আর বাছুর হারায় নি।'

গোপাল বলিল, 'বাছুর না হয় হারায় নি। কিন্তু তুই গুল মারছিস কিনা বুঝব কি করে?'

অমৃত লাফাইয়া উঠিল, 'গুল মারছি! আমি গুল মারছি! দ্যাখ্ গোপ্‌লা, তুই আমাকে চিনিস না—'

'বেশ তো চিনিয়ে দে। যা দেখি একলা জঙ্গলের মধ্যে। তবে বুঝব তুই বাহাদুর।'

অমৃত আর পারিল না, সদর্পে বলিল, 'যাচ্ছি—এক্ষুনি যাচ্ছি। আমি কি ভয় করি নাকি?' সে জঙ্গলের দিকে পা বাড়াইল।

পটল তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'শোন্, এই খড়ি নে। বেশীদূর তোকে যেতে হবে না, সদানন্দদা'র বাড়ির পিছনে যে বড় শিমুলগাছটা আছে তার গায়ে খড়ি দিয়ে ঢ্যারা মেরে আসবি। তবে বুঝব তুই সত্যি গিয়েছিলি।'

খড়ি লইয়া ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে অমৃত বলিল, 'তোরা এখানে থাকবি তো?'

'থাকব।'

অমৃত জঙ্গলের দিকে পা বাড়াইল। যতই অগ্রসর হইল ততই তাহার গতিবেগ হ্রাস হইতে লাগিল। তবু শেষ পর্যন্ত সে সদানন্দ সুরের বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মাঠে উপবিষ্ট ছোকরার দল পাণ্ডুর জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়া নীরবে জঙ্গলের দিকে চাহিয়া রহিল। একজন বিড়ি ধরাইল। একজন হাসিল, 'অম্‌রা হয়তো সদানন্দদা'র বাড়ির পাশে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে।'

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। সকলের দৃষ্টি জঙ্গলের দিকে।

হঠাৎ জঙ্গল হইতে চড়াৎ করিয়া একটা শব্দ আসিল। শুকনো গাছের ডাল ভাঙিলে যেরূপ শব্দ হয় অনেকটা সেইরূপ। সকলে চকিত হইয়া পরস্পরের পানে চাহিল।

আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। কিন্তু অমৃত ফিরিয়া আসিল না। অমৃত যেখানে গিয়াছে, ছোকরাদের দল হইতে সেই শিমুলগাছ বড়জোর পঞ্চাশ-ষাট গজ। তবে সে ফিরিতে এত দেরি করিতেছে কেন!

আরও তিন চার মিনিট অপেক্ষা করিবার পর পটল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'চল্ দেখি গিয়ে। এত দেরি করছে কেন অমরা!'

সকলে দল বাঁধিয়া যে-পথে অমৃত গিয়াছিল সেই পথে চলিল। একজন রহস্য করিয়া বলিল, 'অম্‌রা ঘোড়া-ভূতের পিঠে চড়ে পালাল নাকি?'

অম্‌রা কিন্তু পালায় নাই। সদানন্দ সুরের বাড়ির খিড়কি হইতে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে শিমুলগাছ। সেখানে জ্যোৎস্না-বিদ্ধ অন্ধকারে সাদারঙের কি একটা পড়িয়া আছে। সকলে কাছে গিয়া দেখিল—অমৃত।

একজন দেশলাই জ্বালিল। অমৃত চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার বুকের জামা রক্তে ভিজিয়া উঠিয়াছে।

অমৃত ভূতের ভয়ে মরে নাই, বন্দুকের গুলিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

দুই

ব্যোমকেশ আমাকে লইয়া সান্তালগোলায় আসিয়াছিল একটা সরকারী তদন্ত উপলক্ষে। সরকারের বেতনভুক পুলিস-কর্মচারীরা ব্যোমকেশকে স্নেহের চোখে দেখেন না বটে, কিন্তু মন্ত্রিমহলে তাহার খাতির আছে। পুলিসের জবাব দেওয়া কেস্ মাঝে মাঝে তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে।

গত মহাযুদ্ধের সময় অনেক বিদেশী সৈন্য আসিয়া এদেশের নানা স্থানে ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়াছিল; তারপর যুদ্ধের শেষে বিদেশীরা চলিয়া গেল, দেশে স্বদেশী শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইল। স্বাধীনতার রক্ত-স্নান শেষ করিয়া দেশ যখন মাথা তুলিল তখন দেখিল হ্রদের উপরিভাগ শান্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তলদেশে হিংস্র নক্রকুল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিদেশী সৈন্যদলের ফেলিয়া-যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই নক্রকুলের নখদন্ত। রেলের দুর্ঘটনা, আকস্মিক বোমা বিস্ফোরণ, সশস্ত্র ডাকাতি—নূতন শাসনতন্ত্রকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

পুলিস তদন্তে দু'চারজন দুর্বৃত্ত ধরা পড়িলেও, বোমা পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র কোথা হইতে সরবরাহ হইতেছে তাহার হদিস মিলিল না। বিদেশী সিপাহীরা যেখানে যেখানে ঘাঁটি গাড়িয়াছিল, অস্ত্রগুলি যে তাহার কাছেপিঠেই সঞ্চিত হইয়াছে তাহা অনুমান করা শক্ত নয়; কিন্তু আসল সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল অস্ত্র-সরবরাহকারী লোকগুলাকে ধরা। যাহারা অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের কালাবাজার চালাইতেছে তাহাদের ধরিতে না পারিলে এ উৎপাতের মূলোচ্ছেদ হইবে না।

সরকারী দপ্তরের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যোমকেশ প্রথমে সান্তালগোলায় আসিয়াছে। স্থানটি ছোট, কোন অবস্থাতেই তাহাকে শহর বলা চলে না।

স্টেশনের কাছে রেল-কর্মচারীদের একসারি কোয়ার্টার। একটি পাকা রাস্তা স্টেশনকে স্পর্শ করিয়া দুই দিকে মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে এবং কুড়ি পঁচিশ বিঘা জমিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে; এই স্থানটুকুর মধ্যে কয়েকটা বড় বড় আড়ত, পুলিস থানা, পোস্ট-অফিস, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, সরকারী বিশ্রান্তিগৃহ ইত্যাদি আছে। যে দু'টি চাল-কলের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি সে দু'টি এই রাস্তা-ঘেরা স্থানের দুই প্রান্তে অবস্থিত। স্থানীয় লোক অধিকাংশ বাঙালী হইলেও, মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী যথেষ্ট আছে।

আমরা সরকারী বিশ্রান্তিগৃহে আড্ডা গাড়িয়াছিলাম। ব্যোমকেশের এখানে আত্মপরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল না, এ ধরনের তদন্তে যতটা প্রচ্ছন্ন থাকা যায় ততই সুবিধা; কিন্তু আসিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য কাহারও অবিদিত নাই। স্থানীয় পুলিসের দারোগা সুখময় সামন্ত পুলিস বিভাগ হইতে ব্যোমকেশ সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাঁহার কৃপায় ব্যোমকেশের খ্যাতি দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

দারোগা সুখময়বাবুর মুখ ভারি মিষ্ট, কিন্তু মস্তিষ্কটি দুষ্টবুদ্ধিতে ভরা। তিনি প্রকাশ্যে ব্যোমকেশকে সাহায্য করিতেছিলেন এবং অপ্রকাশ্যে যত ভাবে সম্ভব বাগড়া দিতেছিলেন। পুলিস যেখানে ব্যর্থ হইয়াছে, একজন বাহিরের লোক আসিয়া সেখানে কৃতকার্য হইবে, ইহা বোধ হয় তাঁহার মনঃপূত হয় নাই।

যাহোক, বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ব্যোমকেশ কাজ আরম্ভ করিল। পরিচয় গোপন রাখা সম্ভব নয় দেখিয়া প্রকাশ্যভাবেই অনুসন্ধান শুরু করিল। খোলাখুলি থানায় গিয়া দারোগা সুখময়বাবুর নিকট হইতে স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির নামের তালিকা সংগ্রহ করিল। স্টেশনে গিয়া মাস্টার, মালবাবু, টিকিট-বাবু, চেকার প্রভৃতির সহিত ভাব জমাইল; কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে গিয়া ম্যানেজারের নিকট হইতে স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিদের খোঁজখবর লইল। সকলেই জানিতে পারিয়াছিল ব্যোমকেশ কি জন্য আসিয়াছে, তাই সকলে সহযোগিতা করিলেও বিশেষ কোনও ফল হইল না।

চার পাঁচ দিন বৃথা ঘোরাঘুরির পর ব্যোমকেশ এক মতলব বাহির করিল। স্থানীয় যে-কয়জন বর্ধিষ্ণু লোককে সন্দেহ করা যাইতে পারে তাহাদের বেনামী চিঠি লিখিল। চিঠির মর্ম ঃ আমি তোমার গোপন কার্যকলাপ জানিতে পারিয়াছি, শীঘ্রই দেখা হইবে।—চিঠিগুলি আমি দুই-তিন স্টেশন দূরে জংশনে গিয়া ডাকে দিয়া আসিলাম।

চার ফেলিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু মাছের দেখা নাই। এইভাবে আরও দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। নিষ্কর্মার মতো দিনে রাত্রে ঘুমাইয়া ও সকাল সন্ধ্যা ভ্রমণ করিয়া স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু কাজের সুরাহা হইল না।

তারপর একদিন সকালবেলা বাঘমারি গ্রাম হইতে তিনটি ছেলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বেলা আন্দাজ আটটার সময় গরম জিলাপী সহযোগে গরম দুগ্ধ সেবন করিয়া অভ্যন্তরভাগে বেশ একটি তৃপ্তিকর পরিপূর্ণতা অনুভব করিতেছি, এমন সময় দ্বারের কাছে কয়েকটি মুণ্ড উঁকিঝুঁকি মারিতেছে দেখিয়া ব্যোমকেশ বাহিরে আসিল,—'কি চাই ?'

বিশ্রান্তিগৃহে পাশাপাশি দুটি ঘর, সামনে ঢাকা বারান্দা। তিনটি যুবক বারান্দায় উঠিয়া ইতস্তত করিতেছিল, ব্যোমকেশকে দেখিয়া যুগপৎ দন্তবিকাশ করিল। একজন সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনিই ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ।'

যুবকদের দন্তবিকাশ কর্ণচুম্বী হইয়া উঠিল। একজন বলিল, 'আমরা বাঘমারি গ্রাম থেকে আসছি।'

'বাঘমারি গ্রাম! সে কোথায়?'

'আজ্ঞে বেশী দূর নয়, এখান থেকে মাইলখানেক।'

'আসুন'– বলিয়া ব্যোমকেশ তাহাদের ঘরে লইয়া আসিল। বিশ্রান্তিগৃহের বাঁধা-বরাদ্দ আসবাব –একটি চেয়ার, একটি টেবিল, একটি আরাম-কেদারা, দুটি খাট, মেঝেয় নারিকেল-ছোবড়ার চাটাই পাতা। যুবকেরা দু'জন মেঝেয় বসিল, একজন টেবিলে উঠিয়া বসিল। ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় অর্ধশয়ান হইয়া বলিল, 'কী ব্যাপার বলুন দেখি?'

যে ছোকরা অগ্রণী হইয়া কথা বলিতেছিল তাহার নাম পটল। অন্য দুজনের নাম দাশু ও গোপাল। পটল বলিল, 'আপনি শোনেননি! আমাদের গ্রামে একটা ভীষণ হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে।'

'বলেন কি! কবে?' ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় উঠিয়া বসিল।

দাশু ও গোপাল একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'পরশু সন্ধ্যের পর।'

পটল বলিল, 'পুলিসে তক্ষুনি খবর দেওয়া হয়েছিল। কাল সকাল বেলা ন'টার সময় দারোগা সুখময় সামন্ত গিয়েছিল। লাশ নিয়ে চলে এসেছিল, তারপর আর কোনও খবর নেই। আজ আমরা আপনার কাছে আসবার আগে থানায় গিয়েছিলাম, সুখময় দারোগা আমাদের হাঁকিয়ে দিলে। লাশ নাকি সদরে পাঠানো হয়েছে, হাসপাতালে চেরা-ফাঁড়া হবে। আপনি এসব কিছুই জানেন না? তবে যে শুনেছিলাম আপনি পুলিসকে সাহায্য করবার জন্য এখানে এসেছেন!'

ব্যোমকেশ শুষ্কস্বরে বলিল, 'দারোগাবাবু বোধ হয় এ খবর আমাকে দেওয়া দরকার মনে করেননি। সে যাক। কে কাকে খুন করেছে? কী দিয়ে খুন করেছে?'

পটল বলিল, 'বন্দুক দিয়ে। খুন হয়েছে আমাদের এক বন্ধু—অমৃত। কে খুন করেছে তা কেউ জানে না। ব্যোমকেশবাবু, অমৃতার মৃত্যুর জন্য আমরাও খানিকটা দায়ী, ঠাট্টা-তামাশা করতে গিয়ে এই সর্বনাশ হয়েছে। তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি। সুখময় দারোগার দ্বারা কিছু হবে না, আপনি দয়া করে খুঁজে বার করুন কে খুন করেছে। আমরা আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বন্দুক দিয়ে খুন হয়েছে। আশ্চর্য!—সব কথা খুলে বলুন।'

অতঃপর পটল, দাশু ও গোপাল মিলিয়া কখনও একসঙ্গে কখনও পর্যায়-ক্রমে যে কাহিনী বলিল তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। অমৃতের মৃত্যুতে তাহারা খুব কাতর হইয়াছে এমন মনে হইল না, কিন্তু অমৃতের রহস্যময় মৃত্যু তাহাদের উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। এবং ব্যোমকেশকে হাতের কাছে পাইয়া

এই উত্তেজনা নাটকীয় রূপ ধারণ করিয়াছে।

অমৃতের মৃত্যু-বিবরণ শেষ হইতে আন্দাজ দু'ঘণ্টা লাগিল; ব্যোমকেশ মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিয়া অস্পষ্ট স্থান পরিষ্কার করিয়া লইল। শেষে বলিল, 'ঘটনা রহস্যময় বটে, তার ওপর বন্দুক।--কিন্তু শুধু গল্প শুনলে কাজ হবে না, জায়গাটা দেখতে হবে।'

তিনজনেই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পটল বলিল, 'বেশ তো, এখুনি চলুন না, ব্যোমকেশবাবু। আপনি আমাদের গ্রামে যাবেন সে তো ভাগ্যের কথা।'

ব্যোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'এ-বেলা থাক। দু'দিন যখন কেটে গেছে তখন একবেলায় বিশেষ ক্ষতি হবে না। আমরা ও-বেলা পাঁচটা নাগাদ যাব।'

'বেশ, আমরা এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

তাহারা চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে দারোগা সুখময়বাবু আসিলেন। চেয়ারে নিজের সুবিপুল বপুখানি ঠাসিয়া দিয়া বলিলেন, 'বাঘমারির ছোঁড়াগুলো এসেছিল তো? আমার কাছেও গিয়েছিল। বাঙালীর ছেলে, একটা হুজুগ পেয়েছে, আর কি রক্ষে আছে! আপনি ওদের আমল দেবেন না মশাই, আপনার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, আমল দেব কেন? আপনি তো ওদের আগে থাকতেই চেনেন, কেমন ছেলে ওরা?'

সুখময়বাবু বলিলেন, 'পাড়াগাঁয়ের বকাটে নিষ্কর্মা ছেলে আর কি। বাপের দু'বিঘে ধান-জমি আছে, কি তিনটে নারকেল গাছ আছে, ব্যস্, ঘরে বসে-বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যে ছেলেটা মারা গেছে সেও তো ওদেরই দলের ছেলে।'

'হ্যাঁ, সে ছিল আবার এককাটি বাড়া। মামার ভাতে ছিল, বকামি করে বেড়াতো।'

'বন্দুকের গুলিতে মরেছে শুনলাম।'

'তাই মনে হয়, তবে তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না।'

'হুঁ। কে মেরেছে কিছু সন্দেহ করেন?'

'কি করে সন্দেহ করব বলুন দেখি? কেউ কিছু চোখে দেখেনি, সবাই এক-জোট হয়ে মাঠে আড্ডা দিচ্ছিল। তবে একটা ব্যাপারের জন্যে একজনের ওপর সন্দেহ হচ্ছে। সেদিন সকালবেলা অমৃত নাদুর-বৌকে অপমান করেছিল। নাদু একরোখা গোঁয়ার মানুষ, লাঠি নিয়ে অমৃতকে মারতে ছুটেছিল। সন্ধ্যেবেলা মাঠের আড্ডাতেও সে ছিল না। তাকে একবার থানায় আনিয়ে ভালো করে নেড়ে-চেড়ে দেখতে হবে।—কিন্তু এসব বাজে কথা এখন থাক। একটা জরুরী খবর আপনাকে দিতে এলাম।' সহসা গলা খাটো করিয়া বলিলেন, 'যমুনাদাস গঙ্গারামের নাম জানেন তো, এখানকার মস্তবড় আড়তদার। সে একটা বেনামী চিঠি পেয়েছে।'

ব্যোমকেশ গাঢ় ঔৎসুক্য দেখাইয়া বলিল, 'বেনামী চিঠি! কী আছে তাতে?'

সুখময়বাবু বলিলেন, 'যমুনাদাস চুপিচুপি আমাকে চিঠি দেখিয়ে গেছে।

খামের চিঠি, তাতে স্রেফ লেখা আছে ঃ আমি সব জানতে পেরেছি, শীগ্‌গিরই দেখা হবে।'

'তাই নাকি! তাহলে তো যমুনাদাসের ওপর নজর রাখতে হয়!'

'সে-কথা আর বলতে! আমি একজন লোক লাগিয়ে দিয়েছি যমুনাদাসের পেছনে। সে অষ্টপ্রহর যমুনাদাসের ওপর নজর রেখেছে।'

'ভালো, ভালো! আপনি পাকা লোক, ঠিক কাজই করেছেন। এবার হয়তো একটা সুরাহা হবে।'

সুখময়বাবুর মুখে একটু বিনীত আত্মপ্রসন্নতা খেলিয়া গেল, 'হে-হে—এই কাজ করে চুল পেকে গেল, ব্যোমকেশবাবু। তা সে যাক। এখন আপনার কি খবর বলুন। কিছু পেলেন?'

ব্যোমকেশ হতাশ স্বরে বলিল, 'কৈ আর পেলাম! যতদূর চাই, নাই নাই সে-পথিক নাই।'

সুখময়বাবু উদ্ধৃতিটা ধরিতে পারিলেন না, কিন্তু যেন বুঝিয়াছেন এমনি-ভাবে হে-হে করিলেন। তিনি চেয়ারে একেবারে জাম হইয়া বসিয়াছিলেন, এখন টানা-হেঁচড়া করিয়া নিজেকে চেয়ারের বাহুমুক্ত করিলেন। বলিলেন, 'আজ উঠি, থানায় অনেক কাজ পড়ে আছে।'

ব্যোমকেশও উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'ভালো কথা, অমৃতর পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন নাকি?'

সুখময়বাবু একটু ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন, 'এখনও পাইনি। কালপরশু পাব বোধ হয়। কেন বলুন দেখি?'

'পেলে একবার আমাকে দেখাবেন।'

সুখময়বাবু একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'দেখতে চান, দেখাব। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু, আপনি রুই কাতলা ধরতে এসেছেন, আপনি যদি চুনোপুঁটির দিকে নজর দেন তাহলে আমরা বাঁচি কি করে?'

'না না, নজর দিইনি। নিতান্তই অহেতুক কৌতূহল। কথায় বলে—নেই কাজ তো খই ভাজ।'

সুখময়বাবুর মুখে আবার হাসি ফুটিল, তিনি দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে প্রথম আমাকে লক্ষ্য করিলেন; বলিলেন, 'এই-যে অজিতবাবু, কেমন আছেন? গল্প-টল্প লেখা হচ্ছে? আপনার আজগুবি গল্পগুলো পড়তে মন্দ লাগে না হে-হে। তবে রবার্ট ব্লেকের মতো নয়। আচ্ছা, আসি।'

তিনি শ্রুতিবহির্ভূত হইয়া গেলে ব্যোমকেশ আমার দিকে ফিরিয়া চোখ টিপিল, বলিল, 'হে-হে।'

তিন

বৈকালবেলা ছেলেরা আসিয়া আমাদের গ্রামে লইয়া গেল। রেল-লাইনের ধার দিয়া যখন গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলাম তখন গ্রামের সমস্ত পুরুষ অধিবাসী আমাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য লাইনের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ছেলে-বুড়া কেহ বাদ যায় নাই। সকলের চোখে বিস্ফারিত কৌতূহল। ব্যোমকেশ

বস্তুটা কীদৃশ জীব তাহারা স্বচক্ষে দেখিতে চায়।

মিছিল করিয়া আমরা গ্রামে প্রবেশ করিলাম। পটল অগ্রবর্তী হইয়া আমাদের একটি বাড়িতে লইয়া গেল। কাঁচা-পাকা বাড়ি, সামনের দিকে দুটি পাকা ঘর, পিছনে খড়ের চাল। মৃত অমৃতের মামার বাড়ি।

অমৃতের মামা বলরামবাবু বাড়ির সামনের চাতালে টেবিল-চেয়ার পাতিয়া চায়ের আয়োজন করিয়াছিলেন, জোড়হস্তে আমাদের সংবর্ধনা করিলেন। লোকটিকে ভালোমানুষ বলিয়া মনে হয়, কথাবলার ভঙ্গীতে সংকুচিত জড়তা। তিনি ভাগিনার মৃত্যুতে খুব বেশী শোকাভিভূত না হইলেও একটু যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

চায়ের সরঞ্জাম দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এসব আবার কেন?'

বলরামবাবু অপ্রতিভভাবে জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন, 'একটু চা—সামান্য—'

পটল বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমাদের গ্রামে পায়ের ধুলো দিয়েছেন আমাদের ভাগ্য। চা খেতেই হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা সে পরে হবে, আগে জঙ্গলটা দেখে আসি।'

'চলুন।'

পটল আবার আমাদের লইয়া চলিল। আরও কয়েকজন ছোকরা সঙ্গে চলিল। বলরামবাবুর বাড়ির সম্মুখ দিয়া যে কাঁচা-রাস্তাটি গিয়াছে তাহাই গ্রামের প্রধান রাস্তা। এই রাস্তা একটি অসমতল শিলাকঙ্করপূর্ণ আগাছাভরা মাঠের কিনারায় আসিয়া শেষ হইয়াছে। মাঠের পরপারে একটিমাত্র পাকা বাড়ি, সদানন্দ সুরের বাড়ি। তাহার পিছনে জঙ্গলের গাছপালা। আমরা মাঠে অবতরণ করিলাম। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এই মাঠে বসে তোমরা সেদিন গল্প করছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ঠিক কোন্ জায়গায় বসেছিলে?'

'এই যে—' আরও কিছুদূর গিয়া পটল আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'এইখানে।'

স্থানটি অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন, আগাছা নাই। ব্যোমকেশ বলিল, 'এখান থেকে অমৃত যে-পথে জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল সেই পথে নিয়ে চল।'

'আসুন।'

সদানন্দ সুরের দরজায় তালা ঝুলিতেছে, জানালাগুলি বন্ধ। আমরা বাড়ির পাশ দিয়া পিছন দিকে চলিলাম। পিছনে পাঁচিল-ঘেরা উঠান, পাঁচিল প্রায় এক-মানুষ উঁচু, তাহার গায়ে একটি খিড়কি দরজা। জঙ্গলের গাছপালা খিড়কি-দরজা পর্যন্ত ভিড় করিয়া আসিয়াছে।

বাড়ি অতিক্রম করিয়া আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। জঙ্গলে পাতা ঝরা আরম্ভ হইয়াছে, গাছগুলি পত্রবিরল, মাটিতে স্বয়ংবিশীর্ণ পীতপত্রের আস্তরণ। বাড়ির খিড়কি হইতে পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে একটা প্রকাণ্ড শিমুলগাছ, স্তম্ভের মতো স্থূল গুঁড়ি দশ-বারো হাত উঁচুতে উঠিয়া শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। পটল আমাদের শিমুলতলায় লইয়া গিয়া একটা স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল, 'এইখানে অমৃত মরে পড়ে ছিল।'

স্থানটি ঝরা-পাতা ও শিমুল-ফুলে আকীর্ণ, অপঘাত মৃত্যুর কোনও চিহ্ন নাই। তবু ব্যোমকেশ স্থানটি ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। কঠিন মাটির

উপর কোনও দাগ নাই, কেবল একটা শুক্‌না পাতার নিচে একখণ্ড খড়ি পাওয়া গেল। ব্যোমকেশ খড়িটি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'এই খড়ি দিয়ে অমৃত গাছের গায়ে ঢেরা কাটতে এসেছিল। কিন্তু গাছের গায়ে খড়ির দাগ নেই। সুতরাং—'

পটল বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, দাগ কাটবার আগেই—'

এখানে দ্রষ্টব্য আর কিছু ছিল না। আমরা ফিরিয়া চলিলাম। ফিরিবার পথে ব্যোমকেশ বলিল, 'সদানন্দ সুরের খিড়কির দরজা বন্ধ আছে কিনা একবার দেখে যাই।'

খিড়কির দরজা ঠেলিয়া দেখা গেল ভিতর হইতে হুড়কা লাগানো। প্রাচীন দরজার তক্তায় ছিদ্র আছে, তাহাতে চোখ লাগাইয়া দেখিলাম, উঠানের মাঝখানে একটি তুলসী-মঞ্চ, বাকী উঠান আগাছায় ভরা। একটা পেয়ারাগাছ এক কোণে পাঁচিলের পাশে দাঁড়াইয়া আছে, আর কিছু চোখে পড়িল না।

অতঃপর ব্যোমকেশ পাঁচিলের ধার দিয়া ফিরিয়া চলিল। তাহার দৃষ্টি মাটির দিকে। পাঁচিলের কোণ পর্যন্ত আসিয়া সে হঠাৎ আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'ও কি?'

অনাবৃত শুষ্ক মাটির উপর একটি পরিষ্কার অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন; তাহার আশেপাশে আরও কয়েকটা অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা চিহ্ন রহিয়াছে। ব্যোমকেশ ঝুঁকিয়া চিহ্নটা পরীক্ষা করিল, আমরাও দেখিলাম। তারপর সে ঘাড় তুলিয়া দেখিল পাঁচিলের পরপারে পেয়ারাগাছের ডালপালা দেখা যাইতেছে।

বলিলাম, 'কি দেখছ? কিসের চিহ্ন ওগুলো?'

ব্যোমকেশ পটলের দিকে চাহিয়া বলিল, 'কি মনে হয়?'

পটলের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে; সে ওষ্ঠ লেহন করিয়া বলিল, 'ঘোড়ার খুরের দাগ মনে হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ, ঘোড়া-ভূতের খুরের দাগ। অমৃত তাহলে মিছেকথা বলেনি।'

ফিরিয়া চলিলাম। ব্যোমকেশের ভ্রূ সংশয়ভরে কুঞ্চিত হইয়া রহিল। তাহার মনে ধোঁকা লাগিয়াছে, ঘোড়ার খুরের তাৎপর্য সে পরিষ্কার বুঝিতে পারে নাই। চলিতে চলিতে মাত্র দু'একটা কথা হইল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল 'সদানন্দ সুর কতদিন হল বাইরে গেছেন?'

পটল বলিল, 'সাত-আট দিন হল।'

'কবে ফিরবেন বলে যাননি?'

'না।'

'কোথায় গেছেন তাও কেউ জানে না?'

'না।'

বলরামবাবুর বাড়িতে পৌঁছিয়া চেয়ারে বসিলাম। দর্শকের ভিড় কমিয়া গিয়াছে, তবু দু'চারজন অতি-উৎসাহী ব্যক্তি ব্যোমকেশকে দেখিবার আশায় আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বলরামবাবু আমাদের চা ও জলখাবার আনিয়া দিলেন। পটল দাশু গোপাল প্রভৃতি কয়েকজন ছোকরা কাছে দাঁড়াইয়া আমাদের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল।

চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলরামবাবুকে সওয়াল আরম্ভ করিল—

'অমৃত আপনার আপন ভাগ্‌নে ছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওর মা-বাপ কেউ ছিল না?'

'না। আমার বোন অমর্তকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। আমার কাছে থাকত। তারপর সেও মারা গেল। অমর্তর বয়স তখন পাঁচ বছর।'

'আপনার নিজের ছেলেপুলে নেই?'

'একটি মেয়ে আছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে।'

'অমৃতের কত বয়স হয়েছিল?'

'একুশ।'

'তার বিয়ে দেননি?'

'না। বুদ্ধিসুদ্ধি তেমন ছিল না, ন্যালাক্ষ্যাপা গোছের ছিল, তাই বিয়ে দিইনি।'

'কাজকর্ম কিছু করত?'

'মাঝে মাঝে করত, কিন্তু বেশীদিন চাকরি রাখতে পারত না। সান্তাল-গোলার বড় আড়তদার ভগবতীবাবুর গদিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, কিছু-দিন কাজ করেছিল। তারপর বদ্রিদাস মারোয়াড়ীর চালের কলে মাসখানেক ছিল, তা বদ্রিদাসও রাখল না। কিছুদিন থেকে বিশু মল্লিকের চালের কলে ঘোরাঘুরি করছিল, কিন্তু কাজ পায়নি।'

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল নীরবে নারিকেল-লাড়ু চিবাইল, তারপর এক ঢোক চা খাইয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'গ্রামে কারুর ঘোড়া আছে?'

বলরামবাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন,—ছোকরারাও মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল। শেষে বলরামবাবু বলিলেন, 'গাঁয়ে তো কারুর ঘোড়া নেই!'

'কারুর বন্দুকের লাইসেন্স আছে?'

'আজ্ঞে না।'

'নাদু নামে এক ছোকরার কথা শুনেছি, তার ভালো নাম জানি না। তাকে পেলে দু' একটা প্রশ্ন করতাম।'

বলরামবাবু ছোকরাদের পানে তাকাইলেন, তাহারা আর একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল; তারপর পটল বলিল, 'নাদু কাল বৌকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।'

'শ্বশুরবাড়ি কোথায়?'

"কৈলেসপুরে। ট্রেনে যেতে হয়, সান্তালগোলা থেকে তিন-চার স্টেশন পরে।'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে চায়ের পেয়ালা শেষ করিল। নাদু হয়তো নিরপরাধ, কিন্তু সে পলাইবে কেন? ভয় পাইয়াছে? আশ্চর্য নয়; এরূপ একটা খুনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলে কে না শঙ্কিত হয়?

এই সময়ে একটি ছোকরা বলিয়া উঠিল, 'ওই সদানন্দদা আসছে!'

সকলে একসঙ্গে ঘাড় ফিরাইলাম। রাস্তা দিয়া একটি ভদ্রলোক আসিতে-ছেন। চেহারা গ্রাম্য হইলেও সাজ-পোশাক গ্রাম্য নয়; গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি এবং গরদের চাদর, পায়ে কালো বার্নিশ অ্যালবার্ট, হাতে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

একটি ছোকরা চুপিচুপি অন্য এক ছোকরাকে বলিল, 'সদানন্দদার জামা-কাপড়ের বাহার দেখেছিস! নিশ্চয় কলকাতায় গেছল।'

সদানন্দবাবু সামনা-সামনি আসিলে পটল হাঁক দিয়া বলিল, 'সদানন্দদা, গাঁয়ের খবর শুনেছেন?'

সদানন্দবাবু দাঁড়াইলেন, আমাকে এবং ব্যোমকেশকে লক্ষ্য করিলেন, তারপর বলিলেন, 'কী খবর?'

পটল বলিল, 'অমৃরা মারা গেছে।'

সদানন্দবাবুর চোখে অকপট বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল, 'মারা গেছে! কী হয়েছিল?'

পটল বলিল, 'হয়নি কিছু। বন্দুকের গুলীতে মারা গেছে। কে মেরেছে কেউ জানে না।'

সদানন্দবাবুর মুখখানা ধীরে ধীরে পাথরের মতো নিশ্চল হইয়া গেল, তিনি নিস্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। পটল বলিল, 'আপনি এই এলেন, এখন বাড়ি যান। পরে সব শুনবেন।'

সদানন্দবাবু ক্ষণেক দ্বিধা করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে প্রস্থান করিলেন।

তিনি দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া যাইবার পর ব্যোমকেশ পটলকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সদানন্দবাবু যখন গ্রাম থেকে গিয়েছিলেন তখন তাঁর হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ আর স্টীলের ট্রাংক ছিল না?'

পটল বলিল, 'ঠিক তো, হীরু মোড়ল তাই বলেছিল বটে। সদানন্দদা তোরঙ্গ কোথায় রেখে এলেন!'

এ প্রশ্নের সদুত্তর কাহারও জানা ছিল না। ব্যোমকেশ এদিক ওদিক চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, 'সন্ধ্যে হয়ে এল, আজ উঠি। সদানন্দবাবুর সঙ্গে দু' একটা কথা বলতে পারলে ভালো হত। কিন্তু তিনি এইমাত্র ফিরেছেন—'

ব্যোমকেশের কথা শেষ হইতে পাইল না, বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে আমরা ক্ষণকালের জন্য হতচকিত হইয়া গেলাম। তারপর ব্যোমকেশ একলাফে রাস্তায় নামিয়া সদানন্দ সুরের বাড়ির দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। আমরা তাহার পিছনে ছুটিলাম। শব্দটা ওই দিক হইতেই আসিয়াছে।

সদানন্দ সুরের বাড়ির সম্মুখে পৌঁছিয়া দেখিলাম, বাড়ির সদর দরজার কবাট সামনের চাতালের উপর ভাঙিয়া পড়িয়াছে, সদানন্দ সুর রক্তাক্ত দেহে তাহার মধ্যে পড়িয়া আছেন। খানিকটা কটুগন্ধ ধূম সন্ধ্যার বাতাস লাগিয়া ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িতেছে।

চার

ব্যোমকেশ ও আমি চাতালের উপর উঠিলাম, আর যাহারা আমাদের পিছনে আসিয়াছিল তাহারা চাতালের কিনারায় দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে চক্ষু গোল করিয়া দেখিতে লাগিল।

সদানন্দ সুর যে বাঁচিয়া নাই তাহা একবার দেখিয়াই বোঝা যায়। তাহার শরীর অপেক্ষাকৃত অক্ষত বটে; ডান হাতে তালা ও বাঁ হাতে চাবি দৃঢ়ভাবে ধরা রহিয়াছে; কিন্তু মাথাটা প্রায় ধড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উল্টা দিকে ঘুরিয়া

গিয়াছে, রক্ত ও মগজ মাখামাখি হইয়া চূর্ণ খুলি হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে; মুখের একপাশটা নাই। বীভৎস দৃশ্য। তিন মিনিট আগে যে-লোকটাকে জলজ্যান্ত দেখিয়াছি, তাহাকে এই অবস্থায় দেখিলে স্নায়বিক ত্রাসে শরীর কাঁপিয়া ওঠে, হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

গ্রামবাসীদের এতক্ষণ বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল, পটল প্রথম কণ্ঠস্বর ফিরিয়া পাইল; কম্পিতস্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, এসব কী হচ্ছে আমাদের গ্রামে!'

ব্যোমকেশ ভাঙা দরজার নিকট হইতে ঢালাই লোহার একটা টুকরা কুড়াইয়া লইয়া পরীক্ষা করিতেছিল, পটলের কথা বোধ হয় শুনিতে পাইল না। লোহার টুকরা ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'হ্যান্ড-গ্রিনেড! ক্যাম্বিসের ব্যাগটা কোথায় গেল?'

ব্যাগটা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় একপাশে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল। ব্যোমকেশ গিয়া সেটার অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা করিল। নূতন ও পুরাতন কয়েকটা জামা-কাপড় রহিয়াছে। একটা নূতন টাইম-পীস ঘড়ি বিস্ফোরণের ধাক্কায় চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে, একটা কেশতৈলের বোতল ভাঙিয়া কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে। আর কিছু নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, তুমি বাইরে থাকো, আমি চট্ করে বাড়ির ভিতরটা দেখে আসি।'

শুধু যে দরজার কবাট ভাঙিয়া পড়িয়াছিল তাহাই নয়, দরজার উপরের খিলান খানিকটা উড়িয়া গিয়াছিল, কয়েকটা ইট বিপজ্জনকভাবে ঝুলিয়া ছিল। ব্যোমকেশ যখন লঘুপদে এই বন্ধ্র পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল তখন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। এই অভিশপ্ত বাড়ির মধ্যে কোথায় কোন ভয়াবহ মৃত্যু ওৎ পাতিয়া আছে কে জানে! ব্যোমকেশের যদি কিছু ঘটে, সত্যবতীর সামনে গিয়া দাঁড়াইব কোন্ মুখে?

'দাঁড়াও, আমিও আসছি'—বলিয়া আমি প্রাণ হাতে করিয়া বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িলাম।

ব্যোমকেশ ঘাড় ফিরাইয়া একটু হাসিল; বলিল, 'ভয়ের কিছু নেই। বিপদ যা ছিল তা সদানন্দ সুরের ওপর দিয়েই কেটে গিয়েছে।'

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, বাড়ির ভিতরে আলো অতি অল্প। বলিলাম, 'কি দেখবে চটপটে দেখে নাও। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে।'

বাড়ির সামনের দিকে দু'টি ঘর, পিছনে রান্নাঘর। কোনও ঘরেই লোভনীয় কিছু নাই। যে ঘরের দরজা ভাঙিয়াছিল সে-ঘরে কেবল একটি কোমর-ভাঙা তক্তপোশ আছে; পাশের ঘরে আর একটি তক্তপোশের উপর বালিশ-বিছানা দেখিয়া বোঝা যায় ইহা গৃহস্বামীর শয়নকক্ষ। একটা খোলা দেওয়াল-আলমারিতে কয়েকটা ময়লা জামাকাপড় ছাড়া আর কিছুই নাই।

রান্নাঘরও তথৈবচ। খানকয়েক থালা-বাটি, ঘটি-কলসি, হাঁড়িকুড়ি। উনুনটা অপরিষ্কার, তাহার গর্ভে ছাই জমিয়া আছে। সব দেখিয়া শুনিয়া বলিলাম, 'সদানন্দ সুরের অবস্থা ভালো ছিল না মনে হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ'। ওই দরজাটা দেখেছ?' বলিয়া দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

কাছে গিয়া দেখিলাম। রান্নাঘরের এই দরজা দিয়া উঠানে যাইবার পথ। দরজা ভেজানো রহিয়াছে, টান দিতেই খুলিয়া গেল। বলিলাম, 'একি? দরজা

খোলা ছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সদানন্দ সুর খুলে রেখে যাননি। হুড়কো লাগিয়ে গিয়েছিলেন। ভালো করে দ্যাখো।'

ভালো করিয়া দেখিলাম, দ্বারের পাশে হুড়কো ঝুলিতেছে, কিন্তু তাহার দৈর্ঘ্য বড়জোর হাতখানেক। বলিলাম, এ কি! এটুকু হুড়কো!

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝতে পারলে না? হুড়কোটা প্রমাণ মাপেরই ছিল এবং লাগানো ছিল। তারপর কেউ বাইরে থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে করাত ঢুকিয়ে ওটাকে কেটেছে, তারপর ঘরে ঢুকেছে। ওই দ্যাখো হুড়কোর বাকী অংশটা।'

ব্যোমকেশ দেখাইল, উনানের পাশে জ্বালানী কাঠের সঙ্গে হুড়কোর বাকী অংশটা পড়িয়া আছে।

ব্যাপার কতক কতক আন্দাজ করিতে পারিলেও সমগ্র পরিস্থিতি ধোঁয়াটে হইয়া রহিল। সদানন্দ সুরের কোনও শত্রু তাহার অনুপস্থিতিকালে হুড়কো কাটিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল। তারপর? আজ বোমা ফাটিল কি করিয়া? কে বোমা ফাটাইল?

খোলা দরজা দিয়া আমরা উঠানে নামিলাম। পাঁচিল-ঘেরা উঠানের এককোণে কুয়া, অন্য কোণে পেয়ারাগাছ। ব্যোমকেশ সিধা পেয়ারাগাছের কাছে গিয়া মাটি দেখিল। মাটিতে যে অস্পষ্ট দাগ রহিয়াছে তাহা হইতে আমি কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না, কিন্তু ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হু, যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। যিনি এসেছিলেন তিনি এইখানেই পাঁচিল টপকেছিলেন।'

বলিলাম, 'তাই নাকি! কিন্তু পাঁচিল টপ্‌কাবার কী দরকার ছিল? করাত দিয়ে খিড়কি-দোরের হুড়কো কাটল না কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খিড়কির হুড়কো করাত দিয়ে কাটলে খিড়কি দরজা খোলা থাকত, কারুর চোখে পড়তে পারত। তাতে আগন্তুক মহাশয়ের অসুবিধা ছিল। আমি গোড়াতেই ভুল বুঝেছিলাম, নৈলে সদানন্দ সুর মরতেন না।'

'কী ভুল বুঝেছিলে?'

'আমি সন্দেহ করেছিলাম যাকে ধরতে এখানে এসেছি তিনি সদানন্দ সুর, কিন্তু তা নয়।—চল, এখন যাওয়া যাক। বাঘমারি গ্রামে আর কিছু দেখবার নেই।'

রান্নাঘরের ভিতর দিয়া আবার সদরে ফিরিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া জড়ো হইয়াছে এবং চাতালের নিচে ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে মৃতদেহের পানে চাহিয়া আছে। মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নাই।

ভিড়ের মধ্য হইতে পটল বলিয়া উঠিল, 'ব্যোমকেশবাবু, বাড়ির মধ্যে কী দেখলেন? কাউকে পেলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। পুলিসে খবর পাঠিয়েছ?'

পটল বলিল, 'না। আপনি আছেন তাই—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি কেউ নয়, পুলিসকে খবর দিতে হবে। আচ্ছা, তোমাদের যেতে হবে না; আমরা তো যাচ্ছি, সুখময়বাবুকে খবর দিয়ে যাব।'

'আপনারা যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। যতক্ষণ পুলিস না আসে ততক্ষণ তোমরা কয়েকজন এখানে থেকো।'

'পুলিস কি আজ রাত্রে আসবে?'

'আসবে।'

আমরা আবার রেল-লাইনের ধার দিয়া চলিয়াছি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া চাঁদের আলো ফুটি-ফুটি করিতেছে। একটা মালগাড়ি দীর্ঘ দেহভার টানিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, তুমি এ-ব্যাপারের কিছু কিছু বুঝেছ মনে হচ্ছে। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ উত্তর দিল না, তারপর বলিল, 'অমৃতের মৃত্যুর সঙ্গে সদানন্দ সুরের মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ?'

'সম্বন্ধ আছে নাকি? কী সম্বন্ধ?'

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'অমৃত বেচারা বেঘোরে মারা গেল। সে-রাত্রে যদি সে জঙ্গলে না যেত তাহলে মরত না। যে তাকে মেরেছে সে তাকে মারতে আসেনি।'

'তবে কাকে মারতে এসেছিল?'

'সদানন্দ সুরকে।'

'কিন্তু—সদানন্দ সুর তো তখন বাড়ি ছিলেন না।'

'ছিলেন না বলেই আততায়ী এসেছিল তাঁকে মারতে।'

'বড্ড বেশী রহস্যময় শোনাচ্ছে। অনেকটা কালিদাসের হেঁয়ালির মতো—নেই তাই খাচ্ছ তুমি, থাকলে কোথায় পেতে!—কিন্তু যাক, আজ বোমা ফাটল কি করে?'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'বুবিট্র্যাপ্ কাকে বলে জানো?'

বলিলাম, 'কথাটা শুনেছি। ফাঁদ পাতা?'

'হ্যাঁ। সদানন্দ সুরকে একজন মারতে চেয়েছিল। সে যখন জানতে পারল সদানন্দ সুর বাইরে গেছেন, তখন একদিন সন্ধ্যের পর এসে পাঁচিল ডিঙিয়ে উঠোনে ঢুকল, দরজার হুড়কো করাত দিয়ে কেটে বাড়িতে ঢুকল, তারপর বন্ধ সদর-দরজার মাথায় এমনভাবে একটা বোমা সাজিয়ে রেখে গেল যে, দরজা খুললেই বোমা ফাটবে। আজ সদানন্দ সুর ফিরে এসে দরজা খুললেন, অমনি বোমা ফাটল। এবার বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝেছি। কিন্তু লোকটা কে?'

'এখনও নাম জানি না। কিন্তু তিনি অস্ত্রশস্ত্রের চোরা কারবার করেন এবং কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাত্রিবেলা যুদ্ধযাত্রা করেন। লোকটির নামধাম জানবার জন্যে আমার মনটাও বড় ব্যগ্র হয়েছে।'

সান্তালগোলায় পৌঁছিয়া দেখিলাম দিনের কর্ম-কোলাহল শান্ত হইয়াছে, বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ। থানা খোলা আছে, সুখময়বাবু টেবিলে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছেন। আমাদের পদশব্দে তিনি চোখ তুলিলেন,—'কী খবর?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খবর গুরুতর। বাঘমারিতে আর একটা খুন হয়েছে।'

'খুন।' সুখময়বাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'হ্যাঁ। সদানন্দ সুরকে আপনি চেনেন?'

সুখময়বাবু ভ্রূকুটি করিয়া মাথা নাড়িলেন, 'হয়তো দেখেছি, মনে পড়ছে না। সদানন্দ সুর খুন হয়েছে? কিন্তু আপনি সকলের আগে এ-খবর পেলেন কোথা থেকে?'

'আমি বাঘমারিতে ছিলাম।'

সুখময়বাবুর মুখ হইতে ক্ষণেকের জন্য মিষ্টতার মুখোশ খসিয়া পড়িল, তিনি রূঢ়চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনি বাঘমারিতে গিয়েছিলেন। আমি মানা করা সত্ত্বেও গিয়েছিলেন!'

ব্যোমকেশের দৃষ্টিও প্রখর হইয়া উঠিল, 'আপনি আমাকে মানা করবার কে?'

সুখময়বাবু কড়া সুরে বলিলেন, 'আমি এ এলাকার বড় দারোগা, পুলিসের কর্তা।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি পুলিসের হর্তাকর্তা বিধাতা হতে পারেন, কিন্তু আমাকে হুকুম দেবার মালিক আপনি নন। ইন্‌সপেক্টর সামন্ত, আমি সরকারের কাজে এখানে এসেছি। আপনার ওপর হুকুম আছে সবরকমে আমাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু সাহায্য করা দূরের কথা, আপনি পদে পদে বাগড়া দেবার চেষ্টা করছেন। আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ফের যদি আপনার এতটুকু বেচাল দেখি, আপনাকে এ-এলাকা ছাড়তে হবে। এমন কি চাকরি ছাড়াও বিচিত্র নয়।'

সুখময়বাবু বোধ করি ব্যোমকেশকে গোবেচারী মনে করিয়া এতটা দাপট দেখাইয়াছিলেন, এখন তাহাকে নিজমূর্তি ধারণ করিতে দেখিয়া একেবারে কেঁচো হইয়া গেলেন। তাঁহার মিষ্টতার মুখোশ পলকের মধ্যে আবার মুখে ফিরিয়া আসিল। তিনি কণ্ঠস্বরে বশংবদ দীনতা ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, 'আমি কি-যে বলছি তার ঠিক নেই! আমাকে মাপ করুন ব্যোমকেশবাবু। আজ বিকেল থেকে পেটে একটা ব্যথা ধরেছে, তাই মাথার ঠিক নেই। আপনাকে হুকুম করব আমি! ছি-ছি, কী বলেন আপনি! আমি আপনার হুকুমের গোলাম। হে-হে।—তা সদানন্দ সুর খুন হয়েছে?'

ব্যোমকেশের তখনও মেজাজ ঠাণ্ডা হয় নাই; সে বলিল, 'অমৃতের মৃত্যুর খবর পেয়ে আপনি সে-রাত্রে তদন্ত করতে যাননি, পরদিন সকালবেলা গিয়েছিলেন। এ খবরটা আপনার ওপরওয়ালার কানে পৌঁছুলে তিনি কি করবেন তা বোধ হয় আপনার জানা আছে?'

সুখময়বাবু কাকুতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'কি বলব ব্যোমকেশবাবু, সেদিনও কলিকের ব্যথা ধরেছিল, হে-হে, একেবারে পেড়ে ফেলেছিল। নৈলে খুনের খবর পেয়ে যাব না, এ কি সম্ভব! তা যাক্‌গে ও-কথা। এখন এই সদানন্দ সুর—। আমি এখনি বেরুচ্ছি। এই জমাদার, জল্‌দি ইধার আও! হমারা ঘোড়া'পর জিন চড়ানে বোলো। তুম্‌ ভি তৈয়ার হো লেও। ভারী খুন হুয়া হ্যায়। আভি যানা পড়েগা।'

অতঃপর সুখময়বাবু রণসাজে সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে যাত্রা করিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। পাড়াগাঁয়ে পুলিসকে

তদন্ত উপলক্ষে পথহীন মাঠে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইত হয়, তাই বোধ করি তাহাদের ঘোড়ার ব্যবস্থা।

পাঁচ

পরদিন সকালবেলা প্রাতরাশের পর ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, স্টেশনে বেড়িয়ে আসা যাক।'

সকাল সাতটায় একটা ট্রেন চলিয়া গিয়াছে, আর একটা ট্রেন আসিবে ঘণ্টা দুই পরে। স্টেশনে ভিড় নাই, প্রবেশদ্বারে টিকিট-চেকার নাই। স্টেশনমাস্টার হরিবিলাসবাবু ছাড়া আর সকলেই বোধ করি এই অবকাশে নিজ নিজ কোয়ার্টারে চা খাইতে গিয়াছে।

হরিবিলাসবাবুর সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছিল। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক, অজীর্ণ-জীর্ণ শরীর। ওজন করিয়া কথা বলেন; একটি কথা বলিবার আগে পাঁচবার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেন। আমাদের সহিত পরিচয় হইলেও অধিক বাক্য-বিনিময় হয় নাই। আমরা আসিয়া যখন শূন্য প্ল্যাটফর্মের উপর অলসভাবে পায়চারি করিতে লাগিলাম, তখন তিনি অফিস-ঘর হইতে চশমার উপর দিয়া আমাদের লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু উচ্চবাচ্য করিলেন না।

ব্যোমকেশ অবশ্য প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিবার জন্য আসে নাই, সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল; কিন্তু সে হরিবিলাসবাবুর কাছে গেল না। তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করা এবং খনির গর্ভ হইতে মণিমাণিক্য আহরণ সমান শ্রমসাপেক্ষ। তার চেয়ে অন্য কেহ যদি আসিয়া পড়ে—

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, টিকিট-চেকার মনোতোষ বোধ হয় নিজের কোয়ার্টার হইতে আমাদের দেখিতে পাইয়াছিল, মুখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভারি তোখড় ছেলে, কথাবার্তায় চটপটে। বলিল, 'কী কাণ্ড দাদা! আপনার চোখের সামনে এই ব্যাপার হল—অ্যাঁ!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খবর পেঁছে গেছে দেখছি!'

মনোতোষ বলিল, 'খবর পেঁছবে না! কাল রাত্রে দশটা সতরোর প্যাসেঞ্জার তখনও ইন্ হয় নি, খবর এসে হাজির। তা কী দেখলেন দাদা? দুম্ করে আপনার চোখের সামনে বোমা ফাটল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিক চোখের বোমা ফাটে নি, তবে কানের সামনে বটে। আপনি সদানন্দ সুরকে চিনতেন?'

'চিনতাম না! চারটে তিপ্পান্নর গাড়ি থেকে নামলেন, আমাকে টিকিট দিয়ে ব্যাগ হাতে করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি শুধোলাম—কি দাদা, কলকাতা গেছলেন দেখছি, কেমন বেড়ালেন চেড়ালেন? উনি হেসে বললেন—কলকাতা কি বেড়াবার জায়গা, সেখানে গিয়ে খালি চেড়ালাম। এই বলে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। তখন কে জানতো আধঘণ্টাও কাটবে না।'

ব্যোমকেশ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, 'আচ্ছা, সদানন্দ সুর যখন বাইরে গিয়েছিলেন তখন আপনি তাঁকে দেখেছিলেন?'

মনোতোষ বলিল, 'দেখিনি? আমার চোখ এড়িয়ে এ-ইস্টিশান থেকে কি

কারুর বেরুবার জো আছে দাদা। দিন আষ্টেক-দশ আগেকার কথা; সকালবেলা আমাকে টিকিট দেখিয়ে ইস্টিশানে ঢুকলেন, সাতটা তিনের ডাউন প্যাসেঞ্জারে চলে গেলেন।'

'কলকাতার টিকিট ছিল?'

'অ্যাঁ তা তো ঠিক মনে পড়ছে না, দাদা। তবে কলকাতা ছাড়া আর কি হতে পারে!'

'কলকাতার দিকে অন্য স্টেশন হতে পারে।-সে যাক। তাঁর সঙ্গে কী কী মাল ছিল বলুন তো।'

'মাল!'—মনোতোষ একটু মাথা চুলকাইয়া বলিল, 'যতদূর মনে পড়ছে, এক হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ, অন্য হাতে স্টীল-ট্রাঙ্ক ছিল। কেন বলুন তো?'

'স্টীল ট্রাঙ্কটা সদানন্দবাবু ফিরিয়ে আনেন নি। তার মানে কোথাও রেখে এসেছিলেন। যাক্, আপনি তো দেখছি লোকটিকে ভালোভাবেই চিনতেন। কেমন মানুষ ছিলেন তিনি?'

'ঐটি বলতে পারব না, দাদা। পরচিত্ত অন্ধকার। তবে কথাবার্তায় ভালো ছিলেন। কারুর সাতে-পাঁচে থাকতেন না, নিজের ধান্দায় ঘুরতেন। মাসখানেক আগে আমাদের মাস্টারমশায়ের কাছে খুব যাতায়াত ছিল।'—বলিয়া স্টেশন-মাস্টারের ঘরের দিকে আঙুল দেখাইল।

'তাই নাকি! কিসের জন্যে যাতায়াত?'

'তা জানিনে, দাদা। দুজনে মুখোমুখি বসে কী গুজ-গুজ ফুস্-ফুস্ করতেন ওঁরাই জানেন। আপনি মাস্টারমশাইকে শুধোন না।'

'হুঁ, তাই করি।'

হরিবিলাসবাবুর ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'মাস্টার-মশাই, আসতে পারি?'

হরিবিলাসবাবু এমনভাবে ভ্রূ তুলিয়া চাহিলেন যেন আমাদের চিনিতেই পারেন নাই। তারপর, কাজে বিঘ্ন করার জন্য বিরক্ত হইয়াছেন এমনিভাবে হাতের কলম রাখিয়া বলিলেন, 'আসুন।'

আমরা ঘরে গিয়া বসিলাম। বহু খাতাপত্রে ভারাক্রান্ত প্রকাণ্ড টেবিলের ওপারে তিনি, এপারে আমরা। ব্যোমকেশ বলিল, 'সদানন্দ সুর মারা গেছেন শুনেছেন বোধ হয়?'

হরিবিলাসবাবু প্রশ্নটাকে অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'শুনেছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তার সঙ্গে আপনার জানাশোনা ছিল?'

যেন এই কথার উত্তরের উপর জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে এমনিভাবে গভীর বিবেচনার পর হরিবিলাসবাবু বলিলেন, 'সামান্য জানাশোনা ছিল।'

ব্যোমকেশ ঈষৎ অধীর কণ্ঠে বলিল, 'দেখুন, আপনি মনে করবেন না, নাহক কৌতূহলের বশেই আপনাকে প্রশ্ন করছি। অত্যন্ত ভয়াবহভাবে সদানন্দবাবুর মৃত্যু হয়েছে, আমি পুলিসের পক্ষ থেকে তারই তদন্ত করতে এসেছি।—এখন বলুন কোন্ সূত্রে সদানন্দবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল?'

হরিবিলাসবাবুর চোপ্‌সানো মুখ যেন আরও চুপ্‌সিয়া গেল। তিনি দু'চার বার গলা-ঝাড়া দিয়া অত্যন্ত দ্বিধাসঙ্কুল কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

'সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি প্রাণকেষ্ট পাল রেলের লাইন ইন্সপেক্টর, তাঁর সঙ্গে আমার আগে থাকতে পরিচয় আছে। মাসকয়েক হল প্রাণকেষ্টবাবু এ-লাইনে এসেছেন; রামডিহি জংশনে তাঁর হেড-কোয়ার্টার। ট্রলিতে চড়ে রেলের লাইন পরিদর্শন করে বেড়ানো তাঁর কাজ। কাজের উপলক্ষে সান্তালগোলা দিয়ে তিনি প্রায়ই যাতায়াত করেন, আমার সঙ্গে দেখা হয়। একদিন প্রাণকেষ্টবাবু এসেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কথা কইছি, এমন সময় সদানন্দবাবু প্ল্যাটফর্মে এলেন। প্রাণকেষ্টবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, বললেন—আমার সম্বন্ধী। সেই থেকে আমি সদানন্দবাবুকে চিনি।'

শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল; সে বলিল, 'কতদিন আগের কথা?'

'দু'তিন মাস হবে।'

'প্রাণকেষ্টবাবু প্রায়ই এ-লাইনে যাতায়াত করেন! শেষ কবে এসেছিলেন?'

'চার-পাঁচ দিন আগে। স্টেশনে বেশীক্ষণ ছিলেন না, ট্রলিতে চড়ে লাইন দেখতে চলে গেলেন।'

'শালা-ভগিনীপতির মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল?'

'ভেতরে কি ছিল জানি না, বাইরে সদ্ভাব ছিল।'

'যাক। তারপর থেকে সদানন্দ সুর আপনার কাছে যাতায়াত করতেন? কী উপলক্ষে যাতায়াত করতেন?'

হরিবিলাসবাবু আবার কিছুক্ষণ নীরবে চিত্ত মন্থন করিয়া বলিলেন, 'সদানন্দবাবু দালাল ছিলেন, ছোটখাট জিনিসের দালালি করতেন। আমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া আছে দেখে তিনি আমাকে কবিরাজী চিকিৎসা করাবার জন্য ভজাচ্ছিলেন। দু'এক শিশি গছিয়েছিলেন; হত্তুকী আর বিটনুন। তাতে কিছু হল না।'

হরি হরি, শেষে হরীতকী আর বিটনুন! ব্যোমকেশ তবু প্রশ্ন করিল, 'এ ছাড়া সদানন্দ সুরের সঙ্গে আপনার আর কোনও সম্বন্ধ ছিল না?'

'না।'

নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল, 'আপনাকে অনর্থক কষ্ট দিলাম। প্রাণকেষ্টবাবু এখন রামডিহি জংশনেই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'নমস্কার।—চল অজিত।'

স্টেশনের বাহিরে আসিয়া বলিলাম, 'এবার কী?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওবেলা রামডিহিতে গিয়ে প্রাণকেষ্ট পাল মহাশয়কে দর্শন করে আসতে হবে। তিনি শ্যালকের মৃত্যু সংবাদ যদি বা এখনও না পেয়ে থাকেন, বিকেল নাগাদ নিশ্চয় পাবেন।—হরিবিলাসবাবুকে কেমন মনে হল?'

বলিলাম, 'আকার-সদৃশী প্রজ্ঞা। যেমন ঘুণ-ধরা চেহারা, তেমনি মরচে-ধরা বুদ্ধি। শূন্য সিন্দুকে ডবল তালা। তুমি যদি সন্দেহ করে থাকো যে উনি লুকিয়ে লুকিয়ে গোলা-বারুদের কালোবাজার করছেন, তাহলে ও-সন্দেহ ত্যাগ করতে পার। হরিবিলাসবাবুর একমাত্র গোলা হচ্ছে হরীতকী-খণ্ড, আর বারুদ—বিটনুন।'

ব্যোমকেশ হাসিল; বলিল, 'চল, বাজারটা ঘুরে আসা যাক।'

'বাজারে কী দরকার?'

'এসই না।'

গঞ্জের কর্মব্যস্ততা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক আড়তের সামনে মুক্ত-স্থানে বহু গরুর গাড়ির ঠেলাঠেলি, দুই-চারিটা ঘোড়ায়-টানা খোলা ট্রাক-জাতীয় গাড়িও আছে। প্রত্যেক গোলা হইতে 'রামে রাম দুয়ে দুই' শব্দ উঠিতেছে। ডাঁই-করা কাঁচা-মাল পাঁচসেরী বাটখারায় ওজন হইতেছে।

একটি গোলায় এক বাঙালী যুবক দাঁড়াইয়া কাজকর্ম তদারক করিতেছিলেন ব্যোমকেশ গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এটা নফর কুণ্ডু মশায়ের গোলা না?'

ছোকরা বোধ হয় ব্যোমকেশের মুখ চিনিত, সসম্ভ্রমে বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাঁর ভাইপো।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ বেশ। কুণ্ডুমশাই কোথায়?'

ছোকরা বলিল, 'আজ্ঞে, কাকা এখানে নেই, বাইরে গেছেন। কিছু দরকার আছে কি?'

'দরকার এমন কিছু নয়। কোথায় গেছেন?'

'আজ্ঞে, তা কিছু বলে যাননি।'

'তাই নাকি! কবে গেছেন?'

'গত মঙ্গলবার বিকেলবেলা।'

ব্যোমকেশ আড়চোখে আমার পানে চাহিল। আমার মনে পড়িয়া গেল, গত সোমবারে আমি রামডিহি স্টেশনে গিয়া বেনামী চিঠি ডাকে দিয়া আসিয়াছিলাম। স্বাভাবিক নিয়মে চিঠি মঙ্গলবারে এখানে পৌঁছিয়াছে। নফর কুণ্ডুর নামেও একটি বেনামী চিঠি ছিল। তবে কি চিঠি পাইয়া পাখি উড়িয়াছে? নফর কুণ্ডুই আমাদের অচিন পাখি? কিন্তু সে যাই হোক, ভাইপো ছোকরা কিছু জানে বলিয়া মনে হয় না; সরলভাবে সব কথার উত্তর দিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনি কবে ফিরবেন তাও বোধ হয় জানা নেই?'

'আজ্ঞে না, কিছু বলে যান নি।'

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'আচ্ছা, যেদিন নফরবাবু চলে যান সেদিন সকালে কি কোনও চিঠিপত্র পেয়েছিলেন?'

ছোকরা বলিল, 'চিঠি রোজই দু'চারখানা আসে, সেদিনও এসেছিল।'

'হুঁ।'

প্রস্থানোদ্যত হইয়া ব্যোমকেশ আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল, 'তোমাদের ক'টা ঘোড়া আছে?'

ছোকরা অবাক্ হইয়া চাহিল, 'ঘোড়া!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘোড়া। ওই-যে ট্রাক টানে।' ব্যোমকেশ আঙ্গুল দিয়া পাশের গোলা দেখাইল।

যুবক বুঝিয়া বলিল, 'ও—না, আমাদের ঘোড়া-টানা ট্রাক নেই, গরুর গাড়িতে চলে যায়।'

এই সময় এক ইউনিফর্ম-পরা কনস্টেবল আসিয়া জোড়পায়ে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশকে স্যালুট করিল, 'হুজুর, দারোগাসাহেব সেলাম দিয়া হ্যায়।'

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিল; বলিল, 'চল, যাচ্ছি।'

ছয়

কাছেই থানা। সেই দিকে যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ বলিল, 'সুখময় দারোগা কি রকম ফিচেল দেখেছে? হাটের মাঝখানে কনস্টেবল পাঠিয়েছে, যাতে কারুর জানতে বাকি না থাকে যে পুলিসের সঙ্গে আমার ভারি দহরম মহরম।'

'হুঁ। কিন্তু তলব কিসের জন্যে?'

'বোধ হয় অমৃতের পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এসেছে।'

থানায় পদার্পণ করিতেই সুখময় দারোগা মুখে মধুর রসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিলেন, 'আসুন, আসুন ব্যোমকেশবাবু, আসুন অজিতবাবু, বসুন বসুন। ব্যোমকেশবাবু, আপনি এই চেয়ারটাতে বসুন। আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল আপনারা এদিকে আসছেন। হে-হে, এই নিন অমৃতের পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট। বুদ্ধি বটে আপনার; ঠিক ধরেছিলেন, বন্দুকের গুলীতেই মরেছে।' বলিয়া ডাক্তারের রিপোর্ট ব্যোমকেশের হাতে দিলেন।

বিচিত্র জীব এই সুখময়বাবু। এইরূপ চরিত্র আমরা সকলেই দেখিয়াছি এবং মনে মনে সহিংস তারিফ করিয়াছি। কিন্তু ভালবাসিতে পারি নাই। ইহারা কেবল পুলিস-বিভাগে নয়, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই ছড়াইয়া আছেন।

রিপোর্ট পড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'গুলীটা শরীরের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে দেখছি। কোথায় সেটা?'

'এই যে!' একটা নম্বর-আঁটা টিনের কৌটা হইতে মাষকলাইয়ের মতো একটি সীসার টুকরা লইয়া সুখময়বাবু তাহার হাতে দিলেন।

করতলে গুলীটি রাখিয়া ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ সেটিকে সমীক্ষণ করিল, তারপর সুখময়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ থেকে কিছু বুঝলেন?'

সুখময়বাবু বলিলেন, 'আজ্ঞে, গুলী দেখে বোঝা যাচ্ছে পিস্তল কিংবা রিভলবারের গুলী। এ ছাড়া বোঝবার আর কিছু আছে কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আছে বৈকি। গুলী থেকে বোঝা যাচ্ছে ·৩৮ অটোম্যাটিক থেকে গুলী বেরিয়েছে, যে ·৩৮ অটোম্যাটিক যুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্য ব্যবহার করত। অর্থাৎ—' ব্যোমকেশ থামিল।

সুখময়বাবু বলিলেন, 'অর্থাৎ অমৃতকে যে খুন করেছে এবং আপনি যাকে খুঁজতে এসেছেন তাদের মধ্যে যোগাযোগ আছে, এমন কি তারা একই লোক হতে পারে। কেমন?'

ব্যোমকেশ গুলীটি তাঁহাকে ফেরত দিয়া বলিল, 'এ বিষয়ে আমার কিছু না বলাই ভালো। আপনার কাজ অমৃতের হত্যাকারীকে ধরা, সে-কাজ আপনি করবেন। আমার কাজ অন্য।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই। হ্যাঁ ভালো কথা, সদানন্দ সুরের লাশ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি, রিপোর্ট এলেই আপনাকে দেখাব।'

'আমাকে সদানন্দ সুরের রিপোর্ট দেখানোর দরকার নেই। এটাও আপনারই কেস্, আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমি রুই কাতলা ধরতে এসেছি,

চুনোপুঁটিতে আমার দরকার কি বলুন।'

সুখময়বাবুর চক্ষু দুটি ধূর্ত কৌতুকে ভরিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, 'সে-কথা একশো বার। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু, আপনার জালে যখন রুই-কাতলা উঠবে তখন আমার চুনোপুঁটিও সেই জালেই উঠবে; আমাকে আলাদা জাল ফেলতে হবে না। হে হে হে হে। চললেন নাকি? আচ্ছা, নমস্কার।'

বাহিরে আসিলাম। ব্যোমকেশ আমার পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। লোকটার দুষ্টবুদ্ধির শেষ নাই, অথচ তাহার কার্যকলাপে না হাসিয়াও থাকা যায় না। ব্যোমকেশ বলিল, 'এখনও রোদ চড়েনি, চলো চালের কল দুটো দেখে যাই।'

রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া বিশ্বনাথ রাইস মিল-এর সম্মুখে উপস্থিত হইতে পাঁচ মিনিট লাগিল। বেশ বড় চালের কল, পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর প্রসারিত, কাঁটা-তারের বেড়া দিয়া ঘেরা। গুর্খা-রক্ষিত ফটক দিয়া প্রবেশ করিলে প্রথমেই সামনে প্রকাণ্ড শান-বাঁধানো চাতাল চোখে পড়ে। চাতালের ওপারে একটি পুকুর, বাঁ পাশে ইঞ্জিন-ঘর ও ধান-ভানার করোগেটের ছাউনি, ডান পাশে গুদাম, দপ্তর ও মালিকের থাকিবার জন্য একসারি কক্ষ। সকালবেলা কাজ চালু আছে, ধান-ভানার ছাউনি হইতে ছড়্ ছড়্ ছর্‌র্‌র শব্দ আসিতেছে। কুলী-মজুরেরা কাজে ব্যস্ত, গরুর গাড়ি ও ঘোড়ার ট্রাক হইতে বস্তা ওঠা নামা হইতেছে।

চালকলের মালিকের নাম বিশ্বনাথ মল্লিক। থানা হইতে তাহার নাম সংগ্রহ করিলেও এবং বেনামী চিঠি পাঠাইলেও চাক্ষুষ পরিচয় এখনও হয় নাই। আমরা গুর্খার মারফত এত্তালা পাঠাইয়া মিল-এ প্রবেশ করিলাম। দপ্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বিশ্বনাথবাবু সেখানে নাই, একজন মুহুরী গোছের লোক গদিতে বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে।

'কী চান?'

'বিশ্বনাথবাবু আছেন? আমরা পুলিসের পক্ষ থেকে আসছি।'

লোকটি তটস্থ হইয়া উঠিল, 'আসুন আসুন বসতে আজ্ঞা হোক। কর্তা মিল-এর কাজ তদারক করতে গেছেন, এখনি আসবেন। তাঁকে খবর পাঠাব কি?'

ঘরের অর্ধেক মেঝে জুড়িয়া গদির বিছানা, আমরা গদির উপর উপবেশন করিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, আধুনিক চেয়ার-সোফার চেয়ে সাবেক গদি-ফরাশ ঢের বেশী আরামের। ব্যোমকেশ একটি সুপুষ্ট তাকিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, 'না না, তাঁকে ডেকে পাঠানোর দরকার নেই। সামান্য দু'-চারটে কথা জিজ্ঞেস করার আছে, তা সে আপনিই বলতে পারবেন। আপনি বুঝি মিল-এর হিসেব রাখেন?'

লোকটি সবিনয়ে হস্তঘর্ষণ করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে আমি মিল-এর নায়েব-সরকার। অধীনের নাম নীলকণ্ঠ অধিকারী। আপনি কি ব্যোমকেশ বক্সী মশাই?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। নীলকণ্ঠ অধিকারী ভক্তি-তদ্‌গত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। এমন লোক আছে পুলিসের নাম শুনিলে যাহাদের হৃদয় বিগলিত হয়। উপরন্তু তাহারা যদি ব্যোমকেশ বক্সীর নাম শুনিতে পায় তাহা হইলে তাহাদের হৃদয়াবেগ বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো দু'কূল ছাপাইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন আর তাহাদের ঠেকাইয়া রাখা যায় না। নীলকণ্ঠ অধিকারী সেই জাতীয় লোক। তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, ব্যোমকেশকে

অদেয় তাহার কিছুই নাই; প্রশ্নের উত্তর সে দিবেই, এমন কি, প্রশ্ন না করিলেও সে উত্তর দিবে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাকে দেখে কাজের লোক মনে হচ্ছে। মিলের সব কাজ আপনিই দেখেন?'

নীলকণ্ঠ সহর্ষে হস্তঘর্ষণ করিল, 'আজ্ঞে, কর্তাও দেখেন। উনি যখন থাকেন না তখন আমার ওপরেই সব ভার পড়ে।'

'কর্তা—মানে বিশ্বনাথবাবু—এখানে থাকেন না?'

'আজ্ঞে, এখানেই থাকেন। তবে মিল-এর কাজকর্ম যখন কম থাকে তখন দু'চার দিনের জন্য কলকাতা যান। কলকাতায় কর্তার ফ্যামিলি থাকেন।'

'বুঝেছি। তা কর্তা কতদিন কলকাতা যাননি?'

'মাসখানেক হবে। এখন কাজের চাপ বেশী—'

'আচ্ছা, ও-কথা থাক। অমৃত নামে বাঘমারি গ্রামের একটি ছোকরা সম্প্রতি মারা গেছে, তাকে আপনি চিনতেন?'

নীলকণ্ঠ উৎসুক স্বরে বলিল, 'চিনতাম বৈকি। অমৃত প্রায়ই কর্তার কাছে চাকরির অন্য দরবার করতে আসত। কিন্তু—'

'সদানন্দ সুরকেও আপনি চিনতেন?'

নীলকণ্ঠ সংহত স্বরে বলিল, 'সদানন্দবাবু কাল রাত্রে বোমা ফেটে মারা গেছেন, আজ সকালে খবর পেয়েছি। সদানন্দবাবুকে ভালোরকম চিনতাম। আমাদের এখানে তাঁর খুব যাতায়াত ছিল।'

'কী উপলক্ষে যাতায়াত ছিল?'

'উপলক্ষ- কর্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। মাঝে মাঝে গদিতে এসে বসতেন, তামাক খেতেন, কর্তার সঙ্গে দু'দণ্ড বসে গল্পগাছা করতেন। এর বেশী উপলক্ষ কিছু ছিল না। তবে—' বলিয়া নীলকণ্ঠ থামিল।

'অর্থাৎ মোসায়েবি করতেন। তবে কি?'

'দিন দশেক আগে তিনি কর্তার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলেন।'

'তাই নাকি! কত টাকা?'

'পাঁচশো।'

'হ্যান্ডনোট লিখে টাকা ধার নিয়েছিল?'

'আজ্ঞে না। কর্তা সদানন্দবাবুকে বিশ্বাস করতেন, বহিখাতায় সদানন্দ-বাবুর নামে পাঁচশো টাকা কর্জ লিখে টাকা দেওয়া হয়েছিল। টাকাটা বোধহয় ডুবল।' বলিয়া নীলকণ্ঠ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িল।

ব্যোমকেশ গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। কি ভাবিল জানি না, কিন্তু খানিক পরে বাহির হইতে ঘোড়ার চিঁহি-চিঁহি শব্দ শুনিয়া তাহার চমক ভাঙিল। সে মুখ তুলিয়া বলিল, 'ভালো কথা, অনেকগুলো ঘোড়া দেখলাম। সবগুলোই কি আপনাদের?'

নীলকণ্ঠ সোৎসাহে বলিল, 'আজ্ঞে সব আমাদের। কর্তার খুব ঘোড়ার শখ। ন'টা ঘোড়া আছে।'

'তাই নাকি! এতগুলো ঘোড়া কি করে? ট্রাক টানে?'

'ট্রাক তো টানেই। তা ছাড়া কর্তা নিজে ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসেন। উনি কমবয়সে জকি ছিলেন কিনা—'

'নীলকণ্ঠ!—'

শব্দটা আমাদের পিছন দিক হইতে চাবুকের মতো আসিয়া নীলকণ্ঠের মুখে পড়িল। নীলকণ্ঠ ভীতমুখে চুপ করিল, আমরা একসঙ্গে পিছনে ঘাড় ফিরাইলাম।

দ্বারের সম্মুখে একটি লোক দাঁড়াইয়া আছে। বয়স আন্দাজ চল্লিশ, ক্ষীণ-খর্ব চেহারা, অস্থিসার মুখে বড় বড় চোখ, হাফ-প্যাণ্ট ও হাফ-শার্ট পরা শরীরে বিকলতা কিছু না থাকিলেও, জঙ্ঘার হাড়-দুটি ধনুকের মতো বাঁকা। ইনিই যে মিল-এর মালিক ভূতপূর্ব জকি বিশ্বনাথ মল্লিক তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলাম।

বিশ্বনাথ মল্লিক নীলকণ্ঠের দিকেই চাহিয়া ছিলেন, পলকের জন্যও আমাদের দিকে চক্ষু ফিরান নাই। এখন তিনি ঘরের মধ্যে দুই পা অগ্রসর হইয়া আগের মতোই শাণিত কণ্ঠে নীলকণ্ঠকে বলিলেন, 'ইস্টিশানে মাল চালান যাচ্ছে, তুমি তদারক করো গিয়ে।'

নীলকণ্ঠ কশাহত ঘোড়ার মতো ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এইবার বিশ্বনাথ মল্লিক আমাদের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। তাঁহার মুখ হইতে মালিক-সুলভ কঠোরতা অপগত হইয়া একটু হাসির আভাস দেখা দিল। তিনি সহজ সুরে বলিলেন, 'নীলকণ্ঠ বড় বেশী কথা কয়। আমি আগে জকি ছিলাম, সেই খবর আপনাদের শোনাচ্ছিল বুঝি?'

ব্যোমকেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'ঘোড়ার কথা থেকে জকির কথা উঠে পড়ল।'

বিশ্বনাথবাবু মুখে সহাস্য ভঙ্গী করিলেন, 'নিজের লজ্জাকর অতীতের কথা সবাই চাপা দিতে চায়, আমার কিন্তু লজ্জা নেই। বরং দুঃখ আছে, যদি জকির কাজ ছেড়ে না দিতাম, এতদিনে হয়তো খীম সিং কি খাদে হয়ে দাঁড়াতাম। কিন্তু ও-কথা যাক। আপনি ব্যোমকেশবাবু, না? সদানন্দ সুরের মৃত্যু সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন? আসুন, আমার বসবার ঘরে যাওয়া যাক।'

সাত

বিশু মল্লিকের খাস কামরাটি আধুনিক প্রথায় টেবিল চেয়ার দিয়া সাজানো, বেশ ফিটফাট। আমরা উপবেশন করিলে তিনি টেবিলের দেরাজ হইতে সিগারেটের টিন বাহির করিয়া দিলেন।

বিশু মল্লিকের চেহারাটি অকিঞ্চিৎকর বটে, কিন্তু তাঁহার আচার-ব্যবহারে বেশ একটি আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, চোখ দু'টির অন্তরালে সজাগ শক্তিশালী মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলিতেছে তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। আমাদের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া তিনি নিজে সিগারেট ধরাইলেন। টেবিলের সামনের দিকে বসিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি কি জন্যে সান্তালগোলায় এসেছেন তা আমি জানি। বোধহয় এখানকার সকলেই জানে। এখন বলুন আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। অবশ্য নীলকণ্ঠর কাছে আমার সম্বন্ধে সব কথাই শুনেছেন। যদি আমাকেই গোলাবারুদের

আসামী বলে সন্দেহ করেন তাহলে আমার মিল খুঁজে দেখতে পারেন, আমার কোনও আপত্তি নেই।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'খোঁজাখুঁজির কথা পরে হবে। এখন আমার একটি ব্যক্তিগত কৌতূহল চরিতার্থ করুন। জকির কাজ ছেড়ে চালের কল করলেন কেন? যতদূর জানি জকির কাজে পয়সা আছে।'

বিশুবাবু বলিলেন, 'পয়সা অবশ্য আছে কিন্তু বড় কড়াকড়ির জীবন, ব্যোমকেশবাবু। কখন ওজন বেড়ে যাবে এই ভয়ে আধপেটা খেয়ে জীবন কাটাতে হয়। আরও অনেক বায়নাক্কা আছে। আমার পোষাল না। কিছু টাকা জমিয়েছিলাম, তাই দিয়ে যুদ্ধের আগে এই মিল্ খুলে বসলাম। তা, বলতে নেই, মন্দ চলছে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু ঘোড়ার মোহ ছাড়তে পারলেন না। এখানেও অনেকগুলি ঘোড়া পুষেছেন দেখলাম।'

বিশুবাবু ঈষৎ গাঢ়স্বরে বলিলেন, 'হ্যাঁ। আমি ঘোড়া ভালবাসি। অমন বুদ্ধিমান প্রভুভক্ত জানোয়ার আর নেই। মানুষের প্রকৃত বন্ধু যদি কেউ থাকে তো সে কুকুর নয়, ঘোড়া।'

'তা বটে।' ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'আমারও কুকুরের চেয়ে ঘোড়া ভাল লাগে। কত রঙের ঘোড়াই আছে, লাল সাদা কালো। তবে এদেশে লাল ঘোড়াই বেশী দেখা যায়, সাদা কালো তত বেশী নয়। এই দেখুন না, সাঁওতালগোলাতেই কত ঘোড়া চোখে পড়ল, কিন্তু সাদা বা কালো ঘোড়া একটাও দেখলাম না।'

বিশুবাবু বলিলেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন। সাদা ঘোড়া এখানে একটাও নেই। তবে একটা কালো ঘোড়া আছে। বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর।'

'বদ্রিদাস- সে কে?'

'এখানে আর একটা চালের কল আছে, তার মালিক বদ্রিদাস গিরধরলাল! তার কয়েকটা ঘোড়া আছে, তাদের মধ্যে একটা ঘোড়া কালো।'

ব্যোমকেশ সিগারেটের শেষাংশ অ্যাশ-ট্রেতে ঘসিয়া নিভাইয়া দিল। ঘোড়া সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়াছে এমনি নিরুৎসুক স্বরে বলিল, 'কালো ঘোড়া আছে তাহলে।- যাক, এবার কাজের কথা বলি। আপনার কর্মচারীর কাছে কিছু খবর পেয়েছি, সে-সব কথা আবার জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করব না। সদানন্দ সুরের মৃত্যু-সংবাদ আপনি পেয়েছেন। ঘটনাক্রমে আমি তখন বাঘমারি গ্রামে ছিলাম। ভয়াবহ মৃত্যু।'

বিশুবাবু বলিলেন, 'শুনেছি বোমা ফেটে মৃত্যু হয়েছে। আপনি দেখে-ছিলেন?'

ব্যোমকেশ সংক্ষেপে মৃত্যুর বিবরণ দিয়া বলিল, ' -এখন শুধু সদানন্দ সুরের মৃত্যুর কিনারা নয়, বোমারও কিনারা করতে হবে। আপনি বুদ্ধিমান লোক, এবিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন।'

'কি ভাবে সাহায্য করতে পারি, বলুন।'

'আপনি এখানে অনেকদিন আছেন, এখানকার ঘাঁৎঘোঁৎ জানা আছে। মার্কিন সিপাহীর দল যখন এখানে ছিল তখন আপনিও ছিলেন। আপনি বলতে পারেন কারা মার্কিন সিপাহীদের ছাউনিতে যাতায়াত করত?'

বিশুবাবু কিছুক্ষণ নতনেত্রে চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'মার্কিন সিপাহীদের ছাউনিতে কারুর যাতায়াত ছিল কিনা আমি বলতে পারি না, কিন্তু তাদের সর্বত্র যাতায়াত ছিল। ভারি মিশুক লোক ছিল তারা, আমার মিল্-এও অনেকবার এসেছে।'

'হুঁ। তারা আপনার কাছে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করবার চেষ্টা করেছিল কি?'

বিশুবাবু একটু গম্ভীর হাসিলেন, 'করেছিল। একজন সার্জেন্ট একটা পিস্তল বিক্রি করবার চেষ্টা করেছিল। আমি কিনিনি।'

'আপনি কেনেননি, আর কেউ কিনেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা কে। আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

'কিছু না। আন্দাজ করতে পারলে অনেক আগেই আপনাদের খবর দিতাম, ব্যোমকেশবাবু।'

ব্যোমকেশ আর-একটা সিগারেট ধরাইয়া কিছুক্ষণ নীরবে টানিল, 'আচ্ছা, আর একটা কথা। সাঁওতালগোলা ছোট জায়গা, এখানে মারণাস্ত্রগুলো যদি কেউ লুকিয়ে রাখতে চায় তাহলে কোথায় লুকিয়ে রাখবে আপনি অনুমান করতে পারেন?'

বিশুবাবু আবার কিছুক্ষণ চক্ষু নত করিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন, 'আপনার বিশ্বাস মারণাস্ত্রগুলো সাঁওতালগোলাতেই আছে। কিন্তু তা নাও হতে পারে।'

'মনে করুন সাঁওতালগোলাতেই আছে।'

'বেশ, মনে করলাম। কিন্তু অস্ত্রগুলোর আয়তন কতখানি, ক'টা বন্দুক ক'টা বোমা, এসব তো কিছুই জানি না। কি করে অনুমান করব? আমার মনে হয় পুলিস যদি সাঁওতালগোলার সমস্ত বাড়ি, সমস্ত গোলা আর চালের কল একসঙ্গে খানাতল্লাশ করে তাহলে হয়তো অস্ত্রগুলো বেরুতে পারে।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, 'তা কি সম্ভব! আর যদি সম্ভব হত তাহলেও একটা কথা ভেবে দেখুন। যে-ব্যক্তি এই কাজ করছে সে নির্বোধ নয়, সে কি এমন জায়গায় মাল রাখবে যেখানে পুলিস সহজেই খুঁজে বার করতে পারে? আমার তা মনে হয় না। লোকটি যদি এত নির্বোধ হত তাহলে অনেক আগেই ধরা পড়ে যেত।'

বিশুবাবু উৎসুক স্বরে বলিলেন, 'তাহলে আপনার কী মনে হয়? কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে?'

ব্যোমকেশ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'এমন জায়গায় রেখেছে যেখানে কারুর যেতে মানা নেই, অথচ কেউ যায় না, যেখানে দৈবাৎ মাল পাওয়া গেলেও প্রমাণ করা যাবে না কে রেখেছে?'

বিশুবাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, 'অর্থাৎ--?'

ব্যোমকেশ পিছনের খোলা জানালা দিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিল, 'অর্থাৎ ওই জঙ্গল। ওখানে ঝোপঝাড়ের মধ্যে কয়েকটা পিস্তল আর হ্যান্ড-গ্রিনেড পুঁতে রাখা খুব শক্ত কাজ নয়, কিন্তু খুঁজে বার করা অসম্ভব। যদি বা খুঁজে বার করলেন, কে পুঁতেছে কি করে প্রমাণ করবেন?'

বিশুবাবু উৎসাহ ভরে বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক, ঠিক। জঙ্গলের কথাটা আমার মাথায় আসেনি। নিশ্চয় জঙ্গলে কোথাও পোঁতা আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে। কিন্তু ভুল হয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।'

বিশুবাবু বলিলেন, 'না ব্যোমকেশবাবু, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার বিশ্বাস আর দেরি না করে জঙ্গলটা খুঁজে দেখা দরকার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই করতে হবে। তবে জঙ্গল তো একটুখানি জায়গা নয়, খুঁজতে সময় লাগবে। অনেক লোকও লাগবে। আজ আব হবে না, কাল—'

এই পর্যন্ত বলিয়া ব্যোমকেশ থামিয়া গেল। এতক্ষণ সে অসতর্কভাবে কথা বলিতেছিল, এখন যেন রাশ টানিয়া নিজেকে সংযত করিল; বিশুবাবুর পানে তীক্ষ্ণভাবে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'বিশ্বনাথবাবু, আজ আপনাকে বিশ্বাস করে এমন কথা কিছু বললাম যা বাইরের লোকের কাছে বক্তব্য নয়। আপনি বিশ্বাসযোগ্য লোক বলেই বলেছি। আশা করি আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।'

বিশ্বনাথবাবু বলিলেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাব মুখ থেকে কোনো কথা বেরুবে না। উঠছেন নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, আজ উঠি। একবাব ঐ মাড়োয়ারী কি নাম? বদ্রি-দাসের মিল-এ যাব। দেখি যদি ওর কাছে কিছু খবব পাওয়া যায়। বিকেলে আবার রামডিহি যেতে হবে, সেখানে সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি থাকেন। - আচ্ছা, সদানন্দবাবু যে আপনার কাছে পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিলেন, কিজন্যে ধার চান কিছু বলেছিলেন কি?'

বিশুবাবু বলিলেন, 'তাঁর ইচ্ছে ছিল এখানে কবিরাজী ওষুধের একটা দোকান খোলা। কিন্তু তাঁর মূলধন ছিল না, আমাব কাছে ধার চেয়েছিলেন। লোকটি গরীব হলেও সজ্জন ছিলেন, আমি টাকা দিয়েছিলাম। তিনি বেঁচে থাকলে নিশ্চয় টাকা শোধ দিতেন, কিন্তু—! যাকগে, ও-ক'টা টাকাব জন্যে আমাব দুঃখ নেই। আমি শুধু ভাবছি, সদানন্দবাবুর মতো নিবীহ লোককে কে খুন কবল? কেন খুন করল? তবে কি তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন জীবন ছিল? বাইরে থেকে যা দেখা যেত সেটা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ নয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হয়তো তাই। এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আজ বিকেলে তাঁর ভগিনীপতির সঙ্গে দেখা হলে হয়তো তাঁব প্রকৃত চরিত্র বোঝা যাবে। আচ্ছা, আজ চলি, আবার দেখা হবে।'

দ্বাব পর্যন্ত আসিয়া ব্যোমকেশ ফিরিযা গেল, বিশুবাবুর পাশে দাঁড়াইয়া হ্রস্বকণ্ঠে বলিল, 'একটা কথা জিগ্যেস করা হয়নি। আপনি কি সম্প্রতি কোনো বেনামী চিঠি পেয়েছেন?'

বিশুবাবু চকিতে মুখ তুলিলেন, 'পেয়েছি। আপনি কি করে জানলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আরও দু'একজন পেয়েছে, তাই মনে হল হয়তো আপনিও পেয়েছেন। কী আছে বেনামী চিঠিতে? ভয় দেখানো?'

'এই-যে দেখুন না'—বলিয়া বিশুবাবু দেরাজ হইতে আমাদেরই লেখা চিঠি বাহিব করিয়া দিলেন।

ব্যোমকেশ মনোযোগ দিয়া চিঠি পড়িল, তারপর চিঠি ফেরত দিয়া বলিল. 'হুঁ। কে লিখেছে কিছু আন্দাজ করতে পারেন না?'

বিশুবাবু বলিলেন, 'কিছু না। আমার জীবনে এমন কোনও গুপ্তকথা নেই যা ভাঙিয়ে কেউ লাভ করতে পারে?'

'আপনার শত্রু কেউ আছে?'

'অনেক। ব্যবসাদারের সবাই শত্রু।'

'তাহলে তারাই কেউ হয়তো নিছক mischief করবার জন্যে চিঠি দিয়েছে।—চলি এবার। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

বিশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'আমার মিল তাহলে সার্চ করছেন না?'

ব্যোমকেশও হাসিল, 'অনর্থক পণ্ডশ্রম করে লাভ কি বিশ্বনাথবাবু?'

'আর জঙ্গল?'

'সেটাও আজ নয়—জঙ্গল আপাদমস্তক খুঁজতে অনেক কাঠ-খড় চাই। এস অজিত, রোদ ক্রমেই কড়া হচ্ছে। বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর সঙ্গে দু'টো কথা বলে চট্‌পট আস্তানায় ফিরতে হবে।'

আট

বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর সঙ্গে আলাপ করিয়া কিন্তু সুখ হইল না।

মাড়োয়ারীদের মধ্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর চেহারা দেখা যায়; এক, পাতিহাঁসের মতো মোটা আর বেঁটে; দুই, বকের মতো সরু আর লম্বা। বদ্রিদাসের আকৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর। তাঁহার চালের কলটি আকারে প্রকারে বিশুবাবুর মিল্‌-এর অনুরূপ, সেই ধান শুকাইবার মেঝে, সেই পুকুর, সেই ইঞ্জিন-ঘর, সেই ফটকের সামনে গুর্খা দারোয়ান। পৃথিবীর সমস্ত চাল কলের মধ্যে বোধ করি আকৃতিগত ভ্রাতৃসম্বন্ধ আছে।

বদ্রিদাসের বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে। নিজের গদিতে বসিয়া খবরের কাগজ হইতে তেজি-মন্দার হাল জানিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া এবং পরিচয় শুনিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি গলা উঁচু করিয়া ঘরের আনাচে-কানাচে চকিত ক্ষিপ্র নেত্রপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে পলকের তরেও দৃষ্টি বিনিময় করিলেন না। ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন তাহাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং নেতিবাচক। পুরা সওয়াল জবাব উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই, নমুনাস্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।—

'আপনি অমৃতকে চিনতেন?'

'নেহি।'

'সদানন্দ সুরকে চিনতেন?'

'নেহি।'

'বেনামী চিঠি পেয়েছেন?'

'নেহি।'

'আপনার কালো রঙের ঘোড়া আছে?'

'নেহি।'

আরও কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তরের পর ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল, কঠিন দৃষ্টিতে

বদ্রিদাসকে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'আজ চললাম, কিন্তু আবার আসব। এবার ওয়ারেণ্ট নিয়ে আসব, আপনার মিল সার্চ করব।'

বদ্রিদাস এককথার মানুষ, দু'রকম কথা বলেন না। বলিলেন, 'নেহি নেহি।'

উত্ত্যক্ত হইয়া চলিয়া আসিলাম। ফটকের বাহিরে পা দিয়াছি, একটি শীর্ণকায় বাঙালী আসিয়া আমাদের ধরিয়া ফেলিল; পানের রসে আরক্ত দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল, 'আপনি ব্যোমকেশবাবু? বদ্রিদাসকে সওয়াল করছিলেন?'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'আপনি জানলেন কি করে? ঘরে তো কেউ ছিল না।'

রক্তদন্ত আরও প্রকট করিয়া লোকটি বলিল, 'আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। বদ্রিদাস আগাগোড়া মিছে কথা বলেছে। সে অমৃতকে চিনত, সদানন্দ সুরকে চিনত, বেনামী চিঠি পেয়েছে, ওর কালো রঙের একটা ঘোড়া আছে। ভারি ধূর্ত মাড়োয়ারী, পেটেপেটে শয়তানি।'

ব্যোমকেশ লোকটিকে কিছুক্ষণ শান্তচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আপনি কে?'

'আমার নাম রাখাল দাস। মাড়োয়ারীর গদিতে কাজ করি।'

'আপনার চাকরি যাবার ভয় নেই?'

'চাকরি গিয়েছে। বদ্রিদাস নুটিস্ দিয়েছে, এই মাসের শেষেই চাকরি খালাস।'

'নোটিস দিয়েছে কেন?'

'মুলুক থেকে ওর জাতভাই এসেছে, তাকেই আমার জায়গায় বসাবে। বাঙালী রাখবে না।'

আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। লোকটা আমাদের পিছন পিছন আসিতে লাগিল,—'মনে রাখবেন ব্যোমকেশবাবু, পাজির পা-ঝাড়া ওই বদ্রিদাস। ওর অসাধ্যি কম্ম নেই। জাল জুচ্চুরি কালোবাজার -'

ব্যোমকেশ পিছন ফিরিয়া চাহিল না, হাত নাড়িয়া তাহাকে বিদায় করিল।

বিশ্রান্তিগৃহে ফিরিয়া ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় লম্বা হইল, ঊর্ধ্বে চাহিয়া বোধকরি ভগবানের উদ্দেশে বলিল, 'কত অজানারে জানাইলে তুমি!'

আমি জামা খুলিয়া বিছানার পাশে বসিলাম; বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, অনেক লোকের সঙ্গেই তো মুলাকাৎ করলে। কিছু বুঝলে?'

সে বলিল, 'বুঝেছি সবই। কিন্তু লোকটিকে যতক্ষণ নিঃসংশয়ে চিনতে না পারছি ততক্ষণ বোঝাবুঝির কোনও মানে হয় না।'

'কালো ঘোড়ার ব্যাপারটা কি? বদ্রিদাসের যদি কালো ঘোড়া থাকেই তাতে কী?'

ব্যোমকেশ কতক নিজ মনেই বলিল, 'খট্‌কা লাগছে। বদ্রিদাসের কালো ঘোড়া—খট্‌কা লাগছে!'

'তোমার ধারণা হত্যাকারী কালো ঘোড়ায় চড়ে সদানন্দ সুরকে খুন করতে গিয়েছিল। কিন্তু কেন? ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে লাভ কি?'

'লাভ আছে, কিন্তু লোকসানও আছে। তাই ভাবছি। যাক।' সে আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, 'বিশ্বনাথ মল্লিককে কেমন দেখলে?'

বলিলাম, 'জকি ছিলেন, কুকুরের চেয়ে ঘোড়া ভালবাসেন, এ থেকে ভালো-মন্দ কিছু বুঝলাম না। কিন্তু ওঁকে হাঁড়ির খবর দেওয়া কি উচিত হয়েছে? মনে করো, জঙ্গল সার্চ করার কথাটা যদি বেরিয়ে যায়! আসামী সাবধান হবে না?'

ব্যোমকেশ একটু বিমনাভাবে বলিল, 'হুঁ। কিন্তু আমি তাঁকে চেতিয়ে দিয়েছি, আমার বিশ্বাস তিনি কাউকে বলবেন না।'

'কিন্তু যদি মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায়!'

'তাহলে ভাবনার কথা বটে।—যাক, নীলকণ্ঠ অধিকারীকেও বেশ সবল প্রকৃতির লোক বলে মনে হয়। ভারি প্রভুভক্ত, কী বলো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু রাখাল দাস?'

'ও একটা ছুঁচো। বদ্রিদাস তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই গায়ের ঝাল মেটাতে এসেছিল।'

'কিন্তু ওর কথাগুলো কি মিথ্যে?'

'না, সব সত্যি।'

দুপুরবেলা আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া লইলাম। ব্যোমকেশের মুখখানা সারাক্ষণ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল। উদ্বেগের হেতুটা কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিলাম না।

বেলা সাড়ে চারটের সময় রামডিহি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলাম। পৌনে-পাঁচটায় গাড়ী, পাঁচটা বাজিয়া দশ মিনিটে রামডিহি পৌঁছিবে। প্রাণকেষ্ট পালের সহিত সদালাপ করিয়া ফিরিতে বেশী রাত হইবে না।

টিকিট কিনিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিলাম। ফটকে মনোতোষ টিকিট চেক্ করিয়া মিটিমিটি হাসিল, 'ফিরছেন কখন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ন'টা-দশটা হবে।'

প্ল্যাটফর্মে কিছু যাত্রি সমাগম হইয়াছে ট্রেন আসিতে মিনিট পাঁচেক দেরি আছে। এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরাইতে চোখে পড়িল ক্ষীণাঙ্গ স্টেশনমাস্টার হরিবিলাসবাবুর অফিসের সামনে দাঁড়াইয়া পীনাঙ্গ দারোগা সুখময়বাবু তাঁহার সহিত সতর্কভাবে কথা বলিতেছেন। সুখময়বাবু আমাদের দেখিতে পাইয়া হাত নাড়িলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহার চোখে অনুসন্ধিৎসার ঝিলিক।

'কোথাও যাচ্ছেন নাকি?'

'রামডিহি যাব, একটু কাজ আছে। আপনি?'

সুখময়বাবু বলিলেন, 'আমি কোথাও যাব না। একজনকে এগিয়ে নিয়ে এসেছি। এই ট্রেনেই তিনি আসছেন। হে-হে।' বলিয়া ভ্রূ নাচাইলেন।

ব্যোমকেশ একটু বিস্মিতস্বরে বলিল, 'কে তিনি?'

সুখময়বাবু বলিলেন, 'তাঁর নাম নফর কুণ্ডু। তাঁর কয়েক বস্তা চাল রেলে চালান যাচ্ছিল, একটা বস্তা ট্রেনের ঝাঁকানিতে ফেটে গিয়ে ভেতর থেকে দু'সের আফিম বেরিয়েছে। নফর কুণ্ডুও ধরা পড়েছেন। এই ট্রেনে তিনি আসছেন।' বলিয়া ভ্রূ নাচাইতে নাচাইতে স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে প্রস্থান করিলেন।

ব্যোমকেশ ললাট কুঞ্চিত করিয়া চৌকা-পাথর-ঢাকা প্ল্যাটফর্মের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'ওহে, বদ্রিদাস মাড়োয়ারীও এসেছেন।'

ব্যোমকেশ চকিতে চোখ তুলিল। মালগুদামের দিক হইতে বকের মতো পা ফেলিয়া শনৈঃ শনৈঃ বদ্রিদাস আসিতেছেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি আমাদের দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাদের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন না, ধীর মন্থর পদে প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ব্যোমকেশের ভ্রূ-কুঞ্চন আরও গভীর হইল।

মিনিটখানেক পরে আমি বলিলাম, 'ওহে, বিশুবাবুও উপস্থিত। কী ব্যাপার বলো দেখি?'

যোধপুরী ব্রিচেস্-পরা বিশুবাবু ফটক দিয়া প্রবেশ করিলেন, আমাদের দেখিতে পাইয়া স্মিতমুখে আগাইয়া আসিলেন।

'নমস্কার। কোথাও যাচ্ছেন?'

'রামডিহি যাচ্ছি।'

'ওহো—সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি।'

'হ্যাঁ। দশটার মধ্যেই ফিরব। আপনি?'

'কটা চালান আসবার কথা আছে, তারই খোঁজ নিতে এসেছি। দেখি যদি এসে থাকে।' অস্থিসার মুখে একটু হাসিয়া তিনি মাল-অফিসের দিকে চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে ট্রেনের ধোঁয়া দেখা দিয়াছিল। অবিলম্বে প্যাসেঞ্জার গাড়ি আসিয়া পড়িল। গাড়িতে উঠিবার আগে লক্ষ্য করিলাম, একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে পুলিস-পরিবৃত একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি অবতরণ করিলেন। অনুমান করিলাম ইনিই আফিম-বিলাসী নফর কুণ্ডু। মনে পাপ ছিল বলিয়াই বোধহয় বেনামী চিঠি পাইয়া গা-ঢাকা দিয়াছিলেন।

দুই তিন মিনিট পরে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। ব্যোমকেশের মুখে সংশয়ের ভ্রূকুটি গাঢ়তর হইয়াছে, যেন সে হঠাৎ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া মনস্থির করিতে পারিতেছে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হল কি? ঠেকায় পড়েছ মনে হচ্ছে।'

সে উত্তর দিবার আগেই ঘ্যাঁচ করিয়া গাড়ি থামিয়া গেল। জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলাম ডিস্টান্ট সিগনাল না পাইয়া গাড়ি থামিয়াছে। তারের বেড়ার ওপারে বাঘমারি গ্রাম দেখা যাইতেছে।

যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়াছে এমনি ভাবে লাফাইয়া উঠিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ভালোই হল। অজিত, আমি এখানে নেমে যাচ্ছি, তুমি একাই রামডিহি যাও। প্রাণকেষ্টবাবুকে সব কথা জিগ্যেস করবে। সদানন্দবাবু তাঁর কাছে তোরঙ্গ রেখে গিয়েছিলেন কিনা এ-কথাটা জানতে ভুলো না।—আচ্ছা।'

গাড়ি সিটি মারিয়া আবার গুটিগুটি চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ব্যোমকেশ নামিয়া পড়িল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিলাম। সে তারের বেড়া পার হইয়া আমার উদ্দেশে একবার হাত নাড়িল, তারপর বাঘমারি গ্রামের দিকে চলিল।

নয়

ইতিপূর্বে ব্যোমকেশ কখনও আমাকে এমনভাবে ফেলিয়া পালায় নাই। মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। প্রাণকেষ্টবাবুকে কী জেরা করিব? ব্যোমকেশ যখন জেরা করে তখন তাহার প্রয়োগনৈপুণ্য উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু নিজে এ-কাজ কখনও করি নাই। শেষে কি ধাষ্টামো করিয়া বসিব! ব্যোমকেশ আমাকে একি আতান্তরে ফেলিয়া গেল?

প্যাসেঞ্জার গাড়ি দুল্‌কি চালে চলিয়াছে, দু'তিন মাইল অন্তর ছোট ছোট স্টেশন, তবু অবিলম্বে গাড়ি রামডিহি পৌঁছিবে। সুতরাং এইবেলা মাথা ঠাণ্ডা করিয়া ভাবিয়া লওয়া দরকার। প্রথমেই ভাবিতে হইবে, প্রাণকেষ্টবাবুকে ব্যোমকেশ জেরা করিতে চায় কেন? প্রাণকেষ্টবাবু সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি, সম্ভবতঃ প্রাণকেষ্টবাবুর স্ত্রী সদানন্দবাবুর উত্তরাধিকারিণী, কারণ সদানন্দবাবুর নিকট আত্মীয় আর কেহ নাই। সদানন্দবাবু কলিকাতা যাইবার পথে কি ভগিনীপতির কাছে লোহার তোরঙ্গ রাখিয়া গিয়াছিলেন? তোরঙ্গে কি কোনও মহামূল্য দ্রব্য ছিল? প্রাণকেষ্টবাবু কর্মসূত্রে এই পথ দিয়া ট্রলি চড়িয়া যাতায়াত করিতেন, তাঁহার পক্ষে ট্রলি হইতে নামিয়া বাঘমারি গ্রামে উপস্থিত হওয়া মোটেই শক্ত নয়। তবে কি ব্যোমকেশের সন্দেহ প্রাণকেষ্টবাবুই শ্যালককে সংহার করিয়াছেন?

রামডিহি জংশনে পৌঁছিয়া প্রাণকেষ্ট পালের ঠিকানা পাইতে বিলম্ব হইল না। স্টেশনের সন্নিকটে তারের বেড়া দিয়া ঘেরা কয়েকটি ছোট ছোট কুঠি, তাহারই একটাতে প্রাণকেষ্টবাবু বাস করেন। কুঠির সামনে ছোট্ট বাগান, প্যান্টুলুন ও হাত-কাটা গেঞ্জি পরা একটি পুষ্টকায় ব্যক্তি হাতে খুরপি লইয়া বাগানের পরিচর্যা করিতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া ফ্যালফ্যাল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনিই কি প্রাণকেষ্ট পাল?'

তাঁহার হাত হইতে খুরপি পড়িয়া গেল। তিনি কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া থাকিয়া বিহ্বলভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। বলিলাম, 'আমি পুলিসের পক্ষ থেকে আসছি। খবর পেয়েছেন বোধহয় আপনার শালা সদানন্দ সুর মারা গেছেন।'

এই প্রশ্নে ভদ্রলোক এমন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন যে, মনে হইল তাঁহার প্যান্টুলুন এখনি খসিয়া পড়িবে। তারপর তিনি চমকিয়া উঠিয়া 'সুশীলা' সুশীলা!' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

আমিও কম স্তম্ভিত হই নাই। মনে-মনে যাহাকে দুর্দান্ত শ্যালক হন্তা বলিয়া আঁচ করিয়াছি, তাঁহার এইরূপ আচার-আচরণ! পুলিসের নাম শুনিয়াই শিথিলাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। কিংবা -এটা একটা ভান মাত্র। ঘাগী অপরাধীরা পুলিসের চোখে ধুলো দিবার জন্য নানাপ্রকার ছলচাতুরি অবলম্বন করে -প্রাণকেষ্ট-বাবু কি তাহাই করিতেছেন? সুশীলাই বা কে? তাঁহার স্ত্রী?

পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল, বাড়ির ভিতর হইতে সাড়াশব্দ নাই। অতঃপর কি করিব, ডাকাডাকি করিব কি ফিরিয়া যাইব, এইসব ভাবিতেছি, এমন সময় দ্বারের কাছে প্রাণকেষ্টবাবুকে দেখা গেল। তিনি যেন কতকটা ধাতস্থ হইয়াছেন।

প্যাণ্টলুন যথাস্থানে আছে বটে, কিন্তু হাত-কাটা গেঞ্জির উপর বুশ-কোট চড়াইয়াছেন। মুখে মুমূর্ষু হাসি আনিয়া বলিলেন, 'আসুন'।

সামনের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি ছোট, কয়েকটি সস্তা বেতের চেয়ার ও টেবিল দিয়া সাজানো, অন্দরে যাইবার দরজায় পর্দা; বিলিতী অনুকৃতির মধ্যেও একটু পরিচ্ছন্নতা আছে। আমি অন্দরে যাইবার দরজার দিকে পিছন করিয়া বসিলাম, প্রাণকেষ্টবাবু আমার মুখোমুখি বসিলেন।

শুরু করিলাম,—'আপনার শালা সদানন্দবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছেন তাহলে?'

প্রাণকেষ্ট চমকিয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ- হ্যাঁ।'

'কখন খবর পেলেন?'

'অ্যাঁ—সকালবেলা।'

'কার মুখে খবর পেলেন?'

'অ্যাঁ সান্তালগোলা থেকে হরিবিলাসবাবু টেলিফোন করেছিলেন।'

'মাফ করবেন, আপনার স্ত্রী মানে সদানন্দবাবুর ভগ্নী কি এখানে আছেন?'

দেখিলাম আমার প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে প্রাণকেষ্টবাবুর চক্ষু দুটি আমার মুখ ছাড়িয়া আমার পিছন দিকে চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল।

'হ্যাঁ—আছেন।'

আমি পিছনে ঘাড় ফিরাইলাম। অন্দরের পর্দা একটু ফাঁক হইয়া ছিল চকিতে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। বুঝিতে বাকি রহিল না, পর্দার আড়ালে আছেন পত্নী সুশীলা এবং নেপথ্য হইতে প্রাণকেষ্টবাবুকে পরিচালিত করিতেছেন।

'আপনার স্ত্রী নিশ্চয় খুব শোক পেয়েছেন?'

আবার প্রাণকেষ্টবাবুর চকিতচক্ষু পিছন দিকে গিয়া ফিরিয়া আসিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, খুব শোক পেয়েছেন।'

'আপনার স্ত্রী সদানন্দবাবুর উত্তরাধিকারিণী?'

'তা তা তো জানি না। মানে—'

'সদানন্দবাবুর সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব সদ্ভাব ছিল।'

'যাওয়া-আসা ছিল?'

'তা ছিল বৈকি। মানে—'

তাহার চক্ষু আবার পর্দার পানে ধাবিত হইল, 'অ্যাঁ—মানে—বেশী যাওয়া-আসা ছিল না। কালেভদ্রে—'

'শেষ কবে দেখা হয়েছে?'

'শেষ? অ্যাঁ—ঠিক মনে পড়ছে না—'

'দশ-বারো দিন আগে তিনি আপনার বাসায় আসেননি?'

প্রাণকেষ্টবাবুর চক্ষু দুটি ভয়ার্ত হইয়া উঠিল, 'কৈ না তো!'

'তিনি কলকাতা যাবার আগে আপনার কাছে একটা স্টীলের ট্রাঙ্ক রেখে যাননি?'

প্রাণকেষ্টবাবুর দেহ কাঁপিয়া উঠিল, 'না না, স্টীলের ট্রাঙ্ক—না না, কৈ আমি তো কিছু—'

আমি কড়া সুরে বলিলাম, 'আপনি এত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন কেন?'

'নার্ভাস! না না—'

পর্দা সরাইয়া প্রাণকেষ্টবাবুর স্ত্রী প্রবেশ করিলেন। স্বামীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'আমার স্বামী নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ, অচেনা লোক দেখলে আরও নার্ভাস হয়ে পড়েন। আপনি কি জানতে চান আমাকে বলুন।'

মহিলাকে দেখিলাম। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, দৃঢ়গঠিত দেহ, চোয়ালের হাড় মজবুত, চোখের দৃষ্টি প্রখর। মুখমণ্ডলে ভ্রাতৃশোকের কোনও চিহ্নই নাই। তিনি যে অতি জবরদস্ত মহিলা তাহা বুঝিতে তিলার্ধ বিলম্ব হইল না। আমি উঠিয়া পড়িলাম, 'আমার যা জানবার ছিল জেনেছি, আর কিছু জানবার নেই। নমস্কার।' শ্রীমতী সুশীলাকে জেরা করা আমার কর্ম নয়।

স্টেশনে গিয়া জানিতে পারিলাম, ন'টার আগে ফিরিবার ট্রেন নাই। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা কাটাইবার জন্য স্টেশনের স্টলে চা খাইলাম, অসংখ্য সিগারেট পোড়াইয়া প্ল্যাটফর্মে পাদচারণ করিলাম, এবং সস্ত্রীক প্রাণকেষ্টবাবুর কথা চিন্তা করিলাম।

প্রাণকেষ্ট পাল নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ হইতে পারেন; কিন্তু তিনি যে আমাকে দেখিয়া এত বেশী নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা কেবল ধাতুগত স্নায়বিক দুর্বলতা নয়, অন্য কারণও আছে। কী সে কারণ? প্রাণকেষ্ট পত্নীর ইশারায় আমার কাছে অনেকগুলো মিথ্যাকথা বলিয়াছিলেন। কী সে মিথ্যা-কথা? সদানন্দ সুরের সহিত বেশী সম্প্রীতি না থাক, সদানন্দ সুর তাঁহার বাড়িতে যাতায়াত করিতেন। দশ-বারো দিন আগে কলিকাতায় যাইবার মুখে তিনি স্টীলের ট্রাংকটি নিশ্চয় ভগিনীপতির গৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন। ট্রাংকে নিশ্চয় কোনও মূল্যবান দ্রব্য ছিল। কী মূল্যবান দ্রব্য ছিল? টাকাকড়ি? গহনা? বোমাবারুদ? আন্দাজ করা শক্ত। কিন্তু শ্রীমতী সুশীলা বাক্সে কী আছে জানিবার কৌতূহল সংবরণ করিতে পারেন নাই, হয়তো তালা ভাঙিয়াছিলেন। তাঁহার মতো জবরদস্ত মহিলার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু তারপর? তারপর হয়তো ট্রাংকে এমন কিছু পাওয়া গেল যে সদানন্দ সুরকে খুন করা প্রয়োজন হইল। হয়তো ট্রাংকে হ্যান্ড-গ্রিনেড ছিল, সেই হ্যান্ড-গ্রিনেড দিয়াই সদানন্দকে -

কিন্তু না। শ্রীমতী সুশীলা যত দুর্ধর্ষ মহিলাই হোন, নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে খুন করিবেন? আর প্রাণকেষ্ট পালের পক্ষে এরূপ একটা দুঃসাহসিক কাজে লিপ্ত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।...কিন্তু স্টেশনমাস্টার হরিবিলাসবাবু বন্ধুকে অশুভ সংবাদটা সাত তাড়াতাড়ি দিতে গেলেন কেন? বন্ধুসুলভ সহানুভূতি?

সাড়ে ন'টার সময় সাঁওতালগোলায় ফিরিলাম। আকাশে চাঁদ আছে, শহর-বাজার নিষুতি হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম বিশ্রান্তিগৃহে আসিয়া দেখিব ব্যোমকেশ ফিরিয়াছে। কিন্তু তাহার দেখা নাই। কোথায় গেল সে?

বিশ্রান্তিগৃহের চাকরটা রন্ধন শেষ করিয়া বারান্দায় বসিয়া ঢুলিতেছিল

তাহাকে খাবার ঢাকা দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলাম। সে চলিয়া গেল।

কেরোসিনের বাতি কমাইয়া দিয়া বিছানায় অঙ্গ প্রসারিত করিলাম। পিছনের জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিতেছে।...কোথায় গেল ব্যোমকেশ? বলা নাই কহা নাই ট্রেন হইতে নামিয়া চলিয়া গেল। বাঘমারি গ্রামে তার কী কাজ? এতক্ষণ সেখানে কী করিতেছে?

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; ঘুম ভাঙিল কানের কাছে ব্যোমকেশের ফিসফিস গলার শব্দে, 'অজিত, ওঠো, একটা জিনিস দেখবে এস।'

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, 'কী—?'

'চুপ! আস্তে!' ব্যোমকেশ হাত ধরিয়া আমাকে বিছানা হইতে নামাইল, তারপর পিছনের জানালার দিকে টানিয়া লইয়া গেল; বাহিরের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'দেখছ?'

ঘুমের ঘোর তখনও ভালো করিয়া কাটে নাই, ব্যোমকেশের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইয়াছিল না জানি কী দেখিব! কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে বোকার মতো চাহিয়া রহিলাম। জানালা হইতে পনরো-কুড়ি হাত দূরে ঝোপঝাড় আগাছার মাঝখানে খানিকটা মুক্ত স্থান, সেইখানে ছয়-সাতটা কৃষ্ণবর্ণ জন্তু অর্ধ-বৃত্তাকারে বসিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া চাঁদের পানে চাহিয়া আছে। প্রথমদর্শনে মনে হইল কৃষ্ণকায় কয়েকটি কুকুর। বলিলাম, 'কালো কুকুর।' কিন্তু পরক্ষণেই যখন তাহারা সমস্বরে হুক্কা-হুয়া করিয়া উঠিল, তখন আর সংশয় রহিল না। স্থানীয় শৃগালের দল চন্দ্রালোকে সঙ্গীত-সভা আহ্বান করিয়াছে।

আমার মুখের ভাব দেখিয়া ব্যোমকেশ হো-হো শব্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। শৃগালের দল চমকিয়া পলায়ন করিল। আমি বলিলাম, 'এর মানে? দুপুর রাত্রে আমাকে শেয়াল দেখাবার কী দরকার ছিল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আগে কখনও চাঁদের আলোয় শেয়াল দেখেছ?'

'চাঁদের আলোয় শেয়াল দেখলে কী হয়?'

'পুণ্য হয়, অজ্ঞানতিমির নাশ হয়! আমার মনে যেটুকু সংশয় ছিল তা এবার দূর হয়েছে। চলো এখন খাওয়া যাক, পেট চুঁই-চুঁই করছে।'

আলো বাড়াইয়া দিয়া টেবিলে খাইতে বসিলাম। লক্ষ্য করিলাম, ব্যোমকেশ ক্ষুধার্তভাবে অন্নগ্রাস মুখে পুরিতেছে বটে, কিন্তু তাহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত ফুর্তি কিসের? দুপুর রাত পর্যন্ত ছিলে কোথায়? বাঘমারিতে?'

সে বলিল, 'বাঘমারির কাজ ন'টার মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর—'

'বাঘমারিতে কী কাজ ছিল?'

'পটল, দাশু আর গোপালের সঙ্গে কাজ ছিল।'

'হুঁ, কী কাজ ছিল বলবে না। যাক, তারপর?'

'তারপর সান্তালগোলায় ফিরে এসে সুখময় দারোগার কাছে গেলাম। সেখানে একঘণ্টা কাটল। তারপর গেলাম স্টেশনে। হরিবিলাসবাবু ছিলেন না, তাঁকে বিছানা থেকে ধরে নিয়ে এলাম। লম্বা টেলিফোন করতে হল। এখানকার থানায় পাঁচটি বৈ লোক নেই। কাল সকালে বাইরে থেকে দশজন আসবে। সব

ব্যবস্থা করে ফিরে এলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'প্রাণকেষ্ট পালের কথা জানবার দরকার নেই তাহলে?'

'আছে বৈকি। কি হল সেখানে?'

সব কথা মোটামুটি ভাবে বয়ান করিলাম। সে মন দিয়া শুনিল, কিন্তু বিশেষ আগ্রহ দেখাইল না। আহারান্তে মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল, 'গোড়ার একটা যদি হয় গবেট, অন্যটা হয় বিচ্ছু। প্রকৃতির এই বিধান।'

অতঃপর সিগারেট ধরানো হইলে বলিলাম, 'তোমার পকেটে ওটা কি?'

ব্যোমকেশ একটু চকিত হইল, একটু লজ্জিত হইল। বলিল, 'বন্দুক মানে পিস্তল।'

'কোথায় পেলে?'

'থানায়। সুখময় দারোগার পিস্তল।'

'হুঁ। কোনও কথাই স্পষ্ট করে বলতে চাও না। বেশ, তাহলে এবার শুয়ে পড়া যাক।'

'তুমি শুয়ে পড়। আমাকে রাতটা জেগেই কাটাতে হবে।'

'কেন?'

'যার হাতে হ্যান্ড গ্রেনেড আছে তিনি যদি ভয় পেয়ে থাকেন তাহলে সাবধান থাকা ভালো।'

'তবে আমিও জেগে থাকি।'

রাত্রিটা জাগিয়া কাটিল। সুখের বিষয় কোনও উৎপাত হয় নাই। শেষ রাত্রে চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ মুখের বন্ধন একটু আলগা করিল। ...মাদের অচিন পাখির নাম জানিতে পারিলাম।

দশ

সকাল সাতটার সময় দুইজনে বাহির হইলাম। ব্যোমকেশ গায়ে একটা উড়ানি-চাদর জড়াইয়া লইল, যাহাতে পকেটের পিস্তলটা দৃষ্টি আকর্ষণ না করে।

গঞ্জ গোলার কর্মতৎপরতা এখনও পুরাদমে আরম্ভ হয় নাই, দুই চারিটা গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার ব্রাক্ চলিতে শুরু করিয়াছে। আমরা বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর মিল এ প্রবেশ করিলাম।

বদ্রিদাস দাওয়ায় উবু হইয়া বসিয়া দাতন করিতেছিলেন, পাশে জলভরা ঘটি। আমাদের প্রথমটা দেখিতে পান নাই, একেবারে কাছে পৌঁছিলে দেখিতে পাইয়া তাহার চক্ষু দুটি খাঁচার পাখির মতো ঝট্‌পট করিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল, হাত হইতে দাঁতন পড়িয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'শেঠজি, আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

বদ্রিদাস উবু অবস্থা হইতে অর্ধোত্থিত হইয়া আবার বসিয়া পড়িলেন, 'ক্যা -ক্যা!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা এক জায়গায় খানাতল্লাশ করতে যাচ্ছি, আপনি এখানকার গণ্যমান্য লোক, আপনাকে সাক্ষী মানতে চাই।'

'নেহি, নেহি' -বলিতে বলিতে তিনি জলভরা ঘটিটা তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে

বিশেষ একটি স্থানের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

আমরা আবার বাহির হইলাম। বিশ্বনাথ মল্লিকের মিল-এ পেঁাছিতে পাঁচ মিনিট লাগিল।

ফটকের কাছে নায়েব-সরকার নীলকণ্ঠ অধিকারীর সঙ্গে দেখা হইল। নীলকণ্ঠ ভক্তিভরে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল, 'এত সকালে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কর্তা কোথায়?'

'নিজের ঘরে আছেন। চা খাচ্ছেন।'

'চলুন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'আসুন।'

বিশ্বনাথ মল্লিক নিজের ঘরে টেবিলে বসিয়া পাঁউরুটি, মাখন ও অর্ধসিদ্ধ ডিম্ব সহযোগে প্রাতরাশ সম্পন্ন করিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া তাহার চোয়ালের চর্বণক্রিয়া বন্ধ হইল। গলা হইতে অস্বাভাবিক স্বর নির্গত হইল 'ব্যোমকেশবাবু!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সকালবেলাই আসতে হল। কিন্তু তাড়া নেই, আপনি খাওয়া শেষ করে নিন।'

বিশুবাবু ডিমের প্লেট সরাইয়া দিয়া জড়িতস্বরে বলিলেন, 'কি দরকার?' দেখিলাম তাঁহার অস্থিসার মুখখানা ধীরে ধীরে বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল ভেবেছিলাম আপনার মিল খানাতল্লাশ করে কোনও লাভ নেই। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে লাভ থাকতেও পারে।'

বিশুবাবুর রগের শিরা ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিল, মনে হইল তিনি বিস্ফোরকের মতো ফাটিয়া পড়িবেন। কিন্তু তিনি অতি যত্নে নিজেকে সংবরণ করিলেন, তাঁহার ঠোঁটে হাসির মতো একটা ভঙ্গিমা দেখা দিল। তিনি বলিলেন 'হঠাৎ মত বদলে ফেললেন কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কারণ ঘটেছে। কাল বিকেলে আমি বার্মাডিহি যাইনি, আপনাদের ওই জঙ্গলে শিমুলগাছের কাছে লুকিয়ে ছিলাম। আমার সঙ্গে গাঁয়ের তিনটি ছেলে ছিল। আমরা কাল রাত্রে যা দেখেছি তার ফলে মত বদলাতে হয়েছে, বিশ্বনাথবাবু।'

বিশ্বনাথবাবুর চোখদুটো একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই নিভিয়া গেল। তিনি কম্পিতহস্তে একটা সিগারেট ধরাইলেন, অলসভাবে বুক-পকেট হইতে একটা চাবির রিঙ বাহির করিয়া আঙুলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন, 'আমি যদি আমার মিল খানাতল্লাশ করতে না দিই?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার ইচ্ছের ওপর কিছুই নির্ভর করছে না। আমি তল্লাশী পরোয়ানা এনেছি।'

'কৈ দেখি পরোয়ানা।'

ব্যোমকেশ পকেটে হাত দিল, বিশুবাবু বিদ্যুৎবেগে চাবি দিয়া দেরাজ খুলিবার উপক্রম করিলেন। ব্যোমকেশ পকেট হইতে হাত বাহির করিল, হাতে পিস্তল। সে বলিল, 'দেরাজ খুলবেন না।'

কোণ-ঠাসা বনবিড়ালের মতো বিশু মল্লিক ঘাড় ফিরাইলেন; ব্যোমকেশের হাতে পিস্তল দেখিয়া তিনি দেরাজ খোলার চেষ্টা ত্যাগ করিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া শীৎকারের মতো একটা তর্জন-শ্বাস বাহির হইল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, বাঁশী বাজাও।'

পুলিসের বাঁশী পকেটে লইয়া আমি প্রস্তুত ছিলাম, এখন সবেগে তাহাতে ফুৎকার দিলাম।

মিনিটখানেকের মধ্যে দারোগা সুখময় সামন্ত ও তাঁহার অনুচরবর্গে ঘর ভরিয়া গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'ইন্সপেক্টর সামন্ত, বিশ্বনাথ মল্লিককে অ্যারেস্ট করুন, হাতে হাতকড়া পরান। ওঁর হাতে চাবি আছে, চাবি দিয়ে দেরাজ খুলুন। সাবধানে খুলবেন, অস্ত্রগুলো দেরাজের মধ্যেই আছে।'

বিশ্বনাথ মল্লিককে সহজে গ্রেপ্তার করা গেল না, তিনি বনবিড়ালের মতোই আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া লড়াই করিলেন। অবশেষে পাঁচ-ছয় জন মিলিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া হাতে হাতকড়া পরাইল। তারপর টেবিলের দেরাজ খুলিয়া দেখা গেল তাহাতে ছাব্বিশটি ·৩৮ অটোম্যাটিক, অসংখ্য কার্তুজ এবং চৌদ্দটি হ্যান্ড-গ্রেনেড আছে। কালাবাজারে এগুলির দাম অন্তত বিশ হাজার টাকা।

বিশ্বনাথ মল্লিক পুলিস পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া নিষ্ফল ক্রোধে ফুলিতে-ছিলেন, হঠাৎ উগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'বেশ, আমি চোরা-হাতিয়ারের কারবার করি। কিন্তু অমৃতকে আর সদানন্দ সুরকে খুন করেছি তার কোনো প্রমাণ আছে?'

ব্যোমকেশ শান্তকণ্ঠে বলিল, 'প্রমাণ আছে কিনা সে-বিচার আদালত করবেন। কিন্তু মোটিভ যথেষ্ট ছিল। আর আপনি যে-পিস্তল দিয়ে অমৃতকে মেরেছিলেন সে-পিস্তলটা এর মধ্যেই আছে। গুলীটাও অমৃতের শরীরের মধ্যে পাওয়া গেছে। Ballistic পরীক্ষায় সেটা প্রমাণ করা শক্ত হবে না।'

বিশ্বনাথ মল্লিকের চোখদুটা ঘোলা হইয়া গেল, তিনি হাতকড়াসুদ্ধ দুই হাত দিয়া নিজের কপালে সজোরে আঘাত করিয়া এলাইয়া পড়িলেন।

এগারো

সেদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে মধ্যাহ্ন-ভোজন সম্পন্ন করিয়া আমরা বিশ্রান্তি-গৃহের দুইটি খাটে লম্বমান হইয়াছিলাম। পটল, দাশু ও গোপাল বারংবার ব্যোমকেশের পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। দারোগা সুখময় সামন্ত আসামীকে সদরে চালান দিয়া স্তূপীকৃত হাঁসের ডিমের বড়া খাইতে খাইতে থানার অন্যান্য কর্মচারীদের নিকট ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, আসামীর গ্রেপ্তারের ব্যাপারে তাঁহার কৃতিত্বও কম নয়। গঞ্জের কর্মতৎপরতা ক্ষণকালের জন্য মন্দীভূত হইলেও আবার পুরাদমে চালু হইয়াছে ঃ রামে রাম দুয়ে দুই। অমৃত এবং সদানন্দ সুর নামক দুটি অখ্যাত ব্যক্তির অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে জীবনের নিত্যস্রোত ব্যাহত হয় নাই। এবং তাহা-দের আততায়ী ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলেও ব্যাহত হইবে না। রামে রাম দুয়ে দুই।...রাম নাম সত্য হ্যায়।...

ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বদিকে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল; বলিল, 'সদানন্দ সুরের মৃত্যুতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু অমৃত ছেলেটা নেহাত অকারণেই মারা গেল।'

বোধহয ইচ্ছে ছিল বাড়িতে দুদিন বিশ্রাম কবে ভগিনীপতিব বাসা থেকে তোবঙ্গ নিয়ে আসবেন। কিন্তু তাব ইচ্ছা পূর্ণ হল না। নিজেব বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে প্রায আমাদেব চোখেব সামনে তিনি মাবা গেলেন।

সদানন্দ সুবেব মৃত্যুব পব কিছুই বুঝতে বাকি বইল না। আমি যাকে ধবতে এসেছি সেই মেবেছে অমৃত আব সদানন্দ সুবকে। যাবা আগ্নেযাস্ত্র কেনে তাবা বাইবেব লোক, হত্যাকাবী বাইবেব লোক নয অমৃত আব সদানন্দ সুবেব চেনা লোক। অমৃত তাকে দেখে ফেলেছিল এবং সদানন্দ সুব তাকে দোহন কবতে শুরু কবেছিল। কেবল দুটো কথা তখনও অজ্ঞাত ছিল লোকটা কে? এবং কালো ঘোড়ায চড়ে আসে কেন

অমৃত বলেছিল কালো ঘোড়া ভূত নাক দিযে আগুন বেবুচ্ছে। সবটাই তাব উত্তপ্ত কল্পনা হতে পাবে। আবাব খানিকটা সত্যি হতে পাবে। সুতবাং কালো ঘোড়াব খোঁজ নেওয়া দবকাব।

খোঁজ নিযে জানা গেল সান্তালগোলায কেবল একটি কালো ঘোড়া আছে তাব মালিক বদ্রিদাস মাড়োযাবী। তবে কি বদ্রিদাসই আমাব আসামী। বদ্রিদাস লোকটি পাকাল মাছেব মতো পিছল তিনি ধান চালে প্রচুব কাঁকব মেশাতে পাবেন স্বজাতিব প্রতি তাব অসীম পক্ষপাত থাকতে পাবে কিন্তু তিনি দু দুটো মানুষকে খুন কবতে পাবেন এত সাহস নেই। তা ছাড়া তাকে ঘোড়সওযাব রূপে কল্পনা কবা আমাব পক্ষে একেবাবেই অসম্ভব।

আমি বেনামী চিঠি পাঠানোব ফলে একটা কাজ হযেছিল সন্দেহভাজনেব দল থেকে জনকতক লোককে বাদ দেওয়া গিযেছিল। [illegible] বেনামী চিঠি পুলিসকে দেখিযেছিল সুতবাং সে নয। নফব কুণ্ডুব ওপব প্রথমে সন্দেহ হযেছিল কিন্তু দেখা গেল তাব ঘোড়া নেই। পবেব ঘোড়া ধাব কবে কেউ খুন কবতে যায না। প্রাণকেষ্ট পালকে অবশ্য আমি গোড়া থেকেই বাদ দিযেছিলাম। ট্রলিতে চড়ে বাঘমাবি গ্রামেব কাছাকাছি যাওয়া যায বটে কিন্তু ট্রলিতে কুলি থাকে তাদেব চোখ এড়িযে খুন কবাব সুবিধে নেই। আমাব শুধু জানবাব কৌতূহল ছিল সদানন্দ সুবেব ট্রাংকে কী আছে।

যাহোক সন্দেহভাজনেব দলকে ছাঁটাই কবে মাত্র তিন জন দাঁড়াল। বদ্রিদাস মাড়োযাবী বিশু মল্লিক আব সুখময দাবোগা। সুখময দাবোগাকে বাদ দিতে পাবিনি তাব একটা ঘোড়া আছে যদিও সেটা কালো নয। এবং দাবোগা এই জাতীয কাববাব চালাতে যত সহজে [illegible] পাবে [illegible]। প্রাদেশিক [illegible] অনেকবাব বেশী।

অবশ্য যখন জানতে পাবলাম বিশু মল্লিক একসময [illegible] ছিল তখন সব সন্দেহই তাব ওপব গিযে পড়ল। উপবন্তু জানা গেল বিশু মল্লিক সদানন্দ সুবকে পাঁচশো টাকা ধাব দিযেছে। আসলে ওটা ধাব নয ঘুষ। সদানন্দ সুবেব মতো নিঃস্ব লোককে কোনও ব্যবসাদাব শুধু হাতে ধাব দেবে না।

আমি বিশু মল্লিকেব জন্যে টোপ ফেললাম আমাব মনেব প্রাণেব কথা সব তাকে বলে ফেললাম। জঙ্গলে যে অস্ত্রগুলো লুকিযে বাখা সম্ভব এ চিন্তা আমাব গোড়া থেকেই ছিল। আমি ভেবেছিলাম শিমুলগাছেব কাছাকাছি কোথাও মাটিতে পোঁতা আছে। বিশু মল্লিক যখন শুনল আমবা জঙ্গল খানাতল্লাশ কবাব মতলব কবেছি, তখন সে দুশ্চিন্তায পড়ে গেল। অস্ত্রগুলো অবশ্য

খুবই যত্ন করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে; কিন্তু বলা যায় না, পুলিস খুঁজে বার করতে পারে। তখন বিশু মল্লিককে অবশ্য ধরা যাবে না, কিন্তু অনেক টাকার মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। বিশু মল্লিক লোভে পড়ে গেল।

কাল বিকেলে আমি যখন রামডিহি যাবার জন্যে ট্রেনে চড়লাম তখন বিশু মল্লিক এসে দেখে গেল আমি সত্যি যাচ্ছি কিনা। আমার অবশ্য রামডিহি পর্যন্ত যাবার প্ল্যান ছিল না, স্থির করেছিলাম পরের স্টেশনে নেমে বাঘমারিতে ফিরে আসব। কিন্তু দৈব অনুকূল, ঠিক বাঘমারি গ্রামের গায়ে ট্রেন থেমে গেল।

গ্রামে গিয়ে পটল, দাশু আর গোপালকে যোগাড় করলাম; তাদের নিয়ে জঙ্গলে গেলাম। সারা জঙ্গল তল্লাশ করা অসম্ভব; কিন্তু সদানন্দ সুরের পাঁচিলের পাশে যেখানে ঘোড়ার খুরের দাগ পাওয়া গিয়েছিল সেখান থেকে শিমুলগাছের গোড়া পর্যন্ত খুঁজে দেখলাম, যদি কোথাও সদ্য-খোঁড়া মাটি দেখতে পাই। কিন্তু সেরকম কিছুই চোখে পড়ল না।

এখন কি করা যায়! সূর্যাস্তের বেশী দেরি নেই। জঙ্গলে বসে সিগারেট টানতে টানতে মতলব ঠিক করে নিলাম। পটলদের বললাম, 'চলো, সাঁওতাল-গোলার দিকে যাওয়া যাক।'

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সাঁওতালগোলার কিনারায় পৌঁছলাম। এখানে জঙ্গল প্রায় দেড়শো গজ চওড়া, একপ্রান্তে স্টেশন, অন্য-প্রান্তে কো-অপারেটিভ ব্যাংক মাঝামাঝি বিশু মল্লিকের মিল। মিল-এর এটা পিছন দিক, কাঁটা তারের বেড়ায় ছোট খিড়কির ফটক আছে। আমি পটলদের আমার প্ল্যান বুঝিয়ে দিলাম। তারা জঙ্গলের কিনারায় সম-ব্যবধানে গাছে উঠে লুকিয়ে থাকবে এবং লক্ষ্য করবে ঘোড়ায় চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে কেউ জঙ্গলে ঢোকে কিনা। লোকটাকে চেনবার চেষ্টা করবে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ধরবার চেষ্টা করবে না।

পটল উঠল বিশু মল্লিকের মিল-এর সরাসরি একটা গাছে, দাশু গেল স্টেশনের দিকে, আর গোপাল ব্যাঙ্কের দিকে। আকাশে আজও চাঁদ আছে, রাত হলেও, এদের চোখ এড়িয়ে কেউ জঙ্গলে ঢুকতে পারবে না।

ওদের গাছে তুলে দিয়ে আমি ফিরে চললাম শিমুলগাছের কাছে। ওই গাছটা আমার মনে ঘোর সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল। অমৃতের মৃত্যু হয় ঐ গাছের তলায়। এ-রহস্যের চাবিকাঠি যদি এই জঙ্গলের মধ্যে থাকে তবে নিশ্চয় ঐ শিমুলগাছের কাছাকাছি কোথাও আছে।

যখন শিমুলতলায় ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে, চাঁদের আলো ফুটেছে। শিমুলগাছ থেকে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে একটা ঝাঁকড়া গোছের গাছ ছিল, আমি তাতে উঠে পড়লাম। এইখানে বসে বাঘ-শিকারীর মতো অপেক্ষা করব। আমার সঙ্গে অস্ত্র নেই, আমি এসেছি শুধু ব্যাঘ্র-মশাইকে দেখতে। তিনি আসবেন কিনা জানি না, কিন্তু যদি আসেন, ন'টার আগেই আসবেন।

শিমুলগাছের সব পাতাই প্রায় ঝরে গেছে, গাছের তলায় ছায়া নেই। চাঁদ যত উঁচুতে উঠছে আলো তত পরিষ্কার হচ্ছে। হঠাৎ কাছের একটা গাছ থেকে কোকিল ডেকে উঠল। বিচিত্র পরিস্থিতি। আমি বসে আছি একটা নৃশংস নরহন্তাকে দেখব বলে, আর—কোকিল ডাকছে! আজব দুনিয়া!

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। চোখের কাছে হাত এনে ঘড়ি দেখলাম, পৌনে আটটা। সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে একটা আওয়াজ কানে এল, শুকনো পাতার

ওপর পায়ের মচমচ শব্দ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, ঘন ছায়ার ভিতর থেকে ধীর-মন্থর গমনে একটা ঘোড়া বেরিয়ে আসছে। কালো ঘোড়া। তার পিঠে বসে আছে কালো-পোশাক-পরা একটা মানুষ। মানুষটার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু সে জকির মতো সামনে ঝুঁকে বসেছে আর সতর্কভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

ঘোড়াটা সোজা গিয়ে শিমুলগাছের বিরাট গুঁড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়াল, পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যা দেখলাম তা একেবারে সার্কাসের খেলা। ঘোড়ার সওয়ার টপ্ করে ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াল। তারপর হাত বাড়িয়ে শিমুলগাছের গুঁড়িতে একটা ফোকরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে। মাটি থেকে দশ হাত উঁচুতে যেখানে ডালপালা বেরিয়েছে সেখানে একটা খোপের মতো ফুটো আছে। অচিন পাখির বাসা!

ঘোড়ার পিঠে আসামী কেন জঙ্গলে আসে এখন বুঝতে পারছ? অস্ত্রগুলো মাটিতে পোঁতা নেই, আছে গাছের ফোকরের মধ্যে, মাটি থেকে দশ হাত উঁচুতে। শিমুলগাছের গাছে শক্ত-শক্ত মোটা-মোটা কাঁটা থাকে; শিমুলগাছে মানুষ ওঠে না, এমনকি কাঠবেরালি পর্যন্ত ওঠে না। এমন নিরাপদ গুপ্তস্থান আর নেই। অবশ্য মই লাগিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু কে মই লাগাবে? যারা গুপ্তস্থানের সন্ধান জানে না, তারা কি জন্যে মই লাগাবে? আর যিনি জানেন তিনি যদি মই ঘাড়ে করে জঙ্গলে আসেন তাহলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তার চেয়ে ঘোড়া ঢের নিরাপদ; বিশেষত যদি জকির হাতের শিক্ষিত ঘোড়া হয়।

যাহোক, ঘোড়সওয়ারের বাঁহাতে একটা থলি আছে, সে খোপের মধ্যে ডান হাত ঢুকিয়ে একটি একটি করে অস্ত্রগুলি বার করছে আর থলিতে রাখছে। এতক্ষণে ঘোড়সওয়ারকে চিনতে পেরেছি বিশু মল্লিক। মুখ চিনতে না পারলেও, ঐ রোগা বেঁটে শরীর আর ধনুকের মতো বাঁকা ঠ্যাং ভুল হবার নয়। আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু একটা ধোঁকা তখনও কাটেনি, বিশু মল্লিক কালো ঘোড়া পেল কোত্থেকে? সে ভারি হুঁশিয়ার লোক, তার যদি কালো ঘোড়া থাকত সে কখনই আমার কাছে মিথ্যেকথা বলত না। আসলে আমি যখন তাকে কালো ঘোড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম তখন সে আমার প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। এ মামলার সঙ্গে কালো ঘোড়ার যে কোনও সম্বন্ধ আছে তা সে কল্পনা করতেই পারেনি। আমি কালো ঘোড়ার রহস্য বুঝলাম কাল দুপুর-রাত্রে, বাসায় ফিরে এসে।

সে যাক, বিশু মল্লিক থলি ভরে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে নেমে বসল, তারপর মন্দমন্থর চালে ফিরে চলল। সে জঙ্গলের ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে যাবার পর আমি গাছ থেকে নামলাম। ঘড়িতে তখন সওয়া আটটা। আমি আবার পটলদের উদ্দেশে ফিরে চললাম। আমার প্ল্যান ঠিকই ফলেছে; পুলিস কাল জঙ্গল তল্লাশ করবে, তাই আজ বিশু মল্লিক অস্ত্রগুলো জঙ্গল থেকে সরিয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে অস্ত্রগুলোকে সে রাখবে কোথায়? কারণ, কেবল মানুষটাকে ধরলে চলবে না, অস্ত্রগুলোও চাই। বস্তুত, অস্ত্রগুলো না পেলে মানুষটাকে ধরে কোনও লাভ নেই।

আমি যখন জঙ্গলের কিনারায় পৌঁছলাম তখনও পটলেরা গাছ থেকে নামেনি, আমাকে দেখে নেমে এল। তিনজনেই ভীষণ উত্তেজিত; তারা ঘোড়সওয়ারকে

জঙ্গলে ঢুকতে দেখেছে এবং চিনতে পেরেছে। বিশু মল্লিক তার বাইস মিল এর খিড়কি ফটক দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে এল, পটলের গাছের প্রায় পাশ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। চল্লিশ মিনিট পরে আবার ফিরে নিজের ফটক দিয়ে মিল এ চলে গেল।

আমি জিগ্যেস করলাম 'ঠিক দেখেছ নিজের ফটকে ঢুকেছে?' অন্য কোথাও যায়নি

পটল বলল, আজ্ঞে না, অন্য কোথাও যায়নি।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। অস্ত্রগুলো বিশু মল্লিক মিলেই রাখবে অন্তত যতদিন না পুলিস জঙ্গল তল্লাশ শেষ করে। আমি সকালবেলা তাকে বলে-ছিলাম মিল খানাতল্লাশ করব না আমার কথায় সে বিশ্বাস করেছে। আমাকে বিশু মল্লিক বোধ হয় খুবই সরলপ্রকৃতির লোক বলে মনে করেছিল।

আমি তখন পটল দাশু আর গোপালের পিঠ ঠুকে দিয়ে বললাম 'তোমাদের জন্যেই অমৃতের মৃত্যুর কিনারা করতে পারলাম। কিন্তু তা' আর বেশী কৌতূহল প্রকাশ কোরো না কাল সকাল নটার সময় এসো তখন সব জানতে পারবে। কিন্তু সাবধান কাউকে একটি কথা বলবে না।

তারা গ্রামে ফিরে গেল। আমি থানায় গেলাম। সুখময় দারোগার কাছে পিস্তলটা যোগাড় করে স্টেশনে গেলাম। স্টেশন থেকে কাজকর্ম সেরে যখন ফিরে এলাম তখন রাত দুপুর তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছ।

তোমাকে জাগালাম না পিছনের জানালার কাছে গিয়ে দাড়ালাম। দেখি জানালার বাইরে কয়েকটা জন্তু বসে আছে। প্রথমটা আমিও ভেবেছিলাম কালো কুকুর তারপর লক্ষ্য করে দেখলাম, কুকুর নয়—শেয়াল। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে কালো ঘোড়ার রহস্য ভেদ হয়ে গেল। বুঝতে পারলে না? অত্যন্ত সহজ এমন কি হাস্যকর। কেন যে কথাটা মাথায় আসেনি জানি না। শেয়ালের গায়ের রং কালো নয় পাটকিলে। অথচ আমরা দেখলাম কালো। ঘোড়াটাও কালো ছিল না ছিল গাঢ় বাদামী রঙের ইংরেজীতে যাকে বলে চেস্টনাট। চাঁদের আলো সব গাঢ়রঙই দূর থেকে কালো দেখায়। তাই অমৃত কালো ঘোড়া ভূত দেখেছিল আমিও কালো ঘোড়া দেখেছিলাম। এই হল কালো-ঘোড়ার রহস্য। রহস্য না বলে যদি পরিহাস বলতে চাও তাতেও আপত্তি নেই।

বাকি থেকে বসে তুমি সস্ত্রীক প্রাণকেষ্ট পালের উপাখ্যান বললে। ওদের গলদ কোথায় বুঝতে বেশী কষ্ট হয় না। প্রাণকেষ্ট পাল নিজের কাজে বেশ দক্ষ কিন্তু ঘরে জারিজুরি চলে না স্ত্রীর কাছে কেঁচো। সদানন্দ সুর বোনের কাছে তোরঙ্গ রেখে গিয়েছিলেন ঠিকই। তোরঙ্গ গোড়ায় ভাঙ্গা হয়নি কিন্তু যখন তার মৃত্যু সংবাদ এল তখন ভগিনী সুশীলা আর দ্বিধা করলেন না তোরঙ্গের তালা ভাঙলেন এবং যা পেলেন আত্মসাৎ করলেন। হয়তো দাদার বিষয়সম্পত্তি সবই তিনি শেষ পর্যন্ত পাবেন কিন্তু আইনের কথা কিছু বলা যায় না। হাতে যা পাওয়া গেছে তা হজম করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই হচ্ছে ভগিনী সুশীলার মনস্তত্ত্ব। প্রাণকেষ্ট পাল কিন্তু পুরুষমানুষ, হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান আছে তাই তোমাকে দেখে তিনি বেজায় নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন।

তারপর আর কি? এবার বেদব্যাসের বিশ্রাম। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বিশু মল্লিকের মতো আরও কত মহাজন নীরবে তপস্যা করছেন কে

তার খবর রাখে!

ব্যোমকেশ প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া পাশ ফিরিল; বলিল, 'জাগি পোহাল বিভাবরী। এইবেলা একটুকু ঘুমিয়ে নাও, আজ রাত্রেই কলকাতা ফিরব। হে হে।'

শৈল রহস্য

সহ্যাদ্রি হোটেল
মহাবলেশ্বর -পুণা
৩রা জানুআরি

ভাই অজিত,

বোম্বাই এসে অবধি তোমাদের চিঠি দিতে পারিনি। আমার পক্ষে চিঠি লেখা কি রকম কষ্টকর কাজ তা তোমরা জানো। বাঙালীর ছেলে চিঠি লিখতে শেখে বিয়ের পর। কিন্তু আমি বিয়ের পর দু'দিনের জন্যেও বৌ ছেড়ে রইলাম না, চিঠি লিখতে শিখব কোত্থেকে? তুমি সাহিত্যিক মানুষ, বিয়ে না করেও লম্বা চিঠি লিখতে পার। কিন্তু তোমার কল্পনা-শক্তি আমি কোথায় পাব ভাই। কাঠ-খোট্টা মানুষ, স্রেফ সত্য নিয়ে কারবার করি।

তবু আজ তোমাকে এই লম্বা চিঠি লিখতে বসেছি। কেন লিখতে বসেছি তা চিঠি শেষ পর্যন্ত পড়লেই বুঝতে পারবে। মহাবলেশ্বর নামক শৈলপুরীর সহ্যাদ্রি হোটেলে রাত্রি দশটার পর মোমবাতি জেবলে এই চিঠি লিখছি। বাইরে শীতজর্জর অন্ধকার; আমি ঘরের দোর-জানালা বন্ধ করে লিখছি, তবু শীত আর অন্ধকারকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। মোমবাতির শিখাটি থেকে থেকে নড়ে উঠছে; দেয়ালের গায়ে নিঃশব্দ ছায়া পা টিপে টিপে আনাগোনা করছে। ভৌতিক পরিবেশ। আমি অতিপ্রাকৃতকে সারা জীবন দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি, কিন্তু—

অনেক দিন আগে একবার মুঙ্গেরে গিয়ে বরদাবাবু নামক একটি ভূতজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মনে আছে? আমি তাঁকে বলেছিলাম— ভূত প্রেত থাকে থাক, আমি তাদের হিসেবের বাইরে রাখতে চাই। এখানে এসে কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেছি, ওদের আর হিসেবের বাইরে রাখা যাচ্ছে না।

কিন্তু থাক। গল্প বলার আর্ট জানা নেই বলেই বোধ হয় পরের কথা আগে বলে ফেললাম। এবার গোড়া থেকে শুরু করি—

যে-কাজে বোম্বাই এসেছিলাম সে কাজটা শেষ করতে দিন চারেক লাগল। ভেবেছিলাম কাজ সেরেই ফিরব, কিন্তু ফেরা হল না। কর্মসূত্রে একজন উচ্চ পুলিস কর্মচারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, মারাঠী ভদ্রলোক, নাম বিষ্ণু বিনায়ক আপ্টে। তিনি বললেন, 'বম্বে এসেছেন, পুণা না দেখেই ফিরে যাবেন?'

প্রশ্ন করলাম, 'পুণায় দেখবার কী আছে?'

তিনি বললেন, 'পুণা শিবাজী মহারাজের পীঠস্থান, সেখানে দেখবার জিনিসের অভাব? সিংহগড়, শনিবার দুর্গ, ভবানী মন্দির—'

ভাবলাম এদিকে আর কখনও আসব কি না কে জানে, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। বললাম, 'বেশ যাব।'

আপ্টের মোটরে চড়ে বেরুলাম। বোম্বাই থেকে পুণা যাবার পাকা মোটর-রাস্তা আছে, সহ্যাদ্রির গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে গিয়েছে।

এখানকার নৈসর্গিক বর্ণনা করা আমার কর্ম নয়। এক পাশে উত্তুঙ্গ শিখর, অন্য পাশে অতলস্পর্শ খাদের কোলে সবুজ উপত্যকা। তুমি যদি দেখতে, একটা চম্পূকাব্য লিখে ফেলতে।

পুণায় আপ্টের বাড়িতে উঠলাম। সাহেবী কায়দাকানুন আদর যত্নের সীমা নেই। আমাকে আপ্টে যে এত খাতির করছেন তার পিছনে আপ্টের স্বাভাবিক সহৃদয়তা তো আছেই বোধ হয় বোম্বাই প্রাদেশিক সরকারের ইশারাও আছে। সে যাক। পুণায় বোম্বাই এর চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা কারণ বোম্বাই শহর সমুদ্রের সমতলে, আর পুণা সমুদ্র থেকে প্রায় দু'হাজার ফুট উঁচুতে। পুণার ঠাণ্ডায় কিন্তু বেশ একটি চনমনে ভাব আছে শরীর মনকে চাঙ্গা করে তোলে জড়ভরত করে ফেলে না।

পুণায় তিন দিন থেকে দর্শনীয় যা কিছু আছে সব দেখলাম। তারপর আপ্টে বললেন 'পুণায় এসে মহাবলেশ্বর না দেখে চলে যাবেন?'

আমি বললাম 'মহাবলেশ্বর! সে কাকে বলে?'

আপ্টে হেসে বললেন 'একটা জায়গার নাম। বম্বে প্রদেশের সেরা হিল স্টেশন। আপনাদের যেমন দার্জিলিং আমাদের তেমনি মহাবলেশ্বর। পুণা থেকে আরও দু'হাজার ফুট উঁচু। গরমের সময় বম্বের সবাই মহাবলেশ্বরে যায়।'

'কিন্তু শীতকালে তো যায় না। এখন ঠাণ্ডা কেমন?'

'একেবারে হোম ওয়েদার। চলুন চলুন ভালো লাগবে।'

অতএব মহাবলেশ্বরে এসেছি এবং বেশ মজা টের পাচ্ছি।

পুণা থেকে মহাবলেশ্বর বাহাত্তর মাইল মোটরে আসতে হয়। আমরা পুণা থেকে বেরুলাম দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর মহাবলেশ্বরে পৌঁছুলাম আন্দাজ চারটের সময়। পৌঁছে দেখি শহর শূন্য দু'চারজন স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া সবাই পালিয়েছে। সত্যিই হোম ওয়েদার দিনের বেলায় হি হি কম্প রাত্রে হি হি কম্প। ভাগ্যিস আপ্টে আমার জন্যে একটা মোটা ওভারকোট এনেছিলেন নৈলে শীত ভাঙতো না।

শহরের বর্ণনা দেব না, মনে কর দার্জিলিঙের ছোট ভাই। আপ্টে আমাকে নিয়ে সহ্যাদ্রি হোটেলে উঠলেন। হোটেলে একটিও অতিথি নেই কেবল হোটেলের মালিক দু'তিন জন চাকর নিয়ে বাস করছেন।

হোটেলের মালিক জাতে পার্সী, নাম সোরাব হোর্মজি। আপ্টের পুরানো বন্ধু। মধ্যবয়স্ক লোক মোটাসোটা, টকটকে রঙ। বিষয়বুদ্ধি নিশ্চয় আছে নৈলে হোটেল চালানো যায় না কিন্তু ভারি অমায়িক প্রকৃতি। আপ্টে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে খুব সমাদর করে নিজের বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। অবিলম্বে কফি এসে পড়ল, তার সঙ্গে নানারকম প্যাস্ট্রি। ভাল কথা, তুমি বোধ হয় জান না, গোঁড়া পার্সীরা ধূমপান করে না, কিন্তু মদ খায়। মদ না খেলে তাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে।

কফি-পর্ব শেষ না হতে হতে সূর্যাস্ত হয়ে গেল। অতঃপর আপ্টে আমাকে হোটেলে রেখে মোটর নিয়ে বেরুলেন, এখানে তাঁর কে একজন আত্মীয় আছে তার সঙ্গে দেখা করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবেন। তিনি চলে যাবার পর হোর্মজি মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি বাঙালী। শুনে আশ্চর্য হবেন মাস দেড়েক

আগে পর্যন্ত, এই হোটেলের মালিক ছিলেন একজন বাঙালী।'

আশ্চর্য হলাম। বললাম, 'বলেন কি! বাঙালী এতদূরে এসে হোটেল খুলে বসেছিল!'

'হোমজি বললেন, 'হ্যাঁ। তবে একলা নয়। তাঁর একজন গুজরাতী অংশীদার ছিল।'

এই সময় একটা চাকর এসে অবোধ্য ভাষায় তাকে কি বলল, তিনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কি স্নান করবেন? যদি করেন, গরম জল তৈরি আছে।'

বললাম,—'রক্ষে করুন, এই শীতে স্নান! একেবারে বোম্বাই গিয়ে স্নান করব।'

চাকর চলে গেল। তখন আমি হোমজিকে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, আপনি তো বম্বের লোক? তাহলে এই শীতে এখানে রয়েছেন কেন? এখানে তো কাজকর্ম এখন কিছু নেই।'

হোমজি বললেন, 'কাজকর্ম আছে বৈকি। মার্চ মাস থেকে হোটেল খুলবে, অতিথিরা আসতে শুরু করবে। তার আগেই বাড়িটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ফিট্-ফাট করে তুলতে হবে। তাছাড়া বাড়ির পিছন দিকে গোলাপের বাগান করেছি। চলুন না দেখবেন। এখনও দিনের আলো আছে।'

বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে বাগান দেখলাম। বাগান এখনও তৈরি হয়নি, তবে মাসখানেকের মধ্যে ফুল ফুটতে আরম্ভ করবে। হোমজির ভারি বাগানের শখ।

এইখানে সহ্যাদ্রি হোটেলের একটা বর্ণনা দিয়ে রাখি। চুনকাম করা পাথরের দোতলা বাড়ি, সবসুদ্ধ বারো-চৌদ্দটা বড় বড় ঘর আছে। সামনে দিয়ে গেল-মাটি ঢাকা রাস্তা গিয়েছে; পিছন দিকে গোলাপ বাগানের জমি, লম্বায় চওড়ায় কাঠা চারেক হবে। তারপরই গভীর খাদ, শুধু গভীর নয়, খাড়া নেমে গিয়েছে। পাথরের মোটা আলসের উপর ঝুঁকে উঁকি মারলে দেখা যায়, অনেক নিচে ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে একটা সরু ঝরনার ধারা বয়ে গেছে।

আমরা বাগান দেখে ফিরছি এমন সময় খাদের নিচে থেকে একটা গভীর আওয়াজ উঠে এল। অনেকটা মোষের ডাকের মত। নিচে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার, ওপরে একটু আলো আছে, আমি জিগ্যেস করলাম, 'ও কিসের আওয়াজ?'

হোমজি বললেন, 'বাঘের ডাক। আসুন, ভেতরে যাওয়া যাক।'

ঘরে বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে; চাকর একটা গনগনে কয়লার আংটা মেঝের উপর রেখে গেছে। আমরা আংটার কাছে চেয়ার টেনে বসলাম। ঠান্ডা আঙুলগুলোকে আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'এদিকে বড় বাঘ আছে

হোমজি বললেন, 'আছে। তাছাড়া চিতা আছে, হায়েনা আছে, নে আছে। যে বাঘটার ডাক আজ শুনলেন সেটা মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে কিনা, তাই এ তল্লাট ছেড়ে যেতে পারছে না।'

'মানুষখেকো বাঘ! কত মানুষ খেয়েছে?'

'আমি একটার কথাই জানি। ভারি লোমহর্ষণ কাণ্ড! শুনবেন?'

এই সময় আপ্টে ফিরে এলেন, লোমহর্ষণ কাণ্ড চাপা পড়ে গেল। আপ্টে বললেন, তাঁর আত্মীয় ছাড়ছেন না, আজ রাত্রে তাঁকে সেখানেই ভোজন এবং শয়ন

করতে হবে। কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে তিনি উঠলেন, আমাকে বললেন, 'কাল সকাল ন'টার মধ্যে আমি আসব। আপনি ব্রেক্‌ফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে থাকবেন, দু'জনে বেরুব। এখানে অনেক দেখবার জায়গা আছে: বম্বে পয়েণ্ট, আর্থার্স সীট, প্রতাপগড় দুর্গ—'

তিনি চলে গেলেন। আমরা আরও খানিকক্ষণ বসে এটা-সেটা গল্প করলাম। এখানে এখন শাকসব্জি-দুধ-ডিম-মুর্গী খুব সস্তা, আবার গরমের সময় দাম চড়বে।

কথায় কথায় হোর্মাজি বললেন, 'আপনার ভূতের ভয় নেই তো?'

আমি হেসে উঠলাম। তিনি বললেন, 'কারুর কারুর থাকে। একলা ঘরে ঘুমোতে পারে না। তাহলে আপনার শোবার ব্যবস্থা যদি দোতলায় করি আপনার অসুবিধা হবে না?'

বললাম, 'বিন্দুমাত্র না। আপনি কোথায় শোন?'

তিনি বললেন, 'আমি নিচেয় শুই। আমার বসবার ঘরের পাশে শোবার ঘর। আপনাকে ওপরে দিচ্ছি তার কারণ, এখন সব ঘরের বিছানাপত্র তুলে গুদামে রাখা হয়েছে। অতিথি তো নেই। কেবল দোতলার একটা ঘর সাজানো আছে। তাতে হোটেলের ভূতপূর্ব মালিক সস্ত্রীক থাকতেন। ঘরটা যেমন ছিল তেমনি আছে।'

বললাম, 'বেশ তো, সেই ঘরেই শোব।'

হোর্মাজি চাকরকে ডেকে হুকুম দিলেন, চাকর চলে গেল, তারপর আটটা বাজলে আমরা খেতে বসলাম। এরি মধ্যে মনে হল যেন কত রাত হয়ে গেছে চারিদিক নিষুতি। বাড়িতে যদি ডাকাত পড়ে, মা বলতেও নেই, বাপ বলতেও নেই। গল্প শোনার এই উপযুক্ত সময়। বললাম, 'আপনার লোমহর্ষণ কাণ্ড কৈ বললেন না?'

হোর্মাজি বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভারি রোমাঞ্চকর ব্যাপার। এই বাড়িতেই ঘটেছিল আগেকার দুই মালিকের মধ্যে। বলি শুনুন।'

হোর্মাজি বলতে আরম্ভ করলেন। খাওয়া এবং গল্প একসঙ্গে চলতে লাগল। হোর্মাজি বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলতে পারেন, তাড়াহুড়ো নেই। তাঁর মাতৃভাষা অবশ্য গুজরাতী, কিন্তু ইংরেজীতেই বরাবর কথাবার্তা চলছিল। গল্পটাও ইংরেজীতেই বললেন। আমি তোমার জন্যে বাংলায় সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করে দিলাম।—

বছর ছয়েক আগে মানেকভাই মেহতা নামে একজন গুজরাতী আর বিজয় বিশ্বাস নামে একজন বাঙালী মহাবলেশ্বরে এই সহ্যাদ্রি হোটেল খুলেছিল। দু'জনে সমান অংশীদার; মেহতার টাকা আর বিজয় বিশ্বাসের মেহনত। এই নিয়ে হোটেল আরম্ভ হয়।

মানেক মেহতার অনেক কাজ-কারবার, সে মহাবলেশ্বরে থাকত না; তবে মাঝে মাঝে আসত। বিজয় বিশ্বাসই হোটেলের সর্বেসর্বা ছিলেন। কিন্তু আসলে হোটেলের দেখাশোনা করতেন বিজয় বিশ্বাসের স্ত্রী হৈমবতী। বিজয় বিশ্বাস কেবল ঘরে বসে সিগারেট টানতেন আর হিসেব-নিকেশ করতেন।

মানেক মেহতা লোকটা ছিল প্রচণ্ড পাজি। অবশ্য তখন তার সম্বন্ধে কেউ কিছু জানত না, তাকে ভাল করে কেউ চোখে দেখেনি। পরে সব জানা গেল।

তার তিনটে বৌ ছিল, একটা গোয়ায়, একটা বম্বেতে, আর একটা আমেদাবাদে। এই তিন জায়গায় বেশির ভাগ সময় সে থাকত। যত রকম বে-আইনী দুষ্কার্য করাই ছিল তার পেশা। বোম্বাই প্রদেশে মদ্যপান নিষিদ্ধ, লোকটি বুট্‌লেগিং করত। বিদেশ থেকে লুকিয়ে সোনা আমদানি করত। অনেকবার তার মাল বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কিন্তু লোকটাকে কেউ ধরতে পারেনি।

বিজয় বিশ্বাসের সঙ্গে মানেক মেহতার জোটপাট কি করে হল বলা যায় না। বিজয় বিশ্বাস্ লোকটা ও রকম ছিল না। যতদূর জানা যায়, বিজয় বিশ্বাস আগে থেকেই হোটেল চালানোর কাজ জানত; হয়তো পুণায় কিম্বা বোম্বাইএ কিংবা আমেদাবাদে ছোট-খাট হোটেল চালাত। তারপর সে মানেক মেহতার নজরে পড়ে যায়। মানেক মেহতা যে ধরনের ব্যবসা করে তাতে কখনও হাতে অঢেল পয়সা, কখনও ভাঁড়ে মা ভবানী। সে বোধ হয় মতলব করেছিল হোটেল কিনে কিছু টাকা আলাদা করে রাখবে, যাতে সংকটকালে হাতে একটা রেস্ত থাকে। বিজয় বিশ্বাস তার প্রকৃত চরিত্র জানতেন না, সরল মনেই তার অংশীদার হয়েছিলেন।

বিজয় বিশ্বাস আর তাঁর স্ত্রীর ম্যানেজমেণ্টে সহ্যাদ্রি হোটেল অল্পকালের মধ্যেই বেশ জাঁকিয়ে উঠল। মহাবলেশ্বরে হোটেলের মরসুম হচ্ছে আড়াই মাস, টেনেটুনে তিন মাস। কিন্তু এই কয় মাসের মধ্যেই হোটেলের আয় হয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা, খরচ-খরচা বাদ দিয়ে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা লাভ থাকে; মানেক মেহতা মরসুমের শেষে এসে কখনও নিজের ভাগের টাকা নিয়ে যেত, কখনও বা টাকা ব্যাঙ্কেই জমা থাকত।

সোরাব হোর্মাজি প্রতি বছরই গরমের সময় মহাবলেশ্বরে আসতেন এবং সহ্যাদ্রি হোটেলে উঠতেন। হোটেলটি তাঁর খুব পছন্দ। মনে মনে ইচ্ছে ছিল এই রকম একটি হোটেল পেলে নিজে চালাবেন। তিনি পয়সাওয়ালা লোক, জীবিকার জন্যে কাজ করবার দরকার নেই। কিন্তু ব্যবসা করার প্রবৃত্তি পার্সীদের মজ্জাগত।

গত বছর মে মাসে হোর্মাজি যথারীতি এসেছেন। পুরনো খদ্দের হিসেবে হোটেলে তাঁর খুব খাতির, স্বয়ং হৈমবতী তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করতেন। হোর্মাজিও হৈমবতীর নিপুণ গৃহস্থালির জন্যে তাঁকে খুব সম্মান করতেন। একদিন হৈমবতী বিমর্ষভাবে হোর্মাজিকে বললেন, 'শেঠজি, আসছে বছর আপনি যখন আসবেন তখন আমাদের আর দেখতে পাবেন না।'

হোর্মাজি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কি, দেখতে পাব না কেন?'

হৈমবতী বললেন, 'হোটেল বিক্রি করার কথা হচ্ছে। যিনি আমাদের পার্টনার তিনি হোটেল রাখবেন না। আমরাও চলে যাব। আমার স্বামীর এত ঠাণ্ডা সহ্য হচ্ছে না, আমরা দেশে ফিরে যাব।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলা হোর্মাজি হোটেলের অফিস-ঘরে গিয়ে বিজয় বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করলেন, বললেন, 'আপনারা নাকি হোটেল বিক্রি করছেন?'

বিজয় বিশ্বাসের বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, স্ত্রীর চেয়ে অনেক বড়। একটু কাহিল গোছের চেহারা; আপাদমস্তক গরম জামাকাপড় পরে, গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে বসে সিগারেট টানছিলেন, হোর্মাজিকে খাতির করে বসালেন। বললেন, 'হ্যাঁ শেঠজি! আপনি কিনবেন?'

হোমজি বললেন, 'ভাল দর পেলে কিনতে পারি। আপনার পার্টনার কোথায়?'

বিশ্বাস বললেন, 'আমার পার্টনার এখন বিদেশে আছেন, তাই আমাকে আম-মোক্তারনামা দিয়েছেন। এই দেখুন।' তিনি দেরাজ থেকে পাওয়ার অফ্ অ্যাটর্নি বার করে দেখালেন।

তারপর দর-কষাকষি আরম্ভ হল; বিজয় বিশ্বাস হাঁকলেন দেড় লাখ, হোমজি বললেন, পঞ্চাশ হাজার। শেষ পর্যন্ত চুরাশি হাজারে রফা হল। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি কেনা তো দু'চার দিনের কাজ নয়; দলিল দস্তাবেজ তদারক করা, উকিল অ্যাটর্নির সঙ্গে পরামর্শ করা, রেজিস্ট্রি অফিসে খোঁজ খবর নেওয়া; এইসব করতে কয়েক মাস কেটে গেল। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি হোমজি আর বিজয় বিশ্বাস পুণায় গেলেন, রেজিস্ট্রারের সামনে হোমজি নগদ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রি করালেন। কথা হল, পয়লা ডিসেম্বর তিনি হোটেলের দখল নেবেন। তারপর হোমজি বোম্বাই গেলেন, বিজয় বিশ্বাস মহাবলেশ্বরে ফিরে এলেন।

হোটেলে তখন অতিথি নেই, একটা চাকরানী ছাড়া চাকরবাকরও বিদেয় হয়েছে। তাই এরপর যেসব ঘটনা ঘটেছিল, তা কেবল হৈমবতীর জবানবন্দী থেকেই জানা যায়। মানেক মেহতা নিশ্চয় নিজে আড়ালে থাকবার মতলব করেই বিজয় বিশ্বাসকে মোক্তারনামা দিয়েছিল। যেদিন কবালা রেজিস্ট্রি হল, তার পরদিন রাত্রি ন'টার সময় সে সহ্যাদ্রি হোটেলে এসে হাজির। পরে পুলিসের তদন্তে জানা গিয়েছিল মানেক মেহতা মহাবলেশ্বরের বাইরে দু মাইল দূরে মোটর রেখে পায়ে হেঁটে মহাবলেশ্বরে ঢুকেছিল।

সে যখন পৌঁছুল তখন বিজয় বিশ্বাস আর হৈমবতী রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সেরে অফিস-ঘরে বসে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করছিলেন। চাকরানীটা শুতে গিয়েছিল। তখন বেশ শীত পড়ে গেছে। মানেক মেহতার গায়ে মোটা ওভারকোট, মাথায় পশমের মাঙ্কি-ক্যাপ। তার ব্যবহার বরাবরই খুব মিষ্টি। সে এসে বলল, 'হৈমাবেন, আমি আজ রাত্রে এখানেই থাকব, আর খাব। সামান্য কিছু হলেই চলবে।'

হৈমবতী খাবারের ব্যবস্থা করতে রান্নাঘরে চলে গেলেন, চাকরানীকে আর জাগালেন না। মানেক মেহতা আর বিজয় বিশ্বাস কাজকর্মের কথা শুরু করলেন। অফিস-ঘরে একটা মজবুত লোহার সিন্দুক ছিল, হোটেল বিক্রির টাকা এবং ব্যাঙ্কের জমা টাকা, সব এই সিন্দুকেই রাখা হয়েছিল। বিজয় বিশ্বাস জানতেন দু'এক দিনের মধ্যেই মেহতা টাকা নিতে আসবে।

হৈমবতী রান্নাঘরে গিয়ে স্টোভ জেলে ভাজাভুজি তৈরি করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর কান পড়ে রইল অফিস-ঘরের দিকে। রান্নাঘর অফিস-ঘর থেকে বেশী দূর নয়, তার ওপর নিস্তব্ধ রাত্রি। কিছুক্ষণ পরে তিনি শুনতে পেলেন, ওঁরা দু'জন অফিস্-ঘর থেকে বেরিয়ে কথা বলতে বলতে হোটেলের পিছন দিকের জমিতে চলে গেলেন। হৈমবতীর একটু আশ্চর্য লাগল; কারণ তাঁর স্বামী শীত-কাতুরে মানুষ, এত শীতে খোলা হাওয়ায় যাওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু হৈমবতীর মনে কোনও আশঙ্কাই ছিল না, তিনি রান্নাঘর থেকে বেরুলেন না, যেমন রান্না করছিলেন করতে লাগলেন।

তারপর হোটেলের পিছন দিক থেকে একটা চাপা চিৎকারের শব্দ শুনে তিনি

একেবারে কাঠ হয়ে গেলেন। তাঁর স্বামীর গলার চিৎকার। ক্ষণকাল স্তম্ভিত অবস্থায় থেকে তিনি ছুটে গেলেন হোটেলের পিছন দিকে। পিছনের জমিতে যাবার একটা দরজা আছে, হৈমবতী দরজার কাছে পৌঁচেছেন, এমন সময় মানেক মেহতা ওদিক থেকে ঝড়ের মত এসে ঢুকল। হৈমবতীকে সজোরে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে সদরের দিকে চলে গেল।

'কি হল! কি হল!' বলে হৈমবতী পিছনের জমিতে ছুটে গেলেন। সেখানে কেউ নেই। হৈমবতী তখন স্বামীর খোঁজে অফিস-ঘরের দিকে ছুটলেন। সেখানে দেখলেন লোহার সিন্দুকের কবাট খোলা রয়েছে, তার ভিতর থেকে নোটের বাণ্ডিল সব অন্তর্হিত হয়েছে। প্রায় দেড় লাখ টাকার নোট।

এতক্ষণে হৈমবতী প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পারলেন ঃ মানেক মেহতা' তাঁর স্বামীকে ঠেলে খাদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে আর সমস্ত টাকা নিয়ে পালিয়েছে। তিনি চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।—

ভাই, অজিত আজ এইখানেই থামতে হল। ঘরের মধ্যে অশরীরীর উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। কাল বাকি চিঠি শেষ করব।

৪ঠা জানুয়ারি। কাল চিঠি শেষ করতে পারিনি, আজ রাত্রি দশটার পর মোমবাতি জ্বালিয়ে আবার আরম্ভ করেছি। হোমজি খেতে বসে গল্প বলছিলেন। গল্প শেষ হবার আগেই খাওয়া শেষ হল, আমরা বসবার ঘরে উঠে গেলাম। চাকর কফি দিয়ে গেল।

হোমজি আবার বলতে শুরু করলেন। আমি আজ আরও সংক্ষেপে তার পুনরাবৃত্তি করছি।—

হৈমবতীর যখন জ্ঞান হল তখন দশটা বেজে গেছে, ইলেকট্রিক বাতি নিভে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার। হৈমবতী চাকরানীকে জাগালেন; কিন্তু সে রাত্রে বাইরে থেকে কোনও সাহায্যই পাওয়া গেল না। পুলিস এল পরদিন সকালে।

পুলিসের অনুসন্ধানে বোঝা গেল হৈমবতীর অনুমান ঠিক। হোটেলের পিছনে খাদের ধারে মানুষের ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়েছে। দু'চার দিন অনুসন্ধান চালাবার পর আরও অনেক খবর বেরুল। মানেক মেহতা ডুব মেরেছে। সে পাকিস্তান থেকে তিন লক্ষ টাকার সোনা আমদানি করেছিল, কাস্টম্সের কাছে ধরা পড়ে যায়। মানেক মেহতা ধরা না পড়লেও একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। তাই অংশীদারকে খুন করে সে প্রায় দেড় লাখ টাকা হাতিয়েছে।

এদিকে খাদের তলা থেকে বিজয় বিশ্বাসের লাশ উদ্ধার করা দরকার। কিন্তু এমন দুর্গম এই খাদ যে, সেখানে পৌঁছুনো অতি কষ্টকর ব্যাপার। উপরন্তু সম্প্রতি একজোড়া বাঘ এসে খাদের মধ্যে আড্ডা গেড়েছে। গভীর রাত্রে তাদের হাঁকার শোনা যায়। যা হোক কয়েকজন পাহাড়ীকে নিয়ে তিনদিন পরে পুলিস খাদে নেমে দেখল বিজয় বিশ্বাসের দেহের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই: কয়েকটা হাড়গোড় আর রক্তমাখা কাপড়জামা, গলাবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে তারা ফিরে এল। পুলিসের মনে আর কোনও সংশয় রইল না, মানেক মেহতার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া জারি করল।

ক্রমে ১লা ডিসেম্বর এসে পড়ল। নিঃস্ব বিধবার অবস্থা বুঝতেই পারছো।

হোমজি দয়ালু লোক, হৈমবতীকে কিছু টাকা দিলেন। হৈমবতী চোখের জল মুছতে মুছতে মহাবলেশ্বর থেকে চিরবিদায় নিলেন।

তারপর মাসখানেক কেটে গেছে। পুলিস এখনও মানেক মেহতার সন্ধান পায়নি। বাঘ আর বাঘিনী কিন্তু এখনও খাদের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের রক্তের স্বাদ তারা পেয়েছে, এ স্থান ছেড়ে যেতে পারছে না।

হোমজির গল্প শুনে মনটা একটু খারাপ হল। বাঙালীর সন্তান সুদূর বিদেশে এসে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তা কপালে সইল না। হৈমবতীর অবস্থা আরও শোচনীয়। মানেক মেহতাকে পুলিস ধরতে পারবে কিনা কে জানে; ভারতবর্ষের বিশাল জনসমুদ্র থেকে একটি পুঁটিমাছকে ধরা সহজ নয়।

এই সব ভাবছি এমন সময় হঠাৎ ইলেকট্রিক বাতি নিভে গেল। বললাম, 'এ কি!'

হোমজি বললেন, 'দশটা বেজেছে। এখানে রাত্রি দশটার সময় ইলেকট্রিক বন্ধ হয়ে যায়, আবার শেষ রাত্রে কিছুক্ষণের জন্যে জ্বলে! চলুন, আপনাকে আপনার শোবার ঘরে পৌঁছে দিই।'

হোমজির একটা লম্বা গদার মত ইলেকট্রিক টর্চ আছে, সেটা হাতে নিয়ে তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। দোতলায় এক সারি ঘর, সামনে টানা বারান্দা। সব ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে, কেবল কোণের ঘরের দরজা খোলা। চাকর ঘরে মোমবাতি জ্বেলে রেখে গেছে। (ভাল কথা, এদেশে মোমবাতিকে মেমবাতি বলে; ভারি কবিত্বপূর্ণ নাম, নয়?)

বেশ বড় ঘর; সামনে বারান্দা, পাশে ব্যাল্‌কনি। ঘরের দু'পাশে দু'টো খাট রয়েছে; একটাতে বিছানা পাতা, অন্যটা উলঙ্গ পড়ে আছে। ঘরের মাঝ-খানে একটা বড় টেবিল আর দু'টো চেয়ার, দেয়ালের গায়ে ঠেকানো ওয়ার্ডরোব। টেবিলের উপর একটি অ্যালার্ম টাইমপীস্। এক বান্ডিল মোমবাতি, দেশলাই, একটা থার্মোফ্লাস্কে গরম কফি; রাত্রে যদি তেষ্টা পায়, খাব। হোমজি অতিথি সৎকারের ত্রুটি রাখেননি।

হোমজি বললেন, 'এই ঘরে বিজয় বিশ্বাস স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। হৈমবতী চলে যাবার পর ঘরটা যেমন ছিল তেমনি আছে। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না তো?'

বললাম, 'অসুবিধে কিসের। খুব আরামে থাকব। আপনি যান, এবার শুয়ে পড়ুন গিয়ে। এখানে বোধ হয় সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়াই রেওয়াজ।'

হোমজি হেসে বললেন, 'শীতকালে তাই বটে। কিন্তু সকাল আটটা ন'টার আগে কেউ বিছানা ছাড়ে না। আপনি যদি আগে উঠতে চান, ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখবেন। এই টর্চটা রাখুন, রাত্রে যদি দরকার হয়।'

'ধন্যবাদ।'

হোমজি নেমে গেলেন। আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। মোমবাতির আলোয় ঘরটা আবছায়া দেখাচ্ছে। আমি টর্চটা জ্বালিয়ে ঘরময় একবার ঘুরে বেড়ালাম। আমার সুটকেস চাকর ওআর্ডরোবের পাশে রেখে গেছে। ওআর্ডরোব খুলে দেখলাম সেটা খালি। এসেন্স-কর্পূর-ন্যাপথলিন্ মেশা একটা গন্ধ নাকে এল। হৈমবতী এই ওআর্ডরোবেই নিজের কাপড়চোপড় রাখতেন। ঘরের পিছন দিকে একটা সরু দরজা রয়েছে, খুলে দেখলাম গোসলখানা। আবার বন্ধ করে দিলাম।

তারপর চেয়ারে এসে বসে সিগারেট ধরালাম।

ঘরের দরজা-জানালা সবই বন্ধ, তবু যেন একটা বরফজমানো ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশীক্ষণ বসে থাকা চলবে না; তাড়াতাড়ি সিগারেট শেষ করে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিলাম, সাড়ে সাতটার সময় ঘুম ভাঙলেই যথেষ্ট। আপ্টে আসবেন ন'টার সময়।

টর্চটা বালিশের পাশে নিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে বিছানায় ঢুকলাম। বিছানায় দু'টো মোটা মোটা গদি, গোটা চারেক বিলিতী কম্বল; একেবারে রাজশয্যা। ক্রমশঃ কম্বলের মধ্যে শরীর গরম হতে লাগল। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

আশ্চর্য এই যে, প্রথম রাত্রে ঘুমোবার আগে পর্যন্ত অতিপ্রাকৃত কোনও ইশারা-ইঙ্গিত পাইনি।

ঘুম ভাঙল ঝন্‌ঝন অ্যালার্মের শব্দে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। ঘর অন্ধকার, কোথায় আছি মনে করতে কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল। তারপর মনে পড়ল। কিন্তু এত শীগ্‌গির সাড়ে সাতটা বেজে গেল! কৈ জানালার শার্সি দিয়ে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে না তো!

টর্চ জ্বেলে ঘড়ির উপর আলো ফেললাম। চোখে ঘুমের জড়তা রয়েছে, মনে হল ঘড়িতে দু'টো বেজেছে। কিন্তু অ্যালার্ম ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে বেজে চলেছে।

কি রকম হল! আমি কম্বল ছেড়ে উঠলাম, টেবিলের কাছে গিয়ে ঘড়ির উপর আলো ফেলে দেখলাম সত্যিই দু'টো। তবে অ্যালার্ম বাজল কি করে? অ্যালার্মের কাঁটা ঘোরাতে কি ভুল করেছি?

ঘড়িটা হাতে তুলে নিতেই বাজনা থেমে গেল। দেখলাম অ্যালার্মের কাঁটা ঠিকই সাড়ে সাতটার উপর আছে।

হয়তো ঘড়িটাতে গলদ আছে, অসময়ে অ্যালার্ম বাজে। আমি ঘড়ি রেখে আবার বিছানায় ঢুকলাম। অনেকক্ষণ ঘুম এল না। তারপর আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

এই হল প্রথম রাত্রির ঘটনা।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে হোমজিকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনার টাইমপীসে কি অসময়ে অ্যালার্ম বাজে?'

তিনি ভুরু তুলে বললেন, 'কৈ না! কেন বলুন তো?'

বললাম। তিনি শুনে উদ্বিগ্ন মুখে একটু চুপ করে রইলেন; তারপর বললেন, 'হয়তো সম্প্রতি খারাপ হয়েছে। আমার অন্য একটা অ্যালার্ম ঘড়ি আছে, সেটা আজ রাত্রে আপনাকে দেব।'

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় চাকর একটা চিঠি এনে আমার হাতে দিল।

আপ্টের চিঠি। তিনি লিখেছেন, কাল রাত্রে হঠাৎ পা পিছলে গিয়ে তাঁর পায়ের গোছ মচ্‌কে গেছে, নড়ার ক্ষমতা নেই; আমরা যদি দয়া করে আসি।

চিঠি হোমজিকে দেখালাম। তিনি মুখে চুক্‌চুক্‌ শব্দ করে বললেন, 'চলুন, দেখে আসি।'

জিগ্যেস করলাম, 'কত দূর?'

'মাইল দুই হবে। বাজারের মধ্যে। এখানে মহারাষ্ট্র ব্যাঙ্কের একটা ব্রাঞ্চ আছে, আপ্টের আত্মীয় তাঁর ম্যানেজার। ব্যাঙ্কের উপরতলায় থাকেন।'

ব্রেকফাস্ট সেরে বেরুলাম। হোমজির একটি ছোটখাটো স্ট্যাণ্ডার্ড মোটর আছে, তাইতে চড়ে গেলাম; ব্যাঙ্কের বাড়িটা দোতলা, বাড়ির পাশ থেকে খোলা সিঁড়ি ওপরে উঠেছে। আমরা ওপরে উঠে গেলাম।

আপ্টে বালিশের ওপর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পা তুলে দিয়ে খাটে শুয়ে আছেন, আমাদের দেখে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, 'কী কাণ্ড দেখুন দেখি! কোথায় আপনাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াব, তা নয় একেবারে শয্যাশায়ী।'

আমরা খাটের পাশে চেয়ারে বসলাম, 'কি হয়েছিল?'

আপ্টে বললেন, 'রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনলাম, দরজায় কে খুট্‌খুট্ করে টোকা মারছে। বিছানা ছেড়ে উঠলাম, কিন্তু দোর খুলে দেখি কেউ নেই। আবার দোর বন্ধ করে ফিরছি, পা মুচড়ে পড়ে গেলাম। বাঁ পা-টা স্প্রেন্ হয়ে গেল।'

'আর কোথাও লাগেনি তো?'

'না, আর কোথাও লাগেনি। কিন্তু—' আপ্টে একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আশ্চর্য! আমি হোঁচট্ খাইনি, পায়ে কাপড়ও জড়িয়ে যায়নি। ঠিক মনে হল কেউ আমাকে পিছন থেকে ঠেলে দিলে।'

আমার কি মনে হল, জিগ্যেস করলাম, 'রাত্রি তখন ক'টা?'

'ঠিক দুটো।'

এ বিষয়ে আর কথা হল না, গৃহস্বামী এসে পড়লেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হলেও অনন্তরাও দেশপাণ্ডে বেশ ফুর্তিবাজ লোক। আজকাল ব্যাঙ্কের কাজ-কর্ম নেই বললেই হয়। তিনি আমাদের সঙ্গে আড্ডা জমালেন। আপ্টের পা ভাঙা নিয়ে খানিকটা ঠাট্টা-তামাশা হল, গরম গরম চিঁড়েভাজা আর পোট্যাটো-চিপ্‌স্ দিয়ে আর এক প্রস্থ কফি হল। তারপর আমরা উঠলাম। আপ্টে কাতরভাবে বললেন, 'ভেবেছিলাম মিস্টার বক্সীকে মহাবলেশ্বর ঘুরিয়ে দেখাব, তা আর হল না। দু'তিন দিন মাটিতে পা রাখতেই পারব না।'

হোমজি বললেন, 'তাতে কি হয়েছে, আমি ওঁকে মহাবলেশ্বর দেখিয়ে দেব। আমার তো এখন ছুটি।'

কাল আবার আসব বলে আমরা চলে এলাম। দুপুরবেলা লাঞ্চ খেয়ে হোমজির সঙ্গে বেরুলাম। কাছাকাছি কয়েকটা দর্শনীয় স্থান আছে। একটি হ্রদ আছে, তাতে মোটর-লঞ্চ চড়ে বেড়ালাম। মহাবলেশ্বরের মধু বিখ্যাত, কয়েকটি মধুর কারখানা দেখলাম; মৌমাছি মধু তৈরি করছে আর মানুষ তাই বিক্রি করে পয়সা রোজগার করছে। মৌমাছিদের খেতে দিতে হয় না, মজুরি দিতে হয় না, একটি ফুলের বাগান থাকলেই হল।

কিন্তু যাক, বাজে কথা লিখে চিঠি বড় করব না। এখনও আসল কথা সবই বাকি। হোমজির কাছ থেকে একটা চিঠির কাগজের প্যাড্ যোগাড় করেছি, তা প্রায় ফুরিয়ে এল।

সে রাত্রে দশটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে শুতে গেলাম। চাকর সব ঠিকঠাক করে রেখে গিয়েছে। দেখলাম পুরনো ঘড়ির বদলে একটা নতুন অ্যালার্ম ঘড়ি রেখে গেছে। আমি এতে আর দম দিলাম না, অ্যালার্মের চাবিটা এঁটে বন্ধ করে দিলাম। অ্যালার্মের দরকার নেই, যখন ঘুম ভাঙবে তখন উঠব।

আলো নেভার আগেই শুয়ে পড়লাম।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, শুয়ে শুয়ে দেখছি একটা চামচিকে ঘরে ঢুকেছে।

দরজা-জানালা সব বন্ধ, তাই পালাতে পারছে না, নিঃশব্দ পাখায় ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। দরজা খুলে তাকে তাড়ানো যায় কিনা ভাবছি, এমন সময় ইলেকট্রিক বাতি নিভে গেল। আর উপায় নেই। জন্তুটা সারারাত্রি পালাবার রাস্তা খুঁজে উড়ে বেড়াবে, হয়তো ক্লান্ত হয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকবে।--

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, ঘুম আসছে না। কাল রাত্রি দু'টোর সময় আমার ঘরে অকারণে অ্যালার্ম ঘড়ি বাজল, আর ঠিক সেই সময় দু' মাইল দূরে আপ্টের পা মচ্‌কালো, দু'টো ঘটনার মধ্যে নৈসর্গিক সম্পর্ক কিছুই নেই। সমাপতন ছাড়া আর কি হতে পারে? অথচ, আপ্টের পা যদি না মচকাতো, তিনি আজ এই ঘরে অন্য খাটে শুতেন।- চামচিকেটা কি এখনও উড়ে বেড়াচ্ছে? আমার গায়ে এসে পড়বে না তো! পড়ে পড়ুক। ইতর প্রাণীকে আমার ভয় নেই। সত্যবতী আরশোলা আর ইঁদুরকে ভয় করে.. খোকা ভয় করে টিক্‌টিকিকে .

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কানের কাছে কড়্ কড়্ শব্দে কাড়ানাকাড়া বেজে উঠল। কম্বলের মধ্যে লাফিয়ে উঠলাম। নতুন ঘড়ির অ্যালার্ম বাজছে। এর আওয়াজ আরও উগ্র। কিন্তু অ্যালার্ম বাজার তো কথা নয়, আমি দম দিইনি, চাবি বন্ধ করে দিয়েছি। তবে?

টর্চ জেলে বিছানা থেকে উঠলাম। ঘড়িতে দু'টো বেজেছে। (অ্যালার্মের চাবি যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ, তবু বাজনা বেজে চলেছে)।

ঘড়ি হাতে তুলে নিতেই বাজনা থেমে গেল। যেমন ঘড়ি তেমনি ঘড়ি, অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক।

অজিত, তুমি জানো, আমি রহস্য ভালবাসি না; রহস্য দেখলেই আমার মন তাকে ভেঙে চুরে তার অন্তর্নিহিত সত্যটি আবিষ্কার করতে লেগে যায়। কিন্তু এ কী রকম রহস্য? অলৌকিক ঘটনার প্রতি আমার বুদ্ধি স্বভাবতই বিমুখ, যা প্রমাণ করা যায় না তা বিশ্বাস করতে আমার বিবেকে বাধে। কিন্তু এ কী? চক্ষু কর্ণ দিয়ে যাকে প্রত্যক্ষ করছি তার সঙ্গে ঐহিক কিছুরই কোনও সংস্রব নেই। অমূলক কারণহীন ঘটনা চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে।

এর মূল পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। মোমবাতি জ্বাললাম। তোমাকে আগে লিখেছি ঘরে দু'টো চেয়ার আছে। তার মধ্যে একটা সাধারণ খাড়া চেয়ার, অন্যটা দোল্‌না চেয়ার। আমি গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে নিয়ে দোলনা চেয়ারে বসলাম, সিগারেট ধরিয়ে মৃদু মৃদু দোল খেতে লাগলাম।

দোরের দিকে মুখ করে বসেছি। ডান পাশে টেবিল, বাঁ পাশে দেয়ালে লাগানো ওআর্ডরোব, পিছনে আমার খাট। আমি সিগারেট টানতে টানতে দুলছি আর ভাবছি। চামচিকেটা কোথায় ছিল জানি না, বাতি জ্বলতে দেখে আবার উড়তে আরম্ভ করেছে; আমার মাথা ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। পাখার শব্দ নেই, কেবল এক টুক্‌রো জমাট অন্ধকার শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

সিগারেট শেষ করে চোখ বুজে আছি, ভাবছি কী হতে পারে? দু'টো ঘড়িতেই বেতালা অ্যালার্ম বাজে? তবে কি হোমজি আমার সঙ্গে practical joke করছেন। আমি কাল ভূতের কথায় হেসেছিলাম, তাই তিনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। তা যদি হয় তাহলে ঘড়িটার যন্ত্রপাতি খুলে পরীক্ষা করলেই ধরা যাবে। কিন্তু হোমজি বয়স্থ ব্যক্তি, এমন বাঁদুরে রসিকতা করবেন?

কতক্ষণ চোখ বুজে বসে দোল খাচ্ছিলাম বলতে পারি না, মিনিট পনরোর বেশি নয়; চোখ খুলে চমকে গেলাম। দোলনার চেয়ারটা দুলতে দুলতে ঘুরে গেছে; আমি দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলাম, এখন ওআর্ডরোবের দিকে মুখ করে বসে আছি। শুধু তাই নয়, ওয়ার্ডরোবের খুব কাছে এসে পড়েছি।

চেয়ার ঘুরে যাওয়ার একটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কিন্তু রাত দুটোর সময় একলা ঘরে এরকম ব্যাপার ঘটলে স্নায়ুমণ্ডলে ধাক্কা লাগে। আমারও লেগেছিল। তার ওপর ঘড়িটা আবার পিছন দিক থেকে ঝন্‌ঝন শব্দে বেজে উঠল। আমি লাফিয়ে উঠে ঘড়িটা বন্ধ করতে গেলাম, মোমবাতি নিভে গেল।

বোঝো ব্যাপার! আমার স্নায়ু যদি দুর্বল হত, তাহলে কি করতাম বলা যায় না। কিন্তু আমি দেহটাকে শক্ত করে স্নায়ুর উৎকণ্ঠা দমন করলাম। আমার গায়ের কম্বলের বাতাস লেগে হয়তো মোমবাতি নিভেছে। আমি আবার মোমবাতি জ্বাললাম। ঘড়িটা হাতে নিতেই তার বাজনা থেমে গেল।

কিন্তু ঘড়িকে আর বিশ্বাস নেই। আমি সেটাকে হাতে নিয়ে ওআর্ডরোবের কাছে গেলাম। ওআর্ডরোবে আমার কাপড়-চোপড় রেখেছি, তার মধ্যে ঘড়ি চাপা দিয়ে রাখব। তারপর ঘড়ি যত বাজে বাজুক।

ওআর্ডরোবের কপাট খুলতেই সেণ্ট-কর্পূর-ন্যাপথলিন মেশা গন্ধটা নাকে এল। আমি ঘড়িটাকে আমার জামা-কাপড়ের তলায় গুঁজে দিয়ে কপাট বন্ধ করে দিলাম।

আড়াইটে বেজেছে, এখনও অর্ধেক রাত বাকি। আমি আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

মস্তিষ্ক গরম হয়েছে; তন্দ্রা আসছে আবার ছুটে যাচ্ছে। ঘড়িটা ওআর্ড-রোবের মধ্যে বাজছে কিনা শুনতে পাচ্ছি না। তারপর ক্রমে বোধ হয় ঘুম এসে গিয়েছিল।—

বিকট চিৎকার করে জেগে উঠলাম। কম্বলের মধ্যে আমার পেটের কাছে একটা কিছু কিল্‌বিল করছে। টিকটিকি কিংবা ব্যাঙ্‌ কিংবা চামচিকে। একটানে কম্বল সরিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলাম, টর্চ জ্বাললাম, মোমবাতি জ্বাললাম। বিছানায় কোনও জন্তু-জানোয়ার নেই। চামচিকেটাও কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। হাতঘড়িতে দেখলাম রাত্রি সাড়ে তিনটে।

বাকি রাত্রিটা টেবিলের সামনে খাড়া চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলাম। আর ঘুমোবার চেষ্টা বৃথা।

চিঠি ভীষণ লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ভৌতিক অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। এবার চটপট শেষ করব।

পাঁচটার সময় ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠলো।

আমি ওআর্ডরোব খুলে ঘড়ি বার করলাম। ঘড়ির সঙ্গে একটা বাদামী কাগজের চিল্‌তে বেরিয়ে এল। তাতে বাংলা হরফে একটা ঠিকানা লেখা আছে। কলকাতার দক্ষিণ সীমানার একটা ঠিকানা। ঠিকানাটা নকল করে পাঠালাম, তোমার দরকার হবে।

আমার স্কাউট-ছুরি দিয়ে ঘড়িটা খুললাম। যন্ত্রপাতির কোনও গণ্ডগোল নেই। সহজ ঘড়ি।

আমি সত্যান্বেষী। সত্যকে স্বীকার করতে আমি বাধ্য, তা সে লৌকিক

সত্যই হোক, আর অলৌকিক সত্যই হোক। কায়াহীনকে সম্বোধন করে বললাম, 'তুমি কী চাও?'

উত্তর এল না, কেবল টেবিলটা নড়ে উঠল। আমি টেবিলের ওপর হাত রেখে বসেছিলাম।

বললাম, 'তুমি কি চাও আমি তোমার মৃত্যুর তদন্ত করি?'

এবার টেবিল তো নড়লই, আমি যে চেয়ারে বসেছিলাম তার পিছনে পায়া-দুটো উঁচু হয়ে উঠল। আমি প্রায় টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

বললাম, 'বুঝেছি। কিন্তু পুলিস তো তদন্ত করছেই। আমি করলে কী সুবিধে হবে? আমি কোথায় তদন্ত করব?'

ঘড়িটা চড়াং করে একবার বেজেই থেমে গেল। ঠিকানা লেখা বাদামী কাগজের চিলতেটা টেবিলের একপাশে রাখা ছিল, সেটা যেন হাওয়া লেগে আমার সামনে সরে এল।

আমার মাথায় একটা আইডিয়া এল। মানেক মেহতা কি বাংলাদেশে গিয়ে লুকিয়ে আছে? আশ্চর্য নয়। একলা লুকিয়ে আছে? কিংবা

বললাম, 'হুঁ, আচ্ছা, চেষ্টা করব।'

এই সময় ইলেকট্রিক বাতি নিভে গেল; দেখলাম জানালার শার্সি দিয়ে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে।

হোমজিকে কিছু বললাম না। ন'টার সময় দুজনে আপ্টেকে দেখতে গেলাম। মোটরে যেতে যেতে হোমজিকে জিগ্যেস করলাম, 'হৈমবতীর চেহারা কেমন?'

হোমজি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলেন, বললেন, 'ভাল চেহারা। রঙ খুব ফরসা নয়, কিন্তু ভারি চটকদার চেহারা।'

'বয়স?'

'হয়তো ত্রিশের কিছু বেশী। কিন্তু দীর্ঘযৌবনা, শরীরের বাঁধুনি ঢিলে হয়নি।'—

আপ্টের পা কালকের চেয়ে ভাল, কিন্তু এখনও হাঁটতে পারেন না। গৃহস্বামী অনন্তরাও দেশপাণ্ডের সঙ্গেও দেখা হল। তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম -

'আপনি বিজয় বিশ্বাসকে চিনতেন?'

'চিনতাম বৈকি। সহ্যাদ্রি হোটেলের সব টাকাই আমার ব্যাঙ্কে ছিল।'

'কত টাকা?'

'সীজনের শেষে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার দাঁড়িয়েছিল।'

'বিজয় বিশ্বাসের নিজের আলাদা কোনও অ্যাকাউন্ট ছিল?'

'ছিল। আন্দাজ দু'হাজার টাকা। কিন্তু মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি প্রায় সব টাকা বার করে নিয়েছিলেন। শ'খানেক টাকা পড়ে আছে।'

'তাঁর স্ত্রী যাবার আগে সে টাকা বার করে নেননি?'

'স্ত্রী যতক্ষণ কোর্ট থেকে ওয়ারিশ সাব্যস্ত না হচ্ছেন, ততক্ষণ তো তাঁকে টাকা দিতে পারি না।'

'হৈমবতী এখন কোথায়? তাঁর ঠিকানা জানেন?'

'না।'

'আর কেউ জানে?'

হোমজি বললেন, 'বোধ হয় না। যাবার সময় তিনি নিজেই জানতেন না

কোথায় যাবেন।'

আমি আপ্টেকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনি নিশ্চয় এ মামলার খবর রাখেন। মানেক মেহতার কোনও সন্ধান পাওয়া গেছে?'

তিনি বললেন, 'না। সন্ধান পাওয়া গেলে আমি জানতে পারতাম।'

'মানেক মেহতার ফটোগ্রাফ আছে?'

'একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ ছিল। সহ্যাদ্রি হোটেল যখন আরম্ভ হয় তখন মানেক মেহতা, বিজয় বিশ্বাস আর হৈমবতী একসঙ্গে ছবি তুলিয়েছিল। কিন্তু সেটা পাওয়া যায়নি।'

হোটেলে ফিরে এসে দুপুরবেলা খুব ঘুমোলাম। রাত্রে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলাম, কিন্তু বার বার বাধা পেয়ে শেষ করতে পারিনি। বিদেহাত্মা আমার এই চিঠি লেখাতে সন্তুষ্ট নয়, অথচ সে কী চায় বোঝাতে পারছে না। যাহোক, আজ চিঠি শেষ করব।

এতখানি ভণিতার কারণ বোধ হয় বুঝতে পেরেছ। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তের যে ঠিকানা দিলাম তুমি সেখানে যাবে। যদি সেখানে হৈমবতী বিশ্বাসের দেখা না পাও তাহলে কিছু করবার নেই। কিন্তু যদি দেখা পাও, তাহলে তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করবে ঃ মানেক মেহতার সঙ্গে তাঁদের যে গ্রুপ-ফটো তোলা হয়েছিল সেটা কোথায়? মানেক মেহতার সঙ্গে হৈমবতীর বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা জানবার চেষ্টা করবে। কবে কোথায় বিশ্বাসদের সঙ্গে মেহতার পরিচয় হয়েছিল? হৈমবতীর আর্থিক অবস্থা এখন কেমন? বাড়িতে কে কে আছে সব খবর নেবে। যে প্রশ্নই তোমার মনে আসুক জিগ্যেস করবে। তারপর সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আমাকে লিখে জানাবে; কোনও কথা তুচ্ছ বলে বাদ দেবে না। যদি সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে টেলিগ্রাম করে আমাকে জানাবে।

তোমার চিঠির অপেক্ষায় থাকব। এখানে এই দারুণ শীতে বেশীদিন থাকার ইচ্ছে নেই, কিন্তু এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত চলে যেতেও পারছি না।

আশা করি খোকা ও সত্যবতী ভাল আছে এবং তুমি ইনফ্লুএঞ্জা ঝেড়ে ফেলে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছ।

ভালবাসা নিও।

--তোমার ব্যোমকেশ

কলিকাতা
৮ই জানুআরি

ভাই ব্যোমকেশ,

তোমার চিঠি আজ সকালে পেয়েছি এবং রাত্রে বসে জবাব লিখছি। হায় নাস্তিক, তুমি শেষে ভূতের খপ্পরে পড়ে গেলে! সত্যবতী জানতে চাইছে, ভূত বটে তো? পেত্নী নয়? ওদিকের পেত্নীরা নাকি ভারি জাঁহাবাজ হয়।

যাক, বাজে কথা লিখে পুঁথি বাড়াব না। তোমার নির্দেশ অনুযায়ী আজ বেলা তিনটে নাগাদ বাসা থেকে বেরুচ্ছি, বিকাশ দত্ত এল। আমি কোথায় যাচ্ছি শুনে সে বলল, 'আরে সর্বনাশ, সে যে ধাম্ধাড়া গোবিন্দপুর। পথ চিনে যেতে

পারবেন?'

বললাম, 'তুমিও চল না।' বিকাশ রাজী হল। তাকে সব বললাম না, মোটা-মুটি একটা আন্দাজ দিলাম।

দু'জনে চললাম। সত্যিই ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুর। ট্রামে বাসে কলকাতার দক্ষিণ সীমানা ছাড়িয়ে যেখানে গিয়ে পেঁছুলাম সেখানে কেবল একটি লম্বা রাস্তা চলে গিয়েছে। রাস্তায় দু'তিন শো গজ অন্তর একটা বাড়ি। শেষ পর্যন্ত বেলা আন্দাজ সাড়ে চারটের সময় নির্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হলাম। রাস্তা থেকে খানিক পিছিয়ে ছোট একতলা বাড়ি; চারিদিকে খোলা মাঠ। বিকাশকে বললাম, 'তুমি রাস্তার ধারে গাছতলায় বসে বিড়ি খাও। আমি এখনি ফিরতে পারি, আবার ঘণ্টাখানেক দেরি হতে পারে।'

বাড়ির সদর দরজা বন্ধ, আমি গিয়ে কড়া নাড়লাম। একটা চাকর এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। বলল, 'কাকে চান?'

বললাম, 'শ্রীমতী হৈমবতী বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আপনার নাম?'

'অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'কী দরকার?'

'সেটা শ্রীমতী বিশ্বাসকেই বলব। তুমি তাঁকে বোলো মহাবলেশ্বর থেকে চিঠি পেয়ে এসেছি।'

'আজ্ঞে। একটু দাঁড়ান।' বলে চাকরটা দরজা বন্ধ করে দিল।

দশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছি, সাড়াশব্দ নেই। তারপর দরজা খুলল। চাকরটা বলল, 'আসুন।'

বাড়িতে ঢুকেই ঘর। আসবাবপত্র বেশী কিছু নেই, দুটো চেয়ার, একটা টেবিল। চাকর বলল, 'আজ্ঞে বসুন। গিন্নী ঠাকরুন চান করছেন, এখনি আসবেন।

একটা চেয়ারে বসলাম। বসে আছি তো বসেই আছি। চাকরটা এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করছে, বোধ হয় আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আজকাল কলকাতার যা ব্যাপার দাঁড়িয়েছে, অচেনা লোককে বাড়িতে ঢুকতে দিতে ভয় হয়। চোর-ডাকাত-গুণ্ডা যা-কিছু হতে পারে।

বসে বসে ভাবলাম, গিন্নী ঠাকরুনের স্নান যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ চাকরটাকে নিয়েই একটু নাড়াচাড়া করি। বললাম, 'তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ?'

চাকরটা অন্দরের দোরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ্ঞে, এই তো একমাসও এখনও হয়নি।'

দেখলাম লোকটির কথায় একটু পূর্ববঙ্গের টান আছে।

'তোমার দেশ কোথায়?'

'ফরিদপুর জেলায়'—বলে সে চৌকাঠের ওপর উবু হয়ে বসল। আধবয়সী লোক, মাথায় কদমছাঁট চুল, গায়ে একটা ছেঁড়া ময়লা রঙের সোয়েটার।

'কতদিন কলকাতায় আছ?'

'তা তিন বছর হতে চলল।'

'এখানে—মানে এই বাড়িতে—ক'জন মানুষ থাকে?'

'গিন্নী ঠাকরুন একলা থাকেন।'

'স্ত্রীলোক—একলা থাকেন! পুরুষ কেউ নেই?'

'আজ্ঞে না। আমি বুড়োমানুষ দেখাশুনা করি।'

'এখানে কারুর যাওয়া-আসা আছে?'

'আজ্ঞে না, আপনিই পেরথম এলেন।'

এই সময় হৈমবতীকে দোরের কাছে দেখা গেল। চাকরটা উঠে দাঁড়াল, আমিও দাঁড়ালাম। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে দিনের আলো কমে গিয়েছিল, তিনি চাকরকে বললেন, 'মহেশ, আলো জেবলে নিয়ে এস।'

চাকর চলে গেল। অল্প আলোতেও মহিলাটিকে দেখার অসুবিধা ছিল না। দীর্ঘল চেহারা, সুশ্রী মুখ, পার্সীদের চোখে খুব ফরসা না লাগলেও আমার চোখে বেশ ফরসা। মুখে একটি চিত্তাকর্ষক সৌকুমার্য আছে। যৌবনের চৌকাঠ পার হতে গিয়ে যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। পরনে সাদা থান, গায়ে একটিও অলঙ্কার নেই। কবিত্ব করছি না, কিন্তু তাঁর সদ্যস্নাত চেহারাটি দেখে বৃষ্টি-ভেজা সন্ধ্যার রজনীগন্ধার কথা মনে পড়ে যায়।

আমি হাতজোড় করে নমস্কার করলাম; তিনি প্রতিনমস্কার করে বললেন, 'আপনি মহাবলেশ্বর থেকে আসছেন?'

আমি বললাম, 'না, আমার বন্ধু ব্যোমকেশ বক্সী মহাবলেশ্বরে আছেন, তাঁর চিঠি পেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'তবে কি মানেক মেহতা ধরা পড়েছে?' তাঁর কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ফুটে উঠল।

বললাম, 'না, এখনও ধরা পড়েনি।'

হৈমবতী আস্তে আস্তে চেয়ারে বসলেন, নিরাশ স্বরে বললেন, 'বসুন। আমার কাছে এসেছেন কেন?'

আমি বসলাম, বললাম, 'আমার বন্ধু ব্যোমকেশ বক্সী –'

তিনি বললেন, 'ব্যোমকেশ বক্সী কে? পুলিসের লোক?'

'না। ব্যোমকেশ বক্সীর নাম শোনেননি' -এই বলে তোমার পরিচয় দিলাম। তাঁর মুখ নিরুৎসুক হয়ে রইল। দেখা যাচ্ছে তুমি নিজেকে যতটা বিখ্যাত মনে কর, ততটা বিখ্যাত নও। সব শুনে হৈমবতী বললেন, 'আমি জানতুম না। সারা জীবন বিদেশে কেটেছে—'

এই সময় মহেশ চাকর একটা লণ্ঠন এনে টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল। বলা বাহুল্য, বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই।

লণ্ঠনের আলোয় হৈমবতীর মুখ আরও স্পষ্টভাবে দেখলাম। ব্যথিত আশাহত মুখ ক্লান্তিভরে থমথম করছে, দু'একগাছি ভিজে চুল কপালে গালে জুড়ে রয়েছে। আমার মন লজ্জিত হয়ে উঠল, এই শোক নিষিক্তা মহিলাকে বেশি কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, তাড়াতাড়ি প্রশ্নগুলো শেষ করে চলে যাওয়াই কর্তব্য। বললাম, 'আমাকে মাফ করবেন। মানেক মেহতাকে ধরবার উদ্দেশ্যেই ব্যোমকেশ আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করে পাঠিয়েছে। -মানেক মেহতার সঙ্গে আপনাদের প্রথম পরিচয় কবে হয়?'

হৈমবতী বললেন, 'ছয় বছর আগে। আমাদের তখন আমেদাবাদে ছোট্ট একটি হোটেল ছিল। কি কুক্ষণেই যে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল!'

'মানেক মেহতার সঙ্গে আপনার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল?'

'আমার সঙ্গে তার সর্বসাকুল্যে পাঁচ-ছয় বারের বেশি দেখা হয়নি। বছরের

মধ্যে একবার কি দু'বার আসত; চুপিচুপি আসত, নিজের ভাগের টাকা নিয়ে চুপিচুপি যেত।'

'তার এই চুপিচুপি আসা-যাওয়া দেখে তার চরিত্র সম্বন্ধে আপনাদের কোন সন্দেহ হয়নি?'

'না। আমরা ভাবতাম তার স্বভাবই ওই রকম, নিজেকে জাহির করতে চায় না।'

'তার কোনও ফটোগ্রাফ আছে কি?'

'একটা গ্রুপ-ফটো ছিল, সহ্যাদ্রি হোটেলের অফিসে টাঙানো থাকত। সে রাত্রে আমি মূর্ছা ভেঙে দেখলুম দেয়ালে ছবিটা নেই।'

'সে রাত্রে হোটেলের লোহার সিন্দুকে কত টাকা ছিল?'

'ঠিক জানি না। আন্দাজ দেড় লাখ!'

অতঃপর আর কি প্রশ্ন করব ভেবে পেলাম না। আমি উঠি-উঠি করছি, হৈমবতী আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আমি এখানে আছি আপনার বন্ধু জানলেন কি করে? আমি তো কাউকে জানাইনি।'

উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলাম। মহিলাটির বর্তমান মানসিক অবস্থায় ভূত প্রেতের অবতারণা না করাই ভাল। বললাম, 'তা জানি না, ব্যোমকেশ কিছু লেখেনি। আপনি উপস্থিত এখানেই আছেন তো?'

হৈমবতী বললেন, 'বোধ হয় আছি। আমার স্বামীর এক বন্ধু তাঁর এই বাড়িতে দয়া করে থাকতে দিয়েছেন। আসুন, নমস্কার।'

বাইরে এসে দেখলাম অন্ধকার হয়ে গেছে। রাস্তার ধারে গাছের তলায় বিড়ির মুখে আগুন জ্বলছে, তাই দেখে বিকাশের কাছে গেলাম। তারপর দু'জনে ফিরে চললাম। ভাগ্যক্রমে খানিক দূর যাবার পর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বিকাশ বলল, 'কাজ হল?'

এই কথা আমিও ভাবছিলাম। হৈমবতীর দেখা পেয়েছি বটে, তাঁকে প্রশ্নও করেছি; কিন্তু কাজ হল কি? মানেক মেহ্‌তা এখন কোথায় তার কিছুমাত্র ইঙ্গিত পাওয়া গেল কি? বললাম, 'কতকটা হল।'

বিকাশ খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি যখন ব্যোমকেশবাবুকে চিঠি লিখবেন, তখন তাঁকে জানাবেন যে শোবার ঘরে দু'টো খাট আছে।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি জানলে কি করে?'

বিকাশ বলল, 'আপনি যখন মহিলাটির সঙ্গে কথা বলছিলেন আমি তখন বাড়ির সব জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি।'

'তাই নাকি! আর কি দেখলে?'

'যা কিছু দেখলাম, শোবার ঘরেই দেখলাম। অন্য ঘরে কিছু নেই।'

'কী দেখলে?'

'একটা মাঝারি গোছের লোহার সিন্দুক আছে। আমি যখন কাঁচের ভেতর দিয়ে উঁকি মারলাম, তখন চাকরটা সিন্দুকের হাতল ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করছিল।'

'চাকরটা! ঠিক দেখেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সে যখন সদর দরজা খুলেছিল তখন আমি তাকে দেখেছিলাম। সে ছাড়া বাড়িতে অন্য পুরুষ নেই।'—

তারপর লেকের কাছাকাছি এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। বিকাশ নিজের রাস্তা ধরল, আমি বাসায় ফিরে এলাম। রাত্রে বসে চিঠি লিখছি, কাল সকালে ডাকে দেব।

তুমি কেমন আছ? সত্যবতী আর খোকা ভাল আছে। আমি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছি।

—তোমার অজিত।

* * *

আমি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাহিনীর শেষাংশ লিখিতেছি। ব্যোমকেশের নামে সহ্যাদ্রি হোটেলের ঠিকানায় চিঠি লিখিয়া ডাকে দিয়াছিলাম ৯ তারিখের সকালে। ১২ তারিখের বিকাল বেলা অনুমান তিনটার সময় ব্যোমকেশ আসিয়া উপস্থিত। সবিস্ময়ে বলিলাম, 'একি! আমার চিঠি পেয়েছিলে?'

'চিঠি পেয়েই এলাম। প্লেনে এসেছি।—তুমি চটপট তৈরি হয়ে নাও, এখুনি বেরুতে হবে।'—বলিয়া ব্যোমকেশ ভিতর দিকে চলিয়া গেল।

আধঘণ্টার মধ্যে বাড়ি হইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় বাড়ির সামনে পুলিসের ভ্যান দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে একজন ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন কনস্টেবল। আমরাও ভ্যানে উঠিয়া বসিলাম।

কয়েকদিন আগে যে সময় হৈমবতীর নির্জন গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলাম, প্রায় সেই সময় আবার গিয়া পৌঁছিলাম। আজ কিন্তু ভৃত্য মহেশ দরজা খুলিয়া দিতে আসিল না। দরজা খোলাই ছিল। আমরা সদলবলে প্রবেশ করিলাম।

বাড়িতে কেহ নাই: হৈমবতী নাই, মহেশ নাই। কেবল আসবাবগুলি পড়িয়া আছে; বাহিরের ঘরে চেয়ার-টেবিল, শয়নকক্ষে দু'টি খাট ও লোহার সিন্দুক, রান্নাঘরে হাঁড়ি কলসী। লোহার সিন্দুকের কপাট খোলা, তাহার অভ্যন্তর শূন্য। ব্যোমকেশ করুণ হাসিয়া ইন্সপেক্টরের পানে চাহিল,—'চিড়িয়া উড়েছে।'—

সে-রাত্রে নৈশ ভোজন সম্পন্ন করিয়া ব্যোমকেশ ও আমি তক্তপোশের উপর গায়ে আলোয়ান জড়াইয়া বসিয়াছিলাম। সত্যবতী খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া আসিয়া ব্যোমকেশের গা ঘেঁষিয়া বসিল। একটা শীতের হাওয়া উঠিয়াছে, হাওয়ার জোর ক্রমেই বাড়িতেছে। আমাদের ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ, তবু কোন্ অদৃশ্য ছিদ্রপথে ছুঁচের মত বাতাস প্রবেশ করিয়া গায়ে বিঁধিতেছে।

বলিলাম, 'মহাবলেশ্বরের শীত তুমি খানিকটা সঙ্গে এনেছ দেখছি। আশা করি বিজয় বিশ্বাসের প্রেতটিকেও সঙ্গে আনোনি।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের কাছে আর একটু ঘেঁষিয়া বসিল। ব্যোমকেশ আমার পানে একটি সকৌতুক দৃষ্টি হানিয়া বলিল, 'প্রেত সম্বন্ধে তোমার ভুল ধারণা এখনও যায়নি।'

বলিলাম, 'প্রেত সম্বন্ধে আমার ভুল ধারণা থাকা বিচিত্র নয়, কারণ প্রেতের সঙ্গে আমি কখনও রাত্রিবাস করিনি। আচ্ছা ব্যোমকেশ, সত্যিই তুমি ভূত বিশ্বাস কর?'

'যা প্রত্যক্ষ করেছি তা বিশ্বাস করা-না-করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তুমি ব্যোমকেশ বক্সীর অস্তিত্বে বিশ্বাস কর?'

'ব্যোমকেশ বক্সীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি কারণ তাকে চোখের সামনে দেখতে

পাচ্ছি। কিন্তু ভূত তো চোখে দেখিনি, বিশ্বাস করি কি করে?'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না। কিন্তু আমি যদি বিশ্বাস করি, তুমি আপত্তি করবে কেন?'

কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করিলাম।

'আচ্ছা, ওকথা যাক। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর। কিন্তু তোমার ভূতের এত চেষ্টা সত্ত্বেও কার্যসিদ্ধ হল না।'

'কে বলে কার্যসিদ্ধি হয়নি? ভূত চেয়েছিল মস্ত একটা ধোঁকার টাটি ভেঙে দিতে। তা সে দিয়েছে।'

'তার মানে?'

'মানে কি এখনও কিছুই বোঝোনি?'

'কেন বুঝব না? প্রথমে অবশ্য আমি হৈমবতীর চরিত্র ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝেছি হৈমবতী আর মানেক মেহতা মিলে বিজয় বিশ্বাসকে খুন করেছিল। হৈমবতী একটি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ।'

'হৈমবতীর চরিত্র ঠিকই বুঝেছ। কিন্তু ভূতকে এখনও চেনোনি। ভূতের রহস্য আরও সাংঘাতিক।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের আরও কাছে সরিয়া গেল, হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, 'আমার শীত করছে।'

'শীত করছে, না ভয় করছে।' ব্যোমকেশ হাসিয়া নিজের আলোয়ানের অর্ধেকটা তাহার গায়ে জড়াইয়া দিল।

বলিলাম, 'এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বসো। বুড়ো বয়সে লজ্জা করে না!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমাকে আবার লজ্জা কি! তুমি তো অবোধ শিশু।'

সত্যবতী সায় দিয়া বলিল, 'নয়তো কি! যার বিয়ে হয়নি সে তো দুধের ছেলে।'

বলিলাম, 'আচ্ছা আচ্ছা, এখন ভূতের কথা হোক। আমি কিছুই বুঝিনি, তুমি সব খোলসা করে বল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আগে তোমাকে দু' একটা প্রশ্ন করি। মানেক মেহতা বিজয় বিশ্বাসকে খুন করবার জন্যে খাদের ধারে নিয়ে গেল কেন? বিজয় বিশ্বাসই বা গেল কেন?'

চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'জানি না।'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন। বিজয় বিশ্বাসের নামে ব্যাঙ্কে হাজার দুই টাকা ছিল। হোটেল বিক্রি হবার আগেই সে টাকা বার করে নিয়েছিল কেন?'

'জানি না।'

'তৃতীয় প্রশ্ন। তুমি যখন হৈমবতীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে তখন শীতের সন্ধ্যে হয়-হয়। চাকর যখন বলল হৈমবতী স্নান করছেন, তখন তোমার খট্‌কা লাগল না?'

'না। মানে—খেয়াল করিনি।'

'চতুর্থ প্রশ্ন। চাকরটাকে সন্দেহ করার কোনও কারণ হয়নি। সে পূর্ববঙ্গের লোক, মাত্র কয়েকদিন হৈমবতীর চাকরিতে ঢুকেছিল। অবশ্য একথা যদি সত্যি হয় যে সে লোহার সিন্দুক খোলবার চেষ্টা করছিল—

'অজিত, তোমার সরলতা সত্যিই মর্মস্পর্শী। চাকরটা সিন্দুক খোলবার উদ্যোগ করেছিল বটে, কিন্তু চুরি করবার জন্যে নয়।—মহাবলেশ্বরে দু'জন লোক খুন করবার ষড়যন্ত্র করেছিল, তার মধ্যে একজন হচ্ছে হৈমবতী। অন্য লোকটি কে?'

'মানেক মেহতা ছাড়া আর কে হতে পারে?'

ব্যোমকেশ কুটিল হাসিয়া বলিল, 'ঐখানেই ধাপ্পা–প্রচণ্ড ধাপ্পা। হৈমবতী ষড়যন্ত্র করেছিল তার স্বামীর সঙ্গে, মানেক মেহতার সঙ্গে নয়। হৈমবতীর আর যে দোষই থাক, সে পতিব্রতা নারী, তাতে সন্দেহ নেই।'

হতবুদ্ধি হইয়া বলিলাম, 'কী বলছ তুমি!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যা বলছি মন দিয়ে শোনো।—হোমিজ যখন আমাকে গল্পটা বললেন তখন আমার মনে বিশেষ দাগ কাটেনি। তবু একটা খট্‌কা লেগেছিলঃ মানেক মেহতা বিজয় বিশ্বাসকে খুন করবার জন্যে খাদের ধারে নিয়ে গেল কেন? বিজয় শীত-কাতুরে লোক ছিল, সে-ই বা গেল কেন?

'তারপর ভূতের উৎপাত শুরু হল। দায়ে পড়ে অনুসন্ধান শুরু করলাম। খট্‌কা ক্রমে সন্দেহে পরিণত হতে লাগল। তারপর ওআর্ডরোবের মধ্যে পেলাম একটুকরো বাদামী কাগজে একটা ঠিকানা; বাংলা অক্ষরে লেখা কলকাতার উপকণ্ঠের একটা ঠিকানা। আমার মনের অন্ধকার একটু একটু করে দূর হতে লাগল।

'তোমাকে লম্বা চিঠি লিখলাম। তারপর তোমার উত্তর যখন পেলাম তখন আর কোনও সংশয় রইল না। আপ্টে সাহেবকে সব কথা বললাম। তিনি তখনও ঠ্যাং নিয়ে পড়ে আছেন, কিন্তু তখনই কলকাতার পুলিসকে টেলিগ্রাম করলেন এবং আমার প্লেনে আসার ব্যবস্থা করে দিলেন।'

হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাসকে ধরা গেল না বটে, কিন্তু প্রেতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, আসল অপরাধী কারা তা জানা গেছে। বলা বাহুল্য, যে প্রেতটা নাছোড়বান্দা হয়ে আমাকে ধরেছিল সে মানেক মেহতা।'

সত্যবতী বলিল, 'সত্যি কি হয়েছিল বল না গো!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সত্যি কি হয়েছিল তা জানে কেবল হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাস। আমি মোটামুটি যা আন্দাজ করেছি, তাই তোমাদের বলছি।'

সিগারেট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল। 'মানেক মেহতা ছিল নামকাটা বদমাশ, আর বিজয় বিশ্বাস ছিল ভিজে বেড়াল। একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে। দু'জনে মিলে হোটেল খুলল। মেহতার টাকা, বিশ্বাসদের মেহনত।

'স্ত্রী-পুরুষে হোটেল চালাচ্ছে, হোটেল বেশ জাঁকিয়ে উঠল। প্রতি বছর ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা লাভ হয়। মেহতা মাঝে মাঝে এসে নিজের ভাগের টাকা নিয়ে যায়। বিজয় বিশ্বাস নিজের ভাগের টাকা মহাবলেশ্বরের ব্যাঙ্কে বেশি রাখে না, বোধ হয় স্ত্রীর নামে অন্য কোথাও রাখে। হয়তো কলকাতারই কোনও ব্যাঙ্কে হৈমবতীর নামে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা জমা আছে, ওরা দু'জনে ছাড়া আর কেউ তার সন্ধান জানে না।

'এইভাবে বেশ চলছিল, গত বছর মানেক মেহতা বিপদে পড়ে গেল। তার বে-আইনী সোনার চালান ধরা পড়ে গেল। তাকে পুলিস জড়াতে পারল না বটে,

কিন্তু অত সোনা মারা যাওয়ায় সে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়েছিল। তখন তার একমাত্র মূলধন—হোটেল; মানেক মেহতা ঠিক করল সে হোটেল বিক্রি করবে। তার নগদ টাকা চাই।

'এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হোটেল বিক্রির টাকা কে পাবে। একলা মেহতা পাবে, না বিজয় বিশ্বাসেরও বখরা আছে? ওদের পার্টনারশিপের দলিল আমি দেখিনি। অনুমান করা যেতে পারে যে মানেক মেহতা যখন হোটেল কেনার টাকা দিয়েছিল, তখন হোটেল বিক্রির টাকাটাও পুরোপুরি তারই প্রাপ্য। আমার বিশ্বাস, মেহতা সব টাকাই দাবি করেছিল।

'হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাস ঠিক করল সব টাকা ওরাই নেবে। ওদের পূর্ব ইতিহাস কিছু জানা যায় না, কিন্তু ওদের প্রকৃতি যে স্বভাবতই অপরাধপ্রবণ তাতে আর সন্দেহ নেই। দু'জনে মিলে পরামর্শ করল। মানেক মেহতা পুলিসের নজরলাগা দাগী লোক, তার ঘাড়ে অপরাধের ভার চাপিয়ে দেওয়া সহজ। স্বামী-স্ত্রী মিলে নিপুণভাবে প্ল্যান গড়ে তুলল।

'কলকাতার উপকণ্ঠে তখন কি ভাবে ওরা বাসা ঠিক করেছিল, আমি জানি না। হয়তো কলকাতার কোনও পরিচিত লোকের মারফত বাসা ঠিক করেছিল। হৈমবতী বাসার ঠিকানা কাগজে লিখে ওআর্ডবোবের মধ্যে গুঁজে রেখেছিল, পাছে ঠিকানা ভুলে যায়। পরে অবশ্য ঠিকানা তাদেব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, তাই হৈমবতী যাবাব সময় বাদামী কাগজের টুকরোটা ওয়ার্ডরোবেই ফেলে যান। কাঠের ওয়ার্ডরোবে বাদামী কাগজের টুকরোটা বোধহয় চোখে পড়েনি। ঐ একটি মারাত্মক ভুল হৈমবতী করেছিল।

'যাহোক, নির্দিষ্ট রাত্রে মানেক মেহতা চুপিচুপি এসে হাজির। হোটেলে একটিও অতিথি নেই। চাকরানীটাকে হৈমবতী নিশ্চয় ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিল। হোটেলে ছিল কেবল হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাস।

'মানেক মেহতাকে ওরা হোটেলের অফিস-ঘরেই খুন করেছিল। এমন ভাবে খুন করেছিল যাতে রক্তপাত না হয়। তারপর ছদ্মবেশ ধারণেব পালা। বিজয় বিশ্বাস মানেক মেহতার গা থেকে জামা কাপড় খুলে নিজে পরল, নিজেব জামা কাপড় গলাবন্ধ মানেক মেহতাকে পরিয়ে দিল। তারপর দু'জনে লাশ নিয়ে গিয়ে খাদের মধ্যে ফেলে দিল। কিছুদিন থেকে এক ব্যাঘ্র-দম্পতি এসে খাদে বাসা নিয়েছিল, সুতরাং লাশের যে কিছুই থাকবে না তা বিশ্বাস-দম্পতি জানত। ব্যাঘ্র-দম্পতির কথা বিবেচনা করেই তারা প্ল্যান করেছিল।

'আসল কাজ শেষ হলে বিজয় বিশ্বাস সমস্ত টাকাকড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। নিষুতি শীতের রাত্রি, কেউ তাকে দেখল না। মানেক মেহতা শহরের বাইরে রাস্তার ধারে মোটর রেখে এসেছিল, সেই মোটরে চড়ে বিজয় বিশ্বাস উধাও হয়ে গেল।

'হৈমবতী ঘাঁটি আগলে রইল। বুকের পাটা আছে ওই মেয়েমানুষটির। তারপর যা যা ঘটেছিল সবই প্রকাশ্য ব্যাপার। একমাত্র সাক্ষী হৈমবতী, সে যা বলল পুলিস তাই বিশ্বাস করল। বিশ্বাস না করার কোনও কারণ ছিল না, মানেক মেহতার চরিত্র পুলিস জানত।

'কয়েকদিন পরে সহ্যাদ্রি হোটেল হোর্মাজির হাতে তুলে দিয়ে শোকসন্তপ্তা বিধবা হৈমবতী মহাবলেশ্বর থেকে চলে গেল। ইতিমধ্যে বিজয় বিশ্বাস কলকাতার

বাসায় এসে আড্ডা গেড়েছিল, হৈমবতীও এসে জুটল।

'কিন্তু তারা ভারি হুঁশিয়ার লোক, একেবারে নিশ্চিন্ত হয়নি, সাবধানে ছিল। তাই মহাবলেশ্বরের চিঠি পেয়ে অজিত যখন দেখা করতে গেল তখন হৈমবতী চমকে উঠল বটে কিন্তু ঘাবড়ালো না। হৈমবতীর তখন বোধ হয় বিধবার সাজ ছিল না, সে বিধবা সাজতে গেল। চাকর অজিতকে বাইরের ঘরে বসাল। অজিত যদি এত সরল না হত, তাহলে ওর খটকা লাগত; শীতের সন্ধ্যাবেলা মেয়েরা গা ধুতে পারে, চুল ভিজিয়ে স্নান করে না।

"যাহোক, হৈমবতী যখন এল তখন তার সদ্যস্নাত চেহারা দেখে অজিত মুগ্ধ হয়ে গেল। সে হৈমবতীকে আমার নাম বলল; হৈমবতীর ব্যাপার বুঝতে তিলার্ধ দেরি হল না। অজিত আমার নামটাকে যতখানি অখ্যাত মনে করে, ততখানি অখ্যাত নয় আমার নাম, অজিতের কল্যাণেই নামটা সকলের জানা হয়ে গেছে। কিন্তু সে যাক। বিকাশ ওদিকে জানালা দিয়ে শোবার ঘরে দুটো খাট আর লোহার সিন্দুক দেখে নিয়েছিল। অজিতের চিঠিতে ওটাই ছিল সবচেয়ে জরুরী কথা। চিঠি পড়ে কিছুই আর জানতে বাকি রইল না।

'কিন্তু ওদের ধরা গেল না। সে রাত্রে অজিত পিছন ফিরবার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় হৈমবতী লোহার সিন্দুক থেকে টাকাকড়ি নিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল। এখন তারা কোথায়, কোন্ ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে বলতে পাবে। হয়তো তারা কোনওদিনই ধরা পড়বে না, হয়তো ধরা পড়বে। না পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। পঁয়ত্রিশ কোটি নর-নারীর বাসভূমি এই ভারতবর্ষ—'

কিছুক্ষণ তিনজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। বাহিরে যে হাওয়া উঠিয়াছিল তাহা থামিয়া গিয়াছে। ঘড়িতে দশটা বাজিল।

আমি বলিলাম, 'সব সমস্যার তো সমাধান হল, কিন্তু একটা কথা বুঝলাম না। বিজয় বিশ্বাস ও বাড়িতে থাকতো না কেন? কোথায় থাকত? চাকরটা ওদের সম্বন্ধে কি কিছুই সন্দেহ করেনি?'

ব্যোমকেশ গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'হা' ভগবান, তাও বোঝোনি? চাকরটাই বিজয় বিশ্বাস।'

অ চি ন পা খি

ব্যোমকেশ ও আমি গত ফাল্গুন মাসে বীরেনবাবুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে দু'দিনের জন্য কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম। শহরটি প্রাচীন এবং নোংরা। কলিকাতা হইতে মাত্র তিন ঘণ্টার পথ। ট্রেন বদল করিতে না হইলে আরও কম সময়ে যাওয়া যাইত।

বীরেনবাবুর সহিত আমাদের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতা। তিনি কলিকাতায় পুলিস কর্মচারী ছিলেন। বহুবার বহু সূত্রে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছি। অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি। বছর দুই আগে অবসর লইয়া এই শহরে বাস্তু-ভিটায় বাস করিতেছেন। কন্যার বিবাহে আমাদের সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। ব্যোমকেশেরও হাতে কাজ ছিল না। তাই বিবাহের দিন পূর্বাহ্ণে আমরা বীরেন-বাবুর গৃহে অবতীর্ণ হইলাম।

বিয়ে-বাড়িতে যথাবিহিত কর্মতৎপরতা ও হৈ হৈ চলিতেছে, সানাই বাজিতেছে। বীরেনবাবু ছুটিয়া আসিয়া আমাদের সম্বর্ধনা করিলেন এবং একটি ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। ঘরের মেঝেয় ফরাস পাতা; বরযাত্রীদের জন্য যথারীতি সাজানো। কিন্তু বর ও বরযাত্রীরা স্থানীয় ব্যক্তি, তাহারা সন্ধ্যার পর আসিবে। উপস্থিত ঘরটি খালি রহিয়াছে।

আমরা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলাম। চা জলখাবার আসিল। বীরেনবাবু আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে একটু উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি কন্যাকর্তা, আজকের দিনে আপনি বসে আড্ডা মারলে চলবে কি করে? যান, কাজকর্ম করুন গিয়ে।'

বীরেনবাবু একটু অপ্রতিভ ভাবে এদিক ওদিক চাহিতেছেন এমন সময় ঘরের বাহিরে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কই হে বীরেন, মেয়ের বিয়ের কি ব্যবস্থা করলে দেখতে এলাম।'

'এই যে দাদা!' বীরেনবাবু তাড়াতাড়ি গিয়া একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিলেন—'ভালই হল আপনি এসে পড়েছেন। এঁরা আমার দুই বন্ধু, কলকাতা থেকে এসেছেন। নাম জানেন নিশ্চয়, আপনাদেরই দলের লোক। ইনি হলেন স্বনামধন্য ব্যোমকেশ বক্সী, আর উনি সুলেখক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'নাম শুনেছি বৈকি।' বলিয়া ভদ্রলোক আমাদের প্রতি তীক্ষ্ণায়ত দৃষ্টিপাত করিলেন।

বীরেনবাবু বলিলেন, 'ইনি হচ্ছেন নীলমণি মজুমদার। পুলিসের নামজাদা অফিসার ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন।'

আমরাও ভদ্রলোককে দেখিলাম। গৌরবর্ণ লম্বা চেহারা; বয়স বোধ করি ষাটের ঊর্ধ্বে, কিন্তু শরীর বেশ দৃঢ় আছে; পিঠের শিরদাঁড়া তাঁহার হাতের লাঠির মতই শক্ত এবং ঋজু। মুখ দেখিয়া মনে হয় জবরদস্ত রাশভারী লোক। গলার স্বর গম্ভীর।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বসতে আজ্ঞা হোক।'

নীলমণি মজুমদার লাঠিসুদ্ধ হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন এবং আমাদের মুখোমুখি হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বীরেনবাবু বলিলেন, 'নীলমণিদা. আপনারা তাহলে গল্পসল্প করুন, আমি একটু—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি প্রস্থান করুন। কেবল চাকরকে বলে দেবেন যেন তামাক দিয়ে যায়। গড়গড়া দুটো নিষ্কর্মার মত হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে।'

বীরেনবাবু প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ নীলমণিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনারও কি আদি নিবাস এই শহরে?'

নীলমণিবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না। আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে। কিন্তু সে-সব গেছে! রিটায়ার করে বুড়ো বয়সে কোথায় যাব, তাই এখানেই আছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে আপনার আত্মীয়-স্বজন আছেন বুঝি?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'আত্মীয়-স্বজন আমার কেউ নেই। বিবাহ করিনি, সারা জীবন কেবল কাজই করেছি। পুলিসের কাজে একটা মোহ আছে; আমি আমার কাজে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম। তারপর যখন রিটায়ার করলাম, তখন এই শহরেই রয়ে গেলাম। এ শহরটার সঙ্গে আমার একটা নাড়ীর যোগ আছে; প্রথম যখন সাব-ইন্সপেক্টর হয়ে পুলিসে ঢুকেছিলাম, তখন এই শহরেই পোস্টেড হয়েছিলাম। আবার রিটায়ার করলাম এই শহর থেকেই।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'শহরটার ওপর মায়া পড়ে গেছে আর কি। কতদিন রিটায়ার করেছেন?'

'সাত বছর।'

এই সময় ভৃত্য আসিয়া দুই ছিলিম তামাক দুটি গড়গড়ার মাথার উপর বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

নীলমণিবাবু একটি গড়গড়ার নল হাতে লইলেন, অন্যটি লইল ব্যোমকেশ। কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান চলিল। উৎকৃষ্ট গয়ার তামাক; ধূম-গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশকে প্রথমে দেখিয়া এবং তাহার পরিচয় পাইয়া অনেকেই তাহাকে পরম কৌতূহলের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। নীলমণিবাবুও তামাক টানিতে টানিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিরীক্ষণের মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। ভক্ত-সুলভ পুলক-বিহ্বলতা একেবারেই ছিল না; বরং তিনি যেন চক্ষু দিয়া ব্যোমকেশকে তৌল করিতেছিলেন, ব্যোমকেশের খ্যাতি ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য আছে তাহাই ওজন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। নীলমণিবাবু বুদ্ধিজীবী পুলিস কর্মচারী ছিলেন, স্বচক্ষে দেখিয়া মানুষের চরিত্র নির্ণয় করা তাঁহার কাজ ছিল; পরের মুখে ঝাল খাইবার লোক তিনি নন। তাই ব্যোমকেশকে তিনি নিজের বুদ্ধির নিকষে যাচাই করিয়া লইতে চান।

অবশেষে গড়গড়ার নলটি মুখ হইতে সরাইয়া তিনি যখন কথা বলিলেন, তখন তাঁহার কথার মধ্যেও এই প্রচ্ছন্ন অনুসন্ধিৎসা বক্রভাবে প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনাকে নিয়ে লেখা রহস্য কাহিনীগুলি সবই আমি পড়েছি। লক্ষ্য করেছি, সব সমস্যাই আপনি সমাধান করেছেন। তাই জানতে ইচ্ছে হয়, আপনি কি কখনো কোনো রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনে অকৃতকার্য হননি? কখনো কি ভুল করেননি?'

ব্যোমকেশ গড়গড়ার নল আমার হাতে দিয়া সবিনয়ে হাসিল। বলিল, 'কখনো ভুল করিনি এত বড় কথা বলার স্পর্ধা আমার নেই। নীলমণিবাবু, আমি সত্যান্বেষী। ভুল-ভ্রান্তি অনেক করেছি; এমনও অনেকবার হয়েছে যে অপরাধীকে ধরতে পারিনি। কিন্তু সত্যের সন্ধান পাইনি এমন বোধ হয় কখনো হয়নি। অবশ্য বলতে পারেন আমি ক'টা রহস্যই বা পেয়েছি। আমার চেয়ে হাজার গুণ বেশি রহস্য ঘটনা নিয়ে কাজ করেছেন আপনি। আপনি যতদিন চাকরিতে ছিলেন প্রত্যহ দু'চারটে ছোট-বড় কেস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। আমাকে যদি তাই করতে হত, আমারও অসংখ্য কেস অমীমাংসিত থেকে যেত সন্দেহ নেই।'

ব্যোমকেশের উত্তর শুনিয়া নীলমণিবাবু মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন মনে হইল। তিনি যখন আবার কথা বলিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটু ঘনিষ্ঠতার সুর ধ্বনিত হইল। তিনি বলিলেন, 'দেখুন ব্যোমকেশবাবু, পুলিসের কাজে অনেক ঝামেলা। চুনোপুঁটির কারবারই বেশি, রুই-কাৎলা কদাচিৎ মেলে। আবার মজা জানেন, ওই চুনোপুঁটিগুলোকেই ধরতে প্রাণ বেরিয়ে যায়, রুই-কাৎলা ধরা খুব শক্ত নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা বটে। ডাক্তারেরা বলেন শক্ত রোগের ওষুধ আছে, সর্দি-কাশি সারানোই কঠিন। তা—আপনার চারে যে-ক'টি রুই-কাৎলা এসেছে তাদের সকলকেই আপনি খেলিয়ে ডাঙায় তুলেছেন নিশ্চয়।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ উত্তর দিলেন না। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হাতের নলটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। তারপর ব্যোমকেশের দিকে একটি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়া বলিলেন, 'সব মাছই ডাঙায় তুলেছি ব্যোমকেশবাবু, কেবল একটি বাদে। আমার পুলিস-জীবনের শেষ বড় কেস। এই শহরেই ব্যাপারটা ঘটেছিল। কিন্তু কিনারা করতে পারলাম না।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আসামী কে তা জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রমাণ পেলেন না?'

নীলমণিবাবু ঈষৎ দ্বিধাভরে বলিলেন, 'একটা লোককে পাকা রকম সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই তার অ্যালিবাই ভাঙতে পারলাম না। তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটল যে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সত্যিকার আসামী যে কে সে সম্বন্ধে ধোঁকা আর কাটল না।'

'হুঁ' বলিয়া ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে নল লইল এবং তাকিয়ায় ঠেস দিয়া টানিতে লাগিল। নীলমণিবাবু ব্যোমকেশের উপর চক্ষু স্থির রাখিয়া গড়গড়ায় একটি লম্বা টান দিলেন, তারপর নল রাখিয়া দিয়া বলিলেন, 'আপনি গল্পটা শুনবেন?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, বলিল, 'বেশ তো, বলুন না। ভারি চমকপ্রদ গল্প হবে মনে হচ্ছে।'

'চমকপ্রদ কিনা আপনি বিচার করবেন। আমি যা-যা জানি সব আপনাকে বলছি। হয়তো আপনি আসামীকে সনাক্ত করতে পারবেন।' বলিয়া নীলমণিবাবু একটু হাসিলেন।

ইহা শুধু গল্প শুনাইবার প্রস্তাব নয়, ইহার অন্তরালে একটি চ্যালেঞ্জ রহিয়াছে। নীলমণিবাবু যেন ব্যোমকেশকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—এস দেখি, তোমার কত বুদ্ধি প্রমাণ কর।

ব্যোমকেশ কিন্তু রণাহ্বান গায়ে মাখিল না, হাসিয়া বলিল, 'আরে না না, আপনার মত অভিজ্ঞ পুলিস কর্মচারী যার কিনারা করতে পারেনি, আমার দ্বারা কি তা হবে? তবে গল্পটা শোনার কৌতূহল আছে। আপনি বলুন।'

আমরা নীলমণিবাবুর কাছে সরিয়া আসিয়া বসিলাম। তিনি পকেট হইতে একটা কৌটা বাহির করিয়া এক চিমটি জর্দা মুখে দিলেন। পান নয়, শুধু জর্দা। ইহাই বোধ হয় তাঁহার আসল নেশা।

তিনি গলা ঝাড়া দিয়া গল্প আরম্ভ করিবার উপক্রম করিতেছেন, বীরেনবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'আর এক দফা চা হবে নাকি? মধ্যাহ্ন ভোজনের এখনো বিস্তর দেরি। বিয়ে-বাড়ির ব্যাপার—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুক চা। এবং সেই সঙ্গে আব এক প্রস্থ তামাক।'

সম্মুখে চায়ের পেয়ালা এবং বাঁ হাতে গড়গড়ার নল লইয়া আমরা বসিলাম। নীলমণি মজুমদার তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীর গলায় গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

রিটায়ার করিবার বছর তিনেক আগে নীলমণিবাবু এই জেলার সদর থানার কর্তা হইয়া আসেন। তাঁহার তিনটি প্রধান গুণ ছিল : যে-বুদ্ধি থাকিলে তদন্ত-কর্মে কৃতকার্য হওয়া যায় সে-বুদ্ধি তাঁহার প্রচুর পরিমাণে ছিল; তিনি অতিশয় কর্মঠ ছিলেন; এবং তিনি ঘুষ লইতেন না। শহরটা পুলিস সেরেস্তায় দাগী শহর বলিয়া পরিচিত ছিল; খুন-জখম এবং আরও নানা প্রকার অবৈধ ক্রিয়া-কলাপ এখানে লাগিয়া থাকিত। নীলমণিবাবু পূর্ব হইতে এ শহরের সহিত পরিচিত ছিলেন, শহরের ধাত জানিতেন। তিনি আসিয়া দৃঢ় হস্তে শাসনের ভার তুলিয়া লইলেন।

বছর দেড়েক কাটিয়া গেল। নীলমণিবাবুর সতর্ক শাসনে শহর অনেকটা শান্ত-শিষ্ট ভাবে আছে। নীলমণিবাবুর অভ্যাস ছিল হপ্তায় দু'একবার কাহাকেও কিছু না বলিয়া গভীর রাত্রে সাইকেলে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতেন। শহরের একটা অংশ ছিল বিশেষ ভাবে অপরাধপ্রবণ; তাহারই অন্ধকার অলিগলিতে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন; পাহারাওয়ালারা নিয়মিত রোঁদ দিতেছে কিনা লক্ষ্য করিতেন। তাঁহার সাইকেলে আলো থাকিত না; সঙ্গে থাকিত পিস্তল এবং একটি বৈদ্যুতিক টর্চ। প্রয়োজন হইলে টর্চ জ্বালিতেন।

যে-রাত্রির ঘটনাটা লইয়া এই কাহিনীর আরম্ভ সে-রাত্রে নীলমণিবাবু সাইকেল চড়িয়া যথারীতি বাহির হইয়াছেন। নিশুতি রাত, কোথাও জনমানব নাই, রাস্তার আলোগুলো দূরে দূরে মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। ভদ্র পাড়া যেখানে অভদ্র পাড়ার সঙ্গে মিশিয়াছে সেইখানে আম-কাঁঠালের বাগান-ঘেরা কয়েকটা পুরাতন বাড়ি আছে। বাড়িগুলি জীর্ণ, আম-কাঁঠালের গাছগুলি বর্ষীয়ান। পূর্বে বোধ হয় এই স্থান ভদ্রপল্লীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন ভদ্রপল্লী ঘৃণাভরে দূরে সরিয়া গিয়াছে; ক্ষয়িষ্ণু বাড়িগুলি দুই পক্ষের মাঝখানে সীমানা রক্ষা করিতেছে। এখানে যাহারা বাস করে তাহাদের সামাজিক অবস্থাও ত্রিশঙ্কুর মত স্বর্গ ও মর্তের মধ্যবর্তী।

মন্থর গতিতে সাইকেল চালাইয়া এই পাড়ার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে

নীলমণিবাবু দেখিলেন, সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে কয়েকজন লোক একটি মাচার মত বস্তু কাঁধে লইয়া একটি বাড়ির ফটক হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহাদের ভাবভঙ্গী সন্দেহজনক।

নীলমণিবাবু জোরে সাইকেল চালাইলেন; কাছাকাছি আসিয়া বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বালিয়া লোকগুলার মুখে ফেলিলেন, উচ্চকণ্ঠে হুকুম দিলেন, 'দাঁড়াও।'

চারজন লোক ছিল; তাহারা একসঙ্গে কাঁধ হইতে মাচা ফেলিয়া পলায়ন করিল, মুহূর্তমধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু অদৃশ্য হইবার পূর্বে একজনের মুখ নীলমণিবাবু অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন; সে ওই বাড়ির মালিক সুরেশ্বর ঘোষ।

পলাতকেরা বিভিন্ন দিকে গিয়াছে, নীলমণিবাবু তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি মাচার নিকট গিয়া সাইকেল হইতে নামিলেন, এবং মাচার উপর টর্চের আলো ফেলিলেন।

মাচা নয়, মড়া বহিবার চালি। তাহাতে বাঁধা-ছাঁদা অবস্থায় পড়িয়া আছে একটি স্ত্রীলোকের দেহ। স্বাস্থ্যবতী সধবা যুবতী, দেহে কোথাও আঘাতের চিহ্ন নাই, কিন্তু মৃত।

নীলমণিবাবু হুইস্‌ল্‌ বাজাইলেন। একজন পাহারাওয়ালা কনেস্টবল কাছে-পিঠে ছিল, দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিল। প্রতিবেশীরাও ঘুম ভাঙিয়া নিজ নিজ গৃহ হইতে বাহির হইল।

প্রতিবেশীরা সকলেই মৃতদেহ সনাক্ত করিল; সুরেশ্বরের স্ত্রী হাসি। বাড়িতে অন্য কেহ থাকে না, কেবল সুরেশ্বর ও তাহার স্ত্রী হাসি।

নীলমণিবাবু কনেস্টবলকে থানায় রওনা করিয়া দিলেন, তারপর দুজন প্রতিবেশীকে লইয়া বাড়ি অনুসন্ধান করিলেন। বাড়িটি একতলা হইলেও আকারে ছোট নয়, ছয়খানি ঘর। কিন্তু অধিকাংশ ঘরই ব্যবহার হয় না। দুইটি ঘরে ব্যবহারের চিহ্ন পাওয়া যায়; তন্মধ্যে একটি শয়নের ঘর। এই ঘরটি বেশ বড়, তাহার দুই পাশে দুইটি খাট। দুইটি খাটেই বিছানা পাতা; একটিতে কেহ শয়ন করে নাই, অপরটি দেখিয়া মনে হয় ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বাড়িতে কেহ নাই।

বাগানেও কেহ নাই; বড় বড় আম-কাঁঠালের গাছগুলা সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নীলমণিবাবু প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মেয়েটির অসুখ করেছিল কিনা আপনারা জানেন?'

একজন প্রতিবেশী বলিল, 'অসুখ করেনি। আজই বিকেলবেলা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বিনোদবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল।'

'তাই নাকি! বিনোদবাবু কে?'

'বিনোদ সরকার, সোনারুপার দোকান আছে।'

ফটকের কাছে ফিরিয়া আসিয়া নীলমণিবাবু দেখিলেন, থানা হইতে দুইজন সাব-ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন জমাদার কনেস্টবল প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি অল্প কথায় ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়া একজন সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে মৃতদেহ হাসপাতালে রওনা করিয়া দিলেন, চারজন কনেস্টবল চালি বহিয়া লইয়া গেল।

প্রতিবেশীরা তখনও কেহ চলিয়া যায় নাই, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করিয়া জল্পনা করিতেছিল। নীলমণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মেয়েটির স্বামীর পুরো

নাম কি?'

একজন বলিল, 'সুরেশ্বর ঘোষ।'

'সে কোথায়?'

প্রতিবেশীরা কিছু বলিতে চায় না; শেষে একজন অনিচ্ছাভরে বলিল, 'সুরেশ্বর সন্ধ্যের পর খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যায়, রাত্রি একটা-দেড়টার আগে বাড়ি ফেরে না।'

'কোথায় যায়?'

'শুনেছি কালীকিঙ্কর দাসের দোকানে তাসের আড্ডা বসে, সেখানে যায়।'

'কালীকিঙ্কর দাসের দোকান কোথায়?'

প্রতিবেশীরা ঠিকানা দিল। নীলমণিবাবু তখন জমাদারকে অকুস্থলে বসাইয়া সাব-ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে লইয়া কালীকিঙ্কর দাসের দোকানের উদ্দেশ্যে চলিলেন। প্রতিবেশীদের বলিয়া গেলেন, 'কাল সকালে আসব, আপনাদের এজেহার নেব।'

কালীকিঙ্করের দোকান সুরেশ্বরের বাড়ি হইতে আধ মাইল দূরে, শহরের নিকৃষ্ট অংশ পার হইয়া যেখানে বাজার-হাট আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানে। লোহা-লক্কড়ের দোকান। বাজারের এই অংশটির নাম লোহাপটি।

নিশুতি বাজারের ভিতর দিয়া নীলমণিবাবু কালীকিঙ্করের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দোকানের সামনে রাস্তার পাশে ভারী ভারী লোহার ছড় গুচ্ছাকারে পড়িয়া আছে। কিন্তু দোকানের দ্বার বন্ধ। নীলমণিবাবু নিঃশব্দ পদে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া দেখিলেন, পাশের একটি জানালার ফুটা দিয়া শীর্ণ আলোকরশ্মি বাহিরে আসিতেছে। তিনি সন্তর্পণে জানালার কাছে গিয়া ফুটার মধ্যে চক্ষু নিবিষ্ট করিলেন।

তক্তপোশের উপর ফরাস পাতা; চারজন লোক বসিয়া নিবিষ্ট মনে তাস খেলিতেছে। তাহাদের মাঝখানে, ফরাসের উপর কিছু টাকা ও নোট জমা হইয়াছে। বাজি রাখিয়া খেলা চলিতেছে। তিন তাসের খেলা।

সাব-ইন্সপেক্টর সাইকেল লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিল। নীলমণিবাবু হাত নাড়িয়া তাহাকে ইশারা করিলেন, সে সাইকেল রাস্তায় শোয়াইয়া দিয়া দ্বারের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। নীলমণিবাবু তখন জানালায় টোকা দিলেন।

চারজন খেলোয়াড় একসঙ্গে জানালার দিকে ঘাড় ফিরাইল, চারজোড়া চোখ শঙ্কিত উৎকণ্ঠায় চাহিয়া রহিল; তারপর একজন এক খামচায় সম্মুখের টাকা-কড়ি তুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিল।

নীলমণিবাবু কড়া সুরে বলিলেন, 'দোর খোল।'

চারজন মুখ তাকাতাকি করিল, তারপর একজন গলা উঁচু করিয়া বলিল, 'কে?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'পুলিস। দোর খোল।'

আবার খেলোয়াড়ের মধ্যে মুখ তাকাতাকি। তারপর একজন, বোধ হয় দোকানের মালিক কালীকিঙ্কর দাস, উঠিয়া গেল। নীলমণিবাবু জানালা হইতে সরিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দ্বার খুলিল। রোগা অস্থিসার লোকটা দুই-জন ইউনিফর্ম-পরা পুলিস কর্মচারীকে দেখিয়া এক পা পিছাইয়া গেল, 'কে! কি চাই?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'তুমি কালীকিঙ্কর দাস?'

'হ্যাঁ। কি চাই?'

'এখানে আর কে কে আছে?'

কালীকিঙ্কর ঢোক গিলিয়া বলিল, 'আমার তিনজন বন্ধু আছে।'

নীলমণিবাবু আর বাক্যব্যয় করিলেন না, ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে লইয়া দোকানে প্রবেশ করিলেন। পাশে অফিস ঘরের দরজা; অফিস ঘরে গিয়া তিনি দেখিলেন, তিনজন খেলোয়াড় তখনও ফরাসের উপর বসিয়া আছে, একজন তাস ভাঁজিতেছে। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সকলকে নিরীক্ষণ করিলেন। সকলেরই বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, চেহারায় কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। কেবল এক ব্যক্তি, যে-ব্যক্তি তাস ভাঁজিতেছিল, হাড়ে-মাসে মজবুত গোছের লোক। দেখিয়া মনে হয় এই লোকটাই পালের গোদা।

নীলমণিবাবু প্রশ্ন করিলেন, 'সুরেশ্বর ঘোষ কার নাম?'

মজবুত লোকটি ভুরু তুলিয়া চাহিল, তারপর তাস রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, 'আমি সুরেশ্বর ঘোষ। কি দরকার?' তার স্বর শান্ত ও সংযত।

নীলমণিবাবু একে একে চারজনের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, 'তোমরা দুপুর রাত্রে মড়া নিয়ে ঘাটে পোড়াতে যাচ্ছিলে। ভেবেছিলে একবার পুড়িয়ে ফেলতে পারলে আর কোনো ভয় নেই।'

চারজনের মুখেই অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। সুরেশ্বর বলিল, 'মড়া! কি বলছেন! কার মড়া?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'ন্যাকামি করে পার পাবে না। আমি দেখেছি তোমাকে। যে-চারজন মড়া নিয়ে যাচ্ছিল, তুমি তাদের একজন।'

সুরেশ্বর বলিল, 'কবেকার কথা বলছেন?'

'আজকের কথা বলছি। আজ রাত্রি বারোটার কথা।'

'বাজে কথা বলছেন। আজ রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমরা এখানে তাস খেলতে বসেছি, এক মিনিটের জন্যে কেউ বাইরে যাইনি।'

'বটে! সারাক্ষণ তাস খেলেছ! জুয়া?'

তিনজনে ঘাড় চুলকাইতে লাগিল। সুরেশ্বর কিন্তু তিলমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, 'হ্যাঁ, জুয়া খেলছিলাম। আমরা চার বন্ধু মিলে মাঝে মাঝে খেলি।'

নীলমণিবাবু দেখিলেন এখানে ইহাদের কাবু করা যাইবে না, থানায় লইয়া যাইতে হইবে। বলিলেন, 'আপাতত জুয়া খেলার অপরাধে আমি তোমাদের অ্যারেস্ট করছি। থানায় চল।'

অতঃপর কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটি চলিল, শেষ পর্যন্ত তাহারা থানায় যাইতে রাজী হইল। নীলমণিবাবু বলিলেন, 'যদি জামিন যোগাড় করতে পার, আজ রাত্তিরেই ছেড়ে দেব।'

রাস্তায় কিছুদূর যাইবার পর সুরেশ্বর বলিল, 'মড়ার কথা কী বলছিলেন? কার মড়া?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'তোমার স্ত্রীর।'

সুরেশ্বর রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িল, 'অ্যাঁ! আমার স্ত্রী! কি বলছেন আপনি?'

'বলছি, তোমার স্ত্রী খুন হয়েছে।'

'না না! এসব কি রকম কথা! আমি বিশ্বাস করি না। হাসি!—না, আমি বাড়ি চললাম।'

'বাড়ি গিয়ে কোন লাভ নেই। মৃতদেহ হাসপাতালে চালান দেওয়া হয়েছে।'

থানায় পেঁছিয়া নীলমণিবাবু চারজনকে হাজতে পুরিলেন। তারপর অফিসে বসিয়া একে একে তাহাদের জেরা আরম্ভ করিলেন। প্রথমে ডাকিলেন সুরেশ্বরকে। সে টেবিলের পাশের একটি চেয়ারে উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি কাজ কর?'

সুরেশ্বর বলিল, 'অনেক রকম ব্যবসা আছে। পাইকিরি ব্যবসা। আমি পয়সা-ওয়ালা লোক, পুঁচকে দোকানদার নই।'

'ব্যাড়িটা তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন কিনেছ?'

'পাঁচ-ছয় বছর হবে। উনিশ হাজার টাকায় কিনেছিলাম।'

নীলমণিবাবুকে টাকার কথা শুনাইয়া লাভ হইল না, তিনি অটলভাবে প্রশ্ন করিয়া চলিলেন, 'কতদিন আগে বিয়ে করেছিলে?'

'সাত বছর আগে।'

'শ্বশুরবাড়ি কোথায়?'

'এই শহরে।'

'শ্বশুরের নাম কি?'

'দিনমণি হালদার।'

'সে এখন কোথায়?'

'জানি না। সম্ভবত জেলে।'

'জেলে?'

'হ্যাঁ। জেল আমার শ্বশুরের ঘর-বাড়ি।'

'হুঁ। শ্বশুরের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব আছে?'

'মুখ দেখাদেখি নেই।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত কবিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, 'বৌয়ের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব ছিল?'

একটু দ্বিধা করিয়া সুরেশ্বর বলিল, 'বিয়েব সাত বছর পরে যতটা সদ্ভাব থাকা সম্ভব ততটা ছিল।'

'ছেলে-পিলে নেই?'

'না। বৌ বাঁজা।'

নীলমণিবাবু আঙুল তুলিয়া বলিলেন, 'আজ রাত্রি বারোটার সময় তুমি আর তোমার বন্ধুরা মিলে তোমার স্ত্রীর মৃতদেহ বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যাচ্ছিলে, আমি টর্চের আলো ফেলে তোমাকে দেখেছি।'

সুরেশ্বর নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলিল, 'আপনি ভুল দেখেছেন। রাত্রি বারোটার সময় আমি আর আমার বন্ধুরা কালীকিংকরের দোকানে বসে তাস খেলছিলাম।'

'হুঁ। তোমার স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল?'

'মেয়েমানুষের স্বভাব-চরিত্রের কথা কে বলতে পারে? তবে পাড়া-পড়শীরা বদনাম দিত।'

'কি বদনাম্ দিত?'

'আমি রাত্রে দেরি করে বাড়ি ফিরি। কয়েক মাস থেকে কে একজন নাকি বাগানে এসে হাসির সঙ্গে দেখা করত।'

'স্ত্রীকে এ বিষয়ে কিছু জিগ্যেস করেছিলে?'

'করেছিলাম। সে বলেছিল সব মিথ্যে কথা।'

'আর কিছু?'

'আর কি! একবার হাসির আলমারি খুলে তার মধ্যে এমন কয়েকটা গহনা দেখেছিলাম যা আমি তাকে দিইনি।'

'কোথা থেকে গয়না এল বৌয়ের কাছে খোঁজ নিয়েছিলে?'

'কি হবে খোঁজ নিয়ে? মেয়েমানুষ যদি নষ্ট হতে চায় কেউ তাকে আটকাতে পারে না।'

'কিন্তু খুন করতে পারে।'

'আমি হাসিকে খুন করিনি।'

নীলমণিবাবু আরও অনেকক্ষণ নানা ভাবে জেরা করিলেন, কিন্তু সুরেশ্বরকে টলাইতে পারিলেন না। বরং তাহার ঠোঁট-কাটা স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া মনে হয় সে সত্য কথা বলিতেছে।

সুরেশ্বরকে হাজতে ফেরৎ পাঠাইয়া নীলমণিবাবু কালীকিঙ্করকে ডাকিয়া আনিলেন। কালীকিঙ্করের হাড় বাহির করা শরীরের মধ্যে লোহ-কঠিন একটি মন ছিল, নীলমণি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা বাঁকাইতে পারিলেন না। চার বন্ধু রাত্রি সাড়ে আটটার সময় তাহার দোকানে তাস খেলিতে বসিয়াছিল, নীলমণিবাবু আসা পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও কেহ বাহিরে যায় নাই, এ কথার নড়চড় হইল না।

অন্যান্য বিষয়ে কিন্তু কালীকিঙ্কর সোজাসুজি উত্তর দিল। সুরেশ্বর তাহার আজীবনের বন্ধু, তাহার ঘরের খবর সবই কালীকিঙ্কর জানে। সুরেশ্বরের অবস্থা আগে ভাল ছিল না, যুদ্ধের বাজারে সে পয়সা করিয়াছে। হাসিকে সে বিবাহ করিয়াছিল গরীব অবস্থায়। হাসির বাপটা ছিল একাধারে চোর এবং বোকা; চুরি করিয়া ধরা পড়িয়া যাইত এবং জেলে যাইত। হাসির মায়েরও বদনাম ছিল। বস্তিতে বাস করিলে ভদ্রলোকের মেয়েরও চালচলন খারাপ হইয়া যায়; যেমন দেখিবে তেমনি তো শিখিবে। হাসির বাপ যখন জেলে থাকিত তখন নাকি হাসির মায়ের ঘরে লোক আসিত। সুরেশ্বর যখন হাসিকে বিবাহ করিতে উদ্যত হয়, তখন বন্ধুরা সকলেই মানা করিয়াছিল, কিন্তু সুরেশ্বর কাহারও কথা শুনিল না। তারপর যুদ্ধের বাজারে সুরেশ্বর টাকা করিয়াছে, বাড়ি কিনিয়াছে; কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তেমন বনিবনাও নাই। সুরেশ্বর বাড়িতে বেশি থাকে না, বাহিরে বাহিরে দিন কাটায়। কিন্তু তাই বলিয়া সে স্ত্রীকে খুন করিয়াছে একথা একেবারেই সত্য নয়। সুরেশ্বর তেমন লোকই নয়। সে ভদ্র সন্তান; জীবনের আরম্ভে অনেক দুঃখ-কষ্ট পাইয়া বস্তিতে থাকিয়া বড় হইয়াছে বটে, কিন্তু তার মনটা খুব উঁচু।

কালীকিঙ্করের বন্ধু-প্রশস্তি শেষ হইলে নীলমণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুরেশ্বরের শ্বশুর দিনমণি হালদার এখন কোথায়?'

কালীকিঙ্কর বলিল, 'বছর দুই আগে দিনু হালদার জেল থেকে বেরিয়ে

এখানে এসেছিল। হাসির মা তখন মরে গেছে। দিনু হালদার দু'তিন দিন মেয়ে-জামাইয়ের কাছে ছিল। একদিন সুরেশ্বরের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। দিনু হালদার কোথায় চলে গেল। তারপর থেকে আর তাকে দেখিনি। বয়স হয়েছিল, জেল খেটে শরীরও ভেঙে পড়েছিল। হয়তো মরে গেছে।'

অতঃপর নীলমণিবাবু কালীকিঙ্করকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেবু মণ্ডলকে আনাইলেন। দেবু মণ্ডল কয়লা ও জ্বালানি কাঠের ব্যবসা করে; বিত্তবান ব্যক্তি। সুরেশ্বরের বাল্যবন্ধু, সুখে-দুঃখে নিত্য-সহচর। সুরেশ্বরের স্ত্রীকে খুন করিয়া তাহারা পোড়াইতে লইয়া যাইতেছিল একথা সর্বৈব মিথ্যা। তাহারা তাস খেলিতে-ছিল। বন্ধু-পত্নীর চরিত্র সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে সে অক্ষম; তবে হাসি সদ্‌বংশের মেয়ে ছিল না একথা যথার্থ।

দেবু মণ্ডলকে নীলমণিবাবু ভাঙিতে পারিলেন না, নূতন কোনও তথ্যও আবিষ্কৃত হইল না। তিনি অবশেষে বলিলেন, 'শ্মশান ঘাটে তোমার কাঠের আড়ৎ আছে?'

দেবু মণ্ডল থতমত খাইয়া বলিল, 'আছে। শহরে দুটো আড়ৎ আছে, আর শ্মশানে একটা।'

নীলমণিবাবু কুঞ্চিত চক্ষে কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'এবার সত্যি কথা বলবে?'

দেবু মণ্ডল বলিল, 'সত্যি কথাই বলছি।'

চতুর্থ ব্যক্তির নাম বিলাস দত্ত। ঠিকাদারের কাজ করে, বিল্‌ডিং কন্‌ট্রাক্টর; অতিশয় মিষ্টভাষী ও রসিক। নীলমণিবাবুকে একটি অশ্লীল রসিকতা শুনাইয়া ঘাড় নিচু করিয়া জিভ কাটিল। তাস খেলার ব্যাপার সম্বন্ধে কিন্তু তাহার মনে লেশমাত্র সংশয় নাই। নীলমণিবাবু দেখিলেন বিলাস দত্ত যে শ্রেণীর লোক, সে অজস্র মিথ্যা কথা বলিবে কিন্তু কাজের কথা একটিও বলিবে না। তিনি হতাশ হইয়া বলিলেন, 'তুমি ঠিকেদার, তোমার অনেক বাঁশ আছে?'

বিলাস দত্ত বলিল, 'বাঁশ! আছে বৈকি, এন্তার বাঁশ আছে। ভারা বাঁধবার জন্যে দরকার হয় কিনা।'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'হুঁ, মড়ার চালি বাঁধবার জন্যেও দরকার হয়।'

বন্ধু চতুষ্টয়ের জেরা শেষ করিতে রাত কাবার হইয়া গেল।

পরদিন কিন্তু তাহাদের আর হাজতে আটকাইয়া রাখা গেল না। তাহাদের উকিল জামিন দিয়া তাহাদের খালাস করিয়া লইয়া গেলেন। নীলমণিবাবুর মনে অভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সুরেশ্বর ঘোষ স্ত্রীকে খুন করিয়াছে এবং বাকি তিনজন এই ব্যাপারে লিপ্ত আছে। কিন্তু প্রমাণ নাই; তিনি যাহা চোখে দেখিয়াছেন তাহার কোন সমর্থক নাই; তাঁহার সাক্ষ্য উকিলের জেরায় উড়িয়া যাইবে। তাই বর্তমানে তিনি তাহাদের নামে খুনের অভিযোগ আনিতে পারিলেন না। কেবল জুয়া খেলার অভিযোগেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

তিনি কিন্তু খুনের তদন্তে বিরতি দিলেন না। তিনি দুইজন সহকারী লইয়া সুরেশ্বরের প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করিলেন, তাহাদের বয়ান শুনিলেন। শেষে বেলা প্রায় একটার সময় সুরেশ্বরের বাড়িতে গেলেন। ফটকে একজন কনেস্টবল পাহারায় ছিল, সে বলিল, সুরেশ্বর বেলা এগারোটা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বাড়িতে আছে।

নীলমণিবাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সুরেশ্বর শয়নকক্ষের একটা খাটে শুইয়া ঘুমাইতেছে। পুলিসের জুতার শব্দে সে রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিল, জড়িত স্বরে বলিল, 'আবার কী চাই?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'আমরা বাড়ি তল্লাশ করতে এসেছি।'

'করুন তল্লাশ। যা ইচ্ছে করুন।' বলিয়া সে আবার শয়নের উপক্রম করিল। তাহার বোধ হয় বেলা পর্যন্ত ঘুমানো অভ্যাস, তার উপর কাল সারা রাত্রি জাগরণে গিয়াছে, আজ বোধ হয় সারা দিন ঘুমাইবে। কিন্তু—স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার মনে কি একটুও দাগ পড়ে নাই? খুন করুক বা না করুক, এমন নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতেছে কি করিয়া!

যা হোক, নীলমণিবাবু তাহাকে ঘুমাইতে দিলেন না। বলিলেন, 'তোমার স্ত্রীর গয়নাগুলো দেখতে চাই।'

সুরেশ্বর বিরক্ত মুখে উঠিয়া একটা দেয়াল-আলমারির কপাট খুলিল, তাহার একটা তাকে কাপড়-চোপড়ের পেছন হইতে এক থাবা সোনার গহনা বাহির করিল। আটপৌরে গহনা কিছু আছে, তাছাড়া তোলা গহনা। নীলমণিবাবু বলিলেন, 'এর মধ্যে কোন্ গয়না তুমি দাওনি?'

সুরেশ্বর একটা আংটি, এক জোড়া কানের দুল, একটা চুলের কাঁটা বাছিয়া তাঁহার হাতে দিল। এ গহনাগুলি নূতন, ব্যবহৃত হয় নাই।

নীলমণিবাবু সেগুলি নিজের পকেটে রাখিয়া বলিলেন, 'এগুলো আমি রাখছি। পরে ফেরৎ দেব।'

তারপর তাহারা সমস্ত বাড়ি ও বাগান তন্ন তন্ন করিলেন, কিন্তু এমন কিছুই পাওয়া গেল না—যাহা হইতে হাসির মৃত্যুর কোন হদিস পাওয়া যায়।

বৈকালে সাড়ে তিনটার সময় নীলমণিবাবু সুরেশ্বরের বাড়ির তদন্ত শেষ করিলেন এবং সহকারীদের ফেরৎ পাঠাইয়া নিজে বিনোদ সরকারের দোকানের দিকে চলিলেন। বাজারের মধ্যে বিনোদ সরকারের সোনা-রূপার দোকানটা তাঁহার দেখা ছিল, বেশ বড় দোকান; দোকানের মধ্যেই কারিগরদের কাজ করিবার কারখানা।

বিনোদবাবু দোকানে ছিলেন, একটি সুসজ্জিত কক্ষে টেবিলের সামনে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন। লোকটির বয়স অনুমান পঞ্চাশ, কিন্তু ভারি শৌখীন মানুষ। গায়ে তসরের পাঞ্জাবী, গিলে করা ফরাসডাঙার ধুতি, গোঁফের উপর-নিচে কামাইয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম করিয়া তোলা হইয়াছে, মাথার সম্মুখ ভাগে এক গোছা চুল তিনদিক হইতে টাকের আক্রমণ কোনমতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। আকৃতি একটু খর্ব, কিন্তু তদনুপাতে বেশ গোলগাল।

পুলিস দেখিয়া তিনি একটু বিব্রত হইলেন, বলিলেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো? আমার দোকানে কি কোন গণ্ডগোল হয়েছে?'

নীলমণিবাবু সামনের চেয়ারে বসিলেন, বলিলেন, 'না। আপনার কাছে কিছু খবর জানতে এসেছি।'

বিনোদবাবু ধাতস্থ হইলেন, নীলমণিবাবুর দিকে পানের ডিবা ও জর্দার কৌটা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'কি খবর?'

নীলমণিবাবু পান লইলেন না, জর্দার কৌটা হইতে এক চিম্‌টি জর্দা লইয়া মুখে দিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, 'সুরেশ্বর ঘোষের স্ত্রী মারা গেছে আপনি জানেন?'

বিনোদবাবু চেয়ার হইতে প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন, 'হাসি মারা গেছে! সে কি! কাল বিকেলে যে আমি তাকে দেখেছি।'

'কাল রাত্রে মারা গেছে।'

'রাত্রে! কিন্তু বিকেলবেলা সে তো ভালই ছিল। কিসে মারা গেল? কী হয়েছিল তার?'

'আমার বিশ্বাস কাল রাত্রে তাকে খুন করা হয়েছে।'

'খুন!' বিনোদবাবু আস্তে আস্তে চেয়ারে বসিলেন, কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ টেবিলের উপর প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া বলিলেন, 'সুরেশ্বর খুন করেছে। ও ছাড়া আর কেউ নয়।'

'সুরেশ্বরের কিন্তু অকাট্য অ্যালিবাই আছে।'

'থাক অ্যালিবাই, ঐ সুরেশ্বরের কাজ। সুরেশ্বর আর ওর ওই তিনটে বন্ধু মহা ধূর্ত আর পাজি। ওদের অসাধ্য কাজ নেই।'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'আপনি হাসিকে অনেক দিন থেকে চেনেন?'

'ওকে তিন-চার বছর বয়স থেকে দেখে আসছি।' তিনি নলটি মুখ হইতে লইয়া কিছুক্ষণ তাহার অগ্রভাগ পরিদর্শন করিলেন, একবার নীলমণিবাবুর দিকে চকিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন; তারপর হ্রস্ব স্বরে বলিলেন, 'আপনি পুলিস, আপনার কাছে লুকোব না, কম বয়সে আমি একটু—ইয়ে--হাসির মায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে আজ বিশ-বাইশ বছর আগেকার কথা। হাসির বাপটা ছিল হতভাগা চোর, নেশাখোর, জালিয়াৎ। স্ত্রী-কন্যাকে খেতে দিতে পারত না। হাসির মা পেটের দায়ে –কিন্তু সে যাক। বছর কয়েক আগে হাসির মা মারা গেল। মৃত্যুকালে আমাকে ডেকে মিনতি করে বলে গিয়েছিল, হাসিকে তুমি দেখো, জামাইয়ের মন ভাল নয়।—তার মৃত্যু-শয্যার অনুরোধ আমি এড়াতে পারিনি; হাসিকে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতাম। হাসির মা সতীসাধ্বী ছিল না, কিন্তু তার প্রকৃতি ছিল বড় মধুর।'

কিছুক্ষণ আর কোন কথা হইল না। তারপর নীলমণিবাবু বলিলেন, 'তাহলে আপনার সন্দেহ সুরেশ্বর হাসিকে খুন করেছে?'

বিনোদবাবু যেন স্মৃতি-সমুদ্রের তলদেশ হইতে উঠিয়া আসিলেন, 'অ্যাঁ! হ্যাঁ, আমার তাই বিশ্বাস।'

'কিন্তু কেন? মোটিভ কি?'

'দেখুন, সুরেশ্বর যখন হাসিকে বিয়ে করেছিল, তখন তার চালচুলো কিছু ছিল না। তারপর যুদ্ধের বাজারে সে বড়লোক হল। তখন তার উচ্চাশা হল সে ভদ্রসমাজে মিশবে, দশজনের একজন বলে গণ্য হবে। কিন্তু হাসি বেঁচে থাকতে সে-সম্ভাবনা নেই; হাসির মা-বাপের কেচ্ছা শহরে কে না জানে? তাই সুরেশ্বর হাসিকে মেরেছে। এবার নতুন বিয়ে করে ভদ্রলোক হয়ে বসবে।'

'হাসির স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল?'

'হেলাগোলা মেয়ে ছিল, মনে ছল-কপট ছিল না। একটু হয়তো পুরুষ-ঘেঁষা ছিল, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকত, রাস্তা দিয়ে লোক গেলে ডেকে কথা কইত। কিন্তু তাতেও তাকে দোষ দেওয়া যায় না। পাড়ার মেয়েরা ওর সঙ্গে ভাল করে কথা বলত না, কেউ বা বাঁকা কথা বলত। হাসিও তো মানুষ, তারও তো কথা কইবার দুটো লোক দরকার। আমি জোর করে বলতে পারি, অন্য দোষ তার যতই

থাক, মন্দ সে ছিল না।'

নীলমণিবাবু কৌটা হইতে আর এক টিপ জর্দা মুখে দিলেন, তারপর পকেট হইতে গহনাগুলি বাহির করিয়া বিনোদবাবুর সম্মুখে রাখিলেন, 'দেখুন তো, এগুলো চিনতে পারেন?'

'হাসির গয়না নাকি?' বলিয়া বিনোদবাবু সেগুলি হাতে তুলিয়া লইলেন, তারপর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'এ গয়না আমি হাসিকে কখনো পরতে দেখিনি!'

'আপনি কখনো তাকে গয়না উপহার দেননি?'

বিনোদবাবু মাথা নাড়িলেন, 'না। আমি তাকে পুজো আর দোলের সময় এক-খানা করে শাড়ি দিতাম। গয়না কখনো দিইনি।'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'এ গয়না কি আপনার দোকানে তৈরি?'

বিনোদবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গহনাগুলি আবার পরীক্ষা করিলেন, বলিলেন, 'না, এ গয়না আমার কারিগরের তৈরি নয়। কিন্তু, দাঁড়ান—' তিনি ঘণ্টি টিপিয়া চাকরকে ডাকিলেন—'রামদয়ালকে পাঠিয়ে দাও।'

চশমা চোখে বয়স্থ কারিগর রামদয়াল আসিলে, তাহাব হাতে গহনাগুলি দিয়া বলিলেন, 'দেখ তো, এ গয়না কি আমাদের তৈরি?'

রামদয়াল ভাল করিয়া দেখিযা বলিল, 'আজ্ঞে না, এ গয়না কলকাতাব কারিগরের তৈরি।'

'আচ্ছা, যাও।

নীলমণিবাবুও উঠিলেন, গহনাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিলেন, 'আজ তবে উঠি, যদি দরকার হয় আবার আসব।'

'যখন ইচ্ছে আসবেন।'

সেদিন সন্ধ্যাকালে নীলমণিবাবু সিভিল সার্জন মেজর বর্মণের বাংলোতে গেলেন। বাংলোতেই অফিস। মেজর বর্মণ দিনের কাজ শেষ কবিয়া উঠি-উঠি করিতেছেন, নীলমণিবাবু বলিলেন, 'খবর নিতে এলাম।'

মেজব বর্মণ বলিলেন, 'বসুন। পি এম্ কর্বেছি। রিপোর্ট কাল পাবেন।'

'কি দেখলেন? মৃত্যুর সময়?'

'আন্দাজ রাত্রি দশটা।'

'মৃত্যুর কারণ?'

'যতদূর দেখেছি গায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল না।'

'বিষ-টিষ নাকি?'

মেজর বর্মণ একটি সিগার ধরাইয়া তাহাতে মন্দ-মন্থর টান দিলেন, 'বিষ নয়। বড় আশ্চর্য উপায়ে মেরেছে। আপনার সন্দেহভাজনদের মধ্যে মিলিটাবি-ম্যান কেউ আছে নাকি?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'মিলিটারি-ম্যান কেউ নেই। কিন্তু মেয়েটির স্বামী যুদ্ধের সময় মিলিটারী কণ্ট্র্যাক্টর ছিল, গোরাদের সংস্পর্শে এসেছে। কী ব্যাপার বলুন?'

মেজর বর্মণ বলিলেন, 'মেয়েটির গায়ে আঘাতের চিহ্ন বাইরে থেকে দেখা যায় না, কিন্তু তার গলার তরুণাস্থি, যাকে Thyroid Cartrilage বলে, সেটা একেবারে চূর্ণ হয়ে গেছে।'

নীলমণিবাবু স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 'মানে গলা টিপে মেরেছে!'

'না। গলা টিপে মারলে চামড়ার ওপর আঙুলের দাগ থাকত। আর, গলা টিপে মারার মধ্যে বৈচিত্র্য কিছু নেই।'

'তবে?'

মেজর বর্মণ কয়েকবার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, 'গত মহাযুদ্ধে সৈনিকদের অস্ত্রহীন যুদ্ধের কৌশল শেখানো হয়েছিল, আপনি জানেন?'

'না। সে কি রকম?'

'মনে করুন বনে-জঙ্গলে যুদ্ধ হচ্ছে। আপনি নিরস্ত্র অবস্থায় একজন সশস্ত্র শত্রুর হাতে ধরা পড়লেন। পালাবার উপায় নেই, পালাবার চেষ্টা করলে সে আপনাকে গুলি করে মারবে। এ অবস্থায় আত্মরক্ষার উপায় কি?—আপনি কৌশলে শত্রুর ডান পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর হঠাৎ তার দিকে ঘুরে ডান হাতের পোঁচা দিয়ে সজোরে মারলেন তার গলায়। Thyroid Cartrilage ভেঙে গেল, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল।'

'তৎক্ষণাৎ মৃত্যু?'

'হ্যাঁ। গলা টিপে মারতে গেলে আক্রান্ত ব্যক্তি যুদ্ধ করে মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এতে ওসব বালাই নেই, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আশ্চর্য! মেয়েটির মৃত্যু এইভাবে হয়েছে এতে আপনার সন্দেহ নেই?'

'কোন সন্দেহ নেই।'

'আচ্ছা, আজ উঠি। কাল সকালে লোক পাঠাব রিপোর্টের জন্যে।'

নীলমণিবাবু থানায় ফিরিয়া আসিলেন। সুরেশ্বর যে হাসিকে খুন করিয়াছে ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা ধোঁকা রহিয়াছে। যে লোকটা রাত্রে আসিয়া হাসির সঙ্গে দেখা করিত, সে কে? সে-ই কি হাসিকে গহনাগুলা উপহার দিয়াছিল? হাসির সহিত লোকটার কিরূপ সম্বন্ধ? সে যদি হাসির 'বন্ধু' হয় তবে হাসিকে খুন করিবে কেন?

সে-রাত্রে আর কিছু হইল না। পরদিন সকালে একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও একজন রাইটার জমাদারকে সঙ্গে লইয়া নীলমণিবাবু আবার সুরেশ্বরের বাড়িতে গেলেন। আজ যেমন করিয়া হোক সুরেশ্বরের নিকট হইতে তিনি স্বীকারোক্তি আদায় করিবেন।

সুরেশ্বরের বাড়ির সদর দরজা খোলা, বাড়িতে কেহ আছে বলিয়া মনে হইল না। দু'চার বার ডাকাডাকি করিয়া নীলমণিবাবু সঙ্গীদের লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। শয়নকক্ষের খোলা দরজার সামনে গিয়া তাঁহাদের গতি রুদ্ধ হইল। মেঝের উপর সুরেশ্বর মরিয়া পড়িয়া আছে।

গত রাত্রে সুরেশ্বর যথা-নিয়ত কালীকিঙ্করের দোকানে তাস খেলিতে গিয়াছিল। রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময় গৃহে ফিরিয়া আসে। তারপর কি হইয়াছে কেহ জানে না।

সিভিল সার্জন মেজর বর্মণ সুরেশ্বরের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া রিপোর্ট দিলেন, গলার Thyroid Cartrilage ভাঙিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাৎ যে উপায়ে হাসির মৃত্যু হইয়াছিল ঠিক সেই উপায়ে সুরেশ্বরেরও মৃত্যু হইয়াছে।

গল্প শেষ করিয়া নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ হেঁট মুখে বসিয়া রহিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'এই হচ্ছে ঘটনা। তদন্তের সূত্রে আমি যা-যা জানতে পেরেছিলাম সব আপনাকে বলেছি। আমি প্রথমে সুরেশ্বরকে সন্দেহ করেছিলাম, পরে দেখলাম, হাসি আর সুরেশ্বরকে একই লোক একই উপায়ে খুন করেছে। আমি আসামীকে ধরতে পারিনি, আসামী কে তাও জানতে পারিনি। আপনি বলতে পারেন কে আসামী?'

ব্যোমকেশ গালে হাত দিয়া শুনিতেছিল, বলিল, 'আরো কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'উত্তর যদি জানা থাকে নিশ্চয় দেব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সুরেশ্বরের ওয়ারিস্ কে?'

'সুরেশ্বরের এক খুড়তুতো বোন। সুরেশ্বর উইল করেনি। খুড়তুতো বোনটি অনাথা বিধবা, কলকাতায় কোথায় রাঁধুনি-বৃত্তি করত, সে-ই সব পেয়েছে।'

'যাক। যে-রাত্রে সুরেশ্বরের মৃত্যু হয় সে-রাত্রে ওর তিন-বন্ধু কালীকিঙ্কর দেবু মণ্ডল আর বিলাস দত্ত কোথায় ছিল?'

'সুরেশ্বরের বাড়ি যাবার পর ওরা তিনজন প্রায় সারা রাত কালীকিঙ্করের দোকানে বসে তাস খেলেছিল। আমি ওদের প্রত্যেকের পিছনে চর লাগিয়েছিলাম, তাদের কাছেই খবর পেয়েছি। ওরা সুরেশ্বরকে খুন করেনি।'

'হুঁ। বিনোদ সরকারের পিছনে চর লাগিয়েছিলেন?'

'না। বিনোদ সরকারের ওপর আমার সন্দেহ হয়নি। তার কোনো মোটিভ ছিল না। সুরেশ্বরকে হয়তো মারতে পারতো, কিন্তু হাসিকে মারবে কেন?'

'তা বটে। দিনমণি হালদার তখন কোথায় ছিল খোঁজ নিয়েছিলেন?'

'নিয়েছিলাম। সে তখন পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা গ্রামে ছিল। আমাশায় ভুগছিল। নড়বার ক্ষমতা ছিল না। তাছাড়া ওভাবে খুন করবার কৌশল সে জানবে কোত্থেকে?'

'হুঁ। আচ্ছা, একটা কথা বলুন। আপনার কি মনে হয় হাসির স্বভাব-চরিত্র মন্দ ছিল?'

'না। আমার বিশ্বাস সে ভাল মেয়ে ছিল।'

ব্যোমকেশ নতমুখে ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'কিন্তু তার রক্তে দোষ ছিল। তার মা—কি নাম হাসির মায়ের?'

'অমলা।'

ব্যোমকেশ চোখ তুলিয়া নীলমণিবাবুর পানে চাহিল; তিনিও প্রখর চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার শরীর ক্রমশ কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দুইজনের চোখে চোখ আবদ্ধ হইয়া রহিল; তারপর ব্যোমকেশ তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিল, নির্বাপিত গড়গড়ার নলটা হাতে তুলিয়া লইল।

নীলমণিবাবু আত্মসংবরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, 'আর কিছু জানতে চান?'

ব্যোমকেশ নিরুৎসুক ভাবে মাথা নাড়িল, 'আর কিছু জানবার নেই।'

নীলমণিবাবু একটু বাঁকা সুরে বলিলেন, 'কিছু বুঝলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সবই বুঝেছি, নীলমণিবাবু।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'সবই বুঝেছেন!

হাসিকে কে খুন করেছিল আপনি বুঝেছেন?'

'বুঝেছি বৈকি। হাসিকে খুন করেছিল সুরেশ্বর।'

'তাই নাকি! তাহলে সুরেশ্বরকে মারল কে?'

'সুরেশ্বরকে মেরেছিল—হাসির বাপ।'

'হাসির বাপ! কিন্তু দিনমণি হালদার সে-সময় পঞ্চাশ মাইল দূরে ছিল—'

'আমি দিনমণি হালদারের কথা বলিনি, হাসির বাপের কথা বলেছি। হাসির জন্মদাতা পিতা।'

নীলমণিবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। দেখিতে লাগিলাম তাঁহার মুখ হইতে পরতে পরতে রক্ত নামিয়া যাইতেছে। অবশেষে তিনি যখন কথা বলিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য আর নাই, ক্ষীণ স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'জন্মদাতা পিতা—কার কথা বলছেন?'

ব্যোমকেশ দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'কার কথা বলছি আপনি জানেন, নীলমণিবাবু। গল্পটা আমাকে না বললেই ভাল করতেন।'

অতঃপর নীলমণিবাবু কী বলিতেন তাহা আর শোনা হইল না। বীরেনবাবু প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, রান্না তৈরি। আপনারা স্নান করে নিন। নীলমণিদা, আপনিও মধ্যাহ্ন ভোজনটা এখানেই সেরে নিন না?'

নীলমণিবাবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'না না, আমি চললাম। অনেক দেরি হয়ে গেল।' বলিয়া তিনি দ্রুত প্রস্থান করিলেন। আমাদের প্রতি আর দৃক্‌পাত করিলেন না।

আহারাদি সম্পন্ন করিয়া দুইজনে তাকিয়া মাথায় দিয়া লম্বা হইয়াছিলাম। গড়গড়া চলিতেছিল।

বলিলাম, 'কি করে বুঝলে বল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'নীলমণিবাবুর গল্প শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল হাসির প্রতি তাঁর পক্ষপাত আছে। অথচ তাঁর গল্প অনুযায়ী, হাসিকে জীবিত অবস্থায় তিনি দেখেননি। তার চরিত্র সম্বন্ধে যে সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে তাকে পতিগতপ্রাণা সতীসাধ্বী মনে করবার কারণ নেই। সে প্রগল্‌ভা ছিল, তার স্বামী তাকে সন্দেহ করত, একজন অজ্ঞাত লোক রাত্রে তার সঙ্গে দেখা করত। তবে তার প্রতি নীলমণিবাবুর পক্ষপাত কেন?

'হাসির মা অমলাও সীতা-সাবিত্রী ছিল না। অমলার স্বামী দিনমণি হালদার জেলখানার পোষা পাখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল; মাঝে মাঝে ছাড়া পেত, আবার জেলে গিয়ে ঢুকত। দিনমণি হালদার হাসির বাপ নাও হতে পারে।

'বিনোদ সরকারও হাসির বাপ নয়। হাসির মায়ের সঙ্গে যখন তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তখন হাসির বয়স তিন-চার বছর। তবে কে?

'নীলমণিবাবু গল্প বলবার আগে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, পুলিসের চাকরিতে ঢুকে প্রথম তিনি এই শহরে পোস্টেড হয়েছিলেন। দিনমণি পেশাদার চোর, তাকে ধরতে কিংবা তার ঘর-দোর খানাতল্লাশ করবার জন্যে হয়তো নীলমণিবাবু গিয়েছিলেন। তিনি তখন যুবক, হয়তো দিনমণির কুহকময়ী স্ত্রীর ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলেন; দিনমণি জেলে যাবার পর গোপনে দু'জনের মেলামেশা হয়েছিল।

'দু-তিন বছর পরে নীলমণিবাবু এ জেলা থেকে বদলি হয়ে গেলেন; যাবার আগে জেনে গেলেন তাঁর একটি মেয়ে আছে। মেয়ের নাম হাসি। দূরে গিয়েও তিনি হাসি ও হাসির মায়ের খবর রাখতেন। তিনি বিয়ে করেননি, তাই সংসারের বন্ধন হাসিকে ভুলিয়ে দিতে পারেনি। সংসারে হাসিই তাঁর একমাত্র রক্তের বন্ধন।

'কর্মজীবনের শেষের দিকে তিনি আবার এই শহরে ফিরে এলেন। হাসির মা তখন মরে গেছে, হাসির বিয়ে হয়েছে। নীলমণিবাবুর অভ্যাস ছিল তিনি গভীর রাত্রে সাইকেল চড়ে শহর তদারক করতে বেরুতেন। সেই সময় তিনি হাসির সঙ্গে দেখা করতেন, তাকে ছোটখাটো দু-একখানা গয়না উপহার দিতেন। হাসিকে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন কিনা বলা যায় না। তবে হাসি হয়তো আন্দাজ করেছিল।

'যে-রাত্রে সুরেশ্বর হাসিকে খুন করে সে-রাত্রে নীলমণিবাবু হাসির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। তারপর যা-যা হয়েছিল সবই আমরা নীলমণিবাবুর মুখে শুনেছি। আমার বিশ্বাস সুরেশ্বর তাস খেলতে খেলতে উঠে এসে হাসিকে খুন করেছিল, তারপর ফিরে গিয়ে বন্ধুদের বলেছিল—বৌকে খুন করেছি, এখন তোরা আমাকে বাঁচা। চারজনের মধ্যে অটুট বন্ধুত্ব। তারা পরামর্শ করে স্থির করল, মড়া পুড়িয়ে ফেলা যাক, তারপর রটিয়ে দিলেই হবে, হাসি কুলত্যাগ করেছে।

'নীলমণিবাবু চার বন্ধুকে থানায় ধরে আনলেন, কিন্তু তাদের অ্যালিবাই ভাঙতে পারলেন না। তিনি যখন দেখলেন তাঁর মেয়ের হত্যাকারীকে ফাঁসিকাঠে লটকাতে পারবেন না, তখন ঠিক করলেন নিজেই তাঁকে খুন করবেন। তিনি আর বিলম্ব করলেন না, হাসির মৃত্যুর পর চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সুরেশ্বরকে খুন করলেন।

'কিন্তু ভেবে দেখ, আমি যেভাবে গল্পটাকে খাড়া করেছি, তার আগাগোড়াই অনুমান। এই অনুমান কেবল তখনি সত্যে পরিণত হতে পারে যদি নিশ্চয়ভাবে জানা যায় যে নীলমণিবাবু হাসির বাপ। আমি তাঁর জন্যে ফাঁদ পাতলাম, আচমকা জিগ্যেস করলাম- হাসির মায়ের নাম কি? তিনি না ভেবেচিন্তে বলে ফেললেন – অমলা!

'হাসির মায়ের নাম তিনি জানলেন কি করে? দশ বছর আগে সে মরে গেছে, এ মামলায় তার নাম একবারও কেউ উচ্চারণ করেনি। তবে নীলমণিবাবু জানলেন কি করে? আর সন্দেহ রইল না।

'আমার সামনে হাসির মায়ের নাম উচ্চারণ করেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে অসাবধানে তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন, আমিও তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম আমার ফাঁদ পাতা ব্যর্থ হয়নি। নীলমণিবাবুর অজানা আসামী স্বয়ং নীলমণিবাবু।'

ব্যোমকেশের যুক্তিজালে ছিদ্র পাইলাম না। বলিলাম, 'নীলমণিবাবু তাহলে নিরস্ত্র যুদ্ধের কায়দা আগে থাকতে জানতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। বিদ্যেটা তিনি সিভিল সার্জন মেজর বর্মণের কথা শুনে শিখে নিয়েছিলেন।'

কহেন কবি কালিদাস

যে শহরে আমি ও ব্যোমকেশ হপ্তাখানেকের জন্য প্রবাসযাত্রা করিয়াছিলাম তাহাকে কয়লা-শহর বলিলে অন্যায় হইবে না। শহরকে কেন্দ্র করিয়া তিন-চার মাইল দূরে দূরে গোটা চারেক কয়লার খনি। শহরটি যেন মাকড়সার মত জাল পাতিয়া মাঝখানে বসিয়া আছে, চারিদিক হইতে কয়লা আসিয়া রেলওয়ে স্টেশনে জমা হইতেছে এবং মালগাড়িতে চড়িয়া দিগ্‌বিদিকে যাত্রা করিতেছে। কর্মব্যস্ত সমৃদ্ধ শহর; ধনী ব্যবসায়ীরা এখানে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে, কয়েকটি বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে, উকিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার দালাল মহাজনের ছড়াছড়ি। পথে মোটর ট্যাক্সি বাস ট্রাকের ছুটাছুটি। কাঁচা মালের সহিত কাঁচা পয়সার অবিরাম বিনিময়। শহরটিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—কয়লা। চারিদিকে কয়লার কীর্তন, কয়লার কলকোলাহল। শহরটি মোটেই প্রাচীন নয়, কিন্তু দেখিয়া মনে হয় অদৃশ্য কয়লার গুঁড়া ইহার সর্বাঙ্গে অকালবার্ধক্যের ছায়া ফেলিয়াছে।

যাঁহার আহ্বানে আমরা এই শহরে আসিয়াছি তিনি ফুলঝুরি নামক একটি কয়লাখনির মালিক, নাম মণীশ চক্রবর্তী। কয়েক মাস যাবৎ তাঁহার খনিতে নানা প্রকার প্রচ্ছন্ন উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল। খনির গর্ভে আগুন লাগা, মূল্যবান যন্ত্রপাতি ভাঙিয়া নষ্ট হওয়া ইত্যাদি দুর্ঘটনা ঘটিতেছিল, কুলি-কাবাড়িদের মধ্যেও অহেতুক অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। একদল লোক তাঁহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই; এরূপ অবস্থায় যাহা মনে করা স্বাভাবিক তাহাই মনে করিয়া মণীশবাবু পুলিস ডাকিয়াছিলেন। অনেক নূতন লোককে বরখাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। শেষ পর্যন্ত গোপনে ব্যোমকেশকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

একটি চৈত্রের সন্ধ্যায় আমরা মণীশবাবুর গৃহে উপনীত হইলাম। শহরের অভিজাত অঞ্চলে প্রশস্ত বাগান-ঘেরা দোতলা বাড়ি। মণীশবাবু সবেমাত্র খনি হইতে ফিরিয়াছেন, আমাদের সাদর সম্ভাষণ করিলেন। মণীশবাবুর বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ, গৌরবর্ণ সুপুরুষ, এখনও শরীর বেশ সমর্থ আছে। চোয়ালের হাড়ের কঠিনতা দেখিয়া মনে হয় একটু কড়া মেজাজের লোক।

ড্রয়িং-রুমে বসিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মণীশবাবু বলিলেন, 'ব্যোমকেশ-বাবু, এখানে কিন্তু আপনাদের ছদ্মনামে থাকতে হবে। আপনার নাম গগনবাবু, আর অজিতবাবুর নাম সুজিতবাবু। আপনাদের আসল নাম শুনলে সকলেই বুঝতে পারবে আপনারা কী উদ্দেশ্যে এসেছেন। সেটা বাঞ্ছনীয় নয়।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বেশ তো, এখানে যতদিন থাকব গগনবাবু সেজেই থাকব। অজিতেরও সুজিত সাজতে আপত্তি নেই।'

দ্বারের কাছে একটি যুবক দাঁড়াইয়া অস্বচ্ছন্দভাবে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, বোধহয় ব্যোমকেশের সহিত পরিচিত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মণীশবাবু ডাকিলেন, 'ফণী।'

যুবক উদ্‌গ্রীবভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। মণীশবাবু আমাদের দিকে চাহিয়া

বলিলেন, 'আমার ছেলে ফণীশ।—ফণী, তুমি জানো এ'রা কে, কিন্তু বাড়ির বাইরে আর কেউ যেন জানতে না পারে।'

ফণীশ বলিল, 'আজ্ঞে না।'

'তুমি এবার এ'দের গেস্ট্-রুমে নিয়ে যাও। দেখো যেন ও'দের কোনো অসুবিধা না হয়।—আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে আসুন, চা তৈরি হচ্ছে।'

ড্রয়িং-রুমের লাগাও গেস্ট্-রুম। বড় ঘর, দু'টি খাট। টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি উপযোগী আসবাবে সাজানো, সংলগ্ন বাথরুম। ফণীশ আমাদের ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

ছেলেটিকে বেশ শান্তশিষ্ট এবং ভালমানুষ বলিয়া মনে হয়। বাপের মতই সুপুরুষ, কিন্তু দেহ-মনের পূর্ণ পরিণতি ঘটিতে এখনও বিলম্ব আছে; ভাব-ভঙ্গীতে একটু ছেলেমানুষীর রেশ রহিয়া গিয়াছে। বয়স আন্দাজ তেইশ-চব্বিশ।

বেশবাস পরিবর্তন করিতে করিতে দুই-চারিটা কথা হইল; ফণীশ লাজুকভাবে ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তর দিল। সে পিতার একমাত্র সন্তান, এক বছর আগে তাহার বিবাহ হইয়াছে। সে প্রত্যহ পিতার সঙ্গে কয়লাখনিতে গিয়া কাজকর্ম দেখাশুনা করে। লক্ষ্য কবিলাম, ব্যোমকেশের কথার উত্তর দিতে দিতে সে যেন একটা অন্য কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বলিতে গিয়া সংকোচ-বশে থামিয়া যাইতেছে।

ফণীশ কী বলিতে চায় শোনা হইল না, আমরা বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে চা ও জলখাবার উপস্থিত হইয়াছে; আমরা বসিয়া গেলাম।

চায়ের আসরে কিন্তু মেয়েদের দেখিলাম না, কেবল আমরা চারজন। অথচ বাড়িতে অন্তত দুইটি স্ত্রীলোক নিশ্চয় আছেন। মণীশবাবু বোধকরি পুরাপুরি স্বদেশী বর্জন করেন নাই। তা আজকালকার সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার যুগে একটু অন্তরাল থাকা মন্দ কি?

পানাহার শেষ করিয়া সিগারেট ধরাইয়াছি, একটি প্রকাণ্ড গাড়ি আসিয়া বাড়ির সামনে থামিল। গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। গোরিলার মতন চেহারা, কালিমাবেষ্টিত চোখ দুটিতে মন্থর কুটিলতা। মুখ দেখিয়া চরিত্র অধ্যয়ন যদি সম্ভব হইত বলিতাম লোকটি মহাপাপিষ্ঠ।

মণীশবাবু খুব খাতির করিয়া আগন্তুককে ঘরে আনিলেন, আমাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন, 'ইনি শ্রীগোবিন্দ হালদার, এখানকার একটি কয়লাখনির মালিক। আর এ'রা হচ্ছেন শ্রীগগন মিত্র এবং সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়; আমার বন্ধু, কলকাতায় থাকেন। বেড়াতে এসেছেন।'

গোবিন্দবাবু তাঁহার শনৈশ্চর চক্ষু দিয়া আমাদের সমীক্ষণ করিতে করিতে মণীশবাবুকে বলিলেন, 'খবর নিতে এলাম। খনিতে আর কোনো গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?'

মণীশবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, 'গণ্ডগোল তো লেগেই আছে। পরশু রাত্রে এক কাণ্ড। হঠাৎ পাঁচ নম্বর পিট্-এর পাম্প বন্ধ হয়ে গেল। ভাগ্যে পাহারা-ওয়ালারা সজাগ ছিল তাই বিশেষ অনিষ্ট হয়নি। নইলে—'

গোবিন্দবাবু মুখে চুক্‌চুক শব্দ করিলেন। মণীশবাবু বলিলেন, 'আপনারা তো বেশ আছেন, যত উৎপাত আমার খনিতে। কেন যে হতভাগাদের আমার দিকেই নজর তা বুঝতে পারি না।'

গোবিন্দবাবু বলিলেন, 'আমার খনিতেও মাস ছয়েক আগে গোলমাল শুরু হয়েছিল। আমি জানি পুলিসের দ্বারা কিছু হবে না, আমি সরাসরি চর লাগালাম। আটজন লোককে গুপ্তচর লাগিয়েছিলাম, দিন আষ্টেকের মধ্যে তারা খবর এনে দিল কারা শয়তানি করছে। পাঁচটা লোক ছিল পালের গোদা, তাদের একদিন ধরে এনে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিলাম। তাদের বরখাস্ত করতে হল না, নিজে থেকেই পালিয়ে গেল। সেই থেকে সব ঠাণ্ডা আছে।' বলিয়া তিনি দন্তুর গোরিলা-হাস্য হাসিলেন।

মণীশবাবু বলিলেন, 'আমিও গুপ্তচর লাগিয়েছিলাম কিন্তু কিছু হল না। যাকগে—' তিনি অন্য কথা পাড়িলেন। সাধারণভাবে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। গোবিন্দবাবুর জন্য চা জলখাবার আসিল, তিনি তাহা সেবন করিলেন। তাহার চক্ষু দুইটি কিন্তু আমাদের আশেপাশেই ঘুরিতে লাগিল। আমরা নিছক বেড়ানোর উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি একথা বোধহয় তিনি বিশ্বাস করেন নাই।

ঘণ্টাখানেক পরে তিনি উঠিলেন। মণীশবাবু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত গেলেন, আমরাও গেলাম। ড্রাইভার মোটরের দরজা খুলিয়া দিল। গোবিন্দবাবু মোটরে উঠিবার উপক্রম করিয়া ব্যোমকেশের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া হাসি-হাসি মুখে বলিলেন, 'দেখুন চেষ্টা করে।'

তিনি মোটরে উঠিয়া বসিলেন, মোটর চলিয়া গেল।

মণীশবাবু এবং আমরা কিছুক্ষণ দৃষ্টি-বিনিময় করিলাম, তারপর তিনি বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, 'গোবিন্দ হালদার লোকটা ভারি সেয়ানা, ওর চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়।'

রাত্রির খাওয়াদাওয়া সারিয়া শয়ন করিতে এগারোটা বাজিল। শরীরে ট্রেনের ক্লান্তি ছিল, মাথার উপর পাখা চালাইয়া দিয়া শয়ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে ডুবিয়া গেলাম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

একজন ভৃত্য জানাইল, বড়কর্তা এবং ছোটকর্তা ভোরবেলা কোলিয়ারিতে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখি আমাদের চা ও জলখাবার টেবিলের উপর সাজাইয়া একটি যুবতী দাঁড়াইয়া আছে।

ইতিপূর্বে বাড়ির মেয়েদের দেখি নাই, আমরা একটু থতমত খাইয়া গেলাম। ব্যোমকেশের সুস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে মেয়েটি চোখ নীচু করিয়া ঈষৎ জড়িত-স্বরে বলিল, 'আমি ইন্দিরা, এ বাড়ির বৌ। আপনারা খেতে বসুন।'

ফণীশের বৌ। শ্যামবর্ণা, তনুদীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, মুখখানি তরতরে; বয়স আঠারো-উনিশ। দেখিলেই বোঝা যায় ইন্দিরা লাজুক মেয়ে, অপরিচিত বয়স্থ ব্যক্তির সহিত সহজভাবে বাক্যালাপ করার অভ্যাসও তাহার নাই। নেহাত বাড়িতে পুরুষ নাই, তাই বেচারী বাধ্য হইয়া অতিথি সৎকার করিতে আসিয়াছে।

আমরা আহারে বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'বোসো না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

ইন্দিরা একটি সোফার-কিনারায় বসিল।

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় একটু চুমুক দিয়া গলা ভিজাইয়া লইল, তারপর

জলখাবারের রেকাবি টানিয়া লইল, 'আজ আমাদের উঠতে দোর হয়ে গেল। কর্তা কি ভোরবেলাই কাজে বেরিয়ে যান?'

'হ্যাঁ, বাবা সাতটার সময় বেরিয়ে যান।'

'আর তোমার কর্তা?'

ইন্দিরার ঘাড় অমনি নত হইয়া পড়িল। সে চোখ না তুলিয়াই অস্ফুটস্বরে বলিল, 'উনিও।' তারপর জোর করিয়া লজ্জা সরাইয়া বলিল, 'ও'রা বারোটার সময় ফিরে খাওয়াদাওয়া করেন, আবার তিনটের সময় যান।'

ব্যোমকেশ তাহার পানে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিল, আর কিছু বলিল না।

আহার করিতে করিতে আমি ইন্দিরাকে লক্ষ্য করিলাম। সে চুপটি করিয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে ব্যোমকেশের প্রতি চকিত কটাক্ষপাত করিতেছে। মনে হইল অতিথি সৎকার ছাড়াও অন্য কোনও অভিসন্ধি আছে। ব্যোমকেশ কে তাহা সে জানে, ফণীশ স্ত্রীকে নিশ্চয় বলিয়াছে, তাই ব্যোমকেশকে কিছু বলিতে চায়। সে মনে মনে কিছু সংকল্প করিয়াছে কিন্তু সংকোচবশত বলিতে পারিতেছে না। কাল রাত্রে ফণীশের মুখেও এইরূপ দ্বিধার ভাব দেখিয়াছিলাম।

প্রাতরাশ শেষ করিয়া চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ রুমালে মুখ মুছিল, তারপর প্রসন্নস্বরে বলিল, 'কি বলবে এবার বল।'

আমি ইন্দিরার মুখে সংকল্প ও সংকোচের টানাটানি লক্ষ্য করিতেছিলাম, দেখিলাম সে চমকিয়া উঠিল, বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর তাহার সব উদ্বেগ এক নিশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আমার স্বামীকে রক্ষে করুন। তাঁর বড় বিপদ।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া সোফায় বসিল, ইন্দিরাকে পাশে বসিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিল, 'বোসো। কি বিপদ তোমার স্বামীর আমাকে বলো।'

ইন্দিরা তেরছাভাবে সোফার কিনারায় বসিল, শীর্ণ সংহত স্বরে বলিল, 'আমি—আমি সবকথা গুছিয়ে বলতে পারব না। আপনি যদি সাহায্য করেন, উনি নিজেই বলবেন।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'খনি সম্বন্ধে কোনো কথা কি?'

ইন্দিরা বলিল, 'না, অন্য কথা। আপনারা বাবাকে যেন কিছু বলবেন না, বাবা কিছু জানেন না।'

ব্যোমকেশ শান্ত আশ্বাসের সুরে বলিল, 'আমি কাউকে কিছু বলব না, তুমি ভয় পেও না।'

'ও'কে সাহায্য করবেন?'

'কি হয়েছে কিছুই জানি না। তবু তোমার স্বামী যদি নির্দোষ হন নিশ্চয় সাহায্য করব।'

'আমার স্বামী নির্দোষ।'

'তবে নির্ভয়ে থাকো।'

বাড়ির পাশের দিকে বাগানের কিনারায় একসারি ঘর। ইন্দিরার মুখে হাসি ফুটিবার পর আমরা সিগারেট টানিতে টানিতে সেইদিকে গেলাম।

সামনের ঘর হইতে একটি মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন।

পরিধানে ফরাসডাঙ্গার ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবি, ফিটফাট চেহারা। চুলে নিশ্চয় কলপ লাগাইয়া থাকেন, কালো চুলের নীচে শ্বেতবর্ণ অঙ্কুর মাথা তুলিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার নাম গগন মিত্র, ইনি সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। মণীশবাবুর অতিথি।'

ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমাদের সংবর্ধনা করিলেন, 'আসুন আসুন। আপনারা আসবেন কর্তার মুখে শুনেছিলাম। আমি সুরপতি ঘটক, এই অফিসের দেখাশোনা করি।'

সুরপতিবাবু আমাদের প্রকৃত নাম জানেন না। ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা বুঝি কয়লাখনির অফিস। আপনি অফিস-মাষ্টার।'

সুরপতিবাবু বলিলেন, 'আজ্ঞে। কয়লাখনিতে একটা ছোট অফিস আছে, এটা বড় অফিস। আসুন না দেখবেন।'

ঘরগুলি একে একে দেখিলাম। বিভিন্ন ঘরে কেরানীরা খাতাপত্র লইয়া কাজ করিতেছে, টাইপরাইটারের খটাখট শব্দ হইতেছে, দর্শনীয় কিছু নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে আমরা সুরপতিবাবুর অফিসে বসিলাম।

সাধারণভাবে কিছুক্ষণ বাক্যালাপ চালাইবার পর ব্যোমকেশ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'আপনাকে বলি, আমরা দুই বন্ধু মিলে একটা ছোটখাট কয়লাখনি কেনবার মতলব করেছি। এখানে নয়, অন্য জেলায়। সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কি করে কয়লাখনি চালাতে হয় আমরা কিছুই জানি না, তাই মণীশবাবুর খনি দেখতে এসেছি। অফিসের কাজ, খনির কাজ, সব বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই।'

সুরপতিবাবু মহা উৎসাহে বলিলেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। এ আর বেশী কথা কি? অফিসের কাজ দু'দিনে শিখে যাবেন, আর খনির কাজও এমন কিছু শক্ত নয়। তাছাড়া যদি দরকার হয় আমি আপনাকে খুব ভাল লোক দিতে পারি।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রকম লোক?'

সুরপতিবাবু বলিলেন, 'অফিসের কাজ জানে, কোলিয়ারির কাজ জানে এমন লোক। আমার নিজের হাতে তৈরি করা লোক।'

ব্যোমকেশ আগ্রহ দেখাইয়া বলিল, 'তাই নাকি! তা কাজ-জানা ভাল লোক পেলে আমরা নেব। এ বিষয়ে আবার আপনার সঙ্গে কথা হবে। অফিসের কাজ-কর্মও দেখব। আমরা এখন কিছুদিন আছি।'

অফিস হইতে ফিরিয়া আসিলাম।

বারোটার সময় ফণীশ ও মণীশবাবু খনি হইতে ফিরিলেন। স্নানাহার সারিতে একটা বাজিয়া গেল। তারপর খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা চারজন মোটরে চড়িয়া কয়লাখনিতে চলিলাম।

মস্ত বড় মোটর। ফণীশ চালাইয়া লইয়া চলিল, আমরা তিনজন পিছনে বসিলাম।

মোটর শহর ছাড়াইয়া নির্জন রাস্তা ধরিল। মাইল তিনেক দূরে কয়লাখনি

ব্যোমকেশ বলিল, 'সকালে সুরপতিবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। উনি কতদিন আপনার কাজ করছেন?'

মণীশবাবু বলিলেন, 'প্রায় কুড়ি বছর। পাকা লোক।'

ব্যোমকেশ কহিল, 'ওঁকে বলেছি আমরা একটা কয়লাখনি কিনব। তাই খোঁজ-খবর নিতে এসেছি। আমাদের সত্যিকার পরিচয় দিইনি।'

মণীশবাবু বলিলেন, 'ভালই করেছেন। সুরপতি অবশ্য বিশ্বাসী লোক, দোষের মধ্যে বছর দুই আগে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেছে।'

সুরপতিবাবুর চুলের কলপ এবং শৌখীন জামা-কাপড়ের অর্থ পাওয়া গেল। প্রৌঢ় বয়সে তরুণী ভার্যার চোখে যৌবনের বিভ্রম সৃষ্টি করার চেষ্টা স্বাভাবিক।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সম্প্রতি কেউ আপনার খনি কেনবার প্রস্তাব করেছিল?'

মণীশবাবু বলিলেন, 'সম্প্রতি নয়, কয়েক বছর আগে। একজন মাড়োয়ারী। ভাল দাম দিতে চেয়েছিল, আমি বেচিনি।'

ব্যোমকেশ দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল, 'এখানে অন্য যে সব খনির মালিক আছেন তাঁদের সঙ্গে আপনার সদ্ভাব আছে?'

মণীশবাবু বলিলেন, 'গাঢ় প্রণয় আছে এমন কথা বলতে পারি না তবে মুখোমুখি ঝগড়া কারুর সঙ্গে নেই।'

'এমন কেউ আছেন যিনি বাইরে ভদ্রতার মুখোশ পরে ভিতরে ভিতরে আপনার অনিষ্ট চিন্তা করছেন?'

'থাকতে পারে, কিন্তু তাকে চিনব কি করে?'

'তা বটে। কাল রাত্রে যিনি এসেছিলেন—গোবিন্দ হালদার তিনি কি রকম লোক?'

মণীশবাবু চিন্তা-মন্থর কণ্ঠে বলিলেন, 'গোবিন্দ হালদারকে চেনা শক্ত। পাঁকাল মাছের মত চরিত্র, ধরা-ছোঁয়া যায় না। তবে গোবিন্দবাবুর ছোট ভাই এবং অংশীদার অরবিন্দ অতি বদ লোক। মাতাল, জুয়াড়ী, দুশ্চরিত্র। বছর কয়েক আগে স্ত্রীটা আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে। তারপর থেকে অরবিন্দ একেবারে নামকাটা সেপাই হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

আর কোনও কথা হইল না, আমরা কয়লাখনির এলাকায় প্রবেশ করিলাম।

কয়লাখনির বিস্তারিত বর্ণনা দিবার ইচ্ছা নাই। যাঁহারা স্বচক্ষে কয়লাখনি দেখেন নাই তাঁহারা নিশ্চয় রঙ্গমঞ্চে বা চিত্রপটে দেখিয়াছেন, এমন কিছু নয়নাভিরাম দৃশ্য নয়। বিশেষত এই কাহিনীতে কয়লাখনির স্থান খুবই অল্প; কয়লাখনিকে এই কাহিনীর কালো পশ্চাৎপট বলাই সংগত। পশ্চাৎপট না থাকিলে কাহিনী উলংগ হইয়া পড়ে, তাই রাখিতে হইয়াছে।

কয়লা! যাহার জোরে যন্ত্র চলিতেছে তাহাকে যন্ত্রের সাহায্যে মৃত্তিকার গভীর গর্ভ হইতে টানিয়া আনা হইতেছে সভ্যতার চাকা ঘুরিতেছে। নমো যন্ত্র। তব খনি-খনিত্র নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র! নমো যন্ত্র। অলমিতি।

খনির ম্যানেজার তারাপদবাবুর সঙ্গে পরিচয় হইল। বয়স্ক লোক, খনির সীমানার মধ্যে তাঁহার বাসস্থান; রাশভারী জবরদস্ত লোক বলিয়া মনে হয়। তিনি আমাদের লইয়া খনির বিভিন্ন অংশের কার্যকলাপ দেখাইলেন। খনির গর্ভে অবতরণ করিবার প্রস্তাবও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা রাজী হইলাম না। সীতা পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল; আমাদের সেরূপ কোনও কারণ নাই।

অপরাহ্ণে আমরা তারাপদবাবুর অফিসে চা খাইলাম। সেখানে খনির ডাক্তার যতীন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য উচ্চ কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা হইল। কাজের কথা কিছু হইল না, সাধারণভাবে আলাপ-আলোচনা চলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, আমরা ছদ্মনামেই রহিলাম। এক সময় লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশ ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে বেশ ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছে, ঘরের এক কোণে বসিয়া নিবিষ্ট মনে তাঁহার সহিত গল্প করিতেছে। ডাক্তার ঘোষ আমাদের সমবয়স্ক, তিনিও খনিতেই ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল লইয়া থাকেন। তাঁহার কোট-প্যান্টলুন-পরা চেহারায় জীবন-ক্লান্তির একটু আভাস পাওয়া যায়।

তারপর সন্ধ্যা হইলে আমরা আবার মোটরে চড়িয়া বাড়ির দিকে যাত্রা করিলাম।

রাত্রে আহারাদির পর মণীশবাবু উপরে শয়ন করিতে গেলেন, আমরা নিজের ঘরে আসিলাম। ফণীশ আমাদের সঙ্গে আসিল।

ব্যোমকেশ পাখা চালাইয়া দিয়া নিজের শয্যায় লম্বা হইল, সিগারেট ধরাইয়া ফণীশকে বলিল, 'বোসো। কী কাণ্ড বাধিয়েছ? বৌমাকে এত উদ্বিগ্ন করে তুলেছ কেন?'

ফণীশ চেয়ারে বসিয়া হাত কচলাইতে লাগিল, তারপর কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, 'ইন্দিরাকে রাজী করিয়েছিলাম আপনাকে বলতে, নিজে বলতে সাহস হয়নি—'

'কিন্তু কথাটা কী? তোমাদের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে ভারি গুরুতর ব্যাপার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গুরুতর ব্যাপার। একটা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছি ঘটনা-চক্রে। বাবা যদি জানতে পারেন—'

ব্যোমকেশ বিছানায় উঠিয়া বসিল, 'খুনের মামলা!'

ফণীশ শীর্ণকণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে বিশ্রী ব্যাপার। পুলিস তদন্ত শুরু করেছে, তারা জানতে পেরেছে যে আমরা—'

'কি হয়েছিল সব কথা গুছিয়ে বল।'

ফণীশ অবশ্য সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারিল না। তাহার জট-পাকানো কাহিনীকে আমি যথাসম্ভব সিধা করিয়া লিখিতেছি।

এই শহরে একটি ক্লাব আছে। কৌতুকবশে তাহার নামকরণ হইয়াছে—কয়লা ক্লাব। ক্লাবের চাঁদার হার খুব উঁচু, তাই বড়মানুষ ছাড়া অন্য কেহ ইহার সভ্য হইতে পারে না। ফণীশ এই ক্লাবের সভ্য। আরও অনেক গণ্যমান্য সভ্য আছে; তন্মধ্যে উলুডাঙ্গা কয়লাখনির মালিক মৃগেন্দ্র মৌলিক, ধুবিপোতা খনির মধুময় সুর এবং শিমুলিয়া খনির অরবিন্দ ও গোবিন্দ হালদার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্লাবে অপরাহ্ণে টেনিস খেলা, ব্যাডমিন্টন খেলা হয়; সন্ধ্যার পর বিলিয়ার্ড, পিংপং, তাস-পাশা চলে। বাজি রাখিয়া তাস খেলা হয়। কিন্তু ক্লাবের নিয়মানুযায়ী বেশী টাকা বাজি রাখা যায় না; তাই যাহাদের রক্তে জুয়ার নেশা আছে তাহাদের মন ভরে না। অরবিন্দ হালদার এই অতৃপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। কিন্তু উপায় কি? শহরে ভদ্রভাবে জুয়া খেলার অন্য কোনও আস্তানা নাই।

বছরখানেক আগে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ক্লাবের সভ্য হইয়াছিলেন। পয়সাওয়ালা

লোক, মহাজনী কারবার খুলিয়াছেন, শহরে নবাগত। বাজার অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র অফিস আছে, কিন্তু থাকেন শহরের বাহিরে নির্জন রাস্তার ধারে এক বাড়িতে। শকুনি-মার্কা চেহারা, নাম প্রাণহরি পোদ্দার।

পোদ্দার মহাশয় ক্লাবে আসিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহার সমবয়স্ক বৃদ্ধ ক্লাবে কেহ নাই, বেশীর ভাগই ছেলে-ছোকরা, দু'চারজন মধ্যবয়স্ক আছেন। ক্রমে দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় হইল। কিন্তু বয়সের পার্থক্যবশত কাহারও সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল না।

ফণীশ, মৃগেন মৌলিক, মধুময় সুর এবং অরবিন্দ হালদার এই চারজন মিলিয়া ক্লাবে একটি গোষ্ঠী রচনা করিয়াছিল। ফণীশ ছিল এই চারজনের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে ছোট, আর অরবিন্দ হালদার ছিল সবচেয়ে বয়সে বড়। তাহার বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ; দলের মধ্যে সে-ই ছিল অগ্রণী।

একদিন সন্ধ্যার পর ইহারা ক্লাবের একটা ঘরে বসিয়া ব্রিজ খেলিতেছিল, পোদ্দার মহাশয় আসিয়া তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলেন। টেবিলের চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কে কেমন হাত পাইয়াছে দেখিলেন। অরবিন্দ অলসকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কণ্ট্রাক্ট ব্রিজ জানেন?'

বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিলেন, 'জানি।'

'খেলবেন?'

'খেলব। কি রকম বাজি?'

'এক টাকা পয়েন্ট। চলবে?'

'চলবে।'

যে রাবার খেলা হইতেছিল তাহা শেষ হইলে তাস কাটিয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন বাহির হইয়া গেল। প্রাণহরি পোদ্দার খেলিতে বসিলেন।

দেখা গেল পোদ্দার মহাশয় অতি নিপুণ খেলোয়াড়। কিন্তু সেদিন তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না, ভাল হাত পাইলেন না। খেলার শেষে হিসাব করিয়া দেখা গেল তিনি একুশ টাকা হারিয়াছেন। তিনি টাকা শোধ করিয়া দিলেন।

তারপর হইতে প্রাণহরিবাবু প্রায় প্রত্যহই ফণীশদের দলে খেলিতে বসেন। কখনও হারেন, কখনও জেতেন; সকল অবস্থাতেই তিনি নির্বিকার। এই ভাবে তিনি ফণীশদের দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলেন।

কয়েকমাস এই ভাবে কাটিল।

গত ফাল্গুন মাসে একদিন খেলিতে বসিয়া প্রাণহরিবাবু বলিলেন, 'আপনারা ব্রিজ ছাড়া অন্য কোনো খেলা খেলেন না?'

মধুময় সুর প্রশ্ন করিল, 'কি রকম খেলা?'

প্রাণহরি বলিলেন, 'এই ধরুন, পোকার কিংবা রাণিং ফ্লাশ।'

মৃগেন মৌলিক বলিল, 'আমরা সব খেলাই খেলতে জানি। কিন্তু ক্লাবে জুয়া খেলার নিয়ম নেই। ব্রিজ তো আর জুয়া নয়, game of skill.' বলিয়া নাকের মধ্যে ব্যঙ্গ-হাস্য করিল।

প্রাণহরি তখন কিছু বলিলেন না। খেলা শেষ হইলে বলিলেন, 'একদিন আসুন না আমার বাসায়, নতুন খেলা খেলবেন।'

কাহারও আপত্তি হইল না। অরবিন্দ বলিল, 'মন্দ কি। আপনি কোথায় থাকেন?'

প্রাণহরি বলিলেন, 'শহরের বাইরে উলুডাঙা খনির রাস্তায় আমার বাসা। একলা থাকি, আপনারা যদি আসেন বেশ জমজমাট হবে। কালই আসুন না।'

সকলে রাজী হইল। প্রাণহরি ট্যাক্সি ধরিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার নিজের গাড়ি নাই, ট্যাক্সির সহিত বাঁধা ব্যবস্থা আছে, ট্যাক্সিতেই যাতায়াত করেন।

পরদিন সন্ধ্যার পর চারজন অরবিন্দের মোটরে চড়িয়া প্রাণহরির গৃহে উপস্থিত হইল। শহরের সীমানা হইতে মাইল দেড়েক দূরে নির্জন রাস্তার উপর দোতলা বাড়ি, আশেপাশে দু-তিনশত গজের মধ্যে অন্য বাড়ি নাই।

প্রাণহরিবাবু পরম সমাদরের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, নীচের তলার একটি সুসজ্জিত ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। কিছুক্ষণ সাধারণভাবে বাক্যালাপ হইল। প্রাণহরিবাবু বিপত্নীক ও নিঃসন্তান; পূর্বে তিনি উড়িষ্যার কটক শহরে থাকিতেন। কিন্তু সেখানে মন টিকিল না তাই এখানে চলিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে একটি দাসী আছে, সেই তাঁহার রন্ধন ও পরিচর্যা করে।

এই সময় দাসী চায়ের ট্রে হাতে লইয়া প্রবেশ করিল, ট্রে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল, আবার এক থালা কাটলেট লইয়া ফিরিয়া আসিল। দিব্য-গঠনা যুবতী। বয়স কুড়ি-বাইশ; রং ময়লা, কিন্তু মুখখানি সুন্দর, হরিণের মত চোখ দু'টিতে কুহক ভরা। দেখিলে ঝি-চাকরানী শ্রেণীর মেয়ে বলিয়া মনে হয় না। সে অতিথিদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল।

গরম গরম কাটলেট সহযোগে চা পান করিতে করিতে অরবিন্দ বলিল, 'খাসা কাটলেট ভেজেছে। এটি আপনার ঝি?'

প্রাণহরিবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। মোহিনীকে উড়িষ্যা থেকে এনেছি। রান্না ভাল করে।'

পানাহারের পর খেলা বসিল। সর্বসম্মতিক্রমে তিন তাসের খেলা রাণিং ফ্লাশ আরম্ভ হইল। সকলেই বেশী করিয়া টাকা আনিয়াছিল, প্রাণহরিবাবু পাঁচশো টাকা লইয়া খেলিতে বসিলেন।

দুই ঘণ্টা খেলা হইল। বেশী হার-জিত কিন্তু হইল না; কেহ পঞ্চাশ টাকা জিতিল, কেহ একশো টাকা হারিল। প্রাণহরিবাবু মোটের উপর হারিয়া রহিলেন। স্থির হইল তিন দিন পরে আবার এখানে খেলা বসিবে।

ফণীশের মনে কিন্তু সুখ নাই। সে তাস খেলিতে ভালবাসে বটে, কিন্তু জুয়াড়ী নয়। তাহার মাথার উপর কড়া প্রকৃতির বাপ আছেন, টাকাকড়ি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। দলে পড়িয়া তাহাকে এই জুয়ার ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু দল ছাড়িবার চেষ্টা করিলে তাহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। ফণীশ নিতান্ত অনিচ্ছাভরে জুয়ার দলে সংযুক্ত হইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দিন খেলা খুব জমিয়া গেল। মোহিনী মুর্গীর ফ্রাই তৈরি করিয়াছিল। চা সহযোগে তাহাই খাইতে খাইতে খেলা আরম্ভ হইল; তারপর মধ্যপথে প্রাণহরিবাবু বিলাতী হুইস্কির একটি বোতল বাহির করিলেন। ফণীশের মদ সহ্য হয় না, খাইলেই বমি আসে; সে খাইল না। অন্য সকলে খাইল। অরবিন্দ সবচেয়ে বেশী খাইল। খেলার বাজি উত্তরোত্তর চড়িতে লাগিল। সকলেই উত্তেজিত, কেবল প্রাণহরিবাবু নির্বিকার।

খেলার শেষে হিসাব হইল ঃ অরবিন্দ প্রায় হাজার টাকা জিতিয়াছে, আর

সকলে হারিয়াছে। প্রাণহরিবাবু দুইশত টাকা জিতিয়াছেন।

অতঃপর প্রতি হপ্তায় একদিন-দুইদিন খেলা বসে। খেলায় কোনও দিন একজন হারে, কোনও দিন অন্য কেহ হারে; বাকি সকলে জেতে। প্রাণহরিবাবু কোনও দিনই বেশী হারেন না, মোটের উপর লাভ থাকে।

খেলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পার্শ্বাভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা মোহিনীকে লইয়া। মধুময় এবং মৃগেন্দ্র হয়তো ভিতরে ভিতরে মোহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু অরবিন্দ একেবারে নির্লজ্জভাবে তাহার পিছনে লাগিল। খেলার দিন সে সকলের আগে প্রাণহরিবাবুর বাড়িতে যাইত এবং রান্নাঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া মোহিনীর সহিত রসালাপ করিত। এমন কি দিনের বেলা প্রাণহরিবাবুর অনুপস্থিতি কালে সে তাঁহার বাড়িতে যাইত এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে। মোহিনীর সহিত অরবিন্দের ঘনিষ্ঠতা কতদূর গড়াইয়াছিল বলা যায় না, তবে মোহিনী যে স্তরের মেয়ে তাহাতে সে বড়মানুষের কৃপাদৃষ্টি উপেক্ষা করিবে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

যাহোক, এই ভাবে পাঁচ-ছয় হপ্তা কাটিল। ফণীশের মনে শান্তি নাই, সে বন্ধুদের এড়াইবার চেষ্টা করে কিন্তু এড়াইতে পারে না, অরবিন্দ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। তারপর একদিন সকলেরই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তাহারা জানিতে পারিল প্রাণহরিবাবু পাকা জুয়াচোর, তাস বুঝিয়া হাত সাফাই করেন। খুব খানিকটা বচসা হইল, তারপর অতিথিরা খেলা ছাড়িয়া চলিয়া আসিল।

হিসাবে জানা গেল অতিথিরা প্রত্যেকেই তিন-চার হাজার টাকা হারিয়াছে এবং সব টাকাই প্রাণহরির গর্ভে গিয়াছে। সবচেয়ে বেশী হারিয়াছে অরবিন্দ; প্রায় পাঁচ হাজার টাকা।

অরবিন্দ ক্লাবে বসিয়া আফ্‌সাইতে লাগিল, 'আসুক না হাড়গিলে বুড়ো ঠেঙিয়ে হাড় গুঁড়ো করব।' মধুময়, মৃগেন্দ্র মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল প্রাণহরিকে হাতে পাইলে তাহারাও ছাড়িয়া দিবে না।

প্রাণহরিবাবু কিন্তু হুঁশিয়ার লোক, তিনি আর ক্লাবে মাথা গলাইলেন না।

দিন সাতেক পরে অরবিন্দ বলিল, 'ব্যাটা গা-ঢাকা দিয়েছে। চল, ওর বাড়িতে গিয়ে উত্তম-মধ্যম দিয়ে আসি।'

ফণীশ আপত্তি করিল, 'কি দরকার। টাকা যা যাবার সে তো গেছেই—'

অরবিন্দ বলিল, 'টাকা আমাদের হাতের ময়লা। কিন্তু ব্যাটা ঠকিয়ে দিয়ে যাবে? তুমি কি বলো মৃগেন?'

মৃগেন বলিল, 'শিক্ষা দেওয়া দরকার।'

মধুময় বলিল, 'ওর বাড়িতে একটা মেয়েলোক ছাড়া আর কেউ থাকে না, ভয়ের কিছু নেই।'

রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় চারজন বাহির হইল। ক্লাবের অনতিদূরে ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড হইতে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া প্রাণহরির বাড়ির দিকে চলিল। নিজেদের মোটরে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়; ঐ রাস্তাটা নির্জন হইলেও, রাত্রিকালে উলুডাঙা কোলিয়ারি হইতে বহু যানবাহন যাতায়াত করে। তাহারা প্রাণহরির বাড়ির কাছে চেনা মোটর দেখিতে পাইবে; তাছাড়া অভিযাত্রীদের মোটর-চালকেরা মূক-বধির নয় তাহারা গল্প করিবে। কাহাকেও উত্তম-মধ্যম দিতে হইলে সাক্ষীসাবুদ

যথাসম্ভব কম থাকিলেই ভাল।

প্রাণহরির বাড়ি হইতে একশো গজ দূরে ট্যাক্সি থামাইয়া চারজন অবতরণ করিল। রাস্তা নিরালোক, মধুময়ের হাতে একটা বড় বৈদ্যুতিক টর্চ ছিল, তাহাই মাঝে মাঝে জ্বালিয়া জ্বালিয়া তাহারা বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল, ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরাইয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেল।

দ্বিতলের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। নীচে সদর দরজা খোলা। রান্নাঘর হইতে ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ আসিতেছে, মোহিনী রান্না করিতেছে। সকলে শিকারীর মত নিঃশব্দে প্রবেশ করিল।

সদরে একটা লম্বা গোছের ঘর, তাহার বাঁ পাশ দিয়া দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। এইখানে দাঁড়াইয়া চারজনে নিম্নস্বরে পরামর্শ করিল, তারপর অরবিন্দ মধুময়ের হাত হইতে টর্চ লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'সিঁড়ির মাথায় দরজা আছে, মজবুত দরজা। ভিতর থেকে বন্ধ কি বাইরে থেকে বন্ধ বোঝা গেল না। ইয়েল-লক্ লাগানো।'

আবার পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, নীচের তলাটা ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখা দরকার। বুড়ো ভারি ধূর্ত, হয়তো উপরের ঘরে আলো জ্বালিয়া নীচে অন্ধকারে কোথাও লুকাইয়া আছে। অরবিন্দ রান্নাঘরের দ্বারে উঁকি মারিয়া আসিল, সেখানে মোহিনী দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া একা রান্না করিতেছে, অন্য কেহ নাই।

অতঃপর চারজনে পৃথকভাবে বাড়ির ঘরগুলি ও পিছনের খোলা জমি তল্লাশ করিতে বাহির হইল।

পনেরো মিনিট পরে সকলে সিঁড়ির নীচে ফিরিয়া আসিল। কেহই প্রাণহরিকে খুঁজিয়া পায় নাই। সুতরাং বুড়ো নিশ্চয় উপরেই আছে। অরবিন্দ বলিল, 'চল, আর একবার দোর ঠেলে দেখা যাক।'

এবার চারজনেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। বন্ধ কপাটে চাপ দিতেই কপাট খুলিয়া গেল। ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে। ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর প্রাণহরি পোদ্দার কাত হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার বিরলকেশ মাথার ডান পাশে লম্বা রক্তাক্ত একটা দাগ, তিনি যেন মাথার ডান দিকে সিঁথি কাটিয়া সিঁথির উপর সিঁদুর পরিয়াছেন। মুখ বিকৃত, দন্ত নিষ্ক্রান্ত; প্রাণহরি অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া দর্শকদের উদ্দেশ্যে ভেংচি কাটিতেছেন।

ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া চারজনে হুড়মুড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। তারপর একেবারে রাস্তায়।

ট্যাক্সির কাছে গিয়া দেখিল ট্যাক্সি-ড্রাইভার ষ্টীয়ারিং হুইলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। সকলে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া পরস্পরকে সাবধান করিয়া দিল, তারপর গাড়িতে উঠিয়া বসিল। ড্রাইভার জাগিয়া উঠিয়া গাড়ি চালাইয়া দিল।

চারজনে যখন ক্লাবে ফিরিল তখন মাত্র ন'টা বাজিয়াছে। তাহারা একান্তে বসিয়া পরামর্শ করিল, কাহাকেও কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রাণহরির অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ অবশ্য প্রকাশ পাইবে, কিন্তু তাহারা চারজন যে প্রাণহরির বাড়িতে গিয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই। ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা একশো গজ দূরে ছিল। সে তাহাদের প্রাণহরির বাড়িতে প্রবেশ করিতে দেখে নাই। সুতরাং অভিযানের

কথা বেবাক চাপিয়া যাওয়াই বুদ্ধির কাজ।

. সেদিন সাড়ে দশটা পর্যন্ত ক্লাবে তাস খেলিয়া তাহারা গৃহে ফিরিল। যেন কিছুই হয় নাই।

পরদিন প্রাণহরির মৃত্যু-সংবাদ শহরে রাষ্ট্র হইল বটে, কিন্তু ইহাদের চার-জনের নাম হত্যার সহিত জড়িত হইল না। তৃতীয় দিন পুলিস অরবিন্দের বাড়িতে হানা দিল। পুলিস কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছে।

কিন্তু ইহারা চারজনই শহরের মহাপরাক্রান্ত ব্যক্তি, তাই এখনও কাহারও হাতে দড়ি পড়ে নাই। বাহিরেও জানাজানি হয় নাই। পুলিস জোর তদন্ত চালাইয়াছে, সকলকেই একবার করিয়া ছুঁইয়া গিয়াছে। কখন কী ঘটে বলা যায় না। ফণীশের অবস্থা শোচনীয়। একদিকে খুনের দায়, অন্যদিকে কড়া-প্রকৃতি পিতৃদেব যদি জানিতে পারেন সে জুয়া খেলিতেছে এবং খুনের মামলায় জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা হইলে তিনি যে কী করিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফণীশের কাহিনী শেষ হইতে বারোটা বাজিয়া গেল। তাহাকে আশ্বাস দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'বৌমাকে বোলো ভাবনাব কিছু নেই. আমি সত্য উদ্‌ঘাটনেব ভার নিলাম। কাল আমরা শহরে বেড়াতে যাব, একটা গাড়ি চাই।'

ফণীশ বলিল, 'ড্রাইভারকে বলে দেব. ছোট গাড়িটা আপনাদের জন্যেই মোতায়েন থাকবে।'

ফণীশ চলিয়া গেল। আমরা আলো নিভাইয়া শয়ন করিলাম। নিজের খাটে শুইয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, মৃদুমন্দ টানিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি বুঝলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পাঁচজন আসামীর মধ্যে মাত্র একজনকে দেখেছি। বাকি চারজনকে না দেখা পর্যন্ত কিছু বলা শক্ত।'

'পাঁচজন আসামী!'

'হ্যাঁ। চাকরানীটাকে বাদ দেওয়া যায় না।'

আর কথা হইল না। প্রাণহরি পোদ্দারেব জীবন-লীলার বিচিত্র পরিসমাপ্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে ঘুম ভাঙিয়া দেখি ব্যোমকেশ টেবিলে বসিয়া পরম মনোযোগের সহিত চিঠি লিখিতেছে। গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিলাম. আড়মোড়া ভাঙিয়া বলিলাম, 'কাকে চিঠি লিখছ? সত্যবতীকে? দু'দিন যেতে না যেতেই বিরহ চাগাড় দিল নাকি?'

ব্যোমকেশ লিখিতে লিখিতে বলিল. 'বিরহ নয় -বিকাশ।'

'বিকাশ!'

'বিকাশ দত্ত।'

'ও—বিকাশ। তাকে চিঠি লিখছ কেন?'

'বিকাশের জন্যে একটা চাকরি যোগাড় করেছি। কয়লাখনির ডাক্তারখানায় আর্দালির চাকরি। তাই তাকে আসতে লিখছি।'

'বুঝেছি।'

ব্যোমকেশ আবার চিঠি লেখায় মন দিল। সে বিকাশকে আনিয়া কয়লাখনিতে

বসাইতে চায়, নিজে দূরে থাকিয়া কয়লাখানর তত্ত্ব সংগ্রহ করিবে। আপনি রইলেন ডরপানিতে পোলারে পাঠাইলেন চর।

প্রাতরাশের সময় লক্ষ্য করিলাম আজ ইন্দিরার মুখ অনেকটা প্রফুল্ল; দ্বিধা সংশয়ের মেঘ ফুঁড়িয়া সূর্যের আলো ঝিকমিক করিতেছে। ফণীশ তাহাকে ব্যোমকেশের আশ্বাসের কথা বলিয়াছে।

আজও আমরা দুজনে প্রাতরাশ গ্রহণ করিতেছি, দুই কর্তা বহু পূর্বেই কর্মস্থলে চলিয়া গিয়াছেন। ব্যোমকেশ টোস্ট্ চিবাইতে চিবাইতে ইন্দিরার প্রতি কটাক্ষপাত করিল, বলিল, 'তোমার কর্তাটি একেবারে ছেলেমানুষ।'

ইন্দিরা লজ্জিতভাবে চক্ষু নত করিল; তারপর তাহার চোখে আবার উদ্বেগ ও শঙ্কা ফিরিয়া আসিল। এই মেয়েটির মনে স্বামী সম্বন্ধে আশঙ্কার অন্ত নাই, ব্যোমকেশ তাহাকে ভরসা দিয়া বলিল, 'ভাবনা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা এখন বেরুচ্ছি।'

ইন্দিরা চোখ তুলিয়া বলিল, 'কোথায় যাবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এই এদিক ওদিক। ফিরতে বোধ হয় দুপুর হবে। কর্তা যদি জিগ্যেস করেন, বোলো শহর দেখতে বেরিয়েছি।'

আহার শেষ হইলে আমরা উঠিলাম। মোটর-ড্রাইভার আসিয়া জানাইল, দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।

গাড়িতে উঠিয়া ব্যোমকেশ ড্রাইভারকে হুকুম দিল, 'আগে পোস্ট-অফিসে চল।'

পোস্ট-অফিসে গিয়া চিঠিখানাতে এক্সপ্রেস ডেলিভারি টিকিট সাঁটিয়া ডাকে দিল, তারপর ফিরিয়া আসিয়া ড্রাইভারকে বলিল, 'এবার থানায় চল। সদর থানা।'

থানার সিংহদ্বারে কনেস্টবলের পাহারা। ব্যোমকেশ বড় দারোগাবাবুর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে সে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া বলিল, 'নাম আর দরকার লিখে দিন,—এত্তালা পাঠাচ্ছি।'

ব্যোমকেশ কাগজে লিখিল, 'গগন মিত্র। মণীশ চক্রবর্তীর কয়লাখনি সম্পর্কে।'

অল্পক্ষণ পরে কনেস্টবল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'আসুন।'

ভিতরের একটি ঘরে ইউনিফর্ম-পরা দারোগাবাবু টেবিলের সামনে বসিয়া আছেন, আমরা প্রবেশ করিলে মুখ তুলিলেন, তারপর লাফাইয়া আসিয়া ব্যোমকেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'এ কি কাণ্ড! আপনি গগন মিত্র হলেন কবে থেকে!'

গলার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিলাম—প্রমোদ বরাট। কয়েক বছর আগে গোলাপ কলোনী সম্পর্কে কিছুদিনের জন্য ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। পুলিসের চাকরি ভবঘুরের চাকরি, তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে এই শহরের সদর থানার দারোগাবাবু হইয়া আসিয়াছেন। নিকষকৃষ্ণ চেহারা এই কয় বছরে একটু ভারী হইয়াছে; মুখের ধার কিন্তু লেশমাত্র ভোঁতা হয় নাই।

সমাদর করিয়া আমাদের বসাইলেন। কিছুক্ষণ অতীত-চর্বণ চলিল, তারপর ব্যোমকেশ আমাদের এই শহরে আসার কারণ বলিল। শুনিয়া প্রমোদবাবু বলিলেন, 'হুঁ, ফুলঝুরি কয়লাখনির কেসটা আমাদের ফাইলে আছে; কিন্তু কিছু করা গেল না। এসব কাজ পুলিসের দ্বারা ভাল হয় না; আমাদের অনেক লোক নিয়ে কাজ করতে হয়, মন্ত্রগুপ্তি থাকে না। আপনি পারবেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিকাশ দত্তকে মনে আছে? তাকে ডেকে পাঠালাম, সে কয়লাখনিতে থেকে সুলুক-সন্ধান নেবে।'

প্রমোদবাবু বলিলেন, 'বিকাশকে খুব মনে আছে। চৌকশ ছেলে। তা আমাকে দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কাছে ও-কাজের জন্যে আমি আসিনি, প্রমোদ-বাবু। সম্প্রতি এখানে একটা খুন হয়েছে, প্রাণহরি পোদ্দার নামে এক বৃদ্ধ -'

'আপনি তার খবরও পেয়েছেন?'

'না পেয়ে উপায় কি! আমরা যাঁর বাড়িতে অতিথি তাঁর ছেলেই তো আপনার একজন আসামী।'

প্রমোদ বরাট মুখের একটি করুণ ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'বড় মুশকিলে পড়েছি, ব্যোমকেশবাবু। যে চারজনের ওপর সন্দেহ তারা সবাই এ শহরের হর্তা-কর্তা, প্রচণ্ড দাপট। তাই ভারি সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। সাক্ষী-সাবুদ নেই, সবই circumstantial evidence. এদের কাউকে যদি ভুল করে গ্রেপ্তার করি, আমারই গর্দান যাবে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এই চারজনের মধ্যে কার ওপর আপনার সন্দেহ?'

প্রমোদবাবু ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, 'চারজনেরই মোটিভ সমান, চারজনেরই সুযোগ সমান। তবু মনে হয় এ অরবিন্দ হালদারের কাজ।'

'চারজনে এক জোট হয়ে খুন করতে গিয়েছিল এমন মনে হয় না?'

'না।'

'বাড়িতে একটা দাসী ছিল, তার কথা ভেবে দেখেছেন?'

'দেখেছি। তার সুযোগ ছিল সব চেয়ে বেশী কিন্তু মোটিভ খুঁজে পাইনি।'

'হুঁ। আপনি যা জানেন সব আমাকে বলুন, হয়তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'সাহায্য করবেন আপনি? ধন্যবাদ। আপনার সাহায্য পাওয়া তো ভাগ্যের কথা, ব্যোমকেশবাবু।'

অতঃপর প্রমোদ বরাট যাহা বলিলেন তাহার মর্মার্থ এই—

যে-রাত্রে প্রাণহরি পোদ্দার মারা যান সে-রাত্রে আন্দাজ দশটার সময় উলুডাঙা কোলিয়ারির দিক হইতে একটা ট্রাক আসিতেছিল। ট্রাক-ড্রাইভার হঠাৎ গাড়ি থামাইল, কারণ একটা স্ত্রীলোক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া তাহাকে থামিতে বলিতেছে। গাড়ি থামিলে স্ত্রীলোকটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'শীগ্‌গির পুলিসে খবর দাও, এ বাড়ির মালিককে কারা খুন করেছে।'

ট্রাক-ড্রাইভার আসিয়া থানায় খবর দিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ইন্সপেক্টর বরাট সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া অকুস্থলে উপস্থিত হইলেন। মেয়েটা তখনও ব্যাকুল চক্ষে রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নাম মোহিনী, প্রাণহরির গৃহে সেই এক-মাত্র দাসী, অন্য কোনও ভৃত্য নাই।

ইন্সপেক্টর বরাট বাড়ির দ্বিতলে উঠিয়া লাশ দেখিলেন; তাঁহার অনুচরেরা বাড়ি খানাতল্লাশ করিল। বাড়িতে অন্য কোনও লোক নাই। মোহিনীকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল সে নীচের তলায় রান্নাঘরের পাশে একটি কুঠুরিতে শয়ন করে; কর্তাবাবু শয়ন করেন উপরের ঘরে। আজ সন্ধ্যার সময় শহর হইতে ফিরিয়া তিনি নীচের ঘরে বসিয়া চা পান করিয়াছিলেন, তারপর উপরে উঠিয়া গিয়া-

ছিলেন। মোহিনী রান্না আরম্ভ করিয়াছিল। বাবু ন'টার পর নীচে নামিয়া আসিয়া আহার করেন, আজ কিন্তু তিনি নামিলেন না। আধঘণ্টা পরে মোহিনী উপরে ডাকিতে গিয়া দেখিল ঘরের মেঝেয় কর্তাবাবু মরিয়া পড়িয়া আছেন।

লাশ চালান দিয়া বরাট মোহিনীকে আবার জেরা করিলেন। জেরার উত্তরে সে বলিল, সন্ধ্যার পর বাড়িতে কেহ আসে না; কিছুদিন যাবৎ চারজন বাবু রাত্রে তাস খেলিতে আসিতেন; যেদিন তাঁহাদের আসিবার কথা সেদিন বাবু শহর হইতে মাছ মাংস কিমা ইত্যাদি কিনিয়া আনিতেন, মোহিনী তাহা রাঁধিয়া বাবুদের খাইতে দিত। আজ বাবুরা আসেন নাই, রন্ধনের আয়োজন ছিল না। বাবুরা চারজনই যুবাপুরুষ, কর্তাবাবুর মত বুড়ো নয়। তাঁহারা মোটরে চড়িয়া আসিতেন; সাজপোশাক হইতে তাঁহাদের ধনী বলিয়া মনে হয়। মোহিনী তাহাদের নাম জানে না। আজ সে যখন রান্না করিতেছিল তখন কেহ বাড়িতে আসিয়াছিল কিনা তাহা সে বলিতে পারে না। বাড়িতে লোক আসিলে প্রাণহরি নীচের তলায় তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতেন, উপরের ঘরে কাহাকেও লইয়া যাইতেন না। কর্তাবাবু আজ নীচে নামেন নাই, নামিলে মোহিনী কথাবার্তার আওয়াজ শুনিতে পাইত।

জেরা শেষ করিয়া বরাট বলিলেন, 'তুমি এখন কি করবে? শহরে তোমার জানাশোনা লোক আছে?'

মোহিনী বলিল, 'না, এখানে আমি কাউকে চিনি না।'

বরাট বলিলেন, 'তাহলে তুমি আমার সঙ্গে চল, রাত্তিরটা থানায় থাকবে, কাল একটা ব্যবস্থা করা যাবে। তুমি মেয়েমানুষ, একলা এ বাড়িতে থাকতে পাববে কেন?'

মোহিনী বলিল, 'আমি পারব। নিজের ঘরে দোর বন্ধ করে থাকব। আমার ভয় করবে না।'

সেইরূপ ব্যবস্থা হইল। বরাট একজন কনেস্টবলকে পাহারায় রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রাণহরি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া প্রমোদবাবু জানিতে পারিলেন প্রাণহরি কয়লা ক্লাবের মেম্বর ছিলেন। সেখানে গিয়া খবর পাইলেন, প্রাণহরি চারজন মেম্বরের সঙ্গে নিয়মিত তাস খেলিতেন। ব্যাপার খানিকটা পরিষ্কার হইল; এই চারজন যে প্রাণহরির বাড়িতে তাস খেলিতে যাইতেন তাহা অনুমান করা গেল।

প্রমোদবাবু চারজনকে পৃথকভাবে জেরা করিলেন। তাহারা স্বীকার করিল যে মাঝে মাঝে প্রাণহরির বাড়িতে তাস খেলিতে যাইত, কিন্তু প্রাণহরির মৃত্যুর রাত্রে তাহার বাড়িতে গিয়াছিল একথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিল।

তাহাদের চারজন মোটর ড্রাইভারকে প্রমোদ বরাট প্রশ্ন করিলেন। তিনজন ড্রাইভার বলিল সে-রাত্রে বাবুরা মোটরে চড়িয়া প্রাণহরির বাড়িতে যান নাই। কেবল একজন বলিল, বাবুরা রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় একসঙ্গে ক্লাব হইতে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু মোটরে না গিয়া পদব্রজে গিয়াছিলেন, এবং ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা একসঙ্গে কোথায় গিয়াছিলেন তাহা সে জানে না।

বরাট তখন ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের মধ্যে খোঁজ-খবর লইলেন, শহরে গোটা পঞ্চাশ ট্যাক্সি আছে। শেষ পর্যন্ত একজন ড্রাইভার অন্য একজন ড্রাইভারকে দেখাইয়া

বলিল—ও সেদ্রাত্রে ভাড়ায় গিয়াছিল, ওকে জিজ্ঞাসা করুন। দ্বিতীয় ড্রাইভার তখন বলিল—উক্ত রাত্রে চারজন আরোহী লইয়া সে উলুডাঙা কয়লাখনির রাস্তায় গিয়াছিল। বরাট ড্রাইভারকে কয়লা ক্লাবে আনিয়া চুপিচুপি চারজনকে দেখাইলেন। ড্রাইভার চারজনকে সনাক্ত করিল।

তারপর বরাট চারজনকে বার বার জেরা করিয়াছেন কিন্তু তাহারা অটলভাবে সমস্ত কথা অস্বীকার করিয়াছে। পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছে এই যে, একটা ট্যাক্সি-ড্রাইভার ছাড়া অন্য সাক্ষী নাই; এ অবস্থায় শহরের চারজন গণ্যমান্য লোককে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা যায় না।

বয়ান শেষ করিয়া বরাট বলিলেন, 'আমি যতটুকু জানতে পেরেছি আপনাকে জানালাম। তবে একটা অবান্তর কথা বোধ হয় আপনাকে জানিয়ে রাখা ভাল। অন্যতম আসামীর দাদা গোবিন্দ হালদার আমাকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিতে এসেছিলেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ভারী কৌশলী লোক। আমাকে আড়ালে ডেকে ইশারায় জানিয়েছিলেন যে, কেস্‌টা যদি চাপা দিই তাহলে পাঁচ হাজার টাকা বকশিশ পাব।'

ঘড়িতে দেখিলাম বেলা সাড়ে ন'টা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার এখন কোনো জরুরী কাজ আছে কি? অকুস্থলটা দেখবার ইচ্ছে আছে।'

বরাট বলিলেন, 'বেশ তো, চলুন না।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'মেয়েটা এখনো ওখানেই আছে নাকি?'

বরাট বলিলেন, 'আছে বৈকি। তার কোথাও যাবার নেই, ঐ বাড়িতেই পড়ে আছে।'

তিনজনে বাহির হইলাম, প্রমোদবাবু আমাদের গাড়িতেই আসিলেন। গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে ব্যোমকেশ ড্রাইভারকে বলিল, 'যে-বাড়িতে বাবুরা তাস খেলতে যেতেন সেই বাড়িতে নিয়ে চল।'

ড্রাইভারের নির্বিকার মুখে ভাবান্তর দেখা গেল না, সে নির্দেশ মত গাড়ি চালাইল।

দশ মিনিট পরে প্রাণহরি পোদ্দারের বাড়ির সামনে মোটর থামিল। বাড়ির সদরে কেহ নাই। বাড়িটা দেখিতে একটু উলঙ্গ গোছের; চারিপাশে পাঁচিলের বেড়া নাই, রাস্তা হইতে কয়েক হাত পিছাইয়া আব্রুহীনভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সদর দরজা খোলা।

বরাট ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, 'হতভাগা কনেস্টবলটা গেল কোথায়?'

বরাট আগে আগে, আমরা তাঁহার পিছনে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। রান্নাঘরের দিক হইতে হেঁড়ে গলার আওয়াজ আসিতেছে। সেইদিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম উর্দি-পরা পাহারালা গোঁফে চাড়া দিতে দিতে রান্নাঘরের দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া অন্তর্বর্তিনীর সহিত রসালাপ করিতেছে। আমাদের দেখিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

বরাট আরক্ত চক্ষে তাহার পানে চাহিলেন, সে কলের পুতুলের মত স্যালুট করিল। বরাট বলিলেন, 'বাইরে যাও। সদর দরজা খোলা রেখে তুমি এখানে কি করছ?'

বরাটের প্রশ্নটা সম্পূর্ণ আলঙ্কারিক। অতি বড় নিরেট ব্যক্তিও বুঝিতে পারে পাহারালা এখানে কি করিতেছিল। মক্ষিকা মধুভাণ্ডের কাছে কী করে?

পাহারালা আবার স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল। বরাট তখন রান্নাঘরের ভিতরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। মোহিনী মেঝেয় বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল, ত্বরিতে উঠিয়া বরাটের পানে সপ্রশ্ননেত্রে চাহিল।

কালো মেয়েটার সারা গায়ে—মুখে চোখে অঙ্গসঞ্চালনে—কুহকভরা ইন্দ্রজাল, ভরা যৌবনের দুর্নিবার আকর্ষণ। যদি রঙ ফরসা হইত তাহাকে অপূর্ব সুন্দরী বলা চলিত। তবু, তাহার কালো রঙের মধ্যেও এমন একটি নিশীথ-শীতল মাদকতা আছে যে মনকে আবিষ্ট করিয়া ফেলে।

কিন্তু প্রমোদ বরাট কাঠখোট্টা মানুষ, তিনি বলিলেন, 'তুমি তাজা তরকারি পেলে কোথায়?'

মোহিনী বলিল, 'পাহারালাবাবু এনে দিয়েছেন। উনি নিজের সিধে তরি-তরকারি আমাকে এনে দেন, আমি রেঁধে দিই। আমারও হয়ে যায়।'

বরাট গলার মধ্যে শব্দ করিয়া বলিলেন, 'হুঁ, ভারি দয়ার শরীর দেখছি পাহারালাবাবুর।'

মোহিনী বক্রোক্তি বুঝিল কিনা বলা যায় না, প্রশ্ন করিল, 'আমাকে কি দরকার আছে দারোগাবাবু?'

প্রমোদবাবু বলিলেন, 'তুমি এখানেই থাকো। আমরা খানিক পরে তোমাকে ডাকব।'

'আচ্ছা।'

আমরা সদর দরজার দিকে ফিরিয়া চলিলাম। চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ স্মিতমুখে বলিল, 'আপনি একটু ভুল করেছেন, ইন্সপেক্টর বরাট। আপনার উচিত ছিল একজন বুড়ো পাহারালাকে এখানে বসানো।'

বরাট বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি ওদের চেনেন না। পাহারালারা যত বুড়ো হয় তাদের রস তত বাড়ে।'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আর সুদখোর মহাজনেরা?'

বরাট চকিতে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর নিম্নস্বরে বলিলেন, 'সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না, ব্যোমকেশবাবু। কিন্তু পরিস্থিতি সন্দেহজনক। আপনি মেয়েটাকে জেরা করে দেখুন না, বুড়োর সঙ্গে ওর কোনো রকম ইয়ে ছিল কিনা।'

'দেখব।'

সদর দরজার পাশে উপরে উঠিবার সিঁড়ি দিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। সিঁড়ির মাথায় মজবুত ভারী দরজা, তাহাতে ইয়েল-লক্ লাগানো। বাড়ির অন্যান্য দরজার তুলনায় এ দরজা নূতন বলিয়া মনে হয়। হয়তো প্রাণহরি পোদ্দার বাড়ি ভাড়া লইবার পর এই ঘরে নূতন দরজা লাগাইয়াছিলেন।

বরাট পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া দ্বার খুলিলেন। আমরা অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলাম। তারপর বরাট একটা জানালা খুলিয়া দিতেই রৌদ্রোজ্জ্বল আলো ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরে দু'টি জানালা দু'টি দ্বার। একটি দ্বার সিঁড়ির মুখে, অন্যটি পিছনের দেয়ালে। ঘরটি লম্বায় চওড়ায় আন্দাজ পনেরো ফুট চৌকশ। ঘরে আসবাব বিশেষ কিছু নাই; একটা তক্তপোশের উপর বিছানা, তাহার শিয়রের দিকে দেয়াল ঘেঁষিয়া একটি জগদ্দল লোহার সিন্দুক। একটা দেয়াল-আল্না হইতে প্রাণহরির ব্যবহৃত জামা কাপড় ঝুলিতেছে। প্রাণহরির টাকার অভাব ছিল না, কিন্তু জীবন যাপনের পদ্ধতি ছিল নিতান্ত মামুলী। মাথার কাছে লোহার সিন্দুক লইয়া দরজায় ইয়েল-লক্ লাগাইয়া তিনি তক্তপোশের মলিন শয্যায় শয়ন করিতেন।

ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু চক্ষু বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'লাশ কোথায় ছিল?'

সিঁড়ির দরজা হইতে হাত চারেক দূরে মেঝের দিকে আঙুল দেখাইয়া বরাট বলিলেন, 'এইখানে।'

ব্যোমকেশ নত হইয়া স্থানটা পরীক্ষা করিল, বলিল, 'রক্তের দাগ তো বিশেষ দেখছি না। সামান্য ছিটেফোঁটা।'

বরাট বলিলেন, 'বুড়োর গায়ে কি রক্ত ছিল! চেহারাটা ছিল বেউড় বাঁশের মত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অবশ্য মাথার খুলি ভাঙলে বেশী রক্তপাত হয় না।—মারণাস্ত্রটা পাওয়া গেছে?'

'না। ঘরে কোন অস্ত্র ছিল না। বাড়িতেও এমন কিছু পাওয়া যায়নি যাকে মারণাস্ত্র মনে করা যেতে পারে। বাড়ির চারিপাশে বহু দূর পর্যন্ত খুঁজে দেখা হয়েছে, মারণাস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি।'

'যাক। সিন্দুক খুলে দেখেছিলেন নিশ্চয়। কি পেলেন?'

'সিন্দুকের চাবি পোদ্দারের কোমরে ছিল। সিন্দুক খুলে পেলাম হিসেবের খেরো-বাঁধানো খাতা আর নগদ দশ হাজার টাকা।'

'দশ হাজার টাকা!'

'হ্যাঁ। বুড়োর মহাজনী কারবার ছিল তাই বোধহয় নগদ টাকা কাছে রাখতো।'

'হুঁ। ব্যাঙ্কে টাকা ছিল?'

'ছিল। এবং এখনো আছে। কে পাবে জানি না। টাকা কম নয়, প্রায় দেড় লাখ।'

'তাই নাকি! আত্মীয়-স্বজনরা খবর পেয়েছে?'

'বোধহয় কেউ নেই। থাকলে শকুনির পালের মত এসে জুটত।'

'শহরে বুড়োর একটা অফিস ছিল শুনেছি। সেখানে তল্লাশ করে কিছু পেয়েছিলেন?'

'অফিস মানে চোর-কুটুরির মতন একটা ঘর।—দু'চারটে খাতাপত্তর ছিল, তা থেকে মনে হয় মহাজনী কারবার ভাল চলত না।'

ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে কতকটা নিজমনেই বলিল, 'মহাজনী কারবার ভাল চলত না, অথচ ব্যাঙ্কে দেড় লাখ এবং সিন্দুকে দশ হাজার'—চিন্তা হইতে জাগিয়া উঠিয়া সে বলিল—"ওই অন্য দরজাটার বাইরে কি আছে?'

বরাট বলিলেন, 'স্নানের ঘর ইত্যাদি।'

এ দরজাটাও নূতন মজবুত দরজা। প্রাণহরি পোদ্দার ঘরটিকে দুর্গের মত সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, কারণ সিন্দুকে মাল আছে।

ব্যোমকেশ দরজা খুলিল। সংকীর্ণ ঘরে পিছনের দেয়ালে একটি ঘুলঘুলি দিয়া আলো আসিতেছে, ঘুলঘুলির নীচে সরু একটি দরজা। ঘরে একটি শূন্য বালতি ও টিনের মগ ছাড়া আর কিছু নাই।

সরু দরজার উপরে-নীচে ছিট্‌কিনি লাগানো। ব্যোমকেশ ছিট্‌কিনি খুলিয়া কপাট ফাঁক করিল। উঁকি মারিয়া দেখিলাম, দ্বারের মুখ হইতে শীর্ণ লোহার মই মাটি পর্যন্ত গিয়াছে। মেথরখাটা রাস্তা; প্রাণহরির দুর্গে প্রবেশ করিবার দ্বিতীয় পথ।

ব্যোমকেশ বরাটকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি সে রাত্রে যখন প্রথম এসেছিলেন, এ দরজা দুটো বন্ধ ছিল?'

বরাট বলিলেন, 'হ্যাঁ, দুটোই বন্ধ ছিল। কেবল সামনে সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন, এবাব নীচে যাওয়া যাক। মেয়েটাকে দু'চারটে প্রশ্ন করে দেখি।'

ড্রইং-রুমের মতন সাজানো নীচের তলার যে-ঘরটাতে তাস খেলা হইত সেই ঘরে আমরা বসিয়াছি। মোহিনী একটা চেয়ারের পিঠে হাত রাখিয়া আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখে ভয় বা উদ্বেগের চিহ্ন নাই, ভাবভঙ্গী বেশ সংযত এবং সংবৃত।

মনে মনে প্রাণহরির নিরাভরণ শয়নকক্ষের সহিত সুসজ্জিত ড্রইং-রুমেব তুলনা করিতেছি, ব্যোমকেশ মোহিনীকে প্রশ্ন করিল, 'তুমি প্রাণহরিবাবুর কাছে কতদিন চাকরি করছ?'

মোহিনী বলিল, 'দু'বছরের বেশী।'

'প্রাণহরিবাবু যখন কটকে ছিলেন তখন থেকে তুমি ও'র কাছে আছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'প্রাণহরিবাবুব আত্মীয়স্বজন কেউ আছে?'

'জানি না। কখনো দেখিনি।'

'তুমি কত মাইনে পাও?'

'কটকে ছিল দশ টাকা মাইনে আব খাওয়া-পরা। এখানে আসার পর পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।'

'প্রাণহরিবাবু কেমন লোক ছিলেন?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মোহিনী বলিল, 'তিনি আমার মালিক ছিলেন, ভাল লোকই ছিলেন।' অর্থাৎ, তিনি আমার মালিক ছিলেন তাঁহার নিন্দা করিব না, তোমরা বুঝিয়া লও।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনি কৃপণ ছিলেন?'

মোহিনী চুপ করিয়া রহিল। ব্যোমকেশ স্থিরনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, 'তোমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি রকম ছিল?'

মোহিনী একটু বিস্ময়ভরে ব্যোমকেশের পানে চোখ তুলিল, তাহার ঠোঁটের কোণে যেন একটু চটুলতার ঝিলিক খেলিয়া গেল। তারপর সে শান্তস্বরে বলিল, 'ভালই ছিল। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। তাঁর স্ত্রীলোক-ঘটিত কোনো দোষ ছিল?'

'আজ্ঞে না। বুড়ো মানুষ ছিলেন, ওসব দোষ ছিল না। কেবল তাস খেলার নেশা ছিল। একলা বসে বসে তাস খেলতেন।'

'যাক। তুমি এখন নিজের কথা বল। প্রাণহরিবাবু খুন হয়েছেন, তা সত্ত্বেও তুমি একলা এ বাড়িতে পড়ে আছ কেন?'

'কোথায় যাব? এ শহরে তো আমার কেউ নেই।'

'দেশে ফিরে যাচ্ছ না কেন?'

'তাই যাব। কিন্তু দারোগাবাবু হুকুম দিয়েছেন যতদিন না খুনের কিনারা হয় ততদিন কোথাও যেতে পাব না।'

'দেশে তোমার কে আছে?'

'বুড়ো মা-বাপ আছে।'

'আর স্বামী?'

মোহিনী চকিতে চোখ তুলিয়া আবার চোখ নীচু করিয়া ফেলিল, প্রশ্নের উত্তর দিল না।

'বিয়ে হয়েছে নিশ্চয়?'

মোহিনী নীরবে ঘাড় নাড়িল।

'স্বামী কোথায়?'

মোহিনী ঘাড় না তুলিয়াই ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'স্বামী ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে, আর ফিরে আসেনি।'

ব্যোমকেশ তাহার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সিগারেট ধরাইল, 'কতদিন হল স্বামী ঘরছাড়া হয়েছে?'

'তিন বছর।'

'স্বামী কী কাজ করত?'

'কল-কারখানায় কাজ করত।'

'বিবাগী হয়ে গেল কেন?'

মোহিনীর অধরোষ্ঠ একটু প্রসারিত হইল, সে ব্যোমকেশের প্রতি একটি চকিত চপল কটাক্ষ হানিয়া বলিল, 'জানি না।'

ইহাদের প্রশ্নোত্তর শুনিতে শুনিতে এবং মোহিনীকে দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছি, মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র কেমন? সচ্চরিত্রা, না স্বৈরিণী? সে যে-শ্রেণীর মেয়ে তাহাদের মধ্যে একনিষ্ঠা ও পাতিব্রত্যের স্থান খুব উচ্চ নয়। ঐহিক প্রয়োজনের তাড়নায় তাহাদের জীবন বিপথে-কুপথে সঞ্চরণ করে। অথচ মোহিনীকে দেখিয়া ঠিক সেই জাতীয় সাধারণ ঝি-চাকরানী শ্রেণীর মেয়ে বলিয়া মনে হয় না। কোথায় যেন একটু তফাৎ আছে। তাহার যৌবন-সুলভ চপলতা চটুলতার সঙ্গে চরিত্রের দৃঢ়তা ও সাহস আছে। এ মেয়ে যদি নষ্ট-দুষ্ট হয়, সজ্ঞানে জানিয়া বুঝিয়া নষ্ট-দুষ্ট হইবে, বাহ্য প্রয়োজনের তাগিদে নয়।

ব্যোমকেশ সিগারেটে দু'টা লম্বা টান দিয়া বলিল, 'যে চারজন বাবু এখানে তাস খেলতে আসতেন তাঁদের তুমি কয়েকবার দেখেছ—কেমন?'

মোহিনীর চক্ষু দু'টি একবার দক্ষিণে-বামে সঞ্চরণ করিল, অধরোষ্ঠ ক্ষণকাল বিভক্ত হইয়া রহিল, যেন সে হাসিতে গিয়া থামিয়া গেল। তারপর বলিল, 'হ্যাঁ, কয়েকবার দেখেছি।' সে বুঝিয়াছে ব্যোমকেশের প্রশ্ন কোন দিকে যাইতেছে।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওদের মধ্যে কে কেমন লোক তুমি বলতে পার?'

অব্যক্ত হাসি এবার পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মোহিনী একটু ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, 'কে কেমন মানুষ তা কি মুখ দেখে বলা যায় বাবু? তবে একজন ছিলেন সব চেয়ে ছেলেমানুষ আর সব চেয়ে ভালোমানুষ। বাকি তিনজন—' সে থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, বাকি তিনজন কেমন লোক?'

হাসিমুখে জিভ কাটিয়া মোহিনী বলিল, 'আমি জানি না, বাবু।'

মোহিনীর একটা ক্ষমতা আছে, সে 'জানি না' বলিয়া অনেক কথা জানাইয়া দিতে পারে।

ব্যোমকেশ সিগারেটের দগ্ধাংশ জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'এঁরা তাস খেলার সময় ছাড়াও অন্য সময়ে আসতেন কি?'

মোহিনী কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল, 'একজন আসতেন। কর্তাবাবু সকালবেলা আপিস চলে যাবার পর আসতেন।'

'কে তিনি?'

'নাম জানি না, বাবু। কালো মোটা মতন চেহারা, খুব ছেঁদো কথা বলতে পারেন।'

বরাট অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'অরবিন্দ হালদার।'

ব্যোমকেশ মোহিনীকে বলিল, 'তাহলে তোমার সঙ্গেই তিনি দেখা করতে আসতেন?'

মোহিনী কেবল ঘাড় নাড়িল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'কোনো প্রস্তাব করেছিলেন?'

মোহিনীর দৃষ্টি হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল, সে তীক্ষ্ন স্বরে বলিল, 'সোনার আংটি দিতে এসেছিলেন, সিল্কের শাড়ী দিতে এসেছিলেন।'

'তুমি নিয়েছিলে?'

'না। আমার ইজ্জৎ অত সস্তা নয়।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ তাহাকে নিবিষ্ট চক্ষে নিরীক্ষণ করিল, তারপর বলিল, 'আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। পরে যদি দরকার হয় আবার সওয়াল করব।—তুমি উড়িষ্যার মেয়ে, কিন্তু পরিষ্কার বাংলা বলতে পারো দেখছি।'

মোহিনীর সুর এবার নরম হইল। সে বলিল, 'বাবু, আমি ছেলেবেলা থেকে বাঙালীর বাড়িতে কাজ করেছি।'

ফিরিবার পথে ভাবিতে লাগিলাম, মোহিনী-বর্ণিত ছেলেমানুষ এবং ভালো-মানুষ লোকটি অবশ্য ফণীশ। অন্য তিনজনের মধ্যে অরবিন্দ হালদার দু'কান-কাটা লম্পট। আর বাকি দু'জন? বোধ হয় অতটা বেহায়া নয়, কিন্তু মনে লোভ আছে; ডুবিয়া ডুবিয়া জল পান করেন। মোহিনী বলিয়াছিল, তাহার ইজ্জৎ অত সস্তা নয়। তাহার ইজ্জতের দাম কত? রূপযৌবনের অনুপাতেই কি ইজ্জতের দাম বাড়ে এবং কমে? কিংবা অন্য কোনও নিরিখ আছে? এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিই দিতে পারেন।

থানার সামনে বরাট নামিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওবেলা আবার আসব। সিভিল সার্জন—যিনি অটপ্সি করেছেন—তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

বরাট বলিলেন, 'আসবেন। আমি সিভিল সার্জনের সঙ্গে সময় ঠিক করে রাখব। পি এম রিপোর্ট অবশ্য তৈরি আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পি এম রিপোর্টও দেখব।'

বরাট বলিলেন, 'আচ্ছা। চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখব।'

বাড়ি ফিরিলাম তখন বারোটা বাজিয়াছে। কিয়ৎকাল পরে মণীশবাবুরা ফিরিলেন। মণীশবাবু ভ্রূ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিলে সে বলিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যা করবার আমি করছি। পুলিসের সঙ্গে দেখা করেছি। একটা ব্যবস্থা হয়েছে, পরে আপনাকে সব জানাবো।'

মণীশবাবু সন্তুষ্ট হইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। ফণীশ উৎসুকভাবে আমাদের আশেপাশে ঘুর ঘুর করিতে লাগিল। ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'তুমিও নিশ্চিন্ত থাকো, কাজ খানিকটা এগিয়েছে। বিকেলে আবার বেরুব।'

বেলা তিনটের সময় পিতাপুত্র আবার কাজে বাহির হইলেন। আমরা সুরপতি ঘটকের দপ্তরে গেলাম। সুরপতিবাবু আমাদের অফিস-ঘরে বসাইয়া কয়লাখনি চালানো সম্বন্ধে নানা তথ্য শুনাইতে লাগিলেন। তারপর দ্বারদেশে দুইটি যুবকের আবির্ভাব ঘটিল। খদ্দর-পরা শান্তশিষ্ট চেহারা, মুখে বুদ্ধিমত্তার সহিত বিনীত ভাব। সুরপতিবাবু বলিলেন, 'এই যে তোমরা এসেছ। গগনবাবু, এদেরই কথা আপনাকে বলেছিলাম। ওরা দুই ভাই, নাম বিশ্বনাথ আর জগন্নাথ। ওদের আমি নিজের হাতে কাজ শিখিয়েছি। বয়স কম বটে, কিন্তু কাজকর্মে একেবারে পোক্ত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ বেশ। এখানকার কাজ ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে আপনাদের আপত্তি নেই তো?'

বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ মাথা নাড়িয়া জানাইল, আপত্তি নাই। সুরপতিবাবু বলিলেন, 'ওদের দু'জনকে কিন্তু একসঙ্গে ছাড়তে পারব না, তাহলে আমার কাজের ক্ষতি হবে। ওদের মধ্যে একজনকে আপনারা নিন, যাকে আপনাদের পছন্দ।'

'তাই সই' বলিয়া ব্যোমকেশ পকেট হইতে নোট-বুক বাহির করিয়া দু'জনের নাম-ধাম লিখিয়া লইল, বলিল, 'যথাসময় আমি আপনাকে চিঠি দেব।'

বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। ব্যোমকেশ সুরপতিবাবুকে বলিল, 'দু'জনকেই আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি যাকে দিতে চান তাকেই নেব।'

সুরপতিবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, 'ওরা দুই ভাই সমান কাজের লোক, আপনারা যাকেই নিন ঠকবেন না।'

চারটে বাজিতে আর দেরী নাই দেখিয়া আমরা উঠিলাম।

বরাট অফিসে ছিলেন, বলিলেন, 'সিভিল সার্জন সাড়ে চারটের সময় দেখা করবেন। এই নিন পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট।'

ব্যোমকেশ রিপোর্টে চোখ বুলাইয়া ফেরৎ দিল। তারপর আমরা হাসপাতালের দিকে রওনা হইলাম। সিভিল সার্জন মহাশয়ের অফিস হাসপাতালে।

সিভিল সার্জন বিরাজমোহন ঘোষাল অফিসে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন। বয়স্থ ব্যক্তি, স্থূল গৌরবর্ণ সুদর্শন চেহারা, আমাদের দেখিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'আপনার আসল নাম আমি জেনে ফেলেছি,

ব্যোমকেশবাবু। ইন্সপেক্টর বরাট ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ধাপ্পা টিক্‌ল না।' বলিয়া আবার অট্টহাস্য করিলেন।

ব্যোমকেশ বিনীতভাবে বলিল, 'বে-কায়দায় পড়ে পঞ্চ পাণ্ডবকে ছদ্মনাম গ্রহণ করতে হয়েছিল, আমি তো সামান্য লোক। একটা গোপনীয় কাজে এখানে এসেছি, তাই গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছে।'

'ভয় নেই, আমার পেট থেকে কথা বেরুবে না। বসুন।'

কিছুক্ষণ সাধারণভাবে আলাপ-আলোচনা হাস্য-পরিহাস চলিল। ডাক্তার ঘোষাল আনন্দময় পুরুষ, সারা জীবন মড়া ঘাঁটিয়াও তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত অট্টহাস্য প্রশমিত হয় নাই।

অবশেষে কাজের কথা আরম্ভ হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রাণহরি পোদ্দারের পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট আমি দেখেছি। আপনার মুখে অতিরিক্ত কিছু শুনতে চাই। লোকটি বুড়ো হয়েছিল, রোগা-পটকা ছিল, তার দৈহিক শক্তি কি কিছুই অবশিষ্ট ছিল না?'

বিরাজবাবু বলিলেন, 'দৈহিক শক্তি—?'

'মানে—যৌবন। পুরুষের যৌবন অনেক বয়স পর্যন্ত থাকতে পারে; একশো বছর বয়সে ছেলের বাপ হয়েছে এমন নজিরও পাওয়া যায়। প্রাণহরি পোদ্দারের দেহ-যন্ত্রটা সেদিক দিয়ে কি সক্ষম ছিল?'

বিরাজবাবু আবার অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, 'ও—এই কথা জানতে চান? তা ডাক্তারের কাছে এত লজ্জা কিসের? না, প্রাণহরি পোদ্দারের শরীরে রস-কষ কিছু ছিল না, একেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং।' দু'বার গড়গড়ায় টান দিয়া বলিলেন, 'আমি লক্ষ্য করেছি যারা রাতদিন টাকার ভাবনা ভাবে তাদের ওসব বেশী দিন থাকে না। প্রাণহরি পোদ্দার তো সুদখোর মহাজন ছিল।'

মনে হইল ব্যোমকেশ একটু নিরাশ হইয়াছে। ক্ষণেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া সে বলিল, 'আচ্ছা, ওকথা যাক। এখন মারণাস্ত্রের কথা বলুন। খুলির ওপর ওই একটা চোট্ ছাড়া আর কোথাও আঘাতের দাগ ছিল না?'

'না।'

'এক আঘাতেই মৃত্যু ঘটেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'অস্ত্রটা কী ধরনের ছিল?'

বিরাজবাবু কিছুক্ষণ গড়গড়া টানিলেন, 'কী রকম অস্ত্র ছিল বলা শক্ত। অস্ত্রটা লম্বা গোছের, লম্বা এবং ভারী। কাটারির মতন ধারালো নয়, আবার পুলিসের রুলের মতন ভোঁতাও নয়-'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ইলেকট্রিক টর্চ হতে পারে কি?'

'ইলেকট্রিক টর্চ!' বিরাজবাবু মাথা নাড়িলেন, 'না, তাতে এমন পরিষ্কার কাটা দাগ হবে না। এই ধরুন, কাটারির ফলার উল্টো পিঠ দিয়ে, অর্থাৎ শিরদাঁড়ার দিক দিয়ে যদি সজোরে মাথায় মারা যায় তাহলে ওইভাবে খুলির হাড় ভাঙতে পারে।'

'রান্নাঘরের হাতা বেড়ি খুন্তি—?'

'না, তার চেয়ে ভারী জিনিস।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'অস্ত্রটাই ভাবিয়ে তুলেছে। যাদের ওপর সন্দেহ তারা দা-কাটারি জাতীয় অস্ত্র নিয়ে খুন

করতে গিয়েছিল ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে একেবারে অসম্ভব নয়। আচ্ছা, আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আততায়ী সামনের দিক থেকে অস্ত্র চালিয়েছিল, না পিছন দিক থেকে?'

বিরাজবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'সামনের দিক থেকে। কপাল থেকে মাথার মাঝখান পর্যন্ত হাড় ভেঙেছে, পিছন দিকের হাড় ভাঙেনি।'

'পিছন দিক থেকে মারা একেবারেই সম্ভব নয়?'

বিরাজবাবু ভাবিয়া বলিলেন, 'পোদ্দার যদি চেয়ারে বসে থাকত তাহলে ওভাবে মারা সম্ভব হত, দাঁড়িয়ে থাকলে সম্ভব নয়। তবে যদি আততায়ী দশ ফুট লম্বা হয়--'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, 'দশ ফুট দ্রাঘিমার লোক এখানে থাকলে নজরে পড়ত। আচ্ছা, আজ চলি। নমস্কার।'

থানায় ফিরিয়া বরাট বলিলেন, 'অতঃপর? বাকি তিনজন আসামীকে দর্শন করতে চান?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চাই বৈকি। এখন তাদের বাড়িতে পাওয়া যাবে?'

বরাট বলিলেন, 'না, এসময় তারা খেলাধুলো করতে ক্লাবে আসে।'

'তাহলে এখন থাক। আপনার সঙ্গে ক্লাবে গেলে শিকার ভড়কে যাবে। ভাল কথা, পোদ্দারের হিসেবের খাতাটা দিতে পারেন? ওটা নেড়েচেড়ে দেখতে চাই, যদি কিছু পাওয়া যায়।'

'অফিসেই আছে, নিয়ে যান। আর কিছু?'

'আর—একটা কাজ করলে ভাল হয়। প্রাণহরি পোদ্দারের অতীত সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। বছর দেড়েক আগে বুড়ো কটকে ছিল। কটকের পুলিস দপ্তর থেকে কিছু খবর পাওয়া যায় না-কি?'

বরাট বলিলেন, 'কটকের পুলিস দপ্তরে খোঁজ নিয়েছিলাম, প্রাণহরি পোদ্দারের পুলিস-রেকর্ড নেই। তবে তার সম্বন্ধে সাধারণভাবে যদি জানতে চান, আমার একজন চেনা অফিসার কয়েক বছর কটকে আছেন—ইন্সপেক্টর পট্টনায়ক। তাঁকে লিখতে পারি।'

'তাই করুন। ইন্সপেক্টর পট্টনায়ককে টেলিগ্রাম করে দিন, যত শীগ্গির খবর পাওয়া যায়। আজ উঠলাম, কাল সকালেই আবার আসছি।

নৈশ ভোজনের পর মণীশবাবু উপরে গেলেন, আমরা নিজেদের ঘরে আসিলাম। মাথার উপর পাখা খুলিয়া দিয়া আমি শয়নের উপক্রম করিলাম, ব্যোমকেশ কিন্তু শুইল না, প্রাণহরির হিসাবের খাতা লইয়া টেবিলের সামনে বসিল। খেরো-বাঁধানো দু-ভাঁজ করা লম্বা খাতা, তাহাতে দেশী পদ্ধতিতে হিসাব লেখা।

ব্যোমকেশ হিসাবের খাতার গোড়া হইতে ধীরে ধীরে পাতা উল্টাইতেছে, আমি খাটের ধারে বসিয়া সিগারেট প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি, এমন সময় ফণীশ আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিল, তারপর এক অদ্ভুত কাজ করিল। তাহার সামনে টেবিলের উপর একটি কাঁচের কাগজ-চাপা গোলক ছিল, সে চকিতে তাহা তুলিয়া লইয়া ফণীশের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

ফণীশ টপ করিয়া সেটা ধরিয়া ফেলিল, নচেৎ মেঝেয় পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইত। ব্যোমকেশ হাসিয়া ডাকিল, 'এস ফণীশ।'

ফণীশ বিস্মিত হতবুদ্ধি মুখ লইয়া কাছে আসিল, ব্যোমকেশ কাঁচের গোলাটা তাহার হাত হইতে লইয়া বলিল, 'অবাক হয়ে গেছ দেখছি। ও কিছু নয়, তোমার রিফ্লেক্স পরীক্ষা করছিলাম। বোসো, কয়েকটা প্রশ্ন করব।'

ফণীশ সামনের চেয়ারে বসিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি আজকাল ক্লাবে যাও না?'

ফণীশ বলিল, 'ওই ব্যাপারের পর আর যাইনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাওনি কেন? হঠাৎ যাওয়া বন্ধ করলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।'

ফণীশ বলিল, 'আচ্ছা, কাল থেকে যাব।'

'আমরাও যাব। অতিথি নিয়ে যেতে বাধা নেই তো?'

'না। কিন্তু—ক্লাবে আপনার কিছু দরকার আছে কি?'

'তোমার তিন বন্ধুকে আড়াল থেকে দেখতে চাই।—আচ্ছা, একটা কথা বল দেখি, সেদিন তোমরা যে প্রাণহরি পোদ্দারকে ঠেঙাতে গিয়েছিলে তোমাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র কিছু ছিল?'

'অস্ত্র ছিল না। তবে মধুময়বাবুর হাতে একটা লম্বা টর্চ ছিল, মুণ্ডুওয়ালা টর্চ। আর মৃগাঙ্কবাবুর হাতে ছিল বেতের ছড়ি।'

'কি রকম ছড়ি? মোটা, না লচপচে?'

'লচপচে। যাকে swagger cane বলে।'

'হুঁ, তোমার হাতে কিছু ছিল না?'

'না।'

'অরবিন্দ হালদারের হাতে?'

'না।'

'কাপড়-চোপড়ের মধ্যে লোহার ডাণ্ডা কি ঐরকম কিছু লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল কি?'

'না। গরমের সময়, সকলের গায়েই হাল্কা জামা-কাপড় ছিল, ধুতি আর পাঞ্জাবি। কারুর সঙ্গে ওরকম কিছু থাকলে নজরে পড়ত।'

'হুঁ'—ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া কিছুক্ষণ টানিল, শেষে বলিল, 'কোথা দিশা খুঁজে পাই না। তুমি যাও, শুয়ে পড়ো গিয়ে।—কবিতা আওড়াতে পারো? বৌমাকে বোলো—নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।'

ফণীশ লজ্জিত মুখে চলিয়া গেল। আমি শয়ন করিলাম। ব্যোমকেশ আরও কিছুক্ষণ খাতা দেখিল, তারপর আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

অন্ধকারে প্রশ্ন করিলাম, 'খুব তো কবিতা আওড়াচ্ছ, আজ সারাদিন কিছু পেলে?'

উত্তর আসিল, 'তিনটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি। এক—প্রাণহরি পোদ্দারকে যিনি খুন করেছেন তাঁর টাকার লোভ নেই; দুই—তিনি সব্যসাচী; তিন—মোহিনীর মত মেয়ের জন্য যে-কেউ খুন করতে পারে।—এবার ঘুমিয়ে পড়।'

সকালে ঘুম ভাঙিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ আবার হিসাবের খাতা লইয়া বসিয়াছে।

তারপর যথাসময়ে প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া বাহির হইলাম। ব্যোমকেশ হিসাবের খাতাটি সঙ্গে লইল।

থানায় পৌঁছিলে ইন্সপেক্টর বরাট হাসিয়া বলিলেন, 'এরই মধ্যে হিসেবের খাতা শেষ করে ফেললেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এ খাতায় মাত্র দেড় বছরের হিসেব আছে, অর্থাৎ এখানে আসার পর প্রাণহরি নতুন খাতা আরম্ভ করেছিল।'

বরাট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিছু পেলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুনের ওপর আলোকপাত করে এমন কিছু পাইনি। কিন্তু একটা সামান্য বিষয়ে খট্‌কা লেগেছে।'

'কী বিষয়?'

'একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে প্রাণহরির ব্যবস্থা ছিল, সে রোজ তাকে ট্যাক্সিতে বাড়ি থেকে নিয়ে আসত, আবার বাড়ি পৌঁছে দিত। মাসিক ভাড়া দেবার ব্যবস্থা ছিল নিশ্চয়। কিন্তু হিসেবের খাতায় দেখছি ঠিক উল্টো। এই দেখুন খাতা।' ব্যোমকেশ খাতা খুলিয়া দেখাইল। খাতার প্রতি পৃষ্ঠায় পাশাপাশি জমা ও খরচের স্তম্ভ। খরচের স্তম্ভে এক পয়সা দুই পয়সার খরচ পর্যন্ত লেখা আছে, কিন্তু জমার স্তম্ভ অধিকাংশ দিনই শূন্য। মাঝে মাঝে কোনও খাতক সুদ জমা দিয়াছে তাহার উল্লেখ আছে। ব্যোমকেশ আঙুল দিয়া দেখাইল, 'এই দেখুন, ৩রা মাঘ জমার কলমে লেখা আছে, ট্যাক্সি-ড্রাইভার ৩৫৲ টাকা। এমনি প্রত্যেক মাসেই আছে। কিন্তু খরচের কলমে ট্যাক্সি বাবদ কোনো খরচের উল্লেখ নেই।'

'হয়তো ভুল করে খরচটা জমার কলমে লেখা হয়েছিল।'

'প্রত্যেক মাসেই কি ভুল হবে?'

'হুঁ। আপনার কি মনে হয়?'

'বুঝতে পারছি না। খাতায় জুয়া খেলার লাভ-লোকসানের হিসেবও নেই। একটু রহস্যময় মনে হয় না কি?'

'তা মনে হয় বৈকি। এ বিষয়ে কি করা যেতে পারে?'

ব্যোমকেশ ভাবিয়া বলিল, 'প্রাণহরি যার ট্যাক্সিতে যাতায়াত করত তাকে পেলে সওয়াল জবাব করা যায়। তাকে চেনেন নাকি?'

বরাট বলিলেন, 'না, তার খোঁজ করা দরকার মনে হয়নি। এক কাজ করা যাক, ভুবন দাসকে ডেকে পাঠাই, সে নিশ্চয় সন্ধান দিতে পারবে।'

'ভুবন দাস?'

'সে-রাত্রে ওদের চারজনকে যে ট্যাক্সি-ড্রাইভার প্রাণহরির বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল তার নাম ভুবনেশ্বর দাস।'

'ও—তাকে কি পাওয়া যাবে?'

'কাছেই ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড। আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।'

পনেরো মিনিট পরে ভুবনেশ্বর দাস আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল। দোহারা চেহারা, খাকি প্যান্টুলুন ও শার্ট, মাথায় গার্ডসাহেবের মতন টুপি। বয়স আন্দাজ ত্রিশ-বত্রিশ, চোখ দু'টি অরুণাভ, মুখ গম্ভীর। সন্দেহ হইল

লোকটি নেশাভাঙ করিয়া থাকে।

বরাট ঘাড় নাড়িয়া ব্যোমকেশকে ইঙ্গিত করিলেন, ব্যোমকেশ ভুবন দাসকে একবার আগা-পাস্তলা দেখিয়া লইয়া প্রশ্ন আরম্ভ করিল, 'তোমার নাম ভুবন দাস। মিলিটারিতে ছিলে?'

ভুবন দাস বলিল, 'আজ্ঞে।'

'সিপাহী ছিলে?'

'আজ্ঞে না, ট্রাক-ড্রাইভার।'

'ট্যাক্সি চালাচ্ছ কত দিন?'

'তিন-চার বছর।'

'তিন-চার বছর এখানেই ট্যাক্সি চালাচ্ছ?'

'আজ্ঞে না, এখানে বছর দেড়েক আছি, তার আগে কলকাতায় ছিলাম।'

'বাড়ি কোথায়?'

'মেদিনীপুর জেলা, ভগবানপুর গ্রাম।'

'তুমি সেদিন চারজনকে নিয়ে প্রাণহরি পোদ্দারের বাড়িতে গিয়েছিলে?'

'আজ্ঞে বাড়িতে নয়, বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে।'

'বেশ। তোমার ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেছিল?'

ভুবন দাস একটু নীরব থাকিয়া বলিল, 'বলেছিল। আমি সব কথায় কান করিনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছু মনে আছে?'

ভুবন দাস আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'বোধ হয় কোনো মেয়েলোকের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। চাপা গলায় কথা হচ্ছিল, ভাল শুনতে পাইনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা যাক। বল দেখি তোমার চারজন যাত্রীর মধ্যে কারুর হাতে কোনো অস্ত্র ছিল?'

'একজনের হাতে ছড়ি ছিল।'

'আর কারুর হাতে কিছু ছিল না?'

'লক্ষ্য করিনি।'

'তুমি নেশা কর?'

'আজ্ঞে না' বলিয়া ভুবন দাস ইন্সপেক্টর বরাটের দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিল।

'শহরে তোমার বাসা কোথায়?'

'বাসা নেই। রাত্তিরে গাড়িতেই শুয়ে থাকি।'

'গাড়ি তোমার নিজের?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'শহরের অন্য ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের সঙ্গে তোমার নিশ্চয় জানাশোনা আছে।'

'জানাশোনা আছে, বেশী মেলামেশা নেই।'

'বলতে পারো, কার ট্যাক্সিতে চড়ে প্রাণহরি পোদ্দার শহরে যাওয়া-আসা করতেন?'

মনে হইল ভুবন দাসের রক্তাভ চোখে একটু কৌতুকের ঝিলিক খেলিয়া গেল।

সে কিন্তু গম্ভীর স্বরেই বলিল, 'আজ্ঞে স্যার, আমার ট্যাক্সিতে।'

আমরা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তারপর বরাট কড়া সুরে বলিলেন, 'একথা আগে আমাকে বলনি কেন?'

ভুবন বলিল, 'আপনি তো সুধোননি স্যার।'

ব্যোমকেশ হাসি চাপিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল। ট্যাক্সি-ড্রাইভার সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা খুব বিস্তীর্ণ নয়, কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছি তাহারা অতিশয় স্বল্পভাষী জীব, অকারণে বাক্য ব্যয় করে না। অবশ্য ভাড়া লইয়া ঝগড়া বাধিলে স্বতন্ত্র কথা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি তাহলে প্রাণহরি পোদ্দারকে আগে থাকতে চিনতে?'

ভুবন বলিল, 'আজ্ঞে।'

'তিনি কি রকম লোক ছিলেন?'

'ভাল লোক ছিলেন স্যার, কখনো ভাড়ার টাকা ফেলে রাখতেন না।' ভুবনের কাছে ইহাই সাধুতার চরম নিদর্শন।

'রোজ নগদ ভাড়া দিতেন?'

'আজ্ঞে না, মাস-মাইনের ব্যবস্থা ছিল।'

'কত টাকা মাস-মাইনে?'

'পঁয়ত্রিশ টাকা।'

বরাটের সহিত ব্যোমকেশ মুখ-তাকাতাকি করিল, তারপর ভুবনকে বলিল, 'প্রাণহরি পোদ্দারের সম্বন্ধে তুমি কী জানো সব আমায় বল।'

ভুবন বলিল, 'বেশী কিছু জানি না স্যার। শহরে ওঁর একটা অফিস আছে। বছর খানেক আগে উনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে মাস-মাইনেতে ট্যাক্সি ভাড়া করার কথা তোলেন, আমি রাজী হই। তারপর থেকে আমি ওঁকে সকালে বাড়ি থেকে নিয়ে আসতাম, আবার বিকেল বেলা পৌঁছে দিতাম। বাংলা মাসের গোড়ার দিকে উনি আমাকে অফিসে ডেকে ভাড়া চুকিয়ে দিতেন। এর বেশী ওঁর বিষয়ে আমি কিছু জানি না।'

'তুমি মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা মাস-মাইনেতে রাজী হয়েছিলে? লাভ থাকতো?'

'সামান্য লাভ থাকতো। বাঁধা ভাড়াটে তাই রাজী হয়েছিলাম।'

ব্যোমকেশ খানিক চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল, তারপর প্রশ্ন করিল, 'অন্য কোনো ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে প্রাণহরিবাবুর কারবার ছিল কিনা জানো?'

ভুবন বলিল, 'আজ্ঞে, আমি জানি না।'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আচ্ছা, তুমি এখন যাও। যদি প্রাণহরি সম্বন্ধে কোনো কথা মনে পড়ে দারোগাবাবুকে জানিও।'

'আজ্ঞে।' ভুবন দাস স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল।

তিনজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিলাম। তারপর বরাট বলিলেন, 'কিছুই তো পাওয়া গেল না। হিসেবের খাতায় হয়তো ভুল করেই খরচের জায়গায় জমা লেখা হয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিংবা সাংকেতিক জমা-খরচ।'

ভ্রূ তুলিয়া বরাট বলিলেন, 'সাংকেতিক জমা-খরচ কি রকম?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মনে করুন প্রাণহরি পোদ্দার কাউকে ব্ল্যাক্‌মেল করছিল। ভুবন দাস তাকে যত ভাল লোকই মনে করুক আমরা জানি সে প্যাঁচালো লোক

ছিল। মনে করুন সে মাসিক সত্তর টাকা হিসেবে ব্ল্যাক্‌মেল আদায় করছে, কিন্তু সে-টাকা তো সে হিসেবের খাতায় দেখাতে পারে না। এদিকে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে দিতে হয় মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা। প্রাণহরি খাতায় সাংকেতিক হিসেব লিখল, সত্তর টাকা থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা বাদ দিয়ে পঁয়ত্রিশ টাকা জমা করল। যাকে ব্ল্যাক্‌মেল করছে তার নাম লিখতে পারে না, তাই ট্যাক্সি-ড্রাইভারের নাম লিখল। বুঝেছেন?'

বরাট বলিলেন, 'বুঝেছি। অসম্ভব নয়। প্রাণহরির মনটা খুবই প্যাঁচালো ছিল, কিন্তু আপনার মন আরো প্যাঁচালো।'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, 'আচ্ছা, আজ উঠি। প্রাণহরি কাকে ব্ল্যাক্‌মেল করছিল জানতে পারলে হয়তো খুনের একটা সূত্র পাওয়া যেত। কিন্তু ওর দলিল-পত্রে ওরকম কিছু বোধহয় পাওয়া যায়নি?'

'না। যে দু'চারটে কাগজপত্র পাওয়া গেছে তাতে বে-আইনী কার্যকলাপের কোনো ইঙ্গিত নেই।—আজ ওবেলা আসছেন নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওবেলা আপনাকে আর বিরক্ত করব না। ফণীশের সঙ্গে কয়লা ক্লাবে যাচ্ছি।'

কয়লা ক্লাবের বাড়িটি সুবিস্তৃত ভূমিখন্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত। সামনে বাগান ও মোটর রাখিবার পার্কিং লন্, দুই পাশে ব্যাডমিণ্টন টেনিস প্রভৃতি খেলিবার স্থান। বাড়িটি একতলা হইলেও অনেকগুলি বড় বড় ঘর আছে। মাঝখানের হল-ঘরে বিলিয়ার্ড খেলার টেবিল; অন্য ঘরের কোনোটিতে পিংপং টেবিল, কোনোটিতে চার পাঁচটা তাস খেলার টেবিল ও চেয়ার। আবার একটা ঘরের মেঝেয় ফরাস পাতা, এখানে দাবা ও পাশা খেলার আসর। বাড়ির পিছন ভাগে দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর; একটিতে ম্যানেজারের অফিস, অন্যটিতে পানাহারের ব্যবস্থা, টুকিটাকি খাবার, নরম ও গরম নানা জাতীয় পানীয় এখানে সভ্যদের জন্য প্রস্তুত থাকে।

আমরা যখন ক্লাবে গিয়া পৌঁছিলাম তখনও যথেষ্ট দিনের আলো আছে। অনেক সভ্য সমবেত হইয়াছেন। বাহিরে টেনিস কোর্টে খেলা চলিতেছে; চারজন খেলিতেছে, বাকি সকলে কোর্টের পাশে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া খেলা দেখিতেছেন। ফণীশ আমাদের সেই দিকে লইয়া চলিল।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া খেলা দেখিবার পর ব্যোমকেশ ফণীশের কানে কানে বলিল, 'তোমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ এখানে আছে নাকি?'

ফণীশ বলিল, 'ঐ যে খেলছেন, তোয়ালের নীল গেঞ্জি আর শাদা প্যাণ্টুলুন, উনি মৃগেন মৌলিক।'

একটু রোগা ধরনের শরীর হইলেও মৃগেন মৌলিকের চেহারা বেশ খেলোয়াড়ের মতন। খেলার ভঙ্গীতে একটু চালিয়াতি ভাব আছে, কিন্তু সে ভালই টেনিস খেলে। ব্যাক্‌হ্যান্ড বেশ জোরালো; নেটের খেলাও ভাল।

ব্যোমকেশ খেলা দেখিতে দেখিতে বলিল, 'বাকি দু'জন এখানে নেই?'

ফণীশ বলিল, 'না। চলুন, ভেতর যাওয়া যাক।'

এই সময় পিছন হইতে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ব্যোমকেশবাবু—থুড়ি—গগন-বাবু যে!'

ফিরিয়া দেখিলাম, আমাদের পূর্ব-পরিচিত গোবিন্দ হালদার ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া মধুর গোরিলা-হাস্য হাসিতেছেন।

ব্যোমকেশ কিন্তু হাসিল না, স্থির-দৃষ্টিতে গোবিন্দবাবুকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আসল নামটা জানতে পেরেছেন দেখছি। কি করে জানলেন?'

গোবিন্দবাবু বলিলেন, 'প্রথম দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর দুই আর দুয়ে মিলিয়ে দেখলাম ঠিক মিলে গেল। গগন--ব্যোমকেশ, সুজিত—অজিত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাদের নামকরণ ভাল হয়নি, কাঁচা কাজ হয়েছিল। কিন্তু আসল নামের বহুল প্রচার কি বাঞ্ছনীয়?'

গোবিন্দবাবু বলিলেন, 'আমি প্রচার করছি না। নামটা আল্‌টপ্‌কা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। যা হোক, আমাদের ক্লাবে পদার্পণ করেছেন খুবই আনন্দের কথা। উদ্দেশ্য কিছু আছে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কি মনে হয়?'

গোবিন্দবাবুর মন্থর চক্ষু দুটি একবার ফণীশের দিকে গিয়া আবার ব্যোমকেশের মুখে ফিরিয়া আসিল, 'আপনি কাজের লোক, অকারণে আমোদ করে বেড়াবেন বিশ্বাস হয় না। কাজেই এসেছেন। কিন্তু কোন্ কাজ? কয়লা-খনির রহস্য উদ্‌ঘাটন?'

ব্যোমকেশ আবার বলিল, 'আপনার কি মনে হয়?'

গোবিন্দবাবুর চক্ষু দুটি কুঞ্চিত হইয়া ক্রমে দুইটি ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হইল, 'তাহলে ঠিকই আন্দাজ করেছি। দেখুন, আপনি হুঁশিয়ার লোক, তবু সাবধান করে দিচ্ছি। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করবেন না।' তাঁহার কুঞ্চিত চক্ষুযুগল একবার ফণীশের দিকে সঞ্চারিত হইল, তারপর তিনি টেনিস কোর্টের কিনারায় গিয়া চেয়ারে বসিলেন।

ফণীশের মুখে শঙ্কার ছায়া পড়িয়াছিল, সে স্খলিত স্বরে বলিল, 'গোবিন্দ-বাবু অরবিন্দবাবুর বড় ভাই। উনি যদি বাবাকে বলে দেন -'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভয় নেই, গোবিন্দবাবু কাউকে কিছু বলবেন না। উনি নিজের দুর্বৃত্ত ছোট ভাইটিকে ভালবাসেন।—চল, ভিতরে যাই।'

বাড়ির সামনের বারান্দায় একটি টেবিলে দৈনিক সংবাদপত্র সাপ্তাহিক প্রভৃতি সাজানো রহিয়াছে, আমরা সেইখানে গিয়া বসিলাম। ফণীশ একজন তকমাধারী ভৃত্যকে ডাকিয়া তিন গেলাস ঘোলের সরবৎ হুকুম করিল।

বরফ-শীতল সরবৎ চাখিতে চাখিতে দেখিতেছি, ঘোর ঘোর হইয়া আসিতেছে। বাহিরে টেনিস খেলা শেষ হইল। সভ্যেরা ভিতরে আসিতেছেন, নানা কথাব ছিন্নাংশ কানে আসিতেছে। বাড়ির ভিতরে ঘরে ঘরে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। টেবিল-টেনিসের ঘর হইতে খটাখট শব্দ আসিতেছে। হঠাৎ কোনও সভ্য উচ্চকণ্ঠে হাঁকিতেছেন—এই বেয়ারা!

সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার একটি চলমান চিত্র।

সরবৎ নিঃশেষ হইলে আমরা সিগারেট ধরাইয়া বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। মাঝের হলঘরে দুইজন নিঃশব্দ খেলোয়াড় নিরুদ্বেগ মন্থরতায় বিলিয়ার্ড খেলিতেছেন; প্রকাণ্ড টেবিলের উপর তিনটা বল তিনটি শিশুর মত লুকোচুরি খেলিতেছে।—এখানে আমাদের দ্রষ্টব্য কেহ নাই। এখান হইতে টেবিল-টেনিসের ঘরে গেলাম; দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, হাফ্-ভলির

খেলা চালতেছে; খটাখট শব্দে বল টেবিলের এপার হইতে ওপারে ছুটাছুটি করিতেছে; ব্যস্ত-সমস্ত একটি শুভ্র বুদ্বুদ।—এ ঘরেও আমাদের দর্শনীয় কেহ নাই।

ফরাস-পাতা ঘর হইতে মাঝে হল্লার আওয়াজ আসিতেছিল। সেখানে পাশা বসিয়াছে, চারজন খেলোয়াড় ছক ঘিরিয়া চতুষ্কোণভাবে বসিয়াছেন। একজন দু'হাতে হাড় ঘষিতে ঘষিতে আদুরে সুরে পাশাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে-ছেন, 'পাশা! বারো-পাঞ্জা-সতরো! একবারটি বারো-পাঞ্জা-সতরো দেখাও! এমন মার-মারব, পেটের ছানা বেরিয়ে যাবে।' তিনি পাশা ফেলিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষ হইতে বিপুল হর্ষধ্বনি উঠিল--'তিন কড়া! তিন কড়া!'

-আমরা দ্বারের নিকট হইতে অপসৃত হইয়া তাসের ঘরে উপনীত হইলাম।

তাসের ঘরে সব টেবিল এখনও ভর্তি হয় নাই; কোনও টেবিলে একজন বসিয়া পেশেন্স খেলিতেছেন, কোনও টেবিলে তিনজন খেলোয়াড় চতুর্থ ব্যক্তির অভাবে গলা-কাটা খেলা খেলিয়া সময় কাটাইতেছেন। একটি টেবিলে চতুরঙ্গ খেলা বসিয়াছে; চারজন খেলোয়াড় গভীর মনঃসংযোগে নিজ নিজ তাস দেখিতেছেন। একজন বলিলেন, 'থ্রি হার্ট্স্।' কণ্ট্র্যাক্ট্ খেলা।

ফণীশ ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'যিনি ডাক দিলেন উনি মধুময় সুর, আর তাঁর পার্টনার অরবিন্দ হালদার।'

ব্যোমকেশ টেবিলের কাছে গেল না, দূরে হইতে সেইদিক পানে চাহিয়া রহিল। অরবিন্দ হালদার যে গোবিন্দ হালদারের ছোট ভাই, তাহা পরিচয় না দিলেও বোঝা যায়। সেই গোরিলাগঞ্জন রূপ, কেবল বয়স কম। মধুময় সুর ফিট্ফাট শৌখিন লোক, চেহারায় ব্যক্তিত্বের অভাব গিলে-করা পাঞ্জাবি ও হীরার বোতাম প্রভৃতি দিয়া পূর্ণ করিবার চেষ্টা দেখা যায়।

খেলা আরম্ভ হইয়াছে, ডামি হইয়াছেন বিপক্ষ দলের একজন। স্ল্যামের খেলা, কাহারও অন্য দিকে মন নাই।

পাঁচ মিনিট খেলা দেখিয়া ব্যোমকেশ ইশারা করিল, আমরা বাহিরে আসিলাম। সে সম্ভাব্য আসামীদের দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই, শুষ্ক স্বরে বলিল, 'যা দেখবার দেখা হয়েছে, চল এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

মোটরে বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী দেখলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনটে মানুষকে দেখলাম, তাদের পরিবেশ দেখলাম, হাত-পা নাড়া দেখলাম।—ফণীশ, কাল সকালে আমরা ওদের বাড়িতে যাব। আলাপ-পরিচয় করা দরকার। আজ যা পেয়েছি তার চেয়ে বেশী কিছু পাব আশা করি না, তবু—'

'আজ কিছু পেয়েছ তাহলে?'

'পেয়েছি। যদিও সেটা নেতিবাচক।'

পরদিন সকালে ফণীশ বাপের সঙ্গে কয়লাখনিতে গেল না, মণীশবাবু একাই গেলেন। ফণীশ আমাদের গাড়ি চালাইয়া লইয়া চলিল। গাড়িতে স্টার্ট দিয়া বলিল, 'আগে কোথায় যাবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার কারুর প্রতি পক্ষপাত নেই, যার বাড়ি কাছে তার বাড়িতে আগে চল।'

'তাহলে মৃগেনবাবুর বাড়িতে চলুন।'

মৃগেন মৌলিকের বাড়িটি অতিশয় সুশ্রী, গৃহস্বামীর শৌখীন রুচির পরিচয় দিতেছে। আমাদের মোটর বাগান পার হইয়া গাড়ি-বারান্দায় উপস্থিত হইলে দেখিলাম মৃগেন মৌলিক বাড়ির সম্মুখে ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে, তাহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও সিল্কের ড্রেসিং গাউন। আমরা গাড়ি হইতে নামিলে সে কাগজ মুড়িয়া আমাদের পানে চোখ তুলিল। স্বাগত সম্ভাষণের হাসি তাহার মুখে ফুটিল না, বরঞ্চ মুখ অন্ধকার হইল। আমরা তাহার নিকটবর্তী হইলে সে রূঢ় স্বরে বলিল, 'কি চাই?'

আমরা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। ফণীশ বলিল, 'মৃগেনবাবু, এঁরা আমার বাবার বন্ধু, কলকাতা থেকে এসেছেন--'

ফণীশের প্রতি তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃগেন বলিল, 'জানি। ব্যোমকেশ বক্সী কার নাম?'

ফণীশ থতমত খাইয়া গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি ব্যোমকেশ বক্সী। আপনার সঙ্গে দুটো কথা ছিল।'

মৃগেন মুখ বিকৃত করিয়া অসীম অবজ্ঞার স্বরে বলিল, 'এখানে কিছু হবে না, আপনারা যেতে পারেন।' বলিয়া নিজেই কাগজখানা বগলে লইয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

আমরা পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম। ফণীশের মুখ অপমানে সিন্দুরবর্ণ ধারণ করিয়াছে, ব্যোমকেশের অধরে লাঞ্ছিত হাসি। সে বলিল, 'গোবিন্দ হালদার দেখছি আসামীদের সতর্ক করে দিয়েছেন।'

ফণীশ বলিল, 'চলুন, বাড়ি ফিরে যাই।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, যখন বেরিয়েছি তখন কাজ সেরে বাড়ি ফিরব। ফণীশ, তুমি লজ্জা পেও না। সত্যান্বেষণ যাদের কাজ তাদের লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ করতে হয়। চল, এবার মধুময় সুরের বাড়িতে।'

মোটরে যাইতে যাইতে আমি বলিলাম, 'কিন্তু কেন? এরকম ব্যবহারের মানে কি? মৃগেন মৌলিক যদি নির্দোষ হয় তাহলে তার ভয় কিসের?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওদের ধারণা হয়েছে আমি ফণীশের দলের লোক, ফণীশকে বাঁচিয়ে ওদের ফাঁসিয়ে দিতে চাই।'

মধুময় সুরের বাড়িটি সেকেলে ধরনের, বাগানের কোনও শোভা নাই। বাড়ির সদর বারান্দায় মধুময় সুর গামছা পরিয়া মাদুরের উপর শুইয়া ছিল এবং একটা মুস্কো জোয়ান চাকর তৈল দিয়া তাহার দেহ ডলাই-মলাই করিতেছিল। মধুময়ের শরীর খুব মাংসল নয়, কিন্তু একটি নিরেট গোছের ক্ষুদ্র ভুঁড়ি আছে। আমাদের দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল।

ফণীশ ক্ষীণ কুণ্ঠিত স্বরে আরম্ভ করিল, 'মধুময়বাবু, মাফ করবেন, এটা আপনার স্নানের সময়—'

মধুময় তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমাদের দিকে কয়েকবার চক্ষু মিটিমিটি করিল, তারপর পাখি-পড়া সুরে বলিল, 'আপনারা আমার কাছে কেন এসেছেন, আমি প্রাণহরি পোদ্দারের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানি না। যদি কেউ বলে থাকে আমি তার মৃত্যুর রাত্রে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম তবে তা মিথ্যে কথা। অন্য কেউ গিয়েছিল কিনা আমি জানি না, আমি যাইনি।' বলিয়া মধুময় সুর আবার শয়নের উপক্রম করিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ট্যাক্সি-ড্রাইভার কিন্তু আপনাকে সনাক্ত করেছে।'

মধুময় বলিল, 'ট্যাক্সি-ড্রাইভার মিথ্যাবাদী।—আসুন, নমস্কার।'

ব্যোমকেশ চট করিয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনার একটা টর্চ আছে?'

মধুময় বলিল, 'আমার পাঁচটা টর্চ আছে। আসুন, নমস্কার।'

মধুময় শয়ন করিল, ভৃত্য আবার তৈল-মর্দন আরম্ভ করিল। আমরা চলিয়া আসিলাম।

অরবিন্দ হালদারের বাড়ির দিকে যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা আসব মধুময় জানতো, আমাদের কী বলবে মুখস্থ করে রেখেছিল। যাই বল, মৃগেন মৌলিকের চেয়ে মধুময় সুর ভদ্র। কেমন মিষ্টি সুরে বলল—আসুন, নমস্কার। নিমচাঁদ দত্তের ভাষায়—ছেলেটি বে-তরিবৎ নয়।'

অরবিন্দ হালদার ও গোবিন্দ হালদার একই বাড়িতে বাস করেন, কিন্তু মহল আলাদা। অরবিন্দ নিজের বৈঠকখানায় ফরাস-ঢাকা তক্তপোশের উপর মোটা তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া সিগারেট টানিতেছিল, আমাদের দেখিয়া কনুই-এ ভর দিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, চুল এলোমেলো, কালো মুখে অক্ষৌরিত দাড়ির কর্কশতা। সে আমাদের পর্যায়ক্রমে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, 'এস ফণীশ।'

ফণীশ পাংশুমুখে বলিল, 'এঁরা—'

অরবিন্দ বলিল, 'জানি। বসুন আপনারা।' বলিয়া সিগারেটের কৌটা আগাইয়া দিল।

শিষ্টতার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, তাই একটু থতমত হইলাম। ব্যোমকেশ তক্তপোশের কিনারায় বসিল, আমরাও বসিলাম। অরবিন্দ সহজ সুরে বলিল, 'কাল রাত্রে মাত্রা বেশী হয়ে গিয়েছিল। এখনো খোঁয়ারি ভাঙেনি।—ওরে গদাধর।'

একটি ভৃত্য কাঁচের গেলাসে পানীয় আনিয়া দিল, অরবিন্দ এক চুমুকে তাহা নিঃশেষ করিয়া গেলাস ফেরৎ দিয়া বলিল, 'আপনাদের জন্যে কী আনাব বলুন। চা? সরবৎ? বীয়ার?'

ব্যোমকেশ বিনীত কণ্ঠে বলিল, 'ধন্যবাদ। ওসব কিছু চাই না, অরবিন্দ-বাবু; আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলবার সুযোগ পেলেই কৃতার্থ হয়ে যাব।'

অরবিন্দ বলিল, 'বিলক্ষণ! কি বলবেন বলুন। তবে একটা কথা গোড়ায় জানিয়ে রাখি। ফণীশ আপনাকে কী বলেছে জানি না, কিন্তু প্রাণহরি পোদ্দারের মৃত্যুর রাত্রে আমি তার বাড়িতে যাইনি।'

ব্যোমকেশ একটু নীরব থাকিয়া বলিল, 'অরবিন্দবাবু, আমার কোনো কু-মতলব নেই। নির্দোষ ব্যক্তিকে খুনের মামলায় ফাঁসানো আমার কাজ নয়, আমি সত্যান্বেষী। অবশ্য আপনি যদি অপরাধী হন—'

অরবিন্দ বলিল, 'আমি নিরপরাধ। প্রাণহরির মৃত্যুর রাত্রে আমি তার বাড়ির ত্রিসীমানায় যাইনি। এই কথাটা বুঝে নিয়ে যা প্রশ্ন করবেন করুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ, ও প্রসঙ্গ না হয় বাদ দেওয়া গেল। কিন্তু প্রাণহরির মৃত্যুর আগে আপনি কয়েকবার তার বাড়িতে গিয়েছিলেন।'

অরবিন্দ বলিল, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। আমরা চারজনে জুয়া খেলতে যেতাম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'জুয়া খেলার সময় ছাড়াও আপনি কয়েকবার একলা তার

'বাড়িতে গিয়েছিলেন।'

অরবিন্দের মুখে একটা বিশ্রী লুচ্চামির হাসি খেলিয়া গেল, সে বলিল, 'তা গিয়েছিলাম।'

'কি জন্যে গিয়েছিলেন?'

নির্লজ্জভাবে দন্ত বিকাশ করিয়া অরবিন্দ বলিল, 'মোহিনীকে দেখতে। তার সঙ্গে ভাব জমাতে।'

ব্যোমকেশ বাঁকা সুরে বলিল, 'কিন্তু সুবিধে হল না?'

অরবিন্দের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, সে বড় বড় চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিল, 'সুবিধে হল না—তার মানে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মানে বুঝতেই পারছেন। আপনি কি বলতে চান যে—?'

অরবিন্দ হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তারপর হাসি থামাইয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি মস্ত একজন ডিটেক্‌টিভ হতে পারেন কিন্তু দুনিয়াদারির কিছুই জানেন না। মোহিনী তো তুচ্ছ মেয়েমানুষ, দাসীবাঁদী। টাকা ফেললে এমন জিনিস নেই যা পাওয়া যায় না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কত টাকা ফেলেছিলেন?'

অরবিন্দ দুই আঙুল তুলিয়া বলিল, 'দু'হাজার টাকা।'

'মোহিনীকে দু'হাজার টাকা দিয়েছিলেন? দাসীবাঁদীর পক্ষে দাম একটু বেশী নয় কি?'

'মোহিনীকে দিইনি। মোহিনীর দালালকে দিয়েছিলাম। প্রাণহরি পোদ্দারকে।' অরবিন্দের কথাগুলা বিষমাখানো।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আচ্ছা, ও কথা যাক। প্রাণহরি পোদ্দার লোকটা কেমন ছিল?'

অরবিন্দ নীরসকণ্ঠে বলিল, 'চামার ছিল, অর্থ-পিশাচ ছিল। সাধারণ মানুষ যেমন হয় তেমনি ছিল।'

সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে অরবিন্দের ধারণা খুব উচ্চ নয়। ব্যোমকেশ বলিল, 'জুয়াতে প্রাণহরি পোদ্দার আপনাদের অনেক টাকা ঠকিয়েছিল?'

অরবিন্দ তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'সে জিতেছিল আমরা হেরেছিলাম। ঠকিয়েছিল কিনা বলতে পারি না।'

'তবে তাকে ঠেঙাতে গিয়েছিলেন কেন?'

অরবিন্দ উত্তর দিবার জন্য মুখ খুলিয়া থামিয়া গেল, ব্যোমকেশকে একবার ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'কে বললে ঠেঙাতে গিয়েছিলাম? যারা গিয়েছিল তারা নিজের কথা বলুক, আমি কাউকে ঠেঙাতে যাইনি।'

আমি ফণীশের দিকে অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। সে হেঁটমুখে শুনিতেছিল, একবার চোখ তুলিয়া অরবিন্দের পানে চাহিল, তারপর আবার মাথা হেঁট করিল।

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে বলিল, 'আপনি যেটুকু বললেন, তাতেও গরমিল হচ্ছে। মোহিনীর কথার সঙ্গে আপনার কথা মিলছে না। হয়তো আপনার কথাই সত্যি। আচ্ছা, নমস্কার। আপনার দাদাকে বলবেন, পুলিসকে ঘুষ দিতে যাওয়া নিরাপদ নয়, তাতে সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। সব পুলিস অফিসার ঘুষখোর নয়।'

অতঃপর তিনদিন আমরা প্রায় নিষ্কর্মার মত কাটাইয়া দিলাম, প্রাণহরি পোদ্দারের মৃত্যুরহস্য ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলিয়া রহিল। নূতন তথ্য আর কিছু পাওয়া যায় নাই, পূর্বে সামান্য যেটুকু পাওয়া গিয়াছিল তাহাই সম্বল। কটক হইতে ইন্সপেক্টর বরাটের বন্ধু পট্টনায়ক প্রাণহরির অতীত সম্বন্ধে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার দ্বারাও খুনের উপর আলোকপাত হয় নাই। প্রাণহরি পোদ্দার পেশাদার জুয়াড়ী ছিল, কিন্তু কোনওদিন পুলিসের হাতে পড়ে নাই। সে বছর-দুই কটকে ছিল, কোথা হইতে কটকে আসিয়াছিল তাহা জানা যায় না। তাহার পোষ্য কেহ ছিল না, কাজকর্মও ছিল না। নিজের বাড়িতে কয়েকজন বড়মানুষের অর্বাচীন পুত্রকে লইয়া জুয়ার আড্ডা বসাইত। ক্রমে অর্বাচীনেরা বুঝিল প্রাণহরি জুয়াচুরি করিয়া তাহাদের রুধির শোষণ করিতেছে, তখন তাহারা প্রাণহরিকে উত্তম-মধ্যম দিবার পরামর্শ করিল। কিন্তু পরামর্শ কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেই একদিন প্রাণহরি পোদ্দার নিরুদ্দেশ হইল। তাহার বাড়িতে একটি যুবতী দাসী কাজ করিত, সেও লোপাট হইল। অনুমান হয় বৃদ্ধ প্রাণহরির সহিত দাসীটার অবৈধ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

পট্টনায়কের চিঠি হইতে শুধু এইটুকুই পরিস্ফুট হয় যে প্রাণহরির কর্ম-জীবনে একটা বিশিষ্ট প্যাটার্ণ ছিল।

ব্যোমকেশের চিত্তে সুখ নাই। ইন্দিরার চোখে আবার উদ্বেগ ও আশঙ্কা ঘনীভূত হইতেছে। ফণীশ ছট্ফট করিতেছে। মণীশবাবু গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কিন্তু তিনিও যেন একটু অধীর হইয়া উঠিতেছেন। কয়লাখনির অনামা দুর্বৃত্তেরা এখনও ধরা পড়ে নাই।

বিকাশ দত্ত আসিয়াছে এবং কয়লাখনির হাসপাতালে যোগ দিয়াছে। আমরা একদিন বিকালে মণীশবাবুর সঙ্গে কয়লাখনিতে গিয়াছিলাম, ব্যোমকেশ হাসপাতাল পরিদর্শনের ছুতায় বিকাশের সঙ্গে দেখা করিয়াছে এবং উপদেশ দিয়া আসিয়াছে।

এই তিন দিনের মধ্যে কেবল একটিমাত্র বিশিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার উল্লেখ করা যায়। ব্যোমকেশ ক্রমান্বয়ে বিছানায় শুইয়া, ঘরে পায়চারি করিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই কাল সন্ধ্যার পর আমাকে বলিল, 'চল, রাস্তায় একটু বেড়ানো যাক।'

রাস্তাটি নির্জন, আলো খুব উজ্জ্বল নয়, বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে দু' একজন পদচারী, দু' একটি মোটর যাতায়াত করিতেছে। ব্যোমকেশ হঠাৎ বলিল, 'প্রাণহরি পোদ্দারের মতন একটা থার্ড ক্লাস লোকের হত্যারহস্য তদন্ত করার কী দরকার? যে মেরেছে বেশ করেছে, তাকে সোনার মেডেল দেওয়া উচিত।'

বলিলাম, 'সোনার মেডেল দিতে হলেও তো লোকটাকে চেনা দরকার।'

আরও কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'মোহিনীর কাছে আর একবার যেতে হবে। তাকে একটা কথা জিগ্যেস করা হয়নি।'

এই সময় বাই-সাইকেল প্রথম লক্ষ্য করিলাম। আমরা রাস্তার একটু পাশ ঘেঁষিয়া পায়চারি করিতেছিলাম, দেখিলাম সামনের দিকে আন্দাজ পঞ্চাশ গজ দূরে একটা সাইকেল আসিতেছে। সাইকেলে আলো নাই, রাস্তার আলোতে আরোহীকে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়; তাহার মাথার সোলার টুপি মুখখানাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সাইকেল আমাদের কাছে আসিয়া

পড়িল, তারপর আরোহী আমাদের পায়ের কাছে একটা সাদাগোছের বস্তু ফেলিয়া দিয়া দ্রুত পেডাল ঘুরাইয়া অদৃশ্য হইল।

ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। দশ হাত দূরে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে শ্বেতাভ বস্তুটার দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু কিছু ঘটিল না, টেনিস বলের মত বস্তুটা জড়বৎ পড়িয়া রহিল। উহা যে বোমা হইতে পারে একথা আমার মাথায় আসে নাই; এখন ব্যোমকেশের ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার বুক ঢিব্‌ঢিব্ করিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, চট্ করে বাড়ি থেকে একটা টর্চ নিয়ে এস তো।'

সে দাঁড়াইয়া রহিল, আমি পিছু হটিয়া বাড়িতে গেলাম। ফণীশ ও মণীশবাবু দু'জনেই খবর শুনিয়া আমার সঙ্গে আসিলেন।

'কি ব্যাপার?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাছে আসবেন না। হয়তো কিছুই নয়, তবু সাবধান হওয়া ভাল। অজিত, টর্চ আমাকে দাও।'

টর্চ লইয়া সে ভূ-পতিত বস্তুটার উপর আলো ফেলিল। আমি গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, কাগজের একটা মোড়ক ধীরে ধীরে খুলিয়া যাইতেছে। ব্যোমকেশ কাছে গিয়া আরও কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া বস্তুটা তুলিয়া লইল। হাসিয়া বলিল, 'কাগজে মোড়া এক টুকরো পাথুরে কয়লা।'

মণীশবাবু বলিলেন, 'কয়লা—!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কয়লা মুখ্য নয়, কাগজটাই আসল। চলুন, বাড়িতে গিয়ে দেখা যাক।'

ড্রয়িং-রুমে উজ্জ্বল আলোর নীচে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ সন্তর্পণে মোড়ক খুলিল। পাথুরে কয়লার টুকরো টেবিলে রাখিয়া কুঞ্চিত কাগজটির দুই পাশ ধরিয়া আলোর দিকে তুলিয়া ধরিল। কাগজটা আকারে সাধারণ চিঠির কাগজের মতন, তাহাতে কালি দিয়া বড় বড় অক্ষরে দু'ছত্র লেখা—'ব্যোমকেশ বক্সী, যদি অবিলম্বে শহর ছাড়িয়া না যাও তোমাকে আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না।'

'কী ভয়ানক, আপনার নাম জানতে পেরেছে।' মণীশবাবু হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'দেখি কাগজখানা।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, আপনার ছুঁয়ে কাজ নেই। কাগজে হয়তো আঙুলের ছাপ আছে।'

কাগজখানি সাবধানে ধরিয়া ব্যোমকেশ শয়নকক্ষে আসিল। আমিও সঙ্গে আসিলাম। টেবিলের উপর একটি সচিত্র বিলাতী মাসিকপত্র ছিল, তাহার পাতা খুলিয়া সে কাগজখানি সযত্নে তাহার মধ্যে রাখিয়া দিল। আমি বলিলাম, 'কোন পক্ষের চিঠি। অবশ্য কয়লা দেখে মনে হয় কয়লাখনির আসামীরা জানতে পেরেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা ধাপ্পা হতে পারে। গোবিন্দ হালদার জানেন আমি কয়লাখনি সম্পর্কে এখানে এসেছি।'

ড্রয়িং-রুমে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম অফিসের বড়বাবু সুরপতি ঘটক আসিয়াছেন, কর্তার সঙ্গে বোধকরি অফিসঘটিত কোনও পরামর্শ করিতেছেন। আমাদের দেখিয়া সবিনয়ে নমস্কার করিলেন।

তিনি বাক্যালাপ করিয়া প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ মণীশবাবুকে বলিল, 'আপনি সুরপতিবাবুকে কিছু বলেননি তো?'

মণীশবাবু বলিলেন, 'না।—পাজি ব্যাটারা কিন্তু ভয় পেয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভয় না পেলে আমাকে ভয় দেখাতো না।'

মণীশবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, 'আপনি তলে তলে কি করছেন আমি জানি না কিন্তু নিশ্চয় কিছু করছেন, যাতে পাজি ব্যাটারা ঘাব্‌ড়ে গেছে।—যাহোক, চিঠি পেয়ে আপনি ভয় পাননি তো?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ভয় বেশী পাইনি। তবু, আজ রাত্তিরে দোর বন্ধ করে শোব।'

৩

সকালবেলা ফণীশ আমাদের থানায় নামাইয়া দিয়া বলিল, 'আমাকে একবার বাজারে যেতে হবে, ইন্দিরার একটা জিনিস চাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। অসুবিধা হবে না তো?'

'না। আমরা এখানে ঘণ্টাখানেক আছি।'

ফণীশ মোটর লইয়া চলিয়া গেল, আমরা থানায় প্রবেশ করিলাম।

প্রমোদবাবু টেবিলের সামনে বসিয়া কাগজপত্র লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, ব্যোমকেশ সচিত্র বিলাতী মাসিক পত্রটি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, 'এর মধ্যে এক টুকরো কাগজ আছে, তাতে আঙুলের ছাপ থাকতে পারে। আপনার finger-print expert আছে?'

পত্রিকার পাতা তুলিয়া দেখিয়া বরাট বলিলেন, 'আছে বৈকি। কি ব্যাপার?'

ব্যোমকেশ গত রাত্রির ঘটনা বলিল। শুনিয়া বরাট বলিলেন, 'কয়লাখনির ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে। এখনি ব্যবস্থা করছি। আজ বিকেলবেলাই রিপোর্ট পাবেন।'

তিনি লোক ডাকিয়া পত্রিকাসমেত কাগজখানা করাঙ্ক বিশেষজ্ঞগণের কাছে পাঠাইয়া দিলেন, তারপর বলিলেন, 'তিনদিন আপনি আসেননি, ওদিকের খবর কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যথা পূর্বং তথা পরং, নতুন কোনো খবর নেই। কিন্তু একটা খট্‌কা লাগছে।'

'কিসের খট্‌কা?'

'মোহিনীকে প্রাণহরি পনরো টাকা মাইনে দিত। হিসেবের খাতায় কিন্তু মোহিনীর মাইনের উল্লেখ নেই।'

বরাট চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'হুঁ। প্রাণহরির হিসেবের খাতায় দেখছি বিস্তর গলদ। এখন কি করবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোহিনীকে প্রশ্ন করে দেখতাম। সে এখনো আছে তো?'

বরাট বলিলেন, 'দিব্যি আছে, নড়বার নামটি নেই। আমিও ছাড়তে পারছি না, যতক্ষণ না মামলার একটা হেস্তনেস্ত হয়—'

'তাহলে আমরা একবার ঘুরে আসি।'

'চলুন।'

'না না, আপনার অন্য কাজ রয়েছে, আপনি থাকুন। আমি আর অজিত যাচ্ছি। আপনার সেই তরুণ কনেস্টবলটিকে সেখানে পাব তো?'

বরাট হাসিলেন, 'আলবৎ পাবেন।'

থানা হইতে বাহির হইলাম। ফণীশের এখনও ফিরিবার সময় হয় নাই,

আমরা ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের দিকে চলিলাম।

থানার অনতিদূরে রাস্তার ধারে একটি বিপুল পাকুড় গাছের ছায়ায় ট্যাক্সি দাঁড়াইবার স্থান। সেইদিকে যাইতে যাইতে আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, প্রাণহরির সঙ্গে কয়লাখনির ব্যাপারের কি কোনো সম্বন্ধ আছে?'

সে বলিল, 'কিছু না। একমাত্র আমি হচ্ছি যোগসূত্র।'

ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের কাছাকাছি গিয়া দেখিলাম গাছতলায় মাত্র একটি ট্যাক্সি আছে এবং রাস্তার ধার ঘেঁষিয়া একটা প্রকাণ্ড কালো রঙের মোটর আমাদের দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ট্যাক্সি-ড্রাইভার ভুবন দাস কালো মোটরের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া চালকের সহিত কথা বলিতেছে। আমরা আর একটু নিকটবর্তী হইতেই কালো মোটরটা চলিয়া তেল। ভুবন দাস নিজের ট্যাক্সির কাছে ফিরিয়া চলিল।

ব্যোমকেশ গভীর ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, 'কার মোটর চিনতে পারলে? গোবিন্দ হালদারের মোটর। প্রথম দিন নম্বরটা দেখেছিলাম।'

'গোবিন্দ হালদার ট্যাক্সিওয়ালার কাছে কী চায়?'

'বোধ হয় সাক্ষী ভাঙাতে চায়। এস দেখি।'

আমরা যখন ট্যাক্সির কাছে পৌঁছিলাম তখন ভুবন গাড়ির বুট্ হইতে জ্যাক্ বাহির করিয়া চাকার নীচে বসাইবার উদ্যোগ করিতেছে। আমাদের দেখিয়া স্যালুট করিল, বলিল, 'ট্যাক্সি চাই স্যার?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, একবার প্রাণহরিবাবুর বাড়িতে যেতে হবে। সেখানে একজন মেয়েলোক থাকে তার সঙ্গে দরকার আছে।'

ভুবন আড়চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিল, মাথা চুলকাইয়া বলিল, 'আমার তো একটু দেরী হবে স্যার। টায়ার পাঞ্চার হয়েছে, চাকাটা বদলাতে হবে।'

ব্যোমকেশ অতর্কিতে প্রশ্ন করিল, 'গোবিন্দ হালদার তোমার সঙ্গে কী কথা বলছিলেন?'

ভুবন চমকিয়া উঠিল, 'আজ্ঞে? উনি—উনি আমাকে চেনেন, তাই দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলছিলেন। ভারি ভাল লোক।' বলিয়া জ্যাকের যন্ত্র প্রবলবেগে ঘুরাইয়া গাড়ির চাকা শূন্যে তুলিতে লাগিল।

ব্যোমকেশের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া দেখি সে তন্দ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া আছে, তাহার চক্ষু ভুবনের উপর নিবদ্ধ কিন্তু সে মনশ্চক্ষে অন্য কিছু দেখিতেছে। আমি ডাকিলাম, 'ব্যোমকেশ!'

সে আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বিড় বিড় করিয়া বলিল, 'অজিত, পনরোর সঙ্গে পঁয়ত্রিশ যোগ দিলে কত হয়?'

বলিলাম, 'পঞ্চাশ। কী আবোল-তাবোল বকছ?'

সে বলিল, 'এসো।' বলিয়া থানার দিকে ফিরিয়া চলিল। কিছুদূর গিয়া আমি ফিরিয়া চাহিলাম, ভুবন একাগ্র দৃষ্টিতে আমাদের পানে তাকাইয়া আছে।

থানায় উপস্থিত হইলে বরাট মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'এ কি, গেলেন না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রমোদবাবু, আপনার থানায় কোথাও নিরিবিলি জায়গা আছে? আমি নির্জনে বসে একটু ভাবতে চাই।'

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। বরাট তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিলেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

থানার পিছন দিকে একটি ঢাকা বারান্দা, লোকজন নাই, কয়েকটা চেয়ার পড়িয়া আছে। ব্যোমকেশ একটি ইজি-চেয়ারে লম্বা হইয়া সিগারেট ধরাইল। বরাট মৃদু হাসিয়া প্রস্থান করিলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যে গোটা পাঁচেক সিগারেট নিঃশেষ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, হয়েছে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী হয়েছে?'

সে বলিল, 'দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, সত্যদর্শন হয়েছে। এস।'

বরাটের ঘরে গিয়া তাঁহার টেবিলের পাশে দাঁড়াইতেই তিনি উৎসুক মুখ তুলিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রমোদবাবু, কোন্ ব্যাঙ্কে প্রাণহরির টাকা আছে?'

বরাট বলিলেন, 'সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে। কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সেখানে সেফ্-ডিপজিট ভল্ট আছে কিনা জানেন?'

'আছে বোধ হয়।'

হাতের ঘড়ি দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এতক্ষণে ব্যাঙ্ক খুলেছে।—চলুন।'

বরাট আর প্রশ্ন না করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম ফণীশ ফিরিয়াছে এবং গাড়ি হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'নেমো না, আমাদের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পৌঁছে দিতে হবে।'

শহরের মাঝখানে ব্যাঙ্কের বাড়ি, দ্বারে বন্দুকধারী শান্ত্রীর পাহারা। গাড়ি হইতে নামিবার পূর্বে ব্যোমকেশ ফণীশকে বলিল, 'ফণীশ, তুমি বাড়ি যাও, আমাদের ফিরতে একটু দেরী হবে।—ভাল কথা, বৌমার বাপের বাড়ি কোথায়?'

ফণীশ সবিস্ময়ে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, 'নবদ্বীপে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। তাহলে নিশ্চয় মাল্‌পো তৈরি করতে জানেন। তাঁকে বলে দিও আজ বিকেলে আমরা মাল্‌পো খাব।'

আমরা নামিয়া গেলাম, ফণীশ একটু নিরাশভাবে গাড়ি লইয়া চলিয়া গেল। সে বুঝিয়াছিল, প্রাণহরির মৃত্যুরহস্য সমাধানের উপান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বরাট আমাদের ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ঘরে লইয়া গেলেন; ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁহার আগে হইতেই আলাপ ছিল। বলিলেন, 'প্রাণহরি পোদ্দারের ব্যাপারে এসেছি। আপনার ব্যাঙ্কে সেফ্-ডিপজিট ভল্ট আছে?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আছে।'

বরাট ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রাণহরি পোদ্দার ভল্ট ভাড়া নিয়েছিলেন নাকি?'

ম্যানেজার একজন কর্মচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বলিল, 'হ্যাঁ, নিয়েছিলেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তার সেফ্-ডিপজিটে কী আছে আমরা দেখতে চাই।'

ম্যানেজার কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, 'কিন্তু ব্যাঙ্কের নিয়ম নেই। অবশ্য যদি পরোয়ানা থাকে—'

বরাট বলিলেন, 'প্রাণহরি পোদ্দারকে খুন করা হয়েছে। তার সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র অনুসন্ধান করবার পরোয়ানা পুলিসের আছে।'

ম্যানেজার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'বেশ। চাবি এনেছেন?'

'চাবি?'

'সেফ্-ডিপজিটের প্রত্যেকটি বাক্সের দু'টো চাবি; একটা থাকে যিনি ভাড়া নিয়েছেন তাঁর কাছে, অন্যটা থাকে ব্যাঙ্কের জিম্মায়। দু'টো চাবি না পেলে বাক্স খোলা যায় না।'

ব্যোমকেশ বরাটের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিল। বরাট বলিলেন, 'ডুপ্লিকেট চাবি নিশ্চয় আছে?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আছে। কিন্তু ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারদের হুকুম না পেলে আপনাদের দিতে পারি না। হুকুম পেতে চার-পাঁচ দিন সময় লাগবে।'

ব্যোমকেশ বরাটকে বলিল, 'চলুন, আর একবার প্রাণহরির সিন্দুক খুঁজে দেখা যাক। নিশ্চয় ওই ঘরেই কোথাও আছে।'

বরাট উঠিলেন, ম্যানেজারকে বলিলেন, 'আমরা আবার আসছি। যদি চাবি খুঁজে না পাই, দরখাস্ত করব।'

আমরা থানায় ফিরিয়া গেলাম, সেখান হইতে আরও দুইজন লোক লইয়া পুলিস-কারে প্রাণহরির বাড়িতে উপনীত হইলাম।

আজ তরুণ কনেস্টবলটি বাড়ির সামনে টুল পাতিয়া বসিয়া ছিল, আমাদের দেখিয়া সাড়ম্বরে স্যালুট করিল।

দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ বরাটকে বলিল, 'আমি মোহিনীকে দু'-একটা প্রশ্ন করি, ততক্ষণ আপনারা ওপরের ঘর তল্লাশ করুন গিয়ে। আমার বিশ্বাস চাবি খুঁজে বার করা শক্ত হবে না। হয়তো সিন্দুকেই আছে, আপনারা লুকোনো জিনিস খোঁজেননি তাই পাননি। তখন তো আপনারা জানতেন না যে প্রাণহরির সেফ্-ডিপজিট আছে।'

পুলিসের দল সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। ব্যোমকেশ ও আমি রান্নাঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

মোহিনী দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া রান্না করিতেছিল, আমাদের পদশব্দে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল। আমাদের দেখিয়া চকিত ত্রাসে তাহার চক্ষু একবার বিস্ফারিত হইল, তারপর সে উনান হইতে কড়া নামাইয়া আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

'কিছু দরকার আছে বাবু?' তাহার ক্ষণিক ত্রাস কাটিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি এখনো আছ দেখছি। দেশে ফিরে যাচ্ছ না কেন?'

মোহিনী বলিল, 'কি করব বাবু, পুলিস ছেড়ে না দিলে যাই কি করে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমার বাপ-মা'কে কিংবা স্বামীকে খবর দিয়েছ?'

মোহিনী ক্ষণকাল চক্ষু নত করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'স্বামী কোথায় জানি না। বাপ-মা'কে খবর দিইনি। তারা বুড়ো মানুষ, কি হবে তাদের খবর দিয়ে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা বটে। আচ্ছা, একটা কথা বল দেখি, যে-রাত্রে প্রাণহরিবাবু খুন হয়েছিলেন, সে-রাত্রে তিনি যখন খেতে নামলেন না, তখন তুমি তাঁর ঘরে গিয়েছিলে?'

মোহিনী সায় দিয়া বলিল, 'হ্যাঁ বাবু।'

'ঘরে আলো জ্বলছিল?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'ঘরের পিছন দিকের দরজা, অর্থাৎ স্নানের ঘরের দরজা খোলা দেখেছিলে?'

'না বাবু।' মোহিনীর চোখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল।

'দরজা বন্ধ ছিল?'

পলকের জন্য মোহিনী দ্বিধা করিল, তারপর বলিল, 'আমি কিছুই দেখিনি বাবু। কর্তাবাবু মরে পড়ে আছেন দেখে ছুটে পালিয়ে এসেছিলুম।'

'তুমি স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করে দাওনি?'

'আজ্ঞে না।'

'হুঁ।' ব্যোমকেশ একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল, 'প্রাণহরিবাবু তোমাকে পনরো টাকা মাইনে দিতেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'প্রতি মাসে ঠিক সময়ে মাইনে দিতেন?'

মানুষ যখন মনে মনে এক কথা ভাবে এবং মুখে অন্য কথা বলে তখন তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা যায়, তেমনি অন্যমনস্কভাবে মোহিনী বলিল, 'আমার মাইনে কর্তাবাবুর কাছে জমা থাকত, দরকার হলে দু'এক টাকা চেয়ে নিতুম।'

ব্যোমকেশের পানে কটাক্ষপাত করিয়া দেখিলাম সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। সে বলিল, 'তোমার মাইনের টাকা বোধহয় মারা গেল। আচ্ছা, এবার আমার শেষ প্রশ্ন ঃ তুমি কোনো ন্যাটা লোককে চেন?'

মোহিনী অবাক হইয়া বলিল, 'ন্যাটা লোক! সে কাকে বলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ন্যাটা জান না? যে ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাত বেশী চালায় তাকে ন্যাটা বলে।'

মোহিনী সহসা বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিল, 'না বাবু, সে রকম কাউকে আমি চিনি না।'

মোহিনী দাঁড়াইয়া রহিল, আমরা উপরে প্রাণহরির শয়নকক্ষে উঠিয়া গেলাম।

চাবি পাওয়া গিয়াছে। বেশী খোঁজাখুঁজি করিতে হয় নাই; সিন্দুক ও দেয়ালের মাঝখানে যে স্বল্প-পরিসর স্থান ছিল সেই স্থানে সিন্দুকের পিঠে চাবিটা মোম দিয়া আট্কানো ছিল। বরাট বলিল, 'এই নিন।'

নম্বর খোদাই-করা লম্বা একটি চাবি। ব্যোমকেশ তাহা পরিদর্শন করিয়া বলিল, 'চলুন আবার ব্যাঙ্কে।'

ব্যাঙ্কে গিয়া ম্যানেজারের নিকট চাবি পেশ করা হইল। তিনি এবার আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, স্বয়ং উঠিয়া আমাদের ভল্টে লইয়া গেলেন। ব্যাঙ্কের বাড়ির নীচে মাটির তলায় ঘর, তাহার তিনটি দেয়াল জুড়িয়া কাতারে কাতারে দ্বারযুক্ত স্টীলের খোপ শোভা পাইতেছে।

দুইটি চাবি মিলাইয়া প্রাণহরির খোপের কবাট খোলা হইল। খোপের মধ্যে টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি কিছু নাই, কেবল কয়েকটি পুরাতন চিঠি এবং এক বান্ডিল বন্ধকী তমসুক।

চিঠিগুলি প্রাণহরিকে লেখা নয়, প্রাণহরির দ্বারাও লিখিত নয়। অজ্ঞাতনামা

পুরুষ বা নারীর দ্বারা অজ্ঞাতনামা লোকের নামে লেখা। সম্ভবত এই পত্রগুলিকে অস্ত্র করিয়া প্রাণহরি লেখক ও লেখিকাদের রুধির শোষণ করিতেন।

চিঠিগুলিতে ব্যোমকেশের প্রয়োজন ছিল না, সে তমসুকগুলি লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। ম্যানেজারের ঘরে বসিয়া সে একে একে তমসুকগুলিতে চোখ বুলাইল। তারপর একটি তমসুক তুলিয়া ধরিয়া বরাটকে বলিল, 'এই নিন আপনার আসামী।'

তমসুকে আইনসংগত ভাষায় লেখা ছিল, মহাজন প্রাণহরি পোদ্দার ভগবানপুর নিবাসী ভুবনেশ্বর দাসকে ক্রেতব্য মোটরগাড়ি বন্ধক রাখিয়া আড়াই হাজার টাকা কর্জ দিয়াছেন। কীভাবে ভুবনেশ্বর দাস এই ঋণ শোধ করিবে তাহার শর্তও দলিলে লেখা আছে ঃ পঞ্চাশ টাকা নগদ; প্রাণহরি মোটর ব্যবহার করিবেন তাহার মাসিক ভাড়া পঁচিশ টাকা; একুনে পঁচাত্তর টাকা হিসাবে মাসে শোধ হইবে।

বরাট ভ্রূ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার কাজ শেষ হয়েছে, এবার যা করবার আপনি করবেন।'

বরাট বলিলেন, 'কিন্তু খুনের প্রমাণ?'

'প্রমাণ আছে। তবে আদালতে দাঁড়াবে কিনা বলতে পারি না। এবার আমরা বাড়ি ফিরব, বেলা দেড়টা বেজে গেছে।'

'চলুন, আপনাদের পেঁছে দিয়ে আসি।'

পুলিস-কারে যাইতে যাইতে বেশী কথা হইল না। একবার বরাট বলিলেন, 'ভুবনকে অ্যারেস্ট করি তাহলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'করুন। সে যদি স্বীকার করে তাহলে সব ন্যাট্য চুকে যাবে।'

বাড়ির ফটকের সামনে আমাদের নামাইয়া দিয়া গাড়ি চলিয়া গেল, বরাট বলিয়া গেলেন, 'বিকেলবেলা আসব।'

অপরাহ্ণে আন্দাজ পাঁচটার সময় আমরা ক্ষীরের মালপোয়া লইয়া বসিয়াছি এমন সময় প্রমোদ বরাট আসিলেন।

মণীশবাবু কয়লাখনিতে গিয়াছেন, ফণীশ বাড়িতে আছে। ইন্দিরা এতক্ষণ আমাদের কাছেই ছিল, এখন বরাটকে দেখিয়া ভিতরে গিয়াছে। আসামী কে তাহা শুনিবার পর আমার মাথাটা হিজিবিজি হইয়া গিয়াছিল, এখন কতকটা ধাতে আসিয়াছে।

ইন্স্‌পেক্‌টর বরাটের মুখখানা শুষ্ক, মন বিক্ষিপ্ত; সকালবেলা যে ইউনিফর্ম পরিয়া ছিলেন, এখনও তাহাই পরিয়া আছেন মনে হয়। তিনি আসিয়া হাস্যহীন মুখে পকেট হইতে একটি খাম বাহির করিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিলেন; বলিলেন, 'এই নিন আঙুলের ছাপের ফটো আর রিপোর্ট। তিনজনের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ খামটি না খুলিয়াই পকেটে রাখিল, বরাটের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, 'আজ দুপুরে আপনার খাওয়া হয়নি দেখছি।'

বরাট মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'খাওয়া হবে কোত্থেকে। আপনার আসামী পালিয়েছে।'

ব্যোমকেশ এমনভাবে ঘাড় নাড়িল যেন ইহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল। তারপর

বরাটকে বসিতে বলিয়া সে ফণীশের পানে চাহিল। ফণীশ দ্রুত অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। বরাট চেয়ারে হেলান দিয়া ক্লান্ত স্বরে বলিলেন, 'শুধু আসামী নয়, মোহিনীও পালিয়েছে। দু'জনে ট্যাক্সিতে চড়ে হাওয়া হয়েছে। কনস্টেবলটা প্রাণহরির বাড়িতে পাহারায় ছিল, কিন্তু মোহিনীকে আটক করবার হুকুম তার ছিল না। ভুবন দাস ট্যাক্সিতে এসে রাস্তা থেকে হর্ণ বাজালো, মোহিনী বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে চড়ে বসল। দু'জনে চলে গেল।'

ফণীশ এক থালা খাবার আনিয়া বরাটের সম্মুখে রাখিল, বরাট বিমর্ষভাবে আহার করিতে লাগিলেন। আমরাও মালপোয়াতে মন দিলাম। নীরবে আহার চলিতে লাগিল।

বৈষ্ণবীয় জলযোগ সমাধা করিয়া সিগারেট ধরাইবার উপক্রম করিতেছি, বাহিরের দিক হইতে আর্দালি জাতীয় একটি লোক ঘরে প্রবেশ করিল। মাথায় গান্ধী-টুপি, পরিধানে খদ্দরের চাপকান ও পায়জামা; তাই হঠাৎ তাহাকে চিনিতে পারি নাই। সে মাথার টুপি খুলিয়া মেঝেয় আছাড় মারিল। তারপর বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলিল, 'শালাদের ধরেছি স্যার।'

বিকাশ দত্ত। টুপি খুলিতেই তাহার স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে। ব্যোমকেশ সমাদর করিয়া বলিল, 'এস এস, বিকাশ। কাজ সেরে ফেলেছ তাহলে?'

'সেরেছি স্যার। আমার মাথা ফাটাবার তালে ছিল, তাতেই ধরা পড়ে গেল।' বিকাশ হাত-পা ছড়াইয়া একটা শোফায় বসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, 'দু'জনেই শালা।'

'দু'জনেই শালা--কাদের কথা বলছ?'

বিকাশ উত্তর দিবার পূর্বেই সুরপতি ঘটক প্রবেশ করিলেন। শৌখিন বেশবাস সত্ত্বেও একটু ভিজাবিড়াল ভাব, চোখে সতর্ক বিড়ালদৃষ্টি। তিনি ঘরের পরিস্থিতি ক্ষিপ্র-মসৃণ চক্ষে দেখিয়া লইয়া বিনীত স্বরে বলিলেন, 'কর্তা আছেন কি? তাঁর সঙ্গে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন সুরপতিবাবু।'

বিকাশ সহসা খাড়া হইয়া বসিল, একাগ্র চক্ষে সুরপতিবাবুকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'এ'র নাম সুরপতি ঘটক? বড় অফিসের বড়বাবু?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। কেন বল দেখি?'

বিকাশ সুরপতিবাবুর দিকে তর্জনী নির্দেশ করিয়া বলিল, 'এ'র দুই শালার কথা বলছিলাম স্যার। বিশ্বনাথ আর জগন্নাথ রায়। তারাই কয়লাখনিতে বজ্জাতি করছে।'

সুরপতির চোখে ভয় উছলিয়া উঠিল, তিনি শীর্ণকণ্ঠে বলিলেন, 'কী? কী? আমি তো কিছু—'

বরাট তাঁহার দিকে ধীরে ধীরে চক্ষু ফিরাইয়া নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'সুরপতিবাবু, যে দু'টি ছোকরাকে আপনি আমাদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টায় ছিলেন, তারা আপনার শালা?'

সুরপতি বলিলেন, 'মানে—তাতে কি হয়েছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হয়নি কিছু। কাল রাত্রে আমি একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে তিনজনের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। আমরা মিলিয়ে দেখতে চাই, এই তিন-জনের মধ্যে আপনি আছেন কিনা।—ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি সুরপতিবাবুর আঙুলের ছাপ নিন। মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে উনি এই ষড়যন্ত্রে কতদূর

আছেন। ফণীশ, বাড়িতে রবারস্ট্যাপ-কালির প্যাড আছে?'

সুরপতি এক-পা এক-পা করিয়া পিছু হটিতেছিলেন, দ্বারের কাছাকাছি গিয়া তিনি পাক খাইয়া পালাইবার চেষ্টা করিলেন। ঘটনাক্রমে এই সময় মণীশ-বাবু ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন, দু'জনেই পড়িতে পড়িতে তাল সামলাইয়া লইলেন, তারপর সুরপতি ঘটক তুরঙ্গ গতিতে পলায়ন করিলেন।

মণীশবাবু এইমাত্র কয়লাখনি হইতে ফিরিয়াছেন, ঘরে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ব্যাকুল চক্ষে চারিদিকে চাহিলেন। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন, 'কী হচ্ছে এখানে?—ইন্সপেক্টর বরাট—সুরপতি অমন লাফ মেরে পালালো কেন?'

বরাট বলিলেন, 'আপনি বসুন। আপনার খনিতে যারা অনিষ্ট করছিল তারা ধরা পড়েছে।'

মণীশবাবু বলিলেন, 'ধরা পড়েছে!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই ছেলেটির নাম বিকাশ দত্ত, ও আমার সহকারী। ইন্সপেক্টর বরাটের সঙ্গে পরামর্শ করে বিকাশকে হাসপাতালের আর্দালি সাজিয়ে খনিতে পাঠিয়েছিলাম। ও ধরেছে।'

মণীশবাবু বলিলেন, 'কে—কারা—?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সুরপতি ঘটক এবং তার দুই শালা।'

'অ্যাঁ! সুরপতি!' মণীশবাবু চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, 'কিন্তু—সুরপতি! সে যে আমার অফিসে বিশ বছর কাজ করছে! তার এই কাজ!'

আমরা আবার উপবেশন করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'মণীশবাবু, দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করলে মানুষ স্ত্রীর বশীভূত হয়, সুরপতিবাবু শালাদের বশীভূত হয়েছেন। খুব বেশী তফাৎ নেই।'

মণীশবাবু বলিলেন, 'কিন্তু কেন? ওরা আমার অনিষ্ট করতে চায় কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল 'সেটা এখনো আবিষ্কার করা যায়নি। তবে আবিষ্কার করা শক্ত হবে না। আমার মনে হয়, যে মাড়োয়ারী আপনার খনি কিনতে চেয়েছিল সেই আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ছে। কিংবা অন্য কেউ হতে পারে। সুরপতি-বাবুকে চাপ দিলেই বেরিয়ে পড়বে।'

'কিন্তু--সুরপতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু পেয়েছেন.

'এখনো পাইনি। কিন্তু আঙুলের ছাপ নেবার নামে উনি যেরকম লাফ মেরে পালালেন, ওঁর মনে পাপ আছে।'

মণীশবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল তিনি যত না বিস্মিত হইয়াছেন, ততোধিক দুঃখ পাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'আপনারা বসুন। ফণি, তুমি আমার সঙ্গে এস। অফিসের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আর সুরপতির—' তিনি সপ্রশ্ন নেত্রে বরাটের পানে চাহিলেন।

বরাট বলিলেন, 'সুরপতির ব্যবস্থা আমি করব।'

মণীশবাবু পুত্রকে লইয়া অফিসের দিকে চলিয়া গেলেন।

আমরা চারজন কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। শেষে ব্যোমকেশ অলসকণ্ঠে বলিল, 'ভুবনের নামে হুলিয়া জারি করেছেন নিশ্চয়?'

বরাট বলিলেন, 'সারাদিন তাতেই কেটেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আশাপ্রদ কোনো খবর নেই?'

বরাট বলিলেন, 'চল্লিশ মাইল দূরে একটা রেলওয়ে স্টেশন থেকে খবর পেয়েছি, একটা চালকহীন নম্বরহীন ট্যাক্সি সেখানে পড়ে আছে। লোক পাঠিয়েছি। হয়তো ভুবনের ট্যাক্সি, সে ওখানে ট্যাক্সি ছেড়ে ট্রেন ধরেছে।'

'বোম্বাই গেছে কি মাদ্রাজ গেছে কে জানে!'

'হুঁ। আজ উঠি।'

'আচ্ছা, আসুন। আসামীকে ধরা আপনার কর্তব্য, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন জানি। তবু, যদি ওদের ধরতে না পারেন আমি খুশী হব।'

ইন্সপেক্টর বরাট একটু হাসিলেন।

নৈশ আহারের পর মণীশবাবু শয়ন করিতে গিয়াছিলেন, ফণীশ চুপি চুপি আসিয়া আমাদের ঘরে ঢুকিল। আজ আমাদের ঘরে তিনজনের শয়নের ব্যবস্থা, বিকাশের জন্য একটি ক্যাম্প খাট পাতা হইয়াছে।

ঘরে তিনজনেই উপস্থিত ছিলাম, বিছানায় শুইয়া সিগারেট টানিতেছিলাম; বিকাশ কি করিয়া শালাদের ধাবিল তাহারই গল্প বলিতেছিল। ফণীশকে দেখিয়া ব্যোমকেশ বালিশে কনুই দিয়া উঁচু হইয়া বসিল।

'এস ফণীশ।'

ফণীশ ব্যোমকেশের খাটের পাশে চেয়ার টানিয়া বসিল, অনুযোগের সুরে বলিল, 'কালই চলে যাবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, শালাবাবুরা যে রকম শাসিয়েছে তাড়াতাড়ি কেটে পড়াই ভাল। তুমি যদি বৌমাকে নিয়ে কলকাতায় আসো নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। বৌমাকে সত্যবতীর খুব পছন্দ হবে।' বলিয়া যেন পুরাতন কথা স্মরণ করিয়া একটু হাসিল।

ফণীশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'গল্পটা শুনব।'

ব্যোমকেশ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, মাথার বালিশটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, 'গল্প শুনবে—প্রাণহরির গল্প? বেশ, বলছি; কিন্তু গল্পটা গল্পই হবে, আগাগোড়া সত্য ঘটনা হবে না। অনেকটা ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতন।'

ফণীশ ভ্রূ তুলিয়া প্রশ্ন করিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝলে না? যাঁরা ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন তাঁরা সরাসরি ইতিহাস লেখেন না, ইতিহাস থেকে গোটা-কয়েক চরিত্র এবং ঘটনা তুলে নিয়ে সেই কাঠামোর ওপর নিজের গল্প গড়ে তোলেন। আমি তোমাকে যে গল্প বলব সেটাও অনেকটা সেই ধরনের হবে। সব ঘটনা জানি না, যেটুকু জানি তা থেকে পুরো গল্পটা গড়ে তুলেছি; কল্পনা আর সত্য এ গল্পে সমান অংশীদার।—শুনতে চাও?'

ফণীশ বলিল, 'বলুন।'

ব্যোমকেশ নূতন সিগারেট ধরাইয়া গল্প আরম্ভ করিল।—

ভুবনেশ্বর দাসকে দিয়েই গল্প আরম্ভ করি। তার নাম শুনেও আমার সন্দেহ হয়নি যে সে বাঙালী নয়, ওড়িয়া। বাংলাদেশ আর উড়িষ্যার সঙ্গমস্থলে যারা

থাকে তারা দুটো ভাষাই পরিষ্কার বলতে পারে, বোঝবার উপায় নেই বাঙালী কি ওড়িয়া। যদি বুঝতে পারতাম, সমস্যাটা অনেক আগেই সমাধান হয়ে যেত। কারণ মোহিনী উড়িষ্যার মেয়ে। দুই আর দুয়ে চার।

মোহিনী ভুবনেশ্বরের বৌ। যারা মেয়ে-মরদে গতর খাটিয়ে জীবিকা অর্জন করে ওরা সেই শ্রেণীর লোক। ভুবন কাজ করত কটকের একটা মোটর মেরামতির কারখানায়। মোহিনা বাঙালী গৃহস্থের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করত। আর দুজনে দুজনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। এই ভালবাসাই হচ্ছে এ গল্পের মূল সূত্র।

ভুবনের মনে উচ্চাশা ছিল, মোহিনীর দাসীবৃত্তি তার পছন্দ ছিল না। মোটর কারখানায় কাজ করতে করতে মিলিটারিতে ট্রাক-ড্রাইভারের চাকরি যোগাড় করে সে চলে গেল; মোহিনীকে বলে গেল—টাকা রোজগার করে ট্যাক্সি কিনব, তোকে আর চাকরি করতে হবে না।

বছর দুই ভুবনের আর দেখা নেই। ইতিমধ্যে মোহিনী কটকে প্রাণহরি পোদ্দারের বাড়িতে চাকরি করছে; দিনের বেলা কাজকর্ম করে, রাত্তিরে বাপ-মায়ের কাছে ফিরে যায়।

প্রাণহরি লোকটা অতিবড় অর্থপিশাচ। যেমন কৃপণ তেমনি লোভী। সারা জীবন টাকা-টাকা করে বুড়ো হয়ে গেছে, জুচ্চুরি দাগাবাজি ব্ল্যাক্‌মেল করে অনেক টাকা জমা করেছে, তবু তার টাকার ক্ষিদে মেটেনি। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তার মনে লোভ নেই, কিংবা বুড়ো বয়সে সে লোভ কেটে গিয়েছিল। কিন্তু মোহিনী যখন তার বাড়িতে চাকরি করতে এল তখন তাকে দেখে প্রাণহরির মাথায় এক কুবুদ্ধি গজালো, সে টাকা রোজগারের নতুন একটা রাস্তা দেখতে পেল। বড়মানুষের উচ্ছৃংখল ছেলেরা তার বাড়িতে জুয়া খেলতে আসে, তাদের চোখের সামনে মোহিনীর মতন মেয়েকে যদি ধরা যায় -

মোহিনীর দেহে যে প্রচণ্ড যৌন আকর্ষণ আছে তাই দেখে তার চরিত্র সম্বন্ধে প্রাণহরির মনে ভুল ধারণা জন্মেছিল। সে বড়মানুষের ছেলেদের ধাপ্পা দিয়ে মোহিনীর নাম করে টাকা নিত। কিন্তু মোহিনী ধরা-ছোঁয়া দিত না। কিছুদিন এইভাবে চলবার পর বড়মানুষের ছেলেরা বিগড়ে গেল, তাবা টাকা ঢেলেছে, ছাড়বে কেন? তারা প্রাণহরিকে প্রহার দেবার মতলব করল।

প্রাণহরি দেখল কটক থেকে কেটে না পড়লে মার খেতে হবে। কিন্তু মোহিনীকেও তার দরকার, এমন মুখরোচক টোপ সে আর কোথায় পাবে? সে মোহিনীর কাছে প্রস্তাব করল তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। মোহিনীর আপত্তি নেই: তার স্বামী বিদেশে, তাকে দাসীবৃত্তি করে খেতে হবে, তার কাছে কটকও যা অন্য জায়গাও তাই। সে দেড়া মাইনেতে প্রাণহরির সঙ্গে যেতে রাজী হল।

কিন্তু তারা কটক ছাড়বার আগেই ভুবন ফিরে এল। ভুবন চাকরি করে কিছু টাকা সঞ্চয় করেছে, কিন্তু ট্যাক্সি কেনার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। স্বামী-স্ত্রী মিলে পরামর্শ করল, তারপর ভুবন প্রাণহরির কাছে গেল।

ভুবন প্রাণহরিকে টাকার কথা বলল; তার কিছু টাকা আছে, আরও আড়াই হাজার টাকা পেলেই সে নিজের ট্যাক্সি কিনতে পারবে। প্রাণহরি ভেবে দেখল, টাকা ধার দিলে ভুবন আর মোহিনী দুজনেই তার মুঠোর মধ্যে থাকবে: মোহিনীকে তখন হুকুম মেনে চলতে হবে। সে রাজী হল। রেজিস্ট্রি দলিল তৈরি হল, তাতে ধার-শোধের শর্ত রইল—মোহিনীর মাইনের পনরো টাকা কাটা যাবে,

ভুবন তার ট্যাক্সির রোজগার থেকে মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা দেবে, আর প্রাণহরি নিজের দরকারে ট্যাক্সি ব্যবহার করবে তার জন্য পঁচিশ টাকা দেবে; এই ভাবে প্রতি মাসে পঁচাত্তর টাকা শোধ হবে।

সকলেই খুশী। ভুবন ট্যাক্সি কিনল। তিনজনে কয়লা শহরে এল। তারপর প্রাণহরি শহরের হালচাল বুঝে নিয়ে তার অভ্যস্ত লীলাখেলা আরম্ভ করল।

কয়লা ক্লাব হচ্ছে বড়লোকের আস্তানা, প্রাণহরি সেখানে গিয়ে ছিপ ফেলল। চারটি বড় বড় রুই কাংলা তার ছিপে উঠল। সে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল।

জুয়া খেলার সময় মোহিনীকেও সকলে দেখল। বিশেষভাবে একজনের নজর পড়ল তার ওপর; অরবিন্দ হালদার চরিত্রহীন লম্পট, সে লোভে উন্মত্ত হয়ে উঠল। প্রাণহরি জুয়ায় চারজনকেই শোষণ করছিল, অরবিন্দ হালদারকে বেশী করে শোষণ করতে লাগল। অরবিন্দকে সে জানিয়ে দিয়েছিল যে, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া যায় না।

প্রাণহরির কাছে ছাড়পত্র পেয়ে অরবিন্দ হালদার সময়ে অসময়ে মোহিনীর কাছে আসতে লাগল। কিন্তু মোহিনী শক্ত মেয়ে, তাকে চোখে দেখে যা মনে হয় সে তা নয়। অরবিন্দের মতলব সে বুঝেছে, কিন্তু স্পষ্ট কথা বলে তাকে তাড়িয়ে দেয় না। সে তার সঙ্গে খাতির করে কথা বলে, হয়তো হাসি-মস্করাতেও যোগ দেয়, কিন্তু তার দেওয়া উপহার নেয় না। প্রাণহরি মোহিনীকে বোধ হয় ইশারা দিয়েছিল; ইশারায় যতখানি স্বীকার করা সম্ভব মোহিনী ততখানি স্বীকার করে চলত। প্রাণহরি ঘুঘু লোক, স্পষ্টভাবে মোহিনীকে কিছু বলেনি; ভেবেছিল ইশারাতেই কাজ হবে। হাজার হোক মোহিনী নিম্নশ্রেণীর মেয়ে।

কিছুদিন চেষ্টা-চরিত্র করে অরবিন্দ বুঝল, এ বড় কঠিন ঠাঁই। ওদিকে জুয়াতেও তারা অনেক টাকা হেরেছে। তারপর একদিন প্রাণহরির বেইমানি ধরা পড়ে গেল। জুয়া খেলা বন্ধ হল।

জুয়াতে যারা হেরেছিল তাদের সকলেরই রাগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু অরবিন্দের রাগ হয়েছিল সব চেয়ে বেশী। কারণ সে শুধু জুয়াতেই ঠকেনি, অন্য বিষয়েও ঠকেছিল। ঠকেছিল এবং অপমানিত হয়েছিল। তাই সে একদিন তার তিন সঙ্গীকে নিয়ে প্রাণহরিকে ঠেঙাতে গেল।

দৈবক্রমে যে ট্যাক্সিতে চড়ে তারা প্রাণহরিকে ঠেঙাতে গেল সে ট্যাক্সিটা ভুবন দাসের। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে অরবিন্দ বোধ হয় মোহিনীর সম্বন্ধে তার মনের আফ্‌সানি প্রকাশ করেছিল, ভুবন তার কথা শুনে বুঝল, প্রাণহরি দু'হাজার টাকা নিয়ে তার বৌকে বিক্রি করেছে।

কয়লা শহরে ভুবনের বাসা ছিল না; প্রাণহরিও তার বাড়িতে ভুবনকে থাকতে দেয়নি। কিন্তু আমার বিশ্বাস ভুবন ফুরসৎ পেলেই চুপিচুপি এসে মোহিনীর কাছে রাত কাটিয়ে যেত। স্বামী-স্ত্রীতে কথা হত; হয়তো মোহিনী স্বামীকে ইশারা দিয়েছিল—বুড়োটা লোক ভাল নয়। ভুবন মনে মনে প্রাণহরিকে ঘৃণা করত। খাতকের সঙ্গে মহাজনের ভালবাসা বড়ই বিরল। কিন্তু ভুবন সাবধানী লোক, সে বলত—ধারটা শোধ হলে ট্যাক্সি পুরোপুরি তার নিজের হয়ে যাবে, তখন তারা গাড়ি নিয়ে চলে যাবে, বুড়োর সঙ্গে তাদের আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

প্রাণহরি যে এতবড় শয়তান তা ভুবন কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু যখন সে শুনল যে প্রাণহরি দু'হাজার টাকা নিয়ে তার বৌকে বিক্রি করেছে তখন তার

মাথায় খুন চেপে গেল। দুনিয়ায় পয়সাওয়ালা লম্পট অনেক আছে, পরস্ত্রীর ওপর তারা নজর দেয়; তাদের ওপর ভুবনের রাগ নেই। কিন্তু ওই বুড়ো শয়তানটাকে সে খুন করবে।

খুন করবার সুযোগও হাতে হাতে এসে গেল। প্রাণহরির বাড়ির কাছাকাছি এসে চারজন আরোহী নেমে গেল। ভুবন ট্যাক্সির মুখ ঘুরিয়ে রাখল; তারপর সেও বেরুলো। তার হাতে মোটরের স্প্যানার।

ভুবন প্রাণহরির বাড়িতে প্রত্যহ দিনে রাত্রে দু'বার তিনবার এসেছে, সে জানতো বাড়ির পিছন দিকে ওপরে ওঠবার মেথরখাটা সিঁড়ি আছে। সে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে গেল, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দোরে টোকা মারল।

দু'দিকের দোর বন্ধ করে প্রাণহরি নিজের ঘরে ছিল; সে বোধহয় জানতে পারেনি যে, তাকে চারজনে ঠেঙাতে এসেছে। কিন্তু সে হুঁশিয়ার লোক; টোকা শুনে স্নানের ঘরে গেল। তারপর যখন জানতে পারল যে ভুবন এসেছে তখন সে দোর খুলে দিল। কারণ ভুবনের ওপর তার কোনো সন্দেহ নেই।

দু'জনে শোবার ঘরে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল।

তাদের মধ্যে কোনো কথা হয়েছিল কিনা জানি না। ভুবনের বাঁ হাতে ছিল স্প্যানার, সে আচমকা স্প্যানার তুলে মারলো প্রাণহরির মাথায় এক কোপ। প্রাণহরি মুখ খোলবার সময় পেল না; তৎক্ষণাৎ পতন ও মৃত্যু।

ভুবন তখন সাবধানে সামনের দরজা খুলল। তার বোধ হয় মতলব ছিল সামনের দিকে সাড়াশব্দ না পেলে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবে, পিছনের দরজা বন্ধ থাকবে। কিন্তু সামনে বোধহয় তখন এরা চারজন সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছিল। তাই ভুবন সামনের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যে-পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে গেল। স্প্যানারটা সঙ্গে নিয়ে গেল। এখন পরিস্থিতি দাঁড়াল, সামনের দরজাও খোলা, পিছনের দরজাও খোলা। প্রাণহরির আততায়ী কোন্ দিক দিয়ে ঢুকেছে অনুমান করা শক্ত।

অরবিন্দ প্রথম বার প্রাণহরির দরজা বন্ধ পেয়েছিল; দ্বিতীয় বার চারজনে উঠে দেখল দরজা খোলা এবং প্রাণহরি পোদ্দার ইহলীলা সম্বরণ করেছে। তারা দুদ্দাড় শব্দে পালালো। ট্যাক্সির কাছে ফিরে গিয়ে দেখল ট্যাক্সি-ড্রাইভার স্টীয়ারিং হুইলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। তারা ড্রাইভারকে জাগিয়ে শহরে ফিরে গেল।

ওদিকে মোহিনী রান্না করছিল, সে কিছুই জানতে পারেনি। রান্নার ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দে দূরের শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছিল। রান্না শেষ হবার পর সে যখন দেখল বুড়ো খেতে নামছে না, তখন সে ওপরে গেল। সে দেখল প্রাণহরি মরে পড়ে আছে, সামনের এবং পিছনের দরজা খোলা। অরবিন্দের কথা তার মনে এল না। তার মনে এল ভুবনের কথা। যেখানে ভালোবাসা সেখানেই শঙ্কা। ভুবনকে সে ইশারা দিয়েছিল, বুড়ো লোক ভাল নয়। ভুবন বাইরে বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু তার ভিতরে আছে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারের উগ্রতা। স্ত্রীর অমর্যাদা সে সহ্য করবে না।

মোহিনী মেয়েটা ভারি বুদ্ধিমতী। মড়া দেখেও তার মাথা খারাপ হল না, সে চট্ করে কর্তব্য স্থির করে ফেলল। খুন যেই করুক, তাকে যেন পুলিস ধরতে না পারে। হত্যাকারী স্নানঘরের দোর দিয়ে ঢুকেছে এবং সেই দিক দিয়েই বেরিয়ে

গিয়েছে, মোহিনীর তাতে সন্দেহ নেই। সে পিছন দিকের দরজা দুটো ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল, তারপর ট্রাক-ড্রাইভার মারফত পুলিসে খবর পাঠালো। কী সাংঘাতিক মেয়ে দ্যাখো, একটুকু বাড়াবাড়ি করেনি। পুলিসকে ভুল রাস্তায় চালাবার জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু করেছে।

মোহিনী আমাদের কাছে অনেক মিথ্যে কথা বলেছে, কিন্তু কখনো অনাবশ্যক মিথ্যে কথা বলেনি। ভুবনও তাই। আমার বিশ্বাস যে রাত্রে খুন হয় সেই রাত্রেই কোনো সময় ভুবন ফিরে গিয়ে মোহিনীকে সব কথা বলেছিল এবং তারপর থেকে প্রায়ই গিয়ে দেখা করত। এই জন্যেই মোহিনী খুনের বাড়ি ছেড়ে যেতে চায়নি। ভুবনের সঙ্গে তার যোগাযোগ রাখা নিতান্ত দরকার।

যা হোক, আমি যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলাম তখন পুলিসের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়েছে চারজন আসামীর ওপর। মোটিভ্ এবং সুযোগ এদেব পুরোদস্তুর বিদ্যমান। হয় এরা চারজনে একজোট হয়ে খুন করেছে, নয়তো ওদের মধ্যে একজন খুন করেছে অন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে।

পুলিসের সঙ্গে আমার মতভেদের কোনো কারণ ছিল না; তবু একজোট হয়ে খুন করার প্রস্তাবটা হজম করা শক্ত। সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা মধ্যভারতের ডাকাত নয়, তারা সমাজবাসী তথাকথিত সভ্য মানুষ। তারা দল বেঁধে খুন করবে না।

কিন্তু ওদেব মধ্যে একজন অন্য তিনজনের চোখে ধুলো দিয়ে খুন করে থাকতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা কে? সব চেয়ে বেশী সন্দেহ হয় অরবিন্দ হালদারের ওপর। সে শুধু জুয়াতেই ঠকেনি, আর এক বিষয়ে ঠকেছে; যার জন্যে তার লজ্জার অবধি নেই; যে কথা সে কারুর কাছে স্বীকার করতে পারে না। লম্পটের লজ্জা এক বিচিত্র বস্তু; সে কেবল তখনি লজ্জা পায় যখন দু'হাজার টাকা খরচ করেও সে তার নির্লজ্জ কামনার বস্তু পায় না।

অনুসন্ধান আরম্ভ করে আমার খট্‌কা লাগল। প্রথমেই যে প্রশ্নটি আমার মনে মাথা তুলল সেটি হচ্ছে—মারণাস্ত্রটা গেল কোথায়? ডাক্তাব ঘোষাল যে ধরনের বর্ণনা দিলেন সে রকম কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি; অরবিন্দের দলের কেউ যদি অস্ত্র আনতো তাহলে ফণীশ আর ভুবনের চোখ এড়াতে পারতো না। সুতরাং ওরা অস্ত্রটা আনেনি, নিয়েও যায়নি। তবে সেটা এল কোত্থেকে এবং গেল কোথায়?

দ্বিতীয় কথা, ডাক্তার ঘোষালের বিবৃতি থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, হত্যাকারী লোকটা ন্যাটা। ভেবে দ্যাখো, প্রাণহরির শোবার ঘরে একটা চেয়ার পর্যন্ত নেই; সে আততায়ীর দিকে পিছন ফিরে তক্তপোশের কিনারায় বসেছিল একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আততায়ী তাকে মেরেছে, আঘাত লেগেছে মাথার ডানদিকে সিঁথির মতন। সুতরাং আততায়ী ন্যাটা, তার বাঁ হাত বেশী চলে।

চারজন আসামীর মধ্যে কে ন্যাটা খোঁজ করলাম। কয়লা ক্লাবে গিয়ে দেখলাম, মৃগেন মৌলিক ডান হাতে টেনিস খেলছে, মধুময় সুর আর অরবিন্দ হালদার ডান হাতে তাস ভেঁজে তাস বাঁটছে এবং খেলছে। তখন ফণীশের দিকে কাঁচের কাগজ-চাপা গোলা ফেলে দেখলাম সেও ডান হাতে গোলা ধরল। ওরা কেউ ন্যাটা নয়।

কিন্তু ন্যাটা না হোক, ওদের মধ্যে কেউ সব্যসাচী হতে পারে। কাজেই ওদের একেবারে ত্যাগ করতে পারলাম না। ওরা ছাড়া সন্দেহভাজন আর কেউ নেই। মোহিনী খুন করেনি, তার খুন করবার ইচ্ছে থাকলে সে প্রাণহরিকে বিষ খাওয়াতো; তার মোটিভও কিছু নেই।

আমি কোনো দিকে দিশা খুঁজে পাচ্ছি না, এমন সময় এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল; যেন মেঘে ঢাকা অন্ধকার রাত্রে বিদ্যুৎ চমকালো। দেখলাম ভুবন তার ট্যাক্সির চাকার তলায় জ্যাক্ বসিয়ে বাঁ হাতে ঘোরাচ্ছে!

খুনের রাত্রে ট্যাক্সি-ড্রাইভার ভুবনেশ্বর দাস যে অকুস্থলে উপস্থিত ছিল তা আমরা সকলেই জানতাম, অথচ তার কথা একবারও মনে আসেনি। একেই জি. কে চেষ্টারটন বলেছেন, অদৃশ্য মানুষ-Invisible Man.

অস্ত্রের সমস্যা এক মুহূর্তে সমাধান হয়ে গেল। স্প্যানার দিয়ে ভুবন প্রাণহরিকে মেরেছিল, ডাক্তার ঘোষাল মারণাস্ত্রের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে অবিকল মিলে যাচ্ছে।

ভুবন বৌকে নিয়ে পালিয়েছে। ভারি বুদ্ধিমান লোক, আমি তাকে চিনেছি তা বুঝতে পেরেছিল। কোথায় গিয়ে তারা আস্তানা গাড়বে জানি না; মাদ্রাজ বোম্বাই কত জায়গা আছে। আশা করি প্রমোদবাবু ভুবনকে খুঁজে পাবেন না। কারণ, যদি খুঁজে পান নিশ্চয় তাকে সোনার মেডেল দেবেন না।

আর কিছু বলবার নেই। যদি কোনো কথা বাদ পড়ে থাকে তোমরা আন্দাজ করে নিতে পারবে। ভুবন আর মোহিনী চিরজীবন ফেরারী হয়ে থাকবে, যদি না ধরা পড়ে। প্রাণহরি পোদ্দারের নিষ্ঠুর লোভ দুটো মানুষের জীবন নষ্ট করে দিল, এ কাহিনীর মধ্যে এইটেই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

অ দৃ শ্য ত্রি কো ণ

গল্পটি শুনিয়াছিলাম পুলিস ইন্‌সপেক্টর রমণীমোহন সান্যালের মুখে। ব্যোমকেশ এবং আমি পশ্চিমের একটি বড় শহরে গিয়াছিলাম গোপনীয় সরকারী কাজে সেখানে রমণীবাবুর সহিত পরিচয় হইয়াছিল। সরকারী কাজে লাল ফিতার জট ছাড়াইতে বিলম্ব হইতেছিল, তাই আমরাও নিষ্কর্মার মত ডাক-বাংলোতে বসিয়াছিলাম। রমণীবাবু প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমাদের আস্তানায় আসিতেন, গল্পসল্প হইত। তাঁহার চেহারাটাও ছিল রমণীমোহন গোছের, ভারি মিষ্ট এবং কমনীয়। কিন্তু সেটা তাঁহার ছদ্মবেশ। আসলে তিনি পুলিস বিভাগের একজন অতি চতুর এবং বিচক্ষণ কর্মচারী। তাঁহার বয়স আমাদের চেয়ে কমই ছিল, বছর চল্লিশের বেশী নয়। কিন্তু প্রকৃতিগত সমধর্মিতার জন্য তিনি আসিলে আড্ডা বেশ জমিয়া উঠিত।

আমাদের কাছে তাঁর ঘন ঘন যাতায়াত যে নিঃস্বার্থ সহৃদয়তা না হইতে পারে একথা অবশ্যই আমাদের মনে উদয় হইয়াছিল; উদ্দেশ্যটা যথাসময়ে প্রকাশ পাইবে এই আশায় প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

তারপর একদিন তিনি আমাদের গল্পটি শুনাইলেন। ঠিক গল্প নয়, একটি খুনের মামলার কয়েকটি ঘটনার পরম্পরা। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে জোড়া দিয়া একটি সুসংবদ্ধ গল্প খাড়া করা যায়।

বিবৃতি শেষ করিয়া রমণীবাবু বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, কে খুন করেছে আমি জানি, কেন খুন করেছে জানি; কিন্তু তবু লোকটাকে ফাঁসি-কাঠে ঝোলাতে পারছি না। প্রমাণ নেই। একমাত্র উপায় কনফেশান, আসামীকে নিজের মুখে অপরাধ স্বীকার করানো। আপনার মাথায় অনেক ফন্দি-ফিকির আসে, লোকটাকে ফাঁদে ফেলবার একটা মতলব বার করতে পারেন না?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'ভেবে দেখব।'

গল্পটি আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল; বোধ হয় ব্যোমকেশের মনেও রেখাপাত করিয়া থাকিবে। সে-রাত্রে রমণীবাবু প্রস্থান করিবার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'রমণীবাবু যে মালমসলা দিয়ে গেলেন তা দিয়ে তুমি একটা গল্প লিখতে পার না?'

বলিলাম, 'পারি। মালমসলা ভাল। কেবল চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব জুড়ে দিতে পারলেই গল্প হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তবে লেখ। কিন্তু একটা শর্ত আছে; গল্প জমাবার অছিলায় ঘটনা বদলাতে পাবে না।'

'বদলাবার দরকার হবে না।'

গল্প লিখিতে দুদিন লাগিল। লেখা শেষ করিয়া ব্যোমকেশকে দিলাম, সে পড়িয়া বলিল, 'ঠিকই হয়েছে মনে হচ্ছে। রমণীবাবুকে পড়িয়ে দেখা যাক, তিনি কি বলেন।'

রাত্রে রমণীবাবু আসিলে তাঁহাকে গল্প পড়িতে দিলাম। তিনি পড়িয়া

উৎফুল্ল চক্ষে আমার পানে চাহিলেন—'এই তো! ঘটনার সঙ্গে মনস্তত্ত্ব বেমালুম জোড় খেয়ে গেছে। কিন্তু—'

*গল্পটি নিম্নে দিলাম—

শিবপ্রসাদ সরকার এই শহরে মদের ব্যবসা করিয়া বড়মানুষ হইয়াছিলেন। টাকার প্রতি তাঁহার যথার্থ অনুরাগ ছিল, তাই প্রকাণ্ড বাড়ি, দামী মোটর ছাড়াও তিনি প্রচুর টাকা জমা করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে কৃপণ বলিত, তিনি নিজেকে বলিতেন হিসাবী। এই দুই মনোভাবের মধ্যে সীমারেখা অতিশয় সূক্ষ্ম, আমরা তাহা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব না।

কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে একটা ভারসাম্য আছে। শিবপ্রসাদ সরকারের একমাত্র মাতৃহীন পুত্র যখন সাবালক হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল তাহার চরিত্র পিতার ঠিক বিপরীত। সে অকৃপণ এবং বেহিসাবী, টাকার প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই; কিন্তু টাকার বিনিময়ে যে সকল বৈধ এবং অবৈধ ভোগ্যবস্তু পাওয়া যায় তাহার প্রতি গভীর অনুরাগ আছে। সে দু'হাতে টাকা উড়াইতে আরম্ভ করিল।

পিতা শিবপ্রসাদ ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরে যথেষ্ট অপত্যস্নেহ ছিল। পুত্রের চালচলন লক্ষ্য করিয়া তিনি একটি সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু তাহাতে স্থায়ী ফল হইল না। সুনীল কিছুকাল স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া রহিল, তারপর আবার নিজ মূর্তি ধারণ করিল।

বধূর নাম রেবা; সে সুন্দরী হইলেও বুদ্ধিমতী, অন্ততঃ তাহার সংসার-বুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। উপরন্তু সে শিক্ষিতা এবং কালধর্মে আধুনিকাও বটে। সে স্বামীর স্বৈরাচার অগ্রাহ্য করিয়া একান্তমনে বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবায় নিযুক্ত হইল। শিবপ্রসাদ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত নিজেই ব্যবসাঘটিত কাজ-কর্ম দেখিতেন; কারণ পুত্র অপদার্থ এবং কর্মচারীদের শিবপ্রসাদ বিশ্বাস করিতেন না। রেবা তাঁহার অধিকাংশ কাজের ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইল। মোটর চালাইয়া শ্বশুরকে কর্মস্থলে লইয়া যাইত, সেখানে নানাভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিত, তারপর আবার মোটর চালাইয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিত। এই-ভাবে রেবা শিবপ্রসাদের পুত্রের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

তারপর, রেবা ও সুনীলের বিবাহের চার বছর পরে শিবপ্রসাদের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশ পাইল তিনি সমস্ত সম্পত্তি পুত্রবধূর নামে উইল করিয়া গিয়াছেন।

সম্পত্তি হাতে পাইয়া রেবা প্রথমেই মদের দোকানের বারো আনা অংশ বিক্রয় করিয়া দিল, চার আনা হাতে রাখিল। বড় বাড়িটা বিক্রয় করিয়া শহরের নির্জন প্রান্তে একটি সুদৃশ্য ছোট বাড়ি কিনিল, বড় মোটর বদল করিয়া একটি ছোট ফিয়েট গাড়ি লইল। স্বামীকে বলিল, 'তুমি মাসে তিনশো টাকা হাত-খরচ পাবে। যদি বাজারে ধার কর তার জন্য আমি দায়ী হব না। খবরের কাগজে ইস্তাহার ছাপিয়ে দিয়েছি।'

তারপর তাহারা ছোট বাড়িতে উঠিয়া গিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহাদের

সন্তান-সন্ততি জন্মে নাই।

এই গেল গল্পের ভূমিকা।

সুনীলের বয়স আন্দাজ ত্রিশ বছর, আঁটসাঁট মোটা শরীর, গোল মুখখানা প্যাঁচার মুখের মত থ্যাব্ড়া, মুখ দেখিয়া মনে হয় না বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু আছে। বস্তুত যাহারা বাপের পয়সা উড়াইয়া ফূর্তি করে, তাহাদের বুদ্ধির চেয়ে প্রবৃত্তিরই জোর বেশী, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সুনীলকেও সকলে অমিতাচারী অপরিণামদর্শী নির্বোধ বলিয়া জানিত।

সুনীল কিন্তু নির্বোধ ছিল না। সদ্বুদ্ধি না থাক, দুষ্টবুদ্ধি তাহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। পিতার মৃত্যুর পর সে যখন দেখিল সম্পত্তি বেহাত হইয়া গিয়াছে তখন সে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিল না, টাকার জন্য হম্বিতম্বি করিল না, কেমন যেন জবুথবু হইয়া গেল। শিবপ্রসাদ যতদিন জীবিত ছিলেন সুনীলের বাজার-দেনা তিনিই শোধ করিতেন। কিন্তু রেবা খবরের কাগজে ইস্তাহার ছাপিয়া দিয়াছে, এখন বাজারে কেহ তাহাকে ধার দিবে না। দৈনিক দশ টাকায় কত ফূর্তি করা যায়? সুতরাং সুনীল সুবোধ বালকের ন্যায় ঘরেই দিনযাপন করিতে লাগিল। হপ্তায় একদিন কি দুইদিন বৈকালে বাহির হইত, বাকি দিনগুলি বাড়িতে রোমাঞ্চকর বিলাতী উপন্যাস পড়িয়া কাটাইত। রেবার সহিত তাহার সম্পর্কটা নিতান্তই ব্যবহারিক সম্পর্ক হইয়া দাঁড়াইল; বাহ্যত এক বাড়িতে থাকার ঘনিষ্ঠতা, অন্তরে দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্ব। তাহাদের শয়নের ব্যবস্থাও পৃথক ঘরে।

রেবা সকালবেলা মোটর চালাইয়া বাহির হয়; মদের ব্যবসায় সে চার-আনা অংশীদার, প্রত্যহ নিজে হিসাব পরীক্ষা করে, সেখান হইতে দুপুরবেলা ফিরিয়া আসে। অপরাহ্নে আবার বাহির হয়। এবার কিন্তু ব্যবসা নয়; মেয়েদের একটা ক্ষুদ্র ক্লাব আছে, সেখানে গিয়া গল্পগুজব খেলাধুলা করে, কখনও সিনেমা দেখিতে যায়; তারপর গৃহে ফিরিয়া আসে। সুনীল সারাক্ষণ বাড়িতেই থাকে।

একটা বুড়ী-গোছের ঝি আছে, তাহার নাম আন্না; বাড়ির কাজ, রান্নাবান্না সব সে-ই করে, অন্য চাকর নাই। রেবা সব দিক দিয়া খরচ কমাইয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার পর সুনীল বসিবার ঘরে রহস্য উপন্যাস পড়িতেছিল, রাত্রি আটটার সময় রেবা ফিরিয়া আসিল। গাড়ি গ্যারাজে বন্ধ করিয়া বেশবাস পরিবর্তন করিয়া একখানা বাংলা বই হাতে লইয়া বসিবার ঘরে একটি সোফায় আসিয়া বসিল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনও কথা হইল না। নৈশ আহারের বিলম্ব আছে; রেবা বই খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বইখানার নাম - ব্যোমকেশের কাহিনী।

সুনীলের ভোঁতা মুখ ভাবলেশহীন। সে একবার চোখ তুলিয়া রেবার পানে চাহিল, আবার পুস্তকে চক্ষু ন্যস্ত করিল, তারপর একটু গলা খাঁকারি দিল।

'রেবা—'

রেবা ভ্রূ তুলিয়া চাহিল।

সুনীল ইতস্তত করিয়া বলিল, 'তুমি কোন দিন বাড়ির সামনে একটা লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছ?'

রেবা বই মুড়িয়া কিছুক্ষণ সুনীলের পানে চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল, 'না। কেন?'

সুনীল ধীরে ধীরে বলিল, 'কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছি, সন্ধ্যের পর একটা লোক বাড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে রাস্তা দিয়ে যায়, আবার খানিক পরে তাকাতে তাকাতে ফিরে যায়।'

রেবা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল, 'কি রকম চেহারা লোকটার?'

সুনীল বলিল, 'গুণ্ডার মতন চেহারা। কালো মুস্কো জোয়ান, মাথায় পাগড়ী।'

অনেকক্ষণ আর কথা হইল না; তারপর রেবা মনস্থির করিয়া বলিল, 'কাল সকালে তুমি থানায় গিয়ে এত্তেলা দিয়ে এস। নির্জন জায়গা, যদি সত্যিই চোর-ছ্যাঁচড় হয় পুলিসকে জানিয়ে রাখা ভাল।'

সুনীল কিছুক্ষণ থতমত হইয়া রহিল, শেষে সংকুচিত স্বরে বলিল, 'তুমি বাড়ির মালিক, তুমি পুলিসে খবর দিলেই ভাল হত না?'

রেবা বলিল, 'কিন্তু আমি তো মুস্কো জোয়ান লোকটাকে দেখিনি।—তা না হয় দু'জনেই যাব।'

পরদিন সকালে তাহারা থানায় গেল; নিজেদের এলাকার ছোট থানায় না গিয়া একেবারে সদর থানায় উপস্থিত হইল। সেখানে বড় দারোগা রমণীবাবু বাঙালী, তাঁহার সহিত সামান্য জানাশোনা আছে।

রমণীবাবু তাহাদের খাতির করিয়া বসাইলেন। সুনীলের বাক্যালাপের ভঙ্গীটা একটু মন্থর ও এলোমেলো, তাই রেবাই ঘটনা বিবৃত করিল। এত্তেলা লিখিত হইবার পর রমণীবাবু বলিলেন, 'আপনাদের বাড়িটা একেবারে শহরের এক টেরে। যা হোক, ভয় পাবেন না। আমি ব্যবস্থা করছি, রাত্রে টহলদার পাহারাওলা বাড়ির ওপর নজর রাখবে।'

থানা হইতে রেবা কাজে চলিয়া গেল, সুনীল পদব্রজে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

সেদিন বৈকালে রেবা বলিল, 'এ-বেলা আমি বেরুব না, শরীরটা তেমন ভাল ঠেকছে না।'

সুনীল বই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, 'তাহলে আমি একটু ঘুরে আসি।'

রেবার মুখে অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিল, 'তুমি বেরুবে! কিন্তু দেরি কোরো না বেশি, সকাল সকাল ফিরে এস।—না হয় গাড়িটা নিয়ে যাও।'

সুনীল বলিল, 'দরকার নেই, হেঁটেই যাব। মাঝে মাঝে হাঁটলে শরীর ভাল থাকে।'

উৎকণ্ঠার মধ্যেও রেবার মন একটু প্রসন্ন হইল। নিজের ছোট্ট গাড়িখানাকে সে ভালবাসে, নিজের হাতে তাহার পরিচর্যা করে; সুনীলের হাতে গাড়ি ছাড়িয়া দিতে তাহার মন সরে না।

সুনীল গায়ে একটা ধূসর রঙের শাল জড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। শীতের আরম্ভ, পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়।

সুনীল শহরের কেন্দ্রস্থিত গলিঘুঁজির মধ্যে যখন পৌঁছিল তখন ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে। সে একটা জীর্ণ বাড়ির দরজায় টোকা মারিল; একজন মুস্কো জোয়ান লোক বাহির হইয়া আসিল। সুনীল খাটো গলায় বলিল, 'হুকুম সিং, তোমাকে দরকার আছে।'

হুকুম সিং সেলাম করিল। মুকুন্দ সিং এবং হুকুম সিং দুই ভাই শহরের নামকরা পালোয়ান ও গুণ্ডা; সুনীলের সঙ্গে তাহাদের অনেক দিনের পরিচয়।

বড় মানুষের উচ্ছৃঙ্খল ছেলে এবং গুণ্ডাদের মধ্যে এমন একটি আত্মিক যোগ আছে যে, আপনা হইতেই হৃদ্যতা জমিয়া ওঠে।

সুনীল দ্রুত-হ্রস্ব কণ্ঠে হুকুম সিংকে কিছু উপদেশ দিল, তারপর তাহার হাতে কয়েকটা নোট গুঁজিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি গলি হইতে বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে ধূসর শাল গায়ে লোকটিকে কেহ লক্ষ্য করিল না, লক্ষ্য করিলেও সুনীল সরকার বলিয়া চিনিতে পারিত না। এই বস্তিতে সুনীলকে চিনিবে এমন লোক ক'টাই বা আছে!

সুনীল বাড়ি ফিরিতেই রেবা বলিল, 'এলে? এত দেরি হল যে!' সুনীল ফিরিয়া আসায় সে মনে স্বস্তি পাইয়াছে তাহা বেশ বোঝা যায়। রেবার মনে সুনীলের প্রতি তিলমাত্র স্নেহ নাই, স্বামীকে ভালবাসিতেই হইবে এরূপ সংস্কারও নাই; তাহার হৃদয় এখন সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত ও স্বাধীন। কিন্তু মেয়েমানুষ যতই স্বাধীন হোক, পুরুষের বাহুবলের ভরসা তাহারা ছাড়িতে পারে না।

সুনীল ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'এখনো এক ঘণ্টা হয়নি। খানিকটা ঘুরে বেড়িয়েছি বৈ তো নয়।'

আর কোনও কথা হইল না। চা পান করিয়া দু'জনে বই লইয়া বসিল।

রেবা কিন্তু স্থির হইতে পারিল না। সদর দরজা বন্ধ ছিল, সে মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া জানালা দিয়া রাস্তার দিকে উঁকি মারিতে লাগিল। রাস্তাটা শহরের দিক হইতে আসিয়া রেবার বাড়ি অতিক্রম করিয়া কিছুদূরে যাইবার পর মাঠ-ময়দান ও ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে। রাস্তার শেষ দীপস্তম্ভটা বাড়ির প্রায় সামনাসামনি দাঁড়াইয়া ম্রিয়মান আলো বিতরণ করিতেছে।

একবার জানালায় উঁকি মারিয়া আসিয়া রেবা সোফায় বসিল, হাতের বই-খানা খুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল; তারপর যেন নিরাসক্ত কৌতূহলবশেই প্রশ্ন করিল, 'পুলিসের টহলদার রাত্রে কখন রোঁদ দিতে বেরোয়?'

সুনীল বই হইতে বোকাটে মুখ তুলিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল, 'তা তো জানি না। রাত্রি দশটা এগারোটা হবে বোধ হয়।'

রেবা বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিল, আর কিছু বলিল না। দুজনে নিজ নিজ পাঠে মন দিল।

রাত্রি ঠিক আটটার সময় রেবা চমকিয়া মুখ তুলিল। রাস্তা হইতে যেন একটা শব্দ আসিল। রেবা উঠিয়া গিয়া আবার জানালার পর্দা সরাইয়া উঁকি মারিল। শহরের দিক হইতে একটা লোক আসিতেছে। রাস্তার নিস্তেজ আলোয় তাহাকে অস্পষ্ট দেখা গেল; গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা, মাথায় বৃহৎ পাগড়ী মুখের উপর ছায়া ফেলিয়াছে, হাতে লম্বা লাঠি। লোকটা বাড়ির দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল।

রেবা সশব্দে নিশ্বাস টানিল। সুনীল সেই দিকে ফিরিয়া দেখিল রেবার মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে; সে নীরবে হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। সুনীল উঠিয়া গিয়া রেবার পাশে দাঁড়াইল।

রেবা ফিসফিস করিয়া বলিল, 'বোধ হয় সেই লোকটা, তুমি যাকে দেখেছিলে।'

সুনীল ঘাড় নাড়িল। দু'জনে পাশাপাশি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে আবার নাগরা জুতার আওয়াজ শোনা গেল; লোকটা ফিরিয়া আসিতেছে। রেবা নিশ্বাস রোধ করিয়া রহিল।

লোকটা বাড়ির পানে চাহিতে চাহিতে শহরের দিকে ফিরিয়া গেল। তাহার পদধ্বনি মিলাইয়া যাইবার পর রেবা প্রশ্ন-বিস্ফারিত চক্ষে সুনীলের পানে চাহিল। সুনীলের মনে নিগূঢ় সন্তোষ, কিন্তু সে মুখে দ্বিধার ভাব আনিয়া বলিল, 'সেই লোকটাই মনে হচ্ছে।'

দুজনে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। রেবার মুখ শঙ্কাবিশীর্ণ হইয়া রহিল। সুনীল তাহার প্রতি একটা চোরা কটাক্ষ হানিয়া বই খুলিল।

ঝি আসিয়া প্রশ্ন করিল -খাবার দিবে কি না। অতঃপর দুজনে খাইতে গেল।

আহার করিতে করিতে সুনীল বলিল 'বোধ হয় ভয়ের কিছু নেই। পুলিস যখন দেখাশোনা করবে বলেছে '

প্রত্যুত্তরে রেবার অন্তরের উষ্মা ঝন্ ঝন্ শব্দে বাহির হইয়া আসিল, 'পুলিস তো আর সারারাত্রি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে না, মাঝে মাঝে টহল দিয়ে যাবে। তার ফাঁকে যদি পাঁচটা ডাকাত দোর ভেঙে বাড়িতে ঢোকে, তখন কি করব ?'

সুনীল মুখ হেঁট করিয়া আহার করিতে লাগিল, শেষে বলিল, 'বাড়িতে লাঠি-সোঁটা কিছু আছে ?'

রেবা গভীর বিরক্তিভরে স্বামীর পানে একবার চাহিল, এই বালকোচিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিল না। লাঠি-সোঁটা থাকিলেও চালাইবে কে ?

রাত্রে রেবা নিজ শয়নকক্ষের দ্বারে উপরে-নীচে ছিট্‌কিনি লাগাইয়া শয়ন করিল। এত সতর্কতার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না, রমণীবাবু তাহার বাড়ি পাহারার ভাল ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। কিন্তু রেবার মনের অশান্তি দূর হইল না; বিছানায় শুইয়া সে অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল।

শহরের একান্তে বাড়িটা না কিনিলেই হইত ..কিন্তু তখন কে জানিত? এখন চোর-ছ্যাঁচড়ের ভয়ে বাড়ি ছাড়িয়া গেলে মান থাকিবে না .স্বামী বিষয়বুদ্ধিহীন অপদার্থ...কি করা যায়? দুটা শক্ত-সমর্থ গোছের চাকর রাখিবে? কিন্তু চাকরের উপর ভরসা কি? যে রক্ষক সেই ভক্ষক হইয়া উঠিতে পারে। ডাকাতেরা ঘুষ খাওয়াইয়া যদি চাকরদের বশ করে, তাহারাই রাত্রে দ্বার খুলিয়া ডাকাতদের ঘরে ডাকিয়া আনিবে .তার চেয়ে বুড়ী আন্না ভাল.. শয়নঘরের লোহার সিন্দুকে দামী গহনা আছে, কিন্তু আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র নাই।...

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় রেবা উত্তেজিতভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিল।

তাহার শ্বশুরের একটা পিস্তল ছিল। ছয় মাস পূর্বে তিনি যখন মারা যান, তখন পিস্তলটা থানায় জমা দেওয়া হইয়াছিল। সেই পিস্তলটা কি ফেরত পাওয়া যায় না? কাল সকালেই সে থানায় গিয়া রমণীমোহনবাবুর সঙ্গে দেখা করিবে। একটা পিস্তল বাড়িতে থাকিলে আর ভয় কি ?

অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া রেবা ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে রেবা সুনীলকে লইয়া আবার থানায় চলিল। পথে সুনীলের অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে রেবা বলিল, 'বাবার পিস্তলটা থানায় জমা আছে, সেটা ফেরত নিলে ভাল হয় না?'

যেন কথাটা সুনীলের মাথায় আসে নাই, এমনিভাবে চোখ বড় করিয়া সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'ভাল হবে।'

থানায় রমণীবাবু প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন, 'বেশ তো, একটা দরখাস্ত করে দিন, হয়ে যাবে। কার নামে লাইসেন্স নেবেন?'

এ কথাটা রেবা চিন্তা করে নাই। সে স্ত্রীলোক, পূর্বে কখনও পিস্তল ছোঁড়ে নাই; আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে তাহার মনে একটা সন্ত্রস্ত শঙ্কার ভাব আছে। কিন্তু সে তাহা প্রকাশ করিতে চায় না, চট্ করিয়া বলিল, 'কেন, এঁর নামে।'

রমণীবাবু বলিলেন, 'তাই হবে। আপনি এখনি দরখাস্ত করে দিন; আমি একবার আপনাদের বাড়িতে গিয়ে নিয়ম-রক্ষা রকমের তদারক করে আসব। কালই পিস্তল পেয়ে যাবেন।'

রেবা দরখাস্ত লিখিল, সুনীল তাহাতে সহি করিল। রমণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুনীলবাবু, আপনি আগে কখনো বন্দুক-পিস্তল ছুঁড়েছেন?'

সুনীল আম্‌তা আম্‌তা ভাবে বলিল, 'এঁ- না হ্যাঁ- অনেক দিন আগে লুকিয়ে বাবার পিস্তল নিয়ে কয়েকবার ছুঁড়েছিলাম—তখন ছেলেমানুষ ছিলাম— এঁ—'

রমণীবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'কাজটা বে-আইনী হয়েছিল। যার নামে লাইসেন্স সে ছাড়া আর কারুর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার হুকুম নেই। অবশ্য আতুরে নিয়মো নাস্তি, বিপদে পড়লে সকলেই সব রকম অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।'

সেদিন বৈকালে, রমণীবাবু এন্‌কোয়ারি করিতে আসিলেন এবং চা-জল-খাবার খাইয়া ঘণ্টাখানেক গল্প করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ধারণা জন্মিল সুনীল হাবাগোবা জড়-প্রকৃতির লোক, রেবা তাহাকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতেছে। হাবাগোবা লোকেরা হাতে টাকা পাইলে উচ্ছৃঙ্খল হয়, সুনীলও তাহাই হইয়া-ছিল, এখন শুধরাইয়া গিয়াছে। সুনীলের প্রকৃত স্বরূপ তিনি তখনও চেনেন নাই।

পরদিন সুনীল গিয়া থানা হইতে লাইসেন্স ও পিস্তল লইয়া আসিল। বন্দুকের দোকান হইতে এক বাক্স কার্তুজও কিনিয়া আনিল।

দুপুরবেলা রেবা বাড়ি ফিরিলে সুনীল পিস্তল ও কার্তুজের বাক্স তাহার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, 'এই নাও।'

রেবা সশঙ্ক চক্ষে আগ্নেয়াস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আমি কি করব? তুমি রাখো, দরকার হলে তুমিই তো ব্যবহার করবে।'

সুনীল ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিল, সে পিস্তল ও কার্তুজ লইয়া নিজের ঘরে রাখিয়া আসিল।

ইহার দুইদিন পরে পাগড়ীধারী দুর্বৃত্তটাকে আর একবার রাস্তা দিয়া যাইতে দেখা গেল। তারপর তাহার যাতায়াত বন্ধ হইল।

এক হপ্তা নিরুপদ্রবে কাটিয়া যাইবার পর রেবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ওরা বোধ হয় জানতে পেরেছে বাড়িতে বন্দুক আছে, তাই আশা ছেড়ে দিয়েছে।'

সুনীল বিজ্ঞের মত মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'হুঁ।'

তারপর যত দিন কাটিতে লাগিল, রেবার মন ততই নিরুদ্বেগ হইতে লাগিল। সংসারে স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিল। রেবা সকালে কাজে বাহির হয়, বিকালে বেড়াইতে যায়। সুনীল বাড়িতে বসিয়া রহস্য-রোমাঞ্চ পড়ে;

কদাচিৎ সন্ধ্যার সময় ঘণ্টাখানেকের জন্য বাড়ি হইতে বাহির হয়। তাহার বন্ধু-বান্ধব নাই; সে কখনও রেলওয়ে স্টেশনে গিয়া বইএর স্টল হইতে বই কেনে; কখনও শহরের এঁদোপড়া গলিতে হুকুম সিংএর সঙ্গে দেখা করে। হুকুম সিংএর সঙ্গে তাহার কাজ এখনও শেষ হয় নাই।

এইভাবে দুই মাস কাটিয়া গেল, শীত শেষ হইয়া আসিল। রেবার মন হইতে গুণ্ডার সম্ভাবিত আক্রমণের কথা সম্পূর্ণ মুছিয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যাকালে রেবার দুটি বান্ধবী বাড়িতে আসিয়াছিল; রেবা তাহাদের লইয়া খাওয়াদাওয়া হাসি গল্পে ব্যস্ত ছিল। রেবার বান্ধবীরা বাড়িতে আসিলে সুনীলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া চলে, চাকরের মর্যাদাও সে তাহাদের কাছে পায় না। তাই তাহারা কেহ আসিলে সুনীল নিজের ঘরে বসিয়া থাকে কিংবা বেড়াইতে যায়। আজও সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল, তারপর চুপি চুপি পিছনের দরজা দিয়া বাড়ি হইতে বাহিব হইল। অনেক দিন হইতে সে এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সুনীল শহরে গিয়া গলির মধ্যে হুকুম সিংএর সঙ্গে দেখা করিল। দশ মিনিট ধরিয়া হুকুম সিং তাহার নির্দেশ শুনিয়া শেষে বলিল, 'খবর পেয়েছি বাড়িতে পিস্তল আছে।'

সুনীল পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দেখাইল, পিস্তল খুলিয়া দেখাইল, তাহার মধ্যে টোটা নাই। বলিল, 'তুমি নির্ভয়ে বাড়িতে ঢুকতে পার।'

হুকুম সিং হাত পাতিয়া বলিল, 'আমার ইনাম?'

সুনীল দুই মাসে ছয়শত টাকা জমাইয়াছিল। তাহাই হুকুম সিংএর হাতে দিয়া বলিল, 'এই নাও। এর বেশী এখন আমার কাছে নেই। তুমি কাজ সেরে ওর গায়ের গয়নাগুলো নিও। তারপর সম্পত্তি যখন আমার হাতে আসবে তুমি দশ হাজার টাকা পাবে। আমি এখন রেলওয়ে স্টেশনে যাচ্ছি, রাত্রি আটটার পর বাড়ি ফিরব।'

হুকুম সিং বলিল, 'বহুৎ খুব।'

'যা যা বলেছি মনে থাকবে?'

'জি। আপনি বে-ফিকির থাকুন, আমি সাজসজ্জা করে এখনি বেরুচ্ছি।'

হুকুম সিং কালিঝুলি মাখিয়া ছদ্মবেশ ধারণের জন্য নিজের কোটরে প্রবেশ করিল। সুনীল স্টেশনে গেল না, দ্রুতপদে গৃহের পানে ফিরিয়া চলিল।

অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছিয়া সুনীল দেখিল বান্ধবীরা এখনও আছে। সে আশ্বস্ত হইয়া রাস্তার ধারে একটা বড় গাছের পিছনে লুকাইয়া রহিল। সেখানে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিল; অন্য পকেটে কার্তুজ ছিল, তাহা পিস্তলে ভরিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে রেবার বান্ধবীরা চলিয়া গেল। বেবা ভিতর হইতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

রাত্রি সাড়ে সাতটা। রেবা আন্নাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, 'বাবু কোথায় রে?'

আন্না বলিল, 'বাবু বেরিয়েছে। সদর দিয়ে তোমার ওনারা এলেন, বাবু খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

'ও। আচ্ছা, তুই রান্না চড়াগে যা।'

রেবা উদ্বিগ্ন হইল না। চোর-ডাকাতের ভয় আর তাহার নাই। সে অন্য কথা

ভাবিয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল। এইভাবে যদি জীবন চলিতে থাকে, মন্দ কি?

বাহিরে গাছের আড়ালে সুনীল ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। শহরের দিক হইতে হুকুম সিংকে আসিতে দেখা গেল। সে নিঃশব্দে আসিতেছে, নাগরা জুতার আওয়াজ নাই।

দ্বারের সাম্নাসাম্নি আসিয়া সে আগে পিছে তাকাইল, তারপর দ্বারে মৃদু টোকা দিল।

সুনীল আসিয়াছে মনে করিয়া রেবা দ্বার খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করিয়া হুকুম সিং ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল এবং দু'হাতে রেবার গলা টিপিয়া ধরিল।

একটি অর্ধোচ্চারিত চীৎকার রেবার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, তারপর আর শব্দ নাই। আন্না রান্নাঘর হইতে চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিল, সবিস্ময়ে বাহিরের ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল যখের মত কালো দুর্দান্ত একটা লোক রেবার গলা টিপিতেছে। আন্না বাঙ্নিষ্পত্তি করিল না, রান্নাঘরে ফিরিয়া গিয়া দ্বারে হুড়কা আঁটিয়া দিল।

হুকুম সিং যখন দেখিল রেবার দেহে প্রাণ নাই তখন সে তাহাকে মেঝেয় শোয়াইয়া দিল; রেবার হাতের কানের গলার গহনাগুলা খুলিয়া লইয়া নিজের পকেটে রাখিল, তারপর সদর দরজা দিয়া বাহির হইল।

গাছের আড়ালে সুনীল এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করিতেছিল। 'কে? কে?' বলিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। হুকুম সিং হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, সুনীল ছুটিয়া আসিয়া পিস্তল তুলিল, হুকুম সিংএর বুক লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের সমস্ত কার্তুজ উজাড় করিয়া দিল। হুকুম সিং মুখ থুবড়াইয়া সেইখানেই পড়িল, আর নড়িল না।

সুনীল তখন চীৎকার করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিল 'কী হয়েছে! অ্যাঁ—রেবা—!'

রান্নাঘরে আন্না সুনীলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া আসিল। সুনীল ব্যাকুলস্বরে বলিল, 'আন্না, এ কী হল! রেবা মরে গেছে! গুণ্ডাটা রেবাকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু আমিও গুণ্ডাকে মেরেছি!' সে লাফাইয়া উঠিল—'পুলিস! আমি পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছি।' বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

যথাসময়ে স্থানীয় থানা হইতে পুলিস আসিল। আন্না যাহা দেখিয়াছিল পুলিসকে বলিল।

খবর পাইয়া রমণীবাবু আসিলেন। সুনীল হাব্লার মত তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল, 'আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, ফিরে এসে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুতেই একটা চীৎকার শুনতে পেলাম। ছুটে এসে দেখি ওই লোকটা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। আমার মাথা গোলমাল হয়ে গেল। আমি পিস্তল দিয়ে ওকে মেরেছি। তারপর ঘরে ঢুকে দেখি—' তাহার ব্যগ্র চক্ষু রেবার মৃতদেহের দিকে ফিরিল; সে দু'হাতে মুখ ঢাকিল।

রমণীবাবু ক্ষণেক নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি পিস্তল নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন?'

সুনীল মুখ খুলিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ। আমার নামে পিস্তল, আমি সর্বদা পিস্তল আমার কাছে রাখি।'

রমণীবাবু বলিলেন, 'পিস্তল দিন। ওটা আমি বাজেয়াপ্ত করলাম।'

সুনীল বিনা আপত্তিতে পিস্তল রমণীবাবুর হাতে সমর্পণ করিল। পিস্তলে আর তাহার প্রয়োজন ছিল না।

ব্যোমকেশ বলিল, 'সুনীল সরকার বোকা বটে, কিন্তু বুদ্ধি আছে।'

রমণীবাবু করুণ হাসিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আমার ধারণা ছিল আমি বুদ্ধিমান, কিন্তু সুনীল সরকার আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। তার মতলব কিছু বুঝতে পারিনি। হুকুম সিংকে খুন করার অপরাধে তাকে যে ধরব সে উপায় নেই। স্পষ্টতই হুকুম সিং তার বাড়িতে ঢুকে তার স্ত্রীকে খুন করে গায়ের গয়না কেড়ে নিয়েছিল, সুতরাং তাকে খুন করার অধিকার সুনীলের ছিল। সে এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছে: পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করেছে এবং নিজের দুষ্কার্যের একমাত্র শরিককে সরিয়েছে! স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে-ই এখন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, কারণ সে-ই নিকটতম আত্মীয়। রেবার উইল ছিল না, সুনীল আদালতের হুকুম নিয়ে গদীয়ান হয়ে বসেছে।'

'হুঁ' বলিয়া ব্যোমকেশ চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

রমণীবাবু বলিলেন, 'একটা রাস্তা বার করুন, ব্যোমকেশবাবু। যখন ভাবি একজন অতি বড় শয়তান আইনকে কলা দেখিয়ে চিরজীবন মজা লুটবে তখন অসহ্য মনে হয়।'

ব্যোমকেশ মুখ তুলিয়া বলিল, 'রেবা অজিতের লেখা বইগুলো ভালবাসতো?'

রমণীবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, ব্যোমকেশবাবু। ওদের বাড়ি আমি আগা-পাস্তালা সার্চ করেছিলাম; আমার কাজে লাগে এমন তথ্য কিছু পাইনি, কিন্তু দেখলাম অজিতবাবুর লেখা আপনার কীর্তিকাহিনী সবগুলিই আছে, সবগুলিতে রেবার নাম লেখা। তা থেকে মনে হয় রেবা আপনার গল্প পড়তে ভালবাসতো।'

ব্যোমকেশ আবার চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িল। আমরা সিগারেট ধরাইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। দেখা যাক ব্যোমকেশের মস্তিষ্ক-রূপ গন্ধমাদন হইতে কোন্ বিশল্যকরণী দাবাই বাহির হয়।

দশ মিনিট পরে ব্যোমকেশ নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। আমরা সাগ্রহে তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

সে বলিল, 'রমণীবাবু, রেবার হাতের লেখা যোগাড় করতে পারেন?'

'হাতের লেখা!' রমণীবাবু ভ্রূ তুলিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ধরুন, তার হিসেবের খাতা, কিংবা চিঠির ছেঁড়া টুকরো। যাতে বাংলা লেখার ছাঁদটা পাওয়া যায়।'

রমণীবাবু গালে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন, 'চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু মতলবটা কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মতলবটা এই।—রেবা আমার রহস্য কাহিনী পড়তে ভালবাসতো। সুতরাং অটোগ্রাফের জন্যে আমাকে চিঠি লেখা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। মেয়েদের যে ও দুর্বলতা আছে তার পরিচয় আমরা হামেশাই পেয়ে থাকি। মনে

করুন ছ মাস আগে রেবা আমাকে চিঠি লিখেছিল; আমার অটোগ্রাফ চেয়েছিল, তারপর আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, তার স্বামী তাকে খুন করবার ফন্দী আঁটছে; আমি যদি তার অপঘাত মৃত্যুর খবর পাই তাহলে যেন তদন্ত করি।'

রমণীবাবু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'বুঝেছি। জাল চিঠি তৈরি করবেন, তারপর সেই চিঠি সুনীলকে দেখিয়ে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করবেন!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করব। সুনীল যদি ভয় পেয়ে সত্য কথা বলে ফেলে তবেই তাকে ধরা যেতে পারে।'

রমণীবাবু বলিলেন, 'আমি রেবার হাতের লেখার নমুনা যোগাড় করব। আর কিছু?'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'রেবার নাম-ছাপা চিঠির কাগজ ছিল কি?'

'ছিল। তাও পাবেন। আর কিছু?'

'আর—একটা টেপ্ রেকর্ডিং মেশিন। যদি সুনীল কন্‌ফেস্ করে, তবে পাকাপাকি রেকর্ড থাকা ভাল।'

'বেশ। কাল সকালেই আমি আবার আসব।' বলিয়া রমণীবাবু বিশেষ উত্তেজিতভাবে বিদায় লইলেন।

পরদিন সকালে আমরা সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করিয়াছি, রমণীবাবু আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার হাতে একটি চামড়ার স্যাচেল। হাসিয়া বলিলেন, 'যোগাড় করেছি।'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে সিগারেট দিয়া বলিল, 'কি কি যোগাড় করলেন?'

রমণীবাবু স্যাচেল খুলিয়া সন্তর্পণে একটি কাগজের টুক্‌রা বাহির করিয়া আমাদের সামনে ধরিলেন, বলিলেন, 'এই নিন রেবার হাতের লেখা।'

চিঠির কাগজের ছিন্নাংশ, তাহাতে বাংলায় কয়েক ছত্র লেখা আছে—'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যদি কর্তব্য না থাকে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য থাকবে কেন? আমরা আধুনিক যুগের মানুষ, সেকেলে সংস্কার আঁকড়ে থাকার মানে হয় না'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'এই রেবার হাতের লেখা! দস্তখত নেই দেখছি। কোথায় পেলেন?'

রমণীবাবু স্যাচেল হইতে এক তা সাদা চিঠির কাগজ লইয়া বলিলেন, 'আর এই নিন রেবার নাম-ছাপা সাদা চিঠির কাগজ। কাল রাত্রে এখান থেকে বেরিয়ে সটান সুনীলের বাড়িতে গিয়েছিলাম; তাকে সোজাসুজি বললাম, তোমার বাড়ি আর একবার খুঁজে দেখব। সে আপত্তি করল না।—কেমন, যা যোগাড় করেছি তাতে চলবে তো?'

ব্যোমকেশ ছেঁড়া চিঠির টুকরা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে বলিল, 'চলবে। রেবার হাতের লেখা নকল করা শক্ত হবে না। যারা রবীন্দ্রীয় ছাঁদের নকল করে তাদের লেখা নকল করা সহজ।—টেপ্-রেকর্ডার পেয়েছেন?'

রমণীবাবু বলিলেন, 'পেয়েছি। যখন বলবেন তখনই এনে হাজির করব।—তাহলে শুভকর্মের দিন স্থির কবে করছেন?'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'আজই হোক না, শুভস্য শীঘ্রম্। আমি সুনীলকে একটা চিঠি দিচ্ছি, সেটা আপনি কারুর হাতে পাঠিয়ে দেবেন।'

একটা সাধারণ প্যাডের কাগজে ব্যোমকেশ চিঠি লিখিল—

শ্রীসুনীল সরকার বরাবরেষু—

আপনার স্ত্রীর সহিত পত্রযোগে আমার পরিচয় হইয়াছিল; তিনি মৎ-সংক্রান্ত কাহিনী পড়িতে ভালবাসিতেন। শুনিলাম তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

আমি কয়েকদিন যাবৎ এখানে আসিয়া ডাকবাংলোতে আছি। আপনি যদি আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় ডাকবাংলোতে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন, আপনার স্ত্রী আমাকে যে শেষ চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা আপনাকে দেখাইতে পারি। চিঠিখানি আপনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

নিবেদন ইতি—ব্যোমকেশ বক্সী।

চিঠি খামে ভরিয়া ব্যোমকেশ রমণীবাবুর হাতে দিল। তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, এখন উঠি। চিঠিখানি এমনভাবে পাঠাব যাতে সুনীল বুঝতে না পারে যে, পুলিসের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক আছে। দুপুরবেলা টেপ্ রেকর্ডার নিয়ে আসছি।'

তিনি প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ রেবার চিঠি লইয়া বসিল, নানাভাবে তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে লাগিল, আলোর সামনে তুলিয়া ধরিয়া কাগজ দেখিল, ছিন্ন অংশের কিনারা পর্যবেক্ষণ করিল। তারপর সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিল।

বলিলাম, 'কি দেখলে?'

ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বদিকে ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'চিঠিখানা আস্ত ছিল, সম্প্রতি ছেঁড়া হয়েছে। চিঠির ল্যাজা-মুড়ো কোথায় গেল তাই ভাবছি।'

আমিও ভাবিলাম। তারপর বলিলাম, 'রেবা হয়তো নিজের কোন বান্ধবীকে চিঠিখানা লিখেছিল, রমণীবাবু তার কাছ থেকে আদায় করেছেন। বান্ধবী হয়তো নিজের নাম গোপন রাখতে চায়—'

'হতে পারে, অসম্ভব নয়। রেবার বান্ধবী হয়তো রমণীবাবুকে শর্ত করিয়ে নিয়েছে যে, তার নাম প্রকাশ পাবে না। তাই রমণীবাবু আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন—যাক, এবার জালিয়াতির হাতে-খড়ি হোক। অজিত, কাগজ-কলম দাও।'

অতঃপর দু'ঘণ্টা ধরিয়া ব্যোমকেশ রেবার হাতের লেখা মক্স করিল। শেষে আসল ও নকল আমাকে দিয়া বলিল, 'দেখ দেখি কেমন হয়েছে। অবশ্য নাম-দস্তখতটা আন্দাজে করতে হল, একটা নমুনা পেলে ভাল হত। কিন্তু এতেই চলবে বোধ হয়।'

রেবার চিঠি ও ব্যোমকেশের খসড়া পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলাম, লেখার ছাঁদে তফাত নাই; সাধারণ লোকের কাছে ব্যোমকেশের লেখা স্বচ্ছন্দে রেবার লেখা বলিয়া চালানো যায়। বলিলাম, 'চলবে।'

ব্যোমকেশ তখন সযত্নে চিঠি লিখিতে বসিল। রেবার নাম-ছাপা কাগজে ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া লিখিল। চিঠি এইরূপ—

মাননীয়েষু,

ব্যোমকেশবাবু, আপনার চিঠি আর অটোগ্রাফ পেয়ে কত আনন্দ হয়েছে বলতে পারি না। আমার মতন গুণগ্রাহী পাঠক আপনার অনেক আছে, নিশ্চয়

আপনাকে অটোগ্রাফের জন্য বিরক্ত করে। তবু আপনি যে আমাকে দু'ছত্র চিঠিও লিখেছেন সেজন্যে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার অটোগ্রাফ আমি সযত্নে আমার খাতায় গেঁথে রাখলুম।

আপনার সহৃদয়তায় সাহস পেয়ে আমি আমার নিজের কথা কিছু লিখছি।—

আমার স্বামী বিষয়-বুদ্ধিহীন এবং মন্দ চরিত্রের লোক, তাই আমার শ্বশুর মৃত্যুকালে তাঁর বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আমার নামে উইল করে গিয়েছেন। সম্পত্তি প্রচুর, এবং আমি তাতে আমার স্বামীকে হাতে দিতে দিই না। আমার সন্দেহ হয় আমার স্বামী আমাকে খুন করবার মতলব আঁটছেন; বোধ হয় গুণ্ডা লাগিয়েছেন। কি হবে জানি না। কিন্তু আপনি যদি হঠাৎ আমার অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ পান তাহলে দয়া করে একটু খোঁজখবর নেবেন। আপনি সত্যান্বেষী, অসহায়া নারীর মৃত্যুতে কখনই চুপ করে থাকতে পারবেন না। আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি--
বিনীতা
রেবা সরকার

চিঠিখানি ভাঁজ করিয়া ব্যোমকেশ একটি পুরানো খামের মধ্যে ভরিয়া রাখিল।

বেলা তিনটার সময় রমণীবাবু আসিলেন, সঙ্গে একজন ছোকরা পুলিস। সে রেডিও মিস্ত্রী; তাহার হাতে টেপ্-রেকর্ডারের বাক্স এবং মাইক ইত্যাদি যন্ত্রপাতি।

রমণীবাবু ব্যোমকেশের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মিস্ত্রীকে বলিলেন, 'বীরেন, তাহলে তুমি লেগে যাও।'

'আজ্ঞে স্যার', বলিয়া বীরেন লাগিয়া গেল।

বসিবার ঘরে টেবিলের মাথায় যে ঝোলানো বৈদ্যুতিক আলোটা ছিল তাহার তারে মাইক্ লাগানো হইল, টেপ্-রেকর্ডার যন্ত্রটা বসানো হইল ব্যোমকেশের শয়ন ঘরে। রেকর্ডার চালু হইলে একটু শব্দ হয়, যন্ত্রটা অন্য ঘরে থাকিলে যন্ত্রের শব্দ বসিবার ঘরে শোনা যাইবে না।

সব ঠিকঠাক হইলে বীরেন পাশের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল। আমরা বসিবার ঘরে টেবিলের পাশে বসিয়া সহজ গলায় কথাবার্তা বলিলাম; তারপর পাশের ঘরে গেলাম। বীরেন যন্ত্রের ফিতা উল্টাদিকে ঘুরাইয়া আবার চালু করিল, তখন আমরা নিজেদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। বেশ স্পষ্ট আওয়াজ, কোন্‌টা কাহার গলা চিনিতে কষ্ট হয় না।

ব্যোমকেশ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, 'চলবে।--চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

রমণীবাবু বলিলেন, 'দিয়েছি। আসবে নিশ্চয়। যার মনে পাপ আছে, ও চিঠি পাবার পর তাকে আসতেই হবে। আপনি তাকে ব্ল্যাকমেল করতে চান কিনা সেটা সে জানতে চাইবে। আচ্ছা, আমরা এখন যাই, আবার সন্ধ্যের পর আসব।'

ঠিক ছ'টার সময় বীরেনকে লইয়া রমণীবাবু আসিলেন; পুলিসের গাড়ি

তাঁহাদের নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

রমণীবাবু বলিলেন, 'একটু আগেই এলাম। কি জানি সুনীল যদি সাতটার আগে এসে উপস্থিত হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ করেছেন। প্রথমে আপনারা পাশের ঘরে থাকবেন, যাতে সুনীল জানতে না পারে যে, পুলিসের সঙ্গে আমার যোগ আছে। আমি আর অজিত বসবার ঘরে থাকব; সুনীল আসার পর আপনি তাক্ বুঝে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।'

'সে ভাল কথা।' রমণীবাবু বীরেনকে লইয়া পাশের ঘরে গেলেন এবং দরজা ভেজাইয়া দিলেন। আমরা দু'জনে আসর সাজাইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

ক্রমে অন্ধকার হইল। আমি আলো জ্বালিয়া দিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ সকালবেলার সংবাদপত্রটা তুলিয়া লইয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। আমি সিগারেট ধরাইলাম। কান দু'টা অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া রহিল।

সাতটা বাজিবার কয়েক মিনিট আগেই ডাকবাংলোর সদরে একটি মোটর আসিয়া থামার শব্দ শোনা গেল; আমরা দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। মিনিট দুই-তিন পরে সুনীল সরকার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রমণীবাবু যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহার সহিত বিশেষ গরমিল নাই; উপরন্তু লক্ষ্য করিলাম, তাহার বিভক্ত ওষ্ঠাধরের ফাঁকে দাঁতগুলা কুমীরের দাঁতের মত হিংস্র। ভোঁতা মুখে ধারালো দাঁত। সব মিলাইয়া চেহারাটি নয়নরঞ্জন নয়। তার উপর দুশ্চরিত্র। পতিভক্তিতে রেবা হয়তো সীতা-সাবিত্রীর সমতুল্য ছিল না, কিন্তু সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। সুনীল সরকার স্পষ্টতই রাম কিংবা সত্যবানের সমকক্ষ নয়।

সুনীল বোকার মত কিছুক্ষণ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু—'

ব্যোমকেশ খবরের কাগজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিল, ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, 'সুনীলবাবু? আসুন।'

ন্যালা-ক্যাবলার মত ফ্যালফেলে মুখের ভাব লইয়া সুনীল টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; কে বলিবে তাহার ঘটে গোবর ছাড়া আর কিছু আছে! ব্যোমকেশ শুষ্ক কঠিন দৃষ্টিতে তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আপনার অভিনয় ভালই হচ্ছে, কিন্তু যতটা অভিনয় করছেন ততটা নির্বোধ আপনি নন। বসুন।'

সুনীল খপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল, সুবর্তুল চক্ষে ব্যোমকেশকে পরিদর্শন করিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, 'কী—কী বলছেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছু না। আপনি যখন বোকামির অভিনয় করবেনই তখন ও আলোচনায় লাভ নেই।—সুনীলবাবু, পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পাবার জন্যে আপনি দু'টো মানুষকে খুন করেছেন; এক, আপনার স্ত্রী; দুই, হুকুম সিং। এখানে এসে আমি সব খবর নিয়েছি। আপনি হুকুম সিংকে দিয়ে স্ত্রীকে খুন করিয়েছিলেন, তারপর নিজের হাতে হুকুম সিংকে মেরেছিলেন। হুকুম সিং ছিল আপনার ষড়যন্ত্রের অংশীদার, তাই তাকে সরানো দরকার ছিল; সে বেঁচে থাকলে সারাজীবন ধরে আপনাকে দোহন করত। আপনি এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছেন।'

সুনীল হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, হাউমাউ করিয়া উঠিল, 'এ কি বলছেন

আপনি! রেবাকে আমি মেরেছি! এ কি বলছেন! একটা গুণ্ডা—যার নাম হুকুম সিং—সে আমার স্ত্রীকে গলা টিপে মেরেছিল। আন্না দেখেছে—আন্না নিজের চোখে দেখেছে হুকুম সিং রেবাকে গলা টিপে মারছে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুকুম সিং ভাড়াটে গুণ্ডা, তাকে আপনি টাকা খাইয়েছিলেন।'

'না না, এসব মিথ্যে কথা। রেবাকে আমি খুন করাইনি; সে আমার স্ত্রী, আমি তাকে ভালবাসতাম—'

'আপনি রেবাকে কি রকম ভালবাসতেন, তার প্রমাণ আমার পকেটে আছে -' বলিয়া ব্যোমকেশ নিজের বুক-পকেটে আঙুলের টোকা মারিল।

'কী? রেবার চিঠি? দেখি কী চিঠি রেবা আপনাকে লিখেছিল!'

ব্যোমকেশ চিঠি বাহির করিয়া সুনীলের হাতে দিতে দিতে বলিল, 'চিঠি ছিঁড়বেন না। ওর ফটো-স্ট্যাট্ নকল আছে।'

সুনীল তাহার সতর্ক-বাণী শুনিতে পাইল না, চিঠি খুলিয়া দু'হাতে ধরিয়া একাগ্রচক্ষে পড়িতে লাগিল।

এই সময় নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া রমণীবাবু ব্যোমকেশের চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হইল; ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া সুনীল যখন চোখ তুলিল তখন প্রথমেই তাহার দৃষ্টি পড়িল রমণীবাবুর উপর। পলকের মধ্যে তাহার মুখ হইতে নির্বুদ্ধিতার মুখোস খসিয়া পড়িল। ভোঁতা মুখে ধারালো দাঁত নিষ্ক্রান্ত করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'ও—এই ব্যাপার! পুলিসের ষড়যন্ত্র! আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা। - ব্যোমকেশবাবু, রেবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে জানেন? ঐ রমণী দারোগা!' বলিয়া রমণীবাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

আমরা সুনীলের দিক হইতে পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, ব্যোমকেশ সবিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'রমণীবাবু দায়ী। তার মানে?'

সুনীল বলিল, 'মানে বুঝলেন না? রমণী দারোগা রেবার প্রাণের বন্ধু ছিল যাকে বলে বঁধু। তাই তো আমার ওপর রমণী দারোগার এত আক্রোশ!'

ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। আমি রমণীবাবুর মুখের পানে তাকাইলাম। তিনি একদৃষ্টে সুনীলের পানে চাহিয়া আছেন, মনে হয় তাঁহার সমস্ত দেহ তপ্ত লোহার মত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভয় হইল এখনি বুঝি একটা অগ্নিকাণ্ড হইয়া যাইবে।

ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে বলিল, 'তাহলে এই কারণেই আপনি স্ত্রীকে খুন করিয়েছেন?'

সুনীল বলিল, 'আমি খুন করাইনি। এই জাল চিঠি দিয়ে আমাকে ধরবেন ভেবেছিলেন!' সুনীল চিঠিখানা মুঠির মধ্যে গোলা পাকাইয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল—'সুনীল সরকারকে ধরা অত সহজ নয়। চললাম। যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে গ্রেপ্তার করুন, তারপর আমি দেখে নেব।'

আমরা নির্বাক বসিয়া রহিলাম, সুনীল ময়াল সাপের মত সর্পিল গতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই কয়েক মুহূর্তে সুনীলের চরিত্র যেন চোখের সামনে মূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইল। সাপের মত খল কপট নৃশংস, হঠাৎ ফণা তুলিয়া ছোবল মারে, আবার

গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। সাংঘাতিক মানুষ।

রমণীবাবু একটা অতিদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশ কতকটা নিজ মনেই বলিল, 'ধরা গেল না।'

সহসা বাহির হইতে একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ আসিল। সকলে চমকিয়া উঠিলাম। সর্বাগ্রে ব্যোমকেশ উঠিয়া দ্বারের পানে চলিল, আমরা তাহার পিছন পিছন চলিলাম।

ডাকবাংলোর সামনে সুনীলের মোটর দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার সামনের চাকার পাশে মাটির উপর যে মূর্তিটা পড়িয়া আছে তাহা সুনীলের। তাহার পিঠের উপর হইতে একটি ছুরির মুঠ উঁচু হইয়া আছে।

মৃত্যু যন্ত্রণায় সুনীল কাৎ হইবার চেষ্টা করিল, আমি ও ব্যোমকেশ তাহাকে সাহায্য করিলাম বটে, কিন্তু অন্তিমকালে আমাদের সাহায্য কোনও কাজে আসিল না। সুনীল একবার চোখ মেলিল, আমাদের চিনিতে পারিল কিনা বলা যায় না, কেবল অস্ফুট স্বরে বলিল, 'মুকুন্দ সিং—'

তারপর তাহার হৃৎস্পন্দন থামিয়া গেল।

পথের সামনে ও পিছন দিকে তাকাইলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, পথ জনশূন্য। আমার বিবশ মস্তিষ্কে একটা প্রশ্ন ঘুরিতে লাগিল—মুকুন্দ সিং কে? নামটা চেনা-চেনা। তারপর মনে পড়িয়া গেল, হুকুম সিংএর ভাইএর নাম মুকুন্দ সিং। মুকুন্দ সিং ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছে।

লাশ চালান দেওয়া এবং আইনঘটিত অন্যান্য কর্তব্য শেষ করিতে সাড়ে ন'টা বাজিয়া গেল। আমরা ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। রমণীবাবুও ক্লান্তমুখে আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসিলেন। বীরেন তখনও পাশের ঘরে যন্ত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, রমণীবাবু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি যাও, যন্ত্রটা থাক। আমি নিয়ে যাব।'

বীরেন চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ তিনজনে সিগারেট টানিলাম। তারপর ব্যোমকেশ বলিল, 'সুনীল আইনকে ফাঁকি দিয়েছিল বটে কিন্তু নিয়তির হাত এড়াতে পারল না। আশ্চর্য! মাঝে মাঝে গুণ্ডারাও অনেক নৈতিক সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে।'

রমণীবাবু বলিলেন, 'একটা সমস্যার সমাধান হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সমস্যা তৈরি হল। এখন মুকুন্দ সিংকে ধরতে হবে। আমার কাজ শেষ হল না, ব্যোমকেশবাবু।'

কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানিবার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'সুনীলের অভিযোগ সত্যি—কেমন?'

রমণীবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। আমার আর রেবার বাড়ি এক শহরে, এক পাড়ায়। ওকে ছেলেবেলা থেকে চিনতাম, কিন্তু ভালবাসা-বাসি ছিল না। তারপর রেবার যখন ওই রাক্ষসটার সঙ্গে বিয়ে হল তখন এই শহরেই ওর সঙ্গে আবার দেখা হল...রেবা মন্দ ছিল না, কিন্তু কি জানি কেমন করে কী হয়ে গেল। সুনীল যে জানতে পেরেছে তা একবারও সন্দেহ হয়নি...সুনীলকে আহাম্মক ভেবেছিলাম, তারপর রেবা যখন মারা গেল তখন বুঝলাম সুনীল

কেউটে সাপ...তাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করেছিলাম...শেষে আপনি এলেন, আপনার সাহায্যে শেষ চেষ্টা করলাম—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যে চিঠির ছেঁড়া অংশটা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন সেটা রেবা আপনাকে লিখেছিল?'

রমণীবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। আমাদের দেখাশোনা বেশী হত না। রেবা আমাকে চিঠি লিখত, মনের-প্রাণের কথা লিখত। অনেক চিঠি লিখেছিল।—কিন্তু রেবার কথা আর নয়, ব্যোমকেশবাবু। এখন বলুন টেপ্-রেকর্ডের কী হবে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি আর হবে, ওটা মুছে ফেলা যাক।—আসুন।'

পাশের ঘরে গিয়া আমরা রেকর্ডার চালাইলাম। সদ্যমৃত সুনীলের জীবন্ত কণ্ঠস্বর শুনিলাম। তারপর ফিতা মুছিয়া ফেলা হইল।

খুঁজি খুঁজি নারি

রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে ব্যোমকেশের পরিচয় প্রায় পনরো বছরের। কিন্তু এই পনরো বছরের মধ্যে তাঁহাকে পনরো বার দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। শেষের পাঁচ-ছয় বছর একেবারেই দেখি নাই। কিন্তু তিনি যে আমাদের ভোলেন নাই তাহার প্রমাণ বছরে দুইবার পাইতাম। প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখ ও বিজয়ার দিন তিনি ব্যোমকেশকে নিয়মিত পত্রাঘাত করিতেন।

রামেশ্বরবাবু বড়মানুষ ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার আট-দশখানা বাড়ি ছিল, তাছাড়া নগদ টাকাও ছিল অপর্যাপ্ত; বাড়িগুলির ভাড়া হইতে যে আয় হইত তাহার অধিকাংশই জমা হইত। সংসারে তাঁহার আপনার জন ছিল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কুমুদিনী, প্রথম পক্ষের পুত্র কুশেশ্বর ও কন্যা নলিনী। সর্বোপরি ছিল তাঁহার অফুরন্ত হাস্যরসের প্রবাহ।

রামেশ্বরবাবু হাস্যরসিক ছিলেন। তিনি যেমন প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিতেন তেমনি হাসাইতেও পারিতেন। আমি জীবনব্যাপী বহুদর্শনের ফলে একটি প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলাম যে, যাহাদের প্রাণে হাস্যরস আছে তাহারা কখনও বড়লোক হইতে পারে না, মা লক্ষ্মী কেবল প্যাঁচাদেরই ভালোবাসেন। রামেশ্বরবাবু আমার আবিষ্কৃত এই নিয়মটিকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। অন্ততঃ নিয়মটি যে সার্বজনীন নয় তাহা অনুভব করিয়াছিলাম।

রামেশ্বরবাবুর আর একটি মহৎ গুণ ছিল, তিনি একবার যাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতেন তাহাকে কখনও মন হইতে সরাইয়া দিতেন না। ব্যোমকেশের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল তাঁহার বাড়িতে চৌর্য-ঘটিত সামান্য একটি ব্যাপার লইয়া। ব্যাপারটি কৌতুকপ্রদ প্রহসনে সমাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তদবধি তিনি ব্যোমকেশকে সস্নেহে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কয়েকবার তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণও খাইয়াছি। তিনি আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন, শেষ বরাবর তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু হাস্যরস যে তিলমাত্র প্রশমিত হয় নাই তাহা তাঁহার ষান্মাসিক পত্র হইতে জানিতে পারিতাম।

আজ রামেশ্বরবাবুর অন্তিম রসিকতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল কয়েক বছর আগে; তখনও আইন করিয়া পিতৃ-সম্পত্তিতে কন্যার সমান অধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

সেবার পয়লা বৈশাখ অপরাহ্ণের ডাকে রামেশ্বরবাবুর চিঠি আসিল। পুরু অ্যান্টিক কাগজের খাম, পরিচ্ছন্ন অক্ষরে নাম-ধাম লেখা। খামটি হাতে লইতেই ব্যোমকেশের মুখে হাসি ফুটিল। লক্ষ্য করিয়াছি রামেশ্বরবাবুকে মনে পড়িলেই মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়া ওঠে। ব্যোমকেশ সস্নেহে খামটি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'অজিত, রামেশ্বরবাবুর বয়স কত আন্দাজ করতে পারো?'

বলিলাম, 'নব্বুই হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অত না হলেও আশি নিশ্চয়। এখনো কিন্তু ভীমরতি ধরেনি। হাতের লেখাও বেশ স্পষ্ট আছে।'

সন্তর্পণে খাম কাটিয়া সে চিঠি বাহির করিল। দু-ভাঁজ করা তকতকে দামী কাগজ, মাথায় মনোগ্রাম ছাপা। গোটা গোটা অক্ষরে জরার চিহ্ন নাই। রামেশ্বরবাবু লিখিয়াছেন—

বুদ্ধিসাগরেষু,

ব্যোমকেশবাবু, আপনি ও অজিতবাবু আমার নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন। আপনার বুদ্ধি দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় পরিবর্ধিত হোক; অজিতবাবুর লেখনী ময়ূরপুচ্ছে পরিণত হোক!

আমি এবার চলিলাম। যমরাজের সমন আসিয়ছে, শীঘ্রই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আসিবে। কিন্তু 'থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়?' যমদূতেরা আমাকে ধরিবার পূর্বেই আমি বৈকুণ্ঠে গিয়া পৌঁছিব। কেবল এই দুঃখ আগামী বিজয়ার দিন আপনাদের স্নেহাশিস জানাইতে পারিব না।

মৃত্যুর পূর্বে বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনি দেখিবেন, আমার শেষ ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। আপনার বুদ্ধির উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে।

বিদায়। আমার এই চিঠিখানির প্রতি অবজ্ঞা দেখাইবেন না। আপনি পাঁচ হাজার টাকা পাইলেন কিনা তাহা আমি বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্য কবিব।

পুনরাগমনায় চ।

-শ্রীবামেশ্বব রায়।

চিঠি পড়িয়া ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। আমিও চিঠি পড়িলাম। নিজের মৃত্যু লইয়া পরিহাস হয়তো তাহার চরিত্রানুগ, কিন্তু চিঠির শেষের দিকে যে-সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার অর্থবোধ হইল না। আমাব শেষ ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়...কোন্ ইচ্ছা? আমরা তো তাঁহার কোনও শেষ ইচ্ছার কথা জানি না, চিঠিতে কিছু লেখা নাই। তারপর—পাঁচ হাজাব টাকা পাইলেন কিনা...কোন্ পাঁচ হাজার টাকা? ইহা কি রামেশ্বরবাবুর নূতন ধরনের রসিকতা, কিংবা এতদিনে সত্যই তাঁহার ভীমরতি ধরিয়াছে!

ব্যোমকেশ হঠাৎ বলিল, 'চল, কাল সকালে রামেশ্বরবাবুকে দেখে আসা যাক। কোন্‌দিন আছেন কোন্‌দিন নেই।'

বলিলাম, 'বেশ চল। চিঠি পড়ে তোমার কি মনে হয না যে রামেশ্ববববাবুর ভীমরতি ধরেছে?'

ব্যোমকেশ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'পিতামহ ভীষ্মের কি ভীমরতি ধরেছিল?'

সম্প্রতি ব্যোমকেশ রামায়ণ মহাভারত পড়িতে আরম্ভ কবিয়াছে, হাতে কাজ না থাকিলেই মহাকাব্য লইয়া বসে। ইহা তাহাব বয়সোচিত ধর্মভাব অথবা কাব্য সাহিত্যের মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা বলিতে পারি না। অন্য মতলবও থাকিতে পারে। তবে মাঝে মাঝে তাহার কথাবার্তায় রামায়ণ মহাভারতের গন্ধ পাওয়া যায়।

বলিলাম, 'রামেশ্বরবাবু কি পিতামহ ভীষ্ম?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খানিকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু রামায়ণের দশরথের সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশি।'

বলিলাম, 'দশরথের তো ভীমরতি ধরেছিল।'

সে বলিল, 'হয়তো ধরেছিল। সেটা বয়সের দোষে নয়, স্বভাবের দোষে। কিন্তু রামেশ্বরবাবু যদি একশো বছর বেঁচে থাকেন ও'র ভীমরতি ধরবে না।'

রামেশ্বরবাবুর পারিবারিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সংক্ষিপ্ত। কলিকাতার উত্তরাংশে নিজের একটি বাড়িতে থাকেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কুমুদিনীর বয়স এখন বোধ করি পঞ্চাশোর্ধ্বে, তিনি নিঃসন্তান। প্রথম পক্ষের পুত্রের নাম সম্ভবত রামেশ্বরবাবু নিজের নামের সহিত মিলাইয়া কুশেশ্বর রাখিয়াছিলেন। কুশেশ্বরের বয়সও পঞ্চাশের কম নয়, মাথার কিয়দংশে পাকা চুল, কিয়দংশে টাক। সে বিবাহিত, কিন্তু সন্তান-সন্ততি আছে কিনা বলিতে পারি না। তাহাকে দেখিলে মেরুদণ্ডহীন অসহায় গোছের মানুষ বলিয়া মনে হয়। তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী নলিনী শুনিয়াছি প্রেমে পড়িয়া একজনকে বিবাহ করিয়াছিল, তাহার সহিত রামেশ্বরবাবুর কোনও সম্পর্ক নাই। মোট কথা তাঁহার পরিবার খুব বড় নয়, সুতরাং অশান্তির অবকাশ কম। তাঁহার অগাধ টাকা, প্রাণে অফুরন্ত হাস্যরস। তবু সন্দেহ হয় তাঁহার পারিবারিক জীবন সুখের নয়।

পরদিন বেলা ন'টার সময় রামেশ্বরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম।

বাড়িটা সরু লম্বা গোছের; দ্বারের সামনে মোটর দাঁড়াইয়া আছে। আমরা বন্ধ দ্বারের কড়া নাড়িলাম।

অল্পক্ষণ পরে দ্বার খুলিলেন একটি মহিলা। তিনি বোধ হয় অন্য কাহাকেও প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাই আমাদের দেখিয়া তাঁহার কলহোদ্যত প্রখর দৃষ্টি নরম হইল; মাথায় একটু আঁচল টানিয়া দিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, 'কাকে চান?'

রামেশ্বরবাবুর বাড়ির দু'টি স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ না থাকিলেও তাঁহাদের দেখিয়াছি। ইনি কুশেশ্বরের স্ত্রী; দৃঢ়গঠিত বেঁটে মজবুত চেহারা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী, রামেশ্বর-বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

মহিলার চোয়ালের হাড় শক্ত হইল; তিনি বোধ করি দ্বার হইতেই আমাদের বিদায় বাণী শুনাইবার জন্য মুখ খুলিয়াছিলেন, এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেল। মহিলাটি একবার চোখ তুলিয়া সিঁড়ির দিকে চাহিলেন, তারপর দ্বার হইতে অপসৃত হইয়া পিছনের একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরটি নিশ্চয় রান্নাঘর, কারণ সেখান হইতে হাতা-বেড়ির শব্দ আসিতেছে।

সিঁড়ি দিয়া দু'টি লোক নামিয়া আসিলেন, একজন কুশেশ্বর, দ্বিতীয় ব্যক্তি বিলাতী বেশধারী প্রবীণ ডাক্তার। দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ডাক্তার বলিলেন, 'উপস্থিত ভয়ের কিছু দেখছি না। যদি দরকার মনে কর, ফোন কোরো।'

ডাক্তার মোটরে গিয়া উঠিলেন, মোটর চলিয়া গেল। আমরা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি, কুশেশ্বর এতক্ষণ তাহা লক্ষ্য করে নাই, এখন ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইল। তাহার টাক একটু বিস্তীর্ণ হইয়াছে, অবশিষ্ট চুল আর একটু পাকিয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাদের বোধ হয় চিনতে পারছেন না, আমি ব্যোমকেশ বক্সী। আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

কুশেশ্বর বিহ্বল হইয়া বলিল, 'ব্যোমকেশ বক্সী! ও—তা—হ্যাঁ, চিনেছি বৈকি। বাবার শরীর ভাল নয়—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি হয়েছে?'

কুশেশ্বর বলিল, 'কাল রাত্রে হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাক্ হয়েছিল। এখন সামলেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন? তা—তিনি তেতলার ঘরে আছেন—'

এই সময় রান্নাঘরের দিক হইতে উচ্চ ঠক্‌ঠক্ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। কড়া আওয়াজ; আমরা তিনজনেই সেইদিকে তাকাইলাম; রান্নাঘরের ভিতর হইতে একটি অদৃশ্য হস্ত কপাটের উপর সাঁড়াশি দিয়া আঘাত করিতেছে। কুশেশ্বরের দিকে চাহিয়া দেখি তাহার মুখের ভাব বদলাইয়া গিয়াছে। সে কাশিয়া গলা সাফ করিয়া বলিল, 'বাবার সঙ্গে তো দেখা হতে পারে না. তাঁর শরীর খুব খারাপ—ডাক্তার এসেছিলেন—'

ওদিকে ঠক্‌ঠক্ শব্দ তখন থামিয়াছে। ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া বলিল, 'বুঝেছি। ডাক্তারবাবুর নাম কি?'

কুশেশ্বর আবার উৎসাহিত হইয়া বলিল. 'ডাক্তার অসীম সেন! চেনেন না? মস্ত হার্ট স্পেশালিস্ট।'

'চিনি না, কিন্তু নাম জানি। বিবেকানন্দ রোডে ডিসপেন্সারি।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না?'

'মানে—ডাক্তারের হুকুম নেই—' কুশেশ্বর একবার আড়চোখে রান্নাঘরের পানে তাকাইল।

'কত দিন থেকে ও'র শরীর খারাপ যাচ্ছে?'

'শরীর তো এক রকম ভালই ছিল; তবে অনেক বয়স হয়েছে, বেশি নড়াচড়া করতে পারেন না, নিজের ঘরেই থাকেন। কাল সকালে অনেকগুলো চিঠি লিখলেন, তারপর রাত্তিরে হঠাৎ—'

রান্নাঘরের দ্বারে অধীর সাঁড়াশির শব্দ হইল; কুশেশ্বর অর্ধপথে থামিয়া গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'টরে-টক্কা! আপনার স্ত্রী বোধ হয় রাগ করছেন।—চললাম, নমস্কার।'

ফুটপাথে নামিয়া পিছন ফিরিয়া দেখি সদর দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বিমনাভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, 'ডাক্তার অসীম সেনের ডিসপেন্সারি বেশি দূর নয়। চল, তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাই।'

ভাগ্যক্রমে ডাক্তার সেন ডিসপেন্সারিতে ছিলেন. তিন-চারটি রোগীও ছিল। ব্যোমকেশ চিরকুটে নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিল। ডাক্তার সেন বলিয়া পাঠাইলেন—একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।

আধ ঘণ্টা পরে রোগীদের বিদায় করিয়া ডাক্তার সেন আমাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমরা তাঁহার খাস কামরায় উপনীত হইলাম। ডাক্তারি যন্ত্রপাতি দিয়া সাজানো বড় ঘরের মাঝখানে বড় একটি টেবিলের সামনে ডাক্তার বসিয়া আছেন. ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনিই ব্যোমকেশবাবু? আজ রামেশ্বরবাবুর বাড়ির সদরে আপনাদের দেখেছি না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। আমরা কিন্তু হৃদযন্ত্র পরীক্ষা করাবার জন্যে আসি নি, অন্য একটু কাজ আছে। আমার পরিচয়—'

ডাক্তার সেন হাসিয়া বলিলেন, 'পরিচয় দিতে হবে না। বসুন। কি দরকার বলুন।'

আমরা ডাক্তার সেনের মুখোমুখি চেয়ারে বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'রামেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। কাল তাঁর নববর্ষের শুভেচ্ছা-পত্র পেলাম, তাতে তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না এমনি একটা সংশয় জানিয়েছিলেন; তাই আজ সকালে তাঁকে দেখতে এসেছিলাম। এসে শুনলাম, রাত্রে তাঁর হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পেলাম না, তাই আপনার কাছে এসেছি তাঁর খবর জানতে। আপনি কি রামেশ্বরবাবুর ফ্যামিলি ডাক্তার?'

ডাক্তার সেন বলিলেন, 'পারিবারিক বন্ধু বলতে পারেন। ত্রিশ বছর ধরে আমি ওঁকে দেখছি। ওঁর হৃদ্‌যন্ত্র খুব সবল নয়, বয়সও হয়েছে প্রচুর। মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প কষ্ট পাচ্ছিলেন; তারপর কাল হঠাৎ গুরুতর রকমের বাড়াবাড়ি হল। যা হোক এখন সামলে গেছেন।'

'উপস্থিত তাহলে মৃত্যুর আশঙ্কা নেই?'

'তা বলতে পারি না। এ ধরনের রুগীর কথা কিছুই বলা যায় না, দু' বছর বেঁচে থাকতে পারেন, আবার আজই দ্বিতীয় অ্যাটাক হতে পারে। তখন বাঁচা শক্ত।'

'ডাক্তারবাবু, আপনার কি মনে হয় রামেশ্বরবাবুর যথারীতি সেবা-শুশ্রূষা হচ্ছে?'

ডাক্তার কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, 'আপনি যা ইঙ্গিত করছেন তা আমি বুঝেছি। এরকম ইঙ্গিতের সঙ্গত কারণ আছে কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি রামেশ্বরবাবুকেই চিনি, ওঁর পরিবারের অন্য কাউকে সেভাবে চিনি না। কিন্তু আজ দেখেশুনে আমার সন্দেহ হল, ওঁরা বাইরের লোককে রামেশ্বরবাবুর কাছে ঘেঁষতে দিতে চান না।'

ডাক্তার বলিলেন, 'তা ঠিক। আপনি রামেশ্বরবাবুর ফ্যামিলিকে ভালভাবে চেনেন না। কিন্তু আমি চিনি। আশ্চর্য ফ্যামিলি। কারুর মাথার ঠিক নেই। রামেশ্বরবাবুর স্ত্রী কুমুদিনীর বয়স ষাট, অথর্ব মোটা হয়ে পড়েছেন; কিন্তু এখনো পুতুল নিয়ে খেলা করেন, সংসারের কিছু দেখেন না। কুশেশ্বরটা ক্যাবলা, স্ত্রীর কথায় ওঠে-বসে। একমাত্র কুশেশ্বরের স্ত্রী লাবণ্যর হুঁশ-পর্ব আছে, কাজেই অবস্থাগতিকে সে সংসারের কর্ণধার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'কিন্তু বাড়িতে চাকর-বামুন নেই কেন?'

'লাবণ্য চাকর-বাকর সহ্য করতে পারে না, তাই সবাইকে তাড়িয়েছে। নিজে রাঁধতে পারে না, তাই একটা হাবা-কালা বামনী রেখেছে, বাকি সব কাজ নিজে করে। কুশেশ্বরকে বাজারে পাঠায়।'

'কিন্তু কেন? এসবের একটা মানে থাকা চাই তো।'

ডাক্তার চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আমার বিশ্বাস এসবের মূলে আছে নলিনী।'

'নলিনী! রামেশ্বরবাবুর মেয়ে?'

'হ্যাঁ। অনেক দিনের কথা, আপনি হয়তো শোনেন নি। নলিনী বাড়ির সকলের মতের বিরুদ্ধে এক ছোকরাকে বিয়ে করেছিল, সেই থেকে তার ওপর সকলের আক্রোশ। সবচেয়ে বেশি আক্রোশ লাবণ্যর। রামেশ্বরবাবু প্রথমটা খুবই চটেছিলেন,

কিন্তু ক্রমে তাঁর রাগ পড়ে গেল। লাবণ্যর কিন্তু রাগ পড়ল না। সে নলিনীকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে চায় না, বাপের সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। পাছে রামেশ্বরবাবু চাকর-বাকরকে দিয়ে মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন তাই তাদের সরিয়েছে। রামেশ্বরবাবু বলতে গেলে নিজের বাড়িতে নজরবন্দী হয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হয় না।'

ব্যোমকেশ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, 'হুঁ, পরিস্থিতি কতকটা বুঝতে পারছি। আচ্ছা, রামেশ্বরবাবু উইল করেছেন কিনা আপনি বলতে পারেন?'

ডাক্তার সেন সচকিতে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন—'করেছেন। আমার বিশ্বাস তিনি উইল করে নলিনীকে সম্পত্তির অংশ দিয়ে গেছেন। আমি জানতাম না, কাল রাত্রে জানতে পেরেছি।'

'কি রকম?'

'কাল রাত্রি দশটার সময় রামেশ্বরবাবুর হার্ট-অ্যাটাক হয়; আমাকে ফোন করল, আমি গেলাম। ঘণ্টাখানেক পরে রামেশ্বরবাবু সামলে উঠলেন। তখন আমি সকলকে খেতে পাঠিয়ে দিলাম। রামেশ্বরবাবু চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকালেন, তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'ডাক্তার, আমি উইল করেছি। যদি পটল তুলি, নলিনীকে খবর দিও।' এই সময়ে লাবণ্য আবার ঘরে ঢুকলে আর কোন কথা হল না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'স্পষ্টই বোঝা যায় ওরা রামেশ্বরবাবুকে উইল করতে দিচ্ছে না, পাছে তিনি নলিনীকে সম্পত্তির অংশ লিখে দেন। উনি যদি উইল না করে মারা যান তাহলে সাধারণ উত্তরাধিকারের নিয়মে ছেলে আর স্ত্রী সম্পত্তি পাবে, মেয়ে কিছুই পাবে না—রামেশ্বরবাবুর বাঁধা উকিল কে?'

ডাক্তার সেন বলিলেন, 'বাঁধা উকিল কেউ আছে বলে তো শুনি নি।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল, 'আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। ভাল কথা, নলিনীর সাংসারিক অবস্থা কেমন?'

ডাক্তার বলিলেন, 'নেহাত ছা-পোষা গেরস্ত। ওর স্বামী দেবনাথ সামান্য চাকরি করে, তিন-চারশো টাকা মাইনে পায়। কিন্তু অনেকগুলি ছেলেপুলে—'

অতঃপর আমরা ডাক্তার সেনকে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া আসিলাম। রামেশ্বরবাবুর পারিবারিক জীবনের চিত্রটা আরও পূর্ণাঙ্গ হইল বটে, কিন্তু আনন্দদায়ক হইল না। বৃদ্ধ হাস্যরসিক, অন্তিমকালে সত্যই বিপাকে পড়িয়াছেন, অথচ তাঁহাকে সাহায্য করিবার উপায় নাই। ঘরের ঢেঁকি যদি কুমীর হয়, কে কি করিতে পারে?

দিন আষ্টেক পরে একদিন দেখিলাম, সংবাদপত্রের পিছন দিকের পাতার এক কোণে রামেশ্বরবাবুর মৃত্যু-সংবাদ বাহির হইয়াছে। তিনি খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার টাকা ছিল, তাই বোধ হয় তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ দৈনিক পত্রের পৃষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

ব্যোমকেশ খবরের কাগজে কেবল বিজ্ঞাপন পড়ে, তাই তাহাকে খবরটা দেখাইলাম। আজ রামেশ্বরবাবুর নামোল্লেখে তাহার মুখে হাসি ফুটিল না, সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর পাশের ঘরে গিয়া টেলিফোনে কাহার

সহিত কথা বলিল।

সে ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাকে?'

সে বলিল, 'ডাক্তার অসীম সেনকে, পরশ‍ু রাত্রে রামেশ্বরবাব‍ুর ম‍ৃত্যু হয়েছে। আবার হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল, ডাক্তার সেন উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না। ডাক্তার স্বাভাবিক ম‍ৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়েছেন।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার কি সন্দেহ ছিল যে—?'

সে বলিল, 'ঠিক সন্দেহ নয়। তবে কি জানো, এ রকম অবস্থায় একট‍ু অসাবধানতা, একট‍ু ইচ্ছাকৃত অবহেলা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। রামেশ্বরবাব‍ু মারা গেলে ওদের কার‍ুরই লোকসান নেই, বরং সকলেরই লাভ। এখন কথা হচ্ছে, তিনি যদি উইল করে গিয়ে থাকেন এবং তাতে নলিনীকে ভাগ দিয়ে থাকেন, তাহলে সে-উইল কি ওরা রাখবে? পেলেই ছি‍ঁড়ে ফেলে দেবে।'

সেদিন অপরাহ্নে নলিনী ও তাহার স্বামী দেবনাথ দেখা করিতে আসিল।

নলিনীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি; সন্তান-সৌভাগ্যের আধিক্যে শরীর কিছ‍ু কৃশ ,কিন্তু যৌবনের অস্তলীলা দেহ হইতে সম্প‍ূর্ণ ম‍ুছিয়া যায় নাই। দেবনাথের বয়স আন্দাজ প‍ঁয়তাল্লিশ; এককালে স‍ুশ্রী ছিল, হাত তুলিয়া আমাদের নমস্কার করিল।

নলিনী সজলচক্ষে বলিল, 'বাবা মারা গেছেন। তাঁর শেষ আদেশ আপনার সঙ্গে যেন দেখা করি। তাই এসেছি।'

ব্যোমকেশ তাহাদের সমাদর করিয়া বসাইল। সকলে উপবিষ্ট হইলে বলিল, 'রামেশ্বরবাব‍ুর শেষ আদেশ কবে পেয়েছেন?'

নলিনী বলিল, 'পয়লা বৈশাখ। এই দেখ‍ুন চিঠি।'

খামের উপর কলিকাতার অপেক্ষাকৃত দ‍ুর্গত অঞ্চলের ঠিকানা লেখা। চিঠিখানি ব্যোমকেশকে লিখিত চিঠির অন‍ুর‍ূপ সেই মনোগ্রাম করা কাগজ। চিঠি কিন্তু আরও সংক্ষিপ্ত—

তোমরা সকলে আমার নববর্ষের আশীর্বাদ লইও। যদি ভালমন্দ কিছ‍ু হয়, শ্রীয‍ুক্ত ব্যোমকেশ বক্সী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিও। ইতি -

শ‍ুভাকাঙ্খী
বাবা

পত্র রচনার ম‍ুন্সিয়ানা লক্ষণীয়। কুশেশ্বর ও লাবণ্য যদি চিঠি খ‍ুলিয়া পড়িয়া থাকে, সন্দেহজনক কিছ‍ু পায় নাই। 'ভালমন্দ কিছ‍ু হয়' ইহার নিগ‍ূঢ় অর্থ যে নিজের ম‍ৃত্যু সম্ভাবনা তাহা সহসা ধরা যায় না, সাধারণ বিপদ-আপদও হইতে পারে। তাই তাহারা চিঠি আটকায় নাই।

চিঠি ফেরত দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'শেষবার কবে রামেশ্বরবাব‍ুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

নলিনী বলিল, 'ছ-মাস আগে। প‍ুজোর পর বাবাকে প্রণাম করতে গিয়েছিল‍ুম সেই শেষ দেখা, তা বৌদি সারাক্ষণ কাছে দাঁড়িয়ে রইল, আড়ালে বাবার সঙ্গে একটা কথাও কইতে দিলে না।'

'বৌদির সঙ্গে আপনার সদ্ভাব নেই?'

'সদ্ভাব! বৌদি আমাকে পাঁশ পেড়ে কাটে।'

'কোন কারণ আছে কি?'

'কারণ আর কি! ননদ-ভাজ এই কারণ। বৌদি বাঁজা, আমার মা ষষ্ঠীর কৃপায় ছেলেপুলে হয়েছে, এই কারণ।'

'ডাক্তার সেনের সঙ্গে সম্প্রতি আপনাদের দেখা হয়েছে?'

'সেন-কাকা কাল সকালে আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, বাবা নাকি উইল করে গিয়েছেন।'

'সেই উইল কোথায় আপনারা জানেন?'

'কি করে জানব? বাবাকে ওরা একরকম বন্দী করে রেখেছিল। বাবা অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন, তেতলায় নিজের ঘর ছেড়ে বেরুতে পারতেন না; ওরা যক্ষির মতন বাবাকে আগলে থাকত। বাবা যে সব চিঠি লিখতেন ওরা খুলে খুলে দেখত, যে-চিঠি ওদের পছন্দ নয় তা ছিঁড়ে ফেলে দিত। বাবা যদি উইল করেও থাকেন তা কি আর আছে? বৌদি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'রামেশ্বরবাবু বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি যদি উইল করে গিয়ে থাকেন, নিশ্চয় এমন কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছেন যে সহজে কেউ খুঁজে পাবে না। এখন কাজ হচ্ছে ওরা সেটা খুঁজে পাবার আগে আমাদের খুঁজে বার করা।'

নলিনী সাগ্রহে বলিল, 'হ্যাঁ ব্যোমকেশবাবু। বাবা যদি উইল করে থাকেন নিশ্চয় আমাদের কিছু দিয়ে গেছেন, নৈলে উইল করার কোন মানে হয় না। কিন্তু এ অবস্থায় কি করতে হয় আমরা কিছুই জানি না—' নলিনী কাতব নেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিল।

এই সময় দেবনাথ গলা খাঁকারি দিয়া সর্বপ্রথম কিছু বলিবার উপক্রম করিল। ব্যোমকেশ তাহার দিকে চক্ষু ফিরাইলে সে একটু অপ্রতিভভাবে বলিল, 'একটা কথা মনে হল। শুনেছি উইল করলে দু'জন সাক্ষীর দস্তখত দরকার হয়। কিন্তু আমার শ্বশুর দু'জন সাক্ষী কোথায় পাবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাব কথা যথার্থ; কিন্তু একটা ব্যতিক্রম আছে। যিনি উইল করেছেন তিনি যদি নিজের হাতে আগাগোড়া উইলটা লেখেন তাহলে সাক্ষীর দরকার হয় না।'

নলিনী উজ্জ্বল চোখে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, 'শুনলে? এই জন্যে বাবা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।—ব্যোমকেশবাবু, আপনি একটা উপায় করুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চেষ্টা করব। উইল বাড়িতেই আছে, বাড়ি সার্চ করতে হবে। কিন্তু ওরা যাকে-তাকে বাড়ি সার্চ করতে দেবে কেন? পুলিসের সাহায্য নিতে হবে। ডাক্তার অসীম সেনকেও দরকার হবে। দু-চার দিন সময় লাগবে। আপনারা বাড়ি যান, যা করবার আমি করছি। উইলের অস্তিত্ব যদি থাকে, আমি খুঁজে বার করব।'

ব্যোমকেশ যখন সরকারী মহলে দেখাশুনা করিতে যাইত, আমাকে সঙ্গে লইত না। আমারও সরকারী অফিসের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালো লাগিত না।

দুই দিন ব্যোমকেশ কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইল জানি না। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'সব ঠিক হয়ে গেছে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী ঠিক হয়ে গেছে?'

সে বলিল, 'খানা-তল্লাশের পরোয়ানা পাওয়া গেছে। কাল সকালে পুলিস সঙ্গে নিয়ে আমরা রামেশ্বরবাবুর বাড়ি সার্চ করতে যাব।'

পরদিন সকালবেলা আমরা রামেশ্বরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে পাঁচ-ছয় জন পুলিসের লোক এবং ইন্‌সপেক্টর হালদার নামক জনৈক অফিসার।

কুশেশ্বর প্রথমটা একটু লম্ফঝম্প করিল, তাহার স্ত্রী লাবণ্য আমাদের নয়ন-বহ্নিতে ভস্ম করিবার নিস্ফল চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ইন্‌সপেক্টর হালদার তাহাদের এবং বিধবা কুমুদিনীকে একজন পুলিসের জিম্মায় রান্নাঘরে বসাইয়া তল্লাশ আরম্ভ করিলেন। ত্রিতল বাড়ির কোনও তলই বাদ দেওয়া হইল না; দুইজন নীচের তলা তল্লাশ করিল, দুইজন দ্বিতলে কুশেশ্বর ও লাবণ্যর ঘরগুলি অনুসন্ধানের ভার লইল, ব্যোমকেশ, ইন্‌সপেক্টর হালদার ও আমি তিন তলায় গেলাম। রামেশ্বরবাবু তিন তলায় থাকিতেন, সুতরাং সেখানেই উইল পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশি।

দুইটি ঘর লইয়া তিনতলা। ছোট ঘরটি গৃহিণীর শয়নকক্ষ, বড় ঘরটি একাধারে রামেশ্বরবাবুর শয়নকক্ষ এবং অফিস-ঘর। এক পাশে তাঁহার শয়নের পালঙ্ক, অন্য পাশে টেবিল চেয়ার বইয়ের আলমারি প্রভৃতি। এই ঘর হইতে একটি সরু দরজা দিয়া স্নানের ঘরে যাইবার রাস্তা।

আমরা তল্লাশ আরম্ভ করিলাম। তল্লাশের বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন নাই। দুইটি ঘরের বহু আসবাব, খাট বিছানা টেবিল চেয়ার আলমারির ভিতর হইতে এক টুকরা কাগজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, সুতরাং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই তল্লাশ করা হইল। তল্লাশ করিতে করিতে একটি তথ্য আবিষ্কার করিলাম: আমাদের পূর্বে আর একদফা তল্লাশ হইয়া গিয়াছে। কুশেশ্বর এবং তাহার স্ত্রী উইলের খোঁজ করিয়াছে।

ব্যোমকেশ আমার কথা শুনিয়া বলিল, 'হুঁ। এখন কথা হচ্ছে ওরা খুঁজে পেয়েছে কিনা।'

আড়াই ঘণ্টা পরে আমরা ক্লান্তভাবে টেবিলের কাছে আসিয়া বসিলাম। টেবিলের এক পাশে একটি পিতলের ছোট্ট হামানদিস্তা ছিল, রামেশ্বরবাবু তাহাতে পান ছেঁচিয়া খাইতেন; ব্যোমকেশ সেটা সামনে টানিয়া আনিয়া অন্য-মনস্কভাবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। ইতিপূর্বে, নিম্নতলে যাহারা তল্লাশ করিতেছিল তাহারা জানাইয়া গিয়াছে সে সেখানে কিছু পাওয়া যায় নাই।

ইন্‌সপেক্টর হালদার বলিল, 'তেতলায় নেই। তার মানে রামেশ্বরবাবু উইল করেন নি, কিংবা ওরা আগেই উইল খুঁজে পেয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উইল করা সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু—'

এই সময় ইন্‌সপেক্টর হালদার অলস হস্তে গঁদের শিশির ঢাকনা তুলিলেন।

টেবিলের উপর কাগজ কলম লেফাফা পিন-কুশন গঁদের শিশি প্রভৃতি সাজানো ছিল, আমরা পূর্বেই টেবিল ও তাহার দেরাজগুলি খুঁজিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু গঁদের শিশির ঢাকনা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে

আসিয়া লাগিল।

কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ!

ব্যোমকেশ খাড়া হইয়া বসিল, 'কিসের গন্ধ! কাঁচা পেঁয়াজ! দেখি।'

গঁদের শিশি কাছে টানিয়া লইয়া সে গভীরভাবে তাহার ঘ্রাণ লইল। শিশি কাত করিয়া দেখিল, ভিতরে গাঢ় শ্বেতাভ পদার্থ দেখিয়া গঁদের আঠা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাহাতে পেঁয়াজের গন্ধ কেন? কোথা হইতে পেঁয়াজ আসিল?

গঁদের শিশি হাতে লইয়া ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নিশ্চল বসিয়া রহিল। নিশ্চলতার অন্তরালে প্রচণ্ড মানসিক ক্রিয়া চলিতেছে তাহা তাহার চোখের তীব্র-প্রখর দৃষ্টি হইতে অনুমান করা যায়। আমি ইন্সপেক্টর হালদারের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। পেঁয়াজ-গন্ধী গঁদের শিশির মধ্যে ব্যোমকেশ কোন্ রহস্যের সন্ধান পাইল!

'ইন্সপেক্টর হালদার, দয়া করে একবার কুশেশ্বরের স্ত্রীকে ডেকে আনবেন?'

অল্পক্ষণ পরে লাবণ্য প্রতি পদক্ষেপে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিল। ব্যোমকেশ উঠিয়া নিজের চেয়ার নির্দেশ করিয়া বলিল, 'বসুন। আপনাকে একটা প্রশ্ন করব।'

লাবণ্য উপবেশন করিল। তাহার চোয়ালের হাড় শক্ত, চক্ষে কঠিন সন্দিগ্ধতা। তিনজন অপরিচিত পুরুষ দেখিয়াও তাহার দৃষ্টি নরম হইল না।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আপনার শ্বশুর মশায় কি কাঁচা পেঁয়াজ খেতে ভালোবাসতেন?'

লাবণ্য চকিতভাবে ব্যোমকেশের পানে চাহিল, তাহার মুখের বিদ্রোহ অনেকটা প্রশমিত হইল। সে বলিল, 'ভালোবাসতেন না, কিন্তু যাবার কিছুদিন আগে কাঁচা পেঁয়াজের ওপর লোভ হয়েছিল। ভীমরতির অবস্থা হয়েছিল, তার ওপর একটিও দাঁত ছিল না: হামানদিস্তায় পেঁয়াজ ছেঁচে তাই খেতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ও। মৃত্যুর কতদিন আগে পেঁয়াজের বাতিক হয়েছিল?'

লাবণ্য ভাবিয়া বলিল, 'দশ-বারো দিন আগে। চৈত্র মাসের শেষের দিকে।'

ব্যোমকেশ সহাস্যে হাত জোড় করিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ। আপনাদের মিছে কষ্ট দিলাম, সেজন্য ক্ষমা করবেন। চল অজিত, চলুন ইন্সপেক্টর হালদার। এখানে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে।'

কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাজ শেষ হইল কিছুই বুঝিলাম না, আমরা গুটি গুটি বাহির হইয়া আসিলাম। ফুটপাথে নামিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ইন্সপেক্টর হালদার, আপনি চলুন আমাদের বাসায়। আপনার সঙ্গীদের আর দরকার হবে না।'

বাসায় পৌঁছিয়া সে আমাকে প্রশ্ন করিল, 'অজিত, নববর্ষে রামেশ্বরবাবু আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেটা কোথায়?'

এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিলাম, 'আমি তো সে-চিঠি আর দেখি নি। এইখানেই কোথাও আছে, যাবে কোথায়।'

আমাদের ব্যক্তিগত চিঠির কোনও ফাইল নাই, চিঠি পড়া হইয়া গেলে কিছু-দিন যত্রতত্র পড়িয়া থাকে, তারপর পুঁটিরাম ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দেয়।

ব্যোমকেশ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিল, 'দ্যাখো—খুঁজে দ্যাখো, চিঠিখানা ভীষণ জরুরী। রামেশ্বরবাবু তাতে লিখেছিলেন—আমার এই চিঠিখানির প্রতি

অবজ্ঞা দেখাইবেন না। তখন ও-কথার মানে ব্ঝি নি—'

ইন্‌সপেক্টর হালদার বলিলেন, 'কিন্তু কথাটা কি? ও-চিঠিখানা হঠাৎ এত জরুরী হয়ে উঠল কি করে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ব্ঝতে পারলেন না! ওই চিঠিখানাই রামেশ্বরবাব্র উইল।'

'অ্যাঁ! সেকি!'

'হ্যাঁ। আজ গ'দের শিশিতে পেঁয়াজের রস দেখে ব্ঝতে পারলাম। রামেশ্বর-বাব্ অদৃশ্য কালি দিয়ে উইল লিখে আমাকে পাঠিয়েছিলেন।'

'কিন্তু —অদৃশ্য কালি- '

'পরে বলব। অজিত, চারিদিকে খ্‌জে দ্যাখো, প্‌টিরামকে ডাকো। ও-চিঠি যদি না পাওয়া যায়, নলিনী আর দেবনাথের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

প্‌টিরামকে ডাকা হইল, সে কিছ্ বলিতে পারিল না। ব্যোমকেশ মাথায় হাত দিয়া বসিল, তারপর পাংশ্ম্খ তুলিয়া বলিল, 'থামো, থামো। বাইরে খ্‌জলে হবে না, মনের মধ্যে খ্‌জতে হবে।'

ইজি-চেয়ারে পা ছড়াইয়া শ্ইয়া সে সিগারেট ধরাইল, কড়িকাঠের পানে চোখ তুলিয়া ঘন ঘন ধ্ম উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল।

আমরাও সিগারেট ধরাইলাম।

পনরো মিনিট পরে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'অজিত, সেদিন আমি কোন্ বই পড়ছিলাম মনে আছে?'

বলিলাম, 'কবে? কোন্ দিন?'

'যেদিন রামেশ্বরবাব্র চিঠিখানা এল। পয়লা বৈশাখ, বিকেলবেলা। মনে নেই?'

মনের পটে সেদিনের দৃশ্যটি আঁকিবার চেষ্টা করিলাম। পোস্টম্যান দ্বারে ঠকঠক শব্দ করিল, ব্যোমকেশ তক্তপোশে পদ্মাসনে বসিয়া একটা মোটা বই পড়িতেছিল; কালী সিংহের মহাভারত, না হেমচন্দ্র-কৃত রামায়ণ?

ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'মহাভারত, দ্বিতীয় খণ্ড। পিতামহ ভীষ্মের কথা উঠল মনে নেই?'

ছ্টিয়া গিয়া শেলফ হইতে মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ড বাহির করিলাম। পাতা খ্লিতেই খামসমেত রামেশ্বরবাব্র চিঠি বাহির হইয়া পড়িল।

ব্যোমকেশ উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে!—প্‌টিরাম, একটা আংটায় কয়লার আগ্ন তৈরি করে নিয়ে এস।'

ব্যোমকেশের টেলিফোন পাইয়া ডাক্তার অসীম সেন আসিয়াছেন নলিনী ও দেবনাথকে সঙ্গে লইয়া। ঘরের মেঝেয় আগ্নের আংটা ঘরের বাতাবরণকে আরও উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ব্যোমকেশ চিঠিখানি সযত্নে হাতে ধরিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

'রামেশ্বরবাব্ হাস্যরসিক ছিলেন, উপরন্তু মহা ব্দ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর শরীর অসমর্থ হয়ে পড়েছিল। স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, তিনি ছেলে আর প্ত্রবধ্র হাতের প্তুল হয়ে পড়েছিলেন।

'তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছে, তখন তাঁর ইচ্ছা হল মেয়েকেও সম্পত্তির কিছু ভাগ দিয়ে যাবেন। কিন্তু মেয়েকে সম্পত্তির ভাগ দিতে গেলে উইল করতে হয়, বর্তমান আইন অনুসারে মেয়ের পিতৃ-সম্পত্তির ওপর কোনো স্বাভাবিক দাবী নেই। রামেশ্বরবাবু স্থির করলেন তিনি উইল করবেন।

'কিন্তু শুধু উইল করলেই তো হয় না; তাঁর মৃত্যুর পর উইল যে বিদ্যমান থাকবে তার স্থিরতা কি? কুশেশ্বর আর লাবণ্য সম্পত্তির ভাগ নলিনীকে দেবে না, তারা নলিনীকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তারা নলিনীকে বাপের সঙ্গে দেখা করতে দেয় না, সর্বদা রামেশ্বরবাবুকে আগলে থাকে; তিনি যে-সব চিঠি লেখেন তা খুলে তদারক করে, চিঠিতে সন্দেহজনক কোনো কথা থাকলে, চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

'তবে উপায়? রামেশ্বরবাবু বুদ্ধি খেলিয়ে উপায় বার করলেন। সকলে জানে না, পেঁয়াজের রস দিয়ে চিঠি লিখলে কাগজের ওপর দাগ পড়ে না, লেখা অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু ওই অদৃশ্য লেখা ফুটিয়ে তোলবার উপায় আছে, খুব সহজ উপায়। কাগজটা আগুনে তাতালেই অদৃশ্য লেখা ফুটে ওঠে। আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন ম্যাজিক দেখানোর শখ ছিল; অনেকবার সহপাঠীদের এই ম্যাজিক দেখিয়েছি।

'রামেশ্বরবাবু এই ম্যাজিক জানতেন। তিনি আবদার ধরলেন, কাঁচা পেঁয়াজ খাবেন। তাঁর ছেলে-বৌ ভাবল ভীমরতির খেয়াল, তারা আপত্তি করল না। রামেশ্বরবাবু হামানদিস্তায় পান ছেঁচে খেতেন, তাঁর পান খাওয়ার শখ ছিল, কিন্তু দাঁত ছিল না। পেঁয়াজ হাতে পেয়ে তিনি হামানদিস্তায় থেঁতো করলেন; গন্ধের শিশি থেকে গন্ধ ফেলে দিয়ে তাতে পেঁয়াজের রস সঞ্চয় করে রাখলেন। কেউ জানতে পারল না। তাঁর প্রাণে হাস্যরস ছিল; এই কাজ করবার সময় তিনি নিশ্চয় মনে মনে খুব হেসেছিলেন।

'পয়লা বৈশাখ তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখতেন। এবার নববর্ষ সমাগত দেখে তিনি চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন। আমাকে প্রতি বছর চিঠি লেখেন, এবারও লিখলেন; তারপর চিঠির উল্টো পিঠে অদৃশ্য পেঁয়াজের রস দিয়ে উইল লিখলেন। এই সেই চিঠি আর উইল।'

ব্যোমকেশ খাম খুলিয়া সাবধানে চিঠি বাহির করিল, চিঠির ভাঁজ খুলিয়া দুই হাতে তাহার দুই প্রান্ত ধরিয়া আংটার আগুনের উপর ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিতে লাগিল। আমরা শ্বাস রুদ্ধ করিয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিলাম।

এক মিনিট রুদ্ধশ্বাসে থাকিবার পর আমাদের সমবেত নাসিকা হইতে সশব্দ নিশ্বাস বাহির হইল। কাগজের পিঠে বাদামী রঙের অক্ষর ফুটিয়া উঠিতেছে।

পাঁচ মিনিট পরে কাগজখানি আগুনের উপর হইতে সরাইয়া ব্যোমকেশ একবার তাহার উপর চোখ বুলাইল, তারপর তাহা ডাক্তার সেনের দিকে বাড়াইয়া বলিল, 'ডাক্তার সেন, রামেশ্বরবাবু আপনাকে যে উইলের কথা বলেছিলেন, এই সেই উইল।—পড়ুন, আমরা সবাই শুনব।'

ডাক্তার সেন একবার উইলটা মনে মনে পড়িলেন, তাঁহার মুখে স্মরণাত্মক হাসি ফুটিয়া উঠিল। তারপর তিনি গলা পরিষ্কার করিয়া মন্দ্রকণ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

নমো ভগবতে বাসুদেবায। আমি শ্রীরামেশ্বর রায, সাকিম ১৭নং শ্যামধন মিত্রের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, অদ্য সুস্থ শরীরে এবং বাহাল তবিযতে আমার শেষ উইল লিখিতেছি। অবস্থাগতিকে উইলের সাক্ষী যোগাড় করা সম্ভব হইল না, তাই নিজ হস্তে আগাগোড়া উইল লিখিতেছি। আমার বুদ্ধিভ্রংশ বা মস্তিষ্ক বিকার হয নাই, ডাক্তার অসীম সেন তাহার সাক্ষী। এখন আমার শেষ ইচ্ছা অর্থাৎ Last will and testament লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কলিকাতায আমার যে আটটি বাড়ি আছে এবং ব্যাঙ্কে যত টাকা আছে, তন্মধ্যে হ্যারিসন রোডের বাড়ি এবং নগদ পঁচাত্তর হাজার টাকা আমার কন্যা শ্রীমতী নলিনী পাইবে। আমার স্ত্রী শ্রীমতী কুমুদিনী যাবজ্জীবন আমার শ্যামপুকুরের বাড়ির উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। তাহার মৃত্যুর পর ওই বাড়ি আমার কন্যা নলিনীকে অর্সিবে। আমার বাকী যাবতীয সম্পত্তি ছযটি বাড়ি এবং ব্যাঙ্কের টাকা পাইবে আমার পুত্র শ্রীকৃশেশ্বর রায। স্বনামধন্য সত্যান্বেষী শ্রীব্যোমকেশ বক্সী ও বিখ্যাত ডাক্তার অসীম সেনকে আমার উইলের এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিযা যাইতেছি তাঁহারা যথানির্দেশ ব্যবস্থা করিবেন এবং আমার এস্টেট হইতে প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন।

তারিখ পযলা বৈশাখ ১৩৬০	স্বাক্ষর বকলম খাস শ্রীরামেশ্বর রায

উইল পড়া শেষ হইলে কেহ কিছুক্ষণ কথা কহিল না, তারপর আমরা সকলে একসঙ্গে হর্ষধ্বনি করিযা উঠিলাম। নলিনী গলদশ্রু নেত্রে ছুটিযা আসিযা ব্যোমকেশের পদধূলি লইল। গদগদ স্বরে বলিল 'আপনি আমাদের নতুন জীবন দিলেন।'

ব্যোমকেশ করুণ হাসিযা বলিল 'তা তো দিলাম। কিন্তু এ উইল কোর্টে মঞ্জুর করানো যাবে কি?'

ইন্‌সপেক্টর হালদার আসিযা সবেগে ব্যোমকেশের করমর্দন করিলেন, বলিলেন, 'আপনি ভাববেন না। ওরা উইল contest করতে সাহস করবে না। যদি করে আমি সাক্ষী দেব।

ডাক্তার অসীম সেন বলিলেন 'আমিও।

অ দ্বি তী য়

এক

প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধানে ব্যোমকেশের সহিত যখন সত্যবতীর দাম্পত্য কলহ বাধিয়া যাইত, তখন আমি নিরপেক্ষভাবে বসিয়া তাহা উপভোগ করিতাম। কিন্তু দাম্পত্য কলহে যখন স্ত্রীজাতি এবং পুরুষজাতির আপেক্ষিক উৎকর্ষের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িত তখন বাধ্য হইয়া আমাকে ব্যোমকেশের পক্ষ অবলম্বন করিতে হইত। তবু দুই বন্ধু একজোট হইয়াও সব সময় সত্যবতীর সহিত আঁটিয়া উঠিতাম না। বস্তুত মানুষের ইতিহাসে পুরুষজাতির দুষ্কৃতির নজির এত অপর্যাপ্ত লিপিবদ্ধ হইয়া আছে যে তাহা খণ্ডন করা এক প্রকার অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত আমাদের রণে ভঙ্গ দিতে হইত।

কিছুকাল হইতে কলিকাতা শহরে এক নূতন উৎপাতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে একদিন শীতের সকালবেলা সংবাদপত্র সহযোগে চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ ও আমি তাহাই আলোচনা করিতেছিলাম। যে ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার প্রক্রিয়া মোটামুটি এইরূপ ঃ কখনও একটি, কখনও বা একাধিক ভদ্রশ্রেণীর যুবতী তাক্ বুঝিয়া দুপুরবেলা বাহির হয়। পুরুষেরা তখন কাজে গিয়াছে, বাড়িতে মেয়েরা আহারাদি সম্পন্ন করিয়া দিবানিদ্রার উদ্যোগ করিতেছে। এই সময় যুবতীরা গিয়া দরজায় টোকা মারে। বাড়ির গৃহিণী যদি সতর্ক হন, তিনি দ্বার না খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করেন, 'কে?' একটি যুবতী বাহির হইতে বলে, 'চিকনের কাজ করা ভাল সায়া-ব্লাউজ এনেছি, দাম খুব সস্তা, কিনবেন?' গৃহিণী ভাবেন ফেরিওয়ালী, তিনি দ্বার খুলিয়া দেন। অমনি যুবতীরা ঘরে ঢুকিয়া পড়ে ছুরি বা পিস্তল দেখাইয়া টাকাকড়ি গহনাপত্র কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে।

এই ধরনের ঘটনা পূর্বে কয়েকবার ঘটিয়া গিয়াছে, আসামীরা ধরা পড়ে নাই। সেদিন কাগজ খুলিয়া দেখি অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে আগের দিন দুপুরবেলা কাশীপুরের একটি গৃহস্থের বাড়িতে। ব্যোমকেশকে খবরটি পড়িয়া শুনাইলাম। সে একটু বঙ্কিম হাসিয়া বলিল, 'এতে আশ্চর্য হবার কী আছে' মেয়েরা তো দুপুরে ডাকাতি করেই থাকে।'

এই সময় সত্যবতী ঘরে প্রবেশ করিল। দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশের পানে কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'আহা! মেয়েরা দুপুরে ডাকাতি করে, আর তোমরা সব সাধুপুরুষ।'

ব্যোমকেশ সত্যবতীকে শুনাইবার জন্য কথাটা বলে নাই; কিন্তু সত্যবতী যখন শুনিয়া ফেলিয়াছে এবং জবাব দিয়াছে তখন আর পশ্চাৎপদ হওয়া চলে না। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা সবাই সাধুপুরুষ এমন কথা বলিনি। কিন্তু তোমরাও কম যাও না।'

সুতরাং তর্ক আরম্ভ হইয়া গেল। সত্যবতী তক্তপোশের কিনারায় বসিল, বলিল, 'মেয়েদের নিন্দে করা তোমাদের স্বভাব। মেয়েরা কী করেছে শুনি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশী কিছু নয়, দুপুরে ডাকাতি।'

আমি খবরের কাগজ হইতে দুপুরে ডাকাতির অংশটা পড়িয়া শুনাইলাম। সত্যবতী বলিল, 'বেশ, মেনে নিলাম, ওরা দোষ করেছে, পেটের দায়ে অন্যায় করেছে। কিন্তু তোমরা যে খুন-জখম করছ, যুদ্ধ বাধিয়ে হাজার হাজার লোক মারছ, তার বেলা কিছু নয়? তোমাদের তুলনায় মেয়েরা ক'টা খুন করেছে!'

বেগতিক দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমরা এতদিন ঘরের মধ্যে বন্ধ ছিলে তাই বিশেষ সুবিধে করতে পারনি, এখন স্বাধীনতা পেয়ে তোমাদের বিক্রম বেড়েছে, ক্রমে আরো বাড়বে। বঙ্কিমচন্দ্র কতকাল আগে দেবী চৌধুরাণীর কথা লিখে গেছেন। দেবী চৌধুরাণী সেকেলে মেয়ে ছিল, তাতেই এই। যদি একালের মেয়ে হত তা হলে কী কাণ্ডটা হত ভেবে দেখ অজিত!'

সত্যবতী হাত নাড়িয়া বলিল, 'ওসব বাজে কথা বলে আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। সত্যিকার ক'টা দৃষ্টান্ত দেখাতে পারো যেখানে মেয়েমানুষ খুন করেছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সত্যিকার দৃষ্টান্ত চাও! আরে এই তো সেদিন —বড় জোর মাস দুই হবে—জেনানা ফাটকের এক বন্দিনী জেলখানার গার্ডকে খুন করে নিরুদ্দেশ হয়েছে।'

সত্যবতী হাসিয়া উঠিল, 'দু'মাস আগে একটা মেয়ে একটা খুন করেছিল। এই দু' মাসের মধ্যে তোমরা ক'টা খুন করেছ তার হিসেব দাও দেখি।'

আজিকার কাগজেও একটা পুরুষ-কৃত খুনের খবর ছিল কিন্তু আমি তাহা চাপিয়া গেলাম, তৎপরিবর্তে বলিলাম, 'আজকের কাগজে স্ত্রীজাতির নৃশংসতার একটা গুরুতর দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটা ধোপা এক মহিলার দামী সিল্কের শাড়িতে খোঁচ্ লাগিয়েছিল, মহিলাটি বঁটি দিয়ে তার নাক কেটে নিয়েছেন। ধোপার অবস্থা শোচনীয়, হাসপাতালে আছে, বাঁচবে কিনা সন্দেহ।'

সত্যবতী নির্দয় হাসিয়া বলিল, 'মিছে কথা বলতেও তোমাদের জোড়া নেই। তোমরা সবাই মিথ্যেবাদী চোর ডাকাত খুনী—'

আমাদের তর্ক কতদূর গড়াইত বলা যায় না, কিন্তু এই সময় বহির্দ্বারের কড়া খটখট শব্দে নড়িয়া উঠিল। সত্যবতী বিজয়িনীর ন্যায় উন্নত মস্তকে ভিতরে চলিয়া গেল। আমি দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, ডাকপিওন, একটা পুরুষ্টুগোছের লম্বা খাম দিয়া চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশের নামে খাম, প্রেরকের উল্লেখ নাই। তাহাকে খাম আনিয়া দিলে সে শঙ্কিতভাবে উহা টিপিয়া-টুপিয়া বলিল, 'নবীন লেখকের পাণ্ডুলিপি মনে হচ্ছে। প্রভাতের কাছে পাঠিয়ে দাও।'

আমরা পুস্তক প্রকাশকের ব্যবসায় শরিক হইয়া পড়িবার পর হইতে উৎসাহশীল নবীন লেখকেরা প্রায়ই আমাদের কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া থাকেন, তাই ব্যোমকেশ মোটা খামের চিঠি দেখিলেই তটস্থ হইয়া ওঠে।

বলিলাম, 'পাণ্ডুলিপি নাও হতে পারে। খুলেই দেখ না।'

সে বলিল, 'তুমিই খুলে দেখ।'

খাম খুলিলাম। পাণ্ডুলিপি নয় বটে, কিন্তু ব্যোমকেশকে কেহ লম্বা চিঠি লিখিয়াছে; প্রায় একটা ছোটগল্পের শামিল। ব্যোমকেশ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া তক্তপোশের উপর লম্বা হইল, বলিল, 'প্রেমপত্র নয় নিশ্চয়। সুতরাং তুমি পড়, আমি শুনি।'

তক্তপোশের পাশে চেয়ার টানিয়া আমি চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। হাতের লেখা খুব স্পষ্ট নয়, একটু কষ্ট করিয়া পড়িতে হয়; কিন্তু ভাষা বেশ ঝরঝরে—

শ্রীব্যোমকেশ বক্সী মহাশয় সমীপে
সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

আমার নাম শ্রীচিন্তামণি কুণ্ডু। পুলিস আমাকে খুনের মামলায় জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, তাই নিরুপায় হইয়া আপনার শরণ লইয়াছি। শক্তি থাকিলে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতাম, আমার বক্তব্য মুখে বলিলে আরও পরিষ্কার হইত। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ আমি পক্ষাঘাত রোগে পঙ্গু হইয়াছি, আমার বাম অঙ্গ অচল হইয়া পড়িয়াছে; ঘরের মধ্যে অল্প চলাফেরা করিতে পারি মাত্র। তাই বাধ্য হইয়া পত্র লিখিতেছি।

যে গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা বিবৃত করিবার পূর্বে আমার নিজের পরিচয় কিছু জানাইতে ইচ্ছা করি। আমার বয়স এখন সাতান্ন বৎসর, স্ত্রী-পুত্র নাই, কেবল তিনটি বাড়ি আছে। বাড়িগুলি ভাড়া দিয়াছি, তন্মধ্যে একটি বাড়ির দ্বিতলে দুইটি ঘর লইয়া আমি থাকি। ভৃত্য রামাধীন আমার পরিচর্যা করে।

শিরোনামায় ঠিকানা দেখিয়া বুঝিবেন আমি কলিকাতার পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে থাকি। রাস্তাটি বেশ চওড়া; যে-বাড়িতে আমি থাকি সেটি রাস্তার এক দিকে, আমার অন্য বাড়ি দু'টি প্রায় তাহার সামনাসামনি, রাস্তার অপর দিকে। এই বাড়ি দু'টি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং একতলা; ইহাদের যমজ বাড়ি বলিতে পারেন। দু'টি বাড়ির মাঝখান দিয়া খিড়কির দিকে যাইবার সরু গলি আছে।

আমি রোগে পঙ্গু, দু'টি ঘরের মধ্যেই আমার জীবন। পক্ষাঘাত হওয়ার আগে আমি দালালি করিতাম, অনেক ছুটাছুটি করিয়াছি; ছুটাছুটি করিতেই আমি অভ্যস্ত। তাই এখন সারা বেলা জানালার সামনে বসিয়া থাকি, রাস্তার লোক চলাচল দেখি। একটি বাইনোকুলার কিনিয়াছি; তাহাই চোখে দিয়া দূরের দৃশ্য দেখি। বাইনোকুলার দিয়া অনেক বাড়ির ভিতরের দৃশ্যও দেখা যায়: আমার যমজ বাড়ির ভাড়াটেদের উপরও নজর রাখিতে পারি। যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহারা সিনেমা থিয়েটার দেখে; আমি জানালায় বসিয়া সাদা চোখে প্রবহমান জীবনস্রোত দেখি এবং চোখে দূরবীন লাগাইয়া নেপথ্যদৃশ্য দেখি। কত বিচিত্র দৃশ্য যে দেখিয়াছি শুনিলে আশ্চর্য হইয়া যাইবেন। কিন্তু সে-কথা যাক।

মাস দেড়েক আগে পৌষ মাসের মাঝামাঝি একটি ছোকরা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। বেঁটে-খাটো চেহারা, ঘাড়ে-ছাঁটা তামাটে রঙের চুল, তরতবে মুখ, নাকের নীচে ছোট্ট একটি প্রজাপতি-গোঁফ আছে। পরিধানে দামী বিলাতী পোশাক, তাহার উপর ক্যামেলহেয়ার কাপড়ের ওভারকোট। দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে বলিল, 'আমার নাম তপন সেন। আসতে পারি?'

আমি তখন জানালার কাছে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, মুখ তুলিয়া বলিলাম, 'আসুন।'

তপন সেন আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া আমার সম্মুখে বসিল। আমি বলিলাম, 'কি দরকার বলুন তো?'

সে জানালার বাহিরে আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'আপনার জোড়া বাড়ির একটা

'বাড়ি খালি হয়েছে। তাই এলাম, যদি আমাকে ভাড়া দেন।'

বাড়িটা কিছুদিন হইতে খালি পড়িয়া ছিল। আগের ভাড়াটে বাড়ি তছনছ করিয়া দিয়াছিল, আবার তাহা মেরামত ও চুনকাম করাইয়া রাখিয়াছিলাম; ঠিক করিয়াছিলাম ভাল ভাড়াটে না পাইলে ভাড়া দিব না। ছোকরাকে দেখিয়া শুনিয়া ভালই মনে হইল, সাজপোশাক হইতে অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার কি করা হয়?'

সে ওভারকোটের পকেট হইতে সিগারেটের কৌটা বাহির করিয়া আবার রাখিয়া দিল; বোধ হয় আমার ন্যায় বয়োবৃদ্ধের প্রতি সম্ভ্রমবশতই সিগারেট ধরাইল না। বলিল, 'খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করি। নাইট এডিটার। সারা রাত কাজ করি আর সারা দিন ঘুমোই।' বলিয়া একটু হাসিল।

প্রশ্ন করিলাম, 'সংসারে কে কে আছে?'

সে স্মিতমুখে বলিল, 'সবেমাত্র সংসার আরম্ভ করেছি। আমি আর আমার স্ত্রী। আর কেউ নেই।'

মনে মনে খুশী হইলাম। ছেলেপিলে থাকিলে বাড়ি নষ্ট করে, দেয়ালে কালি দিয়া ছবি আঁকে। বলিলাম, 'বেশ, আপনাকে ভাড়া দেব। দেড় শো টাকা ভাড়া।'

সে ইতস্তত করিয়া বলিল, 'আমার পক্ষে একটু বেশী হয়ে যায়—'

বলিলাম, 'সাজানো বাড়ি। খাট-বিছানা টেবিল-চেয়ার কাবার্ড সব পাবেন।'

'আচ্ছা, তা হলে রাজী। বাড়িটা একবার দেখতে পারি কি?'

চাবি দিলাম, তপন সেন গিয়া বাড়ি দেখিয়া আসিল। তারপর দেড় শো টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, 'এই নিন এক মাসের ভাড়া।'

আমি টাকার রসিদ লিখিয়া দিয়া বলিলাম, 'কবে থেকে বাড়িতে আসবেন?'

সে বলিল, 'কাল ইংরেজী মাসের পয়লা। বাড়ি তো খালিই পড়ে আছে, যদি অনুমতি দেন আজই কোনো সময় আসতে পারি।'

বলিলাম, 'বেশ, যখন ইচ্ছে আসবেন।'

তপন সেন চাবি লইয়া চলিয়া গেল। ভাল ভাড়াটে পাইয়াছি ভাবিয়া মনে মনে উৎফুল্ল হইলাম।

সেদিন সারা বিকালবেলা জানালায় বসিয়া বাড়ির দিকে তাকাইয়া রহিলাম, কিন্তু তপন তাহার স্ত্রীকে লইয়া আসিল না।

সকালবেলা জানালা খুলিয়া দেখি উহারা আসিয়াছে। সদর দরজা খোলা। নিশ্চয় রাত্রে কোনো সময় মালপত্র লইয়া আসিয়াছে।

আমার কৌতূহলী চক্ষু ওই দিকেই যাতায়াত করিতে লাগিল। বেলা সাড়ে ন'টার সময় একটি যুবতী আসিয়া ভিতর দিক হইতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর কয়েক মিনিট গত হইলে খিড়কি দরজার গলি দিয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

তখন তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। লম্বা ছিমছাম চেহারা, মাথায় একমাথা চুল এলো খোঁপার আকারে ঘাড়ের উপর বিন্যস্ত, হাতে একটি ছোট অ্যাটাচি-কেস। ভাবিলাম, সারা রাত কাজ করিয়া তপন ঘুমাইতেছে, তাই তার বউ বাজার করিতে চলিয়াছে।

কিন্তু দুপুর কাটিয়া গেল সে ফিরিয়া আসিল না। একেবারে ফিরিল অপরাহ্নে আন্দাজ চারটার সময়। সদর দরজার কড়া নাড়িল না, গলি দিয়া

খিড়কির দিকে চলিয়া গেল। বোধ হয় স্বামী মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ করিতে চায় না।

কিছুক্ষণ পরে আমি রামাধীনকে পাঠাইলাম। নূতন ভাড়াটে, তাহাদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ-খবর লওয়া দরকার। জানালায় বসিয়া দেখিলাম রামাধীন গিয়া দ্বারের কড়া নাড়িল। মেয়েটি দ্বার খুলিয়া দিল। রামাধীনের সহিত কথা বলিয়া মেয়েটি একবার চোখ তুলিয়া আমার জানালার পানে চাহিল, তারপর রামাধীনের সঙ্গে দ্বিতলে আমার কাছে উঠিয়া আসিল।

দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াছিলাম, এখন কাছে হইতে দেখিলাম। ভারি সুশ্রী চেহারা, লম্বা একহারা, মেদ-গ্রন্থির বাহুল্য নাই; বাঁ গালের উপর মসুরের মত একটি লাল তিল, তাহাতে মুখের লালিত্য আরও বাড়িয়াছে। একটি বিষয় লক্ষ করিলাম, স্বামী-স্ত্রীর বয়স প্রায় একই রকম - তেইশ চব্বিশ। হয়তো প্রেমে পড়িয়া বিবাহ করিয়াছে। আজকাল তো কতই এমন দেখা যায়।

ছোট্ট নমস্কার করিয়া বলিল, 'আমার নাম শান্তা। আমাদের কোনো অসুবিধে নেই; খুব সুন্দর বাড়ি পেয়েছি।' তাহার কথা বলিবার ভঙ্গী যেমন মিষ্ট, গলার স্বরও তেমনি নরম।

বলিলাম, 'বসুন। আপনি—'

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি আপনার মেয়ের বয়সী।'

বলিলাম, 'তা—আচ্ছা। তোমাদের ঝি-চাকর যদি দরকার থাকে, নতুন পাড়ায় এসেছ--'

সে বলিল, 'ঝি-চাকরের দরকার নেই। দু'জনের সংসার, আমি একাই সব কাজ সামলে নিতে পারব।'

বলিলাম, 'বেশ বেশ। তা—আজ তুমি সকালবেলা বেরিয়েছিলে, এখন ফিরলে। সারা দিন কোথায় ছিলে?'

সে বলিল, 'আমি স্কুলে পড়াই। চেতলার দিকে একটা ছোট মেয়েদের স্কুল আছে, সেখানে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করি।—আচ্ছা, আজ যাই, ওর খাবার তৈরি করতে হবে। সন্ধ্যার পর ও কাজে বেরুবে।' শান্তা একটু হাসিয়া ঘাড় হেলাইয়া চলিয়া গেল।

ইহাদের দু'জনকেই আমার ভাল লাগিয়াছে। বর্তমানে ভাড়াটেদের লইয়াই আমার জীবন। তাহারা আমার বাড়িতে বাস করে, ভাড়া দেয়, নিজের ধান্দায় থাকে; মেলামেশা নাই। জোড়া-বাড়ির অন্য অংশে একটি মাদ্রাজী পরিবার থাকে· তাহারা আমার ভাষা বোঝে না, কেবল মাসান্তে ভাড়া দিয়া রসিদ লইয়া যায়। ইহাদের সহিত আমার হৃদয়ের কোনও যোগ নাই। কিন্তু এই নবীন বাঙালী দম্পতি আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে।

জানালায় বসিয়া দেখিলাম, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পর তপন কোট প্যাণ্ট ও ওভারকোট চড়াইয়া খিড়কির গলি দিয়া বাহির হইল, বাড়ির সামনে ল্যাম্পের নীচে দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইল, তারপর বাস্-রাস্তার দিকে চলিয়া গেল। সারা রাত বাহিরে থাকিবে, ভোরের দিকে কাজ শেষ করিয়া ফিরিবে।

অতঃপর উহাদের নিয়ম-বাঁধা জীবনযাত্রা চলিতে লাগিল। সকালে সাড়ে ন'টার সময় শান্তা স্কুলে পড়াইতে চলিয়া যায়, বিকালে ফিরিয়া আসে। তপন সন্ধ্যার পর বাহির হয়, রাত্রে কখন ফেরে জানি না। উহাদের জীবনযাত্রা অতি

শান্ত; বাড়িতে অতিথি আসে না, হয়তো বন্ধুবান্ধব চেনা-পরিচিত কেহ কাছা-কাছি নাই। তপন বাড়ি হইতে রাত্রে বাহির হইবার পর বাড়ির ইলেকট্রিক বাতি নিবিয়া যায়, কেবল সামনের ঘরে মৃদু মোমবাতি জ্বলে। তাহাও আটটা বাজিতে না বাজিতে নিবিয়া যায়। শান্তা বোধ হয় সারা দিনের ক্লান্তির পর তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়ে।

উহাদের বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট কৌতূহল আছে, তাই যখন তখন চোখে দূরবীন লাগাইয়া বাড়িটা দেখি। কিন্তু বাহির হইতে বাড়ির অভ্যন্তর কিছুই দেখা যায় না; সদর দরজা যেমন বন্ধ থাকে, সদরের জানালায় তেমনি পর্দা টানা থাকে। কেবল রাত্রিকালে পর্দার ভিতর দিয়া মোমবাতির মোলায়েম আলো দেখা যায়।

একদিন রবিবার সকালবেলা শান্তা আসিয়া খানিকক্ষণ আমার সঙ্গে গল্পসল্প করিল। আমি রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার কর্তাটি এখনো ঘুমোচ্ছেন বুঝি?'

সে সলজ্জভাবে বলিল, 'হ্যাঁ, সারারাত ঘুমোতে পায় না, তাই—'

আমি বলিলাম, 'তুমি রাত্রে ইলেকট্রিক বাতি জ্বালাও না দেখেছি। কেন বল দেখি?'

শান্তা সচকিত হইয়া বলিল, 'আমার চোখ ভাল নয়, উজ্জ্বল আলো বেশীক্ষণ সহ্য হয় না। ও আবার কম আলোয় দেখতে পায় না। তাই ও চলে গেলেই ইলেকট্রিক নিবিয়ে পিদ্দিম জ্বালি। আপনি লক্ষ্য করেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমি তো সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই জানলার ধারেই বসে থাকি।'

শান্তা সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল, 'সত্যি, আপনার তো কোথাও যাবার উপায় নেই। তা আমি মাঝে মাঝে আসব, ওকেও পাঠিয়ে দেব।'

এইভাবে চলিতেছে। একদিন সন্ধ্যার পর তপনও কাজে যাইবার পথে আমার কাছে আসিয়া দুই চারিটা কথা বলিয়া গেল।

তারপর একদিন গভীর রাত্রে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম।

আমি সাধারণত রাত্রি সাড়ে নটার সময় শয়ন করি। কিন্তু আমার অনিদ্রা রোগ আছে, মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুম হয় না, তখন প্রায় সারারাত জাগিয়া থাকি। দুই হপ্তা আগে রাত্রে যথাসময় শয়ন করিলাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। বারোটা পর্যন্ত সাধ্যসাধনা করিয়া উঠিয়া পড়িলাম; ভাবিলাম এক পেয়ালা গরম কোকো পান করিলে ঘুম আসিতে পারে। স্টোভ জ্বালিয়া জল চড়াইয়া দিলাম। রামাধীন আমার ঘরের বাহিরে দ্বারের সম্মুখে শয়ন করে, তাহাকে আর জাগাইলাম না।

শীতের রাত্রি, জানালা বন্ধ আছে। হঠাৎ কি মনে হইল, জানালার খড়খড়ি তুলিয়া বাহিরে তাকাইলাম। নিষুতি রাত্রে রাস্তায় জনমানব নাই; জোড়া-বাড়ির সামনে রাস্তার আলোটা জ্বলিতেছে। বাড়ি দুটার ভিতরে অন্ধকার।

একটা লোক ওদিকের ফুটপাথ দিয়া আসিতেছে। তাহার মাথা হইতে হাঁটু পর্যন্ত কালো র‍্যাপারে ঢাকা; জোড়া-বাড়ির বরাবর আসিয়া সে থামিল, ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে ও আশেপাশে দেখিল, তারপর সুট্ করিয়া দুই বাড়ির মাঝখানে গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তপনের ঘরে বিদ্যুৎবাতি জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া গেল।

কোকো প্রস্তুত করিয়া পান করিতে করিতে চিন্তা করিলাম। কে লোকটা? তাহার ভাবভঙ্গীতে যেন সতর্ক সাবধানতা রহিয়াছে। ওই গলি গিয়া মাদ্রাজীদের খিড়কি দরজাতেও যাওয়া যায়। কিন্তু মাদ্রাজীরা সংখ্যায় অনেকগুলি, সন্ধ্যার পর দোর তালাবন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে; এই লোকটা নিঃসন্দেহে তপনের ঘরে গিয়াছে। তপন রাত্রে বাড়ি থাকে না, শান্তা একলা থাকে; এই সময় লোকটা চুপিচুপি আসিয়াছে। কী ব্যাপার!

গভীর রাত্রি, স্বামী অনুপস্থিত, বাড়িতে একটি যুবতী ছাড়া অন্য কেহ নাই; এই সময় র‍্যাপার মুড়ি দিয়া লোক আসে। অর্থাৎ—

মনটা খারাপ হইয়া গেল। শান্তাকে ভাল মেয়ে বলিয়াই মনে হইয়াছিল; কিন্তু আজকাল মুখ দেখিয়া স্ত্রী-চরিত্র বোঝা দুষ্কর।—মরুক গে, আমার কি! ভাড়াটে-দের স্ত্রী কী করিতেছে তাহার খোঁজে আমার প্রয়োজন কি? আমার যথাসময়ে ভাড়া পাইলেই হইল।

একবার ভাবিলাম জানালায় দাঁড়াইয়া দেখি লোকটা কতক্ষণে বাহির হয় কিন্তু কোকো পান করিয়া একটু ঘুমের আমেজ আসিতেছিল, আমি শুইয়া পড়িলাম। আসন্ন ঘুমকে খোঁচা দিয়া তাড়াইলে হয়তো সারারাত জাগিয়া থাকিতে হইবে।

এই ঘটনার পর দুই হপ্তা কাটিয়া গিয়াছে। গত রবিবার তপন আসিয়া বাড়ি ভাড়া দিয়া গিয়াছে, উল্লেখযোগ্য আর কিছু ঘটে নাই। তপনকে নৈশ আগন্তুকের কথা বলি নাই। কী দরকার আমার?

তারপর হঠাৎ পরশু রাত্রির ব্যাপার!

পরশু রাত্রেও আমাকে অনিদ্রা রোগে ধরিয়াছিল। বারোটা পর্যন্ত বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম; স্টোভে কোকোর জল চড়াইয়া দিয়া জানলার খড়খড়ি তুলিয়া উঁকি মারিলাম। লোকটা যেন আমার উঁকি মারার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল—সেই র‍্যাপার-ঢাকা লোকটা। সে ফুটপাথ দিয়া দ্রুতপদে আসিয়া গলির ঠিক মুখের কাছে একটু ভিতর দিকে লুকাইয়া পড়িল। তারপর একই দিক হইতে আর একটা লোক আসিতেছে দেখিলাম; গলায় কম্ফর্টার-জড়ানো লোকটা গলির মুখ পর্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, অনিশ্চিত-ভাবে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। মনে হইল সে র‍্যাপার-ঢাকা লোকটাকে অনুসরণ করিয়াছিল, এখন আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

এই সময় র‍্যাপার-ঢাকা লোকটা মুখ হইতে র‍্যাপার সরাইল। সবিস্ময়ে চিনিলাম—তপন! তারপর মুহূর্ত মধ্যে একটা ভয়ংকর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। তপনের হাতে একটা ছুরি ঝলকাইয়া উঠিল, সে এক লাফে সামনে আসিয়া কম্ফর্টার-জড়ানো লোকটার বুকে ছুরি বিঁধিয়া দিল। লোকটা ফুটপাথের উপর পড়িয়া গেল। তপন বিদ্যুৎবেগে আবার গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

আমি হতভম্বভাবে চাহিয়া রহিলাম। লোকটা ফুটপাথের উপর নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে, একটা কাকুতি পর্যন্ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে না। নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে—

আমার ঘরে টেলিফোন আছে। এই ঘটনার ধাক্কা সামলাইয়া আমি থানায় ফোন করিলাম। আমাদের থানা কাছেই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিস আসিয়া পড়িল। দারোগাবাবু আমার বয়ান শুনিয়া তপনের বাসা ঘেরাও করিলেন।

তপনকে কিন্তু বাড়িতে পাওয়া গেল না। শান্তা ঘুমাইতেছিল, সে কিছু জানিতে পারে নাই। তপন খিড়কির দরজা খুলিয়া বাড়িতে আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; সে বাসায় বস্ত্রাদি বদল করিয়া শান্তাকে না জাগাইয়া চুপিচুপি পলায়ন করিয়াছে।

সে-রাত্রে মৃতদেহ সনাক্ত হয় নাই. পরে জানা গিয়াছে মৃত ব্যক্তির নাম বিধুভূষণ আইচ্, বর্ধমানের পুলিসের কর্মচারী ছিল, সম্প্রতি ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল।

তপনের বাসায় পুলিসের পাহারা কায়েম আছে। তপন এখনও ধরা পড়ে নাই। দারোগাবাবুরা ক্রমাগত শান্তাকে জেরা করিয়া চলিয়াছেন। অথচ সে বেচারী নির্দোষ। আমি তাহার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিলাম সেজন্য লজ্জিত আছি। এখন বুঝিয়াছি তপনই মধ্যরাত্রে র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিত।

এদিকে আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তপন কেন খুন করিয়াছে আমি কিছুই জানি না, অথচ ঘণ্টায় ঘণ্টায় নূতন পুলিস অফিসার আসিয়া আমাকে জেরা করিয়া যাইতেছেন। আমি চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গু মানুষ কিন্তু পুলিস বোধ হয় সন্দেহ করে যে খুনের জন্য আমিই দায়ী। আমার অপরাধ এই যে, তপন আমার ভাড়াটে এবং আমি হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এখন আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন; আমার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। পুলিস হয়তো সন্দেহের উপর আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া হাজতে পুরিবে; তাহা হইলে আমি মরিয়া যাইব। আমার টাকা আছে; আপনি যদি আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন আমি আপনাকে খুশী করিয়া দিব।

আর অধিক কি। যত শীঘ্র পারেন আমাকে পুলিসের ঝামেলা হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

বশংবদ,
শ্রীচিন্তামণি কুণ্ডু

দুই

চিঠি পড়া শেষ হইলে ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে চিঠি লইয়া মনে মনে পড়িতে আরম্ভ করিল। আমি আর এক পেয়ালা চা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রান্নাঘরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সত্যবতী হয়তো রাগিয়া আছে, তাহাকে ঠাণ্ডা করাও দরকার।

আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি ব্যোমকেশ চিঠি কোলে লইয়া বসিয়া আছে এবং আপন মনে হাসিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম 'হাসি কিসের?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ব্যাপারটাই হাসির। চিন্তামণি কুণ্ডু মশায় কিন্তু একটি বিষয়ে ভুল করেছেন, তপনের বাড়িতে বিদ্যুৎবাতি নিবে যাওয়ার সময়টা তিনি ভাল করে লক্ষ্য করেন নি।'

'তুমি কি করে তা জানলে?'

'আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তা হলে তিনি নিশ্চয় ভুল করেছেন। আর

একটা ভুল করেছেন, সেটা অবশ্য স্বাভাবিক।' ব্যোমকেশ আবার মৃদু বঙ্কিম হাসিতে লাগিল। তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল, 'অজিত, চিন্তামণিবাবুর ঘরে টেলিফোন আছে, তুমি তাঁর নম্বর খুঁজে তাঁকে ফোন কর। একটা জরুরী প্রশ্নের উত্তর দরকার। তাঁকে জিজ্ঞেস কর তপনের গলার আওয়াজ কি রকম।'

'নিশ্চয় খুব জরুরী প্রশ্ন। আর কিছু জানতে চাও?'

'আর কিছু না। তাঁকে বোলো, ভাবনার কিছু নেই, আমি অবিলম্বে যাচ্ছি।'

চিন্তামণিবাবুকে ফোন করিলাম, তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, 'তপনের গলার আওয়াজ চেরা-চেরা।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চেরা-চেরা! তা হলে ঠিক ধরেছি, আর কোনো সন্দেহ নেই।'

বলিলাম, 'কি ধরেছ তুমিই জান। কিন্তু চিন্তামণিবাবুর গলাও চেরা-চেরা মনে হল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাতে আর আশ্চর্য কি। একে পক্ষাঘাত, তার ওপর পুলিসের আতঙ্ক—চল, বেরিয়ে পড়া যাক। কাজ সেরে ফিরে এসে মধ্যাহ্ন ভোজন করা যাবে।'

চিন্তামণিবাবুর বাড়ির রাস্তাটা বেশ চওড়া নূতন রাস্তা; শহরের অন্তিম প্রান্তে বলিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জন। তপন সেনের বাসা পুলিসের পাহারা দেখিয়া সহজেই সনাক্ত করা গেল। তাহার উল্টাদিকে চিন্তামণিবাবুর দ্বিতল বাড়ি। আমরা উপরে উঠিয়া গেলাম।

আমরা দ্বারের কড়া নাড়িবার পূর্বেই হিন্দুস্থানী ভৃত্য রামাধীন দ্বার খুলিয়া পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আমরা প্রবেশ করিলাম। খোলা জানালার পাশে চিন্তামণিবাবু চেয়ারে বসিয়া ছিলেন, সাগ্রহে গলা বাড়াইয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশ-বাবু। রাস্তায় আসতে দেখেই চিনেছি। আসুন।'

রামাধীন দু'টি চেয়ার আগাইয়া দিল, আমরা বসিলাম। টেলিফোনে গলার আওয়াজ শুনিয়া চিন্তামণিবাবুর চেহারা যেমন আন্দাজ করিয়াছিলাম আসলে তেমন নয়; কৃষ্ণবর্ণ মোটাসোটা মানুষ, উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়া পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পাশে টিপাই-এর উপর একটি দামী বাইনোকুলার রাখা রহিয়াছে।

চিন্তামণিবাবু বলিলেন, 'আগে কি খাবেন বলুন।—চা—কোকো—ওভাল্‌টিন—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন কিছু দরকার নেই। পুলিস আজ আপনার কাছে এসেছিল নাকি?'

চিন্তামণিবাবু বলিলেন, 'আসেনি আবার। দারোগা একবার আমার দিকে তেড়ে আসছে, একবার ও বাড়িতে শান্তার দিকে তেড়ে যাচ্ছে। কী যে চায় ওরা বুঝি না। একই প্রশ্ন পঞ্চাশবার! আমার পক্ষাঘাত হয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে পারি কিনা, বাইনোকুলার রেখেছি কেন, তপন সেনকে বাড়ি ভাড়া দিয়েছি কেন? বলুন দেখি ব্যোমকেশবাবু, এ সব প্রশ্নের কী জবাব দেব? জবাব দিতে দিতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। এখন আপনি আমাকে বাঁচান।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন দারোগাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। তিনি কি—'

বলিতে বলিতে দারোগাবাবু দ্বারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দশ বারো বছর আগে বিজয় ভাদুড়ী যখন ছোট দারোগা ছিলেন তখন তাঁহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। রোগা লম্বা বেউড় বাঁশের মত চেহারা, কিন্তু অত্যন্ত কর্মতৎপর ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি। দশ বছরে তিনি বড় দারোগা হইয়াছেন কিন্তু চেহারার তিলমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। এবং মনও যে পূর্ববৎ সন্দেহপরায়ণ আছে তাহা তাঁহার চোখের দৃষ্টি হইতে অনুমান করা যায়।

দ্বারের নিকট হইতে প্রখর চক্ষে আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন, শুষ্কস্বরে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু যে!'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'চিনতে পেরেছেন দেখছি। তা আপনার আসামী, মানে, তপন সেন ধরা পড়ল?'

বিজয় ভাদুড়ী একবার চিন্তামণিবাবুকে বক্রদৃষ্টিতে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'ধরা পড়েনি এখনো, কিন্তু যাবে কোথায়? আপনি হঠাৎ এখানে কী উদ্দেশ্যে, ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চিন্তামণিবাবু আমার মক্কেল। ওঁর বাড়িতে খুন হয়েছে, ওঁর ভাড়াটে খুন করেছে, আপনারা ওঁকে বিরক্ত করছেন। তাই নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যে উনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন।'

বিজয় ভাদুড়ী কুটিল-কুঞ্চিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন; বোধ করি মনে মনে বিবেচনা করিলেন ব্যোমকেশকে গলা-ধাক্কা দিবেন কি না। তারপর তিনি যখন কথা বলিলেন তখন তাঁহার সুর একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি ব্যোমকেশের দিকে ঝুঁকিয়া ঈষৎ হ্রস্বকণ্ঠে বলিলেন, 'একবার বাইরে আসবেন? দুটো কথা আছে।'

'চলুন।'

আমরা ঘরের বাহিরে লম্বা বারান্দার এক কোণে গিয়া দাঁড়াইলাম। বিজয়বাবু মুখে একটা জোর করা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, 'দেখুন ব্যোমকেশবাবু, উঁচু মহলে আপনার প্রতিপত্তি আছে, আপনি যদি এ মামলায় মাথা গলাতে চান আমি আপনাকে আটকাতে পারব না। কিন্তু আমি অনুরোধ করছি আপনি চিন্তামণি কুণ্ডুকে সাহায্য করবেন না। আমার বিশ্বাস, ও আর ঐ খোট্টা চাকরটা তলে তলে এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছে।'

ব্যোমকেশ স্থির হইয়া বিজয়বাবুর কথা শুনিল, তারপর বলিল, 'কে খুন করেছে আপনি জানেন?'

বিজয়বাবু বলিলেন, 'অবশ্য খুন করেছে তপন সেন, কিন্তু বুড়োটাও এর মধ্যে আছে।'

'বুড়োটাও যদি এর মধ্যে থাকতো তা হলে তপনের নামে খুনের অভিযোগ আনতো কি?'

'ঐ খানেই চালাকি। তপনকে ধরিয়ে দিয়ে বুড়ো নিজেকে বাঁচাতে চায়।'

ব্যোমকেশ বিরক্ত স্বরে বলিল, 'মাফ করবেন বিজয়বাবু, আপনি এ মামলার কিছুই বুঝতে পারেন নি।'

ভ্রূকুটি করিয়া বিজয়বাবু বলিলেন, 'তার মানে?'

'ব্যোমকেশ বলিল, 'মানে পরে বলব। আগে আপনি আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন দেখি।—যে ছুরি দিয়ে খুন হয়েছিল সেটা পাওয়া গেছে কি?'

'না। তপন সেটা নিয়ে পালিয়েছে।'

'তপনের বাড়ি তল্লাশ করে কিছু পেয়েছেন?'

'না, এমন কিছু পাইনি যাতে হদিস পাওয়া যায়। তবে সিন্দুকটা এখনো খোলা হয়নি, তার চাবি তপনের কাছে।'

'শান্তাকে জেরা করে কিছু পেয়েছেন?'

'কাজের কথা কিছু পাইনি। মাস চারেক আগে ওদের বিয়ে হয়েছে, স্বামীর কাজকর্মের কথা শান্তা কিছুই জানে না।'

'হুঁ। আমি কিন্তু সব জানি। কে খুন করেছে জানি, এমন কি আসামী কোথায় আছে তাও জানি—'

বিজয়বাবু লাফাইয়া উঠিলেন, 'জানেন তবে এতক্ষণ বলেন নি কেন?'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'সময় হলেই বলব। তার আগে আমি তপনের বাসাটা একবার ঘুরে ফিরে দেখতে চাই। আর শান্তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি অবশ্য তাকে যথেষ্ট জেরা করেছেন এবং সন্তোষজনক উত্তরও পেয়েছেন। আমি কেবল দু'চারটে প্রশ্ন করব।'

বিজয়বাবু বলিলেন, 'তা বেশ। কিন্তু আসামী—'

'আসামীকেও পাবেন।'

'কোথায়? ওই বাড়িতে? আপনি কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'পারবেন। আগে চলুন ওই বাড়িতে। আসামীকে ধরার জন্যে প্রস্তুত থাকবেন।'

'তার মানে—আপনি বলতে চান তপন সেন বাসায় ফিরে আসবে, কিম্বা বাসাতেই লুকিয়ে আছে—?'

'আসুন আসুন—' ব্যোমকেশ অগ্রগামী হইয়া সিঁড়ির দিকে চলিল, চিন্তামণিবাবুর দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, 'চিন্তামণিবাবু, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আমরা একবার ও বাড়িতে যাচ্ছি, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই খুনের কিনারা হয়ে যাবে।'

তারপর আমরা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলাম।

তপনের বাসার বুকে-পিঠে পুলিস পাহারা। একটি বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি, চোর পালাইলে পুলিসের বুদ্ধি বাড়ে। অপরাধী যখন অপরাধ করিয়া চম্পট দিয়াছে তখন অকুস্থলের চারিপাশে কড়া পাহারা বসাইয়া কী লাভ হয় আমি আজ পর্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ব্যোমকেশ গলি দিয়া খিড়কির দরজার দিকে যাইতে যাইতে বলিল, 'সদর আর খিড়কির দরজা ছাড়া বাড়ি থেকে পালাবার আর কোনো রাস্তা নেই? পাঁচিল ডিঙিয়ে পালানো যায় না?

দারোগা বিজয়বাবু বলিলেন, 'না।'

খিড়কির দরজায় একজন পাহারালা দাঁড়াইয়া আছে, উপরন্তু দরজায় তালা লাগানো। বিজয়বাবুর হুকুমে পাহারালা তালা খুলিয়া দিল, আমরা ভিতরে গেলাম।

ছোট্ট এক টুকরা উঠানের গায়ে দু'টি ঘর, পাশে রান্নাঘর ও স্নানের ঘর। ব্যোমকেশ বলিল, 'বিজয়বাবু, আপনি আর অজিত শান্তার কাছে গিয়ে বসুন,

আমি স্নানের ঘর আর রান্নাঘর এক নজর দেখে যাই।' বলিয়া সে পাশের দিকে চলিল।

আমরা সামনের ঘরে প্রবেশ করিলাম। এটি বসিবার ঘর। বেতের আসবাব দিয়া সাজানো। একটি বেতের চেয়ারে শান্তা উদাস অসহায়ভাবে বসিয়া আছে। চিন্তামণি কুণ্ডু তাহার চেহারার যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা সত্য; বর্তমানে তাহার মাথার চুলগুলি অবিন্যস্ত; চোখ দুটিও ফুলোফুলো। বোধহয় কান্নাকাটি করিয়াছে।

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলে সে মুখ তুলিল। আমাকে লক্ষ্যই করিল না, বিজয়বাবুর দিকে সপ্রশ্ন চক্ষে চাহিল। বিজয়বাবু কিছু বলিলেন না, একটা চেয়ারে উপবেশন করিলেন। আমিও বসিলাম।

তিনজনে নির্বাক বসিয়া আছি। আমি চিন্তা করিতেছি—পুলিসের জেরা শুনিয়া শুনিয়া মেয়েটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে যদি নির্দোষ হয়, স্বামীর অপরাধের সহিত তাহার যদি কোনও সংযোগ না থাকে, তবু তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু তপন ওই লোকটাকে খুন করিল কেন? যৌন ঈর্ষা? শান্তার সঙ্গে ঐ লোকটার কি—?

ব্যোমকেশ শয়নকক্ষ হইতে প্রবেশ করিল, তাহার মুখ হাসি হাসি। সে শান্তার সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিয়া স্মিতমুখে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

শান্তাও ক্লান্তভাবে তাহার পানে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে তাহার চোখে শঙ্কা ও সতর্কতা ফুটিয়া উঠিল। সে সোজা হইয়া বসিয়া একটু বিহ্বলভাবে বলিল, 'কী—কী—?'

ব্যোমকেশ প্রফুল্ল স্বরে বলিল, 'আপনার শোবার ঘরে একটা ছোট লোহার সিন্দুক রয়েছে দেখলাম। ওতে কী আছে?'

শান্তা বলিল, 'দারোগাবাবুকে তো বলেছি, কি আছে আমি জানি না। আমার স্বামী সিন্দুকের চাবি নিজের কাছে রাখতেন।'

বিজয়বাবু বলিলেন, 'সিন্দুকের তালা ভাঙবার ব্যবস্থা করেছি।'

'বেশ বেশ, ওতে অনেক মাল পাবেন; চোরাই মাল, দুপুরে ডাকাতির গয়না-পত্র।'—ব্যোমকেশ শান্তার দিকে ফিরিল, 'আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনার স্বামী কি দাড়ি কামাতেন না? বাড়িতে দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম নেই।'

শান্তার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল, সে অস্পষ্ট স্বরে বলিল, 'তিনি সেলুনে দাড়ি কামাতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ও। আপনার স্বামী দেখছি অসামান্য লোক ছিলেন। তিনি সেলুনে দাড়ি কামাতেন, কিন্তু বাড়িতে চটি জুতো পরতেন না। কোনো কারণ ছিল কি?'

শান্তা চক্ষু নত করিয়া বলিল, 'ওঁর চটি ছিঁড়ে গিয়েছিল, নতুন চটি কেনা হয়নি। যখন বাড়িতে থাকতেন আমার চটি পরতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই নাকি। আপনাদের দু'জনের পায়ের মাপ তাহলে সমান?'

শান্তা বলিল, 'প্রায় সমান।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বাঃ! কত সুবিধে! আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর দেখছি প্রায় সবই সমান, কেবল চুলের রঙ আলাদা। চিন্তামণিবাবু জানিয়েছিলেন তপনের

চুলের রঙ তামাটে। ঠিক তো?'

শান্তা ঢোক গিলিয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

বিজয়বাবু এতক্ষণ চোখ বাহির করিয়া প্রশ্নোত্তর শুনিতেছিলেন, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র উত্তেজনার কণ্ঠে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু —!'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'দাঁড়ান। তৈরি থাকুন, এবার আমার শেষ প্রশ্ন।—শান্তা দেবি, চিন্তামণিবাবু দেখেছিলেন আপনার গালে মসুরের মতো লাল তিল আছে, সে তিলটা গেল কোথায়?'

শান্তা চকিতে নিজের বাঁ গালে হাত দিল, তারপর সামলাইয়া লইয়া বলিল, 'তিল! আমার গালে তো তিল নেই, চিন্তামণিবাবু ভুল দেখেছেন। হয়তো লাল কালির ছিটে লেগেছিল— '

ব্যোমকেশের মুখে হিংস্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, 'সব প্রশ্নেরই জবাব তৈরি করে রেখেছেন দেখছি। কিন্তু এ প্রশ্নের কি জবাব দেবেন!' ক্ষিপ্রহস্তে সে শান্তার চুল ধরিয়া টান দিল, সঙ্গে সঙ্গে পরচুলা খসিয়া আসিল, ভিতর হইতে ঘাড়ে-ছাঁটা তামাটে রঙের চুল বাহির হইয়া পড়িল।

শান্তাও বিদ্যুৎবেগে জবাব দিল। একটু অবনত হইয়া সে নিজের ডান পা হইতে শাড়ীর প্রান্ত তুলিল। পায়ের সঙ্গে রবারের গার্টার দিয়া আটকানো ছিল একটা লিকলিকে ছুরি। ক্ষিপ্রহস্তে ছুরি মুষ্টিতে লইয়া শান্তা ব্যোমকেশের কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া ছুরি চালাইল। আমি ভয়ার্ত সম্মোহিতভাবে শুধু চাহিয়া রহিলাম, একটি স্ত্রীলোকের সুশ্রী কোমল মুখ যে চক্ষের নিমেষে এমন কুশ্রী ও কঠিন হইয়া উঠিতে পারে তাহা কল্পনা করা যায় না।

দারোগা বিজয়বাবু যদি প্রস্তুত না থাকিতেন তাহা হইল ব্যোমকেশের প্রাণ বাঁচিত কিনা সন্দেহ। তিনি বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া শান্তার কব্জি ধরিয়া ফেলিলেন; ছুরি শান্তার মুষ্টি হইতে স্খলিত হইয়া মাটিতে পড়িল। সে বিষাক্ত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া সর্প-তর্জনের মত নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, 'বিজয়বাবু, এই নিন আপনার খুনী আসামী, আর এই নিন খুনের অস্ত্র!'

বিজয়বাবু একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলিলেন, 'কিন্তু চিন্তামণিবাবু বলেছিলেন তপন সেন '

ব্যোমকেশ বলিল, 'তপন সেনের অস্তিত্ব নেই, বিজয়বাবু। আছেন কেবল অদ্বিতীয় শান্তা সেন: ইনিই রাত্রে তপন সেন, দিনে শান্তা সেন—সাক্ষাৎ অর্ধ নারীশ্বর মূর্তি। মহীয়সী মহিলা ইনি। ভাববেন না যে, বিধুভূষণ আইচকে খুন করাই এঁর একমাত্র কীর্তি। মাস দুই আগে ইনি বর্ধমান জেলের এক গার্ডকে খুন করে জেল থেকে পালিয়েছিলেন। এঁর আসল নাম আমার জানা নেই, আপনি পুলিসের লোক, ফেরারী কয়েদীর নাম জানতে পারেন।'

বিজয়বাবু শান্তার হাত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া সুবর্তুল চোখে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন, 'প্রমীলা পাল। এবার সব বুঝেছি। স্বামীকে বিষ খাওয়ানোর জন্যে তোমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। দু'বছর জেল খাটবার পর তুমি জেলের গার্ডকে খুন করে পালিয়েছিলে। পালিয়ে এখানে এসে একাই স্বামী-স্ত্রী সেজে লুকিয়েছিলে। তারপর সে-রাত্রে বিধুভূষণ তোমাকে দেখতে পায়। বিধুভূষণ তোমাকে চিনতে পেরে তোমার পিছু নিয়েছিল। এইখানে

বাড়ির সামনে এসে তুমি তাকে খুন করেছ।' ব্যোমকেশের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বিজয়বাবু বলিলেন, 'কেমন এই তো?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোট কথা এই বটে।'

বিজয়বাবু হুঙ্কার ছাড়িলেন, 'জমাদার।'

জমাদার ঘরের বাহিরেই ছিল, প্রবেশ করিল। বিজয়বাবু বলিলেন, 'হাতকড়া লাগাও।'

চিন্তামণিবাবুর ঘরে বসিয়া চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার চিঠি পড়ে খটকা লেগেছিল, চিন্তামণিবাবু। আপনি ওদের দু'জনকে এক সঙ্গে কখনো দেখেন নি, দূরবীন লাগিয়েও ওদের ব্যূহ ভেদ করতে পারেননি। কেন? পুরুষটা বেঁটে, মেয়েটা লম্বা; হরে দরে হাঁটু জল। ওরা সদর দরজা দিয়ে যাতায়াত করে না, খিড়কি দিয়ে আসে যায়; পুরুষটা চেরা-চেরা গলায় কথা বলে। কেন? সন্দেহ হয় যে কোথাও লুকোচুরি চলছে।

'কিন্তু বেশি ফলাও করে সব কথা বলবার দরকার নেই। স্থূলভাবে ব্যাপারটা এই—জেল ভেঙে পালাবার পর প্রমীলা পালের দুটো জিনিস দরকার হয়েছিল; ছদ্মবেশ আর রোজগার। তার মাথার চুল তামাটে রঙের, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তাই তাকে চুল ছেঁটে পুরুষ সাজতে হল। কিন্তু দুপুরে ডাকাতি করে রোজগার করার জন্য তার মেয়েমানুষ সাজা দরকার, তাই সে একটি সুন্দর বিলিতী পরচুলো যোগাড় করল। কোথায় চুল ছেঁটেছিল, কোথা থেকে পরচুলো যোগাড় করল আমি জানি না; কিন্তু তার দ্বৈত-জীবন আরম্ভ হল। এখন শীতকাল চলছে, স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ সাজার খুব সুবিধা। সে নাকের নীচে একটি ছোট্ট প্রজাপতি-গোঁফ লাগালো, গায়ে কোট-প্যাণ্টের ওপর ওভারকোট চড়ালো, তারপর আপনার কাছে বাড়ি ভাড়া নিতে এল; পাছে মেয়েলী গলা ধরা পড়ে তাই আপনার সঙ্গে চেরা-চেরা গলায় কথা কইল। কলকাতা শহরে ছদ্মবেশে থাকার খুব সুবিধা, পাড়া পড়শী কেউ কারুর খবর রাখে না। কিন্তু সে লক্ষ্য করল আপনি সারাক্ষণ জানালার কাছে বসে থাকেন, আপনার বাইনোকুলার আছে। তাকে সাবধান থাকতে হবে।

'সে-রাত্রে আপনি শুয়ে পড়বার পর সে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি দখল করতে এল। কেউ জানতে পারল না যে মাত্র একজন লোক এসেছে, দু'জন নয়। তার সঙ্গে একটা ছোট্ট লোহার সিন্দুক ছিল, সেটা সে শোবার ঘরে রাখল।

'তারপর তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আরম্ভ হল। সকাল বেলা সে স্কুলে পড়াবার নাম করে বেরিয়ে যায়, দুপুর বেলা 'দুপুরে ডাকাতি' করার মতলবে ঘুরে বেড়ায়, বিকেলবেলা ফিরে আসে। আবার সন্ধ্যের পর পুরুষ সেজে বেরোয় আপনাকে ধাপ্পা দেবার জন্যে। ঘরের বিদ্যুৎ বাতি নিবিয়ে পিদ্দিম জ্বেলে রেখে বেরোয়; তেল ফুরোলে পিদ্দিম নিবে যায়, আপনি ভাবেন শান্তা আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। আপনি কেবল একটা ভুল করেছিলেন; ইলেকট্রিক বাতি যে তপন বাড়ি থেকে বেরুবার আগে নেবে সেটা লক্ষ্য করেন নি। আপনার মনে সন্দেহ ছিল না তাই লক্ষ্য করেন নি।

'যাক, আপনি শুয়ে পড়বার পর সে আবার বাড়িতে ফিরে আসে এবং ঘুমোয়।

একটা আলোয়ান সে সম্ভবত ওভারকোটের নীচে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বেরুতো, ফেরবার সময় সেটা গায়ে জড়িয়ে নিত। তাই প্রথম যে-রাত্রে আপনি খড়খড়ি তুলে তাকে ফিরতে দেখলেন, আপনি ভাবলেন সে শান্তার গুপ্ত প্রণয়ী।

'এইভাবে চলছিল। তারপর প্রমীলার হঠাৎ ভীষণ বিপদ উপস্থিত হল। বিধুভূষণ আইচ পুলিসের কর্মচারী, প্রমীলাকে আগে দেখেছিল, ছুটিতে কলকাতায় এসে সে প্রমীলাকে দেখতে পেল এবং পুরুষের ছদ্মবেশ সত্ত্বেও চিনতে পারল। সে প্রমীলার পিছু নিল। হয়তো কোনো হোটেলে দুজনের দেখা হয়েছিল। প্রমীলা নিশ্চয় তাকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা যখন পারল না, তখন—'

বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়া ব্যোমকেশ থামিল, সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল।

আমি বলিলাম, 'একটা কথা। বিধুভূষণকে খুন করে প্রমীলা বাড়ি ছেড়ে পালাল না কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পালাবার সময় পেল না। সে তো জানত না যে চিন্তামণিবাবু খড়খড়ি তুলে হত্যাকাণ্ডটা দেখে নিয়েছেন। তাই তার বিশেষ তাড়া ছিল না; ভেবেছিল দামী জিনিসপত্র গয়নাগাঁটি নিয়ে ধীরে সুস্থে পালাবে। কারণ ও বাড়িতে থাকা আর তার পক্ষে নিরাপদ নয়; বাড়ির সামনে লাশ পড়ে আছে, পুলিস নিশ্চয় তাকে জেরা করতে আসবে। প্রমীলা পাল জেল-ভাঙা খুনী আসামী, যদি পুলিসের মধ্যে কেউ তাকে চিনতে পারে? সুতরাং নিশ্চয় সে পালাতো। কিন্তু হঠাৎ পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিস এসে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। তখন আর পালাবার রাস্তা নেই, প্রমীলা তাড়াতাড়ি পরচুলোটা পরে নিয়ে মেয়ে সাজল। কিন্তু তাড়াতাড়িতে গালের তিলটা আঁকতে ভুলে গেল।'

'গালে তিল আঁকতো কেন?'

'দুটো চেহারায় রকমফের আনবার জন্যে। পুরুষবেশে নাকের নীচে গোঁফ লাগাতো, আর স্ত্রীবেশে পরচুলো ছাড়াও গালে তিল আঁকত। বুঝেছ?—আজ তা হলে উঠি, চিন্তামণিবাবু।'

চিন্তামণিবাবু গদগদ ধন্যবাদ সহ একটি দুইশত টাকার চেক লিখিয়া দিলেন। আমরা ফিরিয়া চলিলাম।

বেলা দুটো বাজিতে বিলম্ব নাই। পুলিস আসামীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। এখানে তাহাদের আর প্রয়োজন নাই। শ্রীযুক্ত বিজয় ভাদুড়ী মহাশয় খুনী আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া নিশ্চয় প্রচুর প্রশংসা অর্জন করিবেন।

বাসায় পৌঁছিয়া দেখি সত্যবতী দরজার কাছে উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে, আমাদের দেখিয়া ভ্রূ তুলিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিল। অর্থাৎ- এত দেরি যে!

ব্যোমকেশ হঠাৎ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তারপর হাত বাড়াইয়া সত্যবতীর চিবুক একটু নাড়িয়া দিয়া বলিল, 'তোমরাও কম যাও না।'

ম গ্ন মৈ না ক

স্বাধীনতা লাভের পর পনেরো বছর অতীত হইয়াছে। সনাতন ভারতীয় আইন অনুসারে আমাদের স্বাধীনতা দেবী সাবালিকা হইয়াছেন, পলায়নী মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কঠিন সত্যের সম্মুখীন হওয়ার সময় উপস্থিত। সুতরাং এ কাহিনী বলা যাইতে পারে।

নেংটি দত্ত নামধারী অকালপক্ক বালককে লইয়া কাহিনী আরম্ভ করিতেছি, কারণ সে না থাকিলে এই ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটিত না। নেংটি একরকম জোর করিয়াই আমাদের বাসায় আসিয়া ব্যোমকেশের সহিত আলাপ জমাইয়াছিল। অত্যন্ত সপ্রতিভ ছেলে, নাকে-মুখে কথা, বয়স সতেরো কি আঠারো, কিন্তু চেহারা রোগা-পট্‌কা বলিয়া আরো কম বয়স মনে হইত। এই বয়সে সে যথেষ্ট বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়াছিল, অথচ সেই সঙ্গে একটু ন্যাকা-বোকাও ছিল; একাধারে ছেলেমানুষ এবং এঁচড়ে-পাকা। অল্প পরিচয়ে অত্যন্ত ফাজিল ও ডেঁপো মনে হইলেও আসলে সে যে মন্দ ছিল না তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম। ব্যোমকেশকে সে মনে মনে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিত, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া মনে হইত ব্যোমকেশের সমস্ত চালাকি সে ধরিয়া ফেলিয়াছে, ব্যোমকেশের চেয়ে তাহার বুদ্ধি অনেক বেশি।

যখনই সে আমাদের বাসায় আসিত, ব্যোমকেশের সঙ্গে অপরাধ-বিজ্ঞান লইয়া পরম বিজ্ঞের মত আলোচনা করিত। ছেলেটা লেখাপড়ায় বহুদিন ইস্তফা দিয়াছে কিন্তু একেবারে অজ্ঞ নয়, ব্যোমকেশও হাসি মুখে তাহাকে আস্কারা দিত। বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও দু'জনের মধ্যে প্রীতি-কৌতুক মিশ্রিত একটা সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল।

দু'চার দিন আনাগোনা করার পর নেংটি হঠাৎ একদিন হাত বাড়াইয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, একটা সিগারেট দিন না।'

ব্যোমকেশ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল, তারপর ধমক দিয়া বলিল, 'এতটুকু ছেলে, তুমি সিগারেট খাও।'

নেংটি বলিল, 'পাব কোথায় যে খাব? মাসিমা একটি পয়সা উপুড়-হস্ত করে না, মাঝে-মধ্যে মেসোমশায়ের টিন থেকে দু'একটা চুরি করে খাই। তাছাড়া বাড়িতে কি সিগারেট খাওয়ার জো আছে? ধোঁয়ার গন্ধ পেলেই মাসিমা মারমার করে তেড়ে আসে। দিন না একটা।'

ব্যোমকেশ তাহাকে একটা সিগারেট দিল, সে তাহা পরম যত্নে সেবন করিয়া শীঘ্র আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিল।

অতঃপর সে যখনই আসিত তাহাকে একটা সিগারেট দিতে হইত।

একদিন নেংটি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে আসিয়া বলিল, 'জানেন ব্যোমকেশদা, আমাদের বাড়িতে একটা মেয়ে এসেছে, ঠিক বিলিতি মেমের মত দেখতে।'

ব্যোমকেশ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, 'তাই নাকি!'

নেংটি বলিল, 'হ্যাঁ, এত সুন্দর মেয়ে আমি আর দেখিনি। আপনি যদি দেখেন ট্যারা হয়ে যাবেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, তাহলে দেখব না। কে তিনি?'

নেংটি বলিল, 'মেসোমশায়ের বন্ধুর মেয়ে। পূর্ববঙ্গে থাকত, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় বাপ-মা মরে গেছে; মেয়েটা কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। মেসোমশাই তাকে আশ্রয় দিয়েছেন, বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন। আমারই মতন অবস্থা।'

মনে মনে নেংটির মেসোমশাই সন্তোষ সমাদ্দারকে সাধুবাদ করিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও নেংটির মারফৎ তাঁহার কথা জানিতাম। তিনি খ্যাতিমান ব্যক্তি, তাঁহার রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কীর্তিকলাপ বাংলাদেশে কাহারও অবিদিত নয়। আমরা তাঁহার পারিবারিক পরিস্থিতির কথাও জানিতাম। বস্তুত, যে কাহিনী লিখিতেছি তাহা সন্তোষবাবুরই পারিবারিক ঘটনা।

ঘটনার পূর্বকালে ও উত্তরকালে এই পরিবারের মানুষগুলি সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা স্থূলভাবে এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। আকস্মিক মৃত্যু আসিয়া এই সমৃদ্ধ পরিবারেব সহিত আমাদের সংযোগ ঘটাইয়াছিল, আবার আকস্মিক মৃত্যুই নাটকের শেষ অঙ্কে যবনিকা টানিয়া দিয়াছিল। অনেক দিন নেংটিকে দেখি নাই—। কিন্তু যাক।

সন্তোষ সমাদ্দার ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। চৌরঙ্গী হইতে দক্ষিণ দিকে কিছুদূর যাইলে একটি উপ-রাস্তার উপর তাঁহার প্রকাণ্ড দ্বিতল বাগান-ঘেরা বাড়ি। সন্তোষবাবু কিন্তু বাড়িতে কমই থাকিতেন, সারা দিন ব্যবসা-ঘটিত কাজ-কর্মে এবং রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে কাটাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিতেন। তাও শনিবার সন্ধ্যার পর তাঁহাকে বাড়িতে পাওয়া যাইত না, অফিসের কাজ-কর্ম সারিয়া তিনি এক কীর্তন-গায়িকার গৃহে গান শুনিতে যাইতেন, তারপর একেবারে সোমবার সকালে সেখান হইতে অফিসে যাইতেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল আন্দাজ আটচল্লিশ বছর।

তাঁর স্ত্রী চামেলি সমাদ্দার বয়সে তাঁর চেয়ে দু'তিন বছবেব ছোট। শীর্ণ লম্বা স্নায়বিক প্রকৃতির স্ত্রীলোক, যৌবনকালে সন্ত্রাসবাদীদের সহিত যুক্ত ছিলেন। সন্তোষবাবুর সহিত বিবাহের পর কয়েক বছর শান্তভাবে সংসার-ধর্ম পালন করিয়াছিলেন, দু'টি যমজ পুত্রসন্তানও জন্মিয়াছিল। ক্রমে তাঁহার চরিত্রে শুচিবাই দেখা দিল, স্বভাব তীক্ষ্ন ও ছিদ্রান্বেষী হইয়া উঠিল। বাড়িতে মাছ-মাংস রহিত হইল, স্বামীর সহিত এক বাড়িতে থাকা ছাড়া আর অন্য কোন সম্পর্ক রহিল না। এই ভাবে গত দশ-বারো বছর কাটিয়াছে।

ইঁহাদের দুই যমজ পুত্র যুগলচাঁদ ও উদয়চাঁদ। বয়স কুড়ি বছর, দু'জনেই কলেজে পড়ে। যমজ হইলেও দুই ভাইয়ের চেহারা ও চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত; যুগলচাঁদের ছিপ্‌ছিপে চেহারা, তরতরে মুখ, উদয়চাঁদ একটু গ্যাঁটা-গোঁটা ষণ্ডা-গুণ্ডা ধরনের। যুগলচাঁদ ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে; লেখাপড়ায় ভাল; লুকাইয়া কবিতা লেখে। উদয় দাম্ভিক ও দুর্দান্ত, সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে, মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হোটেলে গিয়া মুর্গী খায়। শ্রীমতী চামেলি তাহাকে শাসন করিতে পারেন না, কিন্তু মনে মনে বোধহয় দুই ছেলের মধ্যে তাহাকেই একটু বেশি ভালবাসেন।

এই চার জন ছাড়া আরো তিনটি মানুষ বাড়িতে থাকে। প্রথমত নেংটি ও তাহার ছোট বোন চিংড়ি। বছর দুই আগে তাহাদের মাতা পিতা একসঙ্গে কলেরা রোগে

মারা গিয়াছিলেন, নেংটি ও চিংড়ি অনাথ হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীমতী চামেলি তাহাদের সাক্ষাৎ মাসি নন, কিন্তু তিনি তাহাদের নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিলেন; সেই অবধি তাহারা এখানেই আছে। নেংটির পরিচয় আগেই দিয়াছি, চিংড়ি তাহার চেয়ে তিন-চার বছরের ছোট। তাহার চেহারাটি ছোটখাটো, মোটের উপর সুশ্রী, এই বয়সেই সে ভারী বুদ্ধিমতী ও গৃহকর্মনিপুণা হইয়া উঠিয়াছে। মাসিমা শুচিবাই-এর জন্য অধিকাংশ সময় কল-ঘরে থাকেন, চিংড়িই সংসার চালায়। যুগলচাঁদ তাহার নাম দিয়াছে কুচোচিংড়ি।

তৃতীয় যে ব্যক্তিটি বাড়িতে থাকেন তাঁহার নাম রবিবর্মা। পুরা নাম বোধকরি রবীন্দ্রনাথ বর্মণ, কিন্তু তিনি রবিবর্মা নামেই সমধিক পরিচিত। দীর্ঘ কঙ্কালসার আকৃতি; মুখের ডৌল, চোখের বক্রতা এবং গোঁফ-দাড়ির অপ্রতুলতা দেখিয়া ত্রিপুরা অঞ্চলের সাবেক অধিবাসী বলিয়া সন্দেহ হয়; বয়স আন্দাজ চল্লিশ। ইনি সন্তোষবাবুর একজন কর্মচারী, তাঁহার রাজনীতি-ঘটিত ক্রিয়াকলাপের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী। নিজের সংসার না থাকায় তিনি সন্তোষবাবুর গৃহেই থাকেন, বাড়ির একজন হইয়া গিয়াছেন; প্রয়োজন হইলে বাড়ির কাজকর্মও দেখা-শোনা করেন।

এই সাতটি মানুষের সংসারে হঠাৎ যেদিন একটি অপরূপ সুন্দরী যুবতীর আবির্ভাব ঘটিল, সেদিন মৃত্যু-দেবতার মুখে যে কুটিল হাসি ফুটিয়াছিল তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই। নেংটি প্রথম দিনই আসিয়া যুবতীর আবির্ভাবের খবর দিয়াছিল; তারপর যতবারই আসিয়াছে মশগুল হইয়া যুবতীর প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছে, পরিবারের মধ্যে যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রবল আবহ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করিয়াছে। শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইয়াছে নেংটিদের সংসারে একটি দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহা যে এমন মারাত্মক আকার ধারণ করিবে তাহা কল্পনা করি নাই।

যুবতীর আবির্ভাবের মাস ছয়েক পরের কথা। দুর্গাপূজা শেষ হইয়া কালীপূজার তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে, এই সময় একদিন সন্ধ্যার পর ব্যোমকেশ আমাদের বসিবার ঘরে আলো জ্বালিয়া একমনে রামায়ণ পড়িতেছিল। রাজশেখর বসু মহাশয় মূল বাল্মীকি রামায়ণের চুল ছাঁটিয়া দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া তরতরে ঝরঝরে করিয়া দিয়াছেন, ব্যোমকেশ কর্মহীন দিবসের আলুনি প্রহরগুলি তাহারই সাহায্যে গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি তক্তপোশে চিৎ হইয়া অলসভাবে এলোমেলো চিন্তা করিতেছিলাম। সাম্প্রতিক শারদীয়া পত্রিকার যে কয়টি রচনা পড়িয়াছি তাহা হইতে মনে হয় বাঙালী লেখক বাংলা ভাষা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন; রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমরা যেমন স্বাধীনতা পাইয়াছি, ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনি শাসনহীন অবাধ স্বৈরাচার, মানুষের মন আজ উন্মার্গগামী, জলে-স্থলে-আকাশে সর্বত্র সে ধৃষ্টতা করিয়া বেড়াইতেছে.. আজ সকালে সংবাদপত্রে দেখিলাম একটা এরোপ্লেন চাটগাঁ হইতে কলিকাতা আসিতেছিল বানচাল হইয়া সমুদ্রে ডুবিয়াছে পাকিস্তান এয়ারলাইনসের প্লেন—একটি লোকও বাঁচে নাই, মৃতদের দীর্ঘ ফিরিস্তি বাহির হইয়াছে.. আমরা আকাশচারী হইয়া উঠিয়াছি, মাটিতে আর পা পড়ে না, কবি সত্যেন দত্ত এরোপ্লেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, উদ্‌গত-পাখা জাঁদরেল পিপীলিকা'--উপমাটা ভারি চমকপ্রদ।

'পার্বতীর দাদার নাম জানো?'

তক্তপোশে উঠিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ রামায়ণ রাখিয়া সিগারেট ধরাইতেছে।

বলিলাম, 'পার্বতীর দাদা! কোন্ পার্বতী?'

ব্যোমকেশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'মহাদেবের পার্বতী, হিমালয়-কন্যা পার্বতী।'

'ও, বুঝেছি। পার্বতীর দাদা ছিল নাকি?'

'ছিল।' ব্যোমকেশ তর্জনী তুলিয়া বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিতে আরম্ভ করিল, 'তার নাম মৈনাক পর্বত। সেকালে পাহাড়দের পাখনা ছিল, উড়ে উড়ে বেড়াতো, যখন ইচ্ছে নগর-জনপদ প্রভৃতি লোকালয়ের ওপর গিয়ে বসতো। নগর-জনপদের কী অবস্থা হত বুঝতেই পারছ। দেখে-শুনে দেবরাজ ইন্দ্র চটে গেলেন, বজ্র নিয়ে বেরুলেন। পৃথিবীর যেখানে যত পাহাড় পর্বত আছে, বজ্র দিয়ে সকলের পাখনা পুড়িয়ে দিলেন। কেবল হিমালয়-পুত্র মৈনাক পালালো, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে রইল। সেই থেকে মৈনাক সমুদ্রের তলায় আছে, মাঝে মাঝে নাক বার করে, আবার ডুব মারে। অনেকটা ফেরারী আসামীর মত অবস্থা।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইন্দ্র এত বড় দেবতা, তিনি মৈনাককে ধরতে পারলেন না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ইন্দ্র দেবরাজ ছিলেন বটে, কিন্তু সত্যান্বেষী ছিলেন না। তাছাড়া, তিনি প্রচণ্ড মাতল এবং লম্পট ছিলেন।'

প্রচণ্ড মাতাল এবং লম্পট হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র দেবতাদের রাজা হইলেন কি করিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় পাশের ঘরে কিড়িং কিড়িং শব্দে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। অনেকদিন এমন মধুর আওয়াজ শুনি নাই; মনটা নিমেষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নিশ্চয় কেহ বিপদে পড়িয়া ব্যোমকেশের শরণাপন্ন হইয়াছে। ব্যোমকেশ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার আগেই আমি তড়াক করিয়া গিয়া ফোন ধরিলাম। বিপন্ন শরণার্থীকে দাঁড় করাইয়া রাখা ঠিক নয়।

ফোনে নেংটির গলা শুনিয়া একটু দমিয়া গিয়াছিলাম, তারপর তাহার বার্তা শুনিয়া আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম। নেংটি বলিল, 'অজিতবাবু, শীগ্গির ব্যোমকেশদাকে নিয়ে আসুন। হেনা মল্লিক মরে গেছে।'

হেনা মল্লিক, অর্থাৎ, সেই অপূর্ব সুন্দরী যুবতী। উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, 'মরে গেছে। কী হয়েছিল?'

নেংটি বলিল, 'তেতলার ছাদ থেকে পড়ে মরে গেছে। পুলিস এসেছে। মেসোমশাই বাড়ি নেই—আজ শনিবার—আপনারা শীগ্গির আসুন।'

ব্যোমকেশ আসিয়া আমার হাত হইতে টেলিফোন লইল, বলিল, 'কে, নেংটি! কী হয়েছে?'

সে কিছুক্ষণ ধরিয়া শুনিল, তারপর—'আচ্ছা—দেখি—' বলিয়া টেলিফোন রাখিয়া দিল। আমরা বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ঘড়িতে তখন সাতটা বাজিয়া পঁয়ত্রিশ মিনিট হইয়াছে।

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। আমি কিছুক্ষণ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম, 'যাবে কি না ভাবছ?'

সে বলিল, 'যাওয়া উচিত কি না ভাবছি। গৃহস্বামী ডাকেন নি, হয়তো ব্যাপারটা অপঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়; এ অবস্থায় নেংটির ডাক শুনে যাওয়া উচিত হবে কি?'

আমি বিবেচনা করিয়া বলিলাম, 'গৃহস্বামী বাড়ি নেই। আর যারা আছে তারা ছেলেমানুষ। বাড়িতে পুলিস এসেছে। নেংটিকে হয়তো তার মাসিমা আমাদের কাছে খবর পাঠাতে বলেছেন। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধু হিসেবে আমরা

'যদি যাই, খুব অন্যায় হবে কি?'

ব্যোমকেশ আরো কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তা বটে। চল তবে বেরুনো যাক।'

সন্তোষবাবুর বাড়িতে পৌঁছিলাম সাড়ে আটটা নাগাদ। ফটকের দেউড়িতে কেহ নাই। বাড়িটা অন্ধকারে দেখা গেল না কেবল বাড়ির বহির্ভাগে দেওয়ালের গায়ে ভারা বাঁধা হইয়াছে চোখে পড়িল। বোধহয় দেওয়ালির আগে মেরামত ও চুনকামের কাজ চলিতেছে।

বাড়িতে প্রবেশ করিলেই বড় একটি সাজানো হল-ঘর, মাথার উপর চার-পাঁচটা তীব্র বৈদ্যুতিক বাল্‌ব ঘরটিকে দিনের মত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। ঘরের মাঝামাঝি স্থানে একটি নীচু গোল টেবিল তাহাকে ঘিরিয়া কয়েকটা চেয়ার এবং সোফা। আমরা ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সেখানে আট-দশ জন পুরুষ রহিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইউনিফর্ম-পরা পুলিস।

আমরা প্রবেশ করিলাম কেহ লক্ষ্য করিল না। একজন ইন্সপেক্টর টেবিলের সামনে বসিয়া নত হইয়া ডায়েরিতে কিছু লিখিতেছিলেন, বাকি সকলে টেবিল ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সকলের দৃষ্টি ইন্সপেক্টরের দিকে। পুলিসের লোক বাদ দিলে কেবল চারজন লোক চোখে পড়িল তাহাদের মধ্যে নেংটিকে চিনিতে পারিলাম। বাকি তিনজনের মধ্যে একজন যে সেক্রেটারী রবিবর্মা তাহা তাহার মঙ্গোলীয় মুখ দেখিয়া সহজেই বোঝা যায়। অবশিষ্ট দুইজন অল্পবয়স্ক যুবক, সুতরাং নিশ্চয় যুগলচাঁদ ও উদয়চাঁদ। দুজনের মুখেই শক্-খাওয়া তবুথবু ভাব, এখনো প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় নাই।

আমরা প্রবেশ করিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইলাম। ব্যোমকেশ একবার ঘরের চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল। বাঁ দিকে আসবাব কিছু নাই, কেবল দূরের কোণে উঁচু টিপয়ের উপর টেলিফোন মাঝখানে গোল টেবিল ঘিরিয়া কয়েকজন লোক-ডান দিকে প্রায় দেওয়ালের কাছে সাদা কাপড় ঢাকা একটি মূর্তি মেঝেয় পড়িয়া আছে তাহার ওপারে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ির নিম্নতম ধাপে দুইটি স্ত্রীলোক ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া বসিয়া আছে নিশ্চয় শ্রীমতী চামেলি ও রিংকি। তাহাদের চোখে অবিমিশ্র বিভীষিকা তাহারা চাদর ঢাকা মৃতদেহের পানে চাহিতেছেন না, একদৃষ্টে ঘরের মাঝখানে সমবেত মানুষগুলির পানে চাহিয়া আছেন।

ব্যোমকেশও এক নজরে সব দেখিয়া লইয়া সেইদিকেই অগ্রসর হইল, টেবিলের সম্মুখস্থ হইয়া বলিয়া উঠিল, 'আরে! এ কে রে!'

ইন্সপেক্টর ডায়েরি হইতে মুখ তুলিলেন, অন্য সকলে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল। ইন্সপেক্টর ডায়েরি বন্ধ করিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশ! তুমি কোথেকে?'

ব্যোমকেশ তাঁহার হাতে হাত মিলাইল, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিল না; আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। জানিতে পারিলাম, ইহার নাম অতুলকৃষ্ণ রায়, সংক্ষেপে এ কে রে। কলেজে ব্যোমকেশের সহাধ্যায়ী ছিলেন, এখন কলিকাতায় আছেন। আমার সহিত ইতিপূর্বে দেখা না হলেও ব্যোমকেশের সহিত কালে-ভদ্রে দেখাশোনা হয়। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, খুব আমুদে লোক, কিন্তু কাজের সময় গম্ভীর ও মিতভাষী।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ব্যাপার কি? শুনলাম একটি মেয়ের মৃত্যু হয়েছে!'

'হ্যাঁ।' কিছুক্ষণ নত-চক্ষে চিন্তা করিয়া এ কে রে বলিলেন, 'এস, তোমাকে বলছি।'

আমরা দল হইতে একটু দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম, এ কে রে অল্প কথায় ঘটনা বিবৃত করিলেন।—তিনি এখন এই এলাকার থানাদার দারোগা। আজ সন্ধ্যা সাতটা বাজিতে দশ মিনিটে তিনি টেলিফোনে খবর পান যে, সন্তোষবাবুর বাড়িতে একটি অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছে; ফোন করিয়াছিলেন সেক্রেটারী রবিবর্মা। এ কে রে তৎক্ষণাৎ লোকজন লইয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ির পশ্চিমদিকে, যেদিকে ভারা বাঁধা হয় নাই, সেইদিকে বাড়ির ঠিক ভিতের কাছে মৃতা যুবতীর দেহ পাওয়া গিয়াছে। এ কে রে পুলিস ডাক্তারকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, উচ্চ স্থান হইতে পতনের ফলে ঘাড়ের কশেরু ভাঙিয়া মৃত্যু হইয়াছে, মৃত্যুর কাল অনুমান একঘণ্টা আগে, অর্থাৎ ছ'টা সাড়ে ছ'টার সময়। এ কে রে তখন তিনতলার খোলা ছাদে গিয়া দেখিলেন, ছাদের মাঝখানে এক ছোট মাদুরের আসন পাতা রহিয়াছে, তার পাশে এক জোড়া মেয়েলি চপ্পল। খবর লইয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, মেয়েটি প্রত্যহ সূর্যাস্তের সময় ছাদে আসিয়া বসিত। সন্দেহ রহিল না যে আজও মেয়েটি ছাদে গিয়াছিল এবং ছাদ হইতে পড়িয়া মরিয়াছে।

বিবৃতি শেষ করিয়া এ কে রে পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, 'কিন্তু তোমাকে খবর দিল কে?'

ব্যোমকেশ নেংটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ওই ছেলেটি। ওর নাম নেংটি দত্ত। ও আমার কাছে যাতায়াত করে। বোধহয় ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে ফোন করেছিল।'

নেংটি কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আমাদের দিকেই তাকাইয়াছিল, এ কে রে কিছুক্ষণ তাহাকে নিবিষ্ট চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'হুঁ। তা তুমি এখন কি করতে চাও?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি আর করব। নেহাৎ পারিবারিক বন্ধু হিসেবেই এসেছি, সত্যান্বেষী হিসেবে নয়। তোমার কী রকম মনে হচ্ছে? অপঘাত মৃত্যু?'

এ কে রে বলিলেন, 'অ্যাক্সিডেন্টই মনে হচ্ছে। তবে—' তিনি বাক্যটি অসমাপ্ত রাখিয়া দিলেন, তাঁহার চোখে একটু হাসির আভাস দেখা দিল।

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল। বলিল, 'বাড়ির সকলের জবানবন্দী নিয়েছ?'

এ কে রে বলিলেন, 'হ্যাঁ। কেবল গৃহস্বামীকে এখনো পাইনি। তিনি কোথায় তাও কেউ বলতে পারছে না। শুনলাম, উইক-এন্ডএ তিনি বাড়ি থাকেন না।' আবার তাঁহার চোখের মধ্যে হাসি ফুটিল।

ব্যোমকেশ বলিল 'জবানবন্দীর নকল তৈরি হলে আমাকে এক কপি দেবে?'

এ কে রে বলিলেন, 'দেব। কাল বিকেলে পাবে। লাশ দেখতে চাও?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেখতে পারি। ক্ষতি কি?'

যেখানে চাদর-ঢাকা মৃতদেহ পড়িয়াছিল এ কে রে আমাদের সেখানে লইয়া গেলেন, চাদরের খুঁট ধরিয়া চাদর সরাইয়া দিলেন। অত্যুজ্জ্বল আলোকে মৃতা হেনা মল্লিককে দেখিলাম।

সে রূপসী ছিল বটে, নেংটি মিথ্যা বলে নাই। গায়ের রঙ দুধে আলতা, ঘন সুকৃষ্ণ চুল অবিন্যস্ত হইয়া যেন মুখখানিকে আরো ঘনিষ্ঠ কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে, ভুরু দু'টি তুলি দিয়া আঁকা। চক্ষু অর্ধ নিমীলিত, গাঢ়-নীল চোখের

তারা অর্ধেক, দেখা যাইতেছে, দেহে ভরা যৌবনের উচ্ছলিত প্রগল্‌ভতা! মৃত্যু তাহার প্রাণটুকুই হরণ করিয়া লইয়াছে, দেহে কোথাও আঘাতচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই, যৌবনের লাবণ্য তিলমাত্র চুরি করিতে পারে নাই। এই দেহ দু'দিনের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে ভাবিতেও কষ্ট হয়।

আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দেখিতেছি, হঠাৎ পিছন দিকে শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইলাম। যুগল ও উদয় আমাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উদয়ের চক্ষু রক্তবর্ণ, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, সে যুগলের দিকে ফিরিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, 'যুগল, তুই হেনাকে মেরেছিস!'

যুগল আগুন-ভরা চোখ তুলিয়া উদয়ের পানে চাহিল, শীর্ণ-কঠিন স্বরে বলিল, 'আমি--হেনাকে--মেরেছি' মিথ্যেবাদী! তুই মেরেছিস।'

এক মুহূর্ত বিলম্ব হইলে বোধকরি দুই ভাইয়ের মধ্যে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। কিন্তু সিঁড়ির উপর উপবিষ্ট দু'টি স্ত্রীলোকই তাহা হইতে দিল না। শ্রীমতী চামেলি এবং চিংড়ি একসঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইলেন। চামেলি উদয়ের বুকে দু'হাত রাখিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিতে দিতে তীক্ষ্ণ ভাঙা-ভাঙা গলায় বলিলেন, হতভাগা! এসব কী বলছিস তুই! চলে যা এখান থেকে, নিজের ঘরে যা। হেনাকে কেউ মারেনি, ও নিজে ছাদ থেকে পড়ে মরেছে।'

ওদিকে চিংড়ি যুগলের হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্র-হ্রস্ব কণ্ঠে বলিতেছে, 'দাদা, দু'টি পায়ে পড়ি, চলে এস, এখানে থেকো না। চল তোমার শোবার ঘরে—লক্ষ্মীটি!'

যুদ্ধ থামিল বটে, কিন্তু দু'জনের কেহই ঘর ছাড়িয়া গেল না, রক্তিম চক্ষে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বা পুলিসের লোকেরা কেহই এই সহসা-স্ফুরিত কলহ নিবারণের চেষ্টা করে নাই, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয় তাহারা প্রতীক্ষা করিতেছে এই ঝগড়ার সূত্রে যদি কোন গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু ঝগড়া যখন অর্ধপথে বন্ধ হইয়া গেল তখন এ কে রে উদয়ের কাছে গিয়া বলিলেন, 'আপনি এখনি অভিযোগ করলেন যে আপনার ভাই হেনাকে মেরেছে। এ অভিযোগের কোন ভিত্তি আছে কি?'

উদয় উত্তর দিল না, গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শ্রীমতী চামেলি তীব্র-দৃষ্টিতে ইন্সপেক্টরের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্বেই হঠাৎ ঘরের আবহাওয়া যেন মন্ত্রবলে পরিবর্তিত হইল।

সদর দরজার সামনে একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মধ্যমাকৃতি মানুষ, একটু ভারী গোছের গড়ন কিন্তু মোটা নয়; মুখে লালিত্য না থাক, দৃঢ়তা আছে। বেশভূষা একটু শৌখিন ধরনের, গিলেকরা পাঞ্জাবি ও কোঁচানো থান-ধুতির নীচে সাদা চামড়ার বিদ্যাসাগরী চটি। খবরের কাগজে তাঁহার অজস্র ছবি দেখিয়াছি; সুতরাং সন্তোষ সমাদ্দারকে চিনিতে কষ্ট হইল না। কিন্তু ছবিতে যাহা পাই নাই তাহা এখন পাইলাম, লোকটির একটি প্রবল ব্যক্তিত্ব আছে, তিনি যেখানে উপস্থিত আছেন সেখানে তিনিই প্রধান, অন্য কেহ সেখানে কল্‌কে পায় না।

তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীমতী চামেলি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না, দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেলেন; ক্ষণেক পরে উদয়ও উপরে চলিয়া গেল। বাকি সকলে

যেমন ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি যখন সন্তোষবাবুকে দেখিলাম তখন তিনি দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ চক্ষে ভূমি-শায়িত মৃতদেহের পানে চাহিয়া আছেন। কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি মৃতের পায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার মুখের পেশীগুলি কঠিন হইয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি একবার বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আবার পরিষ্কার হইল। তিনি কাহাকেও সম্বোধন না করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'যাক, বাপ-মা-মেয়ে সবাই অপঘাতে গেল! আশ্চর্য ভবিতব্য।'

আশ্রিত বন্ধুকন্যার মৃত্যুতে তিনি শোকে অভিভূত হইবেন কেহ প্রত্যাশা করে নাই, তবু তাঁহার এই অটল সংযমের জন্যও প্রস্তুত ছিলাম না; একটু বেশি নীরস ও কঠিন মনে হইল। যাহোক, তিনি মৃতদেহ হইতে চক্ষু তুলিয়া একে একে আমাদের দেখিলেন, বলিলেন, 'আপনারা তো দেখছি পুলিস। এঁরা কে?' বলিয়া ব্যোমকেশের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

ব্যোমকেশ একটু অপ্রস্তুত ভাবে গলা-ঝাড়া দিয়া বলিল, 'অনাহূত অতিথি বলতে পারেন। আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী, ইনি আমার বন্ধু অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের আপনি চেনেন না, কিন্তু নেংটি--'

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'না চিনলেও নাম জানি। নেংটি আপনাদের ডেকে এনেছে?' তিনি নেংটির দিকে চক্ষু ফিরাইলেন।

নেংটি পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল 'আমি—মাসিমা খুব ভয় পেয়েছিলেন--'

বেশ করেছ তুমি ব্যোমকেশবাবুকে খবর দিয়েছ। বিপদের সময় বন্ধুর কথাই আগে মনে পড়ে।' তাঁহার কণ্ঠস্বরে প্রসন্নতার আভাস পাওয়া গেল, তিনি ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'নেংটি বুঝি আপনার বন্ধু?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বলতে পারেন।'

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'ভাল ভাল।' এ কে রে'কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আপনার কাজ কি শেষ হয়েছে?'

এ কে রে বলিলেন 'আর সব কাজই শেষ হয়েছে, লাশ চালান দিয়েই আমরা চলে যাব।'

কথাটা বোধহয় সন্তোষবাবুর মনে আসে নাই, তিনি থমকিয়া বলিলেন, 'ঠিক তো। পোস্ট-মর্টেম করতে হবে।' তিনি একবার চকিতের জন্য মৃতদেহের পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, 'আমার কিছু বলবার নেই আপনার যা কর্তব্য তাই করুন।'

তিনি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইলে এ কে রে বলিলেন, যদি আপত্তি না থাকে, আপনাকে দু' চারটে প্রশ্ন করতে চাই।'

সন্তোষবাবু থামিয়া গিয়া বলিলেন, 'আপত্তি কিসের? আপনারা বসুন, আমি এখনি আসছি! রবি, এঁদের খাবার-ঘরে বসাও। আর চিংড়ি তুমি এঁদের জন্যে চা-জলখাবারের ব্যবস্থা কর।'

তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। রবিবর্মা সামনে আসিয়া বলিল, 'আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।'

এ কে রে একজন অফিসারকে মৃতদেহের কাছে দাঁড় করাইয়া রবিবর্মার অনুসরণ করিলেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে চলিলাম।

পাঠকের সুবিধার জন্য এইখানে বাড়ির একটি প্ল্যান দেওয়া হইল।
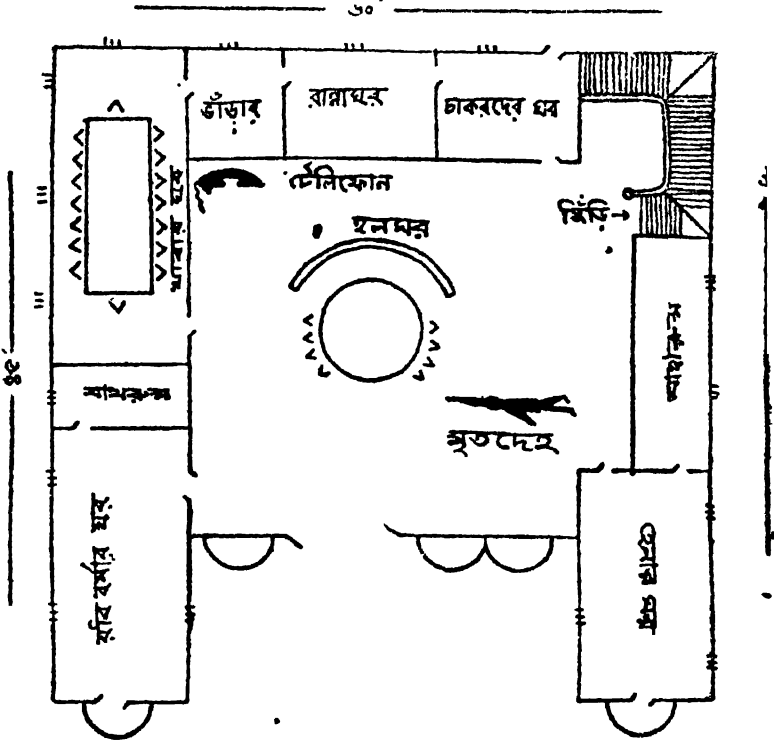
সন্তোষবাবুর ভোজন-কক্ষটি বেশ বড়, লম্বা টেবিলে বারো-চৌদ্দ জন একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতে পারে। আমরা গিয়া চেয়ারগুলিতে উপবিষ্ট হইলাম। লক্ষ্য করিলাম, যুগলচাঁদ, নেংটি ও চিংড়ি আমাদের সঙ্গে আসে নাই। রবিবর্মা বসিল না, কর্তার আগমনের প্রতীক্ষায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

এ কে রে'র পাশের চেয়ারে ব্যোমকেশ বসিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'হেনা মল্লিকের ঘরটা দেখেছ নাকি?'

এ কে রে বলিলেন, 'মোটামুটি দেখেছি! অতি সাধারণ একটা শোবার ঘর। আসবাবপত্রও বেশি কিছু নেই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চিঠিপত্র?'

এ কে রে বলিলেন 'এখনও ভাল করে দেখা হয়নি। যাবার আগে আর একবার দেখে যাব। তুমি দেখবে?'

'দেখব।'

এই সময় যে অফিসারটি লাশ পাহারা দিতেছিল, সে আসিয়া এ কে রে'র কানের কাছে খাটো গলায় বলিল, 'ভ্যান্ এসেছে, লাশ রওনা করে দেব?'

এ কে রে বলিলেন, 'দাও।'

অফিসার চলিয়া গেল। আমরা নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলাম। খোলা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রবিবর্মা হল-ঘরের দিকে অপলক চাহিয়া ছিল, আমরা তাহার চক্ষু দিয়াই যেন মৃতদেহ স্থানান্তরণের কার্যটা দেখিতে পাইলাম। ক্ষণেকের জন্য তাহার মঙ্গোলীয় চোখে একটা ক্ষুধিত অতৃপ্ত লালসা দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। এই পলকের দৃষ্টি জানাইয়া দিয়া গেল সেক্রেটারী রবিবর্মার মন হেনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ছিল না।

তারপর সন্তোষবাবু আসিয়া টেবিলের শীর্ষস্থিত চেয়ারে বসিলেন। তিনি শৌখীন বেশ-বাস ত্যাগ করিয়া মামুলি আটপৌরে জামা-কাপড় পরিয়াছেন। উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'রবি, সিগারেট নিয়ে এস।

রবিবর্মা তাড়াতাড়ি সিগারেট আনিতে গেল, সন্তোষবাবু এ কে রে'র পানে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনি বোধহয় হেনা সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করতে চান? দুঃখের বিষয়, তার কথা আমি বিশেষ কিছু জানি না। মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু তাকে ভাল করে জানবার সুযোগ হয়নি। একে তো আমি বাড়িতে কম থাকি, তাছাড়া হেনাও খুব মিশুক মেয়ে ছিল না। যাহোক—'

রবিবর্মা সিগারেটের কৌটা ও দেশলাই আনিয়া সন্তোষবাবুর সম্মুখে রাখিল, তিনি কৌটার ঢাকা খুলিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিলেন- আসুন।' সিগারেট লইতে লইতে ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া বলিল, 'শুনেছিলাম এ বাড়িতে ধূমপান নিষিদ্ধ।'

সন্তোষবাবু ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, 'আপনাদের জন্যে নিষিদ্ধ নয়।' তিনি নিজে একটা সিগারেট মুখে দিলেন, দেশলাই জ্বালিয়া আমাদের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

'এবার কি প্রশ্ন করবেন করুন।'

এ কে রে রাইটার জমাদারকে ইশারা করিলেন, সে খাতা-পেন্সিল বাহির করিল। তখন প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল।

প্রশ্ন ঃ হেনার বাবার নাম কি?

উত্তর ঃ কমল মল্লিক।

প্রশ্ন ঃ কমল মল্লিক আপনার বন্ধু ছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। তাঁকে প্রায় পনেরো বছর ধরে চিনতাম। ব্যবসার সূত্রে আমাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হত এখনো হয়। কমল মল্লিকের সঙ্গে ঢাকায় জানাশোনা হয়েছিল, তারপর ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হয়।

প্রশ্ন ঃ তাহলে হেনা কলকাতায় আসবার আগেও তাকে দেখেছেন?

উত্তর ঃ অনেক বার। ওর তিন-চার বছর বয়স থেকে ওকে দেখছি।

প্রশ্ন ঃ ওকে আশ্রয় দেবার ফলে বাড়িতে কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল কি?

একটু থমকিয়া গিয়া সন্তোষবাবু বলিলেন আমার স্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর শুচিবাই আছে; হেনা পাকিস্তানের মেয়ে, তার আচার-বিচার নেই, এই অছিলায় তিনি হেনাকে নিজের হাঁড়ি-হেঁশেল থেকে খেতে দিতে অসম্মত হয়েছিলেন। কাছেই একটা হোটেল আছে, সেখান থেকে হেনার খাবার আনার

ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।'

প্রশ্ন ঃ আর কেউ আপত্তি করে নি?

উত্তর ঃ আর কারুর আপত্তি করার সাহস নেই।

প্রশ্ন ঃ বাড়িতে কারুর সঙ্গে হেনার মেলামেশা ছিল না?

উত্তর ঃ মেলামেশার বাধা ছিল না। তবে হেনা মিশুকে মেয়ে ছিল না, বাপ-মায়ের মৃত্যুর শকটাও বোধহয় সামলে উঠতে পাবে নি। তাই সে একা-একাই থাকতো, নিজের ঘর ছেড়ে বড় একটা বেরুতো না।

প্রশ্ন ঃ সে রোজ সন্ধ্যেবেলা তেতলার ছাদে উঠে বেড়াতো আপনি জানেন?

উত্তর ঃ আগে জানতাম না, আজ জানতে পেরেছি।

প্রশ্ন ঃ কার কাছে জানতে পারলেন?

উত্তর ঃ যে আমাকে টেলিফোনে মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছিল তার কাছে।

প্রশ্ন ঃ কে মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছিল?

সন্তোষবাবু কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া রহিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'তাই তো, কে খবর দিয়েছিল তা তো লক্ষ্য করিনি। আমি যেখানে ছিলাম সেখানকার ঠিকানাও তো কেউ জানে না।' তিনি হঠাৎ রবিবর্মার দিকে তীব্র চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, 'রবি।'

রবিবর্মা গাঢ় স্বরে বলিল, 'আজ্ঞে না, আমি ফোন করিনি।'

আমরা একবার মুখ তাকাতাকি করিলাম। এ কে রে বলিলেন, 'টেলিফোনে গলার আওয়াজ শুনে চিনতে পারেন নি?'

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'খবরটা পাবার পর অন্য কোন প্রশ্ন মনেই আসেনি। কিন্তু—'

এ কে রে এবার অনিবার্য প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কোথায় ছিলেন?'

সন্তোষবাবুর মুখে ঈষৎ রক্তসঞ্চার হইল, তিনি একে একে আমাদের সকলের মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া বলিলেন, 'একথা জানা কি নিতান্তই দরকার?'

এ কে রে একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছেন, তাহা তাঁহার ভাবভঙ্গী হইতে প্রকাশ পাইল; তিনি অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু হেনা মল্লিকের মৃত্যু সম্বন্ধে আমি এখনো নিঃসংশয় হতে পারিনি। খুব সম্ভব সে অসাবধানে ছাদ থেকে নিজেই পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু কেউ তাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল -এ সম্ভাবনাও একবারে বাদ দেওয়া যায় না। তাই সব কথা আমাদের জানা দরকার।'

সন্তোষবাবু ভ্রূ তুলিয়া কিছুক্ষণ এ কে রে'র পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'হেনাকে কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল এ সম্ভাবনাও আছে?'

এ কে রে বলিলেন, 'আজ্ঞে আছে।'

সন্তোষবাবু ঈষৎ গলা চড়াইয়া বলিলেন, 'কিন্তু কে তাকে মারবে? কেন মারবে?'

এ কে রে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'তা এখনো জানি না। কিন্তু সব সম্ভাবনাই আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।'

সন্তোষবাবু আবার কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর সহসা খাড়া হইয়া বসিলেন; কড়া চোখে আমাদের সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া কড়া সুরে বলিলেন, 'বেশ, কোথায় ছিলাম বলছি। কিন্তু এটা আমার জীবনের একটা

গুপ্তকথা, এ নিয়ে যেন কথা-চালাচালি না হয়।'

'কথা-চালাচালি হবে না। আপনি যা বলবেন, অফ্-রেকর্ড থাকবে।' এ কে রে অন্য পুলিস কর্মচারীদের ইশারা করিলেন, তাহারা উঠিয়া হল-ঘরে গেল, রাইটার জমাদারও খাতা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। ব্যোমকেশ উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল, 'আমরাও তাহলে পাশের ঘরে গিয়ে বসি।'

সন্তোষবাবু হাত তুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, না, আপনারা বসুন। আপনি উপস্থিত আছেন ভালই হল, আমি আপনাকে আমার পারিবারিক স্বার্থরক্ষার কাজে নিযুক্ত করলাম।'

ব্যোমকেশ আবার বসিয়া পড়িল। সন্তোষবাবু আর-একটা সিগারেট ধরাইয়া মৃদু মৃদু টান দিতে লাগিলেন, আমরা অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

চিংড়ি দ্বারের নিকট হইতে গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'চা নিয়ে আসব?'

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'এস।'

চিংড়ি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে খাবার ও চায়ের ট্রে লইয়া দুইজন ভৃত্য। চিংড়ি আমাদের সামনে চা ও জলখাবারের রেকাবি রাখিতে রাখিতে একবার বিস্ফারিত নেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিল। নেংটির নিকট নিশ্চয় ব্যোমকেশের পরিচয় শুনিয়াছে। তাহার দৃষ্টিতে কৌতূহল ছাড়াও এমন কিছু ছিল, যাহা নির্ণয় করা কঠিন। বোধ হয় সে মনে মনে ভয় পাইয়াছে।

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদেরও দাও।'

চিংড়ি চাকরদের লইয়া হল-ঘরে গেল, রবিবর্মাও বাহিরে গিয়া নিঃশব্দে দ্বার ভেজাইয়া দিল।

আমরা পানাহারে মনোনিবেশ করিলাম। সন্তোষবাবু কেবল এক পেয়ালা চা লইয়াছিলেন, তিনি তাহাতে একটি মৃদু চুমুক দিয়া আমাদের দিকে না চাহিয়াই বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'আমি অকলঙ্ক চরিত্রের লোক নই, কিন্তু সেজন্যে নিজেকে ছাড়া কাউকে দোষ দিই না। আমার অসংখ্য দোষের মধ্যে একটা দোষ, আমি কীর্তন শুনতে ভালবাসি।'

আমরা মুখ তুলিয়া চাহিলাম। রাজনীতির ক্ষেত্রে সন্তোষবাবু বিখ্যাত বক্তা তিনি যে তাঁহার গুপ্তকথা মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে বলিবেন তাহাতে সন্দেহ রহিল না। বস্তুত তাঁহার প্রস্তাবনার বৈচিত্র্যে তিনি আমাদের অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

আর-এক চুমুক চা পান করিয়া তিনি সিগারেটে লম্বা টান দিলেন, তারপর পেয়ালার মধ্যে সিগারেটের দগ্ধাংশ ফেলিয়া এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিতে শুরু করিলেন,—

'কীর্তন-গাইয়ে সুকুমারীর নাম বোধহয় আপনারা শুনেছেন। গান গাওয়া তার ব্যবসা, টাকা নিয়ে সভায়-মজলিশে গান গায়। দশ বছর আগে তার গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার দাম্পত্য-জীবন সুখের নয়, আমি সুকুমারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তখন সুকুমারীর বয়স বাইশ-তেইশ বছর। কিছুদিন লুকিয়ে তার বাড়িতে যাতায়াত করেছিলাম, তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কিন্তু তার বাড়িতে নানা রকম লোক আসত, কেউ গান শুনতে আসত, কেউ বায়না দিতে আসত। দেখলাম, এখানে যাতায়াত করা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়।

'আপনারা জানেন, আমার জীবন রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

স্বাধীনতার যুদ্ধে লড়েছি, জেলে গিয়েছি, পুলিসের লাঠি খেয়েছি সন্ত্রাসবাদীদের অজস্র টাকা দিয়েছি, দেশ-বিভাগের সময় দুই পক্ষের মধ্যে দূতের কাজ করেছি। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার খ্যাতি আছে, প্রতিপত্তি আছে। তেমনি আবার শত্রুও আছে। শত্রুপক্ষ যদি আমার নামে কলঙ্ক রটাবার সুযোগ পায় তাহলে আমার যশ পদমর্যাদা কিছুই থাকবে না। ভেবে-চিন্তে আমি এক কাজ করলাম, বেনামে একটি ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিলাম। উদ্দেশ্য, সুকুমারীকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তুলব, তার প্রকাশ্য গায়িকা-জীবন শেষ হবে। কিন্তু সুকুমারী তাতে রাজী হল না। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, সে নিজের বাসাতেই থাকবে এবং গানের ব্যবসা চালাবে, কেবল হপ্তার মধ্যে দু'দিন শনিবার এবং রবিবার, সে আমার ভাড়া-করা গোপন বাড়িতে এসে থাকবে। আমি সেখানে এমন ভাবে যাতায়াত করব যে কেউ জানতে পারবে না।

'গত দশ বছর ধরে এই ভাবে চলেছে। আমি শনিবার বিকেলের দিকে অফিসের কাজ সেরে সেখানে চলে যাই, তারপর সোমবার সকালে সেখান থেকে সটান অফিসে যাই। আজও তাই হয়েছিল, বেলা আন্দাজ সাড়ে তিনটের সময় সেখানে গিয়েছিলাম। তারপর—রাত্রি আটটার সময় টেলিফোন পেয়ে তৎক্ষণাৎ চলে এলাম।' তাঁহার মুখে নীরস ব্যঙ্গ ফুটিয়া উঠিল, 'এই আমার অ্যালিবাই।'

ব্যঙ্গের খোঁচা হজম করিয়া এ কে রে বিনীত স্বরে বলিলেন, 'ধন্যবাদ। ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, আর দু-একটা প্রশ্ন করেই আপনাকে নিষ্কৃতি দেব। ভাড়াটে বাড়িতে চাকর-বাকর কেউ আছে?'

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'না, ইচ্ছে করেই চাকর রাখিনি। প্রত্যেক শনিবার দুপুরবেলা সুকুমারী নিজের বাসা থেকে ভাড়াটে বাসায় চলে আসে, ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখে। আমি বিকেলবেলা যাই। তারপর সোমবারে আমি অফিসে চলে যাবার পর, সে বাড়িতে তালা দিয়ে নিজের বাসায় ফিরে যায়। হপ্তার বাকি দিন বাড়ি বন্ধ থাকে।'

প্রশ্নঃ টেলিফোন রেখেছেন কেন?

উত্তরঃ নিজের জন্যে নয়, সুকুমারীর জন্যে। সে যে-সময় ভাড়াটে বাড়িতে থাকে, সে-সময় নিজের বাসার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায়। কিন্তু প্রাইভেট নম্বর, ডিরেকটরিতে পাবেন না।

প্রশ্নঃ সেক্রেটারীকে নম্বর বলেননি?

উত্তরঃ না।

প্রশ্নঃ কার জানা সম্ভব?

উত্তরঃ কারুর জানা সম্ভব নয়। আমি কাউকে বলিনি, সুকুমারীও কাউকে বলবে না।

প্রশ্নঃ তাঁকে আপনি বিশ্বাস করেন?

উত্তরঃ করি। আমি তাকে মাসে হাজার টাকা দিই। সে নির্বোধ নয়, নিজের পায়ে কুড়ুল মারবে না।

প্রশ্নঃ আজ যখন টেলিফোন পেলেন, তখন আপনি কি করছিলেন?

উত্তরঃ কীর্তন শুনছিলাম। সুকুমারী চণ্ডীদাসের পদ গাইছিল।

এ কে রে ব্যোমকেশের পানে চক্ষু ফিরাইলেন; ব্যোমকেশ নিঃশব্দে মাথা নাড়িল, অর্থাৎ, আর কোন প্রশ্ন নাই। তখন এ কে রে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন

'আজ এই পর্যন্ত থাক। কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না। আজ কি আপনি আবার—?'

'না, ফিরে যাব না, বাড়িতেই থাকব।' সন্তোষবাবুর গম্ভীর চোখে কৌতুকের কটাক্ষ খেলিয়া গেল, তিনি বলিলেন, 'আমার পিছনে গুপ্তচর লাগিয়ে আমার বাসার সন্ধান পাবেন না।'

এ কে রে জিভ কাটিয়া বলিলেন, 'না না, সে কি কথা! আপনার গুপ্ত বাসা সম্বন্ধে আমার তিলমাত্র কৌতূহল নেই। আপনি যা বললেন আমাদের তদন্তের পক্ষে তাই যথেষ্ট। কেবল—শ্রীমতী সুকুমারীর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারলে ভাল হত।'

'তাকে তার বাসার ঠিকানায় পাবেন।' সন্তোষবাবু সুকুমারীর ঠিকানা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, 'দশটা বাজে। আপনার কাজ বোধহয় এখনো শেষ হয়নি, যতক্ষণ দরকার থাকুন। ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমার পক্ষ থেকে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে থাকবেন তো?'

'নিশ্চয়' বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি তাহলে বিশ্রাম করি গিয়ে। একটু ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।'

তিনি দৃঢ়পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার শরীরে ক্লান্তির কোন লক্ষণ চোখে পড়িল না। বোধহয় মনের ক্লান্তি। বাড়িতে এতবড় দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর—

সন্তোষবাবু যেভাবে তাঁহার গুপ্তকথা প্রকাশ করিলেন তাহাতে ঢাকঢাক গুড়গুড় নাই, নিজের সম্বন্ধে সাফাই গাহিবার চেষ্টা নাই—জীবনের গূঢ় সত্য কথা যখন বলিতেই হইবে তখন স্পষ্ট ভাবে বলাই ভাল। তবু তাঁহার নির্মম সত্যবাদিতা আমার মনকে পীড়া না দিয়া পারিল না। তিনি পাকা ব্যবসায়ী এবং ঝানু রাজনীতিজ্ঞ, তাঁহার চরিত্রে এই কালো দাগটা না থাকিলেই বোধহয় ভাল হইত।

এ কে রে ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলেন, 'অতঃপর?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, হেনার ঘরটা একবার দেখে যাই।'

'চল।—ছাদে যাবে নাকি?'

'যাব। এসেছি যখন, যা-যা দ্রষ্টব্য আছে সবই দেখে যাই।'

হল-ঘরের গোল টেবিলের কাছে বসিয়া পুলিসের বাকি কর্মচারীরা নিম্নস্বরে বাক্যালাপ করিতেছিলেন, রবিবর্মা ছাড়া বাড়ির লোক আর কেহ উপস্থিত ছিল না। হেনার ঘর ডাইনিং-রুম হইতে কোনাকুনি ভাবে হল-ঘরের অপর প্রান্তে। (প্ল্যান পশ্য।) হেনার ঘরের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত, আলো জ্বলিতেছে। আমরা তিনজনে ঘরে প্রবেশ করিলাম। রবিবর্মা আমাদের পিছন পিছন আসিল।

ঘরটি বেশ বড়। সদরের দিকে ধনুরাকৃতি বড় জানালা, পূর্বদিকের দেয়ালেও একটি সাধারণ জানালা আছে। এই জানালার সামনে টেবিল ও চেয়ার, পাশে বইয়ের শেলফ্। ঘরের অন্য পাশে সংকীর্ণ একহারা খাটের উপর বিছানা পাতা: খাটের নীচে বড় বড় দু'টি সুটকেস দেখা যাইতেছে। উত্তর দিকে দেয়ালের কোণে একটি সরু দরজা সংলগ্ন বাথরুমের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। ঘরে

আসবাবের বাহুল্য নাই, তাই ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্ন দেখাইতেছে। সম্ভবত হেনাও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের মেয়ে ছিল।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল 'ঘরের দরজা কি খোলা ছিল?'

এ কে রে বলিলেন, না, তালা লাগানো ছিল। মৃতদেহের হাতে একটা চামড়ার হ্যান্ড ব্যাগ ছিল, তার মধ্যে চাবির রিঙ্ পাওয়া গেছে। এই যে।' তিনি পকেট হইতে একটি চাবির গোছা বাহির করিয়া দিলেন।

চাবি হাতে লইয়া ব্যোমকেশ বলিল 'হেনা তাহলে ঘরে তালা দিয়ে ছাদে গিয়েছিল।'

এ কে রে বলিলেন, 'তাই তো দেখা যাচ্ছে।'

রবিবর্মা মুখের সামনে মুষ্টি রাখিয়া গলায় কাশির মত একটা শব্দ করিল। ব্যোমকেশ তাহার দিকে চক্ষু ফিরাইলে সে বলিল, 'হেনা দোর খুলে রেখে ঘর থেকে কখনো এক পা বেরুতো না, যখনি বেরুতো দোরে তালা দিয়ে বেরুতো।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই নাকি? গোড়া থেকেই এই রকম, না, কোন উপলক্ষ্য হয়েছিল?'

'গোড়া থেকেই এই রকম।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না, চাবির রিঙ্ পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'পাচটা চাবি রয়েছে দেখছি। একটা তো দোরের তালার চাবি। আর অন্যগুলো?'

এ কে রে বলিলেন, 'বাকিগুলোর মধ্যে দুটো হচ্ছে সুটকেসের চাবি। অন্য দুটো কোথাকার চাবি জানা গেল না।'

ব্যোমকেশ চাবিগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'একটা চাবিতে নম্বর খোদাই করা রয়েছে—৭ নম্বর। দেখ তো এ চাবিটা কোথাও লাগে কি না।'

এ কে রে চাবিটি দেখিয়া বলিলেন, না। যে চাবি দুটোর তালা পাওয়া যাচ্ছে না এটা তারই একটা।'

'টেবিলের দেরাজে তালা নেই?'

'আছে। কিন্তু দেরাজগুলো সব খোলা। চাবি নেই।'

হুঁ। –কি মনে হয়?'

দুজনে চোখে চোখে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, শেষে এ কে রে বলিলেন, 'বলা শক্ত। অনেক সময় দেখা যায় তালা হারিয়ে গেছে, কিন্তু চাবিটা রিঙে রয়ে গেছে।'

ব্যোমকেশ রবিবর্মার দিকে চাহিয়া বলিল 'আপনি কিছু বলতে পারেন?'

রবিবর্মা মাথা নাড়িল, 'এ-ঘরের ভিতরের কথা আমি কিছু বলতে পারি না। এই প্রথম ঘরে ঢুকলাম।

ব্যোমকেশ গলার মধ্যে শব্দ করিল চাবির গোছা এ কে রে-কে ফেরৎ দিয়া টেবিলের সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

একদিকে দেরাজযুক্ত টেবিল, লাল বনাত দিয়া ঢাকা, তাহার উপর দু-একটি বই ছাড়া আর কিছু নাই। তারপর চোখে পড়িল লাল বনাতের উপর একটি লাল গোলাপফুল পড়িয়া আছে। ঘরে ফুলদানি নাই, গোলাপফুলটা এমন অনাদৃত ভাবে পড়িয়া আছে যে আশ্চর্য লাগে।

ব্যোমকেশ ফুলটিকে স্পর্শ করিল না, সম্মুখে ঝুঁকিয়া সেটি ভাল ভাবে দেখিল, তারপর টেবিলের শিয়রে খোলা জানালার দিকে চোখ তুলিয়া বলিল,

'তাজা ফুল। বাগানে গোলাপফুল আছে?' জানালার বহির্ভাগের দৃশ্য অন্ধকারে দেখা যাইতেছিল না।

রবিবর্মা বলিল, 'আছে।'

ব্যোমকেশ এ কে রে-কে বলিল, 'গোলাপটা দেখে কী মনে হয়? এমন ভাবে টেবিলের ওপর পড়ে আছে কেন?'

এ কে রে নীরবে জানালার বাহিরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। হেনা যখন ঘরে ছিল না, সেই সময় কেউ বাগান থেকে ফুলটা তুলে জানালার গরাদের ফাঁকে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়েছে।' আমাদের সকলের চক্ষু রবিবর্মার দিকে ফিরিল, সকলের চোখে একই প্রশ্ন—কে ফেলতে পারে?

রবিবর্মা কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসু চক্ষু এড়াইয়া এদিকে-ওদিকে চাহিতে লাগিল, শেষে বলিল, 'আমি কিছু জানি না।'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া দেরাজগুলি খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল, আমি বইয়ের শেলফের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম।

দু-সারি বই। প্রথম সারিতে রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা, সত্যেন দত্তের কাব্যসঞ্চয়ন, নজরুলের সঞ্চিতা এবং আধুনিক লেখকদের রচিত কয়েকটি কথাকাহিনীর পুস্তক। দ্বিতীয় সারিতে অনেকগুলি ইংরেজি উপন্যাসের সুলভ সংস্করণ। হেনা বিদেশী রহস্য-রোমাঞ্চের বইও পড়িত।

'অজিত, দ্যাখো।'

আমি ফিরিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ দেরাজ হইতে একটি ফটোগ্রাফ বাহির করিয়াছে এবং একদৃষ্টে তাহা দেখিতেছে। কার্ডবোর্ডের উপর আঁটা পোস্টকার্ড সাইজের ছবিতে কেবল একটি রমণীর প্রতিকৃতি। আমি এক নজর দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'হেনার ফটো।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না। ছবিটা কয়েক বছরের পুরনো, দেখছ না হলদে হয়ে গেছে, অথচ মহিলাটির বয়স পঁচিশের কম নয়। হেনা হতে পারে না, বোধহয় হেনার মা। হেনা এত রূপ কোথা থেকে পেয়েছিল বোঝা যাচ্ছে।'

হেনাকে জীবিত অবস্থায় দেখি নাই, মৃতদেহ দেখিয়া রূপ অনুমান করিয়াছিলাম। এখন এই ফটো দেখিয়া মনে হইল হেনাকে জীবন্ত অবস্থায় দেখিতেছি। শুধু রূপ নয়, অফুরন্ত প্রাণশক্তি সর্বাঙ্গ দিয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে।

ব্যোমকেশ ছবিটা এ কে রে-র হাতে দিয়া বলিল, 'এটা রাখো। সন্তোষবাবুকে জিজ্ঞেস করতে হবে ছবিটা হেনার মায়ের কিনা।'

এ কে রে ছবিটি লইয়া চোখ বুলাইলেন, রবিবর্মা গলা বাড়াইয়া দেখিয়া লইল। লোকটির চোখ-মুখ দেখিয়া কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু প্রাণে যথেষ্ট কৌতূহল আছে।

এ কে রে ফটো পকেটে রাখিলেন, বলিলেন, 'আচ্ছা। দেরাজে আর কিছু পেলে?'

'না। খুচরো দু-চারটে টাকা পয়সা আছে; এমন কিছু নেই। রবিবাবু, হেনার নামে চিঠিপত্র আসত কিনা আপনি জানেন?'

রবিবর্মা বলিল, 'চিঠি আসার সময় আমি বাড়িতে থাকি না। নেংটি কিংবা চিংড়ি বলতে পারে।'

আর কিছু না বলিয়া ব্যোমকেশ বইয়ের শেলফের কাছে আসিল, বইগুলির মলাটের উপর একবার চোখ বুলাইয়া সঞ্চয়িতা বইখানি হাতে লইল। মলাট খুলিতেই দেখা গেল, এক টুকরা গোলাপী কাগজ ভাঁজের মধ্যে রহিয়াছে। কাগজের উপর চার ছত্র হাতের লেখা। ব্যোমকেশ কাগজটি দু' আঙুলে তুলিয়া ধরিয়া দেখিতেছে, রবিবর্মা বকের মত সেদিকে গলা বাড়াইল। ব্যোমকেশ কিন্তু তাহাকে লেখাটি পড়িতে দিল না চট করিয়া কাগজ পকেটে পুরিল। রবিবর্মার মুখে ভাবান্তব হইল না বটে, কিন্তু তাহার প্রাণটা যে ঐ লেখাটি পড়িবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতেছে, তাহা অনুমান করা শক্ত হইল না।

ব্যোমকেশ একে একে অন্য বইগুলি খুলিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল, এ কে রে এবং আমি দুইপাশে দাঁড়াইয়া তাহার কার্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম। আমাদের পিছনে রবিবর্মা অতৃপ্ত প্রেতাত্মার মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমাদের পিছনে থাকিয়া সে দেখিতে পাইতেছে না আমরা কি করিতেছি, তাই দুর্নিবার কৌতূহলে ছটফট কবিতেছে। এত কৌতূহল কিসের?

উপরের থাকে বাংলা বইগুলিতে আর কিছু পাওয়া গেল না। বইগুলির প্রথম পৃষ্ঠায় পরিচ্ছন্ন মেয়েলি ছাঁদে লেখা আছে হেনা মল্লিক।

নীচের থাকের ইংরেজি বইগুলিতেও কাগজ-পত্র কিছু নাই, কিন্তু একটি বিষয়ে ব্যোমকেশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কয়েকটি বইয়ের নাম-পৃষ্ঠায় রবার-স্ট্যাম্প দিয়া ঢাকার একটি পুস্তক-বিক্রেতার নাম ছাপা আছে। এ কে রে ভ্রূ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, আমিও ভ্রূ তুলিলাম। কিন্তু ব্যোমকেশ কিছু বলিল না; রবিবর্মার সান্নিধ্যবশতই বোধ হয় মুখ খুলিল না।

বই দেখা শেষ হইলে ব্যোমকেশ বলিল, 'সুটকেস দুটোতে কি আছে, খোল না একবার দেখি।'

এ কে বে চাবিব গোছা বাহির করিয়া সুটকেস দু'টি খুলিলেন। দেখা গেল, তাদের মধ্যে নানা জাতীয় মেয়েলি পোশাক থরে থরে সাজানো রহিয়াছে। শাড়ি-স্কার্ট-ঘাঘ্রা-ওড়না-কামিজ-পায়জামা প্রভৃতি সর্বজাতীয় পরিচ্ছদ। সবই দামী জিনিস। ব্যোমকেশ সেগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'না, কাজের জিনিস কিছু নেই। বাথরুমটা তো তুমি দেখেছ '

এ কে রে বলিলেন, 'দেখেছি। বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নেই।'

'আমিও একবার দেখে যাই।' ব্যোমকেশ বাথরুমে প্রবেশ করিল। মিনিট দুই-তিন পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'চল, এবার ছাদে যাওয়া যাক।'

ঘরের দরজা হইতে কয়েক পা সামনের দিকে সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে। বেশ চওড়া বাহারে সিঁড়ি। ব্যোমকেশ সিঁড়িব নীচের ধাপে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'রবিবাবু, আপনি আর আমাদের সঙ্গে আসবেন না, ছাদ আমরা নিজেরাই দেখে নিতে পারব।' কথাগুলি বলার ভঙ্গিতে এমন একটি দৃঢ়তা ছিল যে, রবিবর্মা আর অগ্রসর হইল না, সিঁড়ির পদমূলে দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা উপরে উঠিয়া গেলাম।

দোতলাকে স্পর্শ করিয়া সিঁড়ি তেতলায় উ.'য়া গিয়াছে, মোড় ঘুবিবার সময় দ্বিতল যতখানি দেখা গেল এক নজরে দেখিয়া লইলাম। হল-ঘরের উপরে অবিকল আর একটি হল-ঘর, সামনের দিকে দুই কোণে দু'টি ঘর। তফাৎ এই যে, নীচের তলায় পিছনের দেয়ালে দরজা ছিল না, দ্বিতলে সারি সারি তিনটি

দরজা। অর্থাৎ, নীচের রান্নাঘর ভাড়ারঘর প্রভৃতির উপরে কয়েকটি শয়নকক্ষ, দরজাগুলি উপরের হল-ঘরের সহিত তাহাদের যোগসাধন করিয়াছে।

ত্রিতলে সিঁড়ি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে একটি বন্ধ দ্বার। এ কে রে ছিটকিনি খুলিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন এবং দ্বারের পাশে একটি সুইচ টিপিয়া ছাদের আলো জ্বালিলেন; ফ্লাড্ লাইটের আলোয় প্রকাণ্ড ছাদ উদ্ভাসিত হইল।

আমরা তিনজনে ছাদে পদার্পণ করিলাম। ব্যোমকেশ প্রথমেই দরজাটা পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'ভিতরে এবং বাইরে দু'দিক থেকেই দরজা বন্ধ করবার ব্যবস্থা আছে দেখছি; ভিতরে ছিটকিনি বাইরে শিকল। এ কে রে, তুমি যখন ছাদে এসেছিলে তখন কি দরজা বন্ধ ছিল?'

এ কে রে বলিলেন, 'না, দু'দিক থেকেই খোলা ছিল।'

বৈদ্যুতিক বন্যালোক তো ছিলই, উপরন্তু এতক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডচন্দ্র মাথা তুলিয়াছে। আমরা ছাদের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইলাম।

ছাদটি প্রকাণ্ড, ইহার উপর সুন্দর একটি টেনিস-কোর্ট তৈরি করা চলে। ছাদ ঘিরিয়া নিরেট গাঁথুনির আলিসা, আলিসার গায়ে বাহির হইতে বাঁশের ডগা উঁচু হইয়া আছে; কেবল পূর্বদিকে ভারা নাই, সম্ভবত সেদিকে মেরামতের কাজ শেষ হইয়াছে। ছাদের বাহিরে কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে বাগানের সীমানায় একসারি দীর্ঘ সিলভার পাইনের গাছ সমব্যবধানে দাঁড়াইয়া বাড়িটিকে যেন প্রহরীর মত ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ছাদ হইতে তাহাদের ঊর্ধ্বাংগ মন্দিরের চূড়ার মত দেখাইতেছে।

ব্যোমকেশ একবার চারিদিকে মুণ্ড ঘুরাইয়া সমগ্র দৃশ্যটা দেখিয়া লইল, তারপর তাহার দৃষ্টি ছাদের অভ্যন্তরে ফিরিয়া আসিল। ছাদে অন্য কিছু নাই, কেবল মধ্যস্থলে একটু পশ্চিমদিকে ঘেঁষিয়া একটি মাদুর পাতা রহিয়াছে এবং তাহার পাশে একজোড়া মেয়েলি চটিজুতা।

একটি চিত্র মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিলঃ হেনা ছাদে আসিয়া মাদুর পাতিল, চটিজুতা খুলিয়া তাহার উপর বসিল। তারপর—?

ব্যোমকেশ এই প্রতিমাহীন চিত্রপটের কাছে গিয়া দাঁড়াইল, খানিকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হেনা কোন্ দিকে পড়েছিল?'

যেদিকে ভারা বাঁধা নাই সেই দিকে নির্দেশ করিয়া এ কে রে বলিলেন, 'এই দিকে।'

তিন জনে পূর্বদিকের আলিসার কিনারায় গিয়া দাঁড়াইলাম। সামনেই চাঁদ। পঁচিশ হাত দূরে পাইনগাছের সারি মৃদু বাতাসে মর্মরধ্বনি করিতেছে, যেন হেনার অপমৃত্যু সম্বন্ধে হ্রস্বকণ্ঠে জল্পনা করিতেছে। তাহারা যদি মানুষের ভাষায় কথা বলিতে পারিত বোধহয় প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পাইতাম। 'ঐখানে পড়েছিল!' এ কে রে নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন। আমরা উঁকি মারিয়া দেখিলাম। পাইনগাছের ছায়ায় বিশেষ কিছু দেখা গেল না। আলিসাটা আমার কোমর পর্যন্ত উঁচু, এক ফুট চওড়া। হেনা আমার চেয়ে দৈর্ঘ্যে ছোটই ছিল নিশ্চয়, সে যদি কোনো কারণে নীচের দিকে উঁকি মারিয়াও থাকে, আলিসা ডিঙাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা কম।

ব্যোমকেশও বোধকরি মনে মনে মাপজোক করিতেছিল, এ কে রে'র দিকে ফিরিয়া বলিল, 'হুঁ। আলসের খাড়াই আন্দাজ চার ফুট। হেনার খাড়াই কত ছিল?'

এ কে রে ব্যোমকেশের মনের কথা বুঝিয়া বলিলেন, 'আন্দাজ পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। কিন্তু তাহলেও অসম্ভব নয়।'

'অসম্ভব বলিনি।' ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে আলিসার ধার দিয়া পরিক্রমণ করিল। ভারাগুলি মাটি হইতে ছাদ পর্যন্ত মই রচনা করিয়াছে, একটু শক্ত-সমর্থ মানুষ সহজেই মই দিয়া উপরে উঠিয়া আসিতে পারে।

ছাদ পরিদর্শন শেষ করিয়া ব্যোমকেশ ঈষৎ নিরাশ স্বরে বলিল, 'অনেক রাত হয়েছে, আজ এই পর্যন্ত থাক। হেনার ঘরটা কি সীল করবে?'

এ কে রে বলিলেন, 'সীল করার দরকার দেখি না। ও-ঘরে হেনার মৃত্যু হয়নি। উপরন্তু আমরা দু'জনেই ঘরটা খানাতল্লাশ করেছি।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না। এ কে রে আলো নিভাইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিলেন, আমরা তাঁহার পিছনে চলিলাম।

নিঃশব্দে নামিতেছি। দ্বিতল পর্যন্ত নামিয়া মোড় ঘুরিবার উপক্রম করিতেছি, পাশের দিক হইতে একটা চাপা তীক্ষ্ণ স্বর কানে আসিল—'তুমি চুপ করে থাকবে, কোনো কথা কইবে না।'

চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখি দ্বিতলে হল-ঘরের অন্য প্রান্তে রবিবর্মা ও শ্রীমতী চামেলি মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছেন। রবিবর্মা আমাদের দেখিতে পাইয়া বোধহয় নিঃশব্দে শ্রীমতী চামেলিকে ইশারা করিল তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তারপর ধারালো চোখে প্রখর অসহিষ্ণুতা ফুটাইয়া তিনি দ্রুতপদে পিছনের একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন।

নীচে নামিয়া আসিয়া ব্যোমকেশ এ কে রে'র দিকে বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'শুনলে?'

এ কে রে একটু ঘাড় নাড়িলেন, বলিলেন 'চল, পুলিস-ভ্যানে তোমাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাই।'

পরদিন রবিবার সকাল সাতটার সময় ব্যোমকেশ ও আমি সবেমাত্র চায়ের পেয়ালা লইয়া বসিয়াছি, হুড়মুড় শব্দে নেংটি ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'ব্যোমকেশদা, ভীষণ কাণ্ড!'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'ভীষণ কাণ্ড!'

নেংটি বলিল 'হ্যাঁ। একটা সিগারেট দিন!'

ব্যোমকেশ সিগারেট দিল, নেংটি তাহা ধরাইয়া দুই-তিনটা লম্বা টান দিয়া বলিল, 'কাল রাত্তিরে হেনার ঘরটা কে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।'

আমি বলিয়া উঠিলাম, 'অ্যাঁ! বাড়ি পুড়ে গেছে!'

নেংটি বলিল, বাড়ি নয়, শুধু হেনার ঘরটা পুড়েছে। খাট-বিছানা, টেবিল-আলমারি কিছু নেই, সব ছাই হয়ে গেছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, শেষে বলিল, 'রাত্তিরে কখন তোমরা জানতে পারলে?'

নেংটি বলিল, 'আমরা রাত্তিরে জানব কোত্থেকে, আমরা তো দোতলায় শুই।

রবিবর্মা নীচের তলায় শোয়, সে-ই কিছু জানতে পারেনি। একেবারে সকালবেলায় জানাজানি হল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি, বাড়িতে চেঁচামিচি হৈ-হৈ চলছে। আমি সুট করে পালিয়ে এসেছি আপনাকে খবর দিতে।'

'হুঁ। কে ঘরে আগুন দিতে পারে, বাড়ির লোক না বাইরের লোক?'

'তা আমি কি করে বলব? রাত্তিরে নীচের তলার দরজা-জানালা সব বন্ধ থাকে।'

'সকালে যখন দেখলে তখন কি হেনার ঘরে জানালা দুটো খোলা ছিল?'

'দরজা-জানালা সব পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে, খোলা ছিল কি বন্ধ ছিল বোঝবার উপায় নেই। তবে—'বলিয়া নেংটি থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'তবে কি?'

নেংটির সিগারেট আধাআধি পুড়িয়াছিল, বাকি অর্ধেক নিভাইয়া সে সযত্নে পকেটে রাখিল, বলিল, 'সিঁড়ির তলায় এক টিন পেট্রোল রাখা থাকতো, দেখা গেল টিন খালি।'

'তার মানে—'ব্যোমকেশ কথা অসমাপ্ত রাখিয়া চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া গেল।

নেংটি উঠিয়া পড়িল, বলিল, 'আমি পালাই। মাসিমা যদি জানতে পাবে আমি বাড়ি নেই, রক্ষে থাকবে না।'

ব্যোমকেশ মুখ তুলিয়া বলিল, 'বোসো। তোমাকে দু' একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

নেংটি অনিচ্ছাভরে বসিয়া বলিল, 'আর কি জিজ্ঞেস করবেন, যা জানি সব বলেছি। এবার আপনি বুদ্ধি খাটিয়ে বের করুন, কে খুন করেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুন করেছে তার কোন প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। কিন্তু সে যাক। যে-সময় হেনা ছাদ থেকে পড়ে যায় সে-সময় তুমি কোথায়?'

নেংটি বলিল, 'আমি বাড়ির মধ্যে ছিলাম না, সিগারেট খেতে বেরিয়েছিলাম।'

'কি করে জানলে যে, তুমি যখন সিগারেট খেতে বেরিয়েছিলে ঠিক সেই সময় হেনা ছাদ থেকে পড়ে যায়?'

'শুনুন। সাড়ে পাঁচটার একটু আগে আমি যখন বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি, তখন হেনার ঘরের দোর একটু ফাঁক হয়ে ছিল, দেখলাম সে খাটে বসে কাঠি দিয়ে পশমের গেঞ্জি বুনছে। আধঘন্টা পরে যখন ফিরে এলাম, তখন বাড়িতে ভীষণ কান্ড সবেমাত্র হেনার লাশ পাওয়া গেছে।'

'কে লাশ পেয়েছিল?'

'রবিবর্মা।'

'তুমি যখন বেরুচ্ছিলে তখন হল-ঘরে আর কেউ ছিল?'

'উদয়দা ছিল, আর কেউ ছিল না।'

'তুমি যখন সিগারেট খেয়ে ফিরে এলে তখন বাড়ির সবাই বাড়িতেই উপস্থিত ছিল?'

নেংটি একটু ভাবিয়া বলিল, 'মেসোমশাই ছাড়া আর সবাই উপস্থিত ছিল।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, তারপর বলিল, 'আর একটা কথা। হেনার চিঠিপত্র আসতো কিনা জানো?'

নেংটি দৃঢ়স্বরে বলিল, 'আসতো না। সকাল বিকেল যখনই চিঠি আসে, আমি

পিওনের হাত থেকে চিঠি নিই। হেনার নামে একটাও চিঠি আজ পর্যন্ত আসে নি।'

'বাইরের কারুর সঙ্গে হেনার কোন যোগাযোগ ছিল না?'

নেংটি মাথা নাড়িতে গিয়া থামিয়া গেল, তারপর কুণ্ঠিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'কী?'

নেংটি বলিল, 'কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ব্যোমকেশদা। তুচ্ছ কথা বলেই বোধহয় মনে ছিল না—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হোক তুচ্ছ, বলো শুনি।'

নেংটি ধীরে ধীরে ভাবিয়া ভাবিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, 'হেনা আসবার দশ-বারো দিন পর থেকেই ব্যাপারটা আরম্ভ হয়। আমাদের রাস্তায় বেশি গাড়ি-মোটরের চলাচল নেই, নির্জন বড়মানুষের পাড়া। একদিন বিকেলবেলা একটা ট্যাক্সি আস্তে আস্তে বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল, তার ভেতরে একটা লোক বসে মাউথ-অর্গান বাজাচ্ছে। মাউথ-অর্গান জানেন তো। চশমার খাপের মতন দেখতে, ঠোঁটের ওপর ঘষলে প্যাঁপ্‌পো প্যাঁপ্‌পো করে বাজে—খুব জোর আওয়াজ হয়—'

'জানি। তারপর বলো।'

'ট্যাক্সি চলে গেল, দু'তিন মিনিট পরে আবার উল্টো দিক থেকে মাউথ-অর্গান বাজাতে বাজাতে বাড়ির সামনে দিয়ে গেল। এই ঘটনার দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে হেনা ঘরে তালা লাগিয়ে বেরুলো। আমি প্রথমবার যোগাযোগটা বুঝতে পারিনি—'

'যে লোকটা মাউথ-অর্গান বাজাচ্ছিল তাকে দেখেছিলে?'

'দেখেছিলাম। কোট-প্যান্ট-পরা একটা লোক।'

'তারপর?'

'তারপর দশ-বারো দিন চুপচাপ, হেনা বাড়ি থেকে বেরুলো না। একদিন আমি দোতলার হল-ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, দেখলাম, একটা ট্যাক্সি আসছে; বাড়ির কাছাকাছি আসতেই তার ভেতর থেকে মাউথ-অর্গান বেজে উঠলো, আবার বাড়ি পার হয়েই থেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে ট্যাক্সি ফিরে এল, বাড়ির সামনে আর একবার প্যাঁপ্‌পো প্যাঁপ্‌পো বাজিয়ে চলে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম কী ব্যাপার, আমাদের বাড়ির সামনেই মাউথ-অর্গান বাজায় কেন? এমন সময় দেখি, হেনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেদিকে ট্যাক্সি গেছে সেই দিকে চলে গেল। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, কেউ হেনাকে ইশারা করে যায়, অমনি হেনা তার সঙ্গে দেখা করতে বেরোয়।'

'হেনা কখন ফিরে আসতো?'

'ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরে আসতো।'

'কোথায় যায় তুমি জানো?'

'কি করে জানব? একবার হেনার পিছু নিয়েছিলাম। বাড়ি থেকে শ'খানেক গজ দূরে রাস্তার ধারে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে ছিল, হেনা টুক করে তাতে উঠে পড়ল, ট্যাক্সি চলে গেল।'

'হুঁ। শেষবার কবে হবে হেনা বেরিয়েছিল?

'দশ-বারো দিন আগে।—আচ্ছা ব্যোমকেশদা, আজ তাহলে আমি পালাই, বড্ড দেরি হয়ে গেল। সুবিধে পেলেই আবার আসব।'

'আচ্ছা এস।'

নেংটি চলিয়া যাইবার পর ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে আমি নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলাম, 'কি বুঝছ?'

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'মাউথ-অর্গানের ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে, কিন্তু একটা জিনিস বোঝা যায়। হেনা কলকাতা শহরে নেহাৎ একলা ছিল না। যাহোক, হেনার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চয় হওয়া গেল: অপঘাত মৃত্যু নয়, তাকে কেউ খুন করেছে। এখন প্রশ্ন—মগ্নমৈনাকটি কে?'

বলিলাম, 'ঘরে যে আগুন লাগিয়েছিল সে-ই নিশ্চয়।'

কথাটা ব্যোমকেশের মনঃপূত হইল না, সে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। ব্যাপারটা বুঝে দেখ। একটা লোক হেনাকে খুন করেছে তার মোটিভ্ আমরা জানি না। যৌন-ঈর্ষা হতে পারে, আবার অন্য কিছুও হতে পারে। কিন্তু যে-লোকটা ঘরে আগুন দিয়েছে তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, হেনার ঘরে এমন একটা মারাত্মক জিনিস আছে যা সে নষ্ট করে ফেলতে চায়। আমরা ঘরটা একবার মোটামুটি রকম তল্লাশ করেছি, কিন্তু মারাত্মক কিছু পাইনি। আবার তল্লাশ করে যদি মারাত্মক বস্তুটি খুঁজে পাই। অতএব পুড়িয়ে শেষ করে দাও।'

'কী মারাত্মক জিনিস হতে পারে।'

'হয়তো কাগজ, এক টুকরো কাগজ। বড় জিনিস হলে আমরা খুঁজে পেতাম।'

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বলিলাম 'ব্যোমকেশ, সেই গোলাপী কাগজের টুকরো' তাতে কি লেখা আছে?'

ব্যোমকেশ দেরাজ হইতে কাগজের টুকরাটি বাহির করিয়া দিল বলিল, কবিতা। পড়ে দেখ দেখি, কাব্য হয়েছে কি না।'

কবিতা পড়িলাম—

> তোমার হাসির ঝিলিকটুকু
> ছুরির মত রইল বিঁধে বুকে
> বিনা দোষে শাস্তি দিতে
> পারে তোমার ঠোঁটদুটি টুক্‌টুকে।

বলিলাম, 'মন্দ নয়, অনেকটা সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার মত। কে লিখেছেন?

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওদের বাড়িতে কবি একজনই আছে—যুগল।'

অপরাহ্ণে এ কে রে স্বয়ং জবানবন্দীর নকল লইয়া আসিলেন।

আজ তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করিলেন, দুই চারিটা মজাদার গল্প বলিলেন, ব্যোমকেশ যে পুলিসে যোগ না দিয়ে শূন্যোদরে বন্যমহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতেছে তাহা প্রমাণ করিলেন, সময়োচিত পানাহার গ্রহণ করিলেন; তারপর কাজের কথায় উপস্থিত হইলেন। জবানবন্দীর ফাইল ব্যোমকেশকে দিয়া বলিলেন, 'এই নাও, পড়ে দেখতে পার। কিন্তু তোমার কোন কাজে লাগবে না।'

ভ্রূ তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'কাজে লাগবে না কেন?'

এ কে রে বলিলেন, 'পুলিস-দপ্তরের মতে হেনার মৃত্যু অপঘাত ছাড়া আর কিছু নয়, তদন্ত চালানো নিরর্থক।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আগুন লাগার খবর পেয়েছ?'

এ কে রে বলিলেন, 'পেয়েছি। ওটা সমাপতন। ইচ্ছে করে কেউ আগুন লাগিয়েছিল তার কোন প্রমাণ নেই।'

ব্যোমকেশ একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, 'তাহলে সন্তোষবাবু আমাকে যে কাজ দিয়েছিলেন, সেটা গেল। তাঁর পারিবারিক স্বার্থ রক্ষার আর দরকার নেই।'

এ কে রে হাসিয়া বলিলেন, 'না। তুমি তাঁকে আশ্বাস দিতে পার পুলিস তাঁর পরিবারের ওপর আর কোনো জুলুম করবে না।-ভাল কথা, আগুন লাগার খবর পেয়ে আমি সন্তোষবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি উপস্থিত ছিলেন। কাল হেনার দেরাজের মধ্যে যে ফটোগ্রাফ পাওয়া গিয়েছিল, সেটা তাঁকে দেখালাম। তিনি বললেন, ওটা হেনার মায়ের ছবি।'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল, বলিল, 'ময়না তদন্তে কী পেলে?'

এ কে রে বলিলেন, 'এ রকম অবস্থায় যা আশা করা যায় তার বেশি কিছু নয়। পাঁজরার একটা হাড় ভেঙে হৃৎপিণ্ডকে ফুটো করে দিয়েছে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে। অন্য কোন জটিলতা নেই।'

'মৃত্যুর সময়?'

'সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে।'

তারপর এ কে রে দু' একটা হাসি-তামাশার কথা বলিয়া ব্যোমকেশের পিঠ চাপড়াইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কে রে কি খুব বুদ্ধিমান লোক?'

ব্যোমকেশ আমার পানে চোখ তুলিয়া বলিল 'ওর বুদ্ধি কারুর চেয়ে কম নয়।'

বলিলাম 'দোষের মধ্যে পুলিস।'

'হ্যাঁ, দোষের মধ্যে পুলিস।' ব্যোমকেশ জবানবন্দীর ফাইলটা তুলিয়া লইল।

আধঘণ্টা পরে জবানবন্দী পাঠ শেষ করিয়া সে ফাইল আমাকে দিল, বলিল, 'বিশেষ কিছু নেই, দেখতে পারো। আমি একটু ঘুরে আসি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'অনেক দিন দোকানে যাওয়া হয়নি যাই দেখে আসি প্রভাত কি করছে।'

সে চলিয়া গেল। আমি ফাইল খুলিয়া জবানবন্দী পড়িতে আরম্ভ করিলাম--

রবীন্দ্রনাথ বর্মণ। বয়স ৩৯। সন্তোষ সমাদ্দারের অন্যতম সেক্রেটারী। সন্তোষবাবুর বাড়িতে থাকেন। বেতন ৩৫০৲ টাকা।

আজ শনিবার। কর্তা অফিস থেকে চলে যাবার পর আমি আন্দাজ সাড়ে তিনটের সময় ফিরে আসি। হেনা তখন কোথায় ছিল আমি লক্ষ্য করিনি। সম্ভবত নিজের ঘরেই ছিল।

আমি কিছুক্ষণ নিজের ঘরে বিশ্রাম করলাম। সাড়ে চারটের সময় চাকর চা-জলখাবার এনে দিল, আমি খেলাম। তারপর পাঁচটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরুলাম। বাজারে কিছু কেনাকাটা করবার ছিল, সাবান টুথপেস্ট দাড়ি কামাবার ব্লেড অ্যাস্‌পিরিন, এই সব।

'আমি যখন বেরুই, তখন হল-ঘরে কেবল একজন মানুষ ছিল—উদয়। তার সঙ্গে আমার কোন কথা হয়নি, সে কিছুই করছিল না, বুকে হাত বেঁধে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। উদয় কলেজে পড়ে বইকি, তবে যখন ইচ্ছে চলে আসে, পড়াশুনোয় মন নেই।

আমি বাজার করে ফিরলাম ছ'টার সময়। তখনো অন্ধকার হয়নি, আমি নিজের ঘরে জিনিসপত্র রেখে পূর্বদিকের গোলাপ-বাগানে গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ বেড়াবার পর হঠাৎ নজরে পড়ল বাড়ির কোণে মানুষের চেহারার মত কি যেন একটা পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি হেনা।

চেঁচামেচি করে লোক ডাকলাম। চাকরেরা ছুটে এল, যুগল আর উদয়ও এল—হ্যাঁ, ওরা দু'জনেই বাড়িতে ছিল। সবাই মিলে ধরাধরি করে লাশ বাড়িতে নিয়ে এলাম, তারপর পুলিসকে ফোন করলাম। না, কর্তা বাড়িতে ছিলেন না। শনিবার-রবিবার তিনি বাড়িতে থাকেন না। কোথায় থাকেন আমি জানি না।

যুগলচাঁদ সমাদ্দার। বয়স ২০। সন্তোষ সমাদ্দারের পুত্র।

আমি কলেজে পড়ি। আজ দুটোর পর ক্লাস ছিল না, তাই তিনটের সময় বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। আমার ঘর দোতলায়, রবিবর্মার ঘরের ওপরে।

ঘরে এসে একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়েছিলাম, তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল একেবারে সাড়ে পাঁচটার সময়ে। তাড়াতাড়ি উঠে নীচে নেমে গেলাম। না, হল-ঘরে কেউ ছিল না। আমি গোলাপ-বাগানে গিয়ে কিছুক্ষণ বেড়ালাম, তারপর ফিরে এসে দোতলায় গেলাম। চিংড়ি আমাকে চা-জলখাবার এনে দিল, আমি খেলাম। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে লেখাপড়া করতে বসলাম।

বাগানে আমি বেশিক্ষণ ছিলাম না, পনেরো-কুড়ি মিনিট ছিলাম। ধরুন, সাড়ে পাঁচটা থেকে পৌনে ছ'টা পর্যন্ত। না রবিবর্মাকে বাগানে দেখিনি। বাড়ির পাশে হেনার মৃতদেহ দেখিনি। ছ'টার পর নীচে চেঁচামেচি শুনে আমি নেমে এলাম। ওরা তখন হেনার মৃতদেহ বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসছে।

আমার সঙ্গে হেনার ঘনিষ্ঠতা ছিল না, কারুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সে কারুর সঙ্গে মিশতো না।

উদয়চাঁদ সমাদ্দার। বয়স ২০। সন্তোষ সমাদ্দারের পুত্র।

আজ আমি কলেজে যাইনি। দুপুরবেলা বিলিয়ার্ড খেলতে ক্লাবে গিয়েছিলাম। ক্লাবের নাম গ্রেট ইস্টার্ন স্পোর্টিং ক্লাব।

সাড়ে চারটের সময় আমি বাড়ি ফিরেছি। দোতলায় হেনার ঘরের ওপর আমার ঘর। আমি নিজের ঘরে গেলাম, কাপড়-চোপড় বদলে নীচের হল-ঘরে নেমে এলাম। কেন নেমে এলাম তার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই। আমার বাড়ি, আমি যখন যেখানে ইচ্ছা থাকি।

প্রশ্নঃ আপনি যতক্ষণ হল-ঘরে ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে অন্য কাউকে হল-ঘরে দেখেছিলেন?

উত্তরঃ রবিবর্মা নিজের ঘরে ছিল, মাঝে মাঝে হল-ঘরে আসছিল। সে

আন্দাজ পাঁচটার সময় বেরিয়ে গেল।

প্রশ্নঃ আর কেউ?

উত্তরঃ নেংটি ছোঁক্ ছোঁক্ করে বেড়াচ্ছিল, আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

প্রশ্নঃ হেনা তখন কোথায় ছিল?

উত্তরঃ নিজের ঘরে।

প্রশ্নঃ আপনি হল-ঘরে থাকতে থাকতেই হেনা ছাদে যাবার জন্যে নিজের ঘর থেকে বেরিয়েছিল?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ তার হাতে কিছু ছিল?

উত্তরঃ একটা ছোট মাদুর ছিল। ভ্যানিটি-ব্যাগ ছিল।

প্রশ্নঃ আপনি তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?

উত্তরঃ নো কমেন্ট।

প্রশ্নঃ হেনা চলে যাবার পর আপনি হল-ঘরে কতক্ষণ ছিলেন?

উত্তরঃ পাঁচ মিনিট।

প্রশ্নঃ তারপর কোথায় গেলেন?

উত্তরঃ নিজের ঘরে।

প্রশ্নঃ হেনার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা ছিল?

উত্তরঃ নো কমেন্ট।

শ্রীমতী চামেলি সমাদ্দার। বয়স ৪৪। সন্তোষ সমাদ্দারের স্ত্রী।

ছ'মাস আগে হেনা মল্লিক আমার বাড়িতে এসেছিল। তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ ছিল না, তাকে কখনো দোতলায় উঠতে বলিনি। আমি মুখ দেখে মানুষ চিনতে পারি, হেনা ভাল মেয়ে ছিল না। আমার স্বামী কেন তাকে বাড়িতে এনেছিলেন আমি জানি না। আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, আমি কী করতে পারি। হেনাকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়নি, কোন কথাই হয়নি।

আমার দুই ছেলেই ভাল ছেলে, সচ্চরিত্র ছেলে। হেনার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না, উট্‌কো মেয়ের সঙ্গে তারা মেলামেশা করে না।

আজ পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে আমি চিংড়ির চুল বেঁধে দিয়েছিলুম, চিংড়ি আমার চুল বেঁধে দিয়েছিল, তারপর আমি বাথরুমে গা ধুতে গিয়েছিলুম। হেনাকে তেতলার ছাদে যেতে দেখিনি, ছাদের ওপর কোন শব্দ শুনিনি।

শেফালিকা, ওরফে চিংড়ি। বয়স ১৫। সন্তোষবাবুর গৃহে পালিত।

দু'বছর আগে আমাদের মা-বাবা মারা যান। সেই থেকে দাদা আর আমি মাসিমার কাছে আছি।

হেনা যখন এ-বাড়িতে এসেছিল, তখন তাকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। এত সুন্দর মেয়ে আমি দেখিনি। আমি একবার গিয়েছিলুম ভাব করতে, কিন্তু

সে আমার মুখের ওপর দোর বন্ধ করে দিল। সেই থেকে আমি আর ওর কাছে যাইনি, মাসিমা মানা করে দিয়েছিলেন। ওকে দু-একবার মেসোমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি। মেসোমশাইয়ের সঙ্গে ও ভালভাবে কথা বলত। দশ-বারো দিন অন্তর ভাল কাপড়-চোপড় পরে বাইরে যেত। কোথায় যেত জানি না। একলা যেত আবার ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে আসত। হ্যাঁ, রোজ সন্ধ্যার সময় হেনা ছাদে যেত, সেখানে একলা কি করত জানি না; বোধহয় পায়চারি করত, কিংবা মাদুর পেতে বসে থাকত। মাসিমার বিশ্বাস, হেনা ছাদে গিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেত।

আমি স্কুলে পড়ি না, মাসিমা আমাকে স্কুলে পড়তে দেননি। তিনি বলেন, স্কুল-কলেজে পড়লে মেয়েরা বিগড়ে যায়, সিগারেট খেতে শেখে। আমি মাসিমার কাছে ঘর-কন্নার কাজ শিখেছি।

আজ বিকেলবেলা মাসিমা আমার চুল বেঁধে দিলেন, আমি মাসিমার চুল বেঁধে দিলুম; তারপর মাসিমা বাথরুমে গেলেন। আমি দাদাদের জলখাবার দিতে গেলুম। যুগলদা নিজের ঘরে ছিলেন, তাঁকে খাবার দিয়ে উদয়দা'র ঘরে গেলুম। উদয়দা ঘরে ছিলেন না; তাঁর টেবিলে খাবার রেখে আমি চলে এলুম। তারপর আমিও বাথরুমে গা ধুতে গেলুম। দোতলায় পাঁচটা বাথরুম আছে।

না, হেনা কখন ছাদে গিয়েছিল আমি জানতে পারিনি। ছাদের ওপর শব্দ শুনিনি। বাথরুম থেকে বেরুবার পর নীচের তলা থেকে চেঁচামেচি শুনতে পেলুম, জানতে পারলুম হেনা ছাদ থেকে পড়ে মরে গেছে।

নির্মলচন্দ্র দত্ত, ওরফে নেংটি। বয়স ১৭। সন্তোষবাবুর গৃহে পালিত।

চিংড়ি আমার বোন। আমরা মা-বাবার মৃত্যুর পর থেকে মাসিমার কাছে আছি। আমি লেখাপড়া করি না। মেসোমশাই বলেছেন, আমার আঠারো বছর বয়স হলে তিনি তাঁর কোম্পানিতে চাকরি দেবেন।

হেনা দেখতে খুব সুন্দর ছিল, কিন্তু ভারি অহংকারী ছিল, আমার সঙ্গে কথাই বলত না। বাড়িতে কেবল মেসোমশাইয়ের সঙ্গে হেসে কথা বলত, যুগলদা আর উদয়দা'র সঙ্গে দুটো-একটা কথা বলত। হেনা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

আজ বিকেলে সাড়ে পাঁচটার সময় আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। তখন হেনা নিজের ঘরে ছিল। ছ'টার পর ফিরে এসে শুনলাম সে ছাদ থেকে পড়ে মরে গেছে। এর বেশি আমি আর কিছু জানি না।

জবানবন্দী পড়া শেষ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানিলাম। এই কয়জনের মধ্যেই কেহ হেনাকে ছাদ হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল মনে হয় না। উদয় ছেলেটা একটু উদ্ধত, কিন্তু তাহাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। সত্যই কি কেহ হেনাকে ছাদ হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল? হয়তো পুলিসের অনুমানই ঠিক, ব্যোমকেশ ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখিতেছে। কিন্তু ঘরে আগুন লাগাও কি আকস্মিক?

নেংটি একটা লোকের কথা বলিল, হেনা দশ-বারো দিন অন্তর মাউথ-অর্গানের

বাজনা শুনিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে যাইত। লোকটা কে? সে-ই কোন অজ্ঞাত কারণে হেনাকে খুন করিয়াছে? সন্তোষবাবুর তেতলার ছাদটি অবস্থা গতিকে বাহিরের লোকের পক্ষে সহজগম্য হইয়া পড়িয়াছে, ভারার মই বাহিয়া যে কেহ ছাদে উঠিতে পারে; অর্থাৎ, বাড়ির লোক এবং বাহিরের লোক সকলেরই ছাদে উঠিবার সমান সুবিধা।

সান্ধ্য চায়ের সময় হইলে ব্যোমকেশ ফিরিল। জিজ্ঞাসা করিলাম 'দোকানে কী মতলবে গিয়েছিলে?'

সে চায়ের পেয়ালায় চামচ ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, 'মতলব কিছু ছিল না। মাথার মধ্যে গুমোট জমে উঠেছিল তাই একটু হাওয়া-বাতাস লাগাতে বেরিয়েছিলাম। দোকানে বিকাশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে মাঝে মাঝে প্রভাতের সঙ্গে আড্ডা দিতে দোকানে আসে।' চায়ে একটি চুমুক দিয়া সে সিগারেট ধরাইল, বলিল, 'বিকাশের সঙ্গে দেখা হল ভালই হল, তাকে কাল বিকেলে আসতে বলেছি।'

'তাকে তোমার কী দরকার?'

'দরকার হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে সন্তোষবাবুর ওপর। কাল সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। তিনি যদি আমায় বরখাস্ত করেন তাহলে আর কিছু করবার নেই।' সে পর্যায়ক্রমে চা ও সিগারেটের প্রতি মনোনিবেশ করিল। আরো কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া ভাসা-ভাসা উত্তর পাইলাম। তাহার স্বভাব জানি। তাই আর নিষ্ফল প্রশ্ন করিলাম না।

পরদিন ঠিক ন'টার সময় আমরা দুই জনে সন্তোষবাবুর অফিসে উপস্থিত হইলাম। ক্লাইভ স্ট্রীটে প্রকাণ্ড সওদাগরী সৌধ, যাহার দ্বিতলে সন্তোষবাবুর অফিস।

সন্তোষবাবু সবেমাত্র অফিসে আসিয়াছেন, এত্তালা পাইয়া আমাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমরা তাঁহার খাস কামরায় প্রবেশ করিলাম। টেবিলের উপর কাগজপত্রের ফাইল, দুটি টেলিফোন, সন্তোষবাবু টেবিলের সামনে একাকী বসিয়া আছেন। আজ তাঁহার পরিধানে বিলাতী বেশ; কোট খুলিয়া রাখিয়াছেন; লিনেনের শার্টের সম্মুখভাগে দামী সিল্কের টাই শোভা পাইতেছে।

সন্তোষবাবু হাত নাড়িয়া আমাদের সম্ভাষণ করিলেন। আমরা টেবিলের পাশে উপবিষ্ট হইলে তিনি ভ্রূ তুলিয়া ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলেন, 'কি খবর?'

ব্যোমকেশ বলিল 'শুনেছেন বোধহয়, পুলিস সাব্যস্ত করেছে হেনার মৃত্যু আকস্মিক ঘটনা।'

সন্তোষবাবু চকিত হইয়া বলিলেন, 'তাই নাকি! আমি শুনিনি।' তারপর আরামের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'যাক, বাঁচা গেল। মনে একটা অস্বস্তি লেগে ছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আমি এখনো নিঃসংশয় হতে পারিনি।'

সন্তোষবাবু একটু বিস্ময়ের সহিত তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'ও-মানে আপনার বিশ্বাস হেনাকে কেউ খুন করেছে?—কোন সূত্র পেয়েছেন কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রথমত, ঘরে আগুন লাগাটা স্বভাবিক মনে হয় না।'

সন্তোষবাবু শূন্য পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'তা বটে. ঘরে আগুন লাগাটা আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। আর কিছু?'

ব্যোমকেশ তখন মাউথ-অর্গানবাদকের কথা বলিল। সন্তোষবাবু গভীর মনোযোগের সহিত শুনিলেন, তারপর বলিলেন, 'হুঁ। কিন্তু আমি যতদূর জানি এখানে হেনার চেনা-পরিচিত কেউ নেই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পাকিস্তানের লোক হতে পারে। হয়তো কাজের সূত্রে দশ-বারো দিন অন্তর কলকাতায় আসতো, আর হেনার সঙ্গে দেখা করে যেত।'

এই সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। সন্তোষবাবু টেলিফোন কানে দিয়া শুনিলেন, দু'বার হুঁ হাঁ করিলেন, তারপর যন্ত্র রাখিয়া দিলেন। ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'হতে পারে—হতে পারে। তা, আপনি এখন কি করতে চান?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার যদি অনুমতি থাকে, আমি একবার বাড়ির সকলকে জেরা করে দেখতে পারি।'

সন্তোষবাবু একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'দেখুন ব্যোমকেশবাবু, আপনাকে আমি আমার পারিবারিক স্বার্থ রক্ষার জন্যে নিযুক্ত করেছিলাম। কিন্তু পুলিস যখন বলছে এটা দুর্ঘটনা, তখন আপনার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। অবশ্য, আপনার পারিতোষিক আপনি পাবেন—'

ব্যোমকেশ বলিল 'পারিতোষিকের জন্যে আমি ব্যগ্র নই মিস্টার সমাদ্দার, এবং বেশি কাজ দেখিয়ে বেশি পারিতোষিক আদায় করার মতলবও আমার নেই। আমি শুধু সত্য আবিষ্কার করতে চাই।'

সন্তোষবাবু ঈষৎ অধীর ভাবে বলিলেন, সত্য আবিষ্কার! পুলিসের হাঙ্গামা থেকে যখন বেহাই পেয়েছি, তখন নিছক সত্য আবিষ্কারে আমার আগ্রহ নেই—'

আবার টেলিফোন বাজিল। সন্তোষবাবু ফোনে কথা বলা শেষ করিতে না করিতে অন্য ফোনটা বাজিয়া উঠিল। একে একে দুইটি ফোনে কথা বলা শেষ করিয়া তিনি আমাদের পানে চাহিয়া হাসিলেন। ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'কাজের সময় আপনাকে বিরক্ত করব না। তাহলে—আপনার আগ্রহ নেই?'

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'আগ্রহ নেই, তেমনি আপত্তিও নেই। আপনি বাড়ির সকলকে জেরা করুন।'

'ধন্যবাদ। রবিবর্মা কি অফিসে আছেন?'

'না, তার শরীর খারাপ, সে আজ অফিসে আসেনি। বাড়িতেই আছে।'

'আচ্ছা। আপনি দয়া করে বাড়িতে জানিয়ে দেবেন আমরা যাচ্ছি।'

'আচ্ছা।' তিনি টেলিফোন তুলিয়া নম্বর ঘুরাইতে লাগিলেন। আমরা চলিয়া আসিলাম।

সন্তোষবাবুর বাড়িতে পৌঁছিলাম আন্দাজ সাড়ে ন'টার সময়। দেউড়ি দিয়া প্রবেশ করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, আগে বাগানটা দেখে যাই।'

আমরা পূর্বদিকে মোড় ঘুরিলাম। বাড়ির কোণে হেনার ঘরের পোড়া কাঁচ-ভাঙা জানালা দু'টা গহ্বরের মত উন্মুক্ত হইয়া আছে। গোলাপের বাগানে সিলভার পাইনের ছায়া পড়িয়াছে, অজস্র শ্বেত-রক্ত-পীত ফুল ফুটিয়া আছে। এদিকে ভারা নাই, চুনকাম-করা দেয়াল রৌদ্র প্রতিফলিত করিতেছে। হেনা এই

দেয়ালের পদ্মমূলে পড়িয়া মরিয়াছিল, কিন্তু কোথাও কোনো চিহ্ন নাই। হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি, কিন্তু চিহ্ন থাকে না।

বাড়ির পিছন দিকে ভারা লাগানো আছে। মিস্ত্রিরা মেরামতের কাজ আরম্ভ করিয়াছে, দুইজন মজুর মাথায় লোহার কড়া লইয়া ভারা-সংলগ্ন মই দিয়া ওঠা-নামা করিতেছে। মন্থর ভাবে কাজ চলিতেছে।

পিছন দিক বেড়িয়া আমরা বাড়ির পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইলাম। এখানেও দেয়ালের গায়ে ভারা লাগানো, মিস্ত্রিরা কাজ করিতেছে, মজুর ওঠা-নামা করিতেছে। ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ঊর্ধ্বমুখ হইয়া দেখিল, তারপর মই বাহিয়া তর্ তর্ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

তিন তলার আলিসার উপর দিয়া একবার ছাদে উঁকি মারিয়া সে আবার নামিয়া আসিল। আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, 'কি ব্যাপার? ছাদে কী দেখলে?'

সে হাসিয়া বলিল, 'ছাদে দর্শনীয় কিছু নেই। দর্শনীয় বস্তু ঐখানে।' বলিয়া বাহিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, খিড়কির ফটক। ব্যোমকেশ সেইদিকে অগ্রসর হইল, আমিও চলিলাম। বাগানের এই দিকটাতে আম-লিচু-পেয়ারা-জামরুল প্রভৃতি ফলের গাছ; আমরা এই ফলের বাগান পার হইয়া বাড়ির বহিঃপ্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইলাম।

খিড়কির ফটকটি সঙ্কীর্ণ, লোহার শিক-যুক্ত কপাট আন্দাজ পাঁচ ফুট উঁচু। তাহাতে তালা লাগাইবার ব্যবস্থা থাকিলেও মরিচা-ধরা অবস্থা দেখিয়া মনে হয় বহুকাল তালা লাগানো হয় নাই। ফটকের বাহিরে একটি সরু গলি গিয়াছে। এই পথ দিয়া বাড়ির চাকর-বাকর যাতায়াত করে।

ব্যোমকেশ আমার দিকে ভ্রূ বাঁকাইয়া বলিল, 'কি বুঝলে?'

বলিলাম, 'এই বুঝলাম যে, বাইরে থেকে অলক্ষিতে বাগানে প্রবেশ করা যায় এবং বাগান থেকে মই বেয়ে ছাদে উঠে যাওয়াও শক্ত নয়।'

সে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'শাবাশ।—চল, এবার বাড়ির মধ্যে যাওয়া যাক।'

হল-ঘরে নেংটি হেনার পোড়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেই দিকে চাহিয়া ছিল আমাদের দেখিয়া আগাইয়া আসিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'কি দেখছিলে?'

নেংটি বলিল, 'কিছু না। আজ সকালে মাসিমা এসে ঘরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়েছেন। কাল থেকে মিস্ত্রি লাগবে। নতুন দোর-জানালা বসানো হবে, ঘরের প্ল্যাস্টার তুলে ফেলে নতুন করে প্ল্যাস্টার লাগানো হবে। ভাগ্যিস আগাগোড়া কংক্রীটের বাড়ি, নইলে সারা বাড়িটাই পুড়ে ছাই হয়ে যেত। সেই সঙ্গে আমরাও।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। বাড়ির সব কোথায়?'

নেংটি বলিল, 'বাড়িতেই আছে, মেসোমশাই ফোন করেছিলেন। দাদারা কলেজে যায়নি। ডেকে আনব?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, আমি প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে দেখা করব। রবিবর্মা কোথায়?'

'নিজের ঘরে।' বলিয়া নেংটি আঙুল দেখাইল।

'আচ্ছা। তুমি তাহলে দোতলায় গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দাও। আমি রবিবর্মার সঙ্গে দেখা করেই যাচ্ছি।'

নেংটি দ্বিতলে চলিয়া গেল, আমরা রবিবর্মার দ্বারের সম্মুখে গিয়া

দাঁড়াইলাম। দ্বার ভেজানো ছিল, ব্যোমকেশ টোকা দিতেই খুলিয়া গেল। রবিবর্মা বলিল, 'আসুন।' তাহার গায়ে ধূসর রঙের আলোয়ান জড়ানো, শীর্ণ মুখ আরও শুষ্ক দেখাইতেছে—'শরীরটা ভাল নেই, তাই অফিস যাইনি।' বলিয়া কাশি চাপিবার চেষ্টা করিল।

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি আকারে আয়তনে হেনার ঘরের সমতুল্য। আসবাবও অনুরূপ, একহারা খাট, টেবিল, চেয়ার, বইয়ের শেল্ফ। ঘরটি রবিবর্মা বেশ পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছে।

ব্যোমকেশ রবিবর্মাকে কিছুক্ষণ মনোনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'রবিবাবু, আপনি সত্যিই সন্তোষবাবুর নিভৃত কুঞ্জের ফোন নম্বর জানেন না?'

রবিবর্মা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল 'আজ্ঞে না, সত্যি জানি না। কর্তা আমাকে জানাননি, তাই আমিও জানবার চেষ্টা করিনি। আমি মাইনের চাকর আমার কি দরকার বলুন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা বটে। সুকুমারীর নিজের বাসার ফোন নম্বর তো আপনার জানা আছে, সেখানেও হেনার মৃত্যুর খবর দেননি?'

'আজ্ঞে না।'

'সে-সময় অন্য কাউকে ফোন করতে দেখেছিলেন?'

'আজ্ঞে গোলমালের মধ্যে সব দিকে নজর ছিল না। মনে হচ্ছে পুলিস আসবার পর নেংটি কাউকে ফোন করেছিল।'

'নেংটি আমাকে ফোন করছিল। সে যাক।—বলুন দেখি, পরশু রাত্রে যখন হেনার ঘরে আগুন লেগেছিল, আপনি কিছুই জানতে পারেননি?'

রবিবর্মা কাশিতে লাগিল, তারপর কাশি সংবরণ করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে না, আমি জানতে পারিনি।'

'আশ্চর্য।'

'আজ্ঞে আশ্চর্য নয় আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়েছিলাম। আমার মাঝে মাঝে অনিদ্রা হয়, সারা রাত জেগে থাকি। শনিবার ওই সব ব্যাপারের পর ভাবলাম ঘুম আসবে না তাই শোবার সময় তিনটে অ্যাসপিরিনের বড়ি খেয়েছিলাম। তারপর রাত্রে কী হয়েছে কিছু জানতে পারিনি।'

ব্যোমকেশ এদিক-ওদিক চাহিল। টেবিলের উপর একটা শিশি রাখা ছিল তুলিয়া দেখিল অ্যাসপিরিনের শিশি, প্রায় ভরা অবস্থায় আছে। শিশি রাখিয়া দিয়া সে একথোলো চাবি তুলিয়া লইল। অনেকগুলি চাবি একটি রিংয়ে গ্রথিত, ওজনে ভারী। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এগুলো কোথাকার চাবি?'

'অফিসের চাবি।' রবিবর্মা চাবির গোছা ব্যোমকেশের হাত হইতে লইয়া নিজের পকেটে রাখিল—'অফিসের বেশি ভাগ দেরাজ-আলমারির চাবি আমার কাছে থাকে।'

ব্যোমকেশ সহসা প্রশ্ন করিল, 'রবিবাবু, আপনার দেশ কোথায়?'

থতমত খাইয়া রবিবর্মা বলিল, 'দেশ? কুমিল্লা জেলায়।'

'হেনাকে আগে থাকতে চিনতেন?'

রবিবর্মার তির্যক চোখে শঙ্কার ছায়া পড়িল, সে কাশির উপক্রম দমন করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে না।'

'তার বাপ, কমল মল্লিককে চিনতেন না?'

'আজ্ঞে না।'

'হেনার মৃত্যু সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না?'

রবিবর্মা একটু ইতস্তত করিল, গলা বাড়াইয়া একবার হল-ঘরের দিকে উঁকি মারিল, তারপর চুপিচুপি বলিল কাউকে বলবেন না, একটা কথা আমি জানি।'

'কি জানেন বলুন?'

'সেদিন হেনার ঘরে দেখেছিলাম হেনা উলের জামা বুনছিল। কার জন্যে জামা বুনছিল জানেন? উদয়ের জন্যে।'

উদয়ের জন্যে! আপনি কি করে জানলেন?'

'একদিন বিকেলবেলা আমি দেখে ফেলেছিলাম। উদয় এক বান্ডিল উল এনে হেনাকে দিচ্ছে। হেনা সেই উল দিয়ে সোয়েটার তৈরি করছিল।'

'উদয়ের সঙ্গে তাহলে হেনার ঘনিষ্ঠতা ছিল?'

রবিবর্মা সশঙ্ক চক্ষে চুপ করিয়া রহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আর যুগলের সঙ্গে?'

'আমি জানি না। ব্যোমকেশবাবু, আমি যে আপনাকে কিছু বলেছি, তা যেন কেউ জানতে না পারে। বৌদি জানতে পারলে—'

বৌদি, অর্থাৎ, শ্রীমতী চামেলি। সকলেই তাঁহার ভয়ে আড়ষ্ট। মনে পড়িল সে-রাত্রে সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় তাঁহার চাপা কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, তুমি চুপ করে থাকবে, কোন কথা বলবে না।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার সঙ্গে হেনার ঘনিষ্ঠতা ছিল না?'

রবিবর্মা চমকিয়া উঠিল, 'আমার সঙ্গে! আমি সারা জীবন মেয়েলোককে এড়িয়ে চলেছি। ওসব রোগ আমার নেই, ব্যোমকেশবাবু।'

'ভাল। চল অজিত, ওপরে যাওয়া যাক।'

দোতলায় যুগলের ঘরের উন্মুক্ত দ্বারের সম্মুখে গিয়া একটি নিভৃত দৃশ্য দেখিয়া ফেলিলাম। যুগল টেবিলের সামনে বসিয়া আছে, হাতে কলম, সম্মুখে খাতা, চিংড়ি চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে কিসফিস করিয়া কি বলিতেছে। আমাদের দেখিয়া সে ত্রস্তা হরিণীর মত চাহিল, তারপর আমাদের পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

যুগল ঈষৎ লজ্জিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, 'আসুন।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'আপনাকে দু'তিনটে প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেব, তারপর আপনি যদি কলেজে যেতে চান যেতে পারেন।'

যুগল ঘড়ি দেখিয়া বলিল, দেরি হয়ে গেছে, সকালের দিকেই ক্লাস ছিল।' সে টেবিলের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া খাটের পাশে বসিল, 'কি জানতে চান বলুন?' তাহার কথা বলিবার ভঙ্গিতে ধীর নম্রতা প্রকাশ পাইল। সে-রাত্রির সেই বজ্রাহত বিভ্রান্তির ভাব আর নাই।

ব্যোমকেশ তাহার পাশে বসিয়া বলিল, 'আপনি কবিতা লেখেন?'

যুগল অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, ক্ষীণস্বরে বলিল 'মাঝে মাঝে লিখি।'

ব্যোমকেশ পকেট হইতে এক টুকরা গোলাপী কাগজ লইয়া যুগলের সম্মুখে ধরিল, বলিল, 'দেখুন তো এটা কি আপনার লেখা।'

দেখিলাম যুগলের সুশ্রী মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতেছে। সে কাগজের

টুকরা লইয়া সংশয়িত চিত্তে নাড়াচাড়া করিতেছে, আমি ইত্যবসরে টেবিলের উপর হইতে খাতা লইয়া চোখ বুলাইলাম। কবিতার খাতা, তাহাতে চতুষ্পদী জাতীয় কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা লেখা রহিয়াছে। সবগুলিই অনুরাগের কবিতা, তার মধ্যে একটি মন্দ লাগিল না—

গোলাপ, তোমারে ধরিনু বুকের মাঝে
বিনিময়ে তুমি কাঁটায় ছিঁড়িলে বুক
রক্ত আমার দরদর ঝরিয়াছে
সেই শোণিমায় রাঙা করে নাও মুখ।

এখানে গোলাপ কে তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না।

ওদিকে যুগল দু'বার গলা খাঁকারি দিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, আমারই লেখা।'

ব্যোমকেশ কণ্ঠস্বরে সমবেদনা ভরিয়া বলিল, 'হেনার সঙ্গে আপনার ভালবাসা হয়েছিল।'

যুগল কিয়ৎকাল নতমুখে বসিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল 'ভালবাসা—কি জানি। হেনা যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন একটা নেশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—তারপর এখন—'

ব্যোমকেশ প্রফুল্লস্বরে বলিল, 'নেশা কেটে যাচ্ছে। বেশ বেশ। জানালা দিয়ে গোলাপফুল আপনিই ফেলেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'হেনা তখন ঘরে ছিল না?'

'না!'

'যুগলবাবু, সে-রাত্রে আপনার ভাই উদয়বাবু অভিযোগ করেছিলেন যে, আপনি হেনাকে মেরেছেন। এ অভিযোগের কারণ কি?'

যুগল ধীরে ধীরে বলিল, 'কারণ—ঈর্ষা।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে উদয়বাবুও হেনার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

সেই অতি পুরাতন শুম্ভ নিশুম্ভ ও মোহিনীর কাহিনী। ভাগ্যক্রমে কাহিনীর উপসংহার ভিন্নপ্রকার দাঁড়াইয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাদের দু'জনের মধ্যে হেনা কাকে বেশি পছন্দ করত।'

যুগল ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, 'এখন মনে হচ্ছে হেনা কাউকেই পছন্দ করত না।'

'আপনারা দু'ভাই ছাড়া আর কেউ হেনার প্রতি আসক্ত হয়েছিল? যেমন ধরুন—রবিবর্মা?'

যুগল চকিতে মুখ তুলিল। তাহার মুখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, 'রবিবর্মা! কি জানি, বলতে পারি না।'

উদয় নিজের ঘরে বসিয়া টেনিস র‍্যাকেটের তাঁতে তেল লাগাইতেছিল, আমরা দ্বারের কাছে উপস্থিত হইতেই সে ঘন ভুরুর নীচে রূঢ় চক্ষু রাঙাইয়া বলিল, 'আবার কি চাই?'

ব্যোমকেশের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, সে তর্জনী তুলিয়া বলিল, তুমি হেনাকে উল এনে দিয়েছিলে তোমার সোয়েটার বুনে দেবার জন্যে!'

উদয় উদ্ধতস্বরে বলিল, 'হ্যাঁ দিয়েছিলাম। তাতে কী প্রমাণ হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রমাণ হয় তোমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেদিন সে যখন ছাদে গেল, তখন তুমিও তার পিছন পিছন ছাদে গিয়েছিলে। সেখানে তার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়, তুমি তাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে।'

উদয় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে সভয়ে বলিয়া উঠিল, 'না—না! আমি ছাদে যাই নি। আমি হেনার পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু ছাদে পৌঁছুবার আগেই হেনা দোরে শিকল তুলে দিয়েছিল। আমি—আমি তাকে ঠেলে ফেলে দিই নি—আমি তাকে ভালবাসতাম, সে-ও আমাকে ভালবাসতো।'

ব্যোমকেশ নিষ্ঠুরস্বরে বলিল, 'হেনা আর যাকেই ভালবাসুক, তোমাকে ভালবাসতো না। সে তোমাকে বাঁদর-নাচ নাচাচ্ছিল। এস অজিত।'

আমরা হল-ঘরের মধ্যস্থিত গোল টেবিলের কাছে গিয়া বসিলাম। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, উদয় ক্ষণকাল আচ্ছন্নের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিঃশব্দে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

সামনে ফিরিয়া দেখি পিছনের সারির একটি ঘর হইতে শ্রীমতী চামেলি বাহির হইয়া আসিতেছেন। তিনি বোধ হয় সদ্য স্নান করিয়াছেন, ভিজা চুলের প্রান্ত হইতে এখনো জল ঝরিয়া পড়িতেছে, শাড়ির আঁচলটা কোনমতে মাথাকে আবৃত করিয়াছে, চোখে সন্দিগ্ধ উদ্বেগ। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

শ্রীমতী চামেলি তীব্র অনুচ্চস্বরে ব্যোমকেশকে বলিলেন, 'কী বলছিল উদয় আপনাকে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মারাত্মক কিছু বলে নি, আপনি ভয় পাবেন না। বসুন, আপনার কাছে দু' একটা কথা জানবার আছে।'

শ্রীমতী চামেলি বসিলেন না, চেয়ারে বসিলে বোধ করি দেহ অশুচি হইয়া যাইবে। অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, 'আপনারা কেন আমাদের উত্ত্যক্ত করছেন আপনারাই জানেন। কি জানতে চান বলুন?'

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্নালাপ হইল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আপনি আগে সন্ত্রাসবাদিদের দলে ছিলেন?'

শ্রীমতী চামেলি বলিলেন, 'হ্যাঁ ছিলাম।'

প্রশ্ন: আপনি অহিংসায় বিশ্বাস করেন না?

উত্তর: না, করি না।

প্রশ্ন: বর্তমানে স্বামীর সঙ্গে আপনার সদ্ভাব নেই?

উত্তর: সে-কথা সবাই জানে।

প্রশ্ন: অসদ্ভাবের কারণ কি?

উত্তরঃ যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রশ্ন: আপনার সন্দেহ- হেনা আপনার স্বামীর উপপত্নী ছিল?

উত্তর: হ্যাঁ। আমার স্বামীর চরিত্র ভাল নয়।

এই নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় ব্যোমকেশ যেন ধাক্কা খাইয়া থামিয়া গেল। শেষে

অন্যপ্রসঙ্গ তুলিয়া বলিল, 'নেংটি এবং চিংড়ি আপনার নিজের বোনপো বোনঝি?'

শ্রীমতী চামেলি একটু থমকিয়া গেলেন, তাঁহার উত্তরের উগ্রতাও একটু কমিল। তিনি বলিলেন, 'না, ওদের মা আমার ছেলেবেলার সখী ছিল, তার সঙ্গে গঙ্গাজল পাতিয়েছিলুম। রক্তের সম্পর্ক নেই।'

প্রশ্ন ঃ ওরা জানে?

উত্তর ঃ না, এখনো বলিনি। সময় হলে বলব।

ব্যোমকেশ হাসিমুখে নমস্কার করিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ। আর আপনাকে উত্ত্যক্ত করব না। চললাম।'

শ্রীমতী চামেলি তীব্রদৃষ্টিতে আমাদের পানে চাহিয়া রহিলেন, আমরা নীচের তলায় নামিয়া আসিলাম।

নেংটি ফটক পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিল। ব্যোমকেশের পানে রহস্যময় কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'কিছু বুঝতে পারলেন?'

ব্যোমকেশ একটু বিরক্তস্বরে বলিল, 'না। তুমি বুঝতে পেরেছ নাকি?'

নেংটি বলিল, 'আমার বোঝার কী দরকার। আপনি সত্যান্বেষী, আপনি বুঝবেন।'

ফুটপাথে আসিয়া ব্যোমকেশ ঘড়ি দেখিল—'সাড়ে দশটা। চল, এখনো সময় আছে, শ্রীমতী সুকুমারীকে দর্শন করে যাওয়া যাক।'

শ্রীমতী সুকুমারীর বাসা মধ্য-কলিকাতার ভদ্রপল্লীতে, আমাদের বাসা হইতে বেশি দূর নয়। বাড়ির নীচের তলায় দোকানপাট, দ্বিতলে শ্রীমতী সুকুমারীর বাসস্থান।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে মৃদঙ্গ ও খঞ্জনির মৃদু নিক্কণ শুনিতে পাইলাম। সঙ্গে তরল বিগলিত কণ্ঠস্বর—রাধেশ্যাম, জয় রাধেশ্যাম! এটা বোধহয় সুকুমারী বৈষ্ণবীর গলা-সাধার সময়।

কড়া নাড়ার উত্তরে একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। থান-পরা গোলগাল চেহারা, চোখে স্টীলের চশমা, মুখখানি জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক। অনুমান করিলাম—সুকুমারীর 'মাসি' এবং বিজনেস ম্যানেজার।

একটি ক্ষুদ্র ঘরে আমাদের বসাইয়া মাসি ভিতরে গেল। আমরা জাজিমপাতা তক্তপোশের কিনারায় বসিলাম। ঘরে অন্য আসবাব নাই, কেবল দেয়ালে গৌর-নিতাইয়ের একটি যুগ্মচিত্র ঝুলিতেছে।

ভিতরের ঘরে যন্ত্রসঙ্গীত বন্ধ হইল। মাসি আসিয়া আমাদের ভিতরে লইয়া গেল। এটি বেশ বড় ঘর, মেঝেয় কার্পেট পাতা। একজন শীর্ণকায় কণ্ঠিধারী বৈষ্ণব মৃদঙ্গ কোলে লইয়া যামিনী রায়ের ছবির ন্যায় বসিয়া ছিলেন, আমাদের দেখিয়া কঠোর চক্ষে চাহিলেন, তারপর উঠিয়া চলিয়া গেলেন। অদূরে সুকুমারী খঞ্জনি হাতে বসিয়া ছিল, নতশিরে আমাদের প্রণাম করিয়া ললিতকণ্ঠে বলিল, 'আসুন।'

এক একজন মানুষ আছে যাহাদের যৌবনকাল অতীত হইলেও যৌবনের কুহক থাকিয়া যায়। সুকুমারীর বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশের কম নয়, কিন্তু ওই যে ইংরেজিতে যাহাকে যৌন-আবেদন বলে তাহা এখনো তাহার সর্বাঙ্গে প্রচুর পরিমাণে

বিদ্যমান; সাদা কথায়, তাহাকে দেখিলে পুরুষের মন অশ্লীল হইয়া ওঠে। উন্নত দীঘল দেহ, মুখখানিতে স্নিগ্ধ সরলতা মাখানো, চোখ দুটি ঈষৎ ঢুলঢুলে। ছলাকলার কোন চেষ্টা নাই, অকপট সহজতাই যেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া নিবিড় মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া প্রত্যয় হয়, কেবল সুকণ্ঠের জন্যই সে বিখ্যাত কীর্তন-গায়িকা হয় নাই, রূপ-গুণ-চরিত্র মিশিয়া যে সত্তাটি সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই বিদগ্ধজনের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে; সে যেন মহাজন কবিদের কল্পলোকবাসিনী চিরায়মানা বৈষ্ণবী।

ব্যোমকেশ বলিল, 'সন্তোষবাবু আপনার ঠিকানা দিয়েছিলেন, তাই ভাবলাম—'

সুকুমারী ব্যোমকেশের মুখের উপর মোহভরা চক্ষু রাখিয়া বলিল, 'উনি আপনার কথা ফোনে জানিয়েছেন।' শুধু গানের গলা নয়, তাহার কথা বলার কন্ঠস্বরও মধুক্ষরা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে হেনার কথা শুনেছেন?'

সুকুমারী একটু বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

'হেনা নামে একটি মেয়েকে সন্তোষবাবু নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, একথা আপনি আগে থেকেই জানতেন?'

'হ্যাঁ। বাপ-মা হারা বন্ধুর মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছিলেন আমি জানতাম।'

ব্যোমকেশ একটু কুন্ঠিত ভাবে বলিল 'দেখুন, আপনার সঙ্গে সন্তোষবাবুর দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতার কথা আমি জানি, সুতরাং আমার কাছে সংকোচ করবেন না। সেদিন অর্থাৎ শনিবার দুপুরবেলা থেকে কি কি হয়েছিল আমায় বলুন।'

সুকুমারী কিছুক্ষণ নতমুখে পায়ের নখ খুঁটিয়া বলিল, 'আমার মনে কোন সংকোচ নেই, বরং গৌরব। কিন্তু ওঁর মান-ইজ্জৎ আছে, তাই লুকিয়ে রাখতে হয়। সেদিনের কথা শুনতে চান বলছি। ও বাড়িটাকে আমরা ছোট বাড়ি বলি। সেদিন বেলা আন্দাজ দুটোর সময় এখানকার কাজকর্ম সেরে আমি ছোট বাড়িতে গেলুম। পাঁচ দিন বাড়ি বন্ধ থাকে, ঝাড়া মোছা করতে সাড়ে তিনটে বেজে গেল। তারপর উনি এলেন।

'এসে অফিসের কাপড়-চোপড় ছেড়ে স্নান করলেন। ছোট বাড়িতে ওঁর পাঁচ সেট জামা-কাপড় আছে, অনেক ইংরেজি বই আছে। উনি নিজের ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বসলেন, আমি জলখাবার তৈরি করতে গেলুম। বাজারের খাবার উনি খান না।

ছ'টার সময় উনি জলখাবার খেলেন। তারপর গান শুনতে বসলেন। ছোট বাড়িতে সংগতের যন্ত্র কিছু নেই, আমি কেবল খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাই। মনে আছে, সেদিন তিনটে পদ গেয়েছিলাম। একটি চন্ডীদাসের, একটি গোবিন্দদাসের, আর একটি জগদানন্দর।

'একটি পদ গাইতে অন্তত আধ ঘন্টা সময় লাগে। আমি জগদানন্দর 'মঞ্জু বিকচ কুসুম-পুঞ্জ' পদটি শেষ করে এনেছি, এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। আমি উঠবার আগেই উনি গিয়ে ফোন ধরলেন। দু'মিনিট পরে ফিরে এসে বললেন, 'আমি এখনি যাচ্ছি, হেনা ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে।'

'তিনি যে-বেশে ছিলেন সেই বেশে বেরিয়ে গেলেন।'

সুকুমারী নীরব হইলে ব্যোমকেশও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল, 'কে টেলিফোন করেছিল আপনি জানেন না?'

সুকুমারী বলিল, 'না। তারপর আমি এ-বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিলাম, কিন্তু

এ-বাড়ি থেকে কেউ ফোন করেনি।'

'এ-বাড়িতে কে কে ফোন নম্বর জানে?'

'কেবল দিদিমণি জানেন, আর কেউ না।'

'দিদিমণি?'

'আমার অভিভাবিকা, কাজকর্ম দেখেন। তাঁকে ডাকব?'

'ডাকুন।'

যাহাকে মাসি ভাবিয়াছিলাম তিনিই দিদিমণি, আজকাল বোধহয় উপাধির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সুকুমারীর বাক্য সমর্থন করিলেন। সেদিন তিনি টেলিফোন করেন নাই, এ-বাড়িতে তিনি ও সুকুমারী ছাড়া ছোট বাড়ির টেলিফোন নম্বর আর কেহ জানে না।

দিদিমণি প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল, 'আপনার সকাল বেলাটা নষ্ট হল।'

সুকুমারী হাত জোড় করিয়া বলিল, 'যদি পায়ের ধুলো দিয়েছেন, একটা গান শুনে যান। আমার তো আর কিছুই নেই।'

সাদা গলায় কেবল খঞ্জনি বাজাইয়া সুকুমারী গান করিল। বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন—মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।

তাহার গান পূর্বে কখনো শুনি নাই, শুনিয়া বিভোর হইয়া গেলাম। কণ্ঠের মাধুর্যে, উচ্চারণের বিশুদ্ধতায়, অনুভবের সুগভীর ব্যঞ্জনায় আমার মনটাকে সে যেন কোন দুর্লভ আনন্দঘন রসলোকে উপনীত করিল। এতক্ষণ তাহার চিত্তচাঞ্চল্যকর কুহকিনী মূর্তিই দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার শুদ্ধশান্ত তদ্‌গত তাপসী রূপ দেখিলাম।

সেদিন বাসায় ফিরিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল।

স্নানাহার সারিয়া আমি বাহিরের ঘরে আসিয়াছি ব্যোমকেশ তখনো আঁচাইতেছে, টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি গিয়া ফোন তুলিয়া লইলাম। সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠে প্রবল বাক্যস্রোত বাহির হইয়া আসিল—'হ্যালো ব্যোমকেশ-বাবু, আমি চামেলি সমাদ্দার। দেখুন, আপনি সন্দেহ করেন আমার ছেলেরা হেনাকে খুন করেছে। ভুল—ভুল। আমার ছেলেরা বাপের মত নয়, ওরা সচ্চরিত্র ভাল ছেলে। ওরা কেন হেনাকে খুন করতে যাবে? আমি বলছি আপনাকে, কেউ হেনাকে খুন করেনি, সে নিজে ছাদ থেকে পড়ে মরেছে। নীচের দিকে উঁকি মেরে দেখছিল, তাল সামলাতে পারেনি।'

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি দম লইবার জন্য থামিলেন, আমি অত্যন্ত সংকুচিত ভাবে বলিলাম, 'দেখুন, আমি ব্যোমকেশ নই, অজিত। ব্যোমকেশকে ডেকে দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণ হতচকিত নীরবতা, তারপর কট্ করিয়া টেলিফোন কাটিয়া গেল।

ইতিমধ্যে ব্যোমকেশ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে শ্রীমতী চামেলির কথা বলিলাম। সে সিগারেট ধরাইয়া পায়চারি করিতে করিতে বলিল-'মহিলাটির প্রকৃতি স্নায়ুপ্রধান। আজ আমি তাঁর ছেলেদের যে-সব প্রশ্ন করেছি তা বোধহয় জানতে পেরেছেন, তাই ভয় হয়েছে। পুলিস যে হাত গুটিয়েছে তা জানেন না, জানলে আমাকে ফোন করতেন না।'

আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, আজ তো সকলকেই নেড়ে-চেড়ে দেখলে। কিছু

আন্দাজ করতে পেরেছ?'

সে হাত তুলিয়া বলিল, 'দাঁড়াও, আরো ভাবতে দাও।'

অপরাহ্ণে বিকাশ আসিল, সঙ্গে একটি ক্ষীণকায় যুবক। বিকাশের চেহারা বা বাকভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন নাই; সে যুবকের দিকে তর্জনী নির্দেশ করিয়া বলিল, 'এর নাম গুপীকেষ্ট, আমার শাগরেদ। যদি দরকার হয় তাই সঙ্গে এনেছি স্যার।'

এমন লোক আছে যাহাকে একবার দেখিয়া ভোলা যায় না। গুপীকেষ্ট ঠিক তাহার বিপরীত, তাহার চেহারা এতই বৈশিষ্ট্যহীন যে হাজার বার দেখিলেও মনে থাকে না, বহুরূপী গিরগিটির মত বাতাবরণের সঙ্গে বেবাক মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

ব্যোমকেশ গুপীকেষ্টকে পরিদর্শন করিয়া সহাস্যে বলিল, 'বেশ বেশ, বোসো তোমরা। দু'জনকেই দরকার হবে। আরো দু'জন পেলে ভাল হত।'

বিকাশ সোৎসাহে বলিল, 'আরো আছে স্যার। কয়েকটা ছেলেকে টিক্‌টিকি-তালিম দিচ্ছি। যদি পিছনে লাগার কাজ হয়, তারা পারবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, পিছনে লাগার কাজ। চারজন লোকের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে।'

'ব্যস্, ঠিক আছে। বাবুই আর চিচিংকে লাগিয়ে দেব। ছেলেমানুষ হলেও ওরা হুঁশিয়ার আছে।' বিকাশ ও গুপীকেষ্ট তক্তপোশের প্রান্তে বসিল, বিকাশ বলিল, 'এবার সব কথা বলুন স্যার।'

ব্যোমকেশ পুঁটিরামকে ডাকিয়া চা-জলখাবার হুকুম করিল। তারপর মোটামুটি পরিস্থিতি বিকাশকে বুঝাইয়া দিল; চারজন লোকের উপর নজর রাখিতে হইবেঃ সন্তোষবাবু, রবিবর্মা, যুগল এবং উদয়। তাহারা কোথায় যায়, কাহার সহিত কথা বলে, অস্বাভাবিক কিছু করে কিনা। রোজ ব্যোমকেশকে রিপোর্ট দিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু কোনো বিষয়ে খট্‌কা লাগিলে তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট দিতে হইবে।

কাজকর্ম বুঝাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল থেকে কাজ শুরু করে দাও। আজ লোকগুলোকে তোমাদের চিনিয়ে দেব। সন্তোষবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়ালেই সবাইকে দেখা যাবে। সন্তোষবাবুর অফিস থেকে ফেরার সময় হল। চা খেয়ে নাও, তারপর আমি তোমাদের নিয়ে বেরুব।' বিকাশ বলিল, 'আপনার যাবার কিছু দরকার নেই স্যার। সন্তোষবাবুর ঠিকানা দিন, আমরা সবাইকে চিনে নেব।'

ব্যোমকেশ ঠিকানা দিল। বিকাশ বলিল, 'এখন বলুন স্যার, কে কার পিছনে লাগবে। আমি কার পিছনে লাগব? সন্তোষবাবুর?'

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'না, তুমি লাগবে রবিবর্মার পিছনে। আর গুপীকেষ্ট লাগবে সন্তোষবাবুর পিছনে। বাকি দু'জন যেমন তেমন হলেই হল।'

'তাই হবে স্যার।'

তাড়াতাড়ি জলযোগ সারিয়া বিকাশ ও গুপীকেষ্ট চলিয়া গেল। আমি বলিলাম, 'সন্তোষবাবুকেও তাহলে তুমি সন্দেহ কর?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি সকলকেই সন্দেহ করি। তুমি যদি সেদিন ওখানে উপস্থিত থাকতে, তাহলে তোমাকেও সন্দেহ করতাম।'

প্রশ্ন করিলাম, 'নেংটিকে সন্দেহ কর?'

সে বলিল, 'নেংটি যদি আমাকে খবর না দিত তাহলে তাকেও সন্দেহ করতাম।'

'আর চিংড়িকে?'

'চিংড়িকে সন্দেহ করি। বোধহয় লক্ষ্য করেছ, বয়সে ছেলেমানুষ হলেও সে ধুগলকে ভালবাসে। হেনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী, সুতরাং তার মোটিভ আছে। সুযোগও প্রচুর।'

'কোথায় সুযোগ? যদি উদয়ের কথা বিশ্বাস করা যায়, হেনা ছাদে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিয়েছিল।'

'চিংড়ি আগে' থাকতে ছাদে গিয়ে লুকিয়েছিল কিনা কে জানে। এ যুক্তি শ্রীমতী চামেলির বেলাতেও খাটে। তিনি হেনাকে সহ্য করতে পারতেন না, তিনি মনে করতেন হেনার সঙ্গে তাঁর স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক আছে।'

ব্যোমকেশের কথাগুলো কিছুক্ষণ মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়া বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, তুমি এই কেস সম্বন্ধে কী বুঝেছ আমায় বল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটি কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি—এটা দুর্ঘটনা নয়, খুন। এখন প্রশ্ন কে খুন করেছে? একে একে সন্দেহভাজন লোকগুলিকে ধর। প্রথমে ধর সন্তোষবাবু। তিনি মস্ত বড় মানুষ, নামজাদা রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু তাঁর একটি দুর্বলতা আছে। মৃত বন্ধুর অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে তিনি আশ্রয় দিলেন। তাঁর এই সৎকার্যটি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ দয়াদাক্ষিণ্য না হতে পারে। কিন্তু তিনি হেনাকে খুন করবেন কেন? খুন করার কোন মোটিভ নেই, থাকলেও আমরা জানি না।'

বলিলাম, সুকুমারীর ব্যাপার নিয়ে হেনা তাঁকে ব্ল্যাকমেল করছিল এমন হতে পারে না কি?'

'হেনা পাকিস্তানের মেয়ে, সুকুমারী-ঘটিত ব্যাপার তার জানার কথা নয়। তবু মনে কর সে জানত। তাহলে সন্তোষবাবু তাকে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিলেন কেন? আর ব্ল্যাকমেলে তাঁর ভয়ই বা কিসের। তাঁর স্ত্রী জানেন তার চরিত্র ভাল নয়, ছেলেরা জানে বাপ শনিবারে-রবিবারে বাড়ি আসে না। রবিবর্মা জানে, নেংটি জানে, বাড়ির সবাই জানে, সুতরাং বাইরের লোকও জানে। কিন্তু কারুর কিছু বলবার সাহস নেই, কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারে না। হেনাকে সন্তোষবাবু ভয় করবেন কেন?'

'তা বটে। তাছাড়া তাঁর অ্যালিবাই আছে।'

'শুধু তাঁর অ্যালিবাই নয়, সুকুমারীরও। দু'জনে দু'জনের অ্যালিবাই যোগাচ্ছেন। সুকুমারীকেও সন্দেহ থেকে বাদ দেওয়া যায় না, তার সুযোগ যত কমই হোক মোটিভ যথেষ্ট ছিল। সন্তোষবাবুর কাছ থেকে সে হাজার টাকা মাইনে পায়, হয়তো কিছু ভালবাসাও আছে। হেনাকে যদি সে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিনী মনে করে তাহলে হেনাকে খুন করার মোটিভ তার আছে।'

'তুমি সত্যিই সুকুমারীকে সন্দেহ কর?'

'সত্যি-মিথ্যের কথা নয়, এ হচ্ছে হিসেবের কড়ি, একটি কানাকড়ি বাদ দেওয়া চলে না।'

'তারপর?'

'তারপর রবিবর্মা। তার সুযোগ ছিল প্রচুর, কিন্তু মোটিভ নিয়েই গণ্ডগোল। লোকটির প্রকৃতি পাঁকাল মাছের মতন, ধরা ছোঁয়া যায় না, ধরতে গেলেই পিছলে যায়। আমার মনে হয় রবিবর্মা আগে থেকে হেনাকে চিনত। হেনার প্রতি তার আকর্ষণ বিকর্ষণ দুইই ছিল। আকর্ষণ বুঝতে পারি, রবিবর্মা অবিবাহিত, হেনার মতন সুন্দরী মেয়ের প্রতি সে আকৃষ্ট হবে এতে আশ্চর্য কিছু নেই। কিন্তু বিকর্ষণ কিসের জন্যে? হেনা কি তার কোন বিপজ্জনক গুপ্তকথা জানত? হেনা তাকে প্রণয়-ব্যাপারে প্রশ্রয় দেয়নি তাই আক্রোশ? তাই কি সে উদয়কে ফাঁসাতে চায়?'

'উদয়কে ফাঁসাতে চায়?'

'উদয় হেনাকে উল কিনে দিয়েছিল, হেনা তার জন্যে সোয়েটার বুনছিল—একথা আমাকে বলবার দরকার ছিল না। এ থেকে মনে হয়, সে নিজের ঘাড় থেকে সন্দেহ নামিয়ে উদয়ের ঘাড়ে চাপাতে চায়।'

'হুঁ। তারপর?'

'তারপর উদয়। গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলে, কড়া মেজাজ, কিন্তু হেনার প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। হেনা বোধহয় তাকে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি আশকারা দিত, উদয় ভাবত হেনা তাকেই ভালবাসে। তারপর সে জানতে পারল যুগলের সঙ্গে হেনার কবিতা লেখালেখি চলছে, গোলাপফুলের আদান-প্রদান চলছে। ছাদের ওপর এই নিয়ে হেনার সঙ্গে উদয়ের ঝগড়া হল, রাগের মাথায় উদয় হেনাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিল। হয়তো তার খুন করবার ইচ্ছা ছিল না—'

বলিলাম, 'আর যুগল? তার কী মোটিভ ছিল?'

সে বলিল, 'একই মোটিভ—যৌন-ঈর্ষা। যুগল শান্তশিষ্ট কবি মানুষ, কিন্তু তার প্রাণের মধ্যে কি রকম দুর্বার আগুন জ্বলে উঠেছিল কে বলতে পারে। সে যদি জানতে পেরে থাকে যে, হেনা উদয়ের জন্যে পশমের জামা বুনছে-'

'কিন্তু সে ছাদে গেল কি করে? উদয় সিঁড়ি দিয়ে হেনার পিছু পিছু গিয়েছিল।'

'যুগল বাগানে গিয়েছিল, বাগান থেকে গোলাপফুল তুলে জানলা দিয়ে হেনার টেবিলে ফেলে দিয়েছিল। তারপর ভারার মই বেয়ে ছাদে উঠে যাওয়া কি তার পক্ষে খুব শক্ত?'

'না, শক্ত নয়। কিন্তু গোলাপফুল উপহার দিয়েই তাকে খুন করল?'

'গোলাপফুলটা হয়তো ভাঁওতা, পুলিসের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা।'

'বুঝলাম। আর কে বাকি রইল?'

'শ্রীমতী চামেলি এবং চিংড়ি। দুজনেরই মোটিভ আছে, দুজনেরই সুযোগ সমান। শ্রীমতী চামেলি যখন বাথরুমে ছিলেন চিংড়ি তখন একলা ছিল, আবার চিংড়ি যখন বাথরুমে ছিল, শ্রীমতী চামেলি তখন একলা ছিলেন।'

আমি বলিলাম, 'তাহলে দাঁড়াল কী? এই সাতজনের মধ্যে আসল দোষী কে?'

সে বলিল, 'শুধু সাতজন নয়, আর একটি ছিপে রুস্তম আছেন যিনি মাউথ-অর্গান বাজিয়ে হেনাকে ইশারা দিয়ে যেতেন।'

ঠিক তো, বংশীবদন বনমালীর কথা মনে ছিল না। প্রশ্ন করিলাম, 'ব্যোমকেশ, ও লোকটা কে?'

ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'হিন্দু কি মুসলমান বলতে পারি না, কিন্তু পাকিস্তানী লোক সন্দেহ নেই। বোধহয় দু'জনের মধ্যে প্রণয় ছিল, লোকটা পাকিস্তান থেকে হেনাকে বই এনে দিত। প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে কখন কি ঘটে কিছুই বলা যায় না। প্রণয় হয়তো ক্রমশ বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হেনার মন উদয়ের দিকে ঢলেছিল।'

'লোকটা দশ-বারো দিন অন্তর আসত কেন?'

'হয়তো সে প্লেনে আসত, হয়তো সে প্লেনের একজন অফিসার; দশ-বারো দিন অন্তর দমদমে নামে, হেনার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করে যায়। সবই অবশ্য অনুমান।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে হঠাৎ উঠিয়া পাশের ঘরে গেল, শুনিতে পাইলাম কাহাকে ফোন করিতেছে। দু-তিন মিনিট পরে ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাকে?'

সে বলিল, 'নেংটিকে। বংশীধারী লোকটি হেনার মৃত্যুর পর আর এসেছিল কিনা খবর নিচ্ছিলাম। নেংটি বলল, আসেনি।'

'না আসার কি কারণ থাকতে পারে?'

'হয়তো হেনার মৃত্যুর খবর জানতে পেরেছে, কিংবা অসুখে পড়েছে, কিংবা মরে গেছে। কত রকম কারণ থাকতে পারে।' হঠাৎ ব্যোমকেশ স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল, অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। দেখিলাম সে আমার দিকে চাহিয়া আছে বটে কিন্তু আমাকে দেখিতেছে না, মনশ্চক্ষু দিয়া অভাবনীয় কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছে। তারপর সে চাপা গলায় বলিল, 'অজিত।'

বলিলাম, 'কি হল?'

সে বলিল, 'যেদিন হেনা মারা যায় সেদিনের কথা মনে আছে?'

'মনে থাকবে না কেন? সে তো পরশু!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দুপুরবেলা তুমি খবরের কাগজ পড়ে শোনালে। একটা পাকিস্তানী প্লেন বানচাল হয়ে বঙ্গোপসাগরে ডুবেছে, মনে আছে? আমি মৈনাক পর্বতের গল্প বললাম—'

'মনে আছে বৈকি!'

'সেদিনকার খবরের কাগজটা খুঁজে বার করতে পার?'

'পারি।'

পুরানো খবরের কাগজগুলো একস্থানে জমা করা হইত, মাসের শেষে পুঁটিরাম সেগুলিকে বিক্রয় করিত। আমি সেদিনের কাগজটা খুঁজিয়া আনিয়া ব্যোমকেশকে দিলাম, সে সাগ্রহে কাগজের পাতা উল্টাইয়া বিমান-বিপর্যয়ের বিবরণ দেখিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি দেখছ?'

সে কাগজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, 'ডাকোটা প্লেন। সিঙ্গাপুর থেকে কায়রো পর্যন্ত দৌড়। অফিসার সবাই মুসলমান, কেবল একজন পাইলট ইংরেজ। যাত্রিদলের মধ্যে সব জাতের লোক ছিল—'

ধীরে ধীরে কাগজ মুড়িয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ শূন্যদৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিল।

অতঃপর, আমাদের জীবনে যে কর্ম-চঞ্চলতা আসিয়াছিল, তাহা যেন দমকা বাতাসের মত অকস্মাৎ শান্ত হইয়া গেল। দু'দিন আর কোনো সাড়াশব্দ নাই। কেবল বিকাশ একবার টেলিফোন করিয়া জানাইল তাহারা শিকারের পিছনে লাগিয়া আছে। সন্তোষবাবু ও রবিবর্মা নিয়মিত অফিস যাইতেছেন ও বাড়ি ফিরিতেছেন; যুগল ও উদয় কলেজ যাইতেছে ও বাড়ি ফিরিতেছে; উদয় মাঝে একদিন বিকালবেলা হকি খেলিতে গিয়াছিল। উল্লেখযোগ্য অন্য কোনো খবর নাই।

তৃতীয় দিন, অর্থাৎ, বৃহস্পতিবারে আবার আমাদের জীবনে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়া আসিল, তৈলাভাবে নিবন্ত প্রদীপ আবার ভাস্বর হইয়া উঠিল।

সকালবেলা নেংটি আসিল। তাহার ভাবভঙ্গিতে একটু অস্বস্তির লক্ষণ। ব্যোমকেশ তাহাকে একটি সিগারেট দিয়া বলিল, 'কি খবর?'

নেংটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না, সিগারেট ধরাইয়া কুণ্ঠিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিল। তারপর বলিল, 'ব্যোমকেশদা, আপনি কি উদয়দার পিছনে গুপ্তচর লাগিয়েছেন?'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিল, 'কে বলল?'

'উদয়দা বলল, একটা সিড়িঙ্গে ছোঁড়া তার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'উদয় বুঝি খুব ঘাবড়ে গেছে?'

ঘাবড়াবার ছেলে উদয়দা নয়, সে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে; যেন ভারি গৌরবের কথা। মাসিমা কিন্তু ভয় পেয়েছেন।'

ব্যোমকেশ চকিত হইয়া চাহিল, 'তাই নাকি। কিন্তু তিনি ভয় পেলেন কেন?'

নেংটি মাথা নাড়িয়া বলিল 'তা জানি না। কাল উদয়দা মাসিমার কাছে বড়াই করছিল, জানো মা, আমার পিছনে পুলিস-গোয়েন্দা লেগেছে। তাই শুনে মাসিমার মুখ শুকিয়ে গেল। একেই তো ছট্‌ফটে মানুষ, সেই থেকে আরো ছট্‌ফট করে বেড়াচ্ছিলেন। আজ সকালে আমাকে বললেন, তুই ব্যোমকেশবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়, তাঁর সঙ্গে কথা বলব।'

'আমার সঙ্গে কথা বলবেন?'

'হ্যাঁ।— ব্যোমকেশদা, কিছু হদিস পেলেন?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'কিছু হদিস পেয়েছি।'

নেংটি বিস্ফারিত চক্ষে বলিল 'পেয়েছেন!'

'বোধহয় পেয়েছি কিন্তু তা এখনও বলবার মত নয়। চল, তোমার মাসিমা কি বলেন শুনে আসি। ওঠ অজিত।'

সন্তোষবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নীচের তলার হল-ঘরে হৈ-হুল্লোড় চলিতেছে। চিংড়ি একটা তালপাতার পাখা লইয়া যুগলকে মারিতে ছুটিয়াছে, উদয় চিংড়ির লম্বা বেণী ঘোড়ার রাশের মত ধরিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং বলিতেছে—'হ্যাট ঘোড়া- হ্যাট্ হ্যাট্।' চিংড়ি বলিতেছে, 'কেন আমার খোঁপা খুলে দিলে!' তিনজনেই উচ্চকণ্ঠে হাসিতেছে এবং ঘরময় ছুটা-ছুটি করিতেছে। তিনজনের মুখেই খুন্‌সুড়ির উল্লাস।

আমাদের আবির্ভাবে রঙ্গক্রীড়া অর্ধপথে থামিয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য তিনজনে অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর চিংড়ি লজ্জিত মুখে সিঁড়ি দিয়া উপরে পলায়ন করিল; যুগল ও উদয় অপেক্ষাকৃত মন্থর পদে তাহার

অনুবর্তী হইল।

নেংটি আমাদের বসাইয়া মাসিমাকে খবর দিতে গেল। আমি চুপি চুপি ব্যোমকেশকে বলিলাম, 'ভায়ে ভায়ে ভাব হয়ে গেছে দেখেছ?'

ব্যোমকেশ একটু গম্ভীর হাসিয়া বলিল, 'এর নাম যৌবন।'

নেংটি নামিয়া আসিয়া বলিল, 'মাসিমা আপনাদের ওপরে ডাকছেন।'

দ্বিতলে উঠিলাম, কিন্তু হল-ঘরে কেউ নাই। এই খানিক আগে যাহারা উপরে আসিয়াছিল, তাহারা বোধকরি স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। নেংটি একটি ভেজানো দোরের কপাটে টোকা মারিল। ভিতর হইতে আওয়াজ হইল, 'এস।'

নেংটি দ্বার ঠেলিয়া আমাদের ভিতরে লইয়া গেল।

ঘরটি শয়নকক্ষ হিসাবে বেশ বিস্তৃত; একপাশে জোড়া-খাট ঘরের বিস্তার খর্ব করিতে পারে নাই। খাটটিতে সম্ভবত শ্রীমতী চামেলি চিংড়িকে লইয়া শয়ন করেন। খাট ছাড়া ঘরে ওয়ার্ডরোব, কাপড়ের আলনা, ড্রেসিং-টেবিল, দুইটি আরাম-কেদারা। দেয়ালে একটি লেলিহবসনা মা-কালীর পট। দুইটি বড় বড় জানালা দিয়া বাড়ির পিছন দিকের পাইনের সারি দেখা যাইতেছে।

ঘরে দুইটি স্ত্রীলোক। এক শ্রীমতী চামেলি; তিনি স্নান করিয়া গরদের শাড়ি পরিয়াছেন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে আধুলির মত একটি সিঁদুরের ফোঁটা, মুখ গম্ভীর, চক্ষে চাপা উত্তেজনার অস্বাভাবিক দীপ্তি। দ্বিতীয়, চিংড়ি। তাহার ক্রীড়া-চপলতা আর নাই। সে জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বিস্ফারিত নেত্রে আমাদের পানে চাহিয়া আছে।

শ্রীমতী চামেলি বলিলেন 'নেংটি, চিংড়ি তোরা বাইরে যা, আমি এঁদের সঙ্গে কথা কইব।'

চিংড়ির যাইবার ইচ্ছা ছিল না, সে শম্বুকগতিতে জানালা হইতে দ্বারের দিকে পা বাড়াইতেছিল, নেংটি গভীর ভ্রূকুটি করিয়া মস্তক সঞ্চালনে তাহাকে ইশারা করিল। দুজনে ঘর হইতে বাহির হইল, নেংটি দ্বার ভেজাইয়া দিল।

শ্রীমতী চামেলি চেয়ার নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'আপনারা বসুন।' তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গী কাটা-কাটা, যেন অত্যন্ত সতর্কভাবে কথা বলিতেছেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি বসুন।'

ঘরে দুটি মাত্র চেয়ার ছিল, তৃতীয় ব্যক্তিকে বসিতে হইলে খাটের কিনারায় বসিতে হয়। শ্রীমতী চামেলি একবার খাটের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মুখ ঈষৎ কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন, 'আমি বসব না, আমার এখনো পুজো হয়নি। আপনারা বসুন।'

চেয়ারে বসিতে বসিতে ভাবিলাম, ইনি একদিন সন্ত্রাসবাদিনী ছিলেন বন্দুক চালাইতেন, তখন নিশ্চয় শুচিবাই ছিল না। অবস্থাচক্রে মনের কত পরিবর্তনই না হয়।

আমরা উপবিষ্ট হইলে শ্রীমতী চামেলি কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, ধীরে ধীরে গুনিয়া গুনিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। সংসারের সাধারণ কথা যাহা ব্যোমকেশকে শুনাইবার কোনই সার্থকতা নাই, মনে হইল তিনি ভয় পাইয়াছেন, তাই আসল কথাটা বলিবার আগে খানিকটা ভণিতা করিয়া লইতেছেন।

কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে শুনিয়া ব্যোমকেশ মুখ তুলিল, বলিল, 'দেখুন, আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। আমি এ পরিবারের বন্ধু, সন্তোষবাবু আপনাদের

সকলের স্বার্থরক্ষার জন্যে আমাকে নিযুক্ত করেছেন। হেনার মৃত্যু-সম্বন্ধে আপনার যদি কিছু জানা থাকে, আমাকে খুলে বলতে পারেন।'

শ্রীমতী চামেলি একটু থমকিয়া গেলেন. ব্যোমকেশকে যেন নূতন চক্ষু দিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন. 'আপনি পুলিসের দলের লোক নয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, পুলিসের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'কিন্তু—কিন্তু—আপনি জানেন পুলিস আমার ছেলেদের পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছে!'

বুঝিলাম, শ্রীমতী চামেলি জানেন না যে পুলিস এ মামলা হইতে হাত গুটাইয়াছে। সন্তোষবাবুর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ, কে-ই বা তাঁহাকে বলিবে।

ব্যোমকেশ চুপ করিয়া রহিল। শ্রীমতী চামেলির স্বর তীব্র হইয়া উঠিল, 'এ কি অন্যায়; আমার ছেলেরা নির্দোষ। তবু তাদের পিছনে গুপ্তচর লাগবে কেন?'

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে বলিল, 'তারা নির্দোষ কিনা জানতে চায় বলেই বোধহয় গুপ্তচর লেগেছে।'

'আমি হাজার বার বলেছি আমার ছেলেরা নির্দোষ, তবু তাদের বিশ্বাস হয় না!'

'কিন্তু ওরা নির্দোষ তা আপনিই বা জানলেন কি করে? দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনি ওদের মা, আপনার পক্ষে ওদের নির্দোষিতায় বিশ্বাস করা স্বাভাবিক। কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে তো তা নয়। তাদের চোখে সবাই সমান।'

শ্রীমতী চামেলির চোখে আভ্যন্তরিক জল্পনার ছায়া পড়িল. তিনি এক পা সম্মুখে আসিয়া হঠাৎ চাপা সুরে বলিলেন 'ব্যোমকেশবাবু, আমি জানি হেনা কি করে মরেছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

ব্যোমকেশ চমকিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিল 'স্বচক্ষে দেখেছেন!'

'হ্যাঁ।' শ্রীমতী চামেলি এক নিশ্বাসে বলিয়া গেলেন, 'সেদিন চিংড়ি বাথরুমে যাবার পর আমি বাইরে এসে দেখলুম, হেনা তেতলার ছাদে যাচ্ছে। সকলেই জানে আমি হেনাকে সহ্য করিতে পারি না, হেনাও আমাকে ভয় করে। আমি ভাবলুম, এই সুযোগে আমিও ছাদে গিয়ে যদি তাকে বেশ দু-চার কথা শুনিয়ে দিই তাহলে সে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, আমার ছেলেরা নিরাপদ হবে।'

'তাহলে ছেলেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আপনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন? যাহোক, তারপর?'

'আমিও সিঁড়ি বেয়ে তেতলার ছাদে গেলুম। আমাকে দেখেই হেনা ভয় পেয়ে আলসের দিকে ছুটে গিয়ে আলসের গায়ে আছড়ে পড়ল। তারপর তাল সামলাতে না পেরে উলটে নীচে পড়ে গেল। আমাকে দেখে বোধহয় তার ভয় হয়েছিল যে আমি তাকে মারব।'

ব্যোমকেশ তাঁহার পানে নিষ্পলক চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'এসব কথা আগে বলেন নি কেন?'

শ্রীমতী চামেলি মুখের একটি অধীর ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'বললে কি কেউ বিশ্বাস করত? উল্টে সন্দেহ করত আমিই হেনাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছি।'

ব্যোমকেশ একবার ঘাড় হেঁট করিয়া আবার মুখ তুলিল, 'তা বটে। আচ্ছা, আপনি যখন সিঁড়ি দিয়ে ছাদে গেলেন তখন উদয়কে দেখেছিলেন?'

শ্রীমতী চামেলি ঈষৎ শঙ্কিত কণ্ঠে বলিলেন, 'না, উদয় সেখানে ছিল না।'

'কাউকে দেখেন নি?'

'না, কাউকে না।'

'সিঁড়ির দরজা, ছাদে যাবার দরজা, নিশ্চয় খোলা ছিল?'

'হ্যাঁ, খোলা ছিল।'

'আপনি যখন হেনাকে দেখলেন, তখন সে কী করছিল?'

'ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল।'

'তার হাতে কিছু ছিল?'

'লক্ষ্য করি নি।'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'আর বোধহয় আপনার কিছু বলবার নেই। আচ্ছা,তাহলে আসি। পুলিসকে আপনার কথা বলে দেখতে পারেন।'

শ্রীমতী চামেলি শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা চলিয়া আসিলাম।

বাসায় ফিরিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইল।

শ্রীমতী চামেলি ছেলেদের বাঁচাইবার জন্য যে নিপুণ কল্পকথা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যোমকেশকে আরও বিভ্রান্ত ও বিমর্ষ করিয়া তুলিয়াছিল। সে তক্তপোশের উপর লম্বা হইয়া বিক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, 'কিছু হচ্ছে না—কিচ্ছু হচ্ছে না শুধু ভাঁওতা, শুধু ধাপ্পা। সবাই আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছে।'

আমি বলিলাম, 'তোমারই বা কিসের গরজ, ব্যোমকেশ? পুলিস হাল ছেড়ে দিয়েছে, সন্তোষবাবুরও আগ্রহ নেই। তবে তুমি কেন মিছে খেটে মরছ!'

ব্যোমকেশ ক্লিষ্ট স্বরে বলিল, মুশকিল কি হয়েছে জানো? আমি সত্যান্বেষী, সত্যি কথাটা যতক্ষণ না জানতে পারছি, আমার প্রাণে শান্তি নেই। দুত্তোর! এ সময়ে যদি অন্য একটা কাজ হাতে থাকতো তাহলে হয়তো ভুলে থাকতে পারতাম—'

এই সময় সদর দরজার সামনে পোস্টম্যান আসিয়া দাঁড়াইল।

ইন্সিওর-করা রেজিস্ট্রি খাম। প্রেরকের নাম—উড়িষ্যা রাজ্য সরকারের দপ্তর। কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম--কী ব্যাপার! ব্যোমকেশ খাম খুলিয়া একটি টাইপ-করা চিঠি বাহির করিল। উড়িষ্যা রাজ্য সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী মহাশয় লিখিয়াছেন—

প্রিয় মহাশয় মান্যবর মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের আদেশে এই পত্র লিখিতেছি। আপনি ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার ও বোম্বাই সরকারের পক্ষে যে কাজ করিয়াছেন তাহা আমাদের অবিদিত নহে।

সম্প্রতি উড়িষ্যা সরকারের দপ্তরে কিছু রহস্যময় ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। দপ্তর হইতে মূল্যবান ও অতি গোপনীয় দলিল অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, কিন্তু অপরাধীকে ধরা যাইতেছে না। এ বিষয়ে উড়িষ্যা সরকার আপনার সাহায্যপ্রার্থী। আপনি অবিলম্বে কটকে আসিয়া তদন্তের ভার গ্রহণ করিলে বাধিত হইব। বিলম্বে রাষ্ট্রের ইষ্টহানির সম্ভাবনা।

আপনি কবে আসিতেছেন তার-যোগে জানাইলে উপকৃত হইব। আপনার রাহা-খরচ ইত্যাদি বাবদ ৫০০্ টাকার চেক্ অত্রসহ পাঠানো হইল।

ধন্যবাদান্তে নিবেদন ইতি।—

ব্যোমকেশ প্রফুল্ল মুখে চিঠি ও চেক আমার হাতে দিল, বলিল, 'সরকারী মহলে' আমার খ্যাতি রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেখছি।'

চিঠি পড়িয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম সে দুই হাত পিছন দিকে শৃঙ্খলিত করিয়া পায়চারি করিতেছে। বলিলাম, 'যা চাইছিলে তাই হল। যাবে তো?'

'দেশের কাজ।.যাব বৈকি।'

'কবে যাবে?'

সে পদচারণে বিরতি দিয়া বলিল, 'অজিত, তুমি খাওয়া-দাওয়া সেবে চেক্‌টা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এস। আর কটকে একটা তার করে দাও, আমরা অবিলম্বে যাচ্ছি।'

প্রশ্ন করিলাম, 'অবিলম্বেটা কবে?'

সে হাসিয়া বলিল, 'আজকালের মধ্যে।'

সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় বিকাশ আসিল, বলিল, 'খবব আছে স্যার।'

বিকাশ, গুপীকেষ্ট, বাবুই ও চিচিং নামধাবী চারিটি যুবক যে ব্যোমকেশের পক্ষ হইতে টিকটিকির কাজ করিতেছে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মনটা অগ্রবর্তী হইয়া কটকের দিকে ছুটিয়াছিল।

তিনজনে ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া তক্তপোশের উপব বসিলাম। বিকাশ বলিল 'চীনেম্যানটা বড় জ্বালিয়েছে স্যার।'

'চীনেম্যান!'

'ওই যে আপনার রবিবর্মা। নাক-মুখ-চোখ চীনেম্যানের মতন। নিশ্চয় লুকিয়ে লুকিয়ে আরসোলা খায়।'

'বিচিত্র নয়। তারপর বল, জ্বালিয়েছে কি ভাবে?'

'ক-দিন ধরে লোকটার পিছনে লেগে আছি, তা একবার কি এদিক-ওদিক যাবে। না, বাড়ি থেকে অফিস, আর অফিস থেকে বাড়ি। হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম স্যার। তারপর আজ—'

'আজ কি করেছে?'

'অন্যদিন পাঁচটার সময় অফিস থেকে বেরোয়, আজ সাড়ে চারটেব সময় বেরুলো। বাড়িব দিকে গেল না, বৌবাজারের বাসে উঠল। আমিও উঠলাম। লোকটার মনে পাপ আছে বেশ বোঝা যায়, বাববার পিছু ফিরে চাইছে। আমি ঘাপটি মেরে আছি। শেষে শিয়ালদার কাছাকাছি এসে রবিবর্মা টুক করে নেমে পড়ল। আমিও নামলাম।

'আপনি লক্ষ্য করেছেন বোধহয় ঐখানে একটা হোটেল আছে—নাম ইন্দো-পাক হোটেল। তিন-তলা বাড়ি, কিন্তু একটু ঘুপ্‌সি গোছের। যারা পাকিস্তান থেকে যাওয়া-আসা করে, তারাই বেশির ভাগ এই হোটেলে ওঠে। নীচের তলায় রেস্তরাঁ, মুর্গী-মটন চলছে, ওপর তলায় থাকবার ঘর। রবিবর্মা হোটেলে ঢুকে পড়ল।

'রেস্তরাঁয় হট্টগোল চলছে, রবিবর্মা সেদিকে গেল না। পাশের একটা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে চুপি চুপি ওপরে উঠে গেল।

'আমিও গেলাম। সিঁড়ি যেখানে দোতলায় গিয়ে তেতলার দিকে মোড় ঘুরেছে, সেখানে সরু গলির মত একটা বারান্দা, তার দু'পাশে সারি সারি ঘরের দোর। মাথার ওপর ধোঁয়াটে একটা বাল্‌ব্‌ ঝুলছে। আমি সিঁড়ির মোড় থেকে উঁকি মেরে দেখলাম রবিবর্মা কোণের দিকের একটা ঘরের দরজা চাবি দিয়ে খুলছে। দরজা কিন্তু খুলল না। তখন রবিবর্মা চাবির গোছা থেকে আর একটা চাবি বেছে নিয়ে তালায় পরালো, কিন্তু তবু তালা খুলল না।

'এই সময় তেতলার দিক থেকে সিঁড়ির ওপর পায়ের আওয়াজ হল, দু-তিনজন ভাড়াটে নেমে আসছে। আমি তখন এমন ভাব দেখালাম যেন আমি দোতলায় থাকি, পকেট থেকে চাবি বার করতে করতে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। রবিবর্মা চট করে চাবির গোছা পকেটে পুরে নীচে নেমে গেল। আমিও তার দরজাটা এক নজরে দেখে নিয়ে তার পিছু নিলাম।

'তারপর রবিবর্মা সটান বাড়ি ফিরে গেল। তাকে বাড়িতে পেঁছে দিয়ে আসছি।'

ব্যোমকেশের চক্ষু কিছুক্ষণ অন্তর্নিমগ্ন হইয়া রহিল।

'ইন্দো-পাক হোটেল—হেনা পাকিস্তানের মেয়ে ছিল—রবিবর্মা '—বিকাশের দিকে চোখ তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ঘরের নম্বরটা লক্ষ্য করেছিলে?'

বিকাশ বলিল, 'হ্যাঁ স্যার; দোরের মাথায় পেতলের নম্বর মারা ছিল—৭ নম্বর।'

'৭ নম্বর!' ব্যোমকেশের চোখ ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

'হ্যাঁ স্যার, ৭ নম্বর।'

ব্যোমকেশ আবার চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িল। আমারও মনে হইল সাত নম্বর কথাটা কোথায় যেন শুনিয়াছি, হঠাৎ স্মরণ করিতে পারিলাম না। বিকাশ চুপি চুপি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, '৭ নম্বরের কোন মাহাত্ম্য আছে নাকি স্যার?'

ব্যোমকেশ চক্ষু খুলিল, বিকাশের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল 'তুমিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কাজের লোক। কিন্তু কাজ এখনো শেষ হয়নি। তুমি ইন্দো-পাক হোটেলে ফিরে যাও, ৭ নম্বর ঘরের সামনে পাহারা দাও। আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যেই যাচ্ছি।'

'আচ্ছা স্যার।' বিকাশ চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ পাশের ঘরে উঠিয়া গিয়া ফোন তুলিয়া লইল। সংযোগ স্থাপিত হইলে বলিল, 'এ কে রে? আমি ব্যোমকেশ, একটু দরকার আছে, হেনার চাবির গোছা তোমার কাছে আছে তো?...বেশ বেশ। আমরা এখনি তোমার কাছে যাচ্ছি চাবির গোছাটা দরকার...সাক্ষাতে বলব...তুমি যদি আমাদের সঙ্গে আসতে পারো তো ভাল হয়...বেশ বেশ, আমরা এখনি যাচ্ছি।'

ফোন রাখিয়া দিয়া সে বলিল, 'চল, আজ রাত্রেই হেনা-রহস্যের সমাধান হবে মনে হচ্ছে।'

এতক্ষণে মনে পড়িল হেনার চাবির গোছায় একটা চাবিতে '৭ নম্বর ছাপ মারা ছিল।

এ কে রে-কে ট্যাক্সিতে তুলিয়া লইয়া আমরা আন্দাজ আটটার সময় ইন্দো-পাক হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। পথে একবার মাত্র কথা হইল, এ

কে রে বলিলেন, 'আমি কিন্তু এখন পুলিস নই, স্রেফ তোমার বন্ধু।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই সই।'

দোতলার সিঁড়ির মুখে বিকাশ রেলিংয়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আমাদের দেখিয়া খাড়া হইল। ব্যোমকেশ চুপি চুপি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সাত নম্বর ঘরের খবর কি?'

বিকাশ বলিল, 'ভাল। আর কেউ আসেনি।'

'হোটেলের ম্যানেজার কোথায় থাকে জানো?'

'ঐ ঘরে!' বিকাশ সামনের ঘরের দিকে আঙুল দেখাইল।

ব্যোমকেশ এ কে রে'র দিকে দৃষ্টি ফিরাইল; চোখে চোখে কথা হইল। এ কে রে ঘাড় নাড়িয়া ম্যানেজারের ঘরের বন্ধ দ্বারে টোকা দিলেন।

দ্বার খুলিয়া একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি দাঁড়াইলেন। তাঁহার পিছনে আলোকিত ঘরটি দেখিতে পাইলাম, টেবিল-চেয়ার দিয়া সাজানো ঘর, ঘরে অন্য কেহ নাই, কেবল টেবিলের ওপর একটি বোতল শোভা পাইতেছে।

এ কে রে বলিলেন, 'আপনি হোটেলের ম্যানেজার?'

ম্যানেজার ঢুলুঢুলু চক্ষে এ কে রে-র পোশাক অবলোকন করিয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আসতে আজ্ঞা হোক।' বলিয়া তিনি আভূমি অবনত হইয়া অভিবাদন করিতে গিয়া গোঁত্তা খাইয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন, এ কে রে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, 'আমি পুলিসের কাজে আসিনি। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।'

ম্যানেজারের কণ্ঠ হইতে বিগলিত হাসির খিক্‌খিক্‌ আওয়াজ নির্গত হইল। এ কে রে ঘাড় ফিরাইয়া ব্যোমকেশকে চোখের ইশারা করিলেন, পকেট হইতে হেনার চাবির রিং লইয়া তাহার হাতে দিলেন, তারপরে ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিলেন। আমরা তিনজন বাহিরে রহিলাম।

ব্যোমকেশ বলিল, "এবার সাত নম্বর।'

সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে সাত নম্বর ঘর। টিম্‌টিমে বাল্‌বের আলোয় চাবি বাছিয়া লইয়া ব্যোমকেশ তালায় চাবি পরাইল। সঙ্গে সঙ্গে তালা খুলিয়া গেল। চাবিটা যে এই ঘরেরই এবং হেনার এই ঘরে যাতায়াত ছিল তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

ঘর অন্ধকার। ঘরে পদার্পণ করিতে গিয়া মনে হইল একটা কালো হিংস্র জন্তু ঘরের কোণে ওৎ পাতিয়া আছে, আমরা পা বাড়াইলেই ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে। ব্যোমকেশ বলিল, 'দাঁড়াও, দেশলাই বার করি।'

কিন্তু বিকাশ তৎপূর্বেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বারের পাশে হাতড়াইয়া সুইচ টিপিল। দপ করিয়া ঘরটা আলোকিত হইয়া উঠিল। আমরা ভিতরে গিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিলাম।

ঘরের বন্ধ বাতাসে সেঁতা-সেঁতা গন্ধ। একটি মাত্র জানালা বন্ধ। ঘরটি প্রায় নিরাভরণ; একদিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া একটি লোহার খাট নগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে, অন্য দেওয়ালে একটি মধ্যমাকৃতি গোদরেজের স্টীলের আলমারি। আর কিছু নাই।

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রথমেই স্টীলের আলমারির দিকে গিয়াছিল, সে চাবির রিং হইতে আর একটি চাবি লইয়া আলমারিতে লাগাইয়া পাক দিতেই কপাট

খুলিয়া গেল। বিকাশ ও আমি ব্যোমকেশের পিছন হইতে ঝুঁকিয়া দেখিলাম—

আলমারির তিনটি থাক। নীচের দুটি থাক খালি, উপরের থাকে একটি বই এবং রেক্সিনে বাঁধানো পুস্তকাকার একটি ফাইল রহিয়াছে। পিছন দিকে একটি কৃষ্ণবর্ণ বস্তু অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল, ব্যোমকেশ হাত বাড়াইয়া সেটি বাহিরে আনিল। দেখা গেল সেটি একটি ভাঙা মাউথ-অর্গান।

মাউথ-অর্গানটি নাড়িয়া-চাড়িয়া ব্যোমকেশ আবার রাখিয়া দিল। তারপর বইখানি তুলিয়া লইল। জগ্‌জগে বাঁধানো কোয়ার্টো সাইজের বাংলা বই, মলাটে ফারসী লিপির অনুকরণে নাম লেখা আছে—রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম। ব্যোমকেশ পাতা উল্টাইয়া দেখিল উপহার-পৃষ্ঠায় লেখা আছে—শ্রীমতী মিনা 'মাতাহারি' প্রিয়তমাসু। তন্নিম্নে উপহর্তার নাম দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। নামটা একান্ত পরিচিত।

বইখানি আমার হাতে দিয়া ব্যোমকেশ রেক্সিন-বাঁধানো ফাইলটি হাতে লইল, সন্তর্পণে পাতা খুলিয়া আবার চট করিয়া বন্ধ করিয়া ফেলিল। যতটুকু দেখিতে পাইলাম, মনে হইল কয়েকটি বাংলা হরফে লেখা চিঠি তাহার মধ্যে রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, এখানে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে।' দেখিলাম, তাহার চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করিতেছে। ঘরের বাহিরে আসিয়া সে দরজায় তালা লাগাইল, বলিল, 'এবার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে।'

ম্যানেজারের ঘরে তখন আসর জমিয়া উঠিয়াছে: নিঃশেষিত বোতলটি টেবিলের উপর গড়াইতেছে। এ কে রে একটি অর্ধ-পূর্ণ পাত্র হাতে লইয়া বসিয়া আছেন, ম্যানেজার হাত-জোড় করিয়া তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন—'আর এক চুমুক স্যার, স্রেফ একটি চুমুক। আমার মাথার দিব্যি!'

আমরা প্রবেশ করিলে ব্যোমকেশের সঙ্গে এ কে রে-র দৃষ্টি বিনিময় হইল, ব্যোমকেশ একটু ঘাড় নাড়িল। এ কে রে উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আজ তাহলে—'

ম্যানেজার গদগদ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'তা কি হয়! ভদ্র মহো-মহোদয়েরা এসেছেন, এক চুমুক না খেয়ে যেতে পাবেন না। আমি আর এক বোতল ভাঙছি।'

তিনি আলমারির দিকে অগ্রসর হইলেন, ব্যোমকেশ বাধা দিয়া বলিল, 'না না, আজ থাক, আর একদিন হবে। আচ্ছা ম্যানেজারবাবু, আপনার ৭ নম্বর ঘরে কে থাকে বলুন দেখি?'

'৭ নম্বর!' ম্যানেজার কিছুক্ষণ চক্ষু মিটিমিটি করিয়া বলিলেন, 'ও ৭ নম্বর। একটি পাকিস্তানী ভদ্রলোক ভাড়া নিয়েছেন। ভারী মজার লোক। মাসে মাসে ভাড়া গোনেন, কিন্তু মাসের মধ্যে বড় জোর তিন দিন আসেন। আধ ঘণ্টা থেকেই চলে যান। ভারী মজার লোক।'

'তাঁর সঙ্গে কেউ আসে?'

ম্যানেজারের চোখে একটু ধূর্ততার ছায়া পড়িল, তিনি বলিলেন, 'একটি পরী আসে।'

'ভদ্রলোকের নাম কি?'

'নাম!' ম্যানেজার আকাশ-পাতাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'নামটা বিস্মরণ হয়ে গেছে। কিন্তু কুচ পরোয়া নেই, রেজিস্টারে নাম আছে।'

একটি বাঁধানো খাতা খুলিয়া তিনি বলিলেন, 'ঠিক ধরেছি, যাবে কোথায়?

এই যে ভদ্রলোকের নাম—ঢাকা পাকিস্তান ওমর শিরাজি।' তিনি বিজয়োৎফুল্ল নেত্রে চাহিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওমর শিরাজি। ধন্যবাদ—অশেষ ধন্যবাদ। আজ চলি, আবার একদিন আসব।'

ম্যানেজারের আর একটি বোতল ভাঙিবার সনির্বন্ধ প্রস্তাব এড়াইয়া আমরা নীচে নামিলাম। ব্যোমকেশ বিকাশের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে। আজ বাড়ি যাও। শীগ্‌গির একদিন এসো।'

বিকাশ প্রস্থান করিল। আমরা একটা ট্যাক্সি ধরিয়া এ কে রে'র থানার দিকে চলিলাম, তাঁহাকে পোঁছাইয়া দিয়া বাসায় ফিরিব।

পথে যাইতে যাইতে এ কে রে বলিলেন, 'ম্যানেজার ভদ্রতার অবতার, একেবারে নাছোড়বান্দা ভদ্রলোক, আমাকে এক পেগ খাইয়ে তবে ছাড়লো। আরো খাওয়াবার তালে ছিল।—যা হোক, তোমার কাজ হল?'

ব্যোমকেশ চাবি তাহাকে ফেরত দিয়া বলিল, হল। তুমি কিছু জানতে চাও না?'

এ কে রে দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িলেন, 'না।'

বাসায় ফিরিয়া ব্যোমকেশ প্রথমেই ওমর খৈয়ামের কাব্য ও চিঠির ফাইল সযত্নে দেরাজের মধ্যে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিল। আমি প্রশ্ন করিলাম, 'ওমর খৈয়ামকে তো চিনি, ওমর শিরাজি লোকটি কে?'

পুরনো খবরের কাগজটা টেবিলের ওপরেই ছিল ব্যোমকেশ তাহার পাতা খুলিয়া আমাকে দেখাইল। পাকিস্তানী বিমান-দুর্ঘটনায় মৃতের তালিকায় নাম রহিয়াছে—ওমর শিরাজি, ন্যাভিগেটর।

রাত্রের আহারাদি সম্পন্ন করিয়া ব্যোমকেশ চিঠির ফাইল লইয়া বসিল।

পরদিন বেলা ন'টার সময় সন্তোষবাবুর অফিসে উপস্থিত হইলাম।

সন্তোষবাবু সবেমাত্র আসিয়া অফিসে বসিয়াছেন, ব্যোমকেশকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'একি! আপনি এখনো এখানে?'

ব্যোমকেশ পূর্ণদৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আপনার জন্যে ফাঁদ পাতব ভেবেছিলাম, তা আর দরকার হল না। হ্যাঁ, উড়িষ্যা সরকারের নিমন্ত্রণ আমি পেয়েছি, কিন্তু এখনো যাওয়া হয়নি। বসতে পারি?' অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সে চেয়ারে বসিল। আমিও বসিলাম।

বেফাঁস কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। সন্তোষবাবুর মুখ ক্ষণকালের জন্য লাল হইয়া উঠিল। তারপর তিনি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, 'উড়িষ্যা সরকার!'

ব্যোমকেশের ঠোঁটে একটু হাসি খেলিয়া গেল, সে বলিল, 'আপনার সুপারিশে উড়িষ্যা সরকার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন; আপনার উদ্দেশ্য তো তাঁরা জানেন না। কিন্তু ও-কথা যাক্। সন্তোষবাবু, হেনা মল্লিককে কে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল আমি জানতে পেরেছি।'

আমি সন্তোষবাবুকে লক্ষ্য করিতেছিলাম, দেখিলাম তাঁহার মুখ পাঙাস হইয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দু'টা সর্পচক্ষুর ন্যায় হিংস্র হইয়া উঠিতেছে। তিনি

যে কিরূপ ভয়ংকর প্রকৃতির লোক, কোণঠাসা বন-বিড়ালের মত তাঁহার সম্মুখীন হওয়া যে অতিশয় বিপজ্জনক কাজ, তাহা নিমেষ মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া তিনি বলিলেন, 'কে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল?'

ব্যোমকেশ সহজ সুরে বলিল, 'আপনি।'

যেন কেহ তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে এমনি স্বরে সন্তোষবাবু বলিলেন 'প্রমাণ করতে পারেন?'

ব্যোমকেশ শান্তভাবে মাথা নাড়িল, 'না। তবে আপনার মোটিভ আছে তা প্রমাণ করা যায়।'

'তাই নাকি। আমি আপনার নামে মানহানির মোকদ্দমা করে আপনাকে জেলে পাঠাতে পারি তা জানেন?'

'আমরা নামে মোকদ্দমা করবার সাহস আপনার নেই, সন্তোষবাবু। আমার কাছে আস্ফালন করেও লাভ নেই। শুনুন, আপনি আমাকে আপনার পারিবারিক স্বার্থরক্ষার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, সে কাজ আমি করেছি। যে কারণেই হোক, পুলিস হেনার মৃত্যুর তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছে,আমার ও-বিষয়ে কোন কর্তব্য নেই। কিন্তু সত্য কথা জানবার অধিকার সকলেরই আছে। আমি সত্য কথা জানতে পেরেছি।'

সন্তোষবাবু কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখের মধ্যে কত প্রকার চিন্তা বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল তাহা নির্ণয় করা যায় না। শেষে তিনি বলিলেন, 'কি সত্য কথা জানতে পেরেছেন আপনি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি যা খুঁজেছিলেন, কিন্তু পান নি, যার জন্যে আপনি ঘরে আগুন দিয়েছিলেন, আমি তাই পেয়েছি। একখানা বই--রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, আর কয়েকটা চিঠি।'

সন্তোষবাবুর রগের শিরা ফুলিয়া উঠিল। তিনি অসহায় বিষাক্ত চোখে চাহিয়া বলিলেন, 'কি চান আপনি? টাকা?'

ব্যোমকেশ শুষ্কস্বরে বলিল, 'আমাকে ঘুষ দিতে পারেন এত টাকা আপনারও নেই, সন্তোষবাবু। আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, দেশদ্রোহিতা করেছেন, তার শাস্তি পেতে হবে।'

সন্তোষবাবু নির্বাক চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার রগের শিরা দপদপ করিতে লাগিল।

'হেনার মা মীনার সঙ্গে আপনার প্রণয় ছিল। দেশ ভাগাভাগির সময় আপনি ঢাকায় যেতেন, মীনার সঙ্গে দেখা করতেন। আপনি জানতেন মীনা বিপক্ষদলের গুপ্তচর, তা জেনেও আপনি নিজের দলের গুপ্তকথা তাকে বলতেন। শুধু মুখে বলেই নিশ্চিত হন নি, চিঠি লিখে নিজের দলের সমস্ত সলা-পরামর্শ তাকে জানাতেন। তার ফলে পদে পদে আমাদের হার হয়েছে, আমাদের প্রাপ্য ভূখণ্ড আমরা হারিয়েছি।

'আপনার চিঠিগুলো মীনা রেখে দিয়েছিল। তারপর হঠাৎ সে মরে গেল, চিঠিগুলো তার মেয়ে হেনার হাতে এল। হেনার একজন দোসর ছিল—ওমর শিরাজি। দু'জনে মিলে ষড়যন্ত্র করল, তারপর হেনা এসে আপনার বুকে চেপে বসে ব্ল্যাক্‌মেল শুরু করল।'

সন্তোষবাবুর চোখ দুটো রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি হঠাৎ হাত বাড়াইয়া

বলিয়া উঠিলেন, 'এক লাখ টাকা দেব, চিঠিগুলো আমায় ফেরৎ দিন।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষবাবুও দাঁড়াইলেন, রক্তাক্ত ভীষণ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'দেবেন না?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল, 'কাল থেকে একটি বিশিষ্ট দৈনিক সংবাদপত্রে আপনার চিঠিগুলির ফ্যাক্‌সিমিলি একে একে ছাপা হবে। প্রস্তুত থাকবেন।'

সন্তোষবাবু দুই চক্ষে অগ্নি বিকীর্ণ করিতে করিতে বসিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশ আমাকে ইশারা করিল, আমরা দ্বারের দিকে চলিলাম।

পিছন হইতে ডাক আসিল, 'ব্যোমকেশবাবু!'

আমরা ফিরিয়া গিয়া সন্তোষবাবুর সামনে দাঁড়াইলাম; তিনি টেবিলের উপর দুই কনুই রাখিয়া দু'হাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া আছেন। এক মিনিট পরে তিনি হাত নামাইলেন; দেখিলাম তাঁহার মুখ ভাবলেশহীন। তিনি বলিলেন, 'আমাকে একদিন সময় দেবেন? আজ বিকেল পাঁচটার সময় পার্ক সার্কাস মাঠে আমার বক্তৃতা আছে—'

ব্যোমকেশ তাঁহার মুখের উপর গম্ভীর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরস্বরে বলিল, 'একদিন সময় দিলাম। কাল সকালে সংবাদপত্রে আপনার চিঠি ছাপা হবে না। কিন্তু একটা কথা জানিয়ে রাখি। গুন্ডা লাগিয়ে আমাকে খুন করালেও কোনো লাভ হবে না, চিঠিগুলির নাগাল আপনি পাবেন না। যথাসময়ে সেগুলি ছাপা হবে।'

'ধন্যবাদ।'

সারাদিন ব্যোমকেশ তক্তপোশে শুইয়া কড়িকাঠ গণনা করিল, কথা বলিল না। বেলা চারটার সময় চা আসিলে উঠিয়া বসিয়া চা পান করিল, তারপর বলিল, 'চল, বেরনো যাক।'

'কোথায় যাবে?'

'সন্তোষবাবুর লেকচার শুনতে।'

সুতরাং বাহির হইলাম। মাথার উপর যাহার খাঁড়া ঝুলিতেছে, সে কিরূপ বক্তৃতা দিবে শুনিবার কৌতূহল বোধকরি স্বাভাবিক।

পার্ক সার্কাসের মাঠে মঞ্চ রচিত হইয়াছে, মঞ্চের উপর এক সারি গণ্যমান্য ব্যক্তি উপবিষ্ট, প্রধান সচিবও আছেন। সম্মুখে বৃহৎ জনতা। রাজনৈতিক কোনো একটা গুরুতর প্রসঙ্গ জনসাধারণের গোচর করার উদ্দেশ্যে এই সভা আহূত হইয়াছে। আমরা জনতার পিছনে গিয়া দাঁড়াইলাম।

প্রথমে প্রধান মন্ত্রী উঠিলেন, তিনিই সভাপতি। মাইকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিষয়বস্তুর অবতারণা করিলেন। তারপর একে একে বক্তারা উঠিলেন। সামান্য যুক্তিতর্কের ফোড়ন দিয়া প্রবল হৃদয়াবেগপূর্ণ বক্তৃতা। মুগ্ধ হইয়া বাক্যতরঙ্গে ভাসিয়া চলিলাম।

সর্বশেষে মাইকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন সন্তোষবাবু। তাঁহার মুখের দৃঢ় গাম্ভীর্য বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সূচনা করিতেছে। ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

লোকটির বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা আছে। উচ্ছ্বাস নাই, ভাবালুতা নাই, কেবল

দুর্নিবার যুক্তির দ্বারা তিনি শ্রোতার সমগ্র মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইলেন। ক্রমে তাঁহার ভাষণের ছন্দ দ্রুত হইতে লাগিল, অন্তর্গূঢ় আবেগে কণ্ঠস্বর মৃদঙ্গের ন্যায় ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তারপর তিনি যখন বক্তৃতার শেষে উদাত্ত কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ করিলেন, তখন শ্রোতাদের কণ্ঠ হইতেও স্বতরুৎসারিত জয়ধ্বনি উত্থিত হইল।

ভাষণ শেষ করিয়া সন্তোষবাবু নিজ আসনে গিয়া বসিলেন। আমার দৃষ্টি তাঁহার উপরেই নিবদ্ধ ছিল, দেখিলাম তিনি পকেট হইতে একটি কৌটা বাহির করিয়া কিছু মুখে দিলেন। ভাবিলাম, হয়তো পেনিসিলিনের বড়ি।

ইতিমধ্যে প্রধান সচিব আসিয়া সভা সংবরণের ভাষণ আরম্ভ করিয়াছেন, শ্রোতারা উঠি-উঠি করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ মঞ্চের উপর একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। মুহূর্তে আমার দৃষ্টি সেইদিকে ছুটিয়া গেল; দেখিলাম সন্তোষবাবু নিজ আসনে এলাইয়া পড়িয়াছেন, আশেপাশে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা উদ্বিগ্ন ভাবে তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া দেখিতেছেন। প্রধান মন্ত্রী ভাষণ থামাইয়া সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন। শ্রোতাদের মধ্যে একটা উত্তেজিত গুঞ্জন উঠিল।

পাঁচ মিনিট পরে প্রধান মন্ত্রী মাইকের কাছে ফিরিয়া আসিয়া আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'মর্মান্তিক দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের প্রিয় সুহৃৎ, দেশের সুসন্তান সন্তোষ সমাদ্দার ইহলোক ত্যাগ করেছেন—'

তিনি ভগ্নস্বরে বলিয়া চলিলেন। ব্যোমকেশ আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল, বলিল, 'চল। পঞ্চমাঙ্কে যবনিকা পতন হয়েছে।'

পার্কের বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, বলিল, 'চল, হাঁটা যাক।'

পথ অনেকখানি, তবু ট্রামে-বাসে চড়িবার ইচ্ছা হইল না। আমিও সিগারেট ধরাইয়া বলিলাম, 'চল।'

পাশাপাশি চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল—

'সন্তোষবাবু প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি চরিত্রবান ছিলেন না। ইংরেজিতে কথা আছে—নাবিকদের বন্দরে বন্দরে বৌ, সন্তোষবাবুরও ছিল তাই। তিনি কাজের সূত্রে মাদ্রাজ বোম্বাই দিল্লী সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন, আমার বিশ্বাস প্রত্যেক শহরেই তাঁর একটি করে প্রেয়সী ছিল। বুড়ো বয়সেও তাঁর ও রোগ সারেনি।

'কলকাতাতে যেমন তাঁর ছিল সুকুমারী, ঢাকায় তেমনি ছিল মীনা। মীনা ধর্মে মুসলমানী ছিল। সকল দেশে সকল সভ্য সমাজেই এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক থাকে যারা বাইরে বেশ সভ্য-ভব্য, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিলাসিনীর ব্যবসা চালায়। পাশ্চাত্য দেশে ওদের নাম—ডেমি মনডেন। মীনা ছিল ডেমি মনডেন। তার স্বামী ছিল কিনা জানি না, বোধহয় সাক্ষীগোপাল গোছের একজন কেউ ছিল, তার নাম কমল মল্লিক। কমল মল্লিক নামটা হিন্দু নাম, আবার কামাল মল্লিক বললে মুসলমান নাম হয়ে যায়। হেনা মল্লিক নামটাও তাই। মল্লিক পদবী হিন্দুদের মধ্যে আছে, কিন্তু আসলে ওটা মুসলমানী খেতাব।

'মীনার ছবি দেখেছ, সে ছিল অপরূপ সুন্দরী। সমাজের উঁচু মহলে তার প্রসার ছিল। সন্তোষবাবুকেও সে কুহকের নাগপাশে বেঁধে ফেলেছিল, যখনই

তিনি ঢাকায় যেতেন মীনার সঙ্গে তাঁর দেখা হত। সে বোধহয় তাঁকে গজল শোনাতো।

তারপর এল স্বাধীনতা, এল দেশ-ভাগাভাগির যুদ্ধ। সে যে কী নৃশংস যুদ্ধ তা কারুর ভোলবার কথা নয়। এই সময় সন্তোষবাবু আমাদের দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। দুই পক্ষের মধ্যে যখন দূতের প্রয়োজন হল, তখন সন্তোষবাবু আমাদের পক্ষ থেকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হলেন। তিনি বারবার কলকাতা থেকে ঢাকা যাতায়াত করতে লাগলেন। স্বভাবতই মীনার সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হতে লাগল।

সন্তোষবাবু তখন মীনার প্রেমে হাবু-ডুবু খাচ্ছেন, তিনি নিজের দলের অতিবড় গুপ্তকথাগুলিও মীনার কাছে প্রকাশ করে ফেলতে লাগলেন। মীনা রঙ্গিনী মেয়ে হলেও নিজের দলের স্বার্থচিন্তা তার মনে ছিল; সে গুপ্ত সংবাদ-গুলি যথাস্থানে পৌঁছে দিতে লাগল। অবস্থাটা ভেবে দেখ, রাজনৈতিক কূট-যুদ্ধ চলছে, ওদের গুপ্ত অভিপ্রায় আমরা কিছুই জানি না, ওরা আমাদের গুপ্ত অভিপ্রায় সমস্ত জানে। ফল অনিবার্য।

'সন্তোষবাবুর তখন এমন মোহমত্ত অবস্থা যে, তিনি মীনাকে কেবল মৌখিক গুপ্তকথা জানিয়ে নিরস্ত হননি, যখন কলকাতায় থাকতেন তখন চিঠি লিখে তাকে গুপ্ত সংবাদ জানাতেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণ কী আমি জানি না সম্ভবত অন্য কোন দেশনেতার প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষা। কিন্তু তিনি যে জেনে-শুনে মীনাকে খবর পাঠাতেন, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম বইয়ের উপহার পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছিলেন—মীনা মাতাহারি। তিনি জানতেন মীনা বিপক্ষ দলের গুপ্তচর।

'যাহোক দেশ-ভাগাভাগির লড়াই একদিন শেষ হল। তারপর কয়েক বছর কেটে গেল। মীনা সন্তোষবাবুর চিঠিগুলি যত্ন করে রেখে দিয়েছিল, নষ্ট করেনি। তার কি মতলব ছিল বলতে পারি না, হয়তো ভেবেছিল কোনদিন সন্তোষবাবু যদি বাধন ছেড়বার চেষ্টা করেন তখন চিঠিগুলো কাজে লাগবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন মীনা মারা গেল। বোধহয় অ্যাকসিডেন্টেই মারা গিয়েছিল।

'মীনার একটি মেয়ে ছিল—হেনা। মা যখন মারা গেল তখন সে সাবালিকা হয়েছে। সে মায়ের কাগজপত্রের মধ্যে সন্তোষবাবুর চিঠিগুলো খুঁজে পেল। হেনার নিশ্চয় দু-চারজন উমেদার ছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম ওমর শিরাজি। শিরাজি বিমান কোম্পানিতে কাজ করত, এরোপ্লেনের ন্যাভিগেটর। দেশে দেশে উড়ে বেড়াতো, তার প্লেনের দৌড় সিঙ্গাপুর থেকে কায়রো। দশ-বারো দিন অন্তর তার প্লেন দমদমে নামতো।

'হেনা ওমর শিরাজিকে চিঠির কথা বলল, দু'জনে পরামর্শ করল সন্তোষ-বাবুকে ব্ল্যাকমেল করবে। তারা কলকাতায় এসে সোজাসুজি তাদের মতলব সন্তোষবাবুকে জানালো। হেনা এসে তাঁর বাড়িতে জাঁকিয়ে বসল। ওরা ভেবে দেখেছিল সন্তোষবাবুর বাড়িই হেনার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। সন্তোষবাবু জাঁতিকলে পড়ে গেলেন। ইচ্ছে থাকলেও হেনাকে খুন করেত পারেন না, তাহলেই ওমর শিরাজি তাঁর গুপ্তকথা ফাঁস করে দেবে। তিনি ব্ল্যাকমেলের টাকা গুণতে লাগলেন।

'মারাত্মক চিঠিগুলো হেনা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সন্তোষবাবু আবিষ্কার

করতে পারেননি, তবে সন্দেহ করেছিলেন যে হেনা তাঁর বাড়িতে নিজের ঘরে চিঠিগুলো লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু নিজের বাড়ি বলেই সেখানে তল্লাশ করবার সুবিধা নেই। হেনা সর্বদা নিজের ঘরে থাকে, কেবল সন্ধ্যেবেলা নমাজ পড়বার জন্যে একবাব ছাদে যায়। তাও দোরে তালা লাগিয়ে।

'ওমর শিরাজি ইন্দো-পাক হোটেলে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিল। সেই ঘরে ওদের সাক্ষি প্রমাণ যাবতীয় চিঠিপত্র ওরা লুকিয়ে রেখেছিল। বোধহয় ব্যবস্থা ছিল, সন্তোষবাবু হেনাকে হপ্তায় হপ্তায় টাকা দেবেন। কত টাকা দিতেন জানি না, সন্তোষবাবুর ব্যাঙ্কের হিসেব পরীক্ষা করলে জানা যাবে। যা হোক, টাকা নিয়ে হেনা ওমর শিরাজির অপেক্ষা করত। যথাসময় শিরাজি এসে মাউথ-অর্গান বাজিয়ে তাকে সংকেত জানাতো, তারপর দু'জনে ইন্দো-পাক হোটেলে যেত। সেখানে হেনা শিরাজিকে টাকা দিত, শিরাজি টাকা নিয়ে পাকিস্তানে চলে যেত। এই ছিল তাদের মোটামুটি কর্মপদ্ধতি।'

বলিলাম, 'ভারতীয় টাকা নিয়ে যেত?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'টাকা নিয়ে যেত, কিংবা সোনা কিনে নিয়ে যেত, কিংবা কলকাতার কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা রেখে যেত। আমার বিশ্বাস টাকা নিয়ে যেত।'

'তারপর বলো।'

'হেনা যে সন্তোষবাবুর অনাথা বন্ধু-কন্যা নয়, সে তাঁর রক্ত-শোষণ করছে, একথা কেবল একজনই সন্দেহ করেছিল। রবিবর্মা। সে সন্তোষবাবুর সেক্রেটারী, তার ওপর ভীষণ ধূর্ত ধড়িবাজ লোক। হেনাকে সে আগে থাকতে চিনত কিনা বলা যায় না, কিন্তু কোন সময় সে হেনার পিছু নিয়ে ইন্দো-পাক হোটেলের সন্ধান পেয়েছিল, বুঝেছিল যে ৭ নম্বর ঘরে মারাত্মক দলিল আছে। সে এক গোছা চাবি যোগাড় করে তাক বুঝে ৭ নম্বর ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু দরজা খুলতে পারেনি। তার বোধহয় মতলব ছিল দলিলগুলো হস্তগত করতে পারলে সে-ই সন্তোষবাবুকে ব্ল্যাকমেল করবে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। হেনার মৃত্যুর পর সে একবার চেষ্টা করেছিল। বিকাশ তার পিছনে লেগেছিল, সে দেখে ফেলল। বিকাশ যদি তাকে ইন্দো-পাক হোটেলের ৭ নম্বর ঘরের সামনে দেখতে না পেত, তাহলে সন্তোষবাবুকে ধরা যেত না।'

আমি বলিলাম, 'একটা কথা। এমন কি হতে পারে না যে, সন্তোষবাবুই রবিবর্মাকে নিযুক্ত করেছিলেন দলিলগুলো উদ্ধার করার জন্যে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। সন্তোষবাবু এর মধ্যে থাকলে ছিঁচকে চোরের মত কাজ করতেন না। ম্যানেজারকে মোটা ঘুষ দিয়ে কার্যসিদ্ধি করতেন। যাহোক, পরের কথা আগে বলব না। সন্তোষবাবু জাঁতিকলে পড়ে যন্ত্রণা ভোগ করছেন, ছ-মাস কেটে গেছে আরো কতদিন চলবে ঠিক নেই, এমন সময় এক ব্যাপার ঘটল। একদিন সকালবেলা খবরের কাগজ খুলে সন্তোষবাবু দেখলেন একটি পাকিস্তানী বিমান সমুদ্রে ডুবেছে, মৃতদের মধ্যে নাম পেলেন—ওমর শিরাজি।

'ব্যাস্, সন্তোষবাবু উদ্ধারের পথ দেখতে পেলেন। হেনা খবরের কাগজ পড়ে না, সে এখনো জানতে পারেনি; সে খবর পাবার আগেই তাকে শেষ করতে হবে। তিনি জানতেন, হেনা রোজ সন্ধ্যেবেলা নমাজ পড়তে ছাদে যায়। বর্তমানে বাড়ি মেরামত হচ্ছে, ভারা বেয়ে বাইরে থেকে ছাদে ওঠা সহজ। তিনি ঠিক করে ফেললেন কী করে হেনাকে মারবেন। এমন ভাবে মারবেন যাতে অপঘাত মৃত্যু

বলে মনে হয়।

'দিনটা ছিল শনিবার। বিকেলবেলা তিনি সুকুমারীর কাছে গেলেন, সুকুমারীর সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের অ্যালিবাই তৈরি কবলেন। আট-ঘাট বেঁধে কাজ করতে হবে।'

আমি বলিলাম, 'সুকুমারী যে আমাদের কাছে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছিল তা বুঝতে পারিনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। সন্তোষবাবুর প্রতি সুকুমারীর প্রাণের টান ছিল, নইলে সে তাঁর জন্যে নিজেকে খুনের মামলায় জড়িয়ে ফেলত না। সন্তোষবাবুর মৃত্যুতে যদি কেউ দুঃখ পায় তো সে সুকুমারী।

'খিড়কির ফটক দিয়ে সন্তোষবাবু নিজের বাড়িতে প্রবেশ করলেন, ভারা বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। হেনা বোধ হয় তখন মাদুর পেতে পশ্চিম দিকে মুখ করে, নমাজ পড়বার উপক্রম করছিল, দেখল সন্তোষবাবু উঠে আসছেন। তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে হেনার দেরি হল না, সে ভয় পেয়ে ছাদের পূব দিকে পালাতে লাগল। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? আলসের কাছে আসতেই সন্তোষবাবু পিছন থেকে ছুটে এসে তাকে ধাক্কা দিলেন, সে ছাদ থেকে নীচে পড়ে গেল।

সন্তোষবাবু ছাদের দবজাব শিকল খুলে দিযে, যেমন এসেছিলেন তেমনি ভাবা বেয়ে নেমে গেলেন। শিকল খুলে দেবার কারণ—যদিই কেউ হেনার মৃত্যুকে খুন বলে সন্দেহ কবে, তাহলেও আততায়ী কোন্ দিক থেকে ছাদে উঠেছে তা অনিশ্চিত থেকে যাবে।

'সন্তোষবাবু বাড়িতে এসেছিলেন তা কেউ জানল না, তিনি কর্তব্যকর্ম সুসম্পন্ন করে সুকুমাবীর কাছে ফিবে গেলেন। কিন্তু একটা কাজ বাকি ছিল।

'চিঠিগুলো নিশ্চয় হেনার ঘবে আছে। পুলিস খুঁজে পায়নি বটে, কিন্তু পরে পেতে পারে। গভীর রাত্রে যখন সবাই ঘুমিযে পড়েছে, তখন তিনি চুপি চুপি নেমে এসে হেনার ঘর তল্লাশ করলেন। কিন্তু চিঠি খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি পেট্রোল ঢেলে হেনার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলেন। ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। কিছুক্ষণ নীরবে চলিবাব পর জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সন্তোষবাবুকে টেলিফোন করেছিল কে?'

সে বলিল—'কেউ না। ওটা কপোলকল্পিত। নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে ফিরে গিয়ে সন্তোষবাবু নিশ্চিন্ত হতে পাবেননি, হেনা যদি দৈবাৎ না মরে থাকে! তাছাড়া চিঠিগুলো হেনার ঘর থেকে সরাতে হবে। তাই তিনি একটি অজ্ঞাত সংবাদদাতা সৃষ্টি করলেন; সুকুমারীকে টেলিফোন সম্বন্ধে তালিম দিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন।'

'অদ্ভুত অভিনেতা কিন্তু সন্তোষবাবু।'

হ্যাঁ। অদ্ভুত বক্তা, অদ্ভুত অভিনেতা—এরা সব এক জাতের।'

'আচ্ছা ব্যোমকেশ, সন্তোষবাবু তোমাকে পারিবারিক স্বার্থরক্ষাব জন্যে নিযুক্ত করলেন কেন? গোড়াতেই তোমাকে বিদেয় করলেন না কেন?'

'নেংটি একটা দুষ্কার্য করে ফেলেছিল, আমাকে ডেকেছিল। আমাকে বিদেয় করে দিলে তাঁর ওপর সকলের সন্দেহ হত, তাই তিনি সাধু সেজে আমাকে তাঁর পারিবারিক স্বার্থরক্ষার জন্যে নিযুক্ত করলেন। পরে অবশ্য ছাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখন কম্‌লি নেহি ছোড়্‌তি।'

তুমি কখন ওঁকে সন্দেহ করলে?'

'ঘরে আগুন লাগার খবর পেয়ে বুঝলাম কোনো দাহ্য পদার্থ পুড়িয়ে দেবার জন্যেই ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে। কি রকম দাহ্য পদার্থ? নিশ্চয় এমন কোনো দাহ্য পদার্থ, যা সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বভাবতই দলিলের কথা মনে আসে। কি রকম দলিল? যার সাহায্যে ব্ল্যাকমেল করা যায়। তাহলে হেনা কাউকে ব্ল্যাকমেল করছিল? কাকে ব্ল্যাকমেল করছিল? যুগল আর উদয়কে বাদ দেওয়া যায়; বাকি রইল রবিবর্মা এবং সন্তোষবাবু। কিন্তু রবিবর্মা সামান্য লোক, তাকে ব্ল্যাকমেল করে বেশি টাকা আদায় করা যায় না। অপর পক্ষে সন্তোষবাবু বড়লোক, তাঁর পূর্ববঙ্গে নিত্য যাতায়াত, হেনাকে তিনি নিজের বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন। পুলিসের শৈথিল্যের পিছনেও হয়তো তাঁর প্রভাব কাজ করছে। আমাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে কটকে পাঠানোর চেষ্টার পিছনেও তিনি আছেন। সুতরাং তিনিই সব দিক দিয়ে যোগ্য পাত্র।—ভাল কথা, কাল সকালে কটকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে, জানা দরকার তারা এখনো আমাকে চায় কিনা।'

'বেশ। সন্তোষবাবুর চিঠিগুলো কি করবে?'

'পুড়িয়ে ফেলব। ও চিঠির কাজ শেষ হয়েছে। সন্তোষবাবু প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, তাঁর সুনাম নষ্ট করে কারুর লাভ নেই। মগ্ন মৈনাক মগ্নই থাক।'

বাসায় ফিরিয়া দেখি নেংটি বসিয়া আছে। সত্যবতীর নিকট হইতে চা ও সিগারেট সংগ্রহ করিয়া পরম আরামে সেবন করিতেছে। সে সন্তোষবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পায় নাই। ব্যোমকেশকে দেখিয়া ভ্রূ তুলিয়া ব্যঙ্গভরে বলিল, 'কী, এখনো হেনার খুনীকে ধরতে পারলেন না!'

ব্যোমকেশ বিরক্ত স্বরে বলিল, 'পেরেছি। তুমি এখানে কি করছ?'

নেংটি সচকিত অবিশ্বাসের স্বরে বলিয়া উঠিল, 'পেরেছেন!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। তুমি পেরেছ নাকি!'

নেংটি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, 'আমি—আমি তো গোড়া থেকেই জানি।'

'গোড়া থেকেই জানো! কি করে জানলে? বুদ্ধি খাটিয়ে বের করেছ? আততায়ীর নাম বল তো শুনি?'

নেংটি স্খলিত স্বরে বলিল, 'মেসোমশাই।'

ব্যোমকেশ ক্ষণকাল অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'তুমি জানো! কি করে জানলে?'

নেংটি দ্রুত বিহ্বল কণ্ঠে বলিল, আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি, ব্যোমকেশদা। আমি বাড়ির পিছন দিকের পাইনগাছে উঠে সিগারেট খাচ্ছিলাম। এমন সময় হেনা ছাদে এল, মাদুরটা পেতে বসতে যাবে, হঠাৎ মেসোমশাই পশ্চিমদিকের ভারা বেয়ে উঠে এলেন। তাঁকে দেখেই হেনা দৌড়ে পূর্বদিকে গেল, তিনিও তার পিছনে ছুটলেন, তাকে ঠেলা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দিলেন।'

ব্যোমকেশ কঠোর চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'তুমি এতদিন একথা বলনি কেন?'

নেংটি কাতরস্বরে বলিল, 'কি করে বলি, ব্যোমকেশদা। উনি আমাদের অন্নদাতা, ওঁকে পুলিসে ধরিয়ে দেব কি বলে? তবু আপনাকে খবর দিয়েছিলাম, জানতাম, কেউ যদি অপরাধীকে ধরতে পারে তো সে আপনি।'

ব্যোমকেশের মুখ নরম হইল, সে নেংটির কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, 'নেংটি, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও। সন্তোষবাবু মারা গেছেন।'

দুষ্টচক্র

ডাক্তার সুরেশ রক্ষিত বলিলেন, 'আপনাকে একবার যেতেই হবে, ব্যোমকেশবাবু। রোগীর যেরকম অবস্থা, আপনি গিয়ে আশ্বাস না দিলে বাঁচানো শক্ত হবে।'

ডাক্তার সুরেশ রক্ষিতের বয়স চল্লিশের আশেপাশে, একটু রোগা শুষ্ক গোছের চেহারা, দামী এবং নূতন বিলাতি পোশাক তাঁহার গায়ে যেন মানায় নাই। কিন্তু ভাবভঙ্গি বেশ চটপটে এবং বুদ্ধিমানের মত। আজ সকালে তিনি ব্যোমকেশের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন এবং এক বিচিত্র প্রস্তাব করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ব্যোমকেশের রোগী দেখিতে যাইবার ইচ্ছা নাই। সে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে ডাক্তার রক্ষিতের দিকে চাহিয়া বলিল, 'রোগটা কী?'

ডাক্তার বলিলেন, 'প্যারালিসিস—মানে পক্ষাঘাত। প্রায় তিন মাস আগে অ্যাটাক হয়েছিল। প্রথম ধাক্কাটা সামলে গেছেন, কিন্তু রক্তচাপ খুব বেশি। মাথাটা অবশ্য পরিষ্কার আছে। আমাকে পাঠালেন, আপনি যদি দয়া করে একবার আসেন। মনে ভরসা পেলে হয়তো বেঁচে যেতে পারেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি চিকিৎসা করছেন?'

ডাক্তার বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাঁর বাড়ির একতলার ভাড়াটে। এবং গৃহ চিকিৎসকও। লোকটি মহা ধনী, সুদের কারবার করেন। বিশু পালের নাম হয়তো আপনারা শুনে থাকবেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি নাম বললেন—শিশুপাল?'

ডাক্তার হাসিলেন, 'বিশু পাল। তবে কেউ কেউ শিশুপালও বলে। কেন বলে জানি না, লোকটি সুদখোর মহাজন বটে কিন্তু অর্থ-পিশাচ নয়। বিশেষত গত তিন মাস শয্যাশায়ী থেকে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আমি কি করতে পারি? আমি তো আর ডাক্তার নই।'

ডাক্তার কহিলেন, 'তবে আসল কথা বলি। বিশু পালের এক খাতক আছে, নাম অভয় ঘোষাল। লোকটা ভয়ংকর পাজী। বিপদে পড়ে বিশু পালের কাছ থেকে অনেক টাকা ধার নিয়েছিল, এখন আর শোধ দিচ্ছে না। বিশু পাল জোর তাগাদা লাগিয়েছিলেন, তাইতে অভয় ঘোষাল নাকি ভয় দেখিয়েছে, টাকা চাইলে তাঁকে খুন করবে। তার পরই বিশু পালের স্ট্রোক হয়, সেই থেকে তিন মাস বিছানায় পড়ে আছেন। অবশ্য প্রাণের আশংকা নেই, সাবধানে চিকিৎসা করলে হয়তো আবার চলে ফিরে বেড়াতে পারবেন। কিন্তু আসল কথা তা নয়, ওঁর প্রাণে ভয় ঢুকেছে অভয় ঘোষাল ওঁকে খুন করবেই, তিনি যদি টাকা ছেড়েও দেন তবু খুন করবে।—আপনাকে চিকিৎসা করতে হবে না, বিশু পালের ইচ্ছে আপনার কাছে তাঁর হৃদয়-ভার লাঘব করেন; আপনি যদি কিছু উপদেশ দেন তাও ওঁর কাজে লাগতে পারে।'

ব্যোমকেশ একটু বিমনা থাকিয়া বলিল, 'কেউ যদি শিশুপাল বধের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে তাকে ঠেকিয়ে রাখা শিবের অসাধ্য। যাহোক, ভদ্রলোক যখন আমার সঙ্গলাভের জন্যে এত ব্যাকুল হয়েছেন তখন আমি যাব। ইহলোকেই

হোক আর পরলোকেই হোক, মহাজনদের হাতে রাখা ভালো। কি বল, অজিত?'

আমি বলিলাম, 'তা তো বটেই।'

ডাক্তার রক্ষিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাসিমুখে বলিলেন, 'ধন্যবাদ। এই নিন আমাদের ঠিকানা। কখন আসবেন?' তিনি একটি কার্ড বাহির করিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিলেন।

ব্যোমকেশ কার্ডটি দেখিয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। দেখিলাম বিশু পালের বাসস্থান বেশি দূর নয়, আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা গলির মধ্যে। ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ বিকেলবেলা পাঁচটা নাগাদ যাব।--আচ্ছা, আসুন।'

ডাক্তার প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীকে সান্ত্বনা দেবার কাজ আমার এই প্রথম।'

গলিটি বিসর্পিল; নানা ভঙ্গিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া পার্বত্য নদীর মত চলিয়াছে। দুই পাশে তিনতলা চারতলা বাড়ি। গলি যতই সরু হোক, দেখিয়াছি বাড়ি কখনও ছোট হয় না, আড়ে বাড়িবার জায়গা না পাইয়া দীর্ঘে বাড়ে।

একটি তেতলা বাড়ির দ্বারপার্শ্বে ডাক্তার সুরেশ রক্ষিতের শিলালিপি দেখিয়া বুঝিলাম এই বিশু পালের বাড়ি। ডাক্তার রক্ষিত জানালা দিয়া আমাদের দেখিতে পাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন, বলিলেন, 'আসুন।'

বাড়িটি পুরানো ধরনের; এক পাশে সুড়ঙ্গের মত সংকীর্ণ বারান্দা ভিতর দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহার এক পাশে দ্বার, অন্য পাশে দুটি জানালা। দ্বার দিয়া ডাক্তারখানা দেখা যাইতেছে; তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে একটি ঘর। কিন্তু রোগীর ভিড় নাই। একজন মধ্যবয়স্ক কম্পাউন্ডার দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার রক্ষিত আমাদের ডাক্তারখানায় লইয়া গেলেন না, বলিলেন, 'সিঁড়ি ভাঙতে হবে। বিশুবাবু তিনতলায় থাকেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ তো। আপনি কি এই বাড়িতেই থাকেন? না কেবলই ডাক্তারখানা?'

ডাক্তার বলিলেন, 'তিনটে ঘর আছে। দুটোতে ডাক্তারখানা করেছি, একটাতে থাকি। একলা মানুষ, অসুবিধা হয় না।'

দোতলাতেও তিনটি ঘর। ঘর তিনটিতে অফিস বসিয়াছে। টেবিল চেয়ারের অফিস নয়, মাড়োয়ারীদের মত গদি পাতিয়া অফিস। অনেকগুলি কেরানী বসিয়া কলম পিষিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা কি?'

ডাক্তার বলিলেন, 'বিশুবাবুর গদি। মস্ত কারবার, অনেক রাজা-রাজড়ার টিকি বাঁধা আছে ওঁর কাছে।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না। আমি মনে মনে ভাবিলাম, বিশু পাল শুধু শিশুপালই নয়, জরাসন্ধও বটে।

তেতলার সিঁড়ির মাথায় একটি গুর্খা রণসাজে সজ্জিত হইয়া গাদা-বন্দুক হস্তে টুলের উপর বসিয়া আছে; পদশব্দ শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমাদের পানে তির্যক নেত্রপাত করিল। ডাক্তার বলিলেন, 'ঠিক হ্যায়।' তখন গুর্খা স্যালুট করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

বারান্দা দিয়া কয়েক পা যাইবার পর একটি বন্ধ দ্বার। ডাক্তার দ্বারে টোকা দিলেন। ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন আসিল, 'কে?'

ডাক্তার বলিলেন, 'আমি ডাক্তার রক্ষিত। দোর খুলুন।'

দরজা একটু ফাঁক হইল। একটি প্রৌঢ়া সধবা মহিলার শীর্ণ মুখ ও আতঙ্ক-ভরা চক্ষু দেখিতে পাইলাম। তিনি একে একে আমাদের তিনজনের মুখ দেখিয়া বোধহয় আশ্বস্ত হইলেন, দ্বার পুরাপুরি খুলিয়া গেল। আমরা একটি ছায়াচ্ছন্ন ঘরে প্রবেশ করিলাম।

পুরুষ কণ্ঠে শব্দ হইল, 'আলোটা জ্বেলে দাও গিন্নি।'

মহিলাটি সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিলেন, তারপর মাথায় আঁচল টানিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

এইবার ঘরটি স্পষ্টভাবে দেখিলাম। মধ্যমাকৃতি ঘর, মাঝখানে একটি খাট। খাটের উপর প্রেতাকৃতি একটি মানুষ গায়ে বালাপোশ জড়াইয়া শুইয়া আছে। খাটের পাশে একটি ছোট টেবিলের উপর ওষুধের শিশি জলের গেলাস প্রভৃতি রাখা আছে। ঘরে অন্যান্য আসবাব যাহা আছে তাহা দেখিয়া নার্সিং হোমে রোগীর কক্ষ স্মরণ হইয়া যায়।

প্রেতাকৃতি লোকটি অবশ্য বিশু পাল। জীর্ণগলিত মুখে নিষ্প্রভ দু'টি চক্ষু মেলিয়া তিনি আমাদের পানে চাহিয়া আছেন। মাথার চুল পাঁশুটে সাদা, সম্মুখের দাঁতের অভাবে অধরোষ্ঠ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছে। বয়স পঞ্চাশ কিম্বা ষাট কিম্বা সত্তর পর্যন্ত হইতে পারে। তিনি স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'ব্যোমকেশ-বাবু এসেছেন? আমার কী সৌভাগ্য। আসতে আজ্ঞা হোক।'

আমরা খাটের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। বিশু পাল কম্পিত হস্ত জোড় করিয়া বলিলেন, 'আপনাদের বড় কষ্ট দিয়েছি। আমারই যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দেখছেন তো আমার অবস্থা—'

ডাক্তার বলিলেন, 'আপনি বেশি কথা বলবেন না।'

বিশু পাল কাতর কণ্ঠে বলিলেন, বেশি কথা না বললে চলবে কি করে ডাক্তার? ব্যোমকেশবাবুকে সব কথা বলতে হবে না?'

'তবে যা বলবেন চটপট বলে নিন।' ডাক্তার টেবিল হইতে একটা শিশি লইয়া খানিকটা তরল ঔষধ গেলাসে ঢালিলেন, তাহাতে একটু জল মিশাইয়া বিশু পালের দিকে বাড়াইয়া দিলেন, বলিলেন 'এই নিন, এটা আগে খেয়ে ফেলুন।'

বিশু পাল রুগ্ন বিরক্তিভরা মুখে ঔষধ গলাধঃকরণ করিলেন।

অতঃপর অপেক্ষাকৃত সহজ স্বরে তিনি বলিলেন, 'ডাক্তার, এঁদের বসবার চেয়ার দাও।'

ডাক্তার দু'টি চেয়ার খাটের পাশে টানিয়া আনিলেন, আমরা বসিলাম। বিশু পাল ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'বেশি কথা বলব না, ডাক্তার রাগ করবে। সাঁটে বলছি। আমার তেজারতি কারবার আছে, নিশ্চয় শুনেছেন। প্রায় পঁচিশ বছরের কারবার, বিশ লক্ষ টাকা খাটছে। অনেক বড় বড় খাতক আছে।

'আমি কখনো জামিন জমানত না রেখে টাকা ধার দিই না। কিন্তু বছর দুই আগে আমার দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, তার ফল এখন ভুগছি। বিনা জামিনে ত্রিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলাম।

'অভয় ঘোষালকে আপনি চেনেন না। আমি তার বাপকে চিনতাম, মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন অধর ঘোষাল। অনেক বিষয়সম্পত্তি করেছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর কিছু কাজ-কারবারও হয়েছিল। তাই তাঁকে চিনতাম; সত্যিকার সজ্জন।

'বছর দশেক আগে অধর ঘোষাল মারা গেলেন; তাঁর একমাত্র ছেলে অভয় ঘোষাল সম্পত্তির মালিক হয়ে বসল।

'অভয়কে আমি তখনো দেখিনি। বাপ মারা যাবার পর তার সম্বন্ধে দু-একটা গল্পগুজব কানে আসত। ভাবতাম পৈতৃক সম্পত্তি হাতে পেলে সব ছেলেই গোড়ায় একটু উচ্ছৃঙ্খলতা করে, কালে শুধরে যাবে। এমন তো কতই দেখা যায়।

'আজ থেকে বছর দুই আগের ব্যাপার। অভয় ঘোষালের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছি, হঠাৎ একদিন সে এসে উপস্থিত। তাকে দেখে, তার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কার্তিকের মত চেহারা, মুখে মধু ঝরে পড়ছে। নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, তার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন, তাই সে বিপদে পড়ে আগে আমার কাছেই এসেছে। বড় বিপদ তার, শত্রুরা তাকে মিথ্যে খুনের মামলায় ফাঁসিয়েছে। কোনো মতে জামিন পেয়ে সে আমার কাছে ছুটে এসেছে; মামলা চালাবার জন্যে তার ত্রিশ হাজার টাকা চাই!

'বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি বিশু পাল বিনা জমানতে শুধু হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিয়ে তাকে ত্রিশ হাজার টাকা দিলাম। ছোঁড়া আমাকে গুণ করেছিল, মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল।

'যথাসময় আদালতে খুনের মামলা আরম্ভ হল। খবরের কাগজে বয়ান বেরুতে লাগল; সে এক মহাভারত। এমন দুষ্কার্য নেই যা অভয় ঘোষাল করেনি, পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি প্রায় সবই উড়িয়ে দিয়েছে। কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে তার হিসেব নেই। একটি বিবাহিত যুবতীকে ফুসলে নিয়ে এসেছিল, তারপর বছর খানেক পরে তাকে বিষ খাইয়ে খুন করেছে। তাইতে মোকদ্দমা। আমি একদিন এজলাসে দেখতে গিয়েছিলাম; কাঠগড়ায় অভয় ঘোষাল বসে আছে, যেন কোণ-ঠাসা বন-বেরাল! দেখলেই ভয় করে। ও বাবা, এ কাকে টাকা ধার দিয়েছি!

'কিন্তু মোকদ্দমা টিকলো না, আইনের ফাঁকিতে অভয় ঘোষাল রেহাই পেয়ে গেল। একেবারে বেকসুর খালাস। তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ প্রমাণ হল না।

তারপর আরো বছর খানেক কেটে গেল। আমি অভয় ঘোষালের ওপর নজর রেখেছিলাম, খবর পেলাম সে তার বসত-বাড়ি বিক্রি করবার চেষ্টা করছে। এইটে তার শেষ স্থাবর সম্পত্তি, এটা যদি সে বিক্রি করে দেয়, তাহলে তাকে ধরবার আর কিছু থাকবে না, আমার টাকা মারা যাবে।

টাকার তাগাদা আরম্ভ করলাম। প্রথমে অফিস থেকে চিঠি দিলাম, কোন জবাব নেই। বার তিনেক চিঠি দিয়েও যখন সাড়া পেলাম না, তখন আমি নিজেই একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমরা মহাজনেরা দরকার হলে বেশ আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলতে পারি, ভাবলাম মামলা রুজু করবার আগে তাকে কথা শুনিয়ে আসি, তাতে যদি কাজ হয়। সে আজ তিন মাস আগেকার কথা।

'একটা গুর্খাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম তার বাড়িতে। সামনের ঘরে একটা চেয়ারে অভয় ঘোষাল একলা বসে ছিল। আমাকে দেখে সে চেয়ার থেকে উঠল না, কথা কইল না, কেবল আমার মুখের পানে চেয়ে রইল।

'কাজের সময় কাজী কাজ ফুরোলে পাজী। গালাগালি দিতে এসেছিলাম,

তার ওপর রাগ হয়ে গেল। আমি প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তার চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করলাম। তারপর হঠাৎ নজর পড়ল তার চোখের ওপর। ওরে বাবা, সে কী ভয়ঙ্কর চোখ। লোকটা কথা কইছে না, কিন্তু তার চোখ দেখে বোঝা যায় যে সে আমাকে খুন করবে। যে-লোক একবার খুন করে বেঁচে গেছে, তার তো আশকারা বেড়ে গেছে। ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল।

'আর সেখানে দাঁড়ালাম না, ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরল, কিছুতেই কাঁপুনি থামে না। তখন ডাক্তারকে ডেকে পাঠালাম। ডাক্তার এসে কোনো মতে ওষুধ দিয়ে কাঁপুনি থামালো। তখনকার মতন সামলে গেলাম বটে, কিন্তু শেষ রাত্রির দিকে আবার কাঁপুনি শুরু হল। তখন বড় ডাক্তার ডাকানো হল; তিনি এসে দেখলেন স্ট্রোক হয়েছে, দুটো পা অসাড় হয়ে গেছে।

'তার পর থেকে বিছানায় পড়ে আছি। কিন্তু প্রাণে শান্তি নেই। ডাক্তারেরা ভরসা দিয়েছেন রোগে মরব না, তবু মৃত্যুভয় যাচ্ছে না। অভয় ঘোষাল আমাকে ছাড়বে না। আমি বাড়ি থেকে বেরুই না, দোরের সামনে গুর্খা বসিয়েছি তবু ভরসা পাচ্ছি না।—এখন বলুন ব্যোমকেশবাবু, আমার কি উপায় হবে।'

বিবরণ শেষ করিয়া বিশু পাল অর্ধমৃত অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। ডাক্তার একবার তাঁহার কব্জি টিপিয়া নাড়ী দেখিলেন, কিন্তু ঔষধ দিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ব্যোমকেশ গভীর ভ্রূকুটি করিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল।

এই সময় বিশু পালের স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করিলেন। মাথায় আধ-ঘোমটা, দুই হাতে দু-পেয়ালা চা। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তিনি আমাদের হাতে চায়ের পেয়ালা দিয়া স্বামীর প্রতি ব্যগ্র উৎকণ্ঠার দৃষ্টি হানিয়া প্রস্থান করিলেন। নীরব প্রকৃতির মহিলা, কথাবার্তা বলেন না।

আমরা আবার বসিলাম। দেখিলাম বিশু পাল সপ্রশ্ন নেত্রে ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া আছেন।

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় ক্ষুদ্র একটি চুমুক দিয়া বলিল, 'আপনি যথাসাধ্য সাবধান হয়েছেন, আর কি করবার আছে। খাবারের ব্যবস্থা কি রকম?'

বিশু পাল বলিলেন, 'একটা বামুন ছিল তাকে বিদেয় করে দিয়েছি। গিন্নি রাঁধেন। বাজার থেকে কোনো খাবার আসে না।'

'চাকর বাকর?'

'একটা ঝি আর একটা চাকর ছিল, তাদের তাড়িয়েছি। সিঁড়ির মুখে গুর্খা বসিয়েছি। আর কি করব বলুন।'

'ব্যবসার কাজকর্ম চলছে কি করে?'

'সেরেস্তাদার কাজ চালায়। নেহাৎ দরকার হলে ওপরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে যায়। কিন্তু তাকেও ঘরে ঢুকতে দিই না, দোরের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায়। বাইরের লোক ঘরে আসে কেবল ডাক্তার।'

চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল, 'যা-যা করা দরকার সবই আপনি করেছেন, আর কী করা যেতে পারে ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু সত্যিই কি অভয় ঘোষাল আপনাকে খুন করতে চায়?'

বিশু পাল উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন, ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, 'হ্যাঁ ব্যোমকেশবাবু, আমার অন্তরাত্মা বুঝেছে

ও আমাকে খুন করতে চায়। নৈলে এত ভয় পাব কেন বলুন! কলকাতা শহর তো মগের মুল্লুক নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা বটে। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে?'

বিশু পাল বলিলেন, 'সেই তো ভাবনা, এভাবে কতদিন চলবে। তাই তো আপনার শরণ নিয়েছি, ব্যোমকেশবাবু। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভেবে দেখব। যদি কিছু মনে আসে, আপনাকে জানাব। —আচ্ছা চলি।'

বিশু পাল বলিলেন, 'ডাক্তার!'

ডাক্তার রক্ষিত অমনি পকেট হইতে একটি একশো টাকার নোট বাহির করিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে ধরিলেন। ব্যোমকেশ সবিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'এটা কি?'

বিশু পাল বিছানা হইতে বলিলেন, 'আপনার মর্যাদা। আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, অনেক সময় নষ্ট করেছি।'

'কিন্তু এ রকম তো কোনো কথা ছিল না।'

'তা হোক। আপনাকে নিতে হবে।'

অনিচ্ছা ভরে ব্যোমকেশ টাকা লইল। তারপর ডাক্তার আমাদের নিচে লইয়া চলিলেন।

সিঁড়ির মুখে গুর্খা স্যালুট করিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'এই লোকটা সারাক্ষণ পাহারা দেয়?'

ডাক্তার বলিলেন, 'না, ওরা দু'জন আছে। পুরোনো লোক, আগে দোতলায় পাহারা দিত। একজন বেলা দশটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত থাকে, দ্বিতীয় ব্যক্তি রাত্রি দশটা থেকে বেলা আটটা পর্যন্ত পাহারা দেয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সকালে দু-ঘণ্টা এবং রাত্রে দু-ঘণ্টা পাহারা থাকে না?'

ডাক্তার বলিলেন, 'না, সে-সময় আমি থাকি।'

দ্বিতলে নামিয়া দেখিলাম দপ্তর বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কেরানীরা দ্বারে তালা লাগাইয়া বাড়ি গিয়াছে।

নিচের তলায় নামিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন করতে চাই, ডাক্তারবাবু।'

'বেশ তো, আসুন ডিসপেন্সারিতে।'

আমরা সামনের ঘরে প্রবেশ করিলাম। এটি রোগিদের ওয়েটিং রুম, নূতন টেবিল চেয়ার বেঞ্চি ইত্যাদিতে সাজানো গোছানো। কম্পাউন্ডার পাশের দিকে একটি বেঞ্চিতে এক হাঁটু তুলিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিল, আমাদের দেখিয়া পাশের ঘরে উঠিয়া গেল। ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, 'খাসা ডাক্তারখানা সাজিয়েছেন।'

ডাক্তার শুষ্ক স্বরে বলিলেন, 'সাজিয়ে রাখতে হয়। জানেন তো ভেক না হলে ভিখ্ মেলে না।'

'কতদিনের প্র্যাক্টিস আপনার?'

'এখানে বছর তিনেক আছি, তার আগে মফঃস্বলে ছিলাম।'

'ভালই চলছে মনে হয়—কেমন?'

'মন্দ নয়—চলছে টুক্‌টাক করে। দু-চারটে বাঁধা ঘর আছে। সম্প্রতি পসার কিছু বেড়েছে। বিশুবাবুকে যদি সারিয়ে তুলতে পারি—'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল, 'হ্যাঁ।- আচ্ছা ডাক্তারবাবু, বিশু পালের এই যে মৃত্যুভয়, এটা কি ওঁর মনের রোগ? না সত্যিই ভয়ের কারণ আছে?'

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ভয়ের কারণ আছে। অবশ্য যাদের অনেক টাকা তাদের মৃত্যুভয় বেশি হয়। কিন্তু বিশু পালের ভয় অমূলক নয়। অভয় ঘোষাল লোকটা সত্যিকার খুনী। আমি শুনেছি ও গোটা তিনেক খুন করেছে। এমন কি ও নিজের বাপকে বিষ খাইয়েছিল কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই নাকি! ভারী গুণধর ছেলে তো। এখন মনে পড়ছে বছর দুই আগে ওর মামলার বয়ান খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। ওর ঠিকানা আপনি জানেন নাকি?'

ডাক্তার বলিলেন, 'জানি। এই তো কাছেই বড়জোর মাইল খানেক। যদি দেখা করতে চান ঠিকানা দিচ্ছি।'

এক টুকরা কাগজে ঠিকানা লিখিয়া ডাক্তার ব্যোমকেশকে দিলেন, সে সেটি মুড়িয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিল, 'আর একটা কথা। বিশুবাবুর স্ত্রীর কি কোনো রোগ আছে?'

ডাক্তার বলিলেন, 'স্নায়ুর রোগ। স্নায়বিক প্রকৃতির মহিলা, তার ওপর ছেলেপুলে হয়নি—'

'বুঝেছি।—আচ্ছা চললাম। বিশুবাবু একশো টাকা দিয়ে আমাকে দায়ে ফেলেছেন। তাঁর সমস্যাটা ভেবে দেখব।'

বাহিরে তখন রাস্তার আলো জ্বলিয়াছে। ব্যোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'সাড়ে ছ'টা। চল, খুনী আসামী দর্শন করে যাওয়া যাক। বিশু পাল যখন টাকা দিয়েছেন, তখন কিছু তো করা দরকার।'

মোড়ের মাথায় একটা রিক্‌শা পাওয়া গেল, তাহাতে চড়িয়া আমরা উত্তর দিকে চলিলাম। লক্ষ্য করিয়াছি, আমহার্স্ট স্ট্রীটে লোক চলাচল অপেক্ষাকৃত কম; আশেপাশে সামনে পিছনে যখন জোয়ারের সমুদ্রের মত জনস্রোত ছুটিয়াছে, তখন আমহার্স্ট স্ট্রীট সমুদ্রের সমান্তরাল সঙ্কীর্ণ খালের মত নিস্তরঙ্গ পড়িয়া আছে।

রাস্তায় উত্তর প্রান্তে আসিয়া একটি নম্বরের সামনে রিক্‌শা থামিল, আমরা নামিলাম। ব্যোমকেশ নম্বর মিলাইয়া বলিল, 'এই বাড়ি।'

বাড়িটি ঠিক ফুটপাথের ধারে নয়, মাঝখানে একটু খোলা জমি আছে, তাহাতে কাঁঠালি চাঁপার ঝাড় বাড়িটিকে রাস্তা হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। দ্বিতল বাড়ির উপর-তলা অন্ধকার, নিচের একটা জানালা দিয়া পত্রান্তরাল ভেদ করিয়া ঝিকিমিকি আলো আসিতেছে।

আমরা ছোট ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

সামনের ঘর টেবিল চেয়ার দিয়া সাজানো, যেন অফিস ঘর। একটি লোক চেয়ারে বসিয়া অলসভাবে পেন্সিল দিয়া কাগজের উপর হিজিবিজি কাটিতেছে। আমরা দ্বারের কাছে আসিলে সে চোখ তুলিয়া চাহিল।

সুপুরুষ বটে। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, টক্‌টকে রঙ, কোঁকড়া চুলের মাঝখানে

সিঁথি, নাক চোখ যেন তুলি দিয়া আঁকা। আমিও বিশু পালের মত মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

ব্যোমকেশ দ্বারের নিকট হইতে বলিল, 'আসতে পারি? আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী, ইনি অজিত বন্দ্যো।'

অভয় ঘোষালের চোখের দৃষ্টি সতর্ক। তারপর সে অধর প্রান্তে একটি মুকুলিত হাসি ফুটাইয়া বলিল, 'সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী! কী সৌভাগ্য। আসুন।'

আমরা গিয়া অভয় ঘোষালের মুখোমুখি বসিলাম। সে পেন্সিল নামাইয়া রাখিয়া বলিল, 'কি ব্যাপার বলুন দেখি। সম্প্রতি কোনো কু-কার্য করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'আপনাকে দেখতে এলাম।'

অভয় ঘোষাল বলিল, 'ধন্যবাদ। আমি তাহলে একটি দর্শনীয় জীব। আপনি নিজের ইচ্ছেয় এসেছেন, না কেউ পাঠিয়েছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পাঠায় নি কেউ। কিন্তু মহাজন বিশু পাল তাঁর দুঃখের কথা আমাকে শোনালেন, তাই ভাবলাম আপনাকে দর্শন করে যাই।'

'ও—শিশুপাল।' অভয় ঘোষাল ক্ষণেক থামিয়া বলিল, 'আপনাকে কেউ পাঠিয়েছে বুঝেছিলাম, কিন্তু শিশুপালের কথা মনে আসেনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'জানেন বোধ হয়, বিশু পালের পক্ষাঘাত হয়েছে।'

অভয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, 'তাই নাকি! আমি জানতাম না। মাস তিনেক আগে শিশুপাল আমার বাড়িতে এসেছিল, আমাকে চৌদ্দ-পুরুষান্ত করে গেল। ভগবান আছেন।' তাহার মুখে বা কণ্ঠস্বরে কোনো উষ্মা প্রকাশ পাইল না। পেন্সিলটা তুলিয়া লইয়া সে আবার কাগজে হিজিবিজি কাটিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখান থেকে ফিরে গিয়েই তাঁর স্ট্রোক হয়েছিল। সেই থেকে তিনি নিজের বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছেন। অবশ্য পক্ষাঘাতই তাঁর বাড়িতে আবদ্ধ থাকার একমাত্র কারণ নয়। আপনার ভয়ে তিনি বাড়ি থেকে বের হন না।'

'আমার ভয়ে—বলেন কি! আমি খাতক, সে মহাজন, আমারই তার ভয়ে লুকিয়ে থাকার কথা।' অভয় ঘোষাল ভ্রূ তুলিয়া পরম বিস্ময় ভবে কথাগুলি বলিল, কিন্তু তাহার অধর-প্রান্তে হাসি লাগিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাঁর ভয় হয়েছে আপনি তাঁকে খুন করবেন।'

'এই দেখুন। যত দোষ নন্দ ঘোষ! আমি একটিবার খুনের মামলায় ফেঁসে গিয়েছিলাম, অমনি সবাই ভেবে নিলে আমি খুনী আসামী। আমি যে বেকসুর খালাস পেয়েছি সেটা কেউ ভাবল না।' অভয় ঘোষাল একটু থামিয়া অপেক্ষাকৃত মন্থর কণ্ঠে বলিল, 'তবে একটা কথা সত্যি। আমার কোষ্ঠির ফল- যারা আমার শত্রুতা করে তারা বেশি দিন বাঁচে না।—উঠছেন নাকি?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'হ্যাঁ। আপনাকে দেখতে এসেছিলাম দেখা হয়েছে। এবার যাওয়া যাক।– একটা কথা বলে যাই। বিশু পালের যদি অপঘাতে মৃত্যু হয় আমি খুব দুঃখিত হব। এবং আপনিও শেষ পর্যন্ত দুঃখিত হবেন।'

অভয় ঘোষালের মুখে হঠাৎ পরিবর্তন হইল। মুখের হাসি মুছিয়া গিয়া

চোখে একটা নৃশংস হিংস্রতা ফুটিয়া উঠিল। সে নির্নিমেষ সর্প-চক্ষু মেলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল।

আমার বুকের একটা স্পন্দন থামিয়া গিয়া আবার সবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। এই দৃষ্টি বিশু পালকে ভয়ে দিশাহারা করিয়াছিল। চোখের দৃষ্টিতে মৃত্যুর শপথ এত স্পষ্টভাবে আর কাহারো চোখে দেখি নাই।

ব্যোমকেশ তাহার প্রতি একটি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'চল অজিত।'

ফুটপাথে পৌঁছিয়া দেখিলাম, রাস্তায় পরপারে একটা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া আছে। ড্রাইভারকে ডাকিবার জন্য হাত তুলিয়াছি, ট্যাক্সিটা চলিতে আরম্ভ করিল, দ্রুত বেগ সংগ্রহ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমি ব্যোমকেশের পানে চাহিলাম। সে বিলীয়মান ট্যাক্সির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'ভেতরে কেউ ছিল?'

বলিলাম, 'দেখিনি। ড্রাইভারটা কিন্তু আমাদের দিকেই তাকিয়ে ছিল, তাই ভেবেছিলাম খালি ট্যাক্সি। হয়তো পিছনের সীটে কেউ ছিল।'

'হুঁ।' ব্যোমকেশ চলিতে আরম্ভ করিল,—'কেউ বোধ হয় আমাদের পিছু নিয়েছিল।'

'কে পিছু নিতে পারে?'

'ডাক্তার রক্ষিত ছাড়া আর তো কেউ জানে না যে আমরা এখানে এসেছি।'

'কিন্তু কেন? কী উদ্দেশ্য?'

'তা জানি না। অবশ্য সমাপতনও হতে পারে। ট্যাক্সিতে আমাদের অজানা আরোহী ছিল, কোনো কারণে ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করিয়েছিল, তারপর চলে গেল।'

রাত্রি সাড়ে সাতটা। আমরা পদব্রজে বাসার দিকে চলিলাম। মনে কিন্তু একটা ধোঁকা লাগিয়া রহিল।

পরদিন সকালে খবরের কাগজ খুলিয়াই বলিয়া উঠিলাম, 'ওহে—!'

ব্যোমকেশ চকিতে আমার দিকে ঘাড় ফিরাইল, 'কী! বিশু পাল খুন হয়েছে?'

বলিলাম, 'বিশু পাল নয়—অভয় ঘোষাল।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বোকার মত আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর কাগজখানা আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

সংবাদপত্রের বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত। গত রাত্রে আমহার্স্ট স্ট্রীট নিবাসী অভয় ঘোষাল নামক এক ধনী ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় শয্যায় খুন হইয়াছেন। পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছে; কে খুন করিয়াছে তাহা এখনো জানা যায় নাই। দুই বৎসর পূর্বে অভয় ঘোষাল খুনের অভিযোগে আসামী হইয়া বেকসুর খালাস হইয়াছিলেন।—

মনটা অন্য প্রকার সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত ছিল, তাই অনেকক্ষণ বিমূঢ় হইয়া রহিলাম। কাল রাত্রি সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আমরা তাহাকে দেখিয়াছি, সে হাসি মুখে পরম স্বচ্ছন্দ ভাবে ব্যোমকেশের সহিত প্রচ্ছন্ন বাক্‌যুদ্ধ করিয়াছে। তারপর কী হইল? সে ব্যঙ্গভরে বলিয়াছিল, তাহার অনেক 'বন্ধু' আছে। ট্যাক্সিতে তবে কি তাহার 'বন্ধু' ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল, আমরা চলিয়া যাইবার পর ফিরিয়া

আসিয়া তাহাকে খুন করিয়াছে? কিম্বা ট্যাক্সির লোকটি ডাক্তার রক্ষিত? কিন্তু ডাক্তার রক্ষিত তাহাকে খুন করিতে যাইবে কেন?

বেশি জল্পনা-কল্পনা করিবার আগেই দারোগা রমাপতিবাবু উপস্থিত হইলেন।

রমাপতিবাবুর সহিত কর্ম সম্পর্কে আমাদের ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও অল্প পরিচয় ছিল। কাজের লোক বলিয়া পুলিস বিভাগে তাঁহার সুনাম আছে। আমাদেরই সমবয়স্ক ব্যক্তি; মজবুত চেহারা, অমায়িক বাচনভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি মর্মভেদী।

ব্যোমকেশ সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইল, বলিল, 'কাগজে দেখলাম আপনার এলাকায় অভয় ঘোষাল খুন হয়েছে।'

রমাপতিবাবু চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, 'আপনি অভয় ঘোষালকে চিনতেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চিনতাম না, কাল সন্ধ্যেবেলা পরিচয় হয়েছিল। আমরা তার বাড়িতে গিয়েছিলাম তার সঙ্গে দেখা করতে।'

'তাই নাকি! দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন?'

ব্যোমকেশ সহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আগে আপনি খবর বলুন, তারপর আমি বলব।'

রমাপতিবাবু ক্ষণেক ইতস্তত করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আমিই আগে বলছি। অভয় ঘোষালের ওপর অনেক দিন থেকে পুলিসের নজর ছিল। লোকটা ভদ্রতার মুখোশ পরে বেড়াতো, কিন্তু এত বড় শয়তান খুব কম দেখা যায়। কত ভদ্রঘরের মেয়ের সর্বনাশ করেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। নিজের একটা স্ত্রী ছিল, হঠাৎ তার অপঘাত মৃত্যু হয়। তারপর এক ভদ্রলোকের স্ত্রীকে নিয়ে উধাও হয়েছিল; ভদ্রলোক স্ত্রীকে ডিভোর্স করেন। তখন স্ত্রীলোকটি বোধ হয় অভয়কে বিয়ে করার জন্যে বায়না ধরেছিল, অভয় তাকে বিষ খাইয়ে মারে।

অভয় ঘোষালকে পুলিশ অ্যারেস্ট করল, মামলা কোর্টে উঠল। কিন্তু মামলা টিকল না, অভয়ের অপরাধ পাকাপাকি প্রমাণ হল না। ৩০২ ধারার মামলা, হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার, অভয় ঘোষাল ছাড়া পেয়ে গেল।

'এই হল অভয় ঘোষালের ইতিহাস। কলকাতা শহরেই অন্তত দশজন লোক আছে যারা তাকে খুন করতে পারলে খুশী হয়।

'কাল রাত্রে আন্দাজ বারোটার সময় অভয়ের বাড়ির চাকরানী থানায় এসে খবর দেয় যে অভয় খুন হয়েছে। আমি তখন থানায় ছিলাম না, খবর পেয়ে তদন্ত করতে গেলাম। অভয় ঘোষালের আর্থিক অবস্থা এখন পড়ে গেছে, বাড়িতে একলা থাকে, কেবল একটা কম-বয়সী চাকরানী দেখাশোনা করে। এই চাকরানীটাই থানায় খবর দিতে এসেছিল।

'গিয়ে দেখলাম অভয় দোতলার ঘরে বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে আছে, তার পিঠের বাঁ দিকে 'ঙুনছুঁচের মত একটা শলা বিঁধে আছে। চাকরানীকে সওয়াল করে জানা গেল যে অভয় রাত্রি ন'টার সময় খাওয়াদাওয়া করে শুতে গিয়েছিল; চাকরানী বাড়ির কাজকর্ম সেরে, নিজে খেয়ে, দোর জানলা বন্ধ করে অভয়ের ঘরে গিয়ে দেখল ইতিমধ্যে কেউ এসে অভয়কে খুন করে রেখে গেছে।

'আমরা চাকরানীটাকে আটক করে রেখেছি, কিন্তু সে বোধ হয় খুন করেনি।

কে খুন করেছে তাও জানা যাচ্ছে না। অভয়ের সঙ্গে যাদের শত্রুতা ছিল—মামলায় যারা অভয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল—তাদের সকলের অ্যালিবাই যাচাই করে দেখেছি, তারা কেউ নয় বলেই মনে হয়।

'এই হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি! এখন আপনি কি জানেন বলুন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি যে কিছু জানি তা আপনি জানলেন কি করে?'

রমাপতিবাবু পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া ব্যোমকেশের দিকে বাড়াইয়া দিলেন, 'এই কাগজের টুকরোটা নীচের তলায় অভয়ের বসবার ঘরে টেবিলের ওপর রাখা ছিল।'

গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, কাগজের উপর পেন্সিল দিয়া হিজিবিজি কাটা, তারপর লেখা আছে—ব্যোমকেশ বক্সী—শিশুপাল—। মনে পড়িয়া গেল কাল রাত্রে অভয় ঘোষাল আমাদের সামনে বসিয়া হিজিবিজি কাটিতেছিল।

রমাপতিবাবু বলিলেন, 'আপনার নাম দেখে মনে হল আপনি হয়তো কিছু জানেন। তাই এলাম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিক। এবার আমি যা জানি শুনুন।'

ব্যোমকেশ কাল সকালে ডাক্তার রক্ষিতের আগমন হইতে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল। রমাপতিবাবু গাঢ় মনোযোগ দিয়া শুনিলেন; ব্যোমকেশ কাহিনী শেষ করিলে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত মুখে বলিলেন, 'সন্দেহজনক বটে। কিন্তু বিশু পালের কোনো মোটিভ দেখতে পাচ্ছি না। তার ওপর লোকটা পঙ্গু।—আপনার কি মনে হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না। ক'টার সময় মৃত্যু হয়েছে জানেন কি?'

'পুলিস সার্জন বলছেন, রাত্রি ন'টার পর এবং বারোটার আগে।'

'হুঁ'- ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'আমার মনে হয়, বিশু পাল সত্যি পঙ্গু কিনা ভাল করে যাচাই করে দেখা উচিত।'

রমাপতিবাবু বলিলেন, 'তা বটে। আর কাউকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন বিশু পালকেই নেড়েচেড়ে দেখা যাক। আপনার ফোন আছে, আমাকে একবার ব্যবহার করতে দেবেন?'

'নিশ্চয়। আসুন।' ব্যোমকেশ তাঁহাকে পাশের ঘরে লইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রমাপতিবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'পুলিস সার্জনকে বিশু পালের বাড়িতে যেতে বললাম। আমিও যাচ্ছি। আপনারা আসবেন?'

'বেশ তো, চলুন না।'

আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া রমাপতিবাবুর সঙ্গে বাহির হইলাম।

বিশু পালের বাড়ির সামনে ঈষৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পুলিস সার্জন বাড়ির দ্বারের কাছে পুলিসের ছাপ-মারা গাড়িতে বসিয়া আছেন, রাস্তায় ভিড় জমিয়াছে। ডাক্তার রক্ষিত দ্বারের কাছে উৎকণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা উপস্থিত হইলে সার্জন সুশীলবাবু গাড়ি হইতে নামিলেন। ডাক্তার রক্ষিত আমাদের দিকে আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু! কী হয়েছে?'

ব্যোমকেশ দুই পক্ষের পরিচয় করাইয়া দিল। রমাপতিবাবু ডাক্তার রক্ষিতকে বলিলেন, 'পুলিসের ডাক্তার বিশু পালকে পরীক্ষা করে দেখতে চান। আপনার

আপত্তি আছে?'

ডাক্তার রক্ষিত ক্ষণেক অবাক হইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'আপত্তি! বিন্দুমাত্র না। কিন্তু কেন? কি হয়েছে?'

রমাপতিবাবু বলিলেন, 'অভয় ঘোষাল নামে এক ব্যক্তিকে কাল রাত্রে কেউ খুন করেছে!'

ডাক্তার রক্ষিত প্রতিধ্বনি করিলেন, 'অভয় ঘোষালকে খুন করেছে! ও—বুঝেছি, আপনাদের সন্দেহ বিশুবাবু অভয় ঘোষালকে খুন করেছেন?' তাঁর মুখে একটু শুষ্ক হাসি দেখা দিল—'অর্থাৎ বিশুবাবুর পক্ষাঘাত সত্যিকার পক্ষাঘাত নয়, ভান মাত্র। বেশ তো আসুন, পরীক্ষা করে দেখুন!'

আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিলাম।

দ্বিতলে সেরেস্তা বসিয়াছে। ত্রিতলে সিঁড়ির মুখে গুর্খা সমাসীন। তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া ডাক্তার রক্ষিত বন্ধ দরজায় টোকা দিলেন। দরজা অল্প খুলিযা বিশু পালের স্ত্রী ভয়ার্ত চোখে চাহিলেন। সমস্ত প্রক্রিয়াই কাল সন্ধ্যার মত।

বিশু পালের স্ত্রী পাশের ঘরে চলিয়া গেলেই, আমরা পাঁচ জন ঘরে প্রবেশ করিলাম। ডাক্তার রক্ষিত আলো জ্বালিয়া দিলেন।

বিছানায় বিশু পাল বালাপোশ জড়াইয়া শুইয়া আছেন, কলহশীর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'কী চাই! কী চাই! ডাক্তার এত লোক কেন?'

ডাক্তার রক্ষিত তাঁহার শয্যাপার্শ্বে নত হইয়া বলিলেন, 'পুলিসের পক্ষ থেকে ডাক্তার এসেছেন, আপনাকে পরীক্ষা করতে চান।'

• বিশু পালের কণ্ঠস্বর আরও তীক্ষ্ম হইয়া উঠিল, 'কেন? পুলিসের ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করতে চায় কেন?'

ডাক্তার রক্ষিত ধীর স্বরে কহিলেন, 'অভয় ঘোষাল খুন হয়েছে, তাই—'

বিশু পালের ঊর্ধ্বাঙ্গ ধড়ফড় করিয়া উঠিল, 'কে খুন হয়েছে! কী বললে তুমি ডাক্তার?'

ডাক্তার আবার বলিলেন, 'অভয় ঘোষাল খুন হয়েছে।'

বিশু পালের মুখে পরিত্রাণের আলো ক্ষণেক ফুটিয়া উঠিয়াই মুখ আবার অন্ধকার হইয়া গেল; তিনি স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'অভয় ঘোষাল খুন হয়েছে! কিন্তু—আমি যে তাকে ত্রিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছি, সুদে-আসলে তেত্রিশ হাজার দাঁড়িয়েছে। আমার টাকার কি হবে?'

ডাক্তার নীরস কণ্ঠে বলিলেন, 'টাকার কথা পরে ভাববেন। এখন এঁরা এসেছেন যাচাই করতে সত্যিসত্যি আপনার পক্ষাঘাত হয়েছে কিনা।'

'তার মানে?' বিশু পাল তীব্র চক্ষু ফিরাইয়া আমাদের পানে চাহিলেন।

রমাপতিবাবু খাটের ধারে আগাইয়া গেলেন, শান্ত ভাবে বলিলেন, 'দেখুন, আমাদের কোনো মতলব নেই। আমাদের ডাক্তার কেবল আপনাকে পরীক্ষা করে দেখতে চান। আপনার আপত্তি আছে কি?'

'আপত্তি! কিসের আপত্তি! পুলিসের ডাক্তার আমার রোগ সারিয়ে দিতে পারবে?'

সুশীলবাবু বলিলেন, 'তা—চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

আরো কিছুক্ষণ সওয়াল জবাবের পর বিশু পাল রাজী হইলেন। সুশীলবাবু তাঁহার অঙ্গ হইতে বালাপোশ সরাইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। বিশু পালের

পা দুইটি পক্ষাঘাতে অবশ, ঊর্ধ্বাঙ্গ সচল আছে। সুশীলবাবু পায়ে ছুঁচ ফুটাইয়া দেখিলেন, কোনো সাড়া পাইলেন না। তারপর আরো অনেক ভাবে পরীক্ষা করিলেন; নাড়ী দেখিলেন, রক্ত-চাপ পরীক্ষা করিলেন, ডাক্তার রক্ষিতকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিলেন। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিশু পালের গায়ে বালাপোশ মুড়িয়া দিলেন।

তাঁহার পরীক্ষাকালে এক সময় আমার দৃষ্টি অন্দরের দিকে সঞ্চালিত হইয়াছিল। দেখিলাম বিশুবাবুর স্ত্রী দরজা একটু ফাঁক করিয়া নিষ্পলক চোখে স্বামীর দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার উদ্বেগ যেন স্বাভাবিক উদ্বেগ নয়, একটা বিকৃত ভয়ার্ত উত্তেজনা—

সুশীলবাবু বলিলেন, 'দেখা হয়েছে। চলুন, যাওয়া যাক।'

আমরা দ্বারের দিকে ফিরিলাম। পিছন হইতে বিশু পালের গলা আসিল, 'কেমন দেখলেন? সারবে রোগ?'

সুশীলবাবু একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন, 'সারতে পারে। আপনার ডাক্তারবাবু ভালই চিকিৎসা করছেন।—আচ্ছা, নমস্কার।'

পুলিসের গাড়িতে বাসায় ফিরিবার পথে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহলে রোগটা যথার্থ, অভিনয় নয়!'

সুশীলবাবু বলিলেন, 'না, অভিনয় নয়।'

সেদিন সারা দুপুর ব্যোমকেশ উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া তক্তপোশে পড়িয়া রহিল এবং অসংখ্য সিগারেট ধ্বংস করিল। অপরাহ্ণে যখন চা আসিল, তখনো সে উঠিল না দেখিয়া আমি বলিলাম, 'পুলিস তো তোমাকে অভয় ঘোষালের খুনের তদন্ত করতে ডাকেনি, তবে তোমার এত ভাবনা কিসের?'

সে বলিল, ভাবনা নয়, অজিত, বিবেকের দংশন।'

তারপর সে হঠাৎ উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। শুনিলাম কাহাকে ফোন করিতেছে। মিনিট কয়েক পরে যখন ফিরিয়া আসিল দেখিলাম তাহার মুখ একটু প্রফুল্ল হইয়াছে।

'কাকে ফোন করলে?'

'ডাক্তার অসীম সেনকে।'

ডাক্তার অসীম সেনের সঙ্গে 'খুঁজি খুঁজি নারি' ব্যাপারে আমাদের পরিচয় হইয়াছিল।

ব্যোমকেশ এক চুমুকে কবোষ্ণ চা গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, 'চল, বেরুনো যাক।'

'কোথায়?'

বিশু পালের বাড়ি।'

বিশু পালের বাড়িতে কেরানীরা দিনের কাজ শেষ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে। ডাক্তার রক্ষিত রোগী দেখার ঘরে টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া সিগারেট টানিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া ত্বরিতে পা নামাইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার রোগী কেউ নেই দেখছি। একবার ওপরে চলুন, আপনার সামনে বিশুবাবুকে দুটো কথা বলব।'

ডাক্তার প্রসন্ন নেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া আমাদের উপরে লইয়া চলিলেন।

গুর্খা অন্তর্হিত হইয়াছে, বিশুবাবুর ঘরে দ্বার খোলা। আমরা প্রবেশ করিলাম। আজ আর আলো জ্বালিবার প্রয়োজন হইল না, খোলা জানালা দিয়া পর্যাপ্ত আলো আসিতেছে। বিশু পালের অপঘাত-মৃত্যুভয় কাটিয়াছে।

তিনি পিঠের নীচে কয়েকটা বালিশ দিয়া শয্যায় অর্ধশয়ান ছিলেন, আমাদের পদশব্দে চকিতে ঘাড় ফিরাইলেন।

ব্যোমকেশ শয্যার পাশে গিয়া কিছুক্ষণ বিশু পালের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'খুব খেলা দেখালেন আপনি!'

বিশু পালের চক্ষু দু'টি প্যাঁচার চোখের মত ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল। ব্যোমকেশ দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, 'ডাক্তারকে দলে টেনেছিলেন, তার কারণ ডাক্তার না হলে আপনার কার্যসিদ্ধি হত না। কিন্তু আমাকে দলে টানলেন কেন? আমি আপনার পক্ষে সাক্ষী দেব এই জন্যে?'

ডাক্তার এতক্ষণ আমাদের পিছনে ছিলেন, এখন লাফাইয়া সামনে আসিলেন, উগ্র কণ্ঠে বলিলেন, 'এসব কী বলছেন আপনি! আমার নামে কী বদনাম দিচ্ছেন!'

খোঁচা খাওয়া বাঘের মত ব্যোমকেশ তাঁহার দিকে ফিরিল, 'ডাক্তার, প্রোকেন্‌ নামে কোনো ওষুধের নাম শুনেছ?'

ডাক্তার ফুটো বেলুনের মত চুপসিয়া গেলেন। ব্যোমকেশ আরো কিছুক্ষণ তাঁহার পানে আরক্ত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বিশু পালের দিকে ফিরিল, পকেট হইতে একশো টাকার নোট বাহির করিয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'এই নিন আপনার টাকা। আমি আপনাদের দু'জনকে ফাঁসিকাঠে তুলতে পারি, এই কথাটা ভুলে যাবেন না। আপনাকে দু-দিন হাজতে রাখলেই পক্ষাঘাতের প্রকৃত স্বরূপ বেরিয়ে পড়বে।'

বিশু পাল প্রায় কাঁদিয়া উঠিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, দয়া করুন। আমি যা করেছি প্রাণের দায়ে করেছি, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে করেছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এক শর্তে দয়া করতে পারি। আপনাকে এক লক্ষ টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করতে হবে। রাজী আছেন?'

বিশু পাল শীর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, 'এক লক্ষ টাকা!'

'হ্যাঁ, এক লক্ষ টাকা, এক পয়সা কম নয়। কাল সকালে আপনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এক লক্ষ টাকা জমা দিয়ে আমার কাছে রসিদ পাঠিয়ে দেবেন। যদি টাকা না দেন—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, দেবো এক লক্ষ টাকা।'

'মনে থাকে যেন। কাল বেলা বারোটা পর্যন্ত আমি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রসিদের জন্য অপেক্ষা করব।—চলো অজিত।'

বাড়িতে ফিরিয়া আর এক দফা চা পান করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম, প্রতিরক্ষা তহবিলে এক লক্ষ টাকা চাঁদা খুবই আনন্দের কথা, কিন্তু ব্যোমকেশ দু'টা খুনীকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিল কেন? ব্যোমকেশ বোধ হয় আমার মুখ দেখিয়া কথা বুঝিতে পারিয়াছিল; বলিল, 'বিশু পালকে ছেড়ে না দিয়ে উপায়

ছিল না। মোকদ্দমা কোর্টে উঠলেও সে ছাড়া পেয়ে যেতো। হত্যার মোটিভ কেউ বিশ্বাস করত না।'

বলিলাম, 'কিন্তু মোটিভটা তো খাঁটি?'

'বিশু পালের দিক থেকে খাঁটি, সে সত্যিই নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে অভয় ঘোষালকে খুন করেছিল। কিন্তু জুরী বিশ্বাস করত না, হেসে উড়িয়ে দিত।'

'আচ্ছা, একটা কথা বলো। আত্মরক্ষার জন্যে নরহত্যা করলে দোষ নেই আইনে একথা বলে, কেমন? তাহলে বিশু পাল অভয় ঘোষালকে খুন করে কী দোষ করেছে?'

'আত্মরক্ষার জন্যে নরহত্যার অধিকার মানুষের আছে, কিন্তু তিন মাস ধরে ষড়যন্ত্র করে নরহত্যা করলে আইন তা স্বীকার করবে না। বিশু পাল তা জানত বলেই এত সাবধানে আট-ঘাট বেঁধে কাজে নেমেছিল!'

'ব্যাপার বুঝলাম। তবু তুমি সব কথা পরিষ্কার করে বলো।'

ব্যোমকেশ তখন বলিতে আরম্ভ করিল -

'অভয় ঘোষালকে কাল আমরা দেখেছিলাম। মুখে হাসি লেগে আছে, কিন্তু চোখে জল্লাদের নিষ্ঠুরতা। লোকটা সত্যিকার খুনী। ওর সম্বন্ধে আমরা যা শুনেছি তা একবর্ণ মিথ্যে নয়।

'বিশু পাল মিষ্টি কথায় ভুলে অভয় ঘোষালকে ত্রিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিল। তারপর যখন ধার শোধ করার পালা এল, তখন আর অভয় ঘোষালের দেখা নেই। কে কার টাকা ধারে!

'বিশু পাল তখনো অভয় ঘোষালকে পুরোপুরি চিনত না, সে একদিন তার বাড়িতে গিয়ে তার চৌদ্দ-পুরুষান্ত করল। অভয় ঘোষাল একটি কথা বলল না, কেবল তার পানে চেয়ে রইল। সেই চাউনি দেখে বিশু পাল ভয় পেয়ে গেল। সে বুঝতে পারল অভয় ঘোষাল কী ধাতুর লোক; সে আগেও খুন করেছে, এবার তাকে খুন করবে।

'বিশু পালও কম নয়। সে যখন পাকাপাকি বুঝলো যে অভয় ঘোষাল তাকে খুন না করে ছাড়বে না, তখন সে ঠিক করল অভয় ঘোষালকে সে আগে খুন করবে। তার টাকা মারা যাবার ভয় নেই, কারণ অভয় ঘোষালের একটা বাড়ি আছে, সেটা ক্রোক করে টাকা আদায় করা যাবে।

'খুন করার ব্যাপারে বিশু পালের একটা সুবিধা ছিল। সে জানত যে অভয় ঘোষাল তাকে খুন করতে চায়, কিন্তু বিশু পাল যে অভয় ঘোষালকে খুন করতে চায়, একথা অভয় ঘোষাল জানত না। তাই সে সাবধান হয়নি।

'বিশু পালের বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ হল। সিঁড়ির মুখে গুর্খা মোতায়েন হল। তারপর বিশু পাল প্ল্যান ঠিক করতে বসল।

'নীচের তলার ভাড়াটে ডাক্তার সুরেশ রক্ষিত। বেশ বোঝা যায় তার প্র্যাকটিস নেই। সে বাড়ি-ভাড়া দিতে পারে না, তাই বিশু পালের খাতক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশু পাল তাকে ডেকে নিজের প্ল্যান বলল। ডাক্তারের গলায় ফাঁস, সে রাজী হল।

'বিশু পাল নতুন আসবাব কিনে ডাক্তারের ডিসপেন্সারি সাজিয়ে দিল, যাতে মনে হয় ডাক্তার হেঁজিপেঁজি ডাক্তার নয়, তার বেশ পসার আছে। তারপর বিশু পালের পক্ষাঘাত হল।

'আজকাল ডাক্তারি শাস্ত্রের অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে অপারেশনের জন্যে রুগীকে অজ্ঞান করতে হলে ক্লোরোফর্ম দিতে হতো, এখন আর তা দরকার হয় না। প্রোকেন জাতীয় এক রকম ওষুধ বেরিয়েছে, মেরুদণ্ডের স্থান-বিশেষে ইনজেকশন দিলে শরীরের স্থান-বিশেষ অসাড় হয়ে যায়; তখন শরীরের সেই অংশে স্বচ্ছন্দে অপারেশন করা যায়, রোগী ব্যথা অনুভব করে না।

'ডাক্তার রক্ষিত তাই করল, বিশু পালের পা দুটো অসাড় হয়ে গেল। তখন একজন নামকরা বড় ডাক্তারকে ডাকা হল; তিনি দেখলেন পক্ষাঘাত, সেই রকম ব্যবস্থা করে গেলেন।

'প্রোকেন জাতীয় ওষুধের ফল পাঁচ-ছয় ঘণ্টা থাকে। তারপর আর থাকে না। কিন্তু সে খবর বাইরের লোক জানে না, কেবল বিশু পালের স্ত্রী আর ডাক্তার জানে। কেরানীরা দোতলায় আসে, তারা জানতে পারে মালিকের পক্ষাঘাত হয়েছে। সেরেস্তাদার ঘরে ঢুকতে পায় না, দোরের কাছ থেকে দেখে যায় মালিক বিছানায় পড়ে আছে। কারুর অবিশ্বাস হয় না, অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই।

'কিন্তু বিশু পাল ঝানু লোক, সে কাঁচা কাজ করবে না। নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত সাক্ষী চাই; এমন সাক্ষী চাই যাদের কথা কেউ অবিশ্বাস করবে না। কাল সকালে সে ডাক্তারকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালো। আমি যেতে রাজী হলাম। ডাক্তার ফিরে গিয়ে বেলা একটা আন্দাজ বিশু পালের শিরদাঁড়ায় প্রোকেন ইনজেকশন দিল।

'আমরা পাঁচটার সময় গিয়ে দেখলাম বিশু পাল শয্যাশায়ী, উত্থানশক্তি রহিত। সে তার দুঃখের কথা আমাকে শোনালো, তারপর একশো টাকা দক্ষিণা দিয়ে বিদেয় করল। তার মতলব ঠিক করা ছিল, কাল-রাত্রেই অভয়কে খুন করবে।

'আমি অভয়ের ঠিকানা নিয়েছি সে-খবর ডাক্তার বিশু পালকে জানালো। বিশু পালের ভাবনা হল, আমরা যদি বেশি রাত পর্যন্ত অভয় ঘোষালের বাড়িতে থাকি, তাহলে তার প্ল্যান ভেস্তে যাবে। সে ডাক্তারকে পাঠালো আমাদের ওপর নজর রাখতে; ডাক্তার ট্যাক্সিতে অভয় ঘোষালের বাড়ির সামনে এসে অপেক্ষা করতে লাগল, তারপর আমরা যখন অভয়ের বাড়ি থেকে বেরুলাম তখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল। লাইন ক্লিয়ার!

'সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ বিশু পালের শরীরের জড়ত্ব কেটে গেল, সে চাঙ্গা হয়ে উঠল।

'রাত্রি আটটার সময় একটা গুর্খা চলে যায়, দ্বিতীয় গুর্খা আসে দশটার সময়। বিশু পাল আন্দাজ ন'টার সময় বাড়ি থেকে বেরুলো, বোধ হয় র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বেরিয়েছিল, হাতে ছিল গুনছুঁচের মতন একটা অস্ত্র। গত তিন মাসে সে অভয় ঘোষালের চাল-চলন সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে রেখেছিল। বাড়িতে একটা ঝি ছাড়া আর কেউ থাকে না; অভয় ঘোষাল ন'টার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যায়; সদর দরজা ভেজানো থাকে, চাকরানী বোধ হয় দশটার পর রান্নাঘরের কাজকর্ম সেরে সদর দরজা বন্ধ করে।

'সুতরাং বিশু পালের কোনই অসুবিধা হল না। অভয় ঘোষালকে খুন করে সে দশটার আগেই নিজের বাড়িতে ফিরে এল; কেউ জানতে পারল না। যদি কেউ তাকে দেখে ফেলত তাহলেও বিশু পালের অ্যালিবাই ভাঙা শক্ত হতো। যে লোক তিন মাস পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী সে খুন করতে যাবে কি করে? খুন করার

মোটিভ কোথায়?

'আজ ভোরবেলা বিশু পাল আর একটা ইনজেকশন নিল। সাবধানের মার নেই। তারপর পুলিস-ডাক্তারকে নিয়ে আমরা গেলাম। পুলিস-ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন পক্ষাঘাতই বটে।

'আমার মনটা গোড়া থেকেই খুঁৎখুঁৎ করছিল। একটা সুদখোর মহাজন কেবল আমাকে তার দুঃখের কাহিনী শোনাবার জন্যে একশো টাকা খরচ করবে? ওই-খানেই বিশু পাল একটু ভুল করে ফেলেছিল। তারপর আজ সকালে যখন কাগজে অভয় ঘোষালের মৃত্যু সংবাদ পড়লাম, তখন আর সন্দেহ রইল না যে বিশু পালই অভয় ঘোষালের মৃত্যু ঘটিয়েছে। কিন্তু কী করে?

'তিনজন লোক আছেঃ বিশু পাল নিজে, তার স্ত্রী এবং ডাক্তার রক্ষিত। ডাক্তার রক্ষিত খুবই প্যাঁচে পড়েছে, সে বিশু পালকে পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু নিজের হাতে খুন করবে কি? বিশ্বাস হয় না। বিশু পালের স্ত্রী মেয়েমানুষ, স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে সে অভয় ঘোষালকে হাতের কাছে পেলে বিষ খাওয়াতে পারে কিন্তু অত দূরে গিয়ে ছুরি চালানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। ছুরি মেয়েমানুষের অস্ত্র নয়। বাকি রইল বিশু পাল। কিন্তু সে তো পক্ষাঘাতে পঙ্গু।

'গুর্খা দু'টোকে গোড়াতেই বাদ দিয়েছি। প্রাণীহত্যায় তাদের অরুচি নেই, তারা কুকরি চালাতেও জানে। কিন্তু বিশু পাল নিজের গুর্খা দারোয়ানকে দিয়ে খুন করাবে এত কাঁচা ছেলে সে নয়। গুর্খাদের মাথায় প্যাঁচালো বুদ্ধি নেই, তারা সরল এবং গোঁয়ার। ধরা পড়লেই সত্যি কথা বলে ফেলবে।

'তবে?'

'হঠাৎ আসল কারসাজিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ডাক্তার শাস্ত্রে জ্ঞান থাকলে আগেই বুঝতে পারতাম। বিশু পালের পক্ষাঘাত সত্যিকারের পক্ষাঘাত নয়, পক্ষাঘাতের অস্থায়ী বিকল্প, ডাক্তারী প্রক্রিয়ার দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।

'ডাক্তার অসীম সেনকে ফোন করলাম। তিনি প্রবীণ ডাক্তার, এক কথায় বুঝিয়ে দিলেন।

'আমার দুঃখ এই যে বিশু পালের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার রক্ষিতও ছাড়া পেয়ে গেল। ডাক্তার হয়ে সে যে-কাজ করেছে, তার ক্ষমা নেই।—যাহোক, প্রতিরক্ষা তহবিলে এক লক্ষ টাকাই বা মন্দ কি?'

হেঁয়ালির ছন্দ

১

ব্যোমকেশ সরকারী কাজে কটকে গিয়াছিল, আমিও সঙ্গে ছিলাম। দু'চার দিন সেখানে কাটাইবার পর দেখা গেল, এ দু'চার দিনের কাজ নয়, সরকারী দপ্তরে পর্বতপ্রমাণ দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটিয়া সত্য উদ্‌ঘাটন করিতে সময় লাগিবে। তখন ব্যোমকেশ কটকে থাকিয়া গেল, আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। বাড়িতে একজন পুরুষ না থাকিলে বাঙালী গৃহস্থের সংসার চলে কি করিয়া।

কলিকাতায় আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছি। ব্যোমকেশ নাই, নিজেকে একটু অসহায় মনে হইতেছে। শীত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, বেলা ছোট হইতেছে; তবু সময় কাটিতে চায় না। মাঝে মাঝে দোকানে যাই, প্রভাতের কাজকর্ম দেখি, নূতন পাণ্ডুলিপি আসিলে পড়ি। কিন্তু তবু দিনের অনেকখানি সময় শূন্য পড়িয়া থাকে।

তারপর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যা কাটাইবার একটা সুযোগ জুটিয়া গেল।

আমাদের বাসাবাড়িটা তিনতলা। উপর তলায় গোটা পাঁচেক ঘর লইয়া আমরা থাকি, মাঝের তলার ঘরগুলিতে দশ-বারো জন চাকুরে ভদ্রলোক মেস করিয়া আছেন। নীচের তলায় ম্যানেজারের অফিস, ভাঁড়ার ঘর, খাওয়ার ঘর, কেবল কোণের একটি ঘরে এক ভদ্রলোক থাকেন। এঁদের সকলের সঙ্গেই আমাদের মুখ চেনাচিনি আছে, কিন্তু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই।

সেদিন সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়া একটা মাসিকপত্র লইয়া বসিয়াছি, দ্বারে টোকা পড়িল। দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, একটি মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বিনীত হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে আগে দু'একবার বাসাবাড়ির দ্বিতলে দেখিয়াছি, কিছুদিন হইল মেসে বাসা লইয়াছেন। দ্বিতলের এক কোণে সেরা ঘরটি ভাড়া লইয়া একাকী বাস করিতেছেন। একটু শৌখীন গোছের লোক, সিল্কের চুড়িদার পাঞ্জাবির উপর গরম জবাহর-কুর্তা, মাথার চুল পাকার চেয়ে কাঁচাই বেশি। ফিট্‌ফাট্ চেহারা।

যুক্তকরে নমস্কার করিয়া বলিলেন, 'মাপ করবেন, আমার নাম ভূপেশ চট্টোপাধ্যায়, দোতলায় থাকি।'

বলিলাম, 'আপনাকে কয়েকবার দেখেছি। নাম জানতাম না। আসুন।'

ঘরে আনিয়া বসাইলাম। তিনি বলিলেন, 'মাস দেড়েক হল কলকাতায় এসেছি, বীমা কোম্পানীতে কাজ করি, কখন কোথায় আছি কিছু ঠিক নেই। হয়তো কালই অন্য কোথাও বদলি করে দেবে।'

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করিয়া বলিলাম, 'আপনি বীমা কোম্পানীর লোক। কিন্তু আমি তো কখনো জীবন-বীমা করাইনি, করাবার পরিকল্পনাও নেই।'

তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'না না, আমি সেজন্যে আসিনি। আমি বীমা কোম্পানীর অফিসে কাজ করি বটে, কিন্তু দালাল নই। আমি এসেছিলাম—' একটু অপ্রস্তুতভাবে থামিয়া বলিলেন, 'আমার ব্রিজ খেলার নেশা আছে। এখানে

এসে অবধি খেলতে পাইনি, পেট ফুলছে। অতি কষ্টে দু'টি ভদ্রলোককে যোগাড় করেছি। তাঁরা দোতলায় তিন নম্বর ঘরে থাকেন। কিন্তু চতুর্থ ব্যক্তিকে পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকদিন কাটথ্রোট্ ব্রিজ খেলে কাটালাম, কিন্তু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে। আজ ভাবলাম দেখি যদি অজিতবাবুর ব্রিজ খেলার শখ থাকে।'

এক সময় ব্রিজ খেলার শখ ছিল। শখ নয়, প্রচণ্ড নেশা। অনেকদিন খেলি নাই, নেশা মরিয়া গিয়াছে। তবু মনে হইল সঙ্গিহীন ভাবে নীরস পত্রিকা পড়িয়া সন্ধ্যা কাটানোর চেয়ে বরং ব্রিজ ভাল।

বলিলাম, 'বেশ তো, বেশ তো। আমার অবশ্য অভ্যেস ছেড়ে গেছে, তবু— মন্দ কি।'

ভূপেশবাবু ত্বরিতে উঠিয়া বলিলেন, 'তাহলে চলুন, আমার ঘরে ব্যবস্থা করে রেখেছি। মিছে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

বলিলাম 'আপনি এগোন, আমি চা খেয়েই যাচ্ছি।'

তিনি বলিলেন, 'না না, আমার ঘরেই চা খাবেন।—চলুন।'

তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া হাসি পাইল। এক কালে আমারও এমনি আগ্রহ ছিল, সন্ধ্যার সময় ব্রিজ না খেলিলে মনে হইত দিনটা বৃথা গেল।

উঠিয়া পড়িলাম। সত্যবতীকে জানাইয়া ভূপেশবাবুর সঙ্গে নীচে নামিয়া চলিলাম।

সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দ্বিতলের প্রথম ঘরটি ভূপেশবাবুর। নিজের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া তিনি হাঁক দিলেন, 'রামবাবু, বনমালীবাবু, আপনারা আসুন। অজিতবাবুকে পাকড়েছি।'

বারান্দার মধ্যস্থিত তিন নম্বর ঘরের দ্বার হইতে দু'টি মুণ্ড উঁকি মারিল, তারপর 'আসছি' বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ভূপেশবাবু আমাকে লইয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং আলো জ্বালিয়া দিলেন।

ভূপেশবাবুর ঘরটি বেশ সুপরিসর। বাহিরের দিকে দুই দেয়ালে দু'টি গরাদ-যুক্ত জানালা। ঘরের এক পাশে তক্তপোশের উপর সুজনি-ঢাকা বিছানা, অন্য পাশে খালি আলমারির মাথায় ঝকঝকে স্টোভ, চায়ের সরঞ্জাম ইত্যাদি। ঘরের মাঝখানে একটি নীচু টেবিল ঘিরিয়া চারখানি চেয়ার, স্পষ্টই বোঝা যায় তাস খেলিবার টেবিল। তা ছাড়া ঘরে ড্রেসিং টেবিল, কাপড় রাখার দেরাজ প্রভৃতি যে-কয়টি ছোটখাটো আসবাব আছে সমস্তই সুরুচির পরিচায়ক। ভূপেশবাবুর রুচি একটু বিলাত-ঘেঁষা।

ভূপেশবাবু আমাকে চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, 'চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই, পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে যাবে।'

তিনি স্টোভ জ্বালিয়া জল চড়াইলেন। ইতিমধ্যে রামবাবু ও বনমালীবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পূর্বে পরিচয় থাকিলেও ভূপেশবাবু আর একবার পরিচয় করাইয়া দিলেন, 'ইনি রামচন্দ্র রায়, আর ইনি বনমালী চন্দ। দু'জনে একই ঘরে থাকেন এবং একই ব্যাঙ্কে কাজ করেন।'

আমি লক্ষ্য করিলাম, আরো ঐক্য আছে; একসঙ্গে দু'জনকে কখনো দেখি নাই বলিয়াই বোধ হয় লক্ষ্য করি নাই। দু'জনেরই বয়স পঁয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে, দু'জনেরই মোটাসোটা মাঝারি দৈর্ঘ্যের চেহারা, দু'জনেরই মুখের ছাঁচ এক-

রকম; মোটা নাক, বিরল ভুরু, চওড়া চিবুক। সাদৃশ্যটা স্পষ্টই বংশগত। আমার লোভ হইল ইঁহাদের চমক লাগাইয়া দিই। হাজার হোক আমি ব্যোমকেশের বন্ধু।

বলিলাম, 'আপনারা কি মাসতুত ভাই?'

দু'জনে চমকিয়া চাহিলেন; রামবাবু ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন, 'না। আমি বৈদ্য, বনমালীবাবু কায়স্থ।'

অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। আমতা আমতা করিয়া কৈফিয়ত দিবার চেষ্টা করিতেছি, ভূপেশবাবু এক প্লেট শিঙাড়া আনিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। তারপর চা আসিল। তাড়াতাড়ি চা পর্ব শেষ করিয়া আমরা খেলিতে বসিলাম। মাসতুত ভাই-এর প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল।

খেলিতে বসিয়া দেখিলাম এতদিন পরেও ব্রিজ খেলা ভুলি নাই; খেলার এবং ডাকের কলাকৌশল সবই আয়ত্তের মধ্যে আছে। সামান্য বাজি রাখিয়া খেলা, খেলার শেষে বড়জোর চার আনা লাভ লোকসান থাকে। কিন্তু এই বাজিটুকু না থাকিলে খেলার রস জমে না।

প্রথম রাবারে আমি ও রামবাবু জুড়িদার হইলাম। রামবাবু একটি মোটা চুরুট ধরাইলেন; ভূপেশবাবু ও আমি সিগারেট জ্বালিলাম, বনমালীবাবু কেবল সুপুরি-লবঙ্গ মুখে দিলেন।

তারপর খেলা চলিতে লাগিল। একটা রাবার শেষ হইলে তাস কাটিয়া জুড়িদার বদল করিয়া আবার খেলা চলিল। এঁরা তিনজনেই ভাল খেলোয়াড়; কথাবার্তা বেশী হইতেছে না, সকলের মনই খেলায় মগ্ন। কেবল সিগারেট ও সিগারের আগুন অনির্বাণ জ্বলিতেছে। ভূপেশবাবু এক সময় উঠিয়া গিয়া জানালা খুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে আসিয়া বসিলেন।

খেলা শেষ হইল তখন রাত্রি ন'টা বাজিয়া গিয়াছে, মেসের চাকর দু'বার খাওয়ার তাগাদা দিয়া গিয়াছে। হারজিতের অংক কষিয়া দেখা গেল, আমি দুই আনা জিতিয়াছি। মহানন্দে জিতের পয়সা পকেটস্থ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। ভূপেশবাবু স্মিতমুখে বলিলেন, 'কাল আবার বসবেন তো?'

বলিলাম, 'বসব।'

উপরে আসিয়া সত্যবতীর কাছে একটু বকুনি খাইলাম। শীত ঋতুতে রাত্রি সওয়া ন'টা কম নয়। কিন্তু অনেকদিন পরে ব্রিজ খেলিয়া মনটা ভরাট ছিল, সত্যবতীর বকুনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম।

অতঃপর প্রত্যহ আমাদের তাসের আড্ডা বসিতে লাগিল; ঘরে সন্ধ্যাবাতি জ্বালার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সভা বসে, রাত্রি ন'টা পর্যন্ত চলে। পাঁচ ছয় দিনে এই তিনটি মানুষ সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিল। ভূপেশবাবু সহৃদয় মিষ্টভাষী অতিথি-বৎসল, ব্রিজ খেলার প্রতি গাঢ় অনুরাগ। রামবাবু একটু গম্ভীর প্রকৃতির; বেশী কথা বলেন না, কেহ খেলায় ভুল করিলে তর্ক করেন না। বনমালীবাবু রামবাবুকে অতিশয় শ্রদ্ধা করেন, তাঁহার অনুকরণে ভারিক্কি হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। দু'জনেই অল্পভাষী; তাস খেলার প্রতি গভীর আসক্তি। দু'জনেরই কথায় সামান্য পূর্ববঙ্গের টান আছে।

ছয় দিন আনন্দে তাস খেলিতেছি, আমাদের আড্ডা একটি চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় নীচের তলায় একটি মারাত্মক ব্যাপার ঘটিয়া আমাদের সভাটিকে টলমল করিয়া দিল। নীচের তলাব

একমাত্র বাসিন্দা নটবর নস্কর হঠাৎ খুন হইলেন। তাঁহার সহিত অবশ্য আমাদের কোনই সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু মাঝগঙ্গা দিয়া জাহাজ যাইলে তাহার ঢেউ তীরে আসিয়া লাগে।

সেদিন সাড়ে ছ'টার সময় একটি র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া আমি আড্ডায় যাইবার জন্য বাহির হইলাম। আমার একটু দেরি হইয়া গিয়াছে, তাই সিঁড়ি দিয়া চটি ফটফট্ করিয়া তাড়াতাড়ি নামিতেছি। শেষের ধাপে পেঁছিয়াছি এমন সময় দুম করিয়া একটি শব্দ শুনিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। শব্দটা কোথা হইতে আসিল ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। রাস্তায় হয়তো মোটর ব্যাক-ফায়ার করিয়াছে, কিন্তু বেশ জোর আওয়াজ। রাস্তা হইতে এত জোর আওয়াজ আসিবে না।

ক্ষণকাল থামিয়া আমি আবার নামিয়া ভূপেশবাবুর ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরে আলো জ্বলিতেছে, দেখিলাম ভূপেশবাবু পাশের দিকের জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের পানে কিছু দেখিতেছেন, রামবাবু ও বনমালীবাবু তাঁহার পিছন হইতে জানালা দিয়া উঁকি মারিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি যখন প্রবেশ করিলাম, তখন ভূপেশবাবু উত্তেজিত স্বরে বলিতেছেন, 'ঐ—ঐ—গলি থেকে বেরিয়ে গেল, দেখতে পেলেন? গায়ে বাদামী রঙের আলোয়ান '

আমি পিছন হইতে বলিলাম, 'কি ব্যাপার?'

সকলে ফিরে দিকে ফিরিলেন। ভূপেশবাবু বলিলেন, 'আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন? এই জানলার নীচের গলি থেকে এল। সবেমাত্র জানলাটি খুলেছি অমনি নীচে দুম্ করে শব্দ। গলা বাড়িয়ে দেখলাম একটা লোক তাড়াতাড়ি গলি দিকে বেরিয়ে গেল।'

আমাদের বাসাবাড়িটি সদর রাস্তার উপর। বাড়ির পাশ দিয়া একটি ইট-বাঁধানো সরু কানা গলি বাড়ির খিড়কির সহিত সদর রাস্তার যোগসাধন করিয়াছে, বাসার চাকর বাকর সেই পথে যাতায়াত করে। আমার একটু খটকা লাগিল। বলিলাম, 'এই ঘরের নীচের ঘরে এক ভদ্রলোক থাকেন। তাঁর ঘর থেকে শব্দটা আসে নি তো?'

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'কি জানি। আমার ঘরের নীচে এক ভদ্রলোক থাকেন বটে, কিন্তু তাঁর নাম জানি না।'

রামবাবু ও বনমালীবাবু মুখ তাকাতাকি করিলেন, তারপর রামবাবু গলা ঝাড়া দিয়া বলিলেন, 'নীচের ঘরে থাকেন নটবর নস্কর।'

বলিলাম, 'চলুন। তিনি যদি ঘরে থাকেন, বলতে পারবেন কিসের আওয়াজ।'

ওঁদের তিনজনের বিশেষ আগ্রহ ছিল না, কিন্তু আমি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের বন্ধু, আমি শব্দের মূল অনুসন্ধান না করিয়া ছাড়িব কেন? বলিলাম, 'চলুন, চলুন, একবারটি দেখে এসেই খেলায় বসা যাবে। শব্দটি যদি স্বাভাবিক শব্দ হতো তাহলে কথা ছিল না, কিন্তু গলি দিয়ে একটা লোক এসে যদি নটবরবাবুর ঘরে চিনে-পট্‌কা ছুঁড়ে থাকে তাহলেও তো খোঁজ নেওয়া দরকার।'

অনিচ্ছাভরে তিনজন আমার সঙ্গে চলিলেন।

নীচের তলায় ম্যানেজার শিবকালীবাবুর অফিসে তালা ঝুলিতেছে, স্টোর-রুমের দ্বারও বন্ধ। ভোজনকক্ষটি খোলা আছে, কারণ সেখানে কয়েকটি কাঠের পিঁড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই। কেবল নটবরবাবুর দরজা ভেজানো রহিয়াছে, বাহিরে তালা লাগানো নাই। সুতরাং তিনি ঘরেই আছেন এরূপ অনুমান করা

অন্যায় হইবে না। আমি ডাক দিলাম, 'নটবরবাবু!'

সাড়া নাই। আর একবার অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়াও যখন উত্তর পাওয়া গেল না, তখন আমি আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিলাম। দরজা একটু ফাঁক হইল।

ঘর অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না; কিন্তু একটা মৃদু গন্ধ নাকে আসিল। বারুদের গন্ধ! আমরা সচকিত দৃষ্টি বিনিময় করিলাম।

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'দোরের পাশে নিশ্চয় আলোর সুইচ আছে। দাঁড়ান, আমি আলো জ্বালছি।'

তিনি আমাকে সরাইয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিলেন, তারপর হাত বাড়াইয়া সুইচ খুঁজিতে লাগিলেন। কট্ করিয়া শব্দ হইল, আলো জ্বলিয়া উঠিল।

মাথার উপর বিদ্যুতের নির্মম আলোকে প্রথম যে বস্তুটি চোখে পড়িল তাহা নটবরবাবুর মৃতদেহ। তিনি ঘরের মাঝখানে হাত-পা ছড়াইয়া চিত হইয়া পড়িয়া আছেন; পরিধানে সাদা সোয়েটার ও ধুতি। সোয়েটারের বুকের নিকট হইতে গাঢ় রক্ত গড়াইয়া পড়িয়াছে। নটবর নস্কর জীবিত অবস্থাতেও খুব সুদর্শন পুরুষ ছিলেন না, দোহারা পেটমোটা গ্যেছের শরীর, হাম্‌দো মুখে গভীর বসন্তের দাগ, কিন্তু মৃত্যুতে তাঁহার মুখখানা আরো বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। সে বীভৎসতার বর্ণনা দিব না। মৃত্যুভয় যে কিরূপ কুৎসিত আবেগ তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া বোঝা যায়।

কিছুক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিবার পর রামবাবু গলার মধ্যে হেঁচ্‌কি তোলার মত শব্দ করিলেন। দেখিলাম তিনি মোহাবিষ্ট অবিশ্বাস ভরা চোখে মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া আছেন। বনমালীবাবু হঠাৎ তাঁহার একটা হাত খামচাইয়া ধরিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন, 'দাদা, নটবর নস্কর মরে গেছে!' তাঁহার অভিব্যক্তি দুঃখের কিংবা বিস্ময়ের কিংবা আনন্দের ঠিক ধরিতে পারিলাম না।

ভূপেশবাবু শুষ্কমুখে বলিলেন, মরে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। বন্দুকের গুলিতে মরেছে!—ঐ যে। ঐ যে। জানালার ওপর দেখতে পাচ্ছেন?'

গরাদ-যুক্ত জানালা খোলা রহিয়াছে, তাহার পৈঠার উপর একটি পিস্তল। চিত্রটি স্পষ্ট হইয়া উঠিলঃ জানালার বাহিরের গলিতে দাঁড়াইয়া আততায়ী নটবর নস্করকে গুলি করিল, তারপর পিস্তলটি জানালার পৈঠার উপর রাখিয়া প্রস্থান করিল।

এই সময় পিছন দিকে দ্রুত পদশব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইলাম। মেসের ম্যানেজার শিবকালী চক্রবর্তী আসিতেছেন। তাঁহার চিমড়ে চেহারা, গতি অকারণে ক্ষিপ্র চোখের দৃষ্টি অকারণে ব্যাকুল; কথা বলিবার সময় একই কথা একাধিকবার উচ্চারণ না করিয়া শান্তি পান না। তিনি আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, 'আপনারা এখানে? এখানে? কি হয়েছে? কি হয়েছে?'

'নিজের চোখেই দেখুন'—আমরা দ্বারের সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলাম। শিবকালীবাবু রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠিলেন, 'অ্যাঁ! এ কি—এ কি। নটবর নস্কর মারা গেছেন। রক্ত, রক্ত! কি করে মারা গেলেন?'

জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলাম, 'ঐদিকে দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

পিস্তল দেখিয়া শিবকালীবাবু আবার ত্রাসোক্তি করিলেন,—'অ্যাঁ—পিস্তল—পিস্তল! পিস্তলের গুলিতে নটবরবাবু খুন হয়েছেন! কে খুন করেছে—কখন

খুন করেছে?'

বলিলাম, 'কে খুন করেছে জানি না, কিন্তু কখন খুন করেছে বলতে পারি। মিনিট পাঁচেক আগে।'

সংক্ষেপে পরিস্থিতি বুঝাইয়া দিলাম। তিনি ব্যাকুল নেত্রে মৃতদেহের পানে চাহিয়া রহিলেন।

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, হঠাৎ চোখে পড়িল, শিবকালীবাবুর গায়ে বাদামী রঙের আলোয়ান। বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। বুকের ধড়্‌ফড়ানি দমন করিয়া বলিলাম, 'আপনি কি বাসায় ছিলেন না? বেরিয়েছিলেন?'

তিনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিলেন, 'অ্যাঁ- আমি কাজে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু— কিন্তু– এখন উপায়? কর্তব্য কী- কর্তব্য?'

বলিলাম, 'প্রথম কর্তব্য পুলিসকে খবর দেওয়া।'

শিবকালীবাবু বলিলেন, 'তাই তো, তাই তো। ঠিক কথা—ঠিক কথা! কিন্তু, আমার তো টেলিফোন নেই। অজিতবাবু, আপনাদের টেলিফোন আছে, আপনি যদি-'

আমি বলিলাম, 'এখনি পুলিসকে টেলিফোন করছি।—আপনারা কিন্তু ঘরে ঢুকবেন না, যতক্ষণ না পুলিস আসে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকুন।'

আমি তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিলাম। ঘরে প্রবেশ করিতে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব চোখে পড়িল। আমার গায়েও বাদামী রঙের আলোয়ান।

আমাদের পাড়ার তৎকালীন দারোগা প্রণব গুহ মহাশয়ের সহিত আমাদের পরিচয় ছিল। কর্মপটু বয়স্থ লোক, কিন্তু ব্যোমকেশের প্রতি তিনি প্রসন্ন ছিলেন না। অবশ্য তাঁহার অপ্রসন্নতা কোনো প্রকার বাক্‌-পারুষ্য বা রূঢ়তার মাধ্যমে প্রকাশ পাইত না, ব্যোমকেশকে তিনি অতিরিক্ত সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক কথা বলিয়া কথার শেষে অনুচ্চস্বরে একটু হাসিতেন। বোধ হয় দুইজনের মনের ধাতুগত বিরোধ ছিল; তা ছাড়া সরকারী কার্যকলাপে বে-সরকারী স্থূল হস্তাবলেপ প্রণববাবু পছন্দ করিতেন না।

টেলিফোনে আমার বার্তা শুনিয়া তিনি ব্যঙ্গভরে বলিলেন, 'বলেন কি! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, সর্ষের মধ্যে ভূত! তা ব্যোমকেশবাবু যখন রয়েছেন তখন আমাকে আর কী দরকার? তিনিই তদন্ত করুন।'

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'ব্যোমকেশ কলকাতায় নেই, থাকলে অবশ্য করত।'

প্রণব দারোগা বলিলেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি যাচ্ছি।' খিক্‌ খিক্‌ হাস্য করিয়া তিনি ফোন রাখিয়া দিলেন। আমি আবার নীচের তলায় নামিয়া গেলাম।

আধ ঘণ্টা পরে প্রণববাবু দলবল লইয়া আসিলেন। আমাকে দেখিয়া খিক্‌খিক্‌ হাসিলেন, তারপর গম্ভীর হইয়া লাশ তদারক করিলেন। জানালা হইতে পিস্তলটি রুমালে জড়াইয়া সন্তর্পণে পকেটে রাখিলেন। অবশেষে লাশ চালান দিয়া ঘরের একটি মাত্র চেয়ারে বসিয়া বাসার সকলকে জেরা আরম্ভ করিলেন।

আমি যাহা জানিতাম বলিলাম। বাকি সকলের বয়ান সংক্ষেপে লিখিতেছি—

ম্যানেজার শিবকালীবাবু ব্রহ্মচারী ব্রতধারী পুরুষ, অর্থাৎ অবিবাহিত। পঁচিশ বছর ধরিয়া মেস চালাইতেছেন, এই মেসই তাঁহার স্ত্রী-পুত্র পরিবার।... নটবর নস্কর প্রায় তিন বছর পূর্বে নীচের তলার এই ঘরটিতে বাসা বাঁধিয়াছিলেন,

তদবধি এখানেই ছিলেন। তাঁহার বয়স অনুমান পঞ্চাশ, কাহারো সহিত বেশি মেলামেশা ছিল না। রামবাবু এবং বনমালীবাবু কালে ভদ্রে তাঁহার ঘরে আসিতেন। শিবকালীবাবুর সহিত নটবর নস্করের অপ্রীতি ছিল না, কারণ নটবর প্রতি মাসের পয়লা তারিখে মেসের পাওনা চুকাইয়া দিতেন।...শিবকালীবাবু আজ বিকালে খবর পাইয়াছিলেন যে, কোনো এক গুদামে সস্তায় আলু পাওয়া যাইতেছে, তাই তিনি আলু কিনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু আলু পূর্বেই বিক্রি হইয়া গিয়াছিল, তিনি শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ভূপেশবাবু বীমা কোম্পানীতে চাকরি করেন, মাস দেড়েক হইল বদলি হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। বয়স পঁয়তাল্লিশ, বিপত্নীক, নিঃসন্তান। গৃহ বলিতে কিছু নাই, কর্মসূত্রে ভারতের যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তাস খেলায় দল বাঁধা এবং আজ সন্ধ্যার ঘটনা ভূপেশবাবু যথাযথ বর্ণনা করিলেন, বাদামী আলোয়ান গায়ে লোকটারও উল্লেখ করিলেন। লোকটার মুখ তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই, অপসরণশীল মানুষের মুখ পিছন হইতে দেখা যায় না; ভবিষ্যতে তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবেন এমন সম্ভাবনা কম।

রামচন্দ্র রায় ও বনমালী চন্দের এজাহার প্রায় একই প্রকার। লক্ষ্য করিলাম, রামবাবু ধীরস্থিরভাবে উত্তর দিলেও বনমালীবাবু একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা পূর্বে ঢাকায় ছিলেন, একসঙ্গে একটি বিলাতী কোম্পানীতে চাকরি করিতেন। দেশ বিভাগের হাঙ্গামায় তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র পরিবার সকলেই নিহত হয়, তাঁহারা অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসেন। রামবাবুর বয়স আটচল্লিশ, বনমালীবাবুর পঁয়তাল্লিশ। তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া এই মেসে আছেন এবং একটি ব্যাঙ্কে কাজ করিতেছেন। এইভাবে তিন বছর কাটিয়াছে।

তাঁহাদের ব্রিজ খেলার শখ আছে, কিন্তু কলিকাতায় আসার পর খেলার সুযোগ হয় নাই। কয়েকদিন আগে ভূপেশবাবু নিজের ঘরে ব্রিজ খেলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; সেই অবধি বেশ আনন্দে সন্ধ্যা কাটিতেছিল। তারপর আজ তাঁহারা ভূপেশবাবুর ঘরে পদার্পণ করিবার পাঁচ মিনিট পরে হঠাৎ গলির মধ্যে দুম্ করিয়া আওয়াজ হইল।...নটবরবাবুর সহিত তাঁহাদের ঢাকায় আলাপ ছিল; সামান্য আলাপ, বেশি ঘনিষ্ঠতা নয়। নটবরবাবু ঢাকায় নানাপ্রকার দালালির কাজ করিতেন। এখানে একই মেসে থাকার জন্য তাঁহাদের মাঝে-মধ্যে দেখাশোনা হইত; রামবাবু ও বনমালীবাবু এই ঘরে আসিয়া গল্পসল্প করিতেন। নটবরবাবুর অন্য কোন বন্ধুবান্ধব আছে কিনা তাঁহারা জানেন না।.. বাদামী আলোয়ান গায়ে লোকটাকে তাঁহারা গলির মোড়ে সন্ধ্যার আবছায়া আলোয় পলকের জন্য দেখিয়াছিলেন, আবার দেখিলে চিনিতে পারিবেন না।

মেসে অন্য যাঁহারা থাকেন তাঁহারা কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। দ্বিতলের অন্য প্রান্তে একটি ঘরে পাশার আড্ডা বসিয়াছিল; চারজন খেলুড়ে এবং আরো গুটিচারেক দর্শক সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা বন্দুকের শব্দ শুনিতে পান নাই। মেসের কাহারো সঙ্গে নটবরবাবুর সামান্য মুখ চেনাচেনি ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক ছিল না।

কেবল মেসের ভৃত্য হরিপদ একটা কথা বলিল যাহা অবান্তর হইতে পারে আবার অর্থপূর্ণ হইতে পারে। সন্ধ্যা ছয়টার সময় দ্বিতলের সুরেনবাবু হরিপদকে পাঠাইয়াছিলেন মোড়ের হোটেল হইতে আলুর চপ্ কিনিয়া

আনিতে। চপ্ কিনিয়া খিড়কির পথে ফিরিবার সময় হরিপদ শুনিতে পাইয়াছিল, নটবরবাবুর ঘরে কেহ আসিয়াছে এবং মৃদুগুঞ্জনে কথা বলিতেছে। নটবরবাবুর দরজা ভেজানো ছিল বলিয়া ঘরের ভিতর কে আছে হরিপদ দেখিতে পায় নাই; গলার স্বরও চিনিতে পারে নাই। নটবরবাবুর ঘরে কেহ বড় একটা আসে না, তাই হরিপদ বিশেষ করিয়া ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল। সময় সম্বন্ধে সে স্পষ্টভাবে কিছু বলিতে পারিল না, তবে সুরেনবাবু স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে তিনি সন্ধ্যা ছটার সময় চপ্ আনিতে দিয়াছিলেন।

অর্থাৎ মৃত্যুর আধ ঘণ্টা আগে নটবরবাবুর ঘরে লোক আসিয়াছিল। মেসের কেহ নয়, কারণ কেহই স্বীকার করিল না যে, সে নটবরবাবুর ঘরে গিয়াছিল। সুতরাং বাহিরের লোক। হয়তো বাদামী আলোয়ান গায়ে লোকটা। কিংবা অন্য কেহ; হরিপদর এজেহার হইতে কিছুই ধরা-ছোঁয়া যায় না।

সকলের এজেহার লিখিত হইবার পর প্রণব দারোগা বলিলেন, 'আপনারা এখন যেতে পারেন, আমরা ঘর খানাতল্লাশ করব। হ্যাঁ অজিতবাবু এবং শিবকালী-বাবুকে জানিয়ে দিচ্ছি, যতদিন খুনের কিনারা না হয়, ততদিন আপনারা আমার অনুমতি না নিয়ে কলকাতার বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন না।'

অবাক হইয়া বলিলাম, 'তার মানে?'

প্রণব দারোগা বলিলেন, 'তার মানে, আপনার এবং শিবকালীবাবুর গায়ে বাদামী রঙের আলোয়ান রয়েছে! খিক্‌খিক্।— আচ্ছা আসুন।'

তিনি আমাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমরা যে যার কোটরে ফিরিয়া আসিলাম। তাস খেলার কথা মনেই রহিল না।

পরের দিনটা নিষ্ক্রিয় বৈচিত্র্যহীনভাবে কাটিয়া গেল। পুলিসের দিক হইতে সাড়াশব্দ নাই। প্রণব দারোগা গত রাত্রে নটবরবাবুর ঘর খানাতল্লাশ করিয়া দ্বারে তালা লাগাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিছু কাগজপত্র লইয়া গিয়াছেন। লোকটি আমাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন; কিন্তু এমন মিষ্টভাবে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন যে, কিছু বলিবার থাকে না। তিনি জানেন আমার অকাট্য অ্যালিবাই আছে, তবু তুচ্ছ ছুতা করিয়া আমার উপর কলিকাতা ত্যাগের নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া গেলেন। আমি ব্যোমকেশের বন্ধু, তাই আমাকে উত্ত্যক্ত করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

সকালবেলা মেসের বাবুরা নিজ নিজ অফিসে চলিয়া গেলেন। কাহারো মনে কোনো বিকার নাই। নটবর নস্কর নামক যে মানুষটি তিন বছর মেসে ছিলেন, তিনি যে বন্দুকের গুলিতে মারা গিয়াছেন সেজন্য কাহারো আক্ষেপ নাই। "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে"- সকলেরই এইরূপ একটি পার-মার্থিক মনোভাব।

সন্ধ্যাবেলা ভূপেশবাবুর ঘরে গেলাম। রামবাবু ও বনমালীবাবুও উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেরই একটু নিস্তেজ অবস্থা। খেলার কথা আজ কেহ উল্লেখ করিল না। চা পান করিতে করিতে মনমরা ভাবে নটবর নস্করের মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এবং পুলিসের অকর্মণ্যতার নিন্দা করিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে একটা আইডিয়া মাথায় আসিল। প্রণব দারোগা যত কর্মকুশলই হোন তাঁহার দ্বারা নটবরবাবুর খুনের কিনারা হইবে না। ব্যোমকেশ এখানে নাই, তাসের আড্ডা ম্রিয়মাণ, এ অবস্থায় নিষ্কর্মার মত

বসিয়া না থাকিয়া আমি যদি ঘটনাটি লিখিয়া রাখি তাহা হইলে মন্দ হয় না। আমারো কিছু করা হইবে এবং ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিয়া আমার লেখা পড়িলে হয়তো খুনের একটা হেস্তনেস্ত করিতে পারিবে।

রাত্রেই লিখিতে বসিয়া গেলাম। ব্যোমকেশ যাহাতে খুঁত ধরিবার সুযোগ না পায় এমনি ভাবে ঘটনার ভূমিকা হইতে আরম্ভ করিয়া আমার দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্ত খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করিলাম। লেখা শেষ হইল পরদিন অপরাহ্নে।

লেখা শেষ হইল বটে কিন্তু কাহিনীটি শেষ হইল না। কবে কোথায় গিয়া নটবরবাবুর হত্যা কাহিনী শেষ হইবে কে জানে। হয়তো হত্যাকারীর নাম চিরদিন অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। একটু অপরিতৃপ্ত মন লইয়া সবেমাত্র সিগারেট ধরাইয়াছি এমন সময় সুটকেশ হাতে গুটিগুটি ব্যোমকেশ প্রবেশ করিল।

আমি লাফাইয়া উঠিলাম, 'আরে! তুমি ফিরে এসেছ! কাজ শেষ হয়ে গেল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাজ এখনো আরম্ভই হয়নি। সরকারের দুই দপ্তরে ঝগড়া বেধে গেছে। আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি কাড়াকাড়ি। দেখে শুনে আমি চলে এলাম। ওদের কামড়া-কামড়ি থামলে আবার যাব।'

সত্যবতী ভিতর হইতে ব্যোমকেশের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিল, আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে আসিল। তাহাদের দাম্পত্য জীবন নূতন নয় কিন্তু এখনো ব্যোমকেশকে অপ্রত্যাশিতভাবে কাছে পাইলে সত্যবতীর চোখে আনন্দবিহ্বল জ্যোতি ফুটিয়া ওঠে।

দাম্পত্য পুনর্মিলনের পালা শেষ হইলে আমি নটবর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম এবং লেখাটি পড়িতে দিলাম। ব্যোমকেশ চায়ে চুমুক দিতে দিতে পড়িল।

সন্ধ্যা ছ'টা বাজিলে সে লেখাটা আমাকে ফেরত দিয়া বলিল, 'প্রণব দারোগা তোমাকে শহরবন্দী করে রেখেছে। লোকটা যে আমাদের কী চোখেই দেখেছে! কাল তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। চল, আজ ভূপেশবাবুর সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

বুঝিলাম ব্যোমকেশ আকৃষ্ট হইয়াছে। খুশী হইয়া বলিলাম, 'চল। রামবাবু আর বনমালীবাবুর সঙ্গেও দেখা হতে পারে।'

দ্বিতলে ভূপেশবাবুর ঘরে ব্যোমকেশকে লইয়া গেলাম। আমার অনুমান মিথ্যা নয়, রামবাবু ও বনমালীবাবু উপস্থিত আছেন। পরিচয় করাইয়া দিতে হইল না, সকলেই ব্যোমকেশের চেহারার সঙ্গে পরিচিত। ভূপেশবাবু সমাদরের সহিত ব্যোমকেশকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং চায়ের জল চড়াইলেন। রামবাবুর গাম্ভীর্য অটল রহিল, কিন্তু বনমালীবাবুর চোখে ত্রস্ত সতর্কতা উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ একটি চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিল, 'আমারও এক সময় ব্রিজের নেশা ছিল। তারপর অজিত দাবা খেলতে শিখিয়েছিল। কিন্তু এখন আর খেলা-ধুলো ভাল লাগে না।'

ভূপেশবাবু স্টোভের উপর ফুটন্ত জলে চায়ের পাতা ছাড়িতে ছাড়িতে তাহার দিকে ঘাড় ফিরাইলেন, হাসিমুখে বলিলেন, 'এখন শুধু পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা!'

ভূপেশবাবুর মুখে রবীন্দ্র কাব্য শুনিয়া একটু চমকিত হইলাম। তিনি বীমার অফিসে চাকরি করেন আবার কাব্যচর্চাও করেন!

ব্যোমকেশ শুষ্ক ভাবে বলিল, 'ঠিক বলেছেন। মৃত্যুর সঙ্গে সারাজীবন খেলা করে করে এমন অবস্থা হয়েছে যে হালকা খেলায় আর মন বসে না।'

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'আপনার কথা স্বতন্ত্র। আমিও মৃত্যু নিয়ে কারবার করি, বীমার কাজ মৃত্যু ব্যবসা ছাড়া আর কী বলুন? কিন্তু আমার এখনো ব্রিজ খেলতে ভাল লাগে।'

ব্যোমকেশ ভূপেশবাবুর সঙ্গে কথা বলিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার চক্ষু রামবাবু এবং বনমালীবাবুর দিকেই ঘোরাফেরা করিতেছিল। তাঁহারা নির্বাক বসিয়াছিলেন, এই ধরনের হাল্কা অথচ মার্জিত-রুচি বাক্যালাপের সঙ্গে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা নাই।

ভূপেশবাবু চায়ের পেয়ালা এবং ক্রীমকেকার আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন। ব্যোমকেশ যেন চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'আপনিও স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ। ব্রিজ খেলা বুদ্ধির খেলা, যাদের বুদ্ধি আছে তারা স্বভাবতই এই খেলার দিকে আকৃষ্ট হয়। কেউ কেউ জীবন-যন্ত্রণা থেকে কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তি পাবার আশায় তাস খেলতে বসে। আমি অনেকদিন আগে একজনকে জানতাম, সে পুত্রশোক ভোলাবার জন্যে ব্রিজ খেলত।'

তিনজনের চক্ষু যেন যন্ত্রচালিতবৎ ব্যোমকেশের দিকে ফিরিল। কেহ কোন কথা বলিলেন না, কেবল বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া রহিলেন। ঘরের মধ্যে একটি গুরুভার নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিল।

নীরবে চা-পান সম্পন্ন হইল। তারপর ব্যোমকেশ রুমালে মুখ মুছিয়া সহজ সুরে নীরবতা ভঙ্গ করিল, "আমি কটকে গিয়েছিলাম, আজই বিকেলবেলা ফিরেছি। ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অজিত আমাকে নটবর নস্করের মৃত্যুর খবর জানালো। নটবরবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না, কিন্তু তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনে কৌতূহল হল। নিজের দোরগোড়ায় হত্যাকাণ্ড বড় একটা দেখা যায় না। তাই ভাবলাম আপনাদেব সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'ভাগ্যিস হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছিল তাই আমার ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। আমি কিন্তু নটবর নস্কর সম্বন্ধে কিছু জানি না, জীবিত অবস্থায় তাকে চোখেও দেখিনি। রামবাবু আর বনমালীবাবুর সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল।'

ব্যোমকেশ রামবাবুর পানে তাকাইল। রামবাবুর গাম্ভীর্যের উপর যেন ঈষৎ শঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে। তিনি উস্‌খুস্‌ করিলেন, একবার গলা ঝাড়া দিয়া কিছু বলিবার উপক্রম করিয়া আবার মুখ বন্ধ করিলেন। ব্যোমকেশ তখন বনমালীবাবুর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল, 'নটবরবাবু কেমন লোক ছিলেন আপনি নিশ্চয় জানেন?'

বনমালীবাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ—তা—লোক মন্দ নয়—বেশ ভালই লোক ছিলেন—তবে—'

এতক্ষণে রামবাবু বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইলেন, তিনি বনমালীবাবুর অসমাপ্ত কথার মাঝখানে বলিলেন, 'দেখুন, নটবরবাবুর সঙ্গে আমাদের মোটেই ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবে যখন ঢাকায় ছিলাম তখন নটবরবাবু পাশের বাড়িতে থাকতেন, তাই সামান্য মুখ চেনাচেনি ছিল। ওঁর চরিত্র সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'কতদিন আগে আপনারা ঢাকায় ছিলেন?'

রামবাবু ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, 'পাঁচ ছয় বছর আগে। তারপর দেশ ভাগাভাগির দাঙ্গা শুরু হল, আমরা পশ্চিমবঙ্গে চলে এলাম।'

ব্যোমকেশ বনমালীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঢাকায় আপনারা দুজনে একই অফিসে চাকরি করতেন বুঝি?'

বনমালীবাবু বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। গডফ্রে ব্রাউন কোম্পানীর নাম শুনেছেন, মস্ত বিলিতি কোম্পানী। আমরা সেখানেই—'

তাঁহারা কথা শেষ হইবার পূর্বেই রামবাবু সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'বনমালি! আজ সাতটার সময় নারায়ণবাবুর বাসায় যেতে হবে মনে আছে?—আচ্ছা, আজ আমরা উঠি।'

বনমালীকে সঙ্গে লইয়া রামবাবু দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্যোমকেশ ঘাড় ফিরাইয়া তাঁহাদের নিষ্ক্রমণ ক্রিয়া দেখিল।

ভূপেশবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার প্রশ্নগুলি শুনতে খুবই নিরীহ, কিন্তু রামবাবুর আঁতে ঘা লেগেছে।'

ব্যোমকেশ ভালমানুষের মত বলিল, 'কেন আঁতে ঘা লাগল বুঝতে পারলাম না। আপনি কিছু জানেন?'

ভূপেশবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'কিছুই জানি না। দাঙ্গার সময় আমি অবশ্য ঢাকায় ছিলাম, কিন্তু ওঁদের সঙ্গে তখন পরিচয় ছিল না। ওঁদের অতীত সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।'

'দাঙ্গার সময় আপনিও ঢাকায় ছিলেন?'

'হ্যাঁ, দাঙ্গার বছরখানেক আগে ঢাকায় বদলি হয়েছিলাম, দেশ ভাগ হবার পর ফিরে আসি।'

কিছুক্ষণ কোনো কথা হইল না। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল। ভূপেশবাবু কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি যে গল্প বললেন, পুত্রশোক ভোলবার জন্যে একজন ব্রিজ খেলত, সেটা কি সত্যি গল্প?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, সত্যি গল্প। অনেক দিন আগের কথা, আমি তখন কলেজে পড়তাম। কেন বলুন দেখি?'

ভূপেশবাবু উত্তর দিলেন না, উঠিয়া গিয়া দেরাজ হইতে একটি ফটোগ্রাফ আনিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিলেন। একটি নয়-দশ বছরের ছেলের ছবি; কৈশোরের লাবণ্যে মুখখানি টুলটুল করিতেছে। ভূপেশবাবু অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'আমার ছেলে!'

ছবি হইতে ভূপেশবাবুর মুখের পানে উৎকণ্ঠিত চক্ষু তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ছেলে—'

ভূপেশবাবু ঘাড় নাড়িলেন, 'মারা গেছে। ঢাকায় যেদিন দাঙ্গা শুরু হয় সেদিন স্কুলে গিয়েছিল, স্কুল থেকে আর ফিরে এল না।'

দুর্বহ মৌন ভঙ্গ করিয়া ব্যোমকেশ অর্ধোচ্চারিত প্রশ্ন করিল, 'আপনার স্ত্রী—?'

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'সেও মারা গেছে। হার্ট দুর্বল ছিল, পুত্র শোক সইতে পারল না। আমি মরলাম না, ভুলতেও পারলাম না। পাঁচ ছয় বছর কেটে গেছে, এতদিনে ভুলে যাবার কথা। কিন্তু কাজ করি, তাস খেলি, হেসে খেলে বেড়াই, তবু ভুলতে পারি না। ব্যোমকেশবাবু, শোকের স্মৃতি মুছে ফেলবার কি কোনো

ওষুধ আছে?'

ব্যোমকেশ গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'একমাত্র ওষুধ মহাকাল।'

২

পরদিন সকালে চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, শ্রীমৎ প্রণবানন্দ স্বামীকে দর্শন করে আসা যাক।'

কাল রাত্রে ভূপেশবাবুর জীবনের ট্র্যাজেডি শুনিয়া মনটা ছায়াচ্ছন্ন হইয়া ছিল, প্রণব দারোগার সম্মুখীন হইতে হইবে শুনিয়া আরো দমিয়া গেলাম। বলিলাম, 'প্রণবানন্দ বাবাজীকে দর্শন করা কি একান্ত দরকার?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পুলিসের সন্দেহ থেকে যদি মুক্ত হতে না চাও তাহলে দরকার নেই।'

'চল।'

সাড়ে ন'টার সময় সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে নামিয়া দেখিলাম ভূপেশবাবুর দ্বারে তালা লাগানো। তিনি নিশ্চয় অফিসে গিয়াছেন। তিন নম্বর ঘর হইতে রামবাবু ও বনমালীবাবু শড়াচড়া পরিয়া বাহির হইতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশ আমার পানে চোখ বাঁকাইয়া হাসিল।

নীচের তলায় শিবকালীবাবু অফিসে বসিয়া হিসাব দেখিতেছিলেন, ব্যোমকেশকে দেখিতে পাইয়া লাফাইয়া দ্বারের কাছে আসিলেন, ব্যাকুল চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু! কটক থেকে কবে এলেন—কখন এলেন? নটবর নস্করের কথা শুনেছেন তো! কি মুশকিল দেখুন দেখি, পুলিস আমাকে ধরে টানাটানি করছে নাহক টানাটানি করছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শুধু আপনাকে নয়, অজিতকে নিয়েও টানাটানি করছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো, তাই তো। বাদামী র‍্যাপার! মানে হয় না—মানে হয় না।—আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।'

'দেখি চেষ্টা করে।'

রাস্তায় নামিয়া ব্যোমকেশ থমকিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'এস, গলিটা দেখে যাই।'

'গলিটা' মানে আমাদের বাসার পাশের গলি, যে গলি দিয়া বাদামী আলোয়ান গায়ে লোকটা নটবরবাবুকে গুলি করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। অত্যন্ত সংকীর্ণ গলি, দুইজন মানুষ পাশাপাশি হাঁটিতে পারে না। আমরা আগে পিছে গলিতে প্রবেশ করিলাম; ব্যোমকেশ ইট-বাঁধানো মেঝের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। তাহার মনে কী আছে জানি না, কিন্তু তিন দিন পরে গলির মধ্যে হত্যাকারীর কোনো নিশানা পাওয়া যাইবে ইহা আশা করাও দুরাশা।

নটবরবাবুর ঘরের জানালা বন্ধ। ব্যোমকেশ সেইখানে গিয়া ইট-বাঁধানো জমির উপর সন্ধানী চক্ষু বুলাইতে লাগিল। জানালাটি গলি হইতে চার ফুট উঁচুতে অবস্থিত, কপাট খোলা থাকিলে গলিতে দাঁড়াইয়া স্বচ্ছন্দে ঘরের মধ্যে গুলি চালানো যায়।

'ওটা কিসের দাগ?'

ব্যোমকেশের অঙ্গুলি নির্দেশ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, ঠিক জানালার নীচে ইট-বাঁধানো মেঝের উপর পাঁশুটে রঙের একটা দাগ রহিয়াছে; তিন ইঞ্চি ব্যাসের নক্ষত্রাকার একটা দাগ। গলিতে মাঝে মাঝে ঝাঁট পড়ে, কিন্তু সম্মার্জনীর তাড়না সত্ত্বেও দাগটা মুছিয়া যায় নাই। দুই তিন দিনের পুরোনো দাগ মনে হয়।

বলিলাম, 'কিসের দাগ?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, হঠাৎ গলির মধ্যে ডন ফেলার ভঙ্গিতে লম্বা হইয়া দাগের উপর নাসিকা স্থাপন করিল। বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'ওকি! মাটিতে নাক ঘষছ কেন?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'নাক ঘষিনি। শুঁকছিলাম।'

'শুঁকছিলে! কেমন গন্ধ?'

'যদি জানতে চাও তুমিও শুঁকে দেখতে পার।'

'আমার দরকার নেই।'

'তাহলে চল থানায়।'

গলি হইতে বাহির হইয়া থানার দিকে চলিলাম। দু'একবার ব্যোমকেশের মুখের পানে অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, কিন্তু রাস্তার গন্ধ শুঁকিয়া সে কিছু পাইয়াছে কিনা বোঝা গেল না।

থানায় প্রণব দারোগা ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার চেহারা মোটের উপর ভালোই, দোহারা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ শরীর; দোষের মধ্যে শরীরের খাড়াই মাত্র পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি।

ব্যোমকেশকে দেখিয়া তাঁহার চোখে প্রথমে বিস্ময়, তারপর ছদ্মবিনয় ভাব ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু! সকালে উঠেই আপনার মুখ দেখলাম—কী সৌভাগ্য। খিক্ খিক্।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার সৌভাগ্যও কম নয়। সকালবেলা বেঁটে মানুষ দেখলে কী ফল হয় তা শাস্ত্রেই লেখা আছে—রথস্থং বামনং দৃষ্টবা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।'

প্রণব দারোগা থতমত খাইয়া গেলেন। ব্যোমকেশ চিরদিন প্রণব দারোগার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার মেজাজ অন্যরকম। প্রণববাবু প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'আমার চেহারা আকাশ-পিদ্দিমের মত নয় তা স্বীকার করি।'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'স্বীকার না করে উপায় নেই। আকাশ পিদ্দিমের মাথায় আলো জ্বলে; ঐখানেই আপনার সঙ্গে তফাত।'

প্রণববাবুর মুখ কালো হইয়া উঠিল, তিনি চেষ্টাকৃত কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, 'কি করব বলুন, সকলের মাথায় তো গ্যাস-লাইট জ্বলে না।—কিছু দরকার আছে কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আছে বইকি। প্রথমত, অজিত যে ফেরারী হয়নি তার প্রমাণ স্বরূপ ওকে ধরে এনেছি। আপনি নির্ভয়ে থাকুন, আমি ওর উপর নজর রেখেছি, আমার দৃষ্টি এড়িয়ে ও পালাতে পারবে না।'

প্রণববাবু অপ্রস্তুতভাবে হাসিবার চেষ্টা করিলেন। ব্যোমকেশ নির্দয়ভাবে বলিয়া চলিল, 'আপনি অজিতকে শহর-বন্দী করে রেখেছেন একথা শুনলে কমিশনার সাহেব কি বলবেন আমি জানি না, কিন্তু জানবার আগ্রহ আছে। দেশে

আইন আদালত আছে, জনসাধারণের স্বাধীনতার ওপর অকারণ হস্তক্ষেপ করলে পুলিস কর্মচারিরও সাজা হতে পারে। যা হোক, এসব পরের কথা। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, নটবর নস্করের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনি কোনো সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছেন কিনা।'

প্রণববাবু এই প্রশ্নের রূঢ় উত্তর দিবেন কিনা চিন্তা করিলেন। কিন্তু ব্যোমকেশকে তাহার বর্তমান মানসিক অবস্থায় ঘাঁটানো উচিত হইবে না বুঝিয়া তিনি ধীরস্বরে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, এই কলকাতা শহরের জনসংখ্যা কত, আপনার জানা আছে কি?'

ব্যোমকেশ তাচ্ছিল্যভাবে বলিল, 'কখনো গুণে দেখিনি, লাখ পঞ্চাশেক হবে।'

প্রণববাবু বলিলেন, 'ধরুন পঞ্চাশ লাখ। এই অর্ধ-কোটি মানুষের মধ্যে থেকে বাদামী আলোয়ান গায়ে একটি লোককে ধরা কি সহজ? আপনি পারেন?'

'সব খবর পেলে হয়তো পারি।'

'বাইরের লোককে সব খবর জানানো যদিও আমাদের রীতি বিরুদ্ধ, তবু যতটুকু জানি আপনাকে বলতে পারি।'

'বেশ, বলুন। নটবর নস্করের আত্মীয় স্বজনের কোনো সন্ধান পাওয়া গেছে?'

'না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি।'

'ময়না তদন্তের ফলাফল কি রকম?'

'বুকের হাড় ফুটো করে গুলি হৃদযন্ত্রে ঢুকেছে। পিস্তলের সঙ্গে গুলি মিলিয়ে দেখা গেছে, গুলি ওই পিস্তল থেকেই বেরিয়েছে।'

'আর কিছু?'

'শরীর সুস্থই ছিল, কিন্তু চোখে ছানি পড়বার উপক্রম হয়েছিল।

'পিস্তলের মালিক কে?'

'মার্কিন ফৌজী পিস্তল, কালোবাজারে কিনতে পাওয়া যায়। মালিকের নাম জানার উপায় নেই।'

'ঘর তল্লাশ করে কিছু পেয়েছেন?'

'দরকারী জিনিস যা পেয়েছি তা ওই টেবিলের ওপর আছে। একটা ডায়েরী, গোটা পাঁচেক টাকা, ব্যাঙ্কের পাস-বুক, আর একটা আদালতের ডিক্রীর বাজাপ্তা নকল। আপনি ইচ্ছে করলে দেখতে পারেন।'

ঘরের কোণে একটা টেবিল ছিল, ব্যোমকেশ উঠিয়া সেইদিকে গেল, আমি গেলাম না। প্রণব দারোগা লোক ভাল নয়, তিনি যদি আপত্তি করেন একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। বসিয়া বসিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ ব্যাঙ্কের খাতা পরীক্ষা করিল, ডায়েরীর পাতা উল্টাইল, স্ট্যাম্প কাগজে লেখা আদালতী দলিল মন দিয়া পড়িল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'দেখা হয়েছে!'

প্রণব দারোগার দুষ্টবুদ্ধি এতক্ষণে আবার চাড়া দিয়াছে, তিনি মিটিমিটি চাহিয়া বলিলেন, 'আমি যা-যা দেখেছি আপনিও তাই দেখলেন। আসামীর নাম-ধাম সব জানতে পেরে গেছেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, পেরেছি।'

ভ্রূ আকাশে তুলিয়া প্রণববাবু বলিলেন, 'বলেন কি! এরি মধ্যে! আপনার তো ভারি বুদ্ধি! তা দয়া করে আসামীর নামটা আমায় বলুন, আমি তাকে গ্রেপ্তার

করে ফেলি।'

ব্যোমকেশ চোয়াল শক্ত করিয়া বলিল, 'আসামীর নাম আপনাকে বলব না দারোগাবাবু; ওটা আমার নিজস্ব আবিষ্কার। আপনি এই কাজের জন্যে মাইনে খান, আপনাকে নিজে থেকে খুঁজে বার করতে হবে। তবে একটু সাহায্য করতে পারি। মেসের পাশের গলিটা খুঁজে দেখবেন।'

'সেখানে আসামী তার পদচিহ্ন রেখে গেছে নাকি! খিক্ খিক্।'

'না, পদচিহ্নের চেয়েও গুরুতর চিহ্ন রেখে গেছে।—আর একটা কথা জানিয়ে যাই। দু'চার দিনের মধ্যেই আমি অজিতকে নিয়ে কটকে চলে যাব। আপনার যদি সাহস থাকে তাকে আটকে রাখুন।—চল অজিত।'

থানা হইতে বাহির হইয়া আমি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম, 'কে আসামী, ধরতে পেরেছ?'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'থানায় আসার আগেই জানতে পেরেছি, কিন্তু প্রণব দারোগা একটা ইয়ে। বুদ্ধি নেই তা নয়, বিপরীত বুদ্ধি। ও কোনো কালে নটবর নস্করের খুনীকে ধরতে পারবে না।'

প্রশ্ন করলাম, 'নটবর নস্করের খুনী কে? চেনা লোক?'

'পরে বলব। আপাতত এইটুকু জেনে রাখো যে, নটবর নস্করের পেশা ছিল ব্ল্যাকমেল করা। তুমি বাসায় ফিরে যাও, আমি অফিস-পাড়ায় যাচ্ছি। কলকাতাতেও গডফ্রে ব্রাউনের প্রকাণ্ড ব্যবসা আছে, তাদের অফিসে কিছু খোঁজ-খবর পাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, আমার ফিরতে দেরি হবে।' হাত নাড়িয়া সে চলিয়া গেল।

আমি একাকী বাসায় ফিরিলাম। ব্যোমকেশ ফিরিল বেলা তখন দেড়টা।

স্নানাহারের পর সে বলিল, 'একটা কাজ করতে হবে; বিকেলবেলা তুমি গিয়ে রামবাবুকে, বনমালীবাবুকে এবং ভূপেশবাবুকে চায়ের নেমন্তন্ন করে আসবে। সন্ধ্যের পর এই ঘরে সভা বসবে।'

'তথাস্তু। কিন্তু ব্যাপার কি! গডফ্রে ব্রাউনের অফিসে গিয়েছিলে কেন?'

'থানার নটবর নস্করের জিনিসগুলোর মধ্যে একটা আদালতের রায় ছিল। সেটা পড়ে দেখলাম রাসবিহারী বিশ্বাস এবং বনবিহারী বিশ্বাস নামে দুই ভাই গডফ্রে ব্রাউন কোম্পানীর ঢাকা ব্রাঞ্চে যথাক্রমে খাজাঞ্চী ও তস্য সহকারী ছিল। সাত বছর আগে তারা অফিসের টাকা চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। মামলা হয় এবং বনবিহারীর দু'বছর ও রাসবিহারীর তিন বছর জেল হয়। সেই মোকদ্দমার রায় নটবর নস্কর যোগাড় করেছিল। তারপর তার ডায়েরী খুলে দেখলাম, প্রতি মাসে সে রাসবিহারী ও বনবিহারী বিশ্বাসের কাছ থেকে আশী টাকা পায়। গডফ্রে ব্রাউনের অফিসে গিয়ে চুরি-ঘটিত মামলার কথা যাচাই করে এলাম। সত্যি ঘটনা। সন্দেহ রইল না, নটবর তাদের ব্ল্যাকমেল করছিল।'

'কিন্তু—রাসবিহারী বনবিহারী—এরা কারা? এদের কোথায় খুঁজে পাবে?'

'বেশি দূর খুঁজতে হবে না, এই মেসের তিন নম্বর ঘরে তাঁদের পাওয়া যাবে।'

'অ্যাঁ! রামবাবু আর বনমালীবাবু!'

'হ্যাঁ। তুমি কাছাকাছি আন্দাজ করেছিলে। ওরা মাসতুত ভাই নয়, সাক্ষাৎ সহোদর ভাই। তবে যদি চোরে চোরে মাসতুত ভাই এই প্রবাদ বাক্যের মর্যাদা রাখতে চাও তাহলে মাসতুত ভাই বলতে পার।'

'কিন্তু—কিন্তু —ওরা তো নটবর নস্করকে খুন করতে পারে না। নটবর যখন খুন হয় তখন তো ওরা--'

হাত তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ধৈর্য ধারণ কর। আগাগোড়া কাহিনী আজ চায়ের সময় শুনতে পাবে।'

মাড়োয়ারীর দোকানের রকমারি ভাজাভুজি ও চা দিয়া অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথমে দেখা দিলেন ভূপেশবাবু। ধুতি পাঞ্জাবির উপর কাঁধে পাট করা ধূসর রঙের শাল, মুখে উৎসুক হাসি। বলিলেন, 'ব্রিজ খেলার ব্যবস্থা আছে নাকি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনারা যদি খেলতে চান ব্যবস্থা করা যাবে।'

কিছুক্ষণ পরে রামবাবু ও বনমালীবাবু আসিলেন। গায়ে গলাবন্ধ কোট, চোখে সতর্ক দৃষ্টি। ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন আসুন।'

পানাহারের সঙ্গে ব্যোমকেশ সরস বাক্যালাপ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে. লক্ষ্য করিলাম. রামবাবু ও বনমালীবাবুর আড়ষ্ট ভাব শিথিল হইয়াছে। তাঁহারা সহজভাবে কথাবার্তায় যোগ দিতেছেন।

মিনিট কুড়ি পরে জলযোগ সমাপ্ত করিয়া রামবাবু চুরুট ধরাইলেন; ব্যোমকেশ ভূপেশবাবুকে সিগারেট দিয়া সিগারেটের টিন বনমালীবাবুর সামনে ধরিল, 'আপনি একটা নিন, বনবিহারীবাবু।'

বনমালীবাবু বলিলেন, 'আজ্ঞে আমি সিগারেট খাই না।—' বলিয়া একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেলেন -'আজ্ঞে -আমার নাম—'

'আপনাদের দুই ভায়েরই প্রকৃত নাম আমি জানি—রাসবিহারী এবং বনবিহারী বিশ্বাস।' ব্যোমকেশ নিজের চেয়ারে গিয়া বসিল, 'নটবর নস্কর আপনাদের ব্ল্যাকমেল করছিল: আপনারা মাসে মাসে তাকে আশি টাকা দিচ্ছিলেন'

রাসবিহারী ও বনবিহারী দারুমূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ নিজে সিগারেট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল,—'নটবর নস্কর লোকটা ছিল অতি বড় শয়তান। যখন ঢাকায় ছিল তখন প্রকাশ্যে দালালীর কাজ করত, আর সুবিধা পেলে ব্ল্যাকমেলের ব্যবসা চালাত। আপনারা দুই ভাই যখন জেলে গেলেন তখন সে ভবিষ্যতের কথা ভেবে আদালতের রায়ের নকল যোগাড় করে রাখল। মতলব, আপনারা জেল থেকে বেরিয়ে আবার যখন চাকরি-বাকরি করবেন তখন আপনাদের রক্ত শোষণ করবে।

'তারপর একদিন দেশ ভাগাভাগি হয়ে গেল। ঢাকায় নটবরের ব্যবসা আর চলল না, সে কলকাতায় পালিয়ে এল। কিন্তু এখানে তার জানা-শোনা লোকের সংখ্যা কম, বৈধ এবং অবৈধ কোনো রকম ব্যবসারই সুবিধে নেই, ব্ল্যাকমেল করার উপযুক্ত পাত্র নেই। তার ব্যবসায় ভাঁটা পড়ল। এই মেসে এসে একটা ঘর নিয়ে সে রইল; সামান্য যা টাকা সঙ্গে আনতে পেরেছিল তাই দিয়ে জীবন নির্বাহ করতে লাগল।

'এখানে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন সে আপনাদের দেখল এবং চিনতে পারল। আপনারা এই মেসেই থাকেন। খোঁজ-খবর নিয়ে সে জানতে পারল যে আপনারা ছদ্মনামে এক ব্যাঙ্কে চাকরি করছেন। নটবর নস্কর রোজগারের একটা রাস্তা পেয়ে গেল। ভগবান যেন আপনাদের হাত-পা বেঁধে তার হাতে সঁপে দিলেন।

'নটবর আপনাদের বলল, টাকা দাও, নইলে ব্যাঙ্কে তোমাদের প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে দেব। আপনারা নিরুপায় হয়ে মাসে মাসে টাকা গুনতে লাগলেন। টাকা অবশ্য বেশি নয়, মাসে আশি টাকা। কিন্তু নটবরের পক্ষে তাই বা মন্দ কি। অন্তত মেসের খরচটা উঠে আসে।

'এইভাবে চলছিল। আপনাদের প্রাণে সুখ নেই কিন্তু নটবরের হাত ছাড়ানোর উপায়ও নেই। একমাত্র উপায়, যদি নটবরের মৃত্যু হয়।'

ব্যোমকেশ থামিল। রুদ্ধশ্বাস নীরবতা ভাঙিয়া বনবিহারী হাউমাউ করিয়া উঠিলেন, 'দোহাই ব্যোমকেশবাবু, আমরা নটবর নস্করকে মারিনি। নটবর যখন মরে তখন আমরা ভূপেশবাবুর ঘরে ছিলাম।'

'তা বটে!' ব্যোমকেশ চেয়ারে হেলান দিয়া ঊর্ধ্ব দিকে ধোঁয়া ছাড়িল, অবহেলা ভরে বলিল, 'কে নটবরকে খুন করেছে তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই। মাথা-ব্যথা পুলিসের। কিন্তু আপনারা ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। ব্যাঙ্কে যদি কোনো দিন টাকার গরমিল হয় তখন আমাকে আপনাদের আসল পরিচয় প্রকাশ করতে হবে।'

এবার রামবাবু ওরফে রাসবিহারীবাবু কথা বলিলেন, ব্যাঙ্কে টাকার গরমিল হবে না। আমরা একবার যে ভুল করেছি দ্বিতীয়বার সে-ভুল করব না।'

'ভাল কথা। তাহলে আমি আর অজিত নীরব থাকব।' ব্যোমকেশ ভূপেশবাবুর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল 'আপনি?'

ভূপেশবাবুর মুখে বিচিত্র হাসি খেলিয়া গেল, তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, 'আমিও নীরব। আমার মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুবে না।'

অতঃপর ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর রামবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাত জোড় করিয়া বলিলেন, আপনাদের দয়া জীবনে ভুলব না। আচ্ছা, আজ আমরা যাই, আমার শরীর একটু অসুস্থ বোধ হচ্ছে।'

'আসুন।' ব্যোমকেশ তাঁহাদের দ্বার পর্যন্ত আগাইয়া দিল, তারপর দ্বার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

ভূপেশবাবু ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন দেখিলাম। ব্যোমকেশও প্রত্যুত্তরে হাসিল। ভূপেশবাবু বলিলেন, 'রামবাবু আর বনমালীবাবুর সঙ্গে নটবর নস্করের অবৈধ যোগাযোগ আছে আমি জানতাম না, ব্যোমকেশবাবু। ওটা সমাপতন। আপনি বোধ হয় সবই বুঝতে পেরেছেন কেমন?'

ব্যোমকেশ গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'সব বুঝতে পারিনি তবে মোট কথা বুঝেছি।'

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'আপনি তাহলে গল্পটা বলুন। আমার যদি কিছু বলবার থাকে আমি পরে বলব।'

ব্যোমকেশ ভূপেশবাবুকে একটি সিগারেট দিল, নিজে একটি ধরাইয়া আমার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল 'তুমি নটবরের মৃত্যুর একটা বিবরণ লিখেছ। সেটা পড়ে আমার খট্‌কা লাগল। পিস্তলের আওয়াজ এত জোরে হয় না; এ যেন ছর্‌রা বন্দুকের আওয়াজ, কিম্বা বোমা ফাটার আওয়াজ। অথচ নটবর মরেছে পিস্তলের গুলিতে।

'রামবাবু এবং বনমালীবাবুর মধ্যে চেহারার সাদৃশ্য তুমি লক্ষ্য করেছিলে। আমি তাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখলাম তাঁরা কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন।

নটবরের ঘরে তাঁদের যাতায়াত ছিল, সুতরাং তাঁদের সম্বন্ধে আমার মনে কৌতূহল হল।

'কিন্তু যখন বন্দুকের আওয়াজ হয় তখন ওঁরা দোতলায় ভূপেশবাবুর ঘরে ছিলেন। ভূপেশবাবুর ঘরের পরিস্থিতি অতিশয় নিরুদ্বেগ ও স্বাভাবিক। তিনি নিজের ঘরে আছেন, ছ'টা বেজে পঁচিশ মিনিটে রাসবিহারী ও বনবিহারী তাস খেলতে এলেন। কিন্তু অজিত না আসা পর্যন্ত তাস খেলা আরম্ভ হচ্ছে না। দু'মিনিট পরে সিঁড়িতে অজিতের ফট্‌ফট্‌ চটির শব্দ শোনা গেল। ভূপেশবাবু উঠে গিয়ে গলির দিকের জানলা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গলিতে দুম করে শব্দ হল। রাসবিহারী ও বনবিহারী জানলার কাছে গেলেন। ভূপেশবাবু বলে উঠলেন, 'ঐ ঐ—গলি থেকে বেরিয়ে গেল, দেখতে পেলেন? গায়ে বাদামী রঙের আলোয়ান-?'

'গলির মুখের কাছে সদর রাস্তা দিয়ে লোক যাতায়াত করছিল, রাসবিহারী ও বনবিহারী তাদেরই একজনকে দেখে ভাবলেন সে গলি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের সন্দেহ রইল না যে, ভূপেশবাবু ঠিক কথাই বলছেন। তাঁদের বিশ্বাস হল যে, তাঁরাও লোকটাকে গলি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। এই ধরনের ভ্রান্তি চেষ্টা করলে সৃষ্টি করা যায়।

'পরে নটবরের ঘরের জানলার ওপর পিস্তলটা পাওয়া গেল। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, আততায়ী পিস্তলটা ফেলে গেল কেন? অস্ত্র ফেলে যাওয়ার কোনো ন্যায্য কারণ নেই। আমার সন্দেহ হল এই সহজ স্বাভাবিক পরিস্থিতির আড়ালে মস্ত একটা ধাপ্পাবাজি রয়েছে।

'মেসের চাকর হরিপদ সন্ধ্যে ছ'টার সময় শুনেছিল নটবরের ঘরে লোক আছে। যদি সেই লোকটাই নটবরকে খুন করে থাকে? এবং নিজের অ্যালিবাই তৈরি করার জন্যে মৃত্যুর সময়টা এগিয়ে এনে থাকে? পনরো কুড়ি মিনিটের তফাত ময়না তদন্তে ধরা পড়ে না।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, খুন যে-ই করুক, সে বাইরের লোক নয়, মেসের লোক। কিন্তু লোকটা কে? শিবকালীবাবু? রাসবিহারী-বনবিহারী? কিম্বা অন্য কেউ। কার মোটিভ আছে জানি না, কিন্তু সুযোগ আছে একমাত্র শিবকালীবাবুর। অন্য সকলের অকাট্য অ্যালিবাই আছে।

'মনটা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে রইল, কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না। লক্ষ্য করেছিলাম যে, ভূপেশবাবুর ঘরের নীচে নটবরের ঘর এবং গলির দিকে ভূপেশবাবুর জানলার নীচে নটবরের জানলা। কিন্তু পটকার কথা একেবারেই মনে আসেনি। হ্যাঁ, পটকা। যে পটকা আছাড় মারলে কিম্বা উঁচু থেকে শক্ত মেঝের উপর ফেললে আওয়াজ হয় সেই পটকা।

'আজ সকালে থানায় যাচ্ছিলাম, যদি থানায় গিয়ে কিছু নতুন খবর পাই এই আশায়। বেরুবার সময় মনে হল, দেখি তো গলির মধ্যে নটবরের জানলার কাছে কোনো চিহ্ন পাই কিনা।

'চিহ্ন পেলাম। ঠিক নটবরের জানলার নীচে ইট-বাঁধানো মেঝের ওপর পটকা ফাটার পাঁশুটে দাগ। শুঁকে দেখলাম অল্প বারুদের গন্ধও রয়েছে। আর সন্দেহ রইল না। চমৎকার একটি অ্যালিবাই সাজানো হয়েছে। কে অ্যালিবাই সাজিয়েছে? ভূপেশবাবু ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কারণ তিনিই জানলা খুলেছিলেন।

রাসবিহারী এবং বনবিহারী জানলার কাছে এসেছিলেন আওয়াজ হওয়ার পরে।

'সেদিন সন্ধ্যে ছ'টার সময় ভূপেশবাবু অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দে নীচে নেমে গিয়েছিলেন। পিস্তল আগে থাকতেই যোগাড় করা ছিল,' তিনি নটবরের ঘরে ঢুকে নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে গুলি করলেন। গলির দিকের জানলা খুলে দিয়ে সেখানে পিস্তল রেখে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। ভাগ্যক্রমে কেউ তাঁর যাতায়াত দেখতে পেল না। কিন্তু যদি কেউ দেখে ফেলে থাকে তাই অ্যালিবাই দরকার। তিনি নিজের ঘরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দশ মিনিট পরে রাসবিহারী ও বনবিহারী তাস খেলতে এলেন। কিন্তু অজিত তখনো আসেনি, তাই তিনজনে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'তারপর ভূপেশবাবু সিঁড়িতে অজিতের চটির ফটফট শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি তৈরি ছিলেন তাঁর মুঠোর মধ্যে ছিল একটি মার্বেলের মত পটকা। ঘরের বন্ধ হাওয়ার অজুহাতে তিনি গলির দিকের জানলা খুলে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুঠি থেকে পটকাটি জানলার বাইরে ফেলে দিলেন। নীচে দুম্ করে শব্দ হল। রাসবিহারী ও বনবিহারী ছুটে জানলার কাছে গেলেন; ভূপেশবাবু তাদের বাদামী আলোয়ান গায়ে কাল্পনিক আততায়ী দেখালেন।

'তারপর ভূপেশবাবুকে আর কিছু করতে হল না; স্বাভাবিক নিয়মে যথা-সময়ে লাশ আবিষ্কৃত হল। পুলিস এল, লাশ নিয়ে চলে গেল। যবনিকা পতন।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। ভূপেশবাবু এতক্ষণ নিবাত নিষ্কম্প বসিয়া শুনিতে-ছিলেন, এখনো তিনি নিশ্চল বসিয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহার পানে ভ্রূ বাঁকাইয়া বলিল, 'কোথাও ভুল পেলেন কি?'

ভূপেশবাবু এবার নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন, স্মিতমুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না, ভুল পাইনি। ভুল আমিই করেছিলাম, ব্যোমকেশবাবু। আপনি যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন তা ভাবিনি। ভেবেছিলাম আপনি ফিরে আসতে আসতে নটবরের মামলা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, বলিল, 'দুটো প্রশ্নের উত্তর পাইনি। এক, আপনার মোটিভ কি। দুই, পিস্তলের আওয়াজ চাপা দিলেন কেমন করে। বন্ধ ঘরের মধ্যে পিস্তল ছুঁড়লেও আওয়াজ বাইরে যাবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে আপনি কি কোনো সতর্কতাই অবলম্বন করেননি?'

'দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আগে দিচ্ছি'—ভূপেশবাবু কাঁধ হইতে পাট করা শাল লইয়া দুই হাতে আমাদের সামনে মেলিয়া ধরিলেন; দেখিলাম নূতন শালের গায়ে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, 'এই শাল গায়ে জড়িয়ে নটবরের ঘরে গিয়েছিলাম, শালের ভিতর হাতে পিস্তল ছিল। নটবরকে শালের ভিতর থেকে গুলি করেছিলাম; গুলির আওয়াজ শালের মধ্যেই চাপা পড়েছিল, বাইরে যেতে পারেনি।'

ব্যোমকেশ আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িল। বলিল, 'আর প্রথম প্রশ্নের উত্তর? আমি কতকটা আন্দাজ করেছি; কাল আপনি ছেলের ফটো দেখিয়েছিলেন! যা হোক, আপনি বলুন।'

ভূপেশবাবুর কপালের শিরা দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি সংযত স্বরেই বলিলেন, 'ছেলের ফটো দেখিয়েছিলাম, কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম আপনি সত্য আবিষ্কার করবেন। তাই আগে থেকে নিজের সাফাই গেয়ে রেখে-

ছিলাম। ঢাকায় যেদিন দাঙ্গা বাধে সেদিন নটবর আমার ছেলেকে স্কুল থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যের পর সে আমার বাসায় এসে বলল, দশ হাজার টাকা পেলে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারে। নগদ দশ হাজার টাকা আমার কাছে ছিল না; যা ছিল সব দিলাম, আমার স্ত্রী গায়ের সমস্ত গয়না খুলে দিলেন। নটবর সব নিয়ে চলে গেল, কিন্তু আমি ছেলেকে ফিরে পেলাম না। নটবরের দেখাও আর পেলাম না। তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে, আমি স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে কলকাতায় চলে এসেছি, হঠাৎ একদিন রাস্তায় নটবরকে দেখতে পেলাম। তারপর—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝেছি। আর বলবার প্রয়োজন নেই, ভূপেশবাবু।'

ভূপেশবাবু কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া শেষে বলিলেন, 'এখন আমার সম্বন্ধে আপনি কি করতে চান?'

ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বদিকে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র কোথায় যেন একবার বলেছিলেন, 'দাঁড় কাক মারলে ফাঁসি হয় না।' আমার বিশ্বাস শকুনি মারলেও ফাঁসি হওয়া উচিত নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

রুম নম্বর দুই

নিরুপমা হোটেলের ম্যানেজার হরিশচন্দ্র হোড় ঘুম ভেঙেই ঘড়ি দেখলেন--সাড়ে ছ'টা। তিনি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন। ইঃ, আজ বেজায় দেরি হয়ে গেছে। তিনি ডাকলেন—'গুণধর!'

তকমা-উর্দি পরা সর্দার খানসামা গুণধর এসে দাঁড়াল। শীর্ণকান্তি অত্যন্ত কর্মকুশল চৌকশ লোক, হোটেলের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির প্রতি নজর আছে। হরিশচন্দ্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেড-টি দেওয়া হয়েছে?'

গুণধর বলল—'আজ্ঞে। তেতলার সবাই চা নিয়েছেন, কেবল দোতলার দু'নম্বর ঘরে টোকা দিয়ে সাড়া পেলাম না।'

হরিশচন্দ্র বললেন—'দোতলার দু'নম্বর—রাজকুমারবাবু। পনেরো মিনিট পরে আবার টোকা দিও।—বাজারে কে গেছে?'

'জেনারেলকে নিয়ে সরকার মশায় গেছেন।'

'বেশ। আমার চা নিয়ে এস।' হরিশচন্দ্র উঠে কক্ষ-সংলগ্ন বাথরুমে প্রবেশ করলেন।

রাসবিহারী অ্যাভেন্যু ও গড়িয়াহাটার চৌমাথা থেকে অনতিদূরে নিরুপমা হোটেল। দেশী হোটেল হলেও তার ভাবভঙ্গী একটু বিলিতী-ঘেঁষা। চাকরেরা খানসামার মত তকমা-উর্দি পরে, সদর দরজার সামনে সকাল বিকেল জেনারেলের মত সাজপোশাক পরা দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকে এবং যোগ্য ব্যক্তিকে সেলাম করে। তিনতলা বাড়ির প্রত্যেক তলায় আটখানি ঘর। নীচের তলায় ম্যানেজারের দু'টি ঘর, বাসকক্ষ ও অফিস; টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজানো ডাইনিং রুম, রান্নাঘর, বাবুর্চিখানা, চাকরদের ঘর, স্টোর-রুম ইত্যাদি। হোটেলে দেশী ও বিলিতী দু'রকম খাদ্যই পাওয়া যায়, যার যেমন ইচ্ছা খেতে পারেন। হোটেলে থাকার মাশুল বিলিতী হোটেলের চেয়ে কম, কিন্তু সাধারণ দেশী হোটেলের চেয়ে বেশি। ছোট হোটেল, তাই অধিকাংশ সময়ই পূর্ণ থাকে, উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অতিথি এখানে আসেন।

আধঘণ্টা পরে হরিশচন্দ্র বাথরুম থেকে বিলিতী পোশাক পরে বেরুলেন। দোহারা আকৃতির লোক, তাই কোট-প্যাণ্ট পরলে বেশ মানায়; বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, চোখের দৃষ্টিতে অভিজ্ঞতা এবং সংসার-বুদ্ধি পরিস্ফুট।

টেবিলের ওপর চা এবং প্রাতরাশ সাজিয়ে গুণধর দাঁড়িয়ে ছিল, হরিশচন্দ্র খেতে বসলেন। চা টোস্ট মাখন ও দু'টি অর্ধ-সিদ্ধ ডিম। আহারের সময় হরিশ-চন্দ্র কথা বলেন না, পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রাতরাশ শেষ করে মুখ মুছতে মুছতে বললেন—'রাজকুমারবাবুর খবর আর নিয়েছিলে?'

গুণধর বলল—'আজ্ঞে, এবারও সাড়া পাওয়া গেল না।'

হরিশচন্দ্র ভ্রূকুটি করলেন। তারপর উঠে অফিস-ঘরে গেলেন। দেরাজ থেকে চাবির গোছা নিয়ে পকেটে ফেললেন—'চল দেখি।'

ফাল্গুন মাস হলেও সাতটার সময় বেলা চড়েছে; কলতলায়, রান্নাঘরে, ডাইনিং

ঘুমে ঝি-চাকরের কর্মতৎপরতা। আটটার সময় অতিথিদের ব্রেক-ফাস্ট দিতে হবে।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে হরিশচন্দ্র পশ্চাদ্বর্তী গুণধরকে জিজ্ঞেস করলেন—'কাল রাত্তিরে রাজকুমারবাবু ঘরে ছিলেন তো?'

গুণধর বলল—'আজ্ঞে ছিলেন। রাত্রি পৌনে ন'টার সময় আমি নিজের হাতে তাঁকে ডিনার পোঁছে দিয়েছি।'

'রাত্তিরে সদর দরজা কখন বন্ধ হয়েছিল?'

'আপনি ফিরলেন এগারোটার সময়, তারপর আমি সদর বন্ধ করেছি।'

দোতলায় এক সারিতে আটটি ঘর, সামনে টানা বারান্দা। সিঁড়ির মুখেই ঘরের নম্বর আরম্ভ হয়েছে। সব দরজা ভেজানো। হরিশচন্দ্র দু'নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে একটু কড়াভাবে টোকা দিলেন।

কেউ সাড়া দিল না। হরিশচন্দ্র তখন ডাক দিলেন—'রাজকুমারবাবু!'

এবারেও সাড়া এল না। হরিশচন্দ্র আরো গলা চড়িয়ে ডাকলেন—'রাজকুমার-বাবু!' তবু সাড়া নেই। হরিশচন্দ্র তখন দোরের হ্যান্ডেল ঘোরালেন, কিন্তু হ্যান্ডেল ঘুরল না। দোরে ইয়েল্ তালা লাগানো, চাবি না ঘোরালে বাইরে থেকে দোর খুলবে না।

হরিশচন্দ্র পকেট থেকে চাবির গোছা বার করলেন। এই সময় দু নম্বর ঘরের দু'দিক থেকে দরজা খুলে দু'টি মুণ্ড উঁকি মারল। এক নম্বর থেকে যিনি উঁকি মারলেন তিনি একটি বর্ষীয়সী মহিলা। জিজ্ঞাসা করলেন—'কী হয়েছে?' তিন নম্বর ঘর থেকে গলা বাড়িয়েছিলেন মধ্যবয়স্ক একটি পুরুষ; বললেন—'ম্যানেজারবাবু, আমার জ্বর হয়েছে, শীগ্গির একজন ডাক্তার ডেকে পাঠান।'

মহিলাটি বেরিয়ে এলেন, বললেন—'আমি ডাক্তার।' তিনি হরিশচন্দ্রকে পেরিয়ে তিন নম্বর ঘরের সামনে গেলেন। তিন নম্বরের অধিবাসী শচীতোষ সান্যাল আরক্ত চক্ষু বিস্ফারিত করে একবার ডাক্তারের পানে তাকালেন, তারপর দরজা থেকে সরে গিয়ে বললেন—'আসুন।'

হরিশচন্দ্র গোছা থেকে চাবি বেছে নিয়ে তালায় পরালেন, দরজা একটু ফাঁক করে ভিতরে দেখলেন; কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর দরজা টেনে আবার বন্ধ করে দিলেন।

বারান্দায় কেউ নেই। হরিশচন্দ্র এদিক ওদিক তাকিয়ে খাটো গলায় গুণধরকে বললেন—'গুণধর, তুমি এখানে থাকো, কোথাও যেও না। আমি এখনি আসছি।' তাঁর কণ্ঠস্বর চাপা উত্তেজনায় শীৎকারের মত শোনাল।

তিনি পা টিপে টিপে নীচে নেমে গেলেন। তিন নম্বর ঘরে মহিলা ডাক্তার শোভনা রায় রোগী শচীতোষ সান্যালকে বিছানায় শুইয়ে তাঁর টেম্পারেচার নিলেন, নাড়ী দেখলেন, জিভ পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন—'কিছু নয়, সামান্য ঠাণ্ডা লেগেছে। দুটো অ্যাস্পিরিনের বড়ি খেয়ে শুয়ে থাকুন।'

শচীতোষ বললেন—'জ্বর কত?'

'নাইন্‌টি-নাইন।'

'গায়ে যে ভীষণ ব্যথা!'

'ও কিছু নয়। দো-রসার সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যায়। আমি অ্যাস্পিরিনের বড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনার ফি কত?'

'ফি দিতে হবে না।'

তিন নম্বর থেকে বেরিয়ে শোভনা রায় দেখলেন, গুণধর দু'নম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'এ ঘরে কী হয়েছে?'

গুণধর কেবল মাথা নাড়ল। শোভনা রায় আর কোনো প্রশ্ন না করে নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন।

নীচে হরিশচন্দ্র তখন নিজের অফিস-ঘর থেকে পুলিসকে ফোন করছেন—'শীগ্গির আসুন, খুন হয়েছে—!'

গত রাত্রে ইন্সপেক্টর রাখাল সরকারের বাড়িতে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের নেমতন্ন ছিল। সরকার মশায় দক্ষিণ কলকাতার একটি থানার অধিকারী থানাদার। ব্যোমকেশেরা যখন কেয়াতলায় জমি কিনে বাড়ি তৈরি করতে আরম্ভ করেছিল তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল; পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হলো। সরকার মশায় পুলিস হলেও অত্যন্ত মিশুকে এবং সহৃদয় ব্যক্তি; বয়সে ব্যোমকেশের চেয়ে কিছু ছোট, তাই বন্ধুত্বের সঙ্গে অনেকখানি সম্ভ্রম মেশানো ছিল।

ব্যোমকেশের সঙ্গে অজিতও এসেছিল নেমতন্ন খেতে। গল্পসল্প চলল অনেক রাত পর্যন্ত। রাত বাড়ল কিন্তু গল্প শেষ হলো না। খাওয়া-দাওয়ার পর অজিত উঠি-উঠি করছে দেখে রাখালবাবু বললেন—'ব্যোমকেশদা, আপনি আজ রাতটা না হয় এখানেই থেকে যান। কাল সকালে একেবারে বাড়ির কাজ তদারক করে বাসায় ফিরবেন।'

ব্যোমকেশ বলল—'মন্দ কথা নয়। অজিত, তুমি আজ ফিরে যাও, আমি কাল কাজকর্ম দেখে ফিরব।'

অজিত চলে গেল। কলকাতা শহরে এপাড়া থেকে ওপাড়া যাওয়া বিদেশ-যাত্রার সমান।

পরদিন সকাল পৌনে আটটার সময় ব্যোমকেশ চা-জলখাবার খেয়ে বেরুবার উপক্রম করছে এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রাখালবাবু ফোন ধরে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে শুনলেন; দু'একটা কথা বললেন, তারপর ফোন রেখে দিয়ে ব্যোমকেশকে বললেন—'থানা থেকে বলছিল। আমার এলাকায় একটা হোটেলে খুন হয়েছে। বেশ রহস্যময় ব্যাপার মনে হচ্ছে। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?'

ব্যোমকেশ বলল—'রহস্যময় খুন! নিশ্চয় যাব।'

ইন্সপেক্টর রাখাল সরকার ব্যোমকেশকে নিয়ে যখন নিরুপমা হোটেলে পৌঁছুলেন তখন থানা থেকে দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসে হোটেল দখল করেছে। সদর দরজায় একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। হোটেলের লোককে হোটেলে রাখা হয়েছে, বাইরের লোককে বাইরে।

রাখালবাবু হরিশচন্দ্রের অফিসে প্রবেশ করে দেখলেন, পুলিসের ডাক্তার কালো ব্যাগ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। রাখালবাবু বললেন—'এই যে ডাক্তার এসে গেছেন দেখছি—আপনি হোটেলের ম্যানেজার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনিই লাশ আবিষ্কার করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

ইন্সপেক্টর সরকার এবং ব্যোমকেশ বক্সী পাশাপাশি চেয়ারে বসলেন, রাখালবাবু বললেন —'বেশ। আপনি কী জানেন সংক্ষেপে বলুন।'

আজ সকাল থেকে যা যা ঘটেছিল হরিশচন্দ্র বললেন। শুনে রাখালবাবু ব্যোমকেশের দিকে তাকালেন, ব্যোমকেশ একটু ঘাড় নাড়ল। রাখালবাবু তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'আপনি ঠিক কাজ করেছেন। চলুন ডাক্তার, এবার লাশ পরিদর্শন করা যাক।'

হরিশচন্দ্র আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চললেন; তাঁর পিছনে রাখালবাবু, ব্যোমকেশ ও ডাক্তার।

দোতলায় দু'নম্বর ঘরের সামনে গুণধরের বদলে একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। হরিশচন্দ্র চাবি দিয়ে ঘর খুলে দিলেন। তখন ঘরের ভিতরটি দেখা গেল।

ঠিক দরজার সামনে মেঝের ওপর একটি পুরুষের মৃতদেহ ডানদিকে কাত হয়ে পড়ে আছে; পরনে লুঙ্গি এবং গেঞ্জি। মুখখানা দেখে চমকে উঠতে হয়; কেউ যেন ধারালো ছুরি দিয়ে মুখখানাকে ফালা ফালা করে কেটেছে, তারপর অত্যন্ত অযত্নভরে আবার জোড়া দিয়েছে। কাটা দাগগুলো তাজা নয়, অনেকদিনের পুরনো; শুক্‌নো ক্ষতের দাগ মুখখানাকে কদাকার করে দিয়েছে।

মৃত্যুর কারণ কিন্তু অন্যত্র। গেঞ্জির বুকের ওপর খানিকটা রক্ত শুকিয়ে আছে।

দোরের কাছ থেকে কিছুক্ষণ মৃতদেহ পরিদর্শন করে রাখালবাবু বললেন—'ডাক্তার, আপনি আগে লাশ পরীক্ষা করুন। আপনার কাজ হয়ে গেলে আমরা ঘরে ঢুকব।'

ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করলেন, বাকি তিনজন লাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্যোমকেশ একবার আড় চোখে হরিশচন্দ্রের মুখের পানে তাকালো, কিন্তু সেখানে আড়ষ্ট ভয়ার্তি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

'কী ব্যাপার বলুন দেখি? আমাকে এখনি বেরুতে হবে, কিন্তু পুলিস বেরুতে দিচ্ছে না। এর মানে কি!' মহিলা কণ্ঠের উষ্ণ স্বর শুনে তিনজনে পিছু ফিরে তাকালেন। একটি মহিলা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন —'আপনি কে?'

হরিশচন্দ্র পরিচয় করিয়ে দিলেন—'ইনি এক নম্বর ঘরে থাকেন, ডক্টর মিসেস্ শোভনা রায়।'

রাখালবাবু মিনতির সুরে বললেন—'দেখুন, এই ঘরে কাল রাত্রে এক ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। এ হোটেলে যাঁরা আছেন সকলকেই আমাদের জেরা করতে হবে। জেরা করার আগে কাউকে বাইরে যেতে দিতে পারি না। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সকলের আগে আমি আপনাকে জেরা করে ছেড়ে দেব।'

মহিলাটির মুখের ভাব বদলে গেল, তিনি শঙ্কিত চক্ষে চেয়ে বললেন—'খুন হয়েছে! আমার পাশের ঘরে খুন হয়েছে। কখন? কে খুন করেছে?'

ইন্সপেক্টর মাথা নেড়ে বললেন—'তা এখনো জানা যায়নি। আপনি নিজের ঘরে গিয়ে বসুন, আমরা এখনি আসছি।'

মহিলাটি একটু ইতস্তত করলেন, একবার দু'নম্বর ঘরের দিকে উঁকি

মারলেন, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে সাব-ইন্সপেক্টর দু'জন উপস্থিত হয়েছিল, রাখালবাবু তাদের বললেন—'তোমরা একজন তেতলায় এবং একজন দোতলায় যত অতিথি আছেন সকলের নামধাম ঠিকানা নিয়ে নাও, কাল রাত্রে কে কোথায় ছিল খবর নাও। কেবল এক নম্বর আর তিন নম্বর ঘরে তোমাদের যাবার দরকার নেই, ও'দের আমি জেরা করব।'

সাব-ইন্সপেক্টর দু'জন চলে গেল।

পাঁচ মিনিট পরে ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন—'এবার লাশ সরাতে পারেন।'

রাখালবাবু বললেন—'কি দেখলেন?'

ডাক্তার উত্তর দিলেন—'ছুরির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে; ছুরি কিংবা ওই রকম কোনো সরু ধারালো অস্ত্র। পাঁজরার ফাঁক দিয়ে একেবারে হৃদ্‌যন্ত্রে প্রবেশ করেছে। এ পেশাদার খুনীর কাজ; ওই একটি বই ক্ষতচিহ্ন নেই, প্রথম মারেই মর্মস্থানে পেশচেছে।'

'হুঁ। মৃত্যুর সময়?'

'অটপ্সি না করে নিশ্চয়ভাবে বলা শক্ত, সম্ভবত কাল রাত্রি ন'টা থেকে বারোটার মধ্যে।'

ব্যোমকেশ বলল—'মুখের দাগগুলো কতদিনের পুরনো?'

'দশ বারো বছয়ের কম নয়।'

'বয়স কত হবে? মুখ দেখে তো বোঝা যায় না।'

'চল্লিশের আশেপাশে—আচ্ছা, এখন আমি চলি। তাড়াতাড়ি লাশ পাঠিয়ে দেবেন, আজই কাটবো। কাল রিপোর্ট পাবেন।' ডাক্তার চলে গেলেন।

রাখালবাবু হরিশচন্দ্রকে বললেন—'আপনি নিজের কাজে যান। অফিসেই থাকবেন। এ ঘরের চাবিটা আমায় দিন।'

আধ ঘণ্টা পরে লাশ চালান করে দিয়ে রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে তাকালেন। অর্থাৎ—অতঃ কিম্?

ব্যোমকেশ এক নম্বর ঘরের দিকে আঙুল দেখালো—'মহিলাটির সওয়াল-জবাব আগে সেরে নিন। মহিলা এবং ডাক্তারের অধিকার আগে।'

'ঠিক ঠিক। ও'কে ছেড়ে দিয়ে তারপর এ ঘরটা দেখা যাবে।' রাখালবাবু দু'নম্বরের দোরে চাবি দিয়ে বললেন—'আসুন।'

এক নম্বরের দোরে টোকা দিতেই দোর খুলে গেল। মহিলাটির মুখ অপ্রসন্ন। তাঁর বেঁটে নিরেট গোছের শরীরটি আঁটসাঁট পোশাকের মধ্যে যেন অধীরতায় ফেটে পড়বার উপক্রম করছে। তিনি বললেন—'যত শীগ্‌গির পারেন আমাকে ছেড়ে দিন দারোগাবাবু। আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে।'

'দু'চারটে প্রশ্ন করেই আপনাকে ছেড়ে দেব।' রাখালবাবু খাতা পেন্সিল বার করে প্রশ্ন আরম্ভ করলেন—'আপনার পুরো নাম?'

'মিসেস্ শোভনা রায়।'

'বয়স?'

'উনপঞ্চাশ।'
'স্বামীর নাম?'
'স্বর্গীয় রামরতন রায়।'
'আপনি ডাক্তার। কোথায় ডাক্তারি করেন?'
'বহরমপুরে।'
'কলকাতায় এসেছেন কেন?'
'আমি গাইনকোলজিস্ট, প্রধানত স্ত্রী-রোগের চিকিৎসা করি। সেবা সদনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, মাঝে মাঝে আসি।'
'কলকাতায় আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?'
'আমার কোথাও কেউ নেই।'
'ছেলেপুলে?'
'না। একটা মেয়ে ছিল, অনেকদিন মরে গেছে।'
মিসেস্ রায়ের মুখ ক্ষণেকের জন্য কঠিন হয়ে উঠল, তারপর আবার স্বাভাবিক হলো। মহিলাটির মুখখানি সুশ্রী নয়, কঠিন হলে আরো কুশ্রী দেখায়।
'কলকাতায় যখন আসেন এখানেই ওঠেন?'
'হ্যাঁ। এখানে উঠলে সুবিধে হয়।'
'এবার কবে এসেছেন?'
'পরশু।'
'কাল রাত্রে পাশের ঘরে রাজকুমার বসু নামে এক ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। তাঁকে আপনি চিনতেন?'
'না, কখনো নাম শুনিনি।'
'আগে কখনো দেখেননি? পাশাপাশি ঘরে ছিলেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।'
'না। ও মুখ দেখলে মনে থাকত।'
'কাল রাত্রি আটটার পর আপনি কোথায় ছিলেন?'
'আটটার সময় আমি সেবা সদন থেকে ফিরে আসি। ঘরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়চোপড় বদলে নীচে ডাইনিং রুমে খেতে গেলুম। ন'টার আগেই ঘরে ফিরে এলুম। তারপর আর ঘর থেকে বেরোইনি।'
'রাত্রে কিছু জানতে পেরেছিলেন?'
'আমি সওয়া ন'টার সময় শুয়ে পড়েছিলুম; কিন্তু বার বার ঘুমের বিঘ্ন হচ্ছিল। পাশের ঘরের শব্দে চটকা ভেঙে যাচ্ছিল।'
'পাশের ঘরে শব্দ হচ্ছিল?'
'ঘরে শব্দ হচ্ছিল কিনা শুনতে পাইনি। কিন্তু ঘরের দরজা বার বার খুলছিল আর বন্ধ হচ্ছিল।'
'রাত্রি তখন কত?'
'ঘড়ি দেখিনি। আন্দাজ সাড়ে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে।'
'আপনি কিছু করলেন?'
'কী করব! হোটেলে অনেক অবিবেচক লোক আসে, তারা পরের সুবিধা অসুবিধা বোঝে না।'
'আজ সকালে কখন জানতে পারলেন?'
'খুন হয়েছে আপনার কাছে জানলাম। ভোরবেলা চাকর বেড্-টি দিয়ে গেল।

তারপর আমি তৈরি হয়ে বেরুতে যাচ্ছি, নীচে ব্রেক-ফাস্ট খেয়ে কাজে যাব, এমন সময় পাশের ঘরে দোর-ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি শুনতে পেলুম। বেরিয়ে দেখলুম ম্যানেজার; জিজ্ঞেস করলুম কী হয়েছে, সে কিছু বলল না। তারপর তিন নম্বর ঘরে গেলাম—'

'তিন নম্বর ঘরে গেলেন কেন?'

'তিন নম্বরের ভদ্রলোকটির শরীর খারাপ হয়েছে, ডাক্তার খুঁজছিলেন। তাই তাঁকে দেখতে গিয়েছিলুম।'

'তাঁকে আগে থাকতে চিনতেন বুঝি?'

'দেখেছি। কিন্তু চেনা-পরিচয় কিছু ছিল না। তাঁর নামও জানি না।

'ও—কি হয়েছে ভদ্রলোকের?'

'ঠাণ্ডা লেগে সামান্য জ্বর হয়েছে।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে তাকালেন, ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে জানাল আর কোনো প্রশ্ন নেই। রাখালবাবু শোভনা রায়কে বললেন—'আপাতত আর কোনো প্রশ্ন নেই, আপনি কাজে যেতে পারেন। কিন্তু আমাদের না জানিয়ে কলকাতা ছাড়বেন না।'

শোভনা রায়ের মুখ বিরক্ত হয়ে উঠল। তিনি উত্তর না দিয়ে ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়ালেন।

দু'নম্বর ঘরের দরজা খুলতে খুলতে রাখালবাবু বললেন—'মহিলাটির মেজাজ একটু কড়া; ভয় পাননি; বোধহয় পুলিসের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচয় আছে। ডাক্তার তো।—যাহোক, আসুন দেখা যাক ঘরের মধ্যে আততায়ী কোনো চিহ্ন রেখে গেছে কিনা।—কনস্টেবল হাজরা, তুমি নীচে গিয়ে হেড-অফিসে ফোন করো—যেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টদের পাঠানো হয়।'

কনস্টেবল স্যালুট করে চলে গেল। রাখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দোর ভেজিয়ে দিলেন।

ঘরটি আয়তনে দশ ফুট বাই বারো ফুট। একটি একহারা লোহার খাট; ছোট টেবিল এবং চেয়ার, দেয়ালে আয়না লাগানো। তার পাশে কাপড় রাখার আলনা; মাথার ওপর ফ্যান। দু'জনে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি ফেরালেন।

রাখালবাবু বললেন—'বিছানাটা দেখেছেন?'

'দেখেছি। বিছানা এবং আলনা—দুইই দ্রষ্টব্য।'

বিছানা দেখে মনে হয় কাল রাত্রে রাজকুমার বসু বিছানায় শুয়েছিল; চাদর একটু কুঁচকে আছে, বালিশের ওপর মাথার দাগ। আলনায় একটি কোঁচানো ধুতি ও পাঞ্জাবি টাঙানো রয়েছে।

রাখালবাবু বললেন—'হুঁ। কি মনে হচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে কাল রাত্রে রাজকুমার বসু কাপড় পাঞ্জাবি ছেড়ে লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে শুয়েছিল। তারপর একসময় দোরে টোকা পড়ল। রাজকুমার বিছানা থেকে উঠে যেই দোর খুলল আততায়ী অমনি বাইরে থেকে তার বুকে ছুরি মারল। রাজকুমার পড়ে গেল। আর উঠল না। আততায়ী দরজা টেনে বন্ধ করে চলে গেল। আমার বিশ্বাস আততায়ী ঘরে ঢোকেনি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট রাজকুমারের ছাড়া আর কারুর আঙুলের ছাপ ঘরের মধ্যে পাবে না। দোরের হাতলে আততায়ীর আঙুলের ছাপ হয়তো ছিল, কিন্তু এখন আর পাওয়া যাবে না। তার ওপর আরো

অনেক আঙুলের ছাপ পড়েছে।'

রাখালবাবু বললেন—'তা বটে। তবু অধিকন্তু ন দোষায়। আসুন, ঘরটা তল্লাশ করে দেখা যাক।'

ব্যোমকেশ বলল—'আপনি তল্লাশ করুন। আমি কোনো জিনিসে হাত দেব না, তাতে আঙুলের ছাপ বেড়ে যাবে।'

'বেশ, আপনি তাহলে দাঁড়িয়ে তদারক করুন।'

রাখালবাবু বিধিবদ্ধভাবে তল্লাশ আরম্ভ করলেন। টেবিলের দেরাজ, পাঞ্জাবির পকেট, বিছানার তোশকের নীচে, সর্বত্র অনুসন্ধান করলেন কিন্তু কিছু পেলেন না। অবশেষে খাটের তলা থেকে তিনি একটি সুটকেস টেনে বার করলেন। মৃতের এই একটিমাত্র মাল ঘরে আছে, আর কিছু নেই।

সুটকেসের গায়ে চাবি লাগানো ছিল, রাখালবাবু ডালা তুললেন। দেখা গেল, দু'সেট জামাকাপড় রয়েছে। কাপড়ের নীচে এক গোছা দশ টাকার নোট, আর একটি ডায়েরীর আকারের ছোট বাঁধানো খাতা।

খাতাটি সরিয়ে রেখে রাখালবাবু প্রথমে দশ টাকার নোটগুলি গুনলেন; একশো কুড়িখানি নোট, অর্থাৎ ঠিক ১২০০ টাকা। তিনি নোটগুলি নিজের পকেটে রাখতে রাখতে বললেন—'দেখা যাচ্ছে, যে খুন করেছে তার টাকার লোভ নেই।' তিনি খাতাটি তুলে নিলেন।

খাতার নামপৃষ্ঠায় নাম লেখা রয়েছে—সুকান্ত সোম। রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে তাকালেন। ব্যোমকেশ বলল—'রাজকুমার নামটা তাহলে মেকি। কিন্তু—সুকান্ত সোম' যেন কোথায় শুনেছি, মাথার মধ্যে একটা ঘণ্টি বাজছে। আপনি শোনেননি?'

'মনে পড়ছে না।' রাখালবাবু খাতার পাতা ওলটাতে লাগলেন। প্রত্যেক পাতার মাথায় একটি শহরের নাম, যেমন—কাশী কলকাতা কটক। শহরের নীচে কয়েকটি নাম ও ঠিকানা, সম্ভবস্থলে টেলিফোন নম্বর। কলকাতার পাতায় চারটি নাম লেখা আছে, প্রায় প্রত্যেক নামের পাশে একটি টাকার অঙ্ক। যথা—

মোহনলাল কুণ্ডু	
১১৭ডি, পানাপুকুর লেন	
শ্যামাকান্ত লাহিড়ী	
৩০।১, লেক কলোনী	
জগবন্ধু পাত্র	৪০০
৫৬, রাম ভাদুড়ী লেন	
লতিকা চৌধুরী	
১৭, গান্ধী পার্ক	৩০০

খাতাখানা ব্যোমকেশের হাতে দিয়ে রাখালবাবু বললেন—'দেখুন যদি কিছু হদিস পান।'

ব্যোমকেশ খাতাখানা মন দিয়ে পরীক্ষা করে বলল—'আমার সন্দেহ হচ্ছে লোকটার পেশা ছিল ব্ল্যাকমেল করা।'

'অন্য পেশা কি সম্ভব নয়? যেমন ধরুন, বীমার দালাল।'

'অসম্ভব বলছি না। কিন্তু বীমার দালালকে কেউ খুন করে না। তারা ছদ্মনামেও ঘুরে বেড়ায় না।'

'তাহলে আপনি মনে করেন, রাজকুমার বসু যাদের ব্ল্যাকমেল করছিল তাদের মধ্যে কেউ তাকে খুন করেছে?'

'কলকাতার ফিরিস্তিতে যাদের নাম আছে তাদের সওয়াল করলে কতকটা আন্দাজ করা যাবে।—চলুন, এবার তিন নম্বর মক্কেলের সঙ্গে দেখা করা যাক।'

'চলুন।'

তিন নম্বর ঘরে শচীতোষ সান্যাল বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে ছিলেন, পদশব্দ শুনে ঘাড় তুললেন। বললেন—'কে?'

রাখালবাবু সংক্ষেপে বললেন—'পুলিস।'

শচীতোষবাবু উঠে বসলেন, চক্ষু গোল করে বললেন—'পুলিস! কী চাই?'

রাখালবাবু বললেন—'আপনাকে দু'চারটে প্রশ্ন করতে চাই। জানেন বোধহয় পাশের দু'নম্বর ঘরে খুন হয়েছে।'

শচীতোষবাবু মুহূর্তকাল নির্বাক থেকে আঁৎকে উঠলেন—'খুন হয়েছে! কে খুন হয়েছে?'

তিন নম্বর ঘরটি আয়তনে এবং আসবাব-পত্রে অন্য দু'টি ঘরের অনুরূপ। রাখালবাবু বিছানার ধারে বসলেন। ব্যোমকেশ চেয়ারে বসল। রাখালবাবু বললেন—'দু' নম্বরে যিনি ছিলেন কাল রাত্রে তিনি খুন হয়েছেন, তাঁর নাম রাজকুমার বসু। আপনি তাঁকে চিনতেন নাকি?'

'রাজকুমার বোস—না, চিনতাম না। কে খুন করেছে?'

'তা এখন জানা যায়নি। আপনার নাম কি?'

'শচীতোষ সান্যাল।'

'নিবাস?'

'ভাগলপুর।—আমার শরীর খারাপ, ডাক্তার শুয়ে থাকতে বলেছে।'

'কোন ডাক্তার?'

'মেয়ে ডাক্তার। ঠাণ্ডা লেগেছে, অ্যাস্‌পিরিনের বড়ি খেয়ে শুয়ে থাকতে বলল। আচ্ছা, মেয়েরা কি ভাল ডাক্তার হয়?'

'হতে বাধা নেই। ঠাণ্ডা লাগালেন কি করে?'

'কাল সন্ধ্যের পর বেরিয়েছিলাম। গায়ে আলোয়ান ছিল না, ঠাণ্ডা লেগে গেছে।'

'রাত্তিরে ঘর থেকে বেরোননি?'

'না। ন'টার সময় ডাইনিং রুম থেকে খেয়ে এসে ঘরে ঢুকেছিলাম, আর বেরোইনি।'

'ও কথা থাক। আপনি কবে কলকাতায় এসেছেন?'

'তিন দিন হলো। আজ ফিরে যাবার কথা, কিন্তু—'

'আপনি কলকাতায় এসেছেন কেন?'

'আমার ঘিয়ের ব্যবসা আছে, গঙ্গুরামকে ঘি যোগান দিই। তাই মাঝে মাঝে আসতে হয়। আচ্ছা, ঠাণ্ডা লাগা থেকে তো নিউমোনিয়া হতে পারে!'

'তা পারে, কিন্তু আপনার হবে না। আপনি বেশ তাগড়া আছেন।—বয়স কত?'

'বিয়াল্লিশ। দেখতে তাগড়া বটে, কিন্তু আমার শরীর ভারি পল্‌কা, একটুতেই রোগে ধরে। বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে; কিছু খেলে রোগ

ছেড়ে যাবে না তো?'

'গরম দুধ আর পাঁউরুটি খান।—রাজকুমার বোসকে তাহলে চিনতেন না?'

'না, কখনো নাম শুনিনি।'

ব্যোমকেশ বলল—'সুকান্ত নামটা কখনো শুনেছেন?'

শচীতোষ বললেন—'সুকান্ত? না। আমার শালার নাম ছিল শ্রীকান্তকুমার লাহিড়ী, মারা গেছে।'

রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন—'কাল রাত্রে আপনি পাশের ঘরে কোনো শব্দ শুনেছিলেন?'

'শব্দ? নাঃ। খেয়ে এসেই শুয়েছি, শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি। বউ বলে, আমি একবার ঘুমোলে ডাকাত পড়লেও ঘুম ভাঙে না। পাশের ঘরের লোকটাকে কী দিয়ে খুন করেছে? বন্দুক দিয়ে?'

'না, ছুরি দিয়ে।' রাখালবাবু উঠে পড়লেন—'আপনি পুলিসকে খবর না দিয়ে কলকাতা ছেড়ে যাবেন না। চলুন ব্যোমকেশদা।'

নীচে অফিস ঘরে হরিশচন্দ্র জবুথবুভাবে বসেছিলেন. ব্যোমকেশদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন, কুণ্ঠিত প্রশ্ন করলেন—'কী হলো?'

রাখালবাবু প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন—'এবার আপনাদের, অর্থাৎ হোটেলের স্টাফের এজাহার নেব। আপনাকে দিয়েই আরম্ভ করি। বসুন।'

তিনজনে বসলেন। রাখালবাবু সওয়াল জবাব আরম্ভ করলেন—'আপনার পুরো নাম?'

'হরিশচন্দ্র হোড়।'

'আপনি হোটেলের ম্যানেজার। এখানেই থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন আছেন?'

'আট বছর।'

'মৃত রাজকুমার বোস সম্বন্ধে কী জানেন বলুন।'

হরিশচন্দ্র মোটা খাতা বার করে খুললেন—'রাজকুমার বসু, ঠিকানা আদমপুর, পাটনা। গত পাঁচ বছর ধরে তিনি বছরে দু'বার এখানে আসতেন, দু' তিনদিন থাকতেন। হোটেল থেকে বেরুতেন না, এই অফিসে এসে তিন-চারজন বন্ধুকে টেলিফোন করতেন। তাঁরা এসে সন্ধ্যের পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

'এবার তিনি কবে এসেছিলেন?'

'পরশু।'

'টেলিফোন করেছিলেন?'

'পরশু রাত্রে এলেন, সে-রাত্রে টেলিফোন করেননি। কাল সকালে করেছিলেন।'

'রাজকুমারবাবু যখন আসতেন ওই দু' নম্বর ঘরেই থাকতেন?'

'না, যখন যে-ঘর খালি থাকত সেই ঘরে থাকতেন।'

'রাজকুমারবাবু কি কাজ করতেন আপনি জানেন?'

'আজ্ঞে না।'

'আপনি কাল রাত্রে নিশ্চয় হোটেলেই ছিলেন?'

'আজ্ঞে—' হরিশচন্দ্র একটু ইতস্তত করে বললেন—'ঘণ্টা দুয়ের জন্যে

একবার বেরিয়েছিলাম। আমি হোটেলে থাকি বটে, কিন্তু আমার পরিবার বাইরে ভাড়া বাড়িতে থাকে; মাঝে মাঝে তাদের দেখতে যাই। কাল রাত্রে অতিথিরা খেতে বসবার পর আমি বেরিয়েছিলাম, তারপর এগারোটা নাগাদ ফিরে আসি।'

'আপনার অবর্তমানে হোটেলের ইন্-চার্জ থাকে কে?'

'সর্দার খানসামা গুণধর গুঁই।'

'গুণধরকে একবার ডাকুন।'

গুণধরকে ডাকা হলো, সে এসে দাঁড়াল। আবার প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হলো।

'রাজকুমার বোস—যিনি খুন হয়েছেন—তাঁর সম্বন্ধে তুমি কী জান?'

'আজ্ঞে, বেশি কিছু জানি না। তিনি মাঝে মাঝে আসতেন, দু' তিনদিন থেকে চলে যেতেন।'

'তোমার সঙ্গে তাঁর কোনো কথাবার্তা হতো না?'

'আজ্ঞে, খুব কম। ফাই-ফরমাস করতেন, তার বেশি নয়।'

'তাঁর দেখাশোনা করত কে?'

'আজ্ঞে, আমি করতাম। সকালে বেড্-টি নিয়ে যেতাম, তারপর ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার সব আমিই পৌঁছে দিতাম। দোতলায় যাঁরা থাকেন আমিই তাঁদের দেখাশোনা করি। তেতলায় দেখাশোনা করে—'

'ও—তাহলে রাজকুমারবাবু ডাইনিং রুমে খেতে নামতেন না!'

'আজ্ঞে না।'

'কাল তুমি তাঁকে শেষবার কখন দেখেছ?'

'রাত্রি পৌনে ন'টার সময় তাঁকে ডিনার দিতে গেছলাম, তাবপর ন টার সময় এঁটো বাসন-কোসন আনতে গেছলাম। তখন তিনি বেঁচে ছিলেন।'

'বুঝলাম। কিন্তু তিনি ডাইনিং রুমে যেতেন না কেন বলতে পার?'

'তা—জানি না হুজুর। তবে—বোধহয়—তাঁর মুখখানা কাটাকুটি হয়ে বড় ইয়ে হয়ে গিয়েছিল—তাই তিনি সহজে লোকের সামনে বেরুতেন না।'

'তা হতে পারে। কিন্তু তাঁর কাছে লোক আসত?'

'তা আসত হুজুর।'

'কাল কে কে এসেছিল তুমি জান?'

'আমি জানি না, জেনারেল সিং বলতে পারে।'

'জেনারেল সিং!'

'আজ্ঞে, আমাদের দারোয়ান। তার নাম রামপিরিত সিং, সবাই তাকে জেনারেল সিং বলে ডাকে।'

'ডাকো জেনারেল সিংকে।'

ভোজপুরী জোয়ান রামপিরিত সিং এসে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে স্যালুট করল। আখাম্বা চেহারা, জাঁদরেল পোশাক, ইয়া গোঁফ। রাখালবাবু তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন—'হ্যাঁ, জেনারেল বটে। তুমি হোটেলের সদরে পাহারা দাও?'

রামপিরিত বলল—'জি। সকালে ন'টা থেকে বারোটা, বিকেল পাঁচটা থেকে দশটা আমার ডিউটি।'

'হোটেলে যারা অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে আসে তাদের নামধাম তুমি লিখে রাখ?'

'জি না, সে-রকম হুকুম নেই। যারা ভাল সাজ-পোশাক পরে আসে তাদের স্যালুট করি, যারা অতিথির রুম নম্বর জানতে চায় তাদের রুম নম্বর বলি।'

'কাউকে আটকাও না?'

'জি, ভাল জামা-কাপড় পরা থাকলে আটকাই না।'

'আর যদি ছেঁড়া জামা-কাপড় হয়?'

'তখন কটমট করে তাকাই।'

'সাবাস! এবার বল দেখি, কাল সন্ধ্যের পর দোতলার দু'নম্বর ঘরের বাবুর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?'

'জি, এসেছিল। দু'জন মরদ আর একজন ঔরৎ। রাত্রি সওয়া ন'টার সময় এলেন ঔরৎ, তিনি ঘরের নম্বর জেনে নিয়ে দোতলায় গেলেন; পাঁচ মিনিট পরে তিনি চলে গেলেন।'

'তাঁর বয়স কত?'

'বিশ-পঁচিশ হবে হুজুর। গোরী, পাতলা লম্বা চেহারা, চোখে চশমা ছিল।'

'বেশ। তারপর?'

'তারপর সাড়ে ন'টার সময় এলেন এক মরদ। তিনি ঘরের নম্বর নিয়ে ওপরে গেলেন, পাঁচ মিনিট পরে ফিরে চলে গেলেন। এর চেহারা দুবলা, মুছ-দাড়ি আছে থোড়া থোড়া।'

'তারপর?'

'পৌনে দশটার সময় আর একজন মরদ এলেন। মোটা-তাজা শরীর, খাঁটি বাঙ্গালী বাবু। তিনিও ওপরে গিয়ে পাঁচ মিনিট ছিলেন। তারপর আমার ডিউটির মধ্যে আর কেউ আসেনি হুজুর।'

জেনারেল রামপিরিত সিং-এর চেহারা যত স্থূলই হোক স্মৃতিশক্তি যে খুব তীক্ষ্ন তাতে সন্দেহ নেই। রাখালবাবু খুশী হয়ে বললেন—'বহুৎ আচ্ছা। তুমি এখন আরাম কর গিয়ে।'

জেনারেল জোড়া পায়ে স্যালুট করে চলে গেল।

রাখালবাবু পকেট থেকে ১২০০৲ টাকার নোট বার করে হরিশচন্দ্রের হাতে দিলেন, বললেন -'আপাতত এ টাকাটা আপনার কাছে রাখুন, মৃতের সুটকেসে পাওয়া গেছে। টাকার জন্যে একটা রসিদ দিন।'

ঘরে একটি লোহার সিন্দুক ছিল, হরিশচন্দ্র নোটগুলি সিন্দুকে রেখে রসিদ লিখে দিলেন। ব্যোমকেশ ভুরু কুঁচকে বসে রইল।

ইতিমধ্যে সাব-ইন্সপেক্টর দু'জন নেমে এসে দাঁড়িয়েছিল, রাখালবাবু তাদের প্রশ্ন করলেন—'কি হলো?'

একটি সাব-ইন্সপেক্টর বলল—'আমি তেতলায় গিয়েছিলাম। সকলের নাম ধাম লিখে নিয়েছি। সকলেই বলল, ন'টার পর ডিনার খেয়ে তারা ঘরে ফিরে এসেছিল, আর ঘর থেকে বেরোয়নি।'

'তাদের কথা সত্যি কিনা যাচাই করেছিলে?'

'কি করে যাচাই করব? প্রত্যেকের আলাদা ঘর। তবে একটা প্রমাণ আছে, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হলে একটা চাকর তেতলার সিঁড়ির সামনে শোয়; তাকে ডিঙিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামা সম্ভব নয়। আমি চাকরটাকে জিজ্ঞেস করেছি, সে বলল, রাত্রি সাড়ে দশটার সময় সে শুতে গিয়েছিল, তারপর আর

কেউ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামেনি।'

'বেশ।—আর তুমি?'

দ্বিতীয় সাব-ইন্সপেক্টর বলল—'দোতলাতেও একই অবস্থা। সকলের নাম-ঠিকানা লিখে নিয়েছি। দোতলার সিঁড়ির মুখে যে-চাকরটা শোয় সে বলল, পৌনে এগারোটার সময় সে শুতে গিয়েছিল, তারপর আর কেউ ঘর থেকে বেরোয়নি।'

রাখালবাবু ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাত্তিরে চাকর সিঁড়ির মুখে শোয় কেন?'

ম্যানেজার বললেন—'রাত্রে যদি কোনো অতিথির কিছু দরকার হয়, তাই এই ব্যবস্থা।'

'বুঝলাম।'—রাখালবাবু ঘড়ি দেখলেন, বারোটা বেজে গেছে। তিনি ব্যোমকেশকে বললেন—'এখানকার কাজ আপাতত এই পর্যন্ত। চলুন এবার বেরিয়ে পড়া যাক, রাস্তায় কোথাও খেয়ে নেওয়া যাবে। ভাগ্যক্রমে চারজন মক্কেলের বাড়ি কাছাকাছির মধ্যেই, বেশি ঘোরাঘুরি করতে হবে না। আপনার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল—'

ব্যোমকেশ বলল—'কোনো ক্ষতি নেই, আমি অজিতকে টেলিফোন করে দিচ্ছি।'

সে টেলিফোন তুলে নিল। হরিশচন্দ্র বললেন -'যদি আপত্তি না থাকে এখানেই আপনাদের সকলের আহারের ব্যবস্থা করেছি।'

রাখালবাবু হেসে বললেন—'খুব ভাল কথা।'

নিরুপমা হোটেলের রান্না ভাল।

মধ্যাহ্ন ভোজন দেশী ও বিলাতী মতে সমাধা করে পুলিসের দল ডাইনিং রুম থেকে বেরুলেন, সঙ্গে ব্যোমকেশ। রাখালবাবু দ্বিতীয় সাব-ইন্সপেক্টরকে বললেন—'দত্ত, তুমি এখানে থাকো। এই নাও দু' নম্বর ঘরের চাবি। ফিঙ্গার-প্রিন্টের দল এখনি আসবে, তাদের ঘর খুলে দিও। আমি ঘোষকে নিয়ে বেরুচ্ছি। আসুন ব্যোমকেশদা।'

তিনজনে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাখালবাবু পকেট থেকে খাতা বার করে বললেন—'এ সময় কাউকে বাড়িতে পাব কিনা বলা যায় না। যাহোক, চলুন আগে জগবন্ধু পাত্রকে দেখা যাক। লোকটিকে ওড্র-কুলোদ্ভব মনে হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলল—'হুঁ।'

একটা ট্যাক্সি ধরে তিনজনে উঠে বসলেন, ট্যাক্সি জগবন্ধু পাত্রের ঠিকানা লক্ষ্য করে ছুটল। রাখালবাবু বললেন—'ব্যোমকেশদা, আজ আপনি এমন চুপচাপ কেন? কিছু বলছেন না!'

ব্যোমকেশ বলল—'এখন কেবল শুনে যাচ্ছি, বলা-কওয়ার সময় এখনো আসেনি।—সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।'

জগবন্ধু থাকেন একটি তেতলা বাড়ির নীচের ফ্ল্যাটে। রাখালবাবু কড়া নাড়লেন, একটি লোক দোর খুলে দাঁড়াল। ছাঁটা দাড়ি, কোল-কুঁজো ধরনের চেহারা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ। রাখালবাবু বললেন—'আপনার নাম জগবন্ধু পাত্র?'

'হ্যাঁ।' জগবন্ধু পুলিসের ইউনিফর্ম দেখে একটু সচকিত হয়ে বললেন,—'কি দরকার?'

'নিরুপমা হোটেলে রাজকুমার বসু নামে এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন—'

জগবন্ধু পাত্রের মুখে অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটে উঠল, তিনি বলে উঠলেন—'রাজকুমার খুন হয়েছে!'

'হ্যাঁ। আপনাকে দু' একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'আসুন।' জগবন্ধু পাত্র একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের বসালেন—'বসুন, আমি এখনি আসছি।'

তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন।

বসবার ঘরটি ছোট এবং নিরাভরণ; একটি টেবিল ও তিনটি চেয়ার আছে: টেবিলের ওপর টেলিফোন। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরিয়ে ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল, কিন্তু কোথাও গৃহস্বামীর চরিত্রের কোনো পরিচয় পেল না।

পাঁচ মিনিট কাটল, দশ মিনিট কাটল, জগবন্ধু পাত্রের দেখা নেই। রাখালবাবু তখন গলা চড়িয়ে ডাকলেন—'জগবন্ধুবাবু!' কিন্তু উত্তর এল না।

ব্যোমকেশ মুখ টিপে হাসল, বলল—'মনে হচ্ছে জগবন্ধু পাত্র গৃহত্যাগ করেছেন।'

রাখালবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন 'পালিয়েছে! এসো ঘোষ, বাড়ির ভেতরটা দেখা যাক। আসুন ব্যোমকেশদা।'

ব্যোমকেশ কিন্তু গেল না: ঘোষকে নিয়ে রাখালবাবু ভিতরে গেলেন। দেখলেন, কেউ নেই, খিড়কির দোর খোলা।

রাখালবাবু ফিরে এসে বললেন—'পাখি উড়েছে।'

ব্যোমকেশ ইতিমধ্যে টেবিলের দেরাজ খুলে একটা বাঁধানো খাতা বার করেছিল, তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল—'লোকটা বোধহয় ঘোড়দৌড়ের টাউট্ ছিল।'

'তাই নাকি! কিন্তু পালাল কেন?'

'নিশ্চয় গুরুতর গলদ আছে। শুধু ঘোড়দৌড় হলে পালাত না।'

রাখালবাবু থানায় ফোন করলেন। পলাতকের বর্ণনা দিলেন, আরো লোক ডেকে পাঠালেন। তারপর ফোন নামিয়ে বললেন—'ঘোষ, তুমি এখানে থাকো. আমরা অন্য কাজে যাচ্ছি। এখনি থানা থেকে আরো লোক এসে পড়বে। বাড়ি তন্ন তন্ন করে তল্লাশ করো। আঙুলের ছাপ নিশ্চয় পাবে: তৎক্ষণাৎ হেড্ অফিসে পাঠিয়ে দেবে। লোকটা বোধহয় দাগী আসামী।'

জগবন্ধু পাত্রের বাসা থেকে বেরিয়ে রাখালবাবু ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি মনে হয়? জগবন্ধু পাত্রই আমাদের আসামী?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করে থেকে বলল—'বলা যায় না। লোকটা রাজকুমারের মৃত্যুসংবাদ শুনে চমকে উঠেছিল। তবে অভিনয় হতে পারে।'

অতঃপর মোহনলাল কুণ্ডুর বাসায় গিয়ে জানা গেল, কুণ্ডু মশাই কলকাতায় নেই। সস্ত্রীক কাশী গিয়েছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।

সেখান থেকে তাঁরা শ্যামাকান্ত লাহিড়ীর বাড়ি গেলেন। কিন্তু এখানেও নিরাশ হতে হলো। শ্যামাকান্ত বাড়ি নেই, অফিসে গেছেন। শ্যামাকান্ত পোর্ট কমিশনারের অফিসে বড় চাকরি করেন এইটুকুই শুধু জানা গেল। সন্ধ্যের

আগে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

রাখালবাবু নিশ্বাস ফেলে বললেন—'বাকি রইলেন শুধু লতিকা চৌধুরী। ইনি যখন মহিলা তখন আশা করা যায় দুপুরবেলা এঁকে বাসায় পাওয়া যাবে।'

শ্রীমতী চৌধুরী স্বতন্ত্র বাড়িতে থাকেন, ফ্ল্যাট নয়। ছোটখাটো বাড়িটি, বেশ পরিচ্ছন্ন, সামনে একফালি ফুলের বাগান। ঘণ্টি বাজাতেই একটি চশমা-পরা মহিলা দোর খুলে বললেন—'কাকে চাই? কর্তা বাড়ি নেই।' তারপরই তাঁর চকিত দৃষ্টি পড়ল রাখালবাবুর ইউনিফর্মের ওপর।

জেনারেল রামপিরিত যে বর্ণনা দিয়েছিল, মহিলাটির সঙ্গে তার মিল আছে। তবে বয়স বিশ-পঁচিশ নয়, আরো বেশি। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সেও কিন্তু ছিমছাম গড়ন এবং সুশ্রী মুখ থেকে যৌবনের রেশ সম্পূর্ণ মুছে যায়নি।

রাখালবাবু বললেন—'আপনার নাম শ্রীমতী লতিকা চৌধুরী?'

শ্রীমতী চৌধুরীর ঠোঁট হঠাৎ আলগা হয়ে গেল, তিনি স্খলিত স্বরে বললেন—'হ্যাঁ। কি দরকার?'

রাখালবাবু বললেন—'আপনাকে দু-চারটে প্রশ্ন করতে চাই। আমি পুলিসের লোক।'

শঙ্কা-শীর্ণ মুখে মিসেস চৌধুরী বললেন—'আসুন।'

বসবার ঘরটি পরিপাটিভাবে সাজানো; নীচু চেয়ার, সোফা, সেণ্টার পীস্। দেয়ালে একটি মধ্যবয়স্ক পুরুষের আবক্ষ ফটোগ্রাফ টাঙানো রয়েছে; মুখখানা কঠোর, চোখের নির্মম দৃষ্টি দর্শককে সর্বত্র অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে; এ ঘরে থাকলে ওই সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

ব্যোমকেশ ও রাখালবাবু পাশাপাশি সোফায় বসলেন; শ্রীমতী চৌধুরী একটি চেয়ারের কিনারায় বসে ভয়ার্ত চোখে তাঁদের পানে চাইলেন।

'আপনার স্বামীর নাম কি?'

'তারাকুমার চৌধুরী।'

'কি কাজ করেন?'

'ইঞ্জিনীয়র। রেলের ইঞ্জিনীয়র।'

'ছেলেপুলে?'

'নেই। আমরা নিঃসন্তান।'

'কাল রাত্রি সওয়া ন'টার সময় আপনি নিরুপমা হোটেলে গিয়েছিলেন?'

শ্রীমতী চৌধুরীর চোখ দুটি চশমার ভেতরে বিস্ফারিত হলো—'আমি! না না, আমি তো সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম।'

'হোটেলের দরোয়ান আপনাকে কাল দেখেছে, সে আপনাকে সনাক্ত করতে পারবে।'

শ্রীমতী চৌধুরীর মুখ শুকিয়ে গেল, তিনি ঠোঁট চেটে বললেন—'কিন্তু আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম—আলেয়া সিনেমাতে। টিকিটের প্রতিপত্র দেখাতে পারি।'

'আপনি সিনেমার টিকিট কিনেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ছবি শেষ হবার আগেই নিরুপমা হোটেলে গিয়েছিলেন, রাজকুমার বোসের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।'

রাজকুমারের নাম শুনে শ্রীমতী চৌধুরীর মুখ মড়ার মতন হয়ে গেল। তাঁর ঠোঁট দুটো অস্ফুটভাবে নড়তে লাগল—'রাজকুমার বসু—তাকে তো আমি চিনি না—'

ব্যোমকেশ বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন করল—'সুকান্ত সোমকে চেনেন?'

শ্রীমতী চৌধুরী জালবন্ধা হরিণীর মত ব্যোমকেশের পানে চাইলেন, তারপর দু' হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন।

ব্যোমকেশ নরম সুরে বলল—'আমরা জানি, রাজকুমার বোস আর সুকান্ত সোম একই ব্যক্তি। সে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করছিল। কাল রাত্রি সওয়া ন'টার সময় সিনেমা-ফেরত আপনি তাকে টাকা দিতে গিয়েছিলেন। এখন বাকি কথা সব বলুন, আপনার কোনো ভয় নেই।'

শ্রীমতী চৌধুরী কিছুক্ষণ ফোঁপালেন, তারপর চোখ মুছে মুখ তুললেন, ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন—'বলছি। কেন জানতে চান আপনারাই জানেন, কিন্তু দোহাই আপনাদের, আমার স্বামী যেন কিছু জানতে না পারেন।'

ব্যোমকেশ দেয়ালের ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—'ইনি আপনার স্বামী?'

'হ্যাঁ।'

'কড়া প্রকৃতির লোক মনে হয়। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আমরা কাউকে কিছু বলব না।'

তারপর মিসেস চৌধুরী লজ্জানত চোখে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে যে কাহিনী বললেন তার সারাংশ এই ঃ

বারো-তেরো বছর আগে শ্রীমতী চৌধুরী যখন কুমারী ছিলেন তখন তাঁর প্রকৃতি ছিল অন্য রকম, তিনি নিজেকে সংস্কারমুক্তা অতিআধুনিকা মনে করতেন। বাপের বাড়িতে টাকা ছিল বেশি, শাসন ছিল কম। লতিকা চক্রবর্তী বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে হৈ হৈ করে, সিনেমা-থিয়েটার দেখে সময় কাটাতেন।

সে-সময় চিত্র-জগতে সুকান্ত সোম নামে একজন হীরো ছিল, যেমন তার চেহারা তেমনি অভিনয়। লতিকা চক্রবর্তী তার প্রেমে পড়ে গেলেন, সাধারণ প্রেম নয়, একেবারে বাঁধন-ছেঁড়া প্রেম। তিনি সুকান্তকুমারকে প্রবল অনুরাগ-পূর্ণ চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা হতে লাগল।

লতিকা সুকান্তকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলেন, কিন্তু একদিন জানতে পারলেন, সুকান্তর ঘরে একটি স্ত্রী আছে। তাঁর প্রেমে ভাটা পড়ল। তাঁর বাবা বোধ হয় কিছু সন্দেহ করেছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

তারপর দু'বছর কাটল। লতিকা দেবীর স্বামী লোকটি অতিশয় সজ্জন। কিন্তু যৌন শিথিলতা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত কড়া। বিয়ের পর লতিকা চৌধুরীর রোমাঞ্চের নেশা ছুটে গিয়েছিল, স্বামীকে তিনি প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। সন্তানাদি না হলেও তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়ে উঠেছিল।

একদিন কাগজে ভয়ঙ্কর খবর বেরুল, সুকান্ত নিজের স্ত্রীকে খুন করেছে। কেস আদালতে উঠল। আসামী অবশ্য খালাস পেয়ে গেল, কারণ সে আত্মরক্ষার্থে খুন করেছে; স্ত্রী ছুরি নিয়ে তাকে আক্রমণ করেছিল, তার মুখ এবং সর্বাঙ্গ কেটে ফালা-ফালা করে দিয়েছিল, সে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে স্ত্রীকে গলা টিপে মেরেছে। যতদিন মোকদ্দমা চলেছিল ততদিন লতিকা দেবী ভয়ে কাঁটা

হয়ে ছিলেন, পাছে কোনো সূত্রে তাঁর নামটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু সাক্ষী বা আসামী কেউ তাঁর নাম করল না; তখন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

অতঃপর দু-তিন বছর নিরুপদ্রবে কেটে গেল।

সুকান্তর সিনেমার কাজ শেষ হয়েছিল; ও রকম একটা মুখ নিয়ে সিনেমার হীরো সাজা যায় না। সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিল। হঠাৎ একদিন সুকান্ত তার বীভৎস মুখ নিয়ে লতিকা দেবীর সঙ্গে দেখা করল, বলল—'আমার টাকার দরকার, তোমাকে দিতে হবে। বেশি নয়, ছ' মাস অন্তর তিন শো টাকা; তোমার পক্ষে অতি সামান্য। যদি না দাও, তুমি আমাকে যে-সব চিঠি লিখেছিলে সেগুলি তোমার স্বামীকে দেখাব।'

সেই থেকে শ্রীমতী চৌধুরী ছ' মাস অন্তর তিন শো টাকা গুনছেন। ছ' মাসে তিন শো টাকা তাঁর গায়ে লাগে না, কিন্তু সদাই ভয়, পাছে স্বামী জানতে পারেন।

কাল রাত্রে তিনি টাকা দিতে নিরুপমা হোটেলে গিয়েছিলেন, দু'নম্বর ঘরের দোরের বাইরে থেকে সুকান্ত সোমকে টাকা দিয়ে চলে এসেছিলেন। আর কিছু জানেন না।

শ্রীমতীর কাহিনী শেষ হলে শ্রোতা দু'জন কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। তারপর ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বলল—'আচ্ছা, আজ আমরা যাই। একটা সুখবর দিয়ে যাই, কাল রাত্রি সওয়া ন'টা থেকে এগারোটার মধ্যে সুকান্ত সোম ওরফে রাজকুমার বোস খুন হয়েছে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুজনে ফুটপাথে এসে দাঁড়ালেন। রাখালবাবু বললেন- 'শ্রীমতীর আত্মকথা তো শুনলাম। কিন্তু খুনের হদিস পাওয়া গেল না।'

ব্যোমকেশ বলল—'একেবারে কিছুই পাওয়া যায়নি এমন কথা বলা যায় না। আজ যতগুলি লোকের এজেহার শুনেছি তাদের মধ্যে একজন একটা বেফাঁস কথা বলেছে। কিন্তু কে বলেছে মনে করতে পারছি না।'

'কী বেফাঁস কথা?'

'সেইটেই মনে আসছে না। অনেক কথার মধ্যে ওই কথাটা মগ্নচৈতন্যে ডুব মেরেছে।'

রাখালবাবু ঘড়ি দেখলেন, প্রায় তিনটে বাজে। বললেন—'আমি এখন থানায় ফিরব। আপনি?'

'আমি একবার নতুন বাড়ির কাজকর্ম তদারক করে বাসায় ফিরব। কাল সকালে আবার দেখা হবে। ইতিমধ্যে যদি নতুন খবর কিছু পান, দয়া করে টেলিফোন করবেন।'

পাঁচটার পর বাসায় ফিরে ব্যোমকেশ এক পেয়ালা চা খেল, তারপর সিগারেট ধরিয়ে তক্তপোশের ওপর লম্বা হলো। অজিত বাড়ি নেই, সাড়ে চারটের সময় দোকানে গেছে। ব্যোমকেশ একলা একলা চোখ বুজে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

সাড়ে ছ'টার সময় সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। সত্যবতী কী একটা কাজে ঘরে এসেছিল, চমকে উঠে বলল—'কি হলো?'

ব্যোমকেশ উদ্ভাসিত মুখে বলল—'মনে পড়েছে!'

'কী মনে পড়ল?'

'কাছে এস; কানে কানে বলছি।'

কানে কানে কথা শুনে সত্যবতী হাসিমুখে ব্যোমকেশের বাহুতে একটি ছোট চড় মারল। ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল - 'আমাকে একবার বেরুতে হবে।'

'আবার বেরুবে। কোথায় যাবে?'

''কালকেতু' খবরের কাগজের অফিসে। দশ বছরের পুরনো কাগজের ফাইল দেখতে হবে।'

'ফিরতে নিশ্চয় রাত করবে। জলখাবার খেয়ে যাও।'

'দরকার নেই। পেটে নিরুপমা হোটেলের গদ আছে।'

পরদিন সকালবেলা ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে টেলিফোন করল—'তাজা খবর কিছু আছে নাকি?'

রাখালবাবু বললেন—'সাড়া-জাগানো কোনো খবর নেই। লাশ পরীক্ষা করে অপ্রত্যাশিত কেনো খবর পাওয়া যায়নি; মৃত্যুর সময় ডিনারের আন্দাজ দেড় ঘণ্টা পরে। দু'নম্বর ঘরে রাজকুমার আর গুণধরের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।—শ্যামাকান্ত লাহিড়ীর বাসায় আবার গিয়েছিলাম; সে পরিষ্কার অস্বীকার করল, বলল, নিরুপমা হোটেলে যায়নি। জেনারেল রামপিরিত কিন্তু তাকে সনাক্ত করেছে। শ্যামাকান্তকে অ্যারেস্ট করিনি, কিন্তু তার পেছনে লেজুড় লাগিয়েছি।'

'তারপর?'

'জগবন্ধু পাত্রের আসল নাম জানা গিয়েছে—ভগবান মহান্তি। দাগী আসামী; মেদিনীপুরে একটা স্ত্রীলোককে খুন করে চৌদ্দ বছর জেলে গিয়েছিল, তারপর জেল ভেঙে পালায়। কলকাতায় এসে ছদ্মনামে ঘোড়দৌড়ের দালালি করছিল।'

'আর কিছু?'

'লতিকা দেবীর স্বামী তারাকুমার চৌধুরী সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম তিনি সে-রাত্রে এগারোটার পর বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু এতক্ষণ কোথায় ছিলেন জানা যাচ্ছে না।'

'জানার দরকার নেই। হোটেলের খবর কি?'

'হোটেলের অতিথিরা বড় অস্থির হয়ে উঠেছেন। ভাবছি আজ বিকেলবেলা তাদের ছেড়ে দেব।—আপনি কিছু পেলেন?'

'পেয়েছি। আমি এখনি নিরুপমা হোটেল যাচ্ছি। আপনিও আসুন।'

এক নম্বর ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাখালবাবু ও ব্যোমকেশের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। রাখালবাবু দোরে টোকা দিলেন।

দোর খুলে গেল। মিসেস্ শোভনা রায় রাখালবাবুকে দেখে জ্বলে উঠলেন—'এই যে। আপনি আর কতদিন আমাকে আটকে রাখবেন। আমার মতন একজন ডাক্তারকে এমনভাবে আটকে রাখা আইনবিরুদ্ধ তা জানেন কি?'

রাখালবাবু বললেন—'আমার বিরুদ্ধে আপনার যদি কোনো নালিশ থাকে আদালত আছে। আপাতত আপনাকে আমরা দু-চারটে কথা বলতে চাই।'

দু'জনে ঘরে প্রবেশ করলেন, ব্যোমকেশ চেয়ারে বসে বলল—'আপনাকে একটা গল্প শোনাতে চাই মিসেস্ রায়।'

মিসেস্ রায় আবার জ্বলে উঠলেন, রূঢ়কণ্ঠে বললেন—'আপনি আবার কে! ঠাট্টা করছেন নাকি?'

রাখালবাবু বললেন—'ইনি ব্যোমকেশ বক্সী। নাম শুনে থাকবেন।'

ব্যোমকেশ বলল—'ঠাট্টা করছি না, মোটেই ঠাট্টা করছি না। আপনি বসুন।'

ব্যোমকেশের নাম শুনে মিসেস রায় থতিয়ে গিয়েছিলেন, খাটের ধারে বসলেন। রুক্ষ স্বর যথাসম্ভব নরম করে বললেন—'কি বলবেন বলুন। আমি কিন্তু আজই বহরমপুর ফিরে যাব।'

ব্যোমকেশ বলল—'সেটা ভবিষ্যতের কথা।—গল্পটি খবরের কাগজে পড়লাম, সংক্ষেপে শোনাচ্ছি।—সুকান্ত সোম একজন সিনেমা আর্টিস্ট ছিল—'

মিসেস্ রায়ের শরীর শক্ত হয়ে উঠল, তিনি অপলক চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চেয়ে রইলেন। ব্যোমকেশ শুষ্ক স্বরে বলল—'চেনেন দেখছি। চেনবারই কথা, সে আপনার জামাই ছিল।—সুকান্ত সোম সিনেমা করে খুব নাম করেছিল। আপনি তখন বর্ধমানে প্র্যাকটিস করতেন। বিধবা মানুষ, সংসারে কেবল একটি মেয়ে। বর্ধমানে সুকান্তর যাওয়া-আসা ছিল। সে একদিন আপনার মেয়েটিকে ভুলিয়ে নিয়ে ইলোপ করল। সুকান্ত আপনার মেয়েকে লোভ দেখিয়েছিল তাকে সিনেমার হিরোইন করবে। আপনি সুকান্তকে পছন্দ করতেন না, তাই ইলোপমেণ্ট।

'এক সঙ্গে কিছু দিন বাস করবার পর দু'জনের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ল; দু'জনেরই মিলিটারি মেজাজ। ঝগড়া আরম্ভ হলো। ঝগড়ার প্রধান কারণ, সুকান্ত আপনার মেয়েকে হিরোইন বানাতে পারেনি। একদিন ঝগড়া চরমে উঠল, আপনার মেয়ে ছুরি দিয়ে সুকান্তর মুখ কেটে ফালা-ফালা করে দিল। সুকান্ত নিজের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে আপনার মেয়েকে গলা টিপে খুন করল।

'খুনের আসামী সুকান্ত তিন মাস পুলিসের হাসপাতালে রইল। সেখান থেকে তাকে যখন বিচারের জন্যে আদালতে হাজির করা হলো তখন তার বীভৎস মুখ দেখে জজ সাহেব পর্যন্ত চমকে গেলেন। জেলের হাসপাতালে প্লাস্টিক সার্জারির ব্যবস্থা নেই; সুকান্তর মুখের ঘা শুকিয়েছে বটে, কিন্তু সিনেমার হিরোর পার্ট করার মত মুখ আর নেই।

'বিচার হলো। আপনি সুকান্তর বিরুদ্ধে সাক্ষী ছিলেন, মিসেস্ রায়। কিন্তু তাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে পারলেন না। তার হাতে অস্ত্র ছিল না, আপনার মেয়ের হাতে অস্ত্র ছিল; আত্মরক্ষার অজুহাতে সুকান্ত ছাড়া পেয়ে গেল।'—

মিসেস্ শোভনা রায় আগুন-ভরা চোখে বললেন—'মিছে কথা। ও আগে আমার মেয়েকে গলা টিপে মেরেছিল, তারপর নিজে নিজের মুখ ছুরি দিয়ে কেটেছিল।'

ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে বলল—'কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুকান্ত সিনেমা

আর্টিস্ট, সে কখনো নিজের মুখে ছুরি মেরে নিজের আখের নষ্ট করত না; নিজের গায়ে ছুরি মারত। যা হোক, সুকান্ত খুনের দায় থেকে রেহাই পেল বটে, কিন্তু তার সিনেমা-জীবন শেষ হয়ে গেল। সৎপথে থেকে অন্য কোনো উপায়ে জীবিকা অর্জনের রাস্তা সে জানত না, সে কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে পাটনায় বাসা বাঁধল এবং ব্ল্যাকমেলের ব্যবসা শুরু করল। গত দশ বছরে কলকাতায় কটকে কাশীতে দিল্লীতে তার অনেক খদ্দের জুটেছে। কারুর ওপর সে অযথা উৎপীড়ন করে না, ছ' মাস অন্তর এসে বাঁধা-বরাদ্দ আদায় তসিল করে। এই তার জীবিকা।

'সুকান্ত যখন আদায় তসিলের জন্যে কলকাতায় আসত তখন এই নিরুপমা হোটেলেই থাকত। আপনি ইতিমধ্যে বর্ধমানের বাস তুলে দিয়ে বহরমপুরে গিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন, আপনিও মাঝে মধ্যে এসে এই হোটেলে থাকেন। কিন্তু ঠিক একই সময়ে দু'জনের আসা আগে ঘটেনি, আপনি সুকান্তকে এখানে দেখেননি।

'দৈবক্রমে এবার আপনি তাকে দেখতে পেলেন, সে আপনার পাশের ঘরেই উঠেছে। সে বোধ হয় আপনাকে দেখতে পায়নি। পেলে সাবধান হতো। আপনি তাকে পেলে খুন করেন এই ধরনের একটা ইচ্ছে আপনার মনে ছিল, কিন্তু দশ বছর সে-আগুন ছাই-চাপা পড়েছিল। এখন সুকান্তকে হাতের কাছে পেয়ে ছাই-চাপা আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আপনার মেয়েকে যে খুন করেছে তাকে আপনি বেঁচে থাকতে দেবেন না। আপনার মেয়ে বোধ হয় আপনার কাছ থেকেই তার উগ্র হিংস্র প্রকৃতি পেয়েছিল।

'সে রাত্রে ডিনার খেয়ে এসে আপনি নিজের ঘরে অপেক্ষা করে রইলেন। কিভাবে তাকে খুন করবেন তার প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছেন, এখন শুধু শুভ-মুহূর্তের অপেক্ষা।

'সওয়া ন'টা থেকে সুকান্তর ঘরে লোক আসতে শুরু করল। আপনি নিজের ঘরে ওত পেতে আছেন। দশটার সময় লোক আসা বন্ধ হলো। আপনি অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরুলেন। দোতলার অন্য অতিথিরা দোর বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে, যে-চাকরটা সিঁড়ির সামনে শোয় সে এখনো আসেনি। এই সুযোগ।

'আপনি দু' নম্বর দোরে টোকা দিলেন। সুকান্ত তখন শুয়ে পড়েছিল, সে উঠে দোর খুলল; আপনি সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে অস্ত্রটা ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর দোর টেনে বন্ধ করে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। আপনার সঙ্গে যে রাজকুমার বোসের সম্বন্ধ আছে তা কেউ জানে না, আপনাকে কে সন্দেহ করতে পারে? বরং রাত্রে যারা রাজকুমারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, সন্দেহ পড়বে তাদের ওপর।

'আপনি একটি ছোট্ট ভুল করেছিলেন। ইন্সপেক্টর যখন আপনাকে জেরা করেন তখন আপনি বলেছিলেন, রাজকুমারকে আপনি আগে কখনো দেখেননি; তার পরেই বললেন, ও মুখ দেখলে মনে থাকত। রাজকুমারের মুখ যে মনে রাখার মত তা আপনি জানলেন কি করে? ঘরের দিকে একবার উঁকি মেরেছিলেন বটে, কিন্তু তখন আমরা তিনজন দোরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, রাজকুমারের মুখ আপনি দেখতে পাননি। এই বেফাঁস কথাটা যদি আপনি না বলতেন তাহলে দশ বছরের পুরনো খবরের কাগজের ফাইল দেখার কথা আমার মনে আসত না।'

এই পর্যন্ত বলে ব্যোমকেশ চুপ করল। মিসেস্ রায় কামারের হাপরে গনগনে আগুনের মত জ্বলতে লাগলেন। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—'সব মিছে কথা। সুকান্ত আমার মেয়েকে খুন করেছিল, কিন্তু আমি তাকে খুন করিনি। কি দিয়ে খুন করব? আমার কাছে কি ছোরা-ছুরি আছে?'

ব্যোমকেশ তাঁর ডাক্তারি ব্যাগের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—'আছে। ওই ব্যাগের মধ্যে আছে।'

মিসেস্ রায়ের চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে গেল।

'না, নেই। এই দেখুন—' ব্যাগ খুলে ক্ষিপ্র হস্তে তার ভিতর থেকে তিনি একটি কাঁচি বার করলেন। লম্বা লিকলিকে সার্জিকাল কাঁচি, তার দুটো ফলা আলাদা করা যায়। মিসেস্ রায় কাঁচির একটা ফলা খুলে নিয়ে নিজের বুকে বসিয়ে দিতে গেলেন। কিন্তু রাখালবাবু প্রস্তুত ছিলেন, তিনি বিদ্যুৎবেগে মিসেস্ রায়ের মণিবন্ধ চেপে ধরলেন। মিসেস্ রায় উন্মত্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন—'ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—'

ব্যোমকেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল—'যাক, অস্ত্রটাও পাওয়া গেছে। ওটা না পেলে মুশকিল হতো।'

ছ ল না র ছ ন্দ

টেলিফোন তুলে নিয়ে ব্যোমকেশ বলল—'হ্যালো!'

ইন্সপেক্টর রাখালবাবুর গলা শোনা গেল—'ব্যোমকেশদা, আমি রাখাল। নেতাজী হাসপাতাল থেকে কথা বলছি। একবার আসবেন?'

'কি ব্যাপার?'

'খুনের চেষ্টা। একটা লোককে কেউ গুলি করে মারবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মারতে পারেনি। আহত লোকটাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। সে এক বিচিত্র গল্প বলছে।'

'তাই নাকি? আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।'

কেয়াতলায় ব্যোমকেশের বাড়ি থেকে নেতাজী হাসপাতাল বেশি দূর নয়। আধ ঘণ্টা পরে বিকেল আন্দাজ পাঁচটার সময় ব্যোমকেশ সেখানে পৌঁছে দেখল, এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সামনে দারোগা রাখাল সরকার দাঁড়িয়ে আছেন।

এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি আরো কিছু তথ্য উদ্‌ঘাটন করলেন। আহত লোকটির নাম গঙ্গাপদ চৌধুরী, ভদ্রশ্রেণীর লোক। ফ্রেজার রোড থেকে একটা ছোট রাস্তা বেরিয়েছে, সেই রাস্তায় একটা বাড়ির দোতলার ঘরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। বাড়ির ঠিকে চাকর বেলা তিনটের সময় কাজ করতে এসে গঙ্গাপদকে আবিষ্কার করে। তারপর হাসপাতাল পুলিস ইত্যাদি। গঙ্গাপদর জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু প্রচুর রক্তপাতের ফলে এখনো ভারি দুর্বল।

গঙ্গাপদ আজ বিকেলবেলা তার দোতলার ঘরে রাস্তার দিকে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ সামনের দিক থেকে বন্দুকের গুলি এসে তার চুলের মধ্যে দিয়ে লাঙল চষে চলে যায়। খুলির ওপর গভীর টানা দাগ পড়েছে, কিন্তু গুলি খুলি ফুটো করে ভিতরে ঢুকতে পারেনি, হাড়ের ওপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে গেছে।

বন্দুকের গুলিটা ঘরের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে, দেখে মনে হলো পিস্তল কিংবা রিভলবারের গুলি। পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছে।

এবার চলুন গঙ্গাপদর বয়ান শুনবেন। তাকে খানিকটা রক্ত দেওয়া হয়েছে, এতক্ষণে সে বোধ হয় বেশ চনমনে হয়েছে।

•

গঙ্গাপদ চৌধুরী একটি ছোট ঘরে সংকীর্ণ লোহার খাটের ওপর শুয়ে ছিল। মাথার ওপর পাগড়ির মত ব্যান্ডেজ, তার নীচে শীর্ণ লম্বাটে ধরনের একটি মুখ। মুখের রঙ বোধ করি রক্তপাতের ফলে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। ভাবভঙ্গিতে ভালমানুষির ছাপ।

ব্যোমকেশ ও রাখালবাবু খাটের দু'পাশে চেয়ার টেনে বসলেন। গঙ্গাপদ একবার এর দিকে একবার ওর দিকে তাকাল; তার পাংশু অধরে একটুখানি ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। লোকটি মৃত্যুর সিংদরজা থেকে ফিরে এসেছে, কিন্তু তার

মুখে চোখে ত্রাসের কোনো চিহ্ন নেই।

রাখালবাবু বললেন—'এ'র নাম ব্যোমকেশ বক্সী। ইনি আপনার গল্প শুনতে এসেছেন।'

গঙ্গাপদর চক্ষু হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল, সে ধড়মড় করে উঠে বসবার চেষ্টা করলে ব্যোমকেশ তার বুকে হাত রেখে আবার শুইয়ে দিল, বলল—'উঠবেন না, শুয়ে থাকুন।'

গঙ্গাপদ বুকের ওরপ দু'হাত জোড় করে সংহত সুরে বলল—'আপনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশবাবু! কী সৌভাগ্য। আমার কলকাতা আসা সার্থক হলো।'

রাখালবাবু বললেন—'আপনি যদি শরীরে যথেষ্ট বল পেয়ে থাকেন তাহলে ব্যোমকেশবাবুকে আপনার গল্প শোনান। আর যদি এখনো দুর্বল মনে হয় তাহলে থাক, আমরা পরে আবার আসব।'

গঙ্গাপদ বলল—'না না, আমার আর কোনো দুর্বলতা নেই। খুব খানিকটা রক্ত নাড়ীর মধ্যে ঠুসে দিয়েছে কিনা।' বলে হেসে উঠল।

'তাহলে বলুন।'

খাটের পাশে টিপাইয়ের ওপর এক গ্লাস জল রাখা ছিল, গঙ্গাপদ বালিশের ওপর উ'চু হয়ে শুয়ে এক চুমুক জল খেলো, তারপর হাসি-হাসি মুখে গল্প বলতে আরম্ভ করল ঃ

আমার নাম কিন্তু গঙ্গাপদ চৌধুরী নয়, অশোক মাইতি। কলকাতায় এসে আমি কেমন করে গঙ্গাপদ চৌধুরী বনে গেলাম সে ভারি মজার গল্প। বলি শুনুন।

আমার বাড়ি মীরাটে। সিপাহী যুদ্ধেরও আগে আমার পূর্বপুরুষ মীরাটে গিয়ে বাসা বে'ধেছিলেন। সেই থেকে আমরা মীরাটের বাসিন্দা, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক খুব বেশি নেই।

আমি মীরাটে সামান্য চাকরি করি। বাড়িতে বিধবা মা আছেন; আর একটি আইবুড়ো বোন। আমি বিয়ে করেছিলাম কিন্তু বছর পাঁচেক আগে বিপত্নীক হয়েছি। আর বিয়ে করিনি। বোনটাকে পাত্রস্থ না করা পর্যন্ত –

কিন্তু সে যাক। অফিসে এক মাস ছুটি পাওনা হয়েছিল, ভাবলাম কলকাতা বেড়িয়ে আসি। কলকাতায় আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই; আমি ছেলেবেলায় একবার কলকাতায় এসেছিলাম, তারপর আর আসিনি। ভাবলাম স্বদেশ দেখাও হবে, আর সেই সঙ্গে বোনটার জন্যে যদি একটি পাত্র পাই—

হাওড়ায় এসে নামলাম। মীরাট থেকে এক হিন্দুস্থানী ধর্মশালার ঠিকানা এনেছিলাম, ঠিক ছিল সেখানেই উঠব। ট্রেন থেকে নেমে ফটকের দিকে চলেছি, দেখি একটা দাড়িওয়ালা লোক আমার পাশে পাশে চলেছে, আর ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে আমার পানে তাকাচ্ছে। একবার মনে হলো কিছু বলবে, কিন্তু মুখ খুলে কিছু না বলে আবার মুখ বন্ধ করল। আমি ভাবলাম, এ আবার কে? হয়তো হোটেলের দালাল।

ধর্মশালায় পে'ৗছে কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেলাম। সেখানে একটি কুঠুরীও খালি নেই, সব ভর্তি। এখন হোটেলে যেতে হয়; কিন্তু হোটেলে অনেক খরচ, অত খরচ আমার পোষাবে না। কি করব ভাবছি, এমন সময় সেই দাড়িওয়ালা লোকটি এসে উপস্থিত। চোখে নীল চশমা লাগিয়েছে। বলল—'জায়গা পেলেন না?'

বললাম—'না। আপনি কে?'

সে বলল—'আমার নাম গঙ্গাপদ চৌধুরী। আপান কোথা থেকে আসছেন?'

বললাম—'মীরাট থেকে। আমার নাম অশোক মাইতি। আপনি কি হোটেলের এজেন্ট?'

সে বলল-'না। হাওড়া স্টেশনে আপনাকে দেখেছিলাম. দেখেই চমক লেগে-ছিল। কেন চমক লেগেছিল সে কথা পরে বলছি। এখন বলুন দেখি, কলকাতায় কি আপনার থাকবার জায়গা নেই?'

বললাম—'থাকলে কি ধর্মশালায় আসি? কিন্তু এখানেও দেখছি জায়গা নেই। হোটেলের খরচ দিতে পারব না। তাই ভাবছি কী করি।'

গঙ্গাপদ বলল—'দেখুন, আমার একটা প্রস্তাব আছে। কলকাতায় আমি থাকি, দক্ষিণ কলকাতায় আমার বাসা আছে। আমি মাস খানেকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি, বাসাটা খালি পড়ে থাকবে। ত আপনি যদি আমার বাসায় থাকেন আপনারও সুবিধে আমারও সুবিধে। আমার একটা ঠিকে চাকর আছে. সে আপনার দেখা-শোনা করবে; কোনো কষ্ট হবে না।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম—'আমার মতন একজন অচেনা লোকের হাতে আপনি বাসা ছেড়ে দেবেন!'

গঙ্গাপদ একটু হেসে বলল-'তাহলে চমক লাগার কথাটা বলি। স্টেশনে আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল আপনি আমার ভাই দুর্গাপদ। তারপর ভুল বুঝতে পারলাম। দুর্গাপদ দু' বছর আগে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, বোধ হয় সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে তার চেহারার খুব মিল আছে। তাই—মানে—আপনার প্রতি আমার একটু—ইয়ে—। আপনি যদি আমার বাসায় থাকেন আমি খুব নিশ্চিন্ত হব।'

আমার ভাগ্যে এমন যোগাযোগ ঘটবে স্বপ্নেও ভাবিনি। খুশী হয়ে রাজী হয়ে গেলাম।

গঙ্গাপদ আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে তার বাসায় নিয়ে গেল। ছোট রাস্তায় ছোট বাড়ির দোতলায় একটি মাঝারি গোছের ঘর. ঘরে তক্তপোশের ওপর বিছানা, দেয়ালে আলমারি, দু' একটা বাক্স সুটকেস। আর কিছু নেই।

হিন্দুস্থানী চাকরটা উপস্থিত ছিল। তার নাম রামচতুর। গঙ্গাপদ তাকে পয়সা দিল দোকান থেকে চা জলখাবার আনতে। সে চলে গেলে গঙ্গাপদ রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দিয়ে তক্তপোশে এসে বসল, বলল—'বসুন, আপনার সঙ্গে আরো কিছু কথা আছে।'

আমিও তক্তপোশে বসলাম। গঙ্গাপদ বলল—'আমার বাড়িওয়ালা কাশীপুরে থাকে, লোকটা ভাল নয়। সে যদি জানতে পারে আমি অন্য কাউকে ঘরে বসিয়ে একমাসের জন্য বাইরে গেছি তাহলে হাঙ্গামা বাধাতে পারে। তাই আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। যদি কেউ আপনার নাম জিজ্ঞেস করে, আপনি বলবেন—গঙ্গাপদ চৌধুরী। লোকে ভাববে আমি দাড়ি কামিয়ে ফেলেছি।'

শুনে আমার খুব মজা লাগল, বললাম—'বেশ তো, এ আর বেশি কথা কি!'

তারপর রামচতুর চা জলখাবার নিয়ে এল। গঙ্গাপদ আমাকে জলযোগ করিয়ে উঠে পড়ল, বলল—'আচ্ছা, এবার তাহলে আমি চলি। আমার জিনিসপত্র ঘরে রইল। নিশ্চিন্ত মনে বাস করুন। নমস্কার।'

দোর পর্যন্ত গিয়ে গঙ্গাপদ ফিরে এল, বলল—'একটা কথা বলা হয়নি। যখন ঘরে থাকবেন, মাঝে মাঝে জানলা খুলে রাস্তার দিকে তাকাবেন, লক্ষ্য করবেন রাস্তা দিয়ে লাল কোট পরা কোনো লোক যায় কিনা। যদি দেখতে পান, তারিখ আর সময়টা লিখে রাখবেন। কেমন?'

'আচ্ছা।'

গঙ্গাপদ চলে গেল। আমার সন্দেহ হলো তার মাথার ছিট আছে। কিন্তু থাকুক ছিট, লোকটা ভাল। আমি বেশ আরামে রইলাম। রামচতুর আমার সেবা করে। আমি সকাল বিকেল এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই, দুপুরে আর রাত্রে ঘরে থাকি। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, রাস্তা দিয়ে লাল কোট পরা কেউ যাচ্ছে কিনা। লাল কোট পরে কলকাতার রাস্তায় কেউ ঘুরে বেড়াবে এ যেন ভাবাই যায় না। তবু গঙ্গাপদ যখন বলেছে, হবেও বা।

হপ্তা খানেক বেশ আরামে কেটে গেল।

আজ সকালে খবরের কাগজের অফিসে গেছলাম বোনের পাত্র সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞাপন দিতে। ফিরে এসে খাওয়াদাওয়া সেরে তক্তপোশে শুলাম। রামচতুর চলে গেল।

ঘুম ভাঙল আন্দাজ পোনে তিনটের সময়। বিছানা থেকে উঠে জানলা খুলে দিলাম। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছি, হঠাৎ মাথাটা ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল, উল্‌টে মেঝের ওপর পড়ে গেলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই, অসহ্য যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

হাসপাতালে জ্ঞান হলো। মাথায় পাগড়ি বেঁধে শুয়ে আছি। কে নাকি আমার মাথা লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়েছিল, বন্দুকের গুলি আমার খুলির ওপর আঁচড় কেটে চলে গেছে।—'কী ব্যাপার বলুন দেখি ব্যোমকেশবাবু?'

'সেটা বুঝতে সময় লাগবে। আপনি এখন বিশ্রাম করুন।' ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়াল।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ রাখালবাবু ব্যোমকেশের বাড়িতে এলেন। ব্যোমকেশ তার অফিস ঘরে বসে অলসভাবে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ছিল রাখালবাবুকে একটি সিগারেট দিয়ে বলল—'নতুন খবর কিছু আছে নাকি?'

রাখালবাবু সিগারেট ধরিয়ে বললেন—'রামচতুর পালিয়েছে।'

'রামচতুর! ও—সেই চাকরটা।'

'হ্যাঁ। কাল বিকেলবেলা পুলিসকে খবর দিয়ে সেই যে গা-ঢাকা দিয়েছে তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সত্যিই রাম-চতুর। পুলিসের হাঙ্গামায় থাকতে চায় না। এতক্ষণ বোধ হয় বেহার প্রদেশে ফিরে গিয়ে ভুট্টা পুড়িয়ে খাচ্ছে। আর কিছু?'

'বাড়িওয়ালাকে কাশীপুর থেকে খুঁজে বার করেছি। আজ সকালে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। অশোক মাইতিকে দেখে বলল, এই গঙ্গাপদ চৌধুরী; তারপর গলার আওয়াজ শুনে বলল, না গঙ্গাপদ নয়, কিন্তু চেহারার খুব মিল আছে।'

এই পর্যন্ত শুনে ব্যোমকেশ বলল—'গঙ্গাপদ চৌধুরীর সঙ্গে অশোক মাইতির চেহারার মিল আছে?'

রাখালবাবু বললেন—'হ্যাঁ, গঙ্গাপদ বলেছিল তার ভায়ের সঙ্গে মিল আছে, গঙ্গাপদ এবং তার ভায়ের চেহারা যদি এক রকম হয়—'

'গঙ্গাপদর দাড়িটা মেকি মনে হচ্ছে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অশোক মাইতিকে এনে নিজের বাসায় তুলল কেন? নিজের নামটাই বা তাকে দান করল কেন? আসল কারণটা কী?'

ব্যোমকেশ কি-একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর অলস কণ্ঠে বলল—'চিন্তার কথা বটে। আসল গঙ্গাপদ বোধ করি এখনো নিরুদ্দেশ?'

'হ্যাঁ। তার ঘরের আলমারি থেকে কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় সে কলকাতায় এক লোহার কারখানায় কাজ করে, সম্প্রতি একমাসের ছুটি নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।'

'গুলিটা কোথা থেকে এসেছিল জানা গেছে?'

'সামনের বাড়ি থেকে। রাস্তার ওপারে একটা পোড়ো বাড়ি কিছুদিন থেকে খালি পড়ে আছে, তার দোতলার জানলা থেকে কেউ গুলি ছুঁড়েছিল। পোড়ো বাড়ির ঘরের মধ্যে কয়েকটা তাজা আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, কিন্তু কার আঙুলের ছাপ তা সনাক্ত করার উপায় নেই।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ সংবাদগুলিকে একত্র করে মনের মধ্যে রোমন্থন করল, তারপর বলল—'রহস্যটা কিছু পরিষ্কার হলো?'

রাখালবাবু সিগারেটে দুটো লম্বা টান দিয়ে সেটাকে অ্যাশ-ট্রের ওপর নিবিয়ে দিলেন, আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে বলতে আরম্ভ করলেন 'গঙ্গাপদ চৌধুরীর দাড়ি যে নকল দাড়ি তার একটা জোরালো প্রমাণ তার বাড়িওয়ালা তার মুখে কখনো দাড়ি-গোঁফ দেখেনি; আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, গঙ্গাপদ ছদ্মবেশে বেড়ায় কেন। একটা কারণ এই হতে পারে যে, সে ছদ্মবেশে কোনো গুরুতর অপরাধ করতে চায়। তারপর একদিন হাওড়া স্টেশনে সে অশোক মাইতিকে দেখতে পায়, নিজের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে তাকে ভুলিয়ে নিজের বাসায় এনে বসায়, তারপর নিজে গা-ঢাকা দেয়। হয়তো সে নিজেই সামনের বাড়ি থেকে অশোককে খুন করবার চেষ্টা করেছিল, যাতে লোকে মনে করে যে, গঙ্গাপদই মরেছে। হয়তো এইভাবে সে জীবন বীমার টাকা সংগ্রহ করতে চেয়েছিল। যাই হোক, এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, তার পরিচয় এবং বর্তমান ঠিকানা আমরা জানি না; সে অশোক মাইতিকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল কিনা তা নিশ্চয়ভাবে জানি না, কারণ তার কাগজপত্রের মধ্যে জীবন বীমার পলিসি পাওয়া যায়নি। এখন কর্তব্য কি?'

ব্যোমকেশ একটু ভেবে বলল—'মীরাটে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে?'

রাখালবাবু বললেন—'অশোক মাইতিকে দিয়ে মীরাটে তার মা'র নামে টেলিগ্রাম করিয়েছি। এখনো জবাব আসেনি। কেন, আপনি কি অশোক মাইতিকে সন্দেহ করেন?'

'অশোক মাইতিকে বড় বেশি ভাল মানুষ বলে মনে হয়। সে হয়তো সত্যি কথাই বলছে, কিন্তু তার কোনো সমর্থন নেই। রামচতুর সমর্থন করতে পারত, কিন্তু সে পালিয়েছে।—যাক, গঙ্গাপদ কোথায় কাজ করে?'

'কলকাতার উপকণ্ঠে একটা লোহার কারখানা আছে সেইখানে।' রাখালবাবু

পকেট থেকে নোটবুক বার করে পড়লেন Scrap Iron & Steel Factory Ltd.

'সেখানে খোঁজ নিলে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে।'

'সেখানে যাব বলেই বেরিয়েছি। আপনি আসবেন সঙ্গে?'

'যাব। বাড়িতে বেকার বসে থাকার চেয়ে ঘুরে বেড়ালে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।'

কলকাতার দক্ষিণ সীমানার বাইরে বিঘে দুই জমির ওপর লোহার কারখানা। জমির এধারে ওধারে কয়েকটা করোগেট টিনের উঁচু ছাউনি, তাদের ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে স্তূপীকৃত জং ধরা ঝুনো পুরনো লোহা। চারিদিকে কর্মীদের তৎপরতা দেখে মনে হয় কারখানার কাজ চালু আছে। ফটকের পাশে একটি ছোট পাকা বাড়ি, এটি কোম্পানীর অফিস।

ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু যখন কারখানায় পৌঁছুলেন তখন কারখানার ম্যানেজার রতনলাল কাপাড়িয়া অফিস ঘরে ছিলেন। রতনলাল মাড়োয়ারী হলেও তিন পুরুষ ধরে বাংলাদেশে আছেন, প্রায় বাঙালী হয়ে গেছেন; পরিষ্কার বাংলা বলেন। দু'জনকে সামনে বসিয়ে পান সিগারেট দিলেন, বললেন—'হুকুম করুন।'

রাখালবাবু একবার ব্যোমকেশের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন আরম্ভ করলেন, ব্যোমকেশ চুপ করে বসে শুনতে লাগল।—

'গঙ্গাপদ চৌধুরী এখানে কাজ করে?'

'হ্যাঁ। উপস্থিত ছুটিতে আছে।'

'সে কী কাজ করে?'

'ইলেকট্রিক ফার্নেসের মেল্টার।'

'সে কাকে বলে?'

'আজকাল ইলেকট্রিক আগুনে লোহা গলানো হয়। যে লোক এই কাজ জানে তাকে মেল্টার বলে। গঙ্গাপদ আমার সর্দার মেল্টার। সে ছুটিতে গেছে বলে আমার একটু অসুবিধে হয়েছে। তার অ্যাসিস্টেন্ট দু'জন আছে বটে, কোনো মতে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। আমাদের দেশে ভাল মেল্টার বেশি নেই, যে দু'চারজন আছে, গঙ্গাপদ তাদের একজন।'

'তাই নাকি! সে ছুটি নিল কেন?'

'তার একমাস ছুটি পাওনা হয়েছিল। মনে হচ্ছে যেন বলেছিল ভারত ভ্রমণে যাবে; আজকাল সব স্পেশাল ট্রেন হয়েছে সারাদেশ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।'

'হ্যাঁ। ওর আত্মীয়স্বজন কেউ আছে?'

'বোধ হয় না। একলা থাকত।'

'ওর স্বভাব চরিত্র কেমন?'

'খুব কাজের লোক। বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। হুঁশিয়ার।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে তাকালেন। ব্যোমকেশ যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল, একটু সজাগ হয়ে বলল—'গঙ্গাপদর কোনো শত্রু আছে কিনা আপনি জানেন?'

রতনলাল ভুরু তুললেন—'শত্রু! কই, গঙ্গাপদর শত্রু আছে এমন কথা তো কখনো শুনিনি—ওঃ!'

তিনি হঠাৎ হেসে উঠলেন—'একজনের সঙ্গে গঙ্গাপদর শত্রুতা হয়েছিল, সে এখন জেলে।'

'তিনি কে?'

'তার নাম নরেশ মণ্ডল। তিন বছর আমার সর্দার মেল্টার ছিল, গঙ্গাপদ ছিল তাঁর অ্যাসিস্টেন্ট। দু'জনের মধ্যে খিটিমিটি লেগে থাকত। নরেশ ছিল রাগী, আর গঙ্গাপদ মিটমিটে বজ্জাত। কিন্তু দু'জনেই সমান কাজের লোক। আমি মজা দেখতাম। তারপর হঠাৎ একদিন নরেশ একজনকে খুন করে বসল। গঙ্গাপদ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল। নরেশের জেল হয়ে গেল।'

'খুনের জন্যে জেল! কতদিনের মেয়াদ জানেন?'

'ঠিক জানি না। চার পাঁচ বছর হবে। নরেশ জেলে যাবার পর গঙ্গাপদ সর্দার মেল্টার হয়ে বসল।' বলে রতনলাল হো হো শব্দে হাসলেন।

ব্যোমকেশ হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল—'আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি, এবার উঠি। একটা কথা—গঙ্গাপদকে আপনি শেষবার দেখেছেন কবে?'

'দিন বারো-চোদ্দ আগে।'

'তখন তার মুখে দাড়ি ছিল?'

'দাড়ি! গঙ্গাপদর কস্মিনকালেও দাড়ি ছিল না।'

'ধন্যবাদ।'

রাস্তায় বেরিয়ে রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন—'অতঃপর?'

ব্যোমকেশ বলল—'অতঃপর অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো ছাড়া আর তো কোনো রাস্তা দেখছি না।—এক কাজ করা যেতে পারে। চার পাঁচ বছর আগে নরেশ মণ্ডল খুন করে জেলে গিয়েছিল; তার বিচারের দলিলপত্র আদালতের দপ্তর থেকে তুমি নিশ্চয় যোগাড় করতে পারবে। অন্তত হাকিমের রায়টা যোগাড় কর। সেটা পড়ে দেখলে হয়তো কিছু হদিস পাওয়া যাবে।'

রাখালবাবু বললেন 'বেশ, রায় যোগাড় করব। নেই কাজ তো খই ভাজ। কাল সকালে আপনি খবর পাবেন।'

ব্যোমকেশরা প্রায় মাস ছয়েক হলো কেয়াতলার নতুন বাড়িতে এসেছে। বাড়িটি ছোট, কিন্তু দোতলা। নীচে তিনটি ঘর, ওপরে দু'টি। সত্যবতী এই বাড়িটি নিয়ে সারাক্ষণ যেন পুতুল খেলা করছে। আনন্দের শেষ নেই; এটা সাজাচ্ছে, ওটা গোছাচ্ছে, নিজের হাতে ঝাঁট দিচ্ছে, ঝাড়-পোঁছ করছে। ব্যোমকেশ কিন্তু নির্বিকার, শালগ্রামের শোয়া-বসা বোঝা যায় না।

পরদিন বিকেল বেলায় ব্যোমকেশ তার বসবার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল, দেখছিল লাল কোট পরা কোনো লোক চোখে পড়ে কি না। কয়েকটি লাল শাড়ি পরা মহিলা গেলেন, দু' একটি লাল ফ্রকপরা খোকাখুকীকেও দেখা গেল, কিন্তু লাল কোট পরা বয়স্থ পুরুষ একটিও দৃষ্টিগোচর হলো না। অনুমান হয় আজকাল লাল কোট পরে কোনো পুরুষ কলকাতার রাস্তায় বেরোয় না।

এই সময় টেলিফোন বাজল। রাখালবাবু বললেন—'ব্যোমকেশদা, মামলার রায় পেয়েছি। পড়ে দেখলাম আমাদের কাজে লাগতে পারে এমন কিছু নেই। পিওনের হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি পড়ে দেখুন।'

আধঘণ্টা পরে থানা থেকে কনেস্টবল এসে রায় দিয়ে গেল। আলিপুর

আদালতের জজ সাহেবের রায়, কড়া সরকারী কাগজে বাজাপ্তা নকল। পনরো-ষোল পৃষ্ঠা। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরিয়ে পড়তে বসল।

রায়ের আরম্ভে জজ সাহেব ঘটনার বয়ান করেছেন। তারপর সাক্ষী-সাবুদের আলোচনা করে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন। রায়ের সারংশ এই ঃ

'আসামী নরেশ মণ্ডল, বয়স ৩৯। Scrap Iron & Steel Factory Ltd. নামক লোহার কারখানায় কাজ করে। অপরাধ—রাস্তায় একজন ভিক্ষুককে খুন করিয়াছে। পিনাল কোডের ৩০৪।৩২৩ ধারা অনুযায়ী দায়রা সোপর্দ হইয়াছে।

'প্রধান সাক্ষী গঙ্গাপদ চৌধুরী এবং অন্যান্য সাক্ষীর এজাহার হইতে জানা যায় যে, আসামী অত্যন্ত বদরাগী ও কলহপ্রিয়। ঘটনার দিন বিকাল আন্দাজ পাঁচটার সময় আসামী নরেশ মণ্ডল ও সাক্ষী গঙ্গাপদ চৌধুরী এক সঙ্গে কর্মস্থল হইতে বাসায় ফিরিতেছিল। দুজনে পূর্বোক্ত লোহার কারখানায় কাজ করে, গঙ্গাপদ চৌধুরী নরেশ মণ্ডলের সহকারী।

'পথ চলিতে চলিতে বাজারের ভিতর দিয়া যাইবার সময় নরেশ সামান্য কারণে গঙ্গাপদর সঙ্গে ঝগড়া জুড়িয়া দিল; তখন গঙ্গাপদ তাহার সঙ্গে সঙ্গে না গিয়া পিছাইয়া গেল; নরেশ আগে আগে চলিতে লাগিল, গঙ্গাপদ তাহার বিশ গজ পিছনে রহিল।

'এই সময় একটা কোট-প্যাণ্ট পরা মাদ্রাজী ভিক্ষুক নরেশের পিছনে লাগিল. ভিক্ষা চাহিতে চাহিতে নরেশের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভিক্ষুকটার চেহারা জীর্ণ-শীর্ণ, কিন্তু সে ইংরাজীতে কথা বলে। বাজারে অনেকেই তাহাকে চিনিত।

'গঙ্গাপদ তাহাদের পিছনে যাইতে যাইতে দেখিল, নরেশ ক্রুদ্ধভাবে হাত নাড়িয়া তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্ত ভিক্ষুক তাহার সঙ্গ ছাড়িতেছে না। তারপর হঠাৎ নরেশ পাশের দিকে ফিরিয়া ভিক্ষুকের গালে সজোরে একটা চড় মারিল। ভিক্ষুক রাস্তার উপর পড়িয়া গেল। নরেশ আর সেখানে দাঁড়াইল না, গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল।

'গঙ্গাপদ বিশ গজ পিছন হইতে সবই দেখিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিল ভিক্ষুক অনড় পড়িয়া আছে; তারপর তাহার নাড়ী টিপিয়া দেখিল সে মরিয়া গিয়াছে। ডাক্তারের রিপোর্ট থেকে জানা যায় তাহার প্রাণশক্তি বেশি ছিল না, অল্প আঘাতেই মৃত্যু হইয়াছে।

'ইতিমধ্যে আরও অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নরেশকে চড় মারিতে দেখিয়াছিল। তাহারা পুলিসে খবর দিল। পুলিস নরেশের বাসায় গিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল।

'পুলিসের পক্ষে এই মামলায় যাহারা সাক্ষী দিয়াছে তাহারা সকলেই নিরপেক্ষ, কেবল গঙ্গাপদ ছাড়া। আসামী অপরাধ অস্বীকার করিয়াছে; তাহার বক্তব্য—গঙ্গাপদ তাহার শত্রু, তাহাকে সরাইয়া কর্মক্ষেত্রে তাহার স্থান অধিকার করিতে চায়; তাই সে মিথ্যা মামলা সাজাইয়া তাহাকে ফাঁসাইয়াছে।

'এ কথা সত্য যে সাক্ষী গঙ্গাপদ নিঃস্বার্থ ব্যক্তি নয়; কিন্তু অন্য সাক্ষীদের সঙ্গে তাহার এজাহার মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গঙ্গাপদর সাক্ষ্য মিথ্যা নয়।

'এ অবস্থায় আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য ৩০৪ ধারা অনুসারে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ধার্য হইল।'

ব্যোমকেশের রায় পড়া যখন শেষ হলো তখন সন্ধ্যা নেমেছে, ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ অন্ধকারে চুপ করে বসে রইল, তারপর আলো জেবলে টেলিফোন তুলে নিল—

'রাখাল! রায় পড়লাম।'

'কিছু পেলেন?'

'একটা রাগী মানুষের চরিত্র পেলাম।'

'তাহলে রায় পড়ে কোনো লাভ হলো না?'

'বলা যায় না।—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার লুকানো রতন।'

'তা বটে।'

'ভাল কথা, পোড়ো বাড়িতে যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল তার ফটো নেওয়া হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'গঙ্গাপদ চৌধুরীর পাত্তা পাওয়া যায়নি?'

'না। ভারত ভ্রমণের যত স্পেশাল ট্রেন আছে তাদের অফিসে খোঁজ নিয়েছিলাম কিন্তু গঙ্গাপদ চৌধুরী নামে কোনো যাত্রীর নাম নেই।'

'হুঁ। হয়তো ছদ্মনামে গিয়েছে।'

'কিংবা যায়নি। কলকাতাতেই কোথাও লুকিয়ে বসে আছে।'

'তাও হতে পারে। আর কোনো নতুন খবর আছে?'

'এইমাত্র মীরাট থেকে তার এসেছে। অশোক মাইতি খাঁটি মীরাটের লোক। ওখানে কোনো জাল-জুচ্চুরি নেই।'

'ভাল। আর কিছু?'

'নতুন খবর আর কিছু নেই। এখন কর্তব্য কি বলুন।'

'কর্তব্য কিছু ভেবে পাচ্ছি না। একটা কথা। নরেশের জেলের মেয়াদ এতদিনে ফুরিয়ে আসার কথা, সে জেল থেকে বেরিয়েছে কিনা খবর নিতে পার?'

'পারি। কাল সকালে খবর পাবেন।'

পরদিন বেলা ন'টার সময় রাখালবাবু ব্যোমকেশের কাছে এলেন। মুখ গম্ভীর। বললেন—'ব্যাপার গুরুতর। দেড়মাস আগে নরেশ মণ্ডল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। জেলে ভাল ছেলে সেজে ছিল তাই কিছু দিনের রেয়াত পেয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলল—'হুঁ। জেল থেকে বেরিয়ে সে কোথায় গেছে সন্ধান পেয়েছ?'

'তার পুরোনো বাসায় যায়নি। কারখানাতেও যায়নি, কাল রতনলাল কাপড়িয়ার মুখে তা জানতে পেরেছি। সুতরাং সে ডুব মেরেছে।'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করে থেকে বলল—'ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হচ্ছে। নরেশের মনে যদি পাপ না থাকবে তাহলে সে ডুব মারবে কেন? সে রতনলালের কাছে গিয়ে চাকরিটা আবার ফিরে পাবার চেষ্টা করত।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'গল্পটা এখন কালানুক্রমে সাজানো যেতে পারে।—নরেশ মণ্ডল রাগী এবং ঝগড়াটে, গঙ্গাপদ মিটমিটে শয়তান। দু'জনে এক কারখানায় কাজ করত:

দু'জনের মধ্যে খিটিমিটি লেগেই থাকত। গঙ্গাপদর মতলব নরেশকে সরিয়ে নিজে তার জায়গায় বসবে। কিন্তু নরেশকে সরানো সহজ নয়, সে কাজের লোক।

'হঠাৎ গঙ্গাপদ সুযোগ পেয়ে গেল। নরেশ রাস্তায় একটা ভিখিরিকে চড় মেরে শেষ করে দিল। আর যায় কোথায়। গঙ্গাপদ নরেশকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল।

'নরেশের কিন্তু ফাঁসী হলো না। সে দোষী সাব্যস্ত হলেও তার তিন বছর কারাদণ্ড হলো। গঙ্গাপদর পক্ষে এটা মন্দের ভাল, সে কারখানায় সর্দার মেস্টার হয়ে বসল। নরেশ জেলে গেল।

'নরেশ লোকটা শুধু বদমেজাজী নয়, সে মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখে। জেলে যাবার সময় সে বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করেছিল, গঙ্গাপদকে খুন করে প্রতিহিংসা সাধন করবে। তিন বছর ধরে সে এই প্রতিহিংসার আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে।

'গঙ্গাপদ জানত নরেশের তিন বছরের জেল হয়েছে, সে তক্কেতক্কে ছিল। তাই নরেশ যখন মেয়াদ ফুরবার আগেই জেল থেকে বেরুল, গঙ্গাপদ জানতে পারল। তার প্রাণে ভয় ঢুকল। হয়তো সে দেখেছিল নরেশ তার বাসার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিংবা সামনের পোড়ো বাড়ি থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। গঙ্গাপদ ঠিক করল কিছুদিনের জন্যে বাসা থেকে উধাও হবে।

'সে কারখানা থেকে একমাসের ছুটি নিল এবং একটা দাড়ি যোগাড় করে তাই পরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, যাতে নরেশ তাকে দেখলেও চিনতে না পারে। গঙ্গাপদ বোধহয় সত্যিই ভারত ভ্রমণে যাবার মতলব করেছিল, তারপর হঠাৎ একদিন হাওড়া স্টেশনে অশোক মাইতির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে দেখল অশোক মাইতির চেহারা অনেকটা তার নিজের মত।

'গঙ্গাপদ লোকটা মহা ধূর্ত। তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, অশোক মাইতিকে যদি কোনোমতে নিজের বাসায় এনে তুলতে পারে তাহলে নরেশ ভুল করে তাকেই খুন করবে এবং ভাববে, গঙ্গাপদকে খুন করেছে। গঙ্গাপদ নিরাপদ হবে, তাকে আর প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে না। চাকরিটা অবশ্য যাবে; কিন্তু প্রাণ আগে, না চাকরি আগে? গঙ্গাপদ নিশ্চয় বুঝেছিল যে, নরেশ তাকে সামনের জানলা থেকে গুলি করে মারবে।

'এবার নরেশের দিকটা ভেবে দেখা যাক। নরেশ জেল থেকে বেরিয়ে একটা পিস্তল যোগাড় করেছিল। পুরোনো বাসায় ফিরে যাবার কোনো মানে হয় না, সে অন্য কোথাও আড্ডা গেড়েছিল এবং গঙ্গাপদর বাসার সামনে পোড়ো বাড়িটায় যাতায়াত করেছিল। তার বোধ হয় মতলব ছিল গঙ্গাপদ কখনো তার জানলা খুলে দাঁড়ালে সে রাস্তার ওপার থেকে তাকে গুলি করে মারবে, তারপর কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। গঙ্গাপদ খুন হবার পর কলকাতা শহর আর তার পক্ষে নিরাপদ নয়, পুলিস তাকে সন্দেহ করতে পারে।

'যা হোক, গঙ্গাপদ অশোক মাইতিকে নিজের বাসায় বসিয়ে লোপাট হলো। অশোক মাইতিকে উপদেশ দিয়ে গেল, সে যেন মাঝে মাঝে জানলা খুলে লক্ষ্য করে, রাস্তা দিয়ে লাল কোট পরা কেউ যায় কি না। লাল কোট পরা মানুষটা নিছক কল্পনা; আসল উদ্দেশ্য অশোক মাইতি জানলা খুলে দাঁড়াবে এবং নরেশ সামনের জানলা থেকে তাকে গুলি করবে।

'সবই ঠিক হয়েছিল কিন্তু একটু চুক হয়ে গেল; অশোক মাইতি আহত হলো,

মরল না। সে পুলিসকে সব ঘটনা বলল। এখন গঙ্গাপদ আর নরেশ দু'জনের অবস্থাই সমান, ওরা কেউ আর আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। খবরের কাগজে সংবাদ ছাপা হয়েছে, দু'জনকেই পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'নরেশ অবশ্য আইনত অপরাধী, সে খুন করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গঙ্গাপদ লোকটা মহা পাষণ্ড; জেনেশুনে সে একজন নিরীহ লোককে অনিবার্য মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু সে যদি ধরাও পড়ে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে কি না সন্দেহ।'

ব্যোমকেশ চুপ করল। রাখালবাবুও নীরবে কিছুক্ষণ টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে আঁকজোক কেটে বললেন—'তা যেন হলো। কিন্তু যাকে আইনত শাস্তি দেওয়া যাবে তাকে ধরবার উপায় কি বলুন!'

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ব্যোমকেশ বলল—'একমাত্র উপায়—বিজ্ঞাপন।'

'বিজ্ঞাপন!'

'হ্যাঁ।—পুকুরে ছিপ ফেলে বসে থাকা। মাছ যদি টোপ গেলে তবেই তাকে ধরা যাবে।'

তিন দিন পরে কলকাতার দুইটি প্রধান সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বেরুল
বম্বে স্টীল ফাউণ্ড্রী লিমিটেড—
আমাদের বম্বের কারখানার জন্য অভিজ্ঞ ইলেকট্রিক মেল্টার চাই।
বেতন—৭০০-২৫-১০০০্।
প্রশংসাপত্র সহ দেখা করুন।

গড়িয়াহাট বাজারের কাছে রাস্তার উপর একটি ঘর, তার মাথার উপর সাইন-বোর্ড ঝুলছে—বম্বে স্টীল ফাউণ্ড্রী লিমিটেড (ব্রাঞ্চ অফিস)।

ঘরের মধ্যে একটি টেবিলের সামনে রাখালবাবু বসে আছেন, তাঁর পরিধানে সাদা কাপড়চোপড়। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে নথিপত্র দেখছেন। অদূরে অন্য একটি ছোট টেবিলে ব্যোমকেশ টাইপরাইটার নিয়ে বসেছে। ঘরের দোরের কাছে তকমা-আঁটা একজন বেয়ারা। আর যারা আছে তারা প্রচ্ছন্নভাবে এদিকে ওদিকে আছে, তাদের দেখা যায় না।

প্রথম দিন ব্যোমকেশ ও রাখালবাবু বেলা দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অফিস ঘরে বসে রইলেন, কোনো চাকরি-প্রার্থী দেখা করতে এল না। পাঁচটার সময় ঘরের দোরে তালা লাগাতে লাগাতে রাখালবাবু বললেন—'বিজ্ঞাপন চালিয়ে যেতে হবে।'

পরদিন একটি লোক দেখা করতে এল। রোগা-পটকা লোক, এক চড়ে মানুষ মেরে ফেলবে এমন চেহারা নয়। তার প্রশংসাপত্র দেখে জানা গেল, তার নাম প্রফুল্ল দে, সে একজন ইলেকট্রিকের মিস্ত্রী। সে বলল, ইলেকট্রিক মেল্টারের কাজ সে কখনো করেনি বটে, কিন্তু সুযোগ পেলে চেষ্টা করতে রাজী আছে। রাখাল-বাবু তার নাম-ধাম লিখে নিয়ে মিষ্টি কথায় বিদায় দিলেন।

তৃতীয় দিন তৃতীয় প্রহরে একটি লোক দেখা করতে এল। তাকে দেখেই রাখালবাবুর শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে উঠল। মজবুত হাড়-চওড়া শরীর, গায়ের রং কালো, চোখের কোণে একটু রক্তিমাভা; গায়ে খাকি কোট, মাথায় চুল ক্রু-কাট করে ছাঁটা। সে সতর্কভাবে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে ঘরে ঢুকল। রাখালবাবুর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ধরা-ধরা গলায় বলল—'বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি।'

'বসুন।'

লোকটি সন্তর্পণে সামনের চেয়ারে বসল, একবার ব্যোমকেশের দিকে তীক্ষ্ন সতর্ক চোখ ফেরাল। রাখালবাবু সহজ সুরে বললেন—'ইলেকট্রিক মেল্টারের কাজের জন্য এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'সার্টিফিকেট এনেছেন?'

লোকটি খানিক চুপ করে থেকে বলল—'আমার সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে। তিন বছর অসুখে ভুগেছি, কাজ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তারপর—সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছি।'

'আগে কোথায় কাজ করতেন?'

'নাগপুরে একটা আয়রন ফাউণ্ড্রী আছে, সেখানে কাজ করতাম।—দেখুন, আমি সত্যিই ইলেকট্রিক মেল্টারের কাজ জানি। বিশ্বাস না হয় আমি নিজের খরচে বম্বে গিয়ে তা প্রমাণ করে দিতে পারি।'

রাখালবাবু লোকটিকে ভাল করে দেখলেন, তারপর বললেন—'সে কথা মন্দ নয়।' কিন্তু আমাদের এটা ব্রাঞ্চ অফিস, সবেমাত্র খোলা হয়েছে। আমি নিজের দায়িত্বে কিছু করতে পারি না। তবে এক কাজ করা যেতে পারে। আমি আজ বম্বেতে হেড অফিসে 'তার' করব, কাল বিকেল নাগাদ উত্তর পাব। আপনি কাল এই সময়ে যদি আসেন—'

'আসব, নিশ্চয় আসব।' লোকটি উঠে দাঁড়াল।

রাখালবাবু ব্যোমকেশের দিকে তাকিয়ে বললেন -'বক্সী, ভদ্রলোকের নাম আর ঠিকানা লিখে নাও।'

ব্যোমকেশ বলল—'আজ্ঞে।'

নাম আর ঠিকানা দিতে হবে শুনে লোকটি একটু থতিয়ে গেল, তারপর বলল—'আমার নাম নৃসিংহ মল্লিক। ঠিকানা ১৭ নম্বর কুঞ্জ মিস্ত্রী লেন।'

ব্যোমকেশ নাম ঠিকানা লিখে নিল। ইতিমধ্যে রাখালবাবু টেবিলের তলায় একটি গুপ্ত বোতাম টিপেছিলেন, বাইরে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের কাছে খবর গিয়েছিল যে, ঘর থেকে যে ব্যক্তি বেরুবে তাকে অনুসরণ করতে হবে। রাখালবাবু নিঃসংশয় বুঝেছিলেন যে, এই ব্যক্তিই নরেশ মণ্ডল। কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করার আগে তার বাসার ঠিকানা পাকাভাবে জানা দরকার। সেখানে বন্দুক পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু কিছুই প্রয়োজন হলো না।

নরেশ দোরের দিকে পা বাড়িয়েছে এমন সময় আর একটি লোক ঘরে প্রবেশ করল। নবাগতকে চিনতে তিলমাত্র বিলম্ব হয় না, একেবারে অশোক মাইতির যমজ ভাই। সুতরাং গঙ্গাপদ চৌধুরী। আজ আর তার মুখে দাড়ি নেই।

গঙ্গাপদ নরেশকে দেখবার আগেই নরেশ গঙ্গাপদকে দেখেছিল; বাঘের মত

চাপা গর্জন তার গলা থেকে বেরিয়ে এল, তারপর সে গঙ্গাপদর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল। দু'হাতে তার গলা টিপে ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলতে লাগল—'পেয়েছি তোকে! শালা—শুয়ার কা বাচ্চা—আর যাবি কোথায়!'

রাখালবাবু দ্রুত পকেট থেকে বাঁশী বার করে বাজালেন। আরদালী এবং আর যেসব পুলিসের লোক আনাচে-কানাচে ছিল তারা ছুটে এল। গলা টিপুনি খেয়ে গঙ্গাপদর তখন জিভ বেরিয়ে পড়েছে। সকলে মিলে টানাটানি করে নরেশ আর গঙ্গাপদকে আলাদা করল। রাখালবাবু নরেশের হাতে হাতকড়া পরালেন। বললেন—'নরেশ মণ্ডল, গঙ্গাপদ চৌধুরীকে খুনের চেষ্টার অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো।'

নরেশ মণ্ডল রাখালবাবুর কথা শুনতেই পেল না, গঙ্গাপদর পানে আরক্ত চক্ষু মেলে গজরাতে লাগল—'হারামজাদা বেইমান, তোর বুক চিরে রক্ত পান করব—'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ বসেছিল, চেয়ার ছেড়ে ওঠেনি। সে এখন টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট ধরাল।

রাখালবাবু তাঁর একজন সহকর্মীকে বললেন—'ধীরেন, এই নাও নরেশ মণ্ডলের ঠিকানা। ওর ঘর খানাতল্লাশ কর। সম্ভবত একটা রিভলবার কিংবা পিস্তল পাবে।' আমরা এদের দু'জনকে লক আপ-এ নিয়ে যাচ্ছি।'

গঙ্গাপদ মেঝেয় বসে গলায় হাত বুলোচ্ছিল, চমকে উঠে বলল—'আমাকে লক-আপ-এ রাখবেন। আমি কী অপরাধ করেছি?'

রাখালবাবু বললেন—'তুমি অশোক মাইতিকে খুন করাবার চেষ্টা করেছিলে। তোমার অপরাধ পিনাল কোডের কোন দফায় পড়ে পাবলিক প্রসিকিউটার তা স্থির করবেন। ওঠো এখন।'

সন্ধ্যের পর ব্যোমকেশের বসবার ঘরে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে রাখালবাবু বললেন—'আচ্ছা ব্যোমকেশদা, নরেশ মণ্ডল আর গঙ্গাপদ চৌধুরী—দু'জনেই চাকরির খোঁজে আসবে আপনি আশা করেছিলেন?'

ব্যোমকেশ বলল—'আশা করিনি, তবে সম্ভাবনাটা মনের মধ্যে ছিল। কিন্তু ওরা যে একই সময়ে এসে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ শুরু করে দেবে তা কল্পনা করিনি। ভালই হলো, একই ছিপে জোড়ামাছ উঠল।—নরেশ মণ্ডলের ঘরখানা তল্লাশ করে কী পেলে?'

'পিস্তল পাওয়া গেছে। ওর বিরুদ্ধে মামলা পাকা হয়ে গেছে। এখন দেখা যাক গঙ্গাপদকে পাকড়ানো যায় কি না। তাকে হাজতে রেখেছি, আর কিছু না হোক, কয়েকদিন হাজত-বাস করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক।'

'হুঁ। অশোক মাইতির খবর কি?'

'সে এখনো হাসপাতাল থেকে বেরোয়নি। বেরুলেও তাকে এখন কলকাতায় থাকতে হবে। সে আমাদের প্রধান সাক্ষী।'

ব্যোমকেশ হঠাৎ হেসে উঠল, বলল—'কথায় বলে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। অশোক মাইতি খুব বেঁচে গেছে। ও না বাঁচলে এমন রহস্যটা রহস্যই থেকে যেত।'

শজারুর কাঁটা

উপক্রম

ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল মাস তিনেক আগে এবং কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলেই আবদ্ধ হয়ে ছিল।

গোল পার্কের আড়-পার একটা রাস্তায় কোণের ওপর একটি অস্থায়ী চায়ের দোকান। দিনের আলো ফোটবার আগেই সেখানে চা তৈরি হয়ে যায়। মাটির ভাঁড়ে গরম চা। সঙ্গে বিস্কুটও পাওয়া যায়। এই দোকানের অধিকাংশ খদ্দের ট্যাক্সি ড্রাইভার, বাস কন্ডাক্টার ইত্যাদি। যাদের খুব সকালে কাজে বেরুতে হয় তারা এই দোকানের পৃষ্ঠপোষক।

বুড়ো ভিখিরি ফাগুরাম ছিল এই দোকানের খদ্দের। সে রাত্রে ফুটপাথের একটা ঘোঁজের মধ্যে শুয়ে থাকত, ভোর হতে না হতে দোকান থেকে এক ভাঁড় চা আর দু'টি বিস্কুট কিনে তার ভিক্ষাস্থানে গিয়ে বসত। ফাগুরামের বয়স অনেক, উপরন্তু সে বিকলাঙ্গ, তাই দিনান্তে সে এক টাকার বেশী রোজগার করত।

সেদিন ফাল্গুন মাসের প্রত্যূষে আকাশ থেকে তখনো কুয়াশার ঘোর কাটেনি, ফাগুরাম দোকান থেকে চায়ের ভাঁড় আর বিস্কুট নিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসল। চায়ের দোকানে লোক থাকলেও রাস্তায় তখনো লোক চলাচল আরম্ভ হয়নি।

ফাগুরামের অভ্যাস সে রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে খায়। সে এক চুমুক চা খেয়ে বিস্কুটে একটি ছোট্ট কামড় দিয়েছে, তার মনে হল পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। সে পিছন দিকে ঘাড় ফেরালো, কিন্তু স্পষ্টভাবে কিছু দেখবার আগেই সে পিঠের বাঁ দিকে কাঁটা ফোঁটার মত তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল। অর্ধভুক্ত বিস্কুট তার হাত থেকে পড়ে গেল। তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

ভিক্ষুক ফাগুরামের অপমৃত্যুতে বিশেষ হইচই হল না। দিনের আলো ফুটলে তার মৃতদেহটা পথচারীদের চোখে পড়ল, তারা মৃতদেহকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তারপর লাশ স্থানান্তরিত হল। খবরের কাগজের এক কোণে খবরটা বেরুল বটে, কিন্তু সেটা মারণাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যের জন্যে। ভিক্ষুকের পিঠের দিক থেকে একটা ছয় ইঞ্চি লম্বা শজারুর কাঁটা তার হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়া দেওয়া হয়েছে।

সংবাদপত্রে যারা খবরটা পড়ল তারা এই নিয়ে একটু আলোচনা করল। ভিক্ষুককে কে খুন করতে পারে? হয়তো অন্য কোনো ভিক্ষুক খুন করেছে। কিন্তু শজারুর কাঁটা কেন? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর নেই। পুলিস এ ব্যাপার নিয়ে বেশী দিন মাথা ঘামাল না।

মাসখানেক পরে কিন্তু ভিক্ষুকের অপমৃত্যুর কথাটা আবার সকলের মনে পড়ে গেল। আবার শজারুর কাঁটা। রাত্রে রবীন্দ্র সরোবরের একটা বেঞ্চিতে শুয়ে একজন মুটে-মজুর শ্রেণীর লোক ঘুমোচ্ছিল, আততায়ী কখন এসে নিঃশব্দে তার বুকের বাঁ দিকে শজারুর কাঁটা বিঁধে দিয়ে চলে গেছে। সকালবেলা যখন লাশ

আবিষ্কৃত হল তখন মৃতদেহ শক্ত হয়ে গেছে। মৃতের পরিচয় তখনো জানা যায়নি।

এবার সংবাদপত্রের সামনের দিকেই খবরটা বেরুল এবং বেশ একটু সাড়া জাগিয়ে তুলল। ছোরাছুরির বদলে শজারুর কাঁটা দিয়ে খুন করার মানে কি! খুনী কি পাগল? ক্রমে মৃত ব্যক্তির পরিচয় বেরুল, তার নাম মঙ্গলরাম; সে সামান্য একজন মজুর, তার থাকবার জায়গা ছিল না, তাই যখন যেখানে সুবিধা হত সেখানে রাত কাটত। তার শত্রু কেউ ছিল না, অন্তত খুন করতে পারে এমন শত্রু ছিল না! পুলিস দু'-চার দিন তল্লাশ-তদন্ত করে হাল ছেড়ে দিল।

তৃতীয় দিনের ঘটনাটা হল আরো দু' হপ্তা পরে। গরম পড়ে গেছে, দিন বাড়ছে, রাত কমছে।

গুণময় দাসের জীবনে সুখ ছিল না। তাঁর একটি ছোট মনিহারীর দোকান আছে, একটি ছোট পৈতৃক বাস্তুভিটা আছে, আর আছে একটি প্রচণ্ড দজ্জাল বউ। তার চল্লিশ বছর বয়সেও ছেলেপুলে হয়নি, হবার আশাও নেই। তাই রসের অভাবে তাঁর জীবনটা শুকিয়ে ঝামা হয়ে গিয়েছিল। তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে মদ ধরেছিলেন। জীবন যখন শুকায়ে যায় তখন ওই বস্তুটি নাকি করুণাধারায় নেমে আসে।

রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় গুণময়বাবু দোকান বন্ধ করে বাড়ির অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে তাঁর প্রাণে কোনো উৎসাহ ছিল না, বরং বাড়ি ফিরে গিয়ে আজ তিনি স্ত্রীর কোন্ প্রলয়ঙ্কর মূর্তি দেখবেন এই চিন্তায় তাঁর পদক্ষেপ মন্থর হয়ে আসছিল। তারপর সামনেই যখন মদের দোকানের দরজা খোলা পাওয়া গেল তখন সুট করে সেখানে ঢুকে পড়লেন।

এক ঘন্টা পরে দোকান থেকে বেরিয়ে তিনি আবার গড়িয়ার দিকে চললেন; ওই দিকেই তাঁর বাড়ি। যেতে যেতে তাঁর পা একটু টলতে লাগল, তিনি বুঝলেন আজ মাত্রা একটু বেশী হয়ে গেছে। স্ত্রী যদি বুঝতে পারে, যদি মুখে গন্ধ পায়—

আরো কিছু দূর যাবার পর রবীন্দ্র সরোবরের রেলিং আরম্ভ হল রাস্তার ডান পাশে। পথে লোকজন বেশী নেই, লেকের অন্ধকার এবং রাস্তায় আলো মিলে একটা অস্পষ্ট কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেছে।

গুণময়বাবু রাস্তার একটা নিরিবিলি অংশে এসে লেকের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন, রেলিং-এ হাত রেখে প্যাঁচার মত চক্ষু মেলে ভিতরের দিকে চেয়ে রইলেন।

একটি লোক গুণময়বাবুর কুড়ি-পঁচিশ হাত পিছনে আসছিল; সে গুণময়বাবুর পদসঞ্চারের টলমল ভাব লক্ষ করেছিল। তাই তিনি যখন রেলিং ধরে দাঁড়ালেন, তখন সেও বিশ-পঁচিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁকে নিরীক্ষণ করে অলস পদে তাঁর দিকে অগ্রসর হল।

লোকটি যখন গুণময়বাবুর পিছনে এসে দাঁড়াল তখনো তিনি কিছু জানতে পারলেন না। লোকটি এদিক ওদিক চেয়ে দেখল লোক নেই। সে পকেট থেকে শলাকার মত একটি অস্ত্র বার করল, অস্ত্রটিকে আঙুল দিয়ে শক্ত করে ধরে গুণময়বাবুর পিঠের বাঁ দিকে পাঁজরার হাড়ের ফাঁক দিয়ে গভীরভাবে বিঁধিয়ে দিল। গুণময়বাবুর গায়ে মলমলের পাঞ্জাবি ছিল, শলাকা সটান তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে

প্রবেশ করল।

গুণময়বাবু পলকের জন্যে বুকে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করলেন, তারপর তাঁর সমস্ত অনুভূতি অসাড় হয়ে গেল।

অতঃপব খবরের কাগজে তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হল। একটা বেহেড পাগল শজারুর কাঁটা নিয়ে শহরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু অকর্মণ্য পুলিস তাকে ধরতে পারছে না, এই আক্ষেপের উষ্মা কলকাতার অধিবাসীদের, বিশেষত দক্ষিণ দিকের অধিবাসীদের গরম করে তুলল। বৈঠকে বৈঠকে উত্তেজিত জল্পনা চলতে লাগল। সন্ধ্যার পর পার্কের জনসমাগম প্রায় শূন্যের কোঠাতে গিয়ে দাঁড়াল।

এইভাবে দিন দশ-বারো কাটল। বলা বাহুল্য, আততায়ী ধরা পড়েনি, কিন্তু উত্তেজনার আগুন স্তিমিত হয়ে এসেছে। একদিন ব্যোমকেশের কেয়াতলার বাড়িতে রাত্রি সাড়ে ন'টার পর ইন্সপেক্টর রাখালবাবু এসেছিলেন, অজিতও উপস্থিত ছিল; স্বভাবতই শজারুর কাঁটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

অজিত বলল—'কিন্তু এত অস্ত্রশস্ত্র থাকতে শজারুর কাঁটা কেন?'

রাখালবাবু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আড়চোখে ব্যোমকেশের পানে তাকালেন; ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে বলল—'সম্ভবত আততায়ীর পোষা শজারু আছে। বিনামূল্যে কাঁটা পায় তাই ছোরাছুরির দবকাব হয় না।'

অজিত বলল—'বাজে কথা বলো না। নিশ্চয় কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। আচ্ছা রাখালবাবু, এই যে তিন-তিনটে খুন হয়ে গেল, আসামী তিনজন কি একজন সেটা বুঝতে পেবেছেন?'

রাখালবাবু বললেন—'একজন বলেই তো মনে হয়।'

ব্যোমকেশ বলল—'তিনজন হতেও বাধা নেই। মনে কর, প্রথমে একজন হত্যাকারী ভিখিরিকে শজাবুর কাঁটা দিয়ে খুন করল। তাই দেখে আব একজন হত্যাকারীর মাথায় আইডিয়া খেলে গেল, সে একজন ঘুমন্ত মজুবকে কাঁটা দিয়ে খুন করল। তারপর—'

'আর বলতে হবে না, বুঝেছি। তিন নম্বর হত্যাকারী তাই দেখে একজন দোকানদারকে খুন করল।'

ব্যোমকেশ বলল—'সম্ভব। কিন্তু যা সম্ভব তাই ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। তার চেয়ে ঢের বেশী ইঙ্গিতপূর্ণ কথা হচ্ছে, যারা খুন হয়েছে তাদের মধ্যে একজন ভিখিরি, একজন মজুব এবং একজন দোকানদার।'

এর মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ কী আছে, আমার বুদ্ধির অগম্য। তোমরা গল্প কর, আমি শুতে চললাম।' অজিত উঠে গেল। তার আর রহস্য-রোমাঞ্চের দিকে ঝোঁক নেই।

রাখালবাবু ব্যোমকেশেব পানে চেয়ে মৃদু হাসলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন—'সত্যিই কি পাগলের কাজ? নইলে তিনজন বিভিন্ন স্তরের লোককে খুন করবে কেন? কিন্তু পাগল হলে কি সহজে ধরা যেত না?'

ব্যোমকেশ বলল—'পাগল হলেই ন্যালাক্ষ্যাপা হয় না। অনেক পাগল আছে যারা এমন ধূর্ত যে তাদের পাগল বলে চেনাই যায় না।'

রাখালবাবু বললেন—'তা সত্যি। ব্যোমকেশদা, আপনি যতই থিওরি তৈরি করুন, আপনার অন্তরের বিশ্বাস একটা লোকই তিনটে খুন করেছে। আমারও তাই বিশ্বাস। এখন বলুন দেখি, যে লোকটা খুন করেছে সে পাগল—এই কি

আপনার অন্তরের বিশ্বাস?'

ব্যোমকেশ দ্বিধাভরে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর কি একটা বলবার জন্যে মুখ তুলেছে এমন সময় দ্রুতচ্ছন্দে টেলিফোন বেজে উঠল। ব্যোমকেশ টেলিফোন তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ শুনল, তারপর রাখালবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—'তোমার কল্।'

ফোন হাতে নিয়ে রাখালবাবু বললেন—হ্যালো—' তারপর অপর পক্ষের কথা শুনতে শুনতে তাঁর মুখের ভাব বদলে যেতে লাগল। শেষে—'আচ্ছা, আমি আসছি' বলে তিনি আস্তে আস্তে ফোন রেখে দিলেন, বললেন—'আবার শজারুর কাঁটা। এই নিয়ে চার বার হল। এবার উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোক। কিন্তু আশ্চর্য! ভদ্রলোক মারা যাননি। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

ব্যোমকেশ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলল—'মারা যাননি?'

রাখালবাবু বললেন—'না। কি যেন একটা রহস্য আছে। আমি চলি। আসবেন নাকি?'

ব্যোমকেশ বলল—'অবশ্য।'

কাহিনী

দক্ষিণ কলিকাতায় ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নতুন রাস্তার ওপর একটি ছোট দোতলা বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। খোলা জায়গায় এখানে ওখানে কয়েকটা অনাদৃত ফুলের গাছ।

বাড়িটি কিন্তু অনাদৃত নয়। বাড়ির বহিরঙ্গ যেমন ফিকে নীল রঙে রঞ্জিত এবং সুশ্রী, ভিতরটিও তেমনি পরিচ্ছন্ন ছিমছাম। নীচের তলায় একটি বসবার ঘর; তার সঙ্গে খাবার ঘর, রান্নাঘর এবং চাকরের ঘর। দোতলায় তেমনি একটি অন্তরঙ্গ বসবার ঘর এবং দু'টি শয়নকক্ষ। বছর চার-পাঁচ আগে যিনি এই বাড়িটি প্রৌঢ় বয়সে তৈরি করিয়েছিলেন তিনি এখন গতাসু, তাঁর একমাত্র পুত্র দেবাশিস এখন সস্ত্রীক এই বাড়িতে বাস করে।

একদিন চৈত্রের অপরাহ্ণে দোতলার বসবার ঘরে দীপা একলা বসে রেডিও শুনছিল। দীপা দেবাশিসের বউ; মাত্র দু'মাস তাদের বিয়ে হয়েছে। দীপা একটি আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে ছিল। ঘরে আসবাব বেশী নেই; একটি নীচু টেবিল ঘিরে কয়েকটি আরাম-কেদারা; দেয়াল ঘেঁষে একটি তক্তপোশ, তার ওপর ফরাশ ও মোটা তাকিয়া। এ ছাড়া ঘরে আছে রেডিওগ্রাম এবং এক কোণে টেলিফোন।

রেডিওগ্রামের ঢাকনির ভিতর থেকে গানের মৃদু গুঞ্জন আসছিল। ঘরটি ছায়াচ্ছন্ন, দোর জানলা ভেজানো। দীপা চেয়ারের পিঠে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে ছিল। বাড়িতে একলা তার সারা দুপুর এমনিভাবেই কাটে।

দীপার এই আলস্যশিথিল চেহারাটি দেখতে ভাল লাগে। তার রঙ ফর্সাই বলা যায়, মুখের গড়ন ভাল; কিন্তু ভ্রূর ঋজুরেখা এবং চিবুকের দৃঢ়তা মুখে একটা অপ্রত্যাশিত বলিষ্ঠতা এনে দিয়েছে, মনে হয় এ মেয়ে সহজ নয়, সামান্য নয়।

'' দেয়ালের ঘড়িতে ঠুং ঠুং করে পাঁচটা বাজল। দীপার চোখ দুটো অমান খুলে গেল; সে ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে রেডিও বন্ধ করে দিল, তারপর উঠে বাইরের দরজার দিকে চলল। দরজা খুলতেই সামনে সিঁড়ি নেমে গেছে। দীপা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে ডাকল—'নকুল।'

নকুল বাড়ির একমাত্র চাকর এবং পাচক, সাবেক কাল থেকে আছে। সে এক-তলার খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঁচু দিকে চেয়ে বলল—'হ্যাঁ বউদি. দাদাবাবুর জলখাবার তৈরি আছে।'

দীপা তখন গায়ের শিথিল কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। সিঁড়ির শেষ ধাপে পেঁছেছে এমন সময় কিড়িং কিড়িং শব্দে সদর দরজার ঘণ্টি বেজে উঠল।

দীপা গিয়ে দোর খুলে দিল। কোট-প্যাণ্ট পরা দেবাশিস প্রবেশ করল। দুজনে দুজনের মুখের পানে তাকালো কিন্তু তাদের মুখে হাসি ফুটল না। এদের জীবনে হাসি সুলভ নয়। দীপা নিরুৎসুক সুরে বলল—'জলখাবার তৈরি আছে।'

দেবাশিস কণ্ঠস্বরে শিষ্টতার প্রলেপ মাখিয়ে বলল—'বেশ. বেশ. আমি জামা-কাপড় বদলে এখনই আসছি।'

সে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দীপা মন্থর পদে খাবার ঘরে গিয়ে টেবিলের এক পাশে বসল।

লম্বাটে ধরনের খাবার টেবিল; চারজনের মতন জায়গা. গাদাগাদি করে ছ'জন বসা চলে। দীপা এক প্রান্তে বসে দেখতে লাগল, নকুল দুটি প্লেটে খাবার সাজাচ্ছে: লুচিভাজা. আলুর দম, বাড়িতে তৈরি সন্দেশ। নকুল মানুষটি বেঁটে-খাটো. মাথার চুল পেকেছে. কিন্তু শরীর বেশ নিটোল। বেশী কথা কয় না, কিন্তু চোখ দুটি সতর্ক এবং জিজ্ঞাসু। দীপা তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল—নকুল নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে। তবু নকুলের সামনে ধোঁকার টাটি খাড়া রাখতে হয়। শুধু নকুল কেন. পৃথিবীসুদ্ধ লোকের সামনে। বিচিত্র তাদের বিবাহিত জীবন।

ধুতি পাঞ্জাবি পরে দেবাশিস নেমে এল। একহারা দীঘল চেহারা, ফর্সা সুশ্রী মুখ; বয়স সাতাশ কি আটাশ। সে টেবিলের অন্য প্রান্তে এসে বসতেই নকুল খাবারের প্লেট এনে তার সামনে রাখল, দীপার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল—'তোমাকেও দেব নাকি বউদি?'

দীপা মাথা নেড়ে বলল—'না, আমি পরে খাব।' দেবাশিসের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া এখনো তার অভ্যাস হয়নি: তার বাপের বাড়িতে অন্য রকম রেওয়াজ, পুরুষদের খাওয়া শেষ হলে তবে মেয়েরা খেতে বসে। দীপা সহজে অভ্যাস ছাড়তে পারে না; তবু রাত্রির আহারটা দু'জনে টেবিলের দু' প্রান্তে বসে সম্পন্ন করে। নইলে নকুলের চোখেও বড় বিসদৃশ দেখাবে।

কিছুক্ষণ কোনো কথাবার্তা নেই; দেবাশিস একমনে লুচি আলুর দম খাচ্ছে; দীপা যা-হোক একটা কোনো কথা বলতে চাইছে কিন্তু কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। পিছন থেকে নকুলের সতর্ক চক্ষু তাদের লক্ষ করছে।

শেষ পর্যন্ত দেবাশিসই প্রথম কথা কইল. সোজা হয়ে বসে দীপার পানে চেয়ে একটু হেসে বলল—'আজ একটা নতুন ক্রীম তৈরি করেছি।'

দেবাশিসের কাজকর্ম সম্বন্ধে দীপা কখনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করেনি কিন্তু এখন সে আগ্রহ দেখিয়ে বলল—'তাই নাকি? কিসের ক্রীম?'

দেবাশিস বলল—'মুখে মাখার ক্রীম।'

'ও মা সত্যি? কেমন গন্ধ?'

'তা আমি কি করে বলব। যারা মাখবে তারা বলতে পারবে।'

'তা বাড়িতে একটু যদি আনো, আমি মেখে দেখতে পারি।'

দেবাশিস হাসিমুখে মাথা নাড়ল—'তোমার এখন মাখা চলবে না, অন্য লোকের মুখে মাখিয়ে দেখতে হবে মুখে ঘা বেরোয় কিনা। পরীক্ষা না করে বলা যায় না।'

'কার মুখে মাখিয়ে পরীক্ষা করবে?'

'ফ্যাক্টরির দারোয়ান ফৌজদার সিং-এর মুখে মাখিয়ে দেখব। তার গালের চামড়া হাতীর চামড়ার মতন।'

দীপার মুখে হাসি ফুটল; সে যে নকুলের সামনে অভিনয় করছে তা ক্ষণ-কালের জন্যে বিস্মরণ হয়েছিল, দেবাশিসের মুখের হাসি তার মুখে সংক্রামিত হয়েছিল।

আহার শেষ করে দেবাশিস উঠল। দু'জনে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির নীচে এসে দাঁড়াল। দেবাশিস হঠাৎ আগ্রহভরে বলল—'দীপা, আজ উৎপলা সিনেমাতে একটা ভাল ছবি দেখাচ্ছে। দেখতে যাবে?'

দেবাশিস আগে কখনো দীপাকে সিনেমায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেনি; দীপার শরীরের ভিতর দিয়ে একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ বয়ে গেল। তারপরই তার মন শক্ত হয়ে উঠল। সে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল—'না, আমি যাব না।'

দেবাশিসের মুখ ম্লান হয়ে গেল, তারপর গম্ভীর হয়ে উঠল। সে কিছুক্ষণ দীপার পানে চেয়ে থেকে বলল—'ভয় নেই, সিনেমা-ঘরের অন্ধকারে আমি তোমার গায়ে হাত দেব না।'

আবার দীপার শরীর কেঁপে উঠল, কিন্তু সে আরো শক্ত হয়ে বলল—'না, সিনেমা আমার ভাল লাগে না।' এই বলে সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। দেবাশিস ওপর দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল—'আমি নৃপতিদার বাড়িতে যাচ্ছি, ফিরতে সাড়ে আটটা হবে।'

সদর দরজা খুলে দেবাশিস বাইরে এল, দোরের সামনে তার ফিয়াট গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে; কাজ থেকে ফিরে এসে সে গাড়িটা দোরের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ভেবেছিল, সিনেমা দেখতে যাবার প্রস্তাব করলে দীপা অমত করবে না। তার মন সহজে তিক্ত হয় না, কিন্তু আজ তার মন তিক্ত হয়ে উঠল। এতটুকু বিশ্বাস দীপা তাকে করতে পারে না! এই দু' মাস দীপা তার বাড়িতে আছে, কোনো দিন কোনো ছুতোয় সে দীপার গায়ে হাত দেয়নি, নিজের দাম্পত্য অধিকার জারি করেনি। তবে আজ দীপা তাকে এমনভাবে অপমান করল কেন?

দেবাশিস গাড়ির চালকের আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল। বাড়ির পিছন দিকে গাড়ি রাখার ঘর, সেখানে গাড়ি রেখে সে পায়ে হেঁটে বেরুল। নৃপতি লাহার বাড়ি পাঁচ মিনিটের রাস্তা। নৃপতির বৈঠকখানায় রোজ সন্ধ্যার পর আড্ডা বসে, দেবাশিস প্রায়ই সেখানে যায়।

দীপা ওপরে এসে আবার আরাম-কেদারায় এলিয়ে পড়ল। তার মনের মধ্যে দশদিক তোলপাড় করে ঝড় বইছে, সারা গায়ে অসহ্য ছটফটানি। অভ্যাসবশেই

সে হাত বাড়িয়ে রেডিওগ্রাম চালিয়ে দিল; কোনো একটি মহিলা ইনিয়ে বিনিয়ে আধুনিক গান গাইছেন। কিছুক্ষণ শোনার পর সে রেডিও বন্ধ করে দিয়ে চোখ বুজে চুপ করে রইল। কিন্তু বুকের মধ্যে ঝড়ের আফ্সানি কমল না। তখন সে উঠে অশান্তভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল, অস্ফুট স্বরে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল—'এভাবে আর কত দিন চলবে?'

দীপা যদি হাল্কা চরিত্রের মেয়ে হত, তা হলে তার জীবনে বোধ হয় কোনো ঝড়-ঝাপটাই আসত না।

দীপা বনেদী বংশের মেয়ে। একসময় খুব বোল্‌বোলাও ছিল, তালুক-মুলুক ছিল, এখন অনেক কমে গেছে; তবু মরা হাতী লাখ টাকা। বোল্‌বোলাও কমলেও বংশের মর্যাদাবোধ আর গোঁড়ামি তিলমাত্র কমেনি। দীপার ঠাকুরদা উদয়মাধব মুখুজ্জে এখনো বেঁচে আছেন, তিনিই সংসারের কর্তা। এক সময় একটি বিখ্যাত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, হঠাৎ পঙ্গু হয়ে পড়ার ফলে অবসর নিতে হয়েছে। বাড়িতেই থাকেন এবং নিজের শয়নকক্ষ থেকে প্রচণ্ড দাপটে বাড়ি শাসন করেন।

ঠাকুরদা ছাড়া বাড়িতে আছেন দীপার বাবা-মা এবং দাদা। বাবা নীলমাধব বয়স্ক লোক, কলেজে অধ্যাপনা করেন। মা গোবেচারি ভালমানুষ, কারুর কথায় থাকেন না, নীরবে সংসারের কাজ করে যান। দাদা বিজয়মাধব দীপার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়, সে সংস্কৃত ভাষায় এম-এ পাস করে কলেজে অধ্যাপনার কাজে ঢোকবার চেষ্টা করছে। দীপার বাবা এবং দাদা দু'জনেই তেজস্বী পুরুষ। কিন্তু তাঁরা বাড়িতে উদয়মাধবের হুকুম বেদবাক্য মনে করেন এবং বাইরে বংশ-গৌরবের ধ্বজা তুলে বেড়ান। বংশটা একাধারে সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত এবং প্রাচীনপন্থী।

এই বংশের একমাত্র মেয়ে দীপা। তাকে মেয়ে-স্কুল থেকে সীনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করানো হয়েছিল। তারপর তার পড়াশুনো বন্ধ হল, তার জন্যে পালটি ঘরের ভাল পাত্র খোঁজা আরম্ভ হল। কালধর্মে তাকে পর্দার মধ্যে আবদ্ধ রাখা গেল না বটে, কিন্তু একলা বাইরে যাবার হুকুম নেই। বাইরে যেতে হলে বাপ কিংবা ভাই সঙ্গে থাকবে।

দীপা বাড়িতেই থাকে, গৃহকর্মে রান্নাঘরে মাকে সাহায্য করে; অবসর সময়ে গল্প উপন্যাস পড়ে, রেডিওতে গান শোনে। কিন্তু মন তার বিদ্রোহে ভরা। তার মনের একটা স্বাধীন সত্তা আছে, নিজস্ব মতামত আছে; সে মুখ বুজে বাড়ির শাসন সহ্য করে বটে, কিন্তু তার মনে সুখ নেই। মেয়ে হয়ে বাংলা দেশে জন্মেছে বলে কি তার কোনো স্বাধীনতাই নেই! অন্য দেশের মেয়েদের তো আছে।

ঠাকুরদা উদয়মাধব, পঙ্গু তার জন্যেই বোধ হয় বাড়িতে বন্ধুসমাগম পছন্দ করতেন, লোকজনকে খাওয়াতে ভালবাসতেন। একটা কোনো উপলক্ষ পেলেই নিজের প্রবীণ বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতেন; নীলমাধব এবং বিজয়মাধবের বন্ধুরাও নিমন্ত্রিত হতেন। বৃদ্ধেরা তিনতলায় সমবেত হতেন, প্রৌঢ় অধ্যাপকেরা বসতেন দোতলায় এবং একতলায় বৈঠকখানায় বসে ছেলেছোকরার দল গানবাজনা হই-হুল্লোড় করত। মাসে দু'মাসে এইরকম অনুষ্ঠান লেগেই থাকত।

দীপা অতিথিদের সকলের সামনে বেরুত, কোনো বারণ ছিল না। ঠাকুরদার বন্ধুরা নাতনী সম্পর্কে তার সঙ্গে সেকেলে রসিকতা করতেন, বাপের বন্ধুরা তাকে স্নেহ করতেন, আর দাদার বন্ধুরা তাকে নিজেদের সমান মর্যাদা দিত, মেয়ে বলে অবহেলা করত না। সে প্রয়োজন হলে তাদের সঙ্গে দুটি-চারটি কথাও

বলত। তাদের মধ্যে যখন গান বাজনা হত তখন সে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে শুনত। এইসব ক্রিয়াকর্মে তার মন ভারি উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যদিও বাইরে তার বিকাশ খুব অল্পই চোখে পড়ত। দীপা ভারি চাপা প্রকৃতির মেয়ে।

এইভাবে চলছিল, তারপর একদিন দীপার মানসলোকে একটি ব্যাপার ঘটল, নবযৌবনের স্বভাবধর্মে সে প্রেমে পড়ল। যার সঙ্গে প্রেমে পড়ল সেও তার অনুরাগী। কিন্তু মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, প্রেমিকের জাত আলাদা।

দুপুরবেলা যখন বাড়ি নিষুতি হয়ে যায় তখন দীপা নীচের বসবার ঘরে দোর ভেজিয়ে দিয়ে টেলিফোনের সামনে বসে, চোখে প্রতীক্ষা নিয়ে বসে থাকে। টেলিফোন বাজলেই সে যন্ত্র তুলে নেয়। সাবধানে দুটি-চারটি কথা হয়, তারপর সে টেলিফোন রেখে দেয়। কেউ জানতে পারে না।

সন্ধ্যেবেলা দীপা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে; সামনের ফুটপাথ দিয়ে তার প্রেমিক চলে যায়, তার পানে চাইতে চাইতে যায়। এইভাবে তাদের দেখা হয়। কিন্তু কাছে এসে দেখা করার সুযোগ নেই, সকলে জানতে পারবে।

এদিকে দীপার জন্যে পাত্রের সন্ধান শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু পালটি ঘর যদি পাওয়া যায় তো পাত্র পছন্দ হয় না পাত্র যদি পছন্দ হয় তো ঠিকুজি কোষ্ঠীর মিল হয় না। বিয়ের কথা মোটেই এগুচ্ছে না।

পৌষ মাসের শেষের দিকে একদিন দুপুরবেলা দীপা টেলিফোনে তার প্রেমিকের সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করল, তারপর কোমরে আঁচল জড়িয়ে তেতলায় ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

দীপা সাহসিনী মেয়ে, কিন্তু তার সাহসের সঙ্গে খানিকটা একগুঁয়েমি মেশানো আছে। ঠাকুরদার সঙ্গে তার সম্বন্ধ বড় বিচিত্র; সে ঠাকুরদাকে যত ভালবাসে, বাড়িতে আর কাউকে এত ভালবাসে না। কিন্তু সেই সঙ্গে সে ঠাকুরদাকে ভয়ও করে। তিনি তার কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হবেন এ কথা ভাবতেই সে ভয়ে কাঁটা হয়ে যায়। তাই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে তার উরু আর হাঁটু অল্প কাঁপতে লাগল।

উদয়মাধব মুখুজ্জে একদিন বুড়ো বয়সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যান, তাঁর মেরুদন্ডে গুরুতর আঘাত লাগে। এই আঘাতের ফলে তাঁর নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যায়, চলে ফিরে বেড়াবার ক্ষমতা আর থাকে না। এ ছাড়া তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভালই। দোহারা গড়নের শরীর, মুখের চওড়া চোয়ালে প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ। সত্তর বছর বয়েসেও মানসিক শক্তি বিন্দুমাত্র কমেনি। যে দাপট নিয়ে তিনি কলেজের অধ্যক্ষতা করতেন সেই দাপট পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে। তাঁর চিরদিনের অভ্যাস হুঙ্কার দিয়ে কথা বলা। এখনো তিনি হুঙ্কার দিয়েই কথা বলেন।

দীপা তেতলায় দাদুর ঘরে ঢুকে দেখল তিনি বিছানায় আধ-শোয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। তিনি প্রত্যহ দুটি খবরের কাগজ পড়েন; সকালবেলা ইংরেজী কাগজ আর দুপুরে দিবানিদ্রার পর বাংলা।

দীপাকে দেখে উদয়মাধব কাগজ নামালেন, হুঙ্কার দিয়ে বললেন—'এই যে দীপঙ্করী। আজকাল তোমাকে দেখতে পাই না কেন? কোথায় থাকো?'

দীপার নাম শুধুই দীপা, কিন্তু উদয়মাধব তাকে দীপঙ্করী বলেন। ঠাকুরদার চিরপরিচিত সম্ভাষণ শুনে তার ভয় অনেকটা কমল, সে খাটের পায়ের

দিকে বসে বলল—'আজ সকালেই তো দেখেছেন দাদু। আমি আপনার চা আর ওষুধ নিয়ে এলুম না?'

উদয়মাধব বললেন—'ওহো, তাই নাকি! আমি লক্ষ করিনি। তা এখন কী মতলব?'

দীপা হঠাৎ উত্তর দিতে পারল না, মাথা হেঁট করে বসে রইল। যে কথা বলতে এসেছে তা সহজে বলা যায় না।

উদয়মাধব কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে অপেক্ষা করলেন। তারপর স্বভাবসিদ্ধ হুঙ্কার ছাড়লেন—'কী হয়েছে?'

দীপা তার মনের সমস্ত সাহস একত্র করে দাদুর দিকে ফিরল, তাঁর চোখে চোখ রেখে ধীরস্বরে বলল— 'দাদু, আমি একজনকে বিয়ে করতে চাই, কিন্তু তার জাত অলাদা। আপনার আপত্তি আছে?'

উদয়মাধব ক্ষণেকের জন্যে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, তারপর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে হুঙ্কার দিলেন—'কি বললে, একজনকে বিয়ে করতে চাও! এসব আজকাল হচ্ছে কি? নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করবে! তুমি কি ম্লেচ্ছ বংশের মেয়ে?'

দীপা নতমুখে চুপ করে বসে রইল। উদয়মাধব হুঙ্কারের পর হুঙ্কার দিয়ে বক্তৃতা চালাতে লাগলেন। একটানা হুঙ্কার শুনে নীচে থেকে দীপার মা আর দাদা বিজয়মাধব ছুটে এল, দু-একটা ঝি-চাকরও দোরের কাছ থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল। দীপা কাঠ হয়ে বসে রইল।

আধ ঘণ্টা পরে লেকচার শেষ করে উদয়মাধব বললেন—'আর যেন কোনো দিন তোমার মুখে এ কথা শুনতে না পাই। তুমি এ বংশের মেয়ে, আমার নাতনী, আমি দেখেশুনে যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব তাকেই তুমি বিয়ে করবে। যাও।'

দীপা নীচে নেমে এল; বিজয়ও তার সঙ্গে সঙ্গে এল। দীপা নিজের শোবার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, বিজয় কটমট তাকিয়ে কড়া সুরে বলল- এই শোন্। কাকে বিয়ে করতে চাস্?'

জ্বলজ্বলে চোখে দীপা ফিরে দাঁড়াল, তীব্র চাপা সুরে বলল—'বলব না। মরে গেলেও বলব না।' এই বলে নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দোর বন্ধ করে দিল।

অতঃপর দীপা বাড়িতে প্রায় নজরবন্দী হয়ে রইল। আগে যদি-বা দু-একবার নিজের সখীদের কাছে যাবার জন্য বাড়ির বাইরে যেতে পেত, এখন আর তাও নয়। সর্বদা বাড়ির সবাই যেন শতচক্ষু হয়ে তার ওপর নজর রেখেছে। কেবল দুপুরবেলা ঘণ্টাখানেকের জন্যে সে দৃষ্টিবন্ধন থেকে মুক্তি পায়। তার মা নিজের ঘরে গিয়ে একটু চোখ বোজেন, তার দাদা বিজয় কাজের তদ্বিরে বেরোয়। বাবা নীলমাধব দশটার আগেই কলেজে চলে যান, ঠাকুরদা তেতলায় নিজের ঘরে আবদ্ধ থাকেন। সুতরাং দীপাকে কেউ আগলাতে পারে না। দীপাও বিদ্রোহের কোনো লক্ষণ প্রকাশ করে না।

বস্তুত বাড়ির লোকের ধারণা হয়েছিল, পিতামহের লেকচার শুনে দীপার দিব্যজ্ঞান হয়েছে, সে আর কোনো গোলমাল করবে না। দুপুরবেলা যে টেলিফোন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তা কেউ জানে না।

তারপর একদিন—

ঘটনাচক্রে বিজয় দুপুরবেলা সকাল সকাল বাড়ি ফিরছিল। সে আজ যার

সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তার দেখা পায়নি, তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে সে দেখতে পেল, দীপা বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বালিগঞ্জ রেল স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। বিজয়ের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। একলা দীপা কোথায় যাচ্ছে! দীপার বান্ধবী শুভ্রার বাড়িতে? কিন্তু শুভ্রার বাড়ি তো এদিকে নয়, ঠিক উল্টো দিকে; অন্য কোনো বান্ধবীও এদিকে থাকে না। বিজয় সজোরে পা চালিয়ে দীপাকে ধরবার উদ্দেশ্যে চলল।

'এই, কোথায় যাচ্ছিস?'

তীরবিদ্ধের মত দীপা ফিরে দাঁড়াল। সামনেই দাদা। বিজয় কড়া সুরে বলল—'একলা কোথায় যাচ্ছিস?'

দীপার মুখে কথা নেই; সে একবার ঢোঁক গিলল। বিজয় গলা আরো চড়িয়ে বলল—'কার হুকুমে একলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস? চল, ফিরে চল!'

এবার দীপার মুখ থেকে কথা বেরুল—'যাব না।'

রাস্তায় বেশী লোকচলাচল ছিল না, যারা ছিল তারা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে লাগল। দীপা দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিজয় বলল—'ভাল কথায় যাবি, না চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাব?'

দীপার বুক ফেটে কান্না এল। রাস্তার মাঝখানে এ কি কেলেঙ্কারী! এখনি হয়তো চেনা লোক কেউ দেখতে পাবে। দীপা কোনো মতে দুরন্ত কান্না চেপে বঁড়শির মাছের মত বাড়ির দিকে ফিরে চলল।

বিজয় বাড়িতে ঢুকে 'মা মা' বলে দু'বার ডাক দিয়ে বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকল; দীপা আর দাঁড়াল না, দোতলায় উঠে নিজের ঘরে দোর বন্ধ করল।

বিজয় বসবার ঘরে ঢুকতেই তার নজরে পড়ল টেলিফোন যন্ত্রের নীচে এক টুকরো সাদা কাগজ চাপা রয়েছে। কাছে গিয়ে কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে পড়ল, তাতে লেখা রয়েছে—'আমি যাকে বিয়ে করতে চাই তার সঙ্গে চলে যাচ্ছি। তোমরা আমার খোঁজ করো না। -দীপা।'

এতটা বিজয়ও ভাবতে পারেনি। সে চিঠি নিয়ে সটান ঠাকুরদার কাছে গেল। বাবা-মাও জানতে পারলেন। কিন্তু ঝি-চাকরের কাছে কথাটা লুকিয়ে রাখতে হল। উদয়মাধব গুম হয়ে রইলেন, হুঙ্কার দিয়ে বক্তৃতা করলেন না। ভিতরে ভিতরে দীপার ওপর পীড়ন চলতে লাগল—যার সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিল, সে কে? নাম কি? দীপা কিন্তু মুখ টিপে রইল, নাম বলল না।

নিভৃত পারিবারিক মন্ত্রণায় স্থির হল, সর্বাগ্রে দীপার বিয়ে দেওয়া দরকার; যেখান থেকে হোক পালটি ঘরের সৎ পাত্র চাই। আর দেরি নয়।

বাড়ির মধ্যে সকলের চেয়ে বিজয়ের দুশ্চিন্তা বেশী। তার স্বভাব একটু তীব্র গোছের। তার বোন কোনো অজানা লোকের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল এ লজ্জা যেন তারই সবচেয়ে মর্মান্তিক। সে উঠে পড়ে লেগে গেল পাত্র খুঁজতে।

পাড়ার নৃপতি লাহার বাড়িতে কয়েকটি যুবকের আড্ডা বসত, আগে বলা হয়েছে। বিজয় এই আড্ডায় আসত, এখানে অন্য যারা আসত তাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল, নৃপতি লাহার সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল।

নৃপতি লাহারা সাত পুরুষে বড়মানুষ, কিন্তু বর্তমানে সে ছাড়া বংশে আর কেউ নেই। তার বয়স এখন আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বছর, নিঃসন্তান অবস্থায় বিপত্নীক হবার পর আর বিয়ে করেনি। সে উচ্চশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, সারাদিন

লেখাপড়া নিয়ে থাকে, সন্ধ্যের পর আড্ডা জমায়।

বিজয়মাধব একদিন বিকেলবেলা নৃপতির কাছে এল। তখনো আড্ডা জমার সময় হয়নি, নৃপতি বাড়ির নীচের তলার বৈঠকখানায় বসে একখানা বই পড়ছিল। এই ঘরটিতেই রোজ আড্ডা বসে।

ঘরটি প্রকাণ্ড, সভাঘরের মত। সাবেক কালে এই ঘরে বাবুদের নাচগানের মুজ্‌রো বসত, একালে ঘরটি সোফা চেয়ার প্রভৃতি দিয়ে সাজিয়ে ড্রয়িংরুমে পরিণত করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেকালের গদিমোড়া তক্তপোশ এখনো আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। তা ছাড়া টেবিল-হারমোনিয়াম আছে, পিয়ানো আছে, রেডিওগ্রাম আছে। আর আছে তাস পাশা ক্যাবাম প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম।

বিজয় ঘরে ঢুকে দেখল নৃপতি একলা আছে, বলল–নৃপতিদা, তোমার সঙ্গে আড়ালে একটা পরামর্শ আছে, তাই আগেভাগে এলাম।'

নৃপতি বই মুড়ে বিজয়কে একটু ভাল করে দেখল, তারপর সোফায় নিজের পাশে হাত চাপড়ে বলল—'এস, বসো।'

বিজয় তার পাশে বসে কথা বলতে ইতস্তত করছে দেখে নৃপতি বলল—'কিসের পরামর্শ?'

বিজয় তখল বলল—'নৃপতিদা, দীপার জন্যে পাত্র খোঁজা হচ্ছে কিন্তু মনের মত পাত্র কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি তো অনেক খবর রাখো। একটা ভাল পাত্রের সন্ধান দাও না।'

নৃপতি হাত বাড়িয়ে নিকটস্থ টেবিল থেকে সিগারেটের টিন নিল, একটি সিগারেট ঠোঁটে ধরে বলল—'হুঁ। দীপার এখন বয়স কত?'

'সতেরো। আমাদের বংশে—'

নৃপতি দেশলাই জ্বালবার উপক্রম করে বলল–'তোমাদের বংশের কথা জানি। গৌরীদান করতে পারলেই ভাল হয়। তা কি রকম পাত্র চাও? বিদ্বান হবে, পয়সাকড়ি থাকবে, চেহারা ভালো হবে, এই তো?'

বিজয় বলল—'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আসল কথাটাই বললে না। পালটি ঘর হওয়া চাই।'

সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নৃপতির ঠোঁটের কোণে একটু ব্যঙ্গ-হাসি খেলে গেল। সে বলল—'তাও তো বটে। বংশের ধারা বজায় রাখতে হবে বইকি। তা তোমরা হলে গিয়ে মুখুজ্জে, সুতরাং চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে গাঙ্গুলি কিংবা ঘোষাল চাই। বারেন্দ্র চলবে না?'

'না নৃপতিদা, জানোই তো আমরা আজ পর্যন্ত সাবেক চাল বজায় রেখে চলেছি।'

'জানি বইকি। তোমরা হচ্ছ আরশোলা গোষ্ঠীর জীব।'

'আরশোলা গোষ্ঠীর জীব মানে?'

'আরশোলা অতি প্রাচীন জীব, কোটি কোটি বছর আগে জন্মেছিল; তারপর জীবজগতে অনেক বিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু আরশোলা আরশোলাই রয়ে গেছে। তাই আজকাল আর তাদের বেশী কদর নেই।'

'সে যাই বল, বর্ণাশ্রম ধর্ম আমি মেনে চলি। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, চাতুর্বর্ণ্যং—'

নৃপতি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল; সিগারেট টানতে টানতে সে বোধ করি মনে

মনে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করছিল। সিগারেট শেষ করে সে বলল—'একটি ছেলে আছে, কিন্তু তোমাদের পালটি ঘর কিনা খোঁজ নিতে হবে। তুমি আজ বাড়ি যাও, কাল খবর পাবে।'

'আচ্ছা', বলে বিজয় চলে গেল।

নৃপতি কব্জির ঘড়িতে দেখল পাঁচটা বেজেছে। সিগারেটের টিন পকেটে নিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তার গন্তব্যস্থল বেশী দূর নয়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা।

দেবাশিসের সদর দরজার ঘণ্টি টিপতেই নকুল এসে দোর খুলল। নৃপতি বলল—'দেবাশিসবাবু আছেন?'

নকুল বলল—'আজ্ঞে' তিনি এইমাত্র ফেক্টারি থেকে বাড়ি ফিরেছেন—'

এই সময় দেখা গেল দেবাশিস সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সে সদর দোরের কাছে এলে নৃপতি একটু হেসে বলল—'আমাকে আপনি চিনবেন না, আপনার বাবা শুভাশিসবাবুর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল। আমার নাম নৃপতি লাহা।'

দেবাশিসের মুখেও হাসি ফুটল—'আপনাকে চিনি না বটে, কিন্তু নাম জানি। আপনার বাড়িও দেখেছি। আসুন।' সে নৃপতিকে বসবার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে থমকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—'বসবার ঘরে না গিয়ে চলুন খাবার ঘরে যাই। চায়ের সময় হয়েছে।'

নৃপতি বলল—'বেশ তো।'

দুজনে খাবার ঘরে গিয়ে টেবিলে বসল। দেবাশিস বলল—'নকুল, আমাদের চা জলখাবার দাও।'

নৃপতি বলল—'আমার চা হলেই চলবে।'

খেতে খেতে দুজনেব কথা হতে লাগল। বছর ছয়-সাত আগে দেবাশিসের বাবার সঙ্গে নৃপতির পরিচয় হয়েছিল; দেবাশিস তখন কলকাতায় থাকত না, দিল্লীতে পড়াশুনো করতে গিয়েছিল। শুভাশিসবাবু একদিন নৃপতির বাড়িব সামনে ফুটপাথের ওপর পা পিছলে পড়ে যান, নৃপতি তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফার্স্ট এড্ দিয়েছিল। তারপর শুভাশিসবাবু তাঁর ফ্যাক্টরিতে তৈরি প্রচুর কেশতৈল সাবান কোল্ড ক্রীম প্রভৃতি তাকে উপহার দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তার বাড়িতে এসে তত্ত্ব-তল্লাশ নিতেন। বছর দুই পরে তিনি যখন মারা গেলেন তখন নৃপতি খবর পেল না, একেবারে খবর পেল মাস তিনেক পরে। এমনি কলকাতা শহর। শুভাশিসবাবুর মৃত্যুসংবাদ নৃপতিকে জানাবে এমন লোক কেউ ছিল না।

দেবাশিস দিল্লীতে তার বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে কলেজে পড়াশুনো করছিল। বাল্যকালেই তার মা মারা গিয়েছিলেন। বাবার বন্ধুটি ছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা বিজ্ঞান-অধ্যাপক। দেবাশিস এম· এস-সি· পাস করে দিল্লী থেকে চলে এল। তার মাসখানেক পরেই তার বাবা মারা গেলেন।

নৃপতি প্রশ্ন করল—'আপনার বাড়িতে আর কে আছে?'

দেবাশিস বলল—'আর কেউ নেই, আমি একা। কিংবা আমি আর নকুল বলতে পারেন। নকুল এ বাড়িতে আমি জন্মাবার আগে থেকে আছে।'

'বিয়ে করেননি?

'আমি লেখাপড়া শেষ করে ফিরে আসার পরই বাবা মারা গেলেন, তারপর আর হয়ে ওঠেনি।'

'হুঁ। ভাল কথা, আপনার উপাধি যখন ভট্ট তখন নিশ্চয় ব্রাহ্মণ। গোত্র জানা আছে কি?'

'যখন পইতে হয় শুনেছিলাম শাণ্ডিল্য গোত্র। বাঁড়ুজ্জে।'

'বাঃ, বেশ। আচ্ছা, আমি যদি ঘটকালি করি, আপনার আপত্তি হবে কি?'

দেবাশিস মুখ টিপে একটু হাসল, উত্তর দিল না। নকুল এতক্ষণ ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল, এখন এগিয়ে এসে বলল—'হ্যাঁ বাবু, আপনি করুন। ঘরে একটি বউ দরকার। আমি বুড়ো মানুষ আর কত দিন সংসার চালাব।'

'তাই হবে।' নৃপতি চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল—'আজ চলি। আমার বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা আড্ডা বসে, পাড়ার ছেলেরা আসে। আপনিও আসেন না কেন?'

'আচ্ছা যাব।'

'আজই চলুন না!'

দেবাশিস একটু ইতস্তত করে বলল—'আজই? বেশ, চলুন।'

দু'জনে বেরুল। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। নৃপতির বাড়িব সামনে এসে তারা শুনতে পেল বৈঠকখানায় কেউ লঘু আঙুলের স্পর্শে পিয়ানো বাজাচ্ছে।

বৈঠকখানা ঘরে তিনটে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। কেবল একটি মানুষ ঘবে আছে, দেয়াল-ঘেঁষা পিয়ানোর সামনে বসে আপন মনে বাজিয়ে চলেছে।

নৃপতি দেবাশিসকে নিয়ে ঘবে ঢুকল, বলল—'ওহে প্রবাল, দ্যাখো, আমাদের আড্ডায় একটি নতুন সভ্য পাওয়া গেছে। এঁর নাম দেবাশিস ভট্ট।'

প্রবাল নামধারী যুবক পিয়ানো থেকে উঠে এল। নিরুৎসুক স্ববে বলল—'পরিচয় দেবার দরকার নেই।'

নৃপতি বলল—'আগে থাকতেই পরিচয় আছে নাকি?'

প্রবাল বলল—'সামান্য। গরীবের সঙ্গে বড়মানুষেব যতটুকু পরিচয় থাকা সম্ভব ততটুকুই।'

প্রবাল আবার পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসল। টুং টাং করে একটা সুর বাজাতে লাগল। তার ভাবভঙ্গী দেখে বেশ বোঝা যায় দেবাশিসকে দেখে খুশী হয়নি। সে বয়সে দেবাশিসের চেয়ে দু'এক বছরের বড়, মাঝারি দৈর্ঘ্যের বলিষ্ঠ চেহারা, মুখের গড়নে বৈশিষ্ট্য না থাকলেও জৈব আকর্ষণ আছে; চোখেব দৃষ্টি অপ্রসন্ন। কিন্তু তার চেহারা যেমনই হোক সে ইতিমধ্যে গায়ক হিসেবে বেশ নাম করেছে। তার কয়েকটা গ্রামোফোন রেকর্ড খুব জনপ্রিয় হয়েছে; রেডিও থেকেও মাঝে মাঝে ডাক পায়।

প্রবালের সঙ্গে দেবাশিসের অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। এক সময় তারা একসঙ্গে স্কুলে পড়ত, ভাবসাব ছিল; তারপর দেবাশিস স্কুল থেকে পাস করে দিল্লীতে পড়তে চলে গেল। কয়েক বছর পরে এই প্রথম দেখা। এই কয় বছরের মধ্যে দেবাশিসের বাবা 'প্রজাপতি প্রসাধন' নামে শৌখীন টয়লেট্ দ্রব্যের কারখানা খুলে বড়মানুষ হয়েছেন। আর প্রবালের বাবা হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা যাওয়ার ফলে তাদের সম্পন্ন অবস্থার খুবই অধোগতি হয়েছে। প্রবাল গান গেয়ে কোনো

মতে টিকে আছে।

প্রবালের কথা বলার ভঙ্গিতে দেবাশিস বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, নৃপতি তাকে ঘরের এক কোণে নিয়ে গিয়ে সোফায় পাশাপাশি বসে গল্প করতে লাগল। বলল—'আমার আড্ডায় পাঁচ-ছয়জন আসে। কিন্তু সবাই রোজ আসে না। আজ আরো দু'-তিনজন আসবে।'

নৃপতি দেবাশিসের সামনে সিগারেটের টিন খুলে ধরল, দেবাশিস মাথা নেড়ে বলল—'ধন্যবাদ। আমি খাই না।'

নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে নৃপতি খাটো গলায় বলল—প্রবাল গুপ্ত গাইয়ে-বাজিয়ে লোক, একটু বেশী সেন্সিটিভ্, আপনি কিছু মনে করবেন না। ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এই সময় বাইরে থেকে একটি যুবক সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সিল্কের লম্বা প্যাণ্ট ও বুশ্-কোট পরা সুগঠিত সুদর্শন চেহারা, ধারালো মুখে আভিজাত্যের ছাপ, বেশ দৃঢ় চরিত্রের ছেলে বলে মনে হয়, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। তাকে দেখে নৃপতি বলল--'এই যে কপিল। এস পরিচয় করিয়ে দিইঃ কপিল বোস—দেবাশিস ভট্ট।'

নমস্কার প্রতিনমস্কারের পর কপিল বলল—'নৃপতিদা, তোমার টেলিফোন একবার ব্যবহার করব। রাস্তায় আসতে আসতে একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

কপিল পাশের ঘরে চলে গেলে নৃপতি বলল—'কপিল ছেলেটা ভাল, বাপ অগাধ বড়মানুষ, কিন্তু ওর কোনো বদ্ খেয়াল নেই। লেখাপড়া শিখেছে, টেনিস বিলিয়ার্ড খেলে দিন কাটায়, রাত্তিরে দূরবীণ লাগিয়ে আকাশের তারা গোনে। কেবল একটি দোষ, বিয়ে করতে চায় না।'

প্রবাল হঠাৎ পিয়ানো ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নৃপতির দিকে তাকিয়ে বলল—'আজ চললাম নৃপতিদা।' দেবাশিসকে সে লক্ষই করল না।

নৃপতি বলল—'চললে? এত সকাল সকাল? রেডিওতে গাইতে হবে বুঝি? কাগজে যেন দেখেছিলাম আজ রাত্রে তোমার প্রোগ্রাম আছে।'

প্রবাল বলল--'প্রোগ্রাম আছে। কিন্তু গান আগেই রেকর্ড হয়ে গেছে, আমাকে ষ্টুডিও যেতে হবে না। আমি বাসায় যাচ্ছি।'

নৃপতি বলল—'বাসায় যাচ্ছ। তোমার বউ-এর খবর ভাল তো?'

প্রবাল উদাস স্বরে বলল—'তোমাদের বলিনি নৃপতিদা, বউ আসখানেক আগে মারা গেছে। হার্টের রোগ নিয়ে জন্মেছিল; ডাক্তারেরা বলে বারো-চোদ্দ বছর বয়সের মধ্যে অপারেশন না করালে এ রোগে কেউ একুশ-বাইশ বছরের বেশী বাঁচে না। আমার শ্বশুর রোগ লুকিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল।- আচ্ছা চললাম।'

নৃপতি ও দেবাশিস স্তব্ধ হয়ে রইল। স্ত্রী মারা গেছে অথচ আড্ডার কাউকে কিছু বলেনি; আপন মনে পিয়ানো বাজায় আর চলে যায়। নৃপতি জানত প্রবালের স্ত্রীর মরণান্তক রোগ, কিন্তু খবর শুনে হঠাৎ তার মুখে কথা যোগালো না।

এই সময় কপিল পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে তাদের কাছে দাঁড়াল। সে প্রবালের কথাগুলো শুনতে পায়নি, তার দিকে তাকিয়ে বলল—'বেশ তো পিয়ানো বাজাচ্ছিলে, চললে নাকি? একটা গান শোনাও না।'

প্রবাল তীব্র বিদ্বেষভরা চোখে তার পানে চেয়ে রূঢ়স্বরে বলল—'আমার গান বিনা পয়সায় শোনা যায় না। পয়সা খরচ করতে হয়।'

কপিল একরম কড়া জবাবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, সে একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর সামলে নিয়ে হেসে উঠল। বলল—'পয়সা খরচ করেই যদি গান শুনতে হয় তাহলে তোমার গান শুনব কেন? তোমার চেয়ে অনেক ভাল গাইয়ে আছে।'

প্রবাল আর দাঁড়াল না, হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কপিল একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালো, নৃপতি অপ্রতিভ মুখে বলল—'আজ প্রবালের মেজাজটা ভাল নেই।'

কপিল বলল—'প্রবালের মেজাজ সর্বদাই সপ্তমে চড়ে থাকে। ধাতুগত বিকার।'

'ওর স্ত্রী মারা গেছে।'

কপিল চকিত হয়ে বলল—'তাই নাকি! আমি জানতাম না। ছি ছি, অসভ্যতা করে ফেলেছি।'

নৃপতি বলল—'যাক গে। তুমি কেমন আছ বলো। কয়েকদিন তোমাকে দেখিনি।'

কপিল বলল—'প্ল্যান করেছিলাম বাঙ্গালোরে বেড়াতে যাব কিন্তু প্ল্যান ভেস্তে গেল।'

'ভেস্তে গেল কেন?'

'আমার সঙ্গে যার যাবার কথা ছিল সে যেতে পারল না। একলা বেড়িয়ে সুখ নেই।'

'তা বটে। কিন্তু তুমি বিয়ে করছ না কেন? বিয়ে করলে তো একটি চিরস্থায়ী সহযাত্রী পাবে।'

কপিল হেসে উঠল, থিয়েটারী কায়দায় বাহু প্রসারিত করে বলল—'কবি বলেছেন, হব না তাপস নিশ্চয় যদি না মেলে তপস্বিনী। আমিও কবির দলে।'

নৃপতি বলল—'কিন্তু শুনেছি তোমার বাবা তপস্বিনী জোটাবার ত্রুটি করেননি, গোটা পঞ্চাশেক সুন্দরী তপস্বিনী দেখেছেন। একটিও তোমার পছন্দ হল না?'

কপিল একটু গম্ভীর হয়ে বলল—'সুন্দরী মেয়ে অনেক আছে নৃপতিদা, কিন্তু শুধু সুন্দরী হলেই তো চলে না। আমি এমন বউ চাই যার মন হবে আমার মনের সমান্তরাল, অর্থাৎ সমানধর্মা।—কথাটা বুঝেছেন?'

'বুঝেছি। তুমি হুঁশিয়ার লোক। তা নিজে পছন্দ করে বিয়ে কর না কেন? তোমার বাবা নিশ্চয় অমত করবেন না।'

কপিল হেসে বলল—'সেই চেষ্টাতেই আছি।'

তারপর সাধারণভাবে কথা হতে লাগল। দেবাশিস এতক্ষণ কেবল নিশ্চেষ্ট শ্রোতা ছিল, এখন সেও কথাবার্তায় যোগ দিল। দেবাশিসের পূর্ণতর পরিচয় শুনে কপিল বলল—'আরে তাই নাকি! আপনিই প্রজাপতি প্রসাধন প্রডাকটস্? আমরা যে বাড়িসুদ্ধ আপনার তেল সাবান স্নো ক্রীম ব্যবহার করি। তা অ্যাদ্দিন আপনি ছিলেন কোথায়?'

দেবাশিস বলল—'এখানেই ছিলাম, কিন্তু নৃপতিবাবুর সঙ্গে আলাপ ছিল না।'

আরো খানিকক্ষণ গল্পসল্প হল। চাকর এসে ছোট ছোট পেয়ালায় কফি দিয়ে গেল। ক্রমে আটটা বাজল। নৃপতি বলল—'আজ বোধ হয় আর কেউ আসবে না।'

দেবাশিস বলল—'আজ উঠি।'

কপিল বলল—'এরি মধ্যে! আমাদের আড্ডা ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত চলে।'

দেবাশিস হেসে বলল—'আবার আসব।'

নৃপতি জিজ্ঞেস করল—'কাল আসতে পারবেন?'

দেবাশিস বলল—'আচ্ছা, কাল আসব।'—

পরদিন দেবাশিস একটু দেরি করে এল। ইচ্ছে ছিল সাড়ে আটটা ন'টা পর্যন্ত থেকে গল্পগুজব করবে। বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা একলা বিজ্ঞানের বই আর সাময়িক পত্র পড়ে কাটে, এখানে নতুন লোকের সঙ্গ পাওয়া যাবে। প্রবালের অসামাজিক ব্যবহার সত্ত্বেও নৃপতির আড্ডাটি তার ভাল লেগে গিয়েছিল।

সাড়ে ছ'টার সময় নৃপতির বৈঠকখানায় গিয়ে দেবাশিস দেখল প্রবাল পিয়ানোর সামনে বসে চাবির ওপর আঙুল বুলোচ্ছে, কপিল এবং আর একটি ছেলে তক্তপোশের পাশে বসে পাঞ্জা লড়ছে; নৃপতি এবং অন্য একটি যুবক সোফায় পাশাপাশি বসে গল্প করছে। নৃপতি তাকে হাত তুলে ডাকল।

দেবাশিস কাছে গেলে নৃপতি বলল—'বসুন এখানে। পরিচয় করিয়ে দিই। দেবাশিস ভট্ট- বিজয়মাধব মুখুজ্জে। বিজয় হচ্ছে অধ্যাপক বংশের ছেলে, সম্প্রতি সংস্কৃতে এম. এ. পাস করে অধ্যাপনার কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে।' দেবাশিসের পূর্ণ পরিচয় নৃপতি আগেই বিজয়কে দিয়েছিল, আর পুনরাবৃত্তি করল না।

বিজয় উৎসুক চোখে দেবাশিসকে দেখতে লাগল। নৃপতি তাদের মাঝখান থেকে উঠে পড়ল, বলল—'তোমরা গল্প কর, আমি আসছি।'

বিজয় দেবাশিসের দিকে একটু ঘেঁষে বসল। বলল—'এক পাড়াতে থাকি, অ্যাদ্দিন আলাপ-পরিচয় হয়নি, কি আশ্চর্য বলুন দেখি।' চেহারা দেখেই দেবাশিসকে তার পছন্দ হয়েছিলঃ দীপার উপযুক্ত বর।

যদিও কলকাতা শহরে পাশাপাশি বাস করেও আলাপ-পরিচয় না হওয়াতে আশ্চর্য কিছু নেই, তবু দেবাশিস হাসিমুখে বলল—'আশ্চর্য বইকি।'

ওদিকে কপিল আর অন্য ছেলেটির পাঞ্জা লড়া শেষ হয়েছিল, নৃপতি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—'কি হে খড়্গ বাহাদুর, তোমার দেশে যাবার কথা ছিল না?'

খড়্গ বাহাদুর প্রফুল্ল স্বরে বলল—'কথা তো ছিল নৃপতিদা, কিন্তু যাওয়া হল না।'

খড়্গ বাহাদুর নেপালী যুবক। তার মা বাঙালী। তাই তার মাতৃভাষাও বাংলা। চমৎকার চেহারা, যেমন পীতাভ সোনালী রঙ তেমনি লম্বা ছিপছিপে গড়ন। তার মুখে চোখে মঙ্গোলীয় রক্তের ছাপ এত অল্প যে ধরা যায় না। বর্তমানে সে বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়; পায়ের কাছে বল পেলে সে যাদুকর বনে যায়। কলকাতার সব চেয়ে নামজাদা ফুটবল ক্লাবের সে খেলোয়াড়। তার খেলা দেখবার জন্যে লক্ষ লক্ষ দর্শক মাঠে জমা হয়। কিন্তু তার চরিত্রে

বিন্দুমাত্র চালিয়াতি নেই। উচ্চবংশের ছেলে, কিন্তু ভারি বিনয়ী। বয়স তেইশ কি চব্বিশ।

নৃপতি বলল—'কেন, যাওয়া হল না কেন?'

খড়্গ বাহাদুর বলল—'কাঠমাণ্ডুতে বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়েছিল, হঠাৎ তার পেলাম কীসব গণ্ডগোল হয়েছে, বিয়ে পেছিয়ে গেছে।'

নৃপতি বলল—'তার মানে এক বছরের ধাক্কা। ফুটবল সীজন এসে পড়ল, এরপর তুমি তো আর নেপালে গিয়ে বসে থাকতে পারবে না।'

খড়্গ বাহাদুর চোখে কৌতুক এবং মুখে বিষণ্ণতা নিয়ে মাথা নাড়ল।

চাকর বড় একটি ট্রে'র ওপর কয়েক পেয়ালা কফি নিয়ে এল, সকলেই এক এক পেয়ালা তুলে নিল। এই সময় সদর দরজার কাছ থেকে আওয়াজ এল—'ওহে আমিও আছি; আমার জন্যে এক পেয়ালা রেখো।'

একটি যুবক প্রবেশ করল। রজতগৌর বর্ণ, মুখের ছাঁচ কেষ্টনগরের পুতুলকেও হার মানায়; চোখ দু'টি উজ্জ্বল, ক্ষৌরিত মুখে একটু হাসি লেগে আছে। বয়স সাতাশ-আটাশ।

নৃপতি বলল—'এস সুজন।'

সুজন মিত্র একজন উদীয়মান চিত্রনক্ষত্র; দু' তিনখানা ছবি করেই বেশ নাম করেছে। যেমন গম্ভীর ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে তেমনি হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতাও আছে। সব চেয়ে বড় কথা হঠাৎ খ্যাতি ও অর্থ লাভ করেও তার মেজাজ বিগড়ে যায়নি। নিজের কথা সাত কাহন করে বলতে সে ভালবাসে না। বস্তুত তার সম্বন্ধে কেউ বড় কিছু জানে না। স্ত্রীজাতির প্রতি তার আসক্তির কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। এমন কি সে বিবাহিত কি অবিবাহিত তাই কেউ জানে না। দক্ষিণ কলকাতার একান্তে একটি ছোট বাড়িতে একলা থাকে বেশির ভাগ সময়ই হোটেলে খায়। অত্যন্ত অনাড়ম্বর এবং অপ্রকট তার জীবন।

সুজন ট্রে থেকে টপ্ করে একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে বলল—'ঠিক সময়ে এসেছি, আর একটু হলে ফাঁকি পড়তাম।'

কফিতে একটি চুমুক দিয়ে সে তার উজ্জ্বল অভিনেতার চোখ দু'টি ঘরের চারিদিকে ফেরালো, তারপর দেবাশিসকে দেখে হ্রস্ব কণ্ঠে বলল—'নৃপতিদা, নতুন অতিথির সমাগম হয়েছে দেখছি!'

নৃপতি বলল—'হ্যাঁ, এস তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। খড়্গ, তুমিও এস।'

পরিচয় বিনিময়ের পর সুজন মিটিমিটি হেসে বলল—দেবাশিসবাবু, এখন বলুন দেখি আপনি ফুটবল খেলা দেখতে ভালবাসেন, না সিনেমা দেখতে ভালবাসেন?'

দেবাশিস বলল—'দুই-ই ভালবাসি। খেলার মাঠে এবং রুপালী পর্দায় আপনাদের দু'জনকে অনেকবার দেখেছি।'

তারপর সকলে মিলে খানিকক্ষণ হাসিগল্প চালাল। প্রবাল কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগ দিল না, নিজের মনে টুংটাং করে পিয়ানো বাজিয়ে চলল।

রাত আন্দাজ ন'টার সময় সভা ভঙ্গ হল। দেবাশিস বেশ প্রফুল্ল মনে বাড়ি ফিরে এল।

এইভাবে কয়েকদিন কাটবার পর এক রবিবার সকালবেলা বিজয়, তার বাবা নীলমাধব এবং নৃপতি দেবাশিসের বাড়িতে দেখা করতে এল। দেবাশিস তাদের

খাতির করে নীচের তলার বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো এবং নকুলকে চায়ের হুকুম দিল।

নীলমাধব মুখুজ্জে অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তিনি আগে বিজয়ের মুখে দেবাশিস সম্বন্ধে সব কথা শুনেছিলেন এবং তত্ত্ব-তল্লাশও নিয়েছিলেন। পাত্রটিকে সৎপাত্র মনে হওয়ায় তিনি এখন স্বচক্ষে দেখতে এসেছেন। তিনি দেবাশিসকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করলেন এবং নৃপতির দিকে ঘাড় নেড়ে সন্তোষ জ্ঞাপন করলেন।

ইতিমধ্যে চা এসে পড়েছে। নৃপতি চা খেতে খেতে নিপুণভাবে বিয়ের প্রস্তাব তুলল। নৃপতির ঘটকালির দিকে বিশেষ দক্ষতা আছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেল। দেবাশিসের ঠিকুজি কোষ্ঠী ছিল না তাই জ্যোতিষের যোটক বাদ দিতে হল। নৃপতি বলল—'দেবাশিস, দীপাকে তোমার অপছন্দ হবে না জানি, তবু একবার দেখা দরকার। আজ বিকেলে আমি এসে তোমাকে এঁদের বাড়িতে নিয়ে যাব। কেমন?'

দেবাশিস সম্মত হল। বলা বাহুল্য, এই ক'দিনে নৃপতি ও দেবাশিসের ঘনিষ্ঠতা 'তুমি' ও 'নৃপতিদার' পর্যায়ে নেমেছে।

সেদিন অপরাহ্ণে নৃপতি এসে দেবাশিসকে দীপাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। বৈঠকখানা ঘরে আসর হয়েছিল; আড়ম্বর কিছু নয়, টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে এক গুচ্ছ ফুল, তক্তপোশের ওপর মখমলের আস্তরণ এবং মোটা তাকিয়া। বিজয় তাদের নিয়ে গিয়ে ঘরে বসাল, তারপর নীলমাধব এসে দেবাশিসকে তেতলার ঘরে নিয়ে গেলেন। উদয়মাধব তার সঙ্গে দু'চারটে কথা বললেন; তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল ভাবী নাতজামাই দেখে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

তারপর নীলমাধব দেবাশিসকে নিয়ে আবার নীচে নেমে এলেন। পাঁচ মিনিট পরে বিজয় গিয়ে দীপাকে নিয়ে এল, দীপা এসে টেবিলের কাছে দাঁড়াল। পরনে আটপৌরে শাড়ি ব্লাউজ, কানে ছোট ছোট দু'টি সোনার আংটি, গলায় সরু হার, হাতে তিনগাছি করে চুড়ি। কনে দেখানো উপলক্ষে তাকে সাজগোজ করানো হয়নি, কিংবা সে নিজেই সাজগোজ করেনি। তার সারা দেহে প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ। এক বার সে পলকের জন্য চোখ তুলে দেবাশিসের দিকে চেয়ে আবার চোখ নীচু করল। ভ্রূর ঋজু রেখার নীচে চোখের দৃষ্টি খর।

দেবাশিসের কিন্তু দীপাকে খুব ভালো লেগে গেল। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা শূন্য বললেই হয়, তবু দীপাকে দেখে তার মনে মাধুর্যের সঞ্চার হল, মনে হল একে স্ত্রীরূপে পেলে সে সুখী হবে।

দু'মিনিট পরে বিজয় বলল—'দীপা, তুমি এবারে যাও। দেখা হয়েছে।'

দীপা চলে গেল। তারপর মিষ্টিমুখ করে দেবাশিস সলজ্জ সম্মতি জানাল।

দু'হপ্তার মধ্যে সব ঠিকঠাক, বিয়ে হয়ে গেল। এই দু'হপ্তার মধ্যে দীপা যে তার প্রেমিকের সঙ্গে চুপিচুপি টেলিফোন মারফত বাক্যালাপ করেছে সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও কেউ তা জানতে পারল না।

বিয়ের রাত্রে কনের বাড়িতে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে নৃপতির বাড়ির আড্ডাধারীরাও এল, কারণ তারা বিজয়ের বন্ধু। আবার বউভাতের রাত্রে যারা দেবাশিসের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে এল তাদের মধ্যে প্রজাপতি ফ্যাক্টরির সহকারীদের সঙ্গে নৃপতির

দলও এল, কারণ তারা দেবাশিসের বন্ধু। যাকে বলে, বরের ঘরের মাসী কনের ঘরের পিসী।

দেবাশিসের বাড়িতে স্ত্রীলোক নেই, দীপার কয়েকটি প্রতিবেশিনী সখী এসে ফুলশয্যা সাজিয়ে দিয়ে গেল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া আমোদ আহ্লাদ চলল। নৃপতির দলই আসর জমিয়ে রাখল। সুজন শুধুই চিত্রাভিনেতা নয়, সে নানারকম ম্যাজিক দেখাল। প্রবাল আজ আর কোনো অশিষ্টতা করল না, নিজে থেকেই গান গেয়ে শোনাল। সকলেই নববধূকে নানা রকম উপহার দিল। নৃপতি দিল সোনার রিস্টওয়াচ কপিল দিল দামী একটা ঝরনা কলম, খড়্গ বাহাদুর দিল নেপালে তৈরি ঝকঝকে ধারালো কুক্‌রি ছোরা, প্রবাল দিল তার নিজের গাওয়া কয়েকটা গানের রেকর্ড, সুজন দিল একটি রূপোর সরস্বতী মূর্তি। দেবাশিসের ফ্যাক্টরির বন্ধুরাও যথাযোগ্য উপহার দিলেন।

বউভাতের উৎসব শেষে অতিথির দল যখন বিদায় নিল তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। বাড়ির নীচের তলায় রইল ভৃত্য নকুল, আর দোতলায় দেবাশিস এবং দীপা। প্রথম মিলন রাত্রি।

শেষ অতিথিকে বিদায় দিয়ে দেবাশিস ওপরতলায় গিয়ে দেখল, সব ঘরে বড় বড় আলো জ্বলছে; বসবার ঘরের একটা চেয়ারে দীপা শক্ত হয়ে বসে আছে। দেবাশিস তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেবাশিসের স্বভাব, যা সম্ভাব্য তাই তার মন স্বীকার করে নেয়, বিলক্ষণতার দিকে সহজে তার দৃষ্টি পড়ে না। সে দীপার দিকে দু' হাত বাড়িয়ে স্নিগ্ধ হেসে বলল—'এস'।

দীপা চকিতে একবার চোখ তুলল; তার চোখে ভয়ের ছায়া। দেবাশিস ভাবল, কুমারী মনের স্বাভাবিক লজ্জা। সে দীপার পাশের চেয়ারে বসে তার হাতের ওপর হাত রাখল, বলল--'বারোটা বেজে গেছে, আর কতক্ষণ বসে থাকবে। চল শোবার সময় হল।'

দীপা হাত সরিয়ে নিল। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, তবু যা বলবার তা বলতে হবে, আর দেরি করা চলবে না। সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল 'আমি—আমি আলাদা শোব।'

দেবাশিসের মনে কৌতুকের সঙ্গে একটু বিস্ময় মিশল। কথাগুলো যেন একটু বেসুরো, ঠিক লজ্জার মত নয়। তবু সে হাসিমুখেই বলল--তুমি আলাদা শুলে ফুলশয্যা হবে কি করে?'

'দীপার শরীর কেঁপে উঠল; সে শরীরের সমস্ত স্নায়ু পেশী শক্ত করে বলল—'না—না--আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আমি—'

এবার দেবাশিসের মন থেকে কৌতুকের ভাব একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। সে কিছুক্ষণ স্থির চোখে দীপার পানে চেয়ে থেকে বলল 'কি কথা বলতে চাও?'

দীপার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল, সে কোনোমতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি অন্য একজনকে ভালবাসি।'

কথাটার ভাবার্থ দেবাশিসের মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল, তারপর তার মনে যে দীপ জ্বলেছিল, তা আস্তে আস্তে নিবে গেল, তার মনে হল, ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোটাও যেন কমে কমে পিদিমের চেয়েও নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। সে দীপার পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শুষ্ক প্রশ্ন করল—'তবে আমাকে বিয়ে করলে কেন?'

দীপা ঘাড় গুঁজে বসে রইল, কেবল তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত হল—'আমি দোষ করেছি, কিন্তু আমার উপায় ছিল না। বাড়ির লোক জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছে।'

যাকে ভালবাস তাকে বিয়ে করলেই পারতে!'

'জাত আলাদা, তাই—'

'জাত!' একটা কঠিন হাসি দেবাশিসের মনের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে স্থির হল—'তা এখন কি করা যেতে পারে?'

দীপা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ব্যগ্র মিনতির কণ্ঠে বলল—'আমাকে আপনার বাড়িতে থাকতে দিন, আমি আপনাকে বিরক্ত করব না, আপনার সামনে আসব না—'তার গলা কান্নায় বুজে এল।

ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে দেবাশিস নিজের চুলের মধ্যে আঙুল চালাল, বলল—'এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। সব কথা ভেবে দেখতে হবে। তুমি যাও, শোও গিয়ে।' সে ফুল দিয়ে সাজানো শয়নঘরের দিকে আঙুল দেখাল—'আমি অন্য কোথাও শোব।'

দীপা আর দাঁড়াল না, দ্রুত ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তার চুলে তখনো ফুলের মালা জড়ানো, গলায় হাতে ফুলের গয়না। সেই অবস্থাতেই সে ফুল-ঢাকা বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এত সহজে পরিত্রাণ পাবে তা সে আশা করেনি।

দোতলায় আর একটি শয়নকক্ষ ছিল, দেবাশিসের বাবা যে ঘরে শুতেন; নকুল সে ঘরও পরিষ্কার করেছিল, খাটের ওপর বিছানা পেতে সুজ্‌নি ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। বিয়ের শুভদিনে বাড়িতে কোথাও সে অপরিচ্ছন্নতা রাখেনি। দেবাশিস দীর্ঘকাল অব্যবহৃত এই ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ খাটের পাশে বসে রইল। মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে, সে কক্ষসংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে কল খুলে মাথাটা কলের তলায় রাখল। তারপর ভিজে মাথায় ফিরে এসে আলো নিভিয়ে বিছানার সুজ্‌নির ওপরেই শুয়ে পড়ল।

রেল গাড়ি প্রচন্ড বেগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ যখন লাইনের বাইরে লাফিয়ে পড়ে তখন কাউকে নোটিস দেয় না; দেবাশিসের জীবনে তেমনি আজ এই মহাদুর্যোগ এসেছে অপ্রত্যাশিতভাবে; দু' মিনিট আগেও এই দুর্যোগের কোনো আভাস সে পায়নি। কিন্তু আত্মহারা হয়ে বিপথে কুপথে ছুটোছুটি করলে চলবে না, মাথা ঠান্ডা রেখে ভেবেচিন্তে সুবুদ্ধির পথ বেছে নিতে হবে।

দেবাশিস জটিল চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। সে শান্ত ধীর প্রকৃতির মানুষ, অন্য কেউ হলে আজ রাত্রেই একটা কান্ড করে বসত।

দীপা অন্য একজনকে ভালবাসে, এইটেই হচ্ছে মূল কথা। দীপা কাকে ভালবাসে, সে লোকটা কে, তা জানবার আগ্রহ দেবাশিসের নেই; সে যেই হোক না কেন, দীপা তাকে ভালবাসে। তবু দীপা পারিবারিক চাপে পড়ে দেবাশিসকে বিয়ে করেছে। কিন্তু এই বিয়েকে সে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কে পরিণত করতে চায় না।...প্রেমাস্পদের সঙ্গে দীপার ঘনিষ্ঠতা কত দূর অগ্রসর হয়েছিল? জল্পনা নিষ্ফল।

দীপার বাড়ির সকলেই অবশ্য দীপার অসবর্ণ প্রণয়ের কথা জানে, বিজয়মাধব জানে। জেনে-শুনে তারা এই কাজ করেছে। হয়তো ভেবেছে, বিয়ের পর দীপা

ক্রমে তার প্রণয়ীকে ভুলে যাবে। কিন্তু দীপা ভুলবে বলে মনে হয় না, প্রণয়ীর প্রতি তার একনিষ্ঠা আছে।...নৃপতি কি জানে? বোধ হয় জানে না. জানলে দেবাশিসের এমন অনিষ্ট করত না; নৃপতিকে সজ্জন বলেই মনে হয়।...কিন্তু যা হবার তা তো হয়েছে, এখন এই জট ছাড়াবার উপায় কি? ডিভোর্স?

একটা বেজে গেল, দুটো বেজে গেল। এতক্ষণ পরে দেবাশিস লক্ষ করল, বসবার ঘরে তীব্র শক্তির আলোটা জ্বলেই চলেছে। সে উঠে আলোটা নেবাতে গেল। দীপার ঘরের দরজা বন্ধ; দরজার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে একটু থেমে কান পেতে শুনল. কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে কোনো শব্দ এল না; দীপা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বসবার ঘরের আলো নিবিয়ে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ল।

ঝাঁ ঝাঁ রাত্রি। কলকাতা শহর নিঝুম হয়ে আছে। দূরে একটা রেলের ইঞ্জিন একটানা বাঁশী বাজাতে বাজাতে আরো দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল। দেবাশিস অন্ধকারে চোখ মেলে শুধু ভাবছে—

তিনটে বেজে গেল। দেবাশিসের মনে হল, নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে এক বিন্দু জোনাকি-আলো জ্বলছে আর নিবছে...একটা অর্ধ-পরিণত সংকল্প.. তার বেশী আজ রাত্রে আর কিছু সম্ভব নয়...

দেবাশিস আবার বাথরুমে গিয়ে মাথায় জল ঢালল, তারপর ফিরে এসে বিছানায় শোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু বেশীক্ষণ ঘুমোতে পারল না, শরীরের ক্লান্তি কেটে যাবার পর ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই তার ঘুম ভেঙে গেল। সে মুখ ধুয়ে নীচে নেমে গেল। নকুল তখনো ওঠেনি, কাল রাত্রের খাটাখাটুনির পর আজ বোধ হয় একটু বেশী ঘুমিয়ে পড়েছে। দেবাশিস নিঃশব্দে সদর দরজা খুলে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। শুকনো বাগানে ফুল নেই. কিন্তু ভোরের বাতাসটি বেশ মিঠে। সে সদর দরজা থেকে ফটক পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল।

একটু একটু করে দিনের আলো ফুটছে কিন্তু এ রাস্তায় এখনো লোক চলাচল আরম্ভ হয়নি। দেবাশিস পায়চারি করতে করতে এক সময় ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল। বন্ধ ফটকের উপর কনুই রেখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল বাঁ দিক থেকে একজন লোক হন্‌হন্‌ করে আসছে। কাছে এলে সে চিনতে পারল— বিজয়মাধব।

বিজয়মাধবের সঙ্গে এই কয় দিনে দেবাশিসের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, উপরন্তু সে এখন তার শ্যালক। কিন্তু বিজয়কে আসতে দেখে তার মনটা গরম হয়ে উঠল। তাই বিজয় যখন মুখে হাসি ফুটিয়ে ফটকের ওপারে এসে দাঁড়াল তখন দেবাশিসের মুখে সে হাসির প্রতিবিম্ব পড়ল না, সে গম্ভীর চোখে বিজয়ের পানে চেয়ে বলল—'আবার কি জন্যে এসেছেন? কর্তব্যকর্ম কি এখনো শেষ হয়নি?'

বিজয়ের হাসি মিলিয়ে গেল, সে থতমত খেয়ে বলে উঠল—'দীপা কিছু বলেছে নাকি?'

দেবাশিস নীরস কণ্ঠে বলল—'সবই বলেছে। সে অন্তত আমায় ঠকায়নি।'

বিজয় কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত চেয়ে থেকে হঠাৎ ফটক খুলে ভিতরে এল, তারপর দেবাশিসের হাত চেপে ধরে ব্যগ্র মিনতির স্বরে বলল—'ভাই দেবাশিস, তুমি দীপার স্বামী, তুমি আমার পরমাত্মীয়, আমার ছোট ভাইয়ের সমান। আমি

একটা কথা বলব? শুনবে?'

'কি বলবেন বলুন।'

'দীপা একেবারে ছেলেমানুষ, সবে সতেরো পেরিয়ে আঠারোয় পা দিয়েছে, ওর মনে কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছু নেই। ওইটুকু মেয়ের বুদ্ধিই বা কতখানি? তুমি ভাই ওর কথায় কান দিও না। দু'চার দিন ঘর করলেই আগের কথা সব ভুলে যাবে।.কম বয়সের একটা খেয়াল বই তো নয়?'

'ওর কথা শুনে তা তো মনে হয় না।'

'মেয়েমানুষের কথার কি কোনো দাম আছে? ওরা আধুনিক কায়দায় বড় বড় কথা বলে, ভিতরে কিন্তু ফক্কিকার। দীপা স্কুলে পড়েছে, স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে মিশে পাকামি শিখেছে। ওর মনটা ভাবপ্রবণ; সিনেমা-থিয়েটার নাচগানের দিকে টান আছে, যদিও আমরা তাকে কোনোদিন আশকারা দিইনি। আমি জোর গলায় বলছি, আমাদের বংশের মেয়ে কখনো বিপথে কুপথে যাবে না।'

দেবাশিস শান্ত গলায় বলল—'আপনার ভয় নেই, এ নিয়ে আমি ঝোঁকের মাথায় কোনো কেলেঙ্কারি কান্ড করব না, যা করবার ভেবে-চিন্তে করব। এ কথা বাড়ির বাইরে আর কেউ জানে?'

'না।' বিজয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাড়ির দোরের কাছে নকুলকে দেখা গেল। নকুল এগিয়ে এসে বলল—'দাদাবাবু, চা তৈরি হয়েছে।'

বিজয় খাটো গলায় তাড়াতাড়ি বলল—'আচ্ছা ভাই, আজ আমি যাই। শীগ্‌গির আবার আসব।' বলে সে দ্রুতপদে চলে গেল।

দেবাশিস বাড়ির দিকে ফিরে যেতে যেতে বলল—'নকুল, তুই আমাদের চা ওপরের ঘরে দিয়ে আয়।'

নকুল মুচকি হেসে বলল—'তাই দিয়েছি দাদাবাবু!'

দেবাশিস দোতলায় উঠে গেল। দেখল, বসবার ঘরে নীচু টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে আর দীপা তক্তপোশের পাশে চুপটি করে বসে আছে-কাল রাত্রে যেমন বসে ছিল। অবশ্য কাল রাত্রের বাসি জামাকাপড়, ফুলের গয়না আর নেই, তার বদলে পাট-ভাঙ্গা শাড়ি ব্লাউজ। দেবাশিস আসতেই দীপা একটু আড়ষ্টভাবে উঠে দাঁড়াল।

দেবাশিস দোর বন্ধ করে দিয়ে দোরের সামনে ফিরে দাঁড়িয়ে দীপার পানে তাকাল। খোলা জানালা দিয়ে সকালের নরম আলো দীপার ওপর পড়েছে। বিজয় যা বলেছিল তা মিথ্যে নয়, দীপার ছিপছিপে শরীরে কৌমার্যের কোমলতা এখনো লেগে আছে, ভারি ছেলেমানুষ মনে হয়। কিন্তু তার মুখে পরিণত মনের দৃঢ়তা, মুখের লাবণ্য যেন দৃঢ়তার উপাদানে তৈরি।

দেবাশিস কাছে এসে চায়ের সরঞ্জামের দিকে দৃষ্টি নামালো; টি-পটে চা, দু'টি পেয়ালা, গরম দুধ, চিনির কিউব্, প্লেটে স্তূপীকৃত টোস্ট, মাখনের পাত্রে মাখন, অন্য একটি পাত্রে মার্‌মালেড্ এবং চারটি সিদ্ধ ডিম। নকুল দু'জনের জন্য প্রচুর প্রাতরাশ করেছে, একলা দেবাশিসের জন্য এত করে না।

দেবাশিস দীপার দিকে চোখ তুলে সহজ গলায় বলল—'তুমি চা ঢালবে?'

দীপাদের বাড়িতে সাবেক রেওয়াজ, পেয়ালায় চা ঢালা হয়ে সকলের কাছে যায়। প্রাতরাশ খাওয়ার কোনো বিধিবন্ধ রীতি নেই। সে একটু ইতস্তত করল। তাই দেখে দেবাশিস বলল—'আচ্ছা, আমিই চা ঢালছি।'

দু'টি পেয়ালায় চা ঢেলে সে একটি পেয়ালা দীপার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—'বসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে, চা খেতে খেতে কথা হবে।'

দীপা সঙ্কুচিতভাবে চেয়ারে বসল। তার সঙ্কোচ মনের জড়ত্ব নয়, অপরিচিত এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সঙ্কোচ। তার জীবনে অভাবনীয় ওলটপালট আরম্ভ হয়েছে।

দেবাশিস নিজের চায়ে একটি ছোট চুমুক দিয়ে পেয়ালা নামিয়ে রাখল, বলল—'তোমার দাদা বিজয়মাধব আজ ভোর হতে না হতে এসেছিল।'

দীপা চকিত চোখ তুলে আবার চোখ নত করল। দেবাশিস এক টুকরো টোস্টে মাখন লাগাতে লাগাতে বলল—'তার কথা শুনে মনে হল তোমার গুপ্তকথা বাড়ির সবাই জানে। বাইরের কেউ জানে নাকি?'

দীপা মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল—'না—না—।' আর কোনো কথা তার শুকনো গলা দিয়ে বেরুল না।

দেবাশিস বলল—'তা সে যাই হোক, সব কথা বিবেচনা করা দরকার। একটা ব্যাপার ঘটেছে, আমার জীবনে হঠাৎ একটা বেয়াড়া সমস্যা এসে হাজির হয়েছে। যথাসাধ্য কেলেঙ্কারি বাঁচিয়ে তার নিষ্পত্তি করতে হবে। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

দীপা ঘাড় নাড়ল, অস্ফুট স্বরে বলল—'পারছি।' সে কিন্তু দেবাশিসের ধরনধারন কিছুই বুঝতে পারছে না। এরকম অবস্থায় মানুষ কি এমনিভাবে কথা বলে?

দেবাশিস টোস্টে কামড় দিয়ে বলল—'তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

দীপা তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিল, কিন্তু হাতের পেয়ালা হাতেই রইল, ঠোঁট পর্যন্ত উঠল না।

দেবাশিস শান্তভাবে বলল—'সমস্যার সোজাসুজি নিষ্পত্তি আছে ডিভোর্স।'

দীপার হাতের পেয়ালা কেঁপে উঠল। আর একটু হলেই পড়ে যেত। সে সামলে নিয়ে রুদ্ধস্বরে বলল—'না।'

দেবাশিস ভুরু তুলে বলল—'না কেন? তোমার বাড়ির লোক ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে না দিয়ে অন্যায় করেছেন, সে অন্যায় সংশোধন করা উচিত।'

দীপা নত চোখে বলল—'আমার দাদু—তিনি তাহলে বাঁচবেন না।'

দেবাশিস কিছুক্ষণ কথা কইল না, কতকটা যেন অন্যমনস্কভাবে দীপার পানে চেয়ে রইল। তারপর নিজের ঈষদুষ্ণ পেয়ালাটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে নিঃশেষ করে আবার রেখে দিল।

উদয়মাধবকে দেবাশিস দেখেছে বৃদ্ধের চারিত্রিক প্রবলতা অনুভব করেছে নাতনী ডিভোর্স-কোর্টে গিয়েছে শুনলে তিনি হয়তো আত্মহত্যা করবেন না, কিন্তু নাতনীকে খুন করতে পারেন।

'ডিভোর্স যদি সম্ভব না হয় তাহলে দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে—তুমি বাপের বাড়ি ফিরে যাও, সেখানে যেমন ছিলে তেমনি থাকো।'

'না, ওরা আবার আমায় ফেরত পাঠিয়ে দেবে। মাঝ থেকে জানাজানি হবে।'

'তাহলে তৃতীয় পন্থা হচ্ছে এখানেই থাকা। আলাদাই থাকবে, আমি তোমার কাছে যাব না। কিন্তু আমারও তো লোকলজ্জা আছে। বাইরের লোকের কাছে

ভণ্ডামি করতে হবে। তুমি পারবে?'

দীপা ঘাড় নেড়ে জানাল, সে পারবে.

দেবাশিস বলল, 'বাড়ির চাকরও বাইরের লোক। তার সামনেও ধোঁকার টাটি খাড়া রাখতে হবে।'

দীপা আবার ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

দেবাশিস নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল—'বেশ। কিন্তু এভাবে কত দিন চলবে?'

দীপা চুপ করে রইল, এ প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই জানে না। দেবাশিস আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা খুবই অল্প; কিন্তু তার মনে হল, এরা বড় স্বার্থপর. নিজের স্বার্থই বোঝে, আর কারুর কথা ভাবে না।

কাল দেবাশিস ভেবেছিল. এখন দু'তিন দিন সে ফ্যাক্টরিতে যাবে না. সারা দিন বাড়িতে থেকে বউয়ের সঙ্গে ভাব করবে। কিন্তু সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। সে খানিকক্ষণ বিমনাভাবে ঘুরে বেড়ালো. কাল রাত্রে যে বিছানায় শুয়েছিল সেটা ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে রাখল. নকুল না সন্দেহ করে যে. তারা আলাদা শুয়েছে। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে বলল. 'নকুল. আমার খাবার তৈরি কর. আমি ন'টার সময় ফ্যাক্টরি যাব।'

স্নান করতে গিয়ে দেবাশিসের একটা কথা মনে এল। সে দেখল, দীপা তখনো বসবার ঘরে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, সে তার কাছে গিয়ে বলল—নকুলের চোখে যদি ধুলো দিতে হয় তাহলে তোমার ঘরের লাগোয়া বাথরুমে আমাকে স্নান করতে হবে। অন্য বাথরুমে আমার ভিজে কাপড় দেখলে নকুলের মনে সন্দেহ হবে। আমি তোমার বাথরুমে স্নান করতে পারি?'

দীপার মনে হল দেবাশিস তাকে ব্যঙ্গ করছে। সে চোখ তুলে চাইল. কিন্তু দেবাশিসের মুখে ব্যঙ্গবিদ্রূপের চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না। সে তখন একটু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

দেবাশিস স্নানাহার করে ন'টার সময় কাজে চলে গেল।

অতঃপর সংসারের সব ভার পড়ল নকুলের ওপর। নতুন বউকে বাড়ির কাজকর্ম শেখাতে হবে. বউয়ের খাওয়াদাওয়ার ওপর নজর রাখতে হবে। বাড়িতে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই; সাময়িকভাবে নকুল হয়ে উঠল বাড়ির গিন্নী।

দুপুরবেলা দীপাকে ভাত খাইয়ে নকুল ওপরে পাঠিয়ে দিল. বলল—'যাও, একটু ঘুমিয়ে নাও গিয়ে।'

কিন্তু দীপার দিনের বেলা ঘুমোনো অভ্যেস নেই। সে ঘুরে ঘুরে ওপরতলাটা দেখতে লাগল...এই ঘরে কাল রাত্রে দেবাশিস শুয়েছিল...নকুল যেন জানতে না পারে. সে ওপরে আসবার আগেই রোজ বিছানা ঝেড়ে ঠিকঠাক করে রাখতে হবে... বাড়ির পাশের ব্যালকনি থেকে বাগানটা দেখা যায়। বাগানের ছিরি নেই, যেন কত কাল কেউ বাগানের দিকে তাকায়নি। দেবাশিসের বাগানের শখ নেই। দীপার খুব বাগানের শখ আছে। সে বাপের বাড়ির খোলা ছাদে টবের বাগান করেছিল।

ঘণ্টাখানেক ঘুরে ফিরে সে বসবার ঘরে এল। রেডিওগ্রামের ওপর নজর পড়ল। দীপা রেডিও শুনতে ভালবাসে...বাপের বাড়িতে তার একটি ট্র্যানজিস্টার ছিল. সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গান শুনত. ফুটবলের কমেণ্টারি শুনত, নাট্য-

তিময় শুনত। ট্র্যান্জিস্টারটা আনা হয়নি। তার অনেক নিজস্ব জিনিস বাপের বাড়িতে পড়ে আছে।

দীপা রেডিওগ্রামের কপাট সরিয়ে কলকব্জা নাড়াচাড়া করতে করতে গানের সুর বেজে উঠল। দুপুরবেলার শান্ত ত্বরাহীন প্রোগ্রাম। সে রেডিওর পাশে একটা গদিমোড়া আরাম-চেয়ারে বসে শুনতে লাগল।

কাল রাত্রে দীপা অল্পই ঘুমিয়েছে, যেটুকু ঘুমিয়েছে তাও যেন আড়ষ্ট হয়ে। এখন রেডিওর মৃদু গুঞ্জন শুনতে শুনতে তার চোখ বুজে এল।

হঠাৎ তার চমক ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। সে চোখ মেলে দেখল, ঘরের কোণে ছোট টেবিলের ওপর টেলিফোন বাজছে। দীপা রেডিও বন্ধ করে দিল। নিশ্চয় দেবাশিসের টেলিফোন। একটু ইতস্তত করে সে উঠে গিয়ে ফোন তুলে নিল।

'হ্যালো।'

অপর প্রান্ত থেকে আওয়াজ এল—'দীপা, আমার গলা চিনতে পারছ?'

দীপার বুক ধড়ফড় করে উঠল, সে অবরুদ্ধ স্বরে বলল—'পারছি।'

'ঘরে কেউ আছে?'

'না, আমি একা।'

'বেশ। তোমার স্বামীকে বলেছ?'

'বলেছি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কিছু না।'

'রাত্রে তোমাকে বিরক্ত করেনি?'

'না।'

'তুমি একলা শুয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। এইভাবে চালিয়ে যাও।'

'কত দিন?'

'একটু সময় লাগবে। তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। শপথ মনে আছে তো?'

'শপথ!'

'শপথ করেছ, আমর নাম কাউকে বলবে না। মা কালীর নামে শপথ করেছ, মনে আছে?'

'আছে।'

'তোমার স্বামী হয়তো নাম জানবার জন্যে পীড়ন করতে পারে।'

'নাম জানতে চায়নি। চাইলেও আমি বলব না।'

'বেশ। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে ফোন করব। দুপুরবেলা তোমার স্বামী যখন বাড়িতে থাকবে না তখন ফোন করব।'

'আচ্ছা।'

সে ফোন রেখে দিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসল। মনে হল তার শরীরের সমস্ত জোর ফুরিয়ে গেছে।

বিকেল পাঁচটার সময় দেবাশিস ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এল। নকুল দোর খুলে দিল। দীপা ওপর থেকে ঘণ্টির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল, সে উৎকর্ণ হয়ে রইল।

দেবাশিস উপরে উঠে এসে দেখল, দীপা নীরব রেডিওগ্রামের সামনে বসে আছে। সে ঢুকতেই দীপা চকিতে একবার তার দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াল। দেবাশিস দ্বিধা-মন্থর পায়ে তার সামনে এল। কারুর মুখে কথা নেই। কিন্তু শুধু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা কতক্ষণ চলে। শেষে দেবাশিস বলল—'নকুল তোমার দেখাশুনো করেছিল তো?'

দীপা ঘাড় নেড়ে বলল—'হ্যাঁ।'

দেবাশিস প্রশ্ন করল—'চা খেয়েছ?'

দীপা মাথা নাড়ল—'না।'

অতঃপর আর কি বলা যেতে পারে, দেবাশিস ভেবে পেল না। ওদিকে দীপা প্রাণপণে চেষ্টা করছে সহজভাবে যা হোক একটা কিছু বলতে। কিন্তু কী বলবে? বক্তব্য কী আছে? শেষ পর্যন্ত একটা কথা মনে এল, সে ঘাড় তুলে বলল—'আপনি দুপুরবেলা কোথায় খাওয়াদাওয়া করেন?'

দেবাশিস বলল—'আমার ফ্যাক্টরিতে খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা আছে। ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে সকলেই দুপুরবেলা ক্যান্টিনে খায়। আমিও খাই।'

দীপা শুধু বলল—'ও।'

দেবাশিস বলল—'আচ্ছা, আমি কাপড়-চোপড় বদলে নিই। তারপর নীচে গিয়ে চা খাওয়া যাবে।'

সংশয়স্খলিত স্বরে দীপা বলল—'আচ্ছা।'

দেবাশিস দীপার ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল—'আমি তাহলে তোমার বাথরুমই ব্যবহার করছি।'

দোর পর্যন্ত গিয়ে দেবাশিস থমকে দাঁড়াল, তারপর আস্তে আস্তে দীপার সামনে ফিরে এসে গলা খাটো করে বলল—'একটা কথা। তুমি আমাকে 'আপনি' বললে ভাল শোনায় না। অবশ্য আড়ালে তা বলতে পার, কিন্তু নকুল কিংবা অন্য কারুর সামনে 'তুমি' বলাই স্বাভাবিক। নইলে ওদের খট্‌কা লাগতে পারে।'

দীপা মুখ নীচু করে নীরব রইল।

দেবাশিস প্রশ্ন করল—'কি বলো?'

দীপা অনিচ্ছা-ভরা ক্ষীণ স্বরে বলল—'আচ্ছা।'

দেবাশিস বাথরুমে চলে গেল। দীপা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, প্রকাশ্যে 'তুমি' বলা এবং আড়ালে 'আপনি' বলা কি খুব সহজ কাজ? রঙ্গালয়ের নটনটীরা বোধহয় পারে। তার মনে হল সে আস্তে আস্তে অতলস্পর্শ চোরাবালির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে।

দশ মিনিট পরে দেবাশিস পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এল, বলল—'চল, নীচে যাই।'

দেবাশিসের পিছু পিছু দীপা নীচে নেমে গেল, দু'জনে টেবিলের দু'প্রান্তে বসল। নকুল তাদের সামনে রেকাবি-ভরা লুচি তরকারী রাখল। দেবাশিস খেতে আরম্ভ করল কিন্তু দীপা হাত গুটিয়ে বসে রইল।

নকুল জিজ্ঞেস করল—'দাদাবাবু, ডিম ভেজে দেব?'

"দেবাশিস দীপার পানে চাইল। দীপা একটু মাথা নাড়ল; বাপের বাড়িতে তার ডিম খাওয়া বারণ ছিল। আইবুড়ো মেয়েদের ডিম খেতে নেই।

দেবাশিস বলল—'থাক, দরকার নেই।'

চায়ের পেয়ালা টেবিলে রাখতে এসে নকুল বলল—'ও কি বউদি, তুমি খাচ্ছ না?'

দীপা মাথা হেঁট করল, তারপর কাতর দৃষ্টিতে দেবাশিসের পানে তাকাল। দেবাশিস বুঝতে পারল দীপার সংকোচের কারণ কি। সে একটু হেসে বলল – 'নকুল, ওর বোধ হয় পুরুষের সামনে খাওয়া অভ্যেস নেই।'

দেবাশিস তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর নকুল দীপার কাছে এসে বলল– 'বউদি, এ সংসারে মেয়ে-পুরুষ সবাই একসঙ্গে খায়, কর্তাবাবুর আমল থেকে এই রেওয়াজ দেখে আসছি। তুমি যখন এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছ তখন তোমাকেও তো এ বাড়ির রেওয়াজ মেনে চলতে হবে। ভাবনা নেই, আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে। নাও, খেতে আরম্ভ কর। তোমার বাপের বাড়িতে কি ডিমের চলন নেই?'

দীপা বলল—'পুরুষেরা হাঁসের ডিম খান। মুরগির ডিমের চলন নেই।'

নকুল বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল—'হাঁসের ডিমও যা মুরগির ডিমও তাই, সব ডিমই সমান।'

দীপা নকুলের তদারকিতে চা-জলখাবার খেয়ে ঘরের বাইরে এসে দেখল, দেবাশিস সিঁড়ির হাতলের ওপর কনুই রেখে দাঁড়িয়ে আছে। দীপাকে দেখে সে বলল—'বেড়াতে যাবে? সারা দিন তো বাড়িতে বন্ধ আছ, চল না মোটরে খানিক বেড়িয়ে আসবে।'

অভিনয় চলছে চলুক, কিন্তু কোথাও একটা সীমারেখা টানা দরকার। দীপা সোজা দৃষ্টিতে দেবাশিসের পানে চেয়ে দৃঢ় স্বরে বলল—'না।'

দেবাশিসের মুখ দেখে মনে হল না যে সে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে, সে সহজভাবে বলল—'আচ্ছা, আমি তাহলে একটু ঘুরে আসি। বেশী দূর নয়, নৃপতিদার আড্ডা পর্যন্ত।'

সে বেরিয়ে পড়ল। অর্ধেক পথ গিয়েছে, দেখল কপিল বোস পায়ে হেঁটে তার দিকেই আসছে। কপিলের একটি ছোট মোটর আছে, বেশীর ভাগ তা'তেই সে ঘুরে বেড়ায়। মুখোমুখি হলে দেবাশিস বলল—'এদিকে কোথায় চলেছেন?'

কপিল একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল—'আপনার দিকেই যাচ্ছিলাম।'

মনে মনে বিস্মিত হলেও দেবাশিস মুখে বলল—'আমার দিকে? তা—চলুন ফেরা যাক।'

কপিল তাড়াতাড়ি বলল—'না না, তার দরকার নেই। আপনি আড্ডায় যাচ্ছেন তো? চলুন আমারও শেষ গন্তব্যস্থান সেখানেই। আপনার কাছে যাচ্ছিলাম একটা জিনিসের খোঁজে।'

দু'জনে নৃপতির বাড়ির দিকে চলল। দেবাশিস জিজ্ঞেস করল—'কিসের খোঁজে?'

কপিল দ্বিধাভরে বলল—'আমার সিগারেট-কেস্‌টা আজ সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না। যত দূর মনে পড়ে কাল বিকেল পর্যন্ত ছিল; তারপর আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার সিগারেটই খেয়েছি, আমার পকেটে সিগারেট-কেস্ আছে

কিনা খেয়াল করিনি। আজ সকালবেলা দেখি নেই। বাড়িতে খুঁজলাম, পাওয়া গেল না। তা ভাবলাম, খোঁজ নিয়ে আসি আপনার বাড়িতেই পকেট থেকে পড়ে গেছে কিনা।'

দেবাশিস বলল—'আমার বাড়িতে যদি পড়ে থাকে এবং কেউ তুলে না নিয়ে থাকে তাহলে নকুল নিশ্চয় সরিয়ে রেখেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করব। কিসের সিগারেট-কেস্—সোনার?'

কপিল তাড়াতাড়ি বলল—'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ভাববেন না, আমি প্রায়ই জিনিস হারিয়ে ফেলি, তবে বেশীর ভাগ সময়েই পাওয়া যায়। হয়তো বাড়িতেই আছে, কিংবা নৃপতিদার আড্ডায়।'

নৃপতির আড্ডাঘরে তখন আলো জ্বলছে; ঘরে কেবল নৃপতি আর প্রবাল বসে গল্প করছে। এরা ঘরে ঢুকলে নৃপতি সমাদরের সুরে বলে উঠল- 'আরে, এস এস।'

দু'জনে নৃপতির কাছে বসল। নৃপতি দেবাশিসকে নিবিষ্ট চোখে দেখতে দেখতে চাপা কৌতুকের সুরে বলল--আমি তো ভেবেছিলাম, এখন কিছু দিন তুমি বাড়ি থেকে বেরুবেই না। যা হোক, দাম্পত্য-জীবন কেমন লাগছে?'

প্রশ্নের জন্যে দেবাশিস তৈরি ছিল না, একটু দম নিয়ে মুখে সলজ্জ হাসি এনে বলল 'মন্দ কি, ভালই লাগছে।'

প্রবালের গলায় মধ্যে হাসির মত একটা শব্দ হল, সে বলল- প্রথম প্রথম ভালই লাগে। তারপর--' সে উঠে গিয়ে পিয়ানোর সামনে বসল, টুংটাং শব্দে একটা বিষাদের সুর বাজাতে লাগল।

কপিল ভ্রূকুটি করে কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে রইল, তারপর বিস্বাদসূচক মুখভঙ্গী করে দেবাশিসকে বলল-'এক জাতের লোক আছে তারা শুধু চাঁদের কলঙ্কই দেখে, চাঁদ দেখতে পায় না। নৃপতিদা, একটা সিগারেট দিন, আমার সিগারেট-কেস্‌টা হারিয়ে ফেলেছি।'

কপিল সিগারেট ধরিয়েছে এমন সময় চিত্রনক্ষত্র সুজন মিত্র প্রবেশ করল। বোধহয় সোজা ফিল্ম স্টুডিও থেকে আসছে, পরনে করডুরয়ের লম্বা প্যান্ট এবং টকটকে লাল রঙের সিল্কের শার্ট। দেবাশিসকে দেখে চোখ বড় করে কৌতুকের ভঙ্গিতে হাসল, তারপর বলল—'নৃপতিদা, আজ কাগজে খবর দেখেছেন?'

সকলেই উৎসুক চোখে তার পানে চাইল, প্রবালের পিয়ানো বন্ধ হল। নৃপতি বলল -'কি খবর? কাগজ অবশ্য পড়েছি, কিন্তু গুরুতর কোনো খবর দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

সুজন পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বলল—'গুরুতর খবর না হতে পারে কিন্তু ঘরোয়া খবর। আমাদের পাড়ার খবর। খবরের কাগজের এক কোণে ছোট্ট একটি খবর। গোল পার্কের কাছে কাল ভোরবেলা একজন ভিখিরি মারা গেছে।' এই বলে সুজন নাটকীয় ভঙ্গিতে চুপ করল। সবাই অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইল।

সুজন তখন আবার আরম্ভ করল--ভাবছেন, একটা ভিখিরির মৃত্যু এমন কী চাঞ্চল্যকর খবর। কিন্তু ভিখিরির মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, কোনো অজ্ঞাত ঘাতক তাকে খুন করেছে। এবং তার চেয়েও বিস্ময়কর খবর অজ্ঞাত আততায়ী ভিখিরির পিঠের দিক থেকে তার বুকের মধ্যে একটা শজারুর কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে

বধ করেছে।'

সুজনের বক্তৃতার মাঝখানে প্রবালও পিয়ানো থেকে উঠে কাছে এসে বসেছিল। শ্রোতারা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। শেষে নৃপতি বলল—'ছোট খবর বলেই বোধহয় চোখে পড়েনি। তোমরা কেউ পড়েছ?'

কেউ পড়েনি। দেবাশিস এবং প্রবাল খবরের কাগজ পড়ে না। নতুন খবরের প্রতি তাদের আসক্তি নেই। কপিল কেবল খেলাধুলোর পাতাটা পড়ে।

প্রবাল বলল—'শজারুর কাঁটা কি মানুষের শরীরে বিঁধিয়ে দেওয়া যায়—ভেঙে যাবে না?'

নৃপতি পণ্ডিত ব্যক্তি, সে বলল—'না, ভাঙবে না। নরম কাঁটা হলে দুমড়ে যেতে পারে কিন্তু ভাঙবে না। শক্ত কাঁটা লোহার শলার মত সটান মাংসের মধ্যে ঢুকে যাবে।'

প্রবাল জিজ্ঞেস করল—'শজারুর কাঁটা কোথায় পাওয়া যায়? বাজারে বিক্রি হয় নাকি?'

নৃপতি বলল—'সব জায়গায় পাওয়া যায় না। শুনেছি নিউ মার্কেটে দু'একটা দোকানে পাওয়া যায়। তাছাড়া বেদেরা গড়ের মাঠে বিক্রি করতে আসে।'

দেবাশিস বলল—'কিন্তু ছোরাছুরি থাকতে শজারুর কাঁটা দিয়ে মানুষ খুন করবার মানে কি?'

কেউ সদুত্তর দিতে পারল না। কপিল নতুন প্রশ্ন করল—'কিন্তু ভিখিরিকে কে খুন করবে? কেন খুন করবে?'

নৃপতি একটু ভেবে বলল—'ভিখিরিদের মধ্যেও কৃপণ ও সঞ্চয়ী লোক থাকে। এমন শোনা গেছে, ভিখিরি মারা যাবার পর তার কাঁথা-কানির ভেতর থেকে দু'শো চারশো টাকা বেরিয়েছে। এই লোকটাও হয়তো সঞ্চয়ী ছিল, তার টাকার লোভে কেউ তাকে খুন করেছে।'

কপিল বলল—'আমার মনে হয় এ একটা উন্মাদ পাগলের কাজ। নইলে শজারুর কাঁটার কোনো মানে হয় না।'

সুজন বলল—'তা বটে, প্রকৃতিস্থ মানুষ শজারুর কাঁটা দিয়ে খুন করবে কেন? প্রবাল, তোমার কি মনে হয়?'

প্রবাল অবহেলা ভরে বলল—'যে-ই খুন করুক সে সাধু ব্যক্তি, ভিখিরি মেরে সমাজের উপকার করেছে। যারা কাজ করে না তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।' সে উঠে গিয়ে আবার পিয়ানোর সামনে বসল।

তারপর খড়্গ বাহাদুর এল। তার আজ মাঠে খেলা ছিল; সে খেলার কথা তুলল, আলোচনার প্রসঙ্গ বিষয়ান্তরে সঞ্চারিত হল। কিছুক্ষণ পরে কফি এল। কফি খেয়ে আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পর দেবাশিস বাড়ি ফিরল।

দেবাশিসের জীবনযাত্রা বিয়ের আগে যেমন ছিল বিয়ের পরেও প্রায় তেমনি রয়ে গেল। বাড়িতে একজন লোক বেড়েছে এই যা। কেবল নকুল এবং বাইরের অন্যান্যদের সামনে ভণ্ডামি করতে হয়। দেবাশিসের ভাল লাগে না।

আড়ালে দীপার সঙ্গে দেবাশিসের সম্পর্ক বড় বিচিত্র। ঘনিষ্ঠতা না করে যতটা সহজভাবে একসঙ্গে বাস করা যায় দু'জনে সেই চেষ্টা করছে। কিন্তু

কাজটি সহজ নয়। দীপার মনের নিভৃত আতঙ্ক তার চোখের চাউনিতে হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে। দেবাশিসের মন অশান্ত; সে জানে দীপা অন্যকে ভালবাসে, তবু দীপা তার মনকে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করছে। বিজয় বলেছিল, দীপা ছেলেমানুষ, দু'চার দিন স্বামীর ঘর করলেই আগের কথা ভুলে যাবে। কিন্তু দীপার ভাবভঙ্গী দেখে তা মনে হয় না। দীপা আর যাই হোক, তার মন চপল নয়।

এইরকম শঙ্কা-দ্বিধার মধ্য দিয়ে কিছুদিন কেটে যায়। একদিন বিকেলবেলা ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এসে দেবাশিস দীপাকে বলল—'একটা কথা আছে। ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে তাদের ইচ্ছে, তুমি একদিন ফ্যাক্টরিতে যাও, ওরা তোমাকে পার্টি দিতে চায়। যাবে?'

দীপার মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, এ আবার কি নতুন ঝঞ্ঝাট? সে একটু চুপ করে থেকে বলল—'না গেলেই কি নয়?'

দেবাশিস বলল—'তুমি যদি না যেতে চাও আমি জোর করতে পারি না। তবে না গেলে খারাপ দেখায়।'

শুক্‌নো মুখে দীপা বলল—'তা হলে যাব।'

দু'তিন দিন পরে দেবাশিস একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরল, তারপর কোট প্যাণ্ট ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবি পরে দীপাকে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে ফিরে গেল।

প্রজাপতি প্রসাধন ফ্যাক্টরির কারখানাটি ব্যারাকের মত লম্বা, তাতে অসংখ্য ঘর, দু' পাশে চওড়া বারান্দা। বাড়ির চার ধারে অনেকখানি খোলা জমিও আছে। কেমিস্ট এবং কর্মী মিলিয়ে আন্দাজ ষাটজন লোক এখানে কাজ করে। ফ্যাক্টরি হিসাবে বড় প্রতিষ্ঠান বলা যায় না; কিন্তু এখান থেকে যে শিল্পদ্রব্য তৈরি হয়ে বেরোয় তার চাহিদা সর্বত্র।

আজ ফ্যাক্টরির পুরোভূমিতে একটি ছোট মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। দেবাশিসের মোটর মণ্ডপের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ফ্যাক্টরির প্রবীণ কেমিস্ট ডক্টর রামপ্রসাদ দত্ত এসে দীপাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিলেন। ডক্টর দত্তর পিছনে আরো কয়েকজন কর্মী ছিল, সকলে হাসিমুখে দীপাকে অভ্যর্থনা করল।

ডক্টর দত্ত দীপাকে বললেন—'চল, আগে তোমাকে তোমার ফ্যাক্টরি দেখাই।'

ডক্টর দত্ত বয়সে দীপার পিতৃতুল্য, তাঁর সস্নেহ ঘনিষ্ঠ সম্বোধনে দীপার মনের আড়ষ্টতা অনেকটা কেটে গেল। দেবাশিস তাদের সঙ্গে গেল না; সে জানতো সে সঙ্গে না থাকলে দীপা বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করবে।

ফ্যাক্টরির কাজের বেলা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তবু কয়েকটা ঘরে কয়েকজন লোক তখনো কাজ করছে। কোথাও সারি সারি জালার মতন কাঁচের পাত্রে কেশতৈল রাখা রয়েছে, কোনো ঘরে স্নো ক্রীম, কোনো ঘরে ল্যাভেণ্ডার অডিকলোন প্রভৃতি নানা জাতের তরল গন্ধদ্রব্য। সব মিশিয়ে একটি চমৎকার সুগন্ধে বাড়ি ম-ম করছে।

ডক্টর দত্ত ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন। দেখতে দেখতে নিজের অজ্ঞাতসারেই দীপার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল। এটা কি, ওটা কেমন করে তৈরি হয়, ক্রীম স্নো ইত্যাদিতে কি কি উপকরণ লাগে এইসব প্রশ্নের উত্তর শুনতে শুনতে সে যেন একটা নতুন রাজ্যে প্রবেশ করল। নতুন তথ্য আবিষ্কারের একটা উত্তেজনা আছে, কৌতূহলী মন সহজেই মেতে ওঠে।

ফ্যাক্টরি পরিদর্শন শেষ করে ডক্টর দত্ত দীপাকে মণ্ডপে নিয়ে গেলেন। মণ্ডপের একপাশে অনুচ্চ মঞ্চ, তার ওপর কয়েকটি চেয়ার; মঞ্চের সামনে দর্শকদের চেয়ারের সারি। ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে সকলেই মণ্ডপে উপস্থিত। ডক্টর দত্ত দীপাকে মঞ্চের ওপর একটি চেয়ারে বসালেন, দেবাশিস তার পাশে বসল। ফাংশন আরম্ভ হল।

ফ্যাক্টরির কর্মীরা শুধু কাজই করে না, তাদের মধ্যে শিল্পী রসিক গুণিজনও আছে। একটি কোট-প্যান্ট পরা ছোকরা প্রেক্ষাভূমি থেকে উঠে এসে রবীন্দ্রনাথের গান ধরল—তোমরা সবাই ভাল, আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো। ছোকরার গলা ভাল; গান শুনতে শুনতে শ্রোতাদের দন্ত বিকশিত হয়ে রইল। দীপার মুখেও একটি অরুণাভ হাসি আনাগোনা করতে লাগল। সে একবার আড়চোখে দেবাশিসের পানে তাকাল; দেখল, তার ঠোঁটে লোক-দেখানো নকল হাসি। দীপা এখন দেবাশিসের হাসি দেখে বুঝতে পারে আসল হাসি কি নকল হাসি। তার মন হোঁচট খেয়ে শক্ত হয়ে বসল।

গানের পালা শেষ হলে আর একটি যুবক এসে গম্ভীর মুখে একটি হাসির গল্প শোনাল। সকলে খুব খানিকটা হাসল। তারপর ডক্টর দত্ত উঠে ছোট্ট একটি বক্তৃতা দিলেন। চা কেক্‌ দিয়ে সভা শেষ হল।

দেবাশিস দীপাকে নিয়ে নিজের মোটরের কাছে এসে দেখল, মোটরের পিছনের সীট একরাশ গোলাপফুল এবং আরো অনেক উপহারদ্রব্যে ভরা। দেবাশিস স্নিগ্ধকণ্ঠে সকলকে ধন্যবাদ দিল, তারপর দীপাকে পাশে বসিয়ে মোটর চালিয়ে চলে গেল। সন্ধ্যে তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

সাবধানে গাড়ি চালাতে চালাতে দেবাশিস বলল—কেমন লাগল?'

পাশের আলো-আঁধারি থেকে দীপা বলল—'ভাল।'

গাড়ির দু'পাশের ফুটপাথ দিয়ে স্রোতের মত লোক চলেছে তারা যেন অন্য জগতের মানুষ। গাড়ি চলতে চলতে কখনো চৌমাথার সামনে থামছে, আবার চলছে; এদিক ওদিক মোড় ঘুরে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে।

'ডক্টর দত্তকে কেমন মনে হল?'

এবার দীপার মনে একটু আলো ফুটল—'খুব ভাল লোক, এত চমৎকার কথা বলেন। উনি কি অনেক দিন এখানে মানে, ফ্যাক্টরিতে আছেন?'

দেবাশিস বলল—'বাবা যখন ফ্যাক্টরির পত্তন করেন তখন থেকে উনি আছেন। আমি ফ্যাক্টরির মালিক বটে, কিন্তু উনিই কর্তা।'

গাড়ির অভ্যন্তর গোলাপের গন্ধে পূর্ণ হয়ে আছে। দীপা দীর্ঘ আঘ্রাণ নিয়ে বলল—ফ্যাক্টরির অন্য সব লোকেরাও ভাল।'

দেবাশিস মনে মনে ভাবল, ফ্যাক্টরির সবাই ভাল, কেবল মালিক ছাড়া। মুখে বলল—'ওরা সবাই আমাকে ভালবাসে।' একটু থেমে বলল—'ফ্যাক্টরি থেকে বার্ষিক যে লাভ হয় তার থেকে আমি নিজের জন্যে বারো হাজার টাকা রেখে বাকি সব টাকা কর্মীদের মধ্যে মাইনের অনুপাতে ভাগ করে দিই।'

'ও—' দীপার মনে একটা কৌতূহল উঁকি মারল, সে একবার একটু দ্বিধা করে শেষে প্রশ্ন করল—'ফ্যাক্টরি থেকে কত লাভ হয়?'

দেবাশিস উৎসুকভাবে একবার দীপার পানে চাইল, তারপর বলল—'খরচ-খরচা বাদ দিয়ে-ইন্‌কাম ট্যাক্স শোধ করে এ বছর আন্দাজ দেড় লাখ টাকা বেঁচেছে। আশা হচ্ছে, আসছে বছর আরো বেশী লাভ হবে।'

আর কোনো কথা হবার আগেই মোটর বাড়ির ফটকে প্রবেশ করল। বাড়ির সদরে মোটর দাঁড় করিয়ে দেবাশিস বলল-'গোলাপফুলগুলোর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।'

দীপা বলল—আমি করছি।'

নকুল এসে দাঁড়িয়েছিল, দীপা তাকে প্রশ্ন করল—'নকুল, বাড়িতে ফুলদানি আছে?'

নকুল বলল--'আছে বইকি বউদি, ওপরের বসবার ঘরে দেয়াল-আলমারিতে আছে। চাবি তো তোমারই কাছে।'

'আচ্ছা। আমি ওপরে যাচ্ছি, তুমি গাড়ি থেকে ফুল আর যা যা আছে নিয়ে এস।' দীপা ওপরে চলে গেল।

ওপরের বসবার ঘরে কাবার্ডে অনেক শৌখিন বাসন-কোসন ছিল, তার মধ্যে কয়েকটা রুপোর ফুলদানি। কিন্তু বহুকাল অব্যবহারে রুপোর গায়ে কলঙ্ক ধরেছে। দীপা ফুলদানিগুলোকে বের করে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর নকুল এক বোঝা গোলাপ নিয়ে উপস্থিত হলে তাকে প্রশ্ন করল—'নকুল, ব্রাসো আছে?'

নকুল বলল-'বাসন পরিষ্কার করার মলম? না বউদি, ছিল, শেষ হয়ে গেছে। কে আর রুপোর বাসন মাজাঘষা করছে! আমি তেঁতুল দিয়েই কাজ চালিয়ে দিই।'

দীপা বলল—'তেঁতুল হলেও চলবে। এখন চল, ফুলগুলোকে বাথরুমের টবে রেখে ফুলদানি পরিষ্কার করতে হবে।'

দীপার শয়নঘরের সংলগ্ন বাথরুমে জলভরা টবে লম্বা ডাঁটিসুদ্ধ গোলাপ ফুলগুলোকে আপাতত রেখে দীপা তেঁতুল দিয়ে ফুলদানি সাফ করতে বসল। এতদিন পরে সে একটা কাজ পেয়েছে যাতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও ভুলে থাকা যায়।

দেবাশিস একবার নিঃশব্দে ওপরে এসে দেখল, দীপা ভারি ব্যস্ত। আঁচলটা গাছ-কোমর করে জড়িয়েছে, মাথার চুল একটু এলোমেলো হয়েছে; ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। দেবাশিস দোরের কাছে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট চোখে দেখল, কিন্তু দীপা তাকে লক্ষই করল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেবাশিস আস্তে আস্তে নীচে নামল, তারপর নৃপতির বাড়িতে চলে গেল।

কিন্তু আজ আর তার আড্ডায় মন বসল না। ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল। ওপরের বসবার ঘরে দীপা রেডিও চালিয়ে বসে ছিল, দেবাশিসকে দেখে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে রেডিও নিবিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল--ফুলগুলোকে ফুলদানিতে সাজিয়ে ঘরে ঘরে রেখেছি। দেখবে?'

দেবাশিসের মনের ভিতর দিয়ে বিস্ময়ানন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল। দীপা এতদিন তাকে প্রকাশ্যে 'তুমি' এবং জনান্তিকে 'আপনি' বলেছে, আজ হঠাৎ নিজের অজান্তে জনান্তিকেও 'তুমি' বলে ফেলেছে।

দেবাশিস মুচকি হেসে বলল—'চল, দেখি।'

দীপা তার হাসি লক্ষ করল; হাসিটা যেন গোপন অর্থবহ। সে কিছু বুঝতে

পারল না, বলল—'এসো।'

নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে আলো জেবলে দীপা দেবাশিসের মুখের পানে চাইল; দেবাশিস দেখল, ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে ঝক্‌ঝকে রুপোর ফুলদানিতে দীর্ঘবৃন্ত একগুচ্ছ গোলাপ শোভা পাচ্ছে। লাল, গোলাপী এবং সাদা, তিন রঙের গোলাপ, তার সঙ্গে মেডেন হেয়ার ফার্নের জালিদার পাতা।

ফুলদানিতে ফুল সাজানোর কলাকৌশল আছে, যেমন-তেমন করে সাজালেই হয় না। দেবাশিস খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে উঠল—'বাঃ, ভারি চমৎকার সাজিয়েছ! মনে হচ্ছে যেন ফুলের ফোয়ারা।'

ঘর থেকে বেরিয়ে বসবার ঘরে এসে দেবাশিসের নজর পড়ল রেডিওগ্রামের ওপরে একটা ফুলদানিতে গোলাপ সাজানো রয়েছে। এর সাজ অন্য রকম; চরকি ফুলঝুরির মতন ফুলগুলি গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে দেবাশিস বলল—'এটাও ভারি সুন্দর। আগে চোখে পড়েনি।'

এই সময় নকুল নীচে থেকে হাঁক দিল—'বউদিদি, তোমরা এস। ভাত বেড়েছি।'

দু'জনে নীচে নেমে গেল। রান্নাঘরের টেবিলেও গোলাপগুচ্ছ। দেবাশিস দীপার পানে প্রশংসাপূর্ণ চোখে চেয়ে একটু হাসল।

সে-রাত্রে নিজের ঘরে শুতে গিয়ে দেবাশিস দেখল, তার ড্রেসিং টেবিলের ওপরেও গোলাপের ফোয়ারা। দীপা তার ঘরে ফুল রাখতে ভোলেনি। দেবাশিসের মন মাধুর্যপূর্ণ হয়ে উঠল।

দীপা নিজের ঘরে গিয়ে নৈশ দীপ জেবলে শুয়েছিল। কিন্তু ঘুম সহজে এল না। মনের মধ্যে একটি আলোর চারপাশে বাদলা পোকার মতন অনেকগুলো ছোট ছোট চিন্তার টুকরো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলোটি স্নিগ্ধ তৃপ্তির আলো। আজকের দিনটা যেন গোলাপ-জলের ছড়া দিয়ে এসেছিল ফ্যাক্টরিতে অনুষ্ঠান... ডক্টর দত্ত...সভামণ্ডপে গান...তোমরা সবাই ভাল ..ফ্যাক্টরির সবাই যেন প্রাণপণে চেষ্টা করেছ তাকে খুশী করতে...রাশি রাশি গোলাপফুল.. ঘরে সাজিয়ে রাখতে কী ভালই লাগে...দেবাশিসেব ভাল লেগেছে...সে অমন মুখ টিপে হাসল কেন?. . যেন হাসির আড়ালে কিছু মানে ছিল—ওঃ!

শুয়ে শুয়ে দীপার মুখ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। সে মনের ভুলে দেবাশিসকে আড়ালে 'তুমি' বলে ফেলেছিল, তখন বুঝতে পারেনি। দেবাশিস তাই শুনে হেসেছিল।

দীপা বিছানা থেকে উঠে খোলা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে রাস্তা চলে গেছে; রাস্তার ওপারের তিন চারটে বাড়ির সদর এই জানলা থেকে দেখা যায়। বাড়িগুলির আলো নিবে গেছে। রাস্তায় দু'সারি আলো নিষ্পলক জবলছে। রাস্তা দিয়ে দু'একটি লোক কদাচিৎ চলে যাচ্ছে, পঁচিশ গজ দূর থেকে তাদের জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। আধ-ঘুমন্ত রাত্রি।

ভণ্ডামি করা, মিথ্যে অভিনয় করে মানুষকে ঠকানো, এসব দীপার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তবু ঘটনাচক্রে সে দেবাশিসের সঙ্গে লোক ঠকানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে খানিকটা মানসিক ঘনিষ্ঠতা অনিবার্য। সেজন্য দেবাশিসের কোনো দোষ নেই; সে স্বভাব-ভদ্রলোক, তার প্রকৃতি মধুর। কিন্তু সান্নিধ্য যতই ঘনিষ্ঠ হোক, দীপা তাকে ভালবাসে না, অন্য একজনকে ভালবাসে। কতকগুলো অভাবনীয় ঘটনা-সমাবেশের ফলে দীপা আর দেবাশিস

একত্র নিক্ষিপ্ত হইয়েছে। এ অবস্থায় দীপা যদি দেবাশিসের সঙ্গে সহজ সম্বন্ধে বাস করে তাতে দোষ কি? তাকে আড়ালে 'তুমি' বললে অন্যায় হবে কেন? কাউকে 'তুমি' বললেই কি তার সঙ্গে ভালবাসার সম্বন্ধ বোঝায়?

মনের অস্বস্তি অনেকটা কমলো। সে আবার গিয়ে বিছানায় শুল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। সে লক্ষ করেনি যে, যতক্ষণ সে জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল ততক্ষণ একটি লোক রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টে ঠেস দিয়ে একদৃষ্টে তার পানে তাকিয়ে ছিল। লক্ষ করলে এত সহজে ঘুম আসত না।

পরদিন সকালবেলা ওপরের বসবার ঘরে চা খেতে খেতে দেবাশিস বলল—'তুমি সারাদিন একলা থাকো, সময় কাটে কি করে?'

দীপা চুপ করে রইল। সময় কাটবার তাই কাটে, সময়ের যদি দাড়িয়ে পড়বার উপায় থাকত তাহলে বোধহয় দীপার সময় দাঁড়িয়েই পড়ত।

দেবাশিস বলল—'তোমার বই পড়ার শখ নেই? বাড়িতে কিছু বই আছে কিন্তু সেগুলো বিজ্ঞানের বই। তুমি যদি চাও বইয়ের দোকান থেকে গল্প-উপন্যাসের বই এনে দিতে পারি। মাসিক সাপ্তাহিক কাগজেরও গ্রাহক হওয়া যায়।'

দীপা এবারও চুপ করে রইল। বই পড়তে সে ভালবাসে, ভাল লেখকের ভাল গল্প-উপন্যাস পেলে পড়ে, কিন্তু বই মুখে দিয়ে তো সারা দিন-রাত কাটে না।

'কিংবা তোমাকে বইয়ের দোকানে নিয়ে যেতে পারি, তুমি নিজের পছন্দ মতন বই কিনো।'

দীপা সংশয় জড়িত স্বরে বলল—'আচ্ছা।'

দেবাশিস বুঝল, বই সম্বন্ধে দীপার বেশী আগ্রহ নেই। তখন সে বলল—'তোমার বান্ধবীদের বাড়িতে ডাকো না কেন? তাদের সঙ্গে গল্প করেও দু'দণ্ড সময় কাটবে।'

দীপা বলল—'আচ্ছা ডাকব।'

চা শেষ করে দেবাশিস জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নীচে অনাদৃত বাগানের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ঘরের দিকে ফিরে বলল—'তুমি ফুল ভালবাস। বাগান করার শখ আছে কি?'

'আছে।' দীপা সাগ্রহে উঠে দাঁড়াল, এক পা এক পা করে দেবাশিসের কাছে এসে বলল—'বাপের বাড়িতে ছাতের ওপর বাগান করেছিলুম, টবের বাগান।'

দেবাশিস হেসে বলল—'ব্যস, তবে আর কি, এখানে মাটিতে বাগান কর। বাবা মারা যাবার পর বাগানের যত্ন নেওয়া হয়নি। আমি আজই ব্যবস্থা করছি। আগে একটা মালী দরকার, তুমি একলা পারবে না।'

পরদিন মালী এল, গাড়ি গাড়ি সার এল, কোদাল খন্তা খুরপি গাছকাটা কাঁচি এল, নার্সারী থেকে মৌসুমী ফুলের বীজ, গোলাপের কলম, বারোমেসে গাছের চারা এল, ছোট ছোট সুপুরিগাছ এল। মহা আড়ম্বরে দীপার জীবনের উদ্যান পর্ব আরম্ভ হয়ে গেল।

তারপর কয়েকদিন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কাটল। প্রৌঢ় মালী পদ্মলোচন অতিশয় বিজ্ঞ ব্যক্তি, তার সঙ্গে পরামর্শ করে কোথায় মৌসুমী ফুলের বীজ

পোঁতা হবে, কোথায় গোলাপের কলম বসবে, কীভাবে সুপুরি আর ঝাউ-এর সারি বসিয়ে বীথি-পথ তৈরি হবে, দীপা তারই প্ল্যান করছে। ঘুমে জাগরণে বাগান ছাড়া তার অন্য চিন্তা নেই।

দেবাশিস নির্লিপ্তভাবে সব লক্ষ করে, কিন্তু দীপার কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করে না, এমনকি তাকে বাগান সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেও যায় না। দীপা যা করছে করুক, তার যাতে মন ভাল থাকে তাই ভাল।

দিন কাটছে।

একদিন দুপুরবেলা দীপা রেডিওর মৃদু গুঞ্জন শুনতে শুনতে ভাবছিল, অরোকোরিয়া পাইন-এর চারাটি বাগানের কোন জায়গায় বসালে ভাল হয়, এমন সময় ঘরের কোণে টেলিফোন বেজে উঠল। দীপা চকিতে সেই দিকে চাইল তারপরে উঠে গিয়ে ফোন তুলে নিল—'হ্যালো।'

টেলিফোনে আওয়াজ এল—'আমি। গলা চিনতে পারছ?'

দীপার বুকের মধ্যে দু'বার ধক্ ধক্ করে উঠল। সে যেন ধাক্কা খেয়ে স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এল। একটু দম নিয়ে একটু হাঁপিয়ে বলল—'হ্যাঁ।'

'খবর সব ভাল?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো গোলমাল হয়নি?'

'না।'

'তোমার স্বামী মানুষটা কেমন?'

'মন্দ মানুষ নয়!'

'তোমার ওপর জোর-জুলুম করছে না?'

'না।'

'একেবারেই না?'

'না।'

'হুঁ। আরো কিছুদিন এইভাবে চালাতে হবে।'

'আর কত দিন?'

'সময়ে জানতে পারবে। আচ্ছা।'

ফোন রেখে দিয়ে দীপা আবার আরাম-চেয়ারে এসে বসল, পিছনে মাথা হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইল। রেডিওর মৃদু গুঞ্জন চলছে। দু'মিনিট আগে দীপা বাগানের কথা ভাবছিল, এখন মনে হল বাগানটা বহু দূরে চলে গেছে।

বিকেলবেলা আন্দাজ সাড়ে তিনটের সময় নীচে সদর দোরের ঘণ্টি বেজে উঠল। দীপা চোখ খুলে উঠে বসল। কেউ এসেছে। দেবাশিস কি আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এল? কিন্তু আজ তো শনিবার নয়—

দীপা উঠে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াল। নকুল দোর খুলছে। তারপরই মেয়েলী গলা শোনা গেল—'আমি দীপার বন্ধু, সে বাড়িতে আছে তো?'

নকুল উত্তর দেবার আগেই দীপা ওপর থেকে ডাকল—'শুভ্রা, আয়, ওপরে চলে আয়।'

শুভ্রা ওপরে এসে সিঁড়ির মাথায় দীপাকে জড়িয়ে ধরল, বলল—'সেই ফুলশয্যের রাত্রে তোকে সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিলুম। তারপর আসিনি, তোকে হনিমুন করবার সময় দিলুম। আজ ভাবলুম, দীপা আর কনে-বউ নেই, এত দিনে পাকা গিন্নী হয়েছে, যাই দেখে আসি। হ্যাঁ ভাই, তোর বর বাড়িতে নেই তো?'

'না। আয়, ঘরে আয়।'

শুভ্রা মেয়েটি দীপার চেয়ে বছর দেড়েকের বড়, বছর খানেক আগে বিয়ে হয়েছে। তার চেহারা গোলগাল, প্রকৃতি রঙ্গপ্রিয়, গান গাইতে পারে। প্রকৃতি বিপরীত বলেই হয়তো দীপার সঙ্গে তার মনের সান্নিধ্য বেশী।

বসবার ঘরে গিয়ে তারা পশ্চিমের খোলা জানলার সামনে দাঁড়াল। শুভ্রা দীপাকে ভাল করে দেখে নিয়ে মৃদু হাসল, বলল—'বিয়ের জল গায়ে লাগেনি, বিয়ের আগে যেমন ছিলি এখনো তেমনি আছিস। কিন্তু গায়ে গয়না নেই, কেন? হাতে দু'গাছি চুড়ি, কানে ফুল আর গলায় সরু হার; কনে-বউকে কি এতে মানায়।'

দীপা চোখ নামালো, তারপর আবার চোখ তুলে বলল—'তুই তো এখনই বললি আমি আর কনে-বউ নই।'

শুভ্রা বলল—গয়না পরার জন্য তুই এখনও কনে-বউ। কিন্তু আসল কথাটা কী? 'আভরণ সৌতিনি মান'?'

'সে আবার কি!'

'তা জানিস না! কবি গোবিন্দদাস বলেছেন, সময়বিশেষে গয়না সতীন হয়ে দাঁড়ায়।' এই বলে দীপার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে গাইল—

'সখি, কি ফল বেশ বনান
কানু পরশমণি পরশক বাধন
আভরণ সৌতিনি মান।'

দীপার মুখের ওপর যেন এক মুঠো আবীর ছড়িয়ে পড়ল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—'যাঃ, তুই বড় ফাজিল।'

শুভ্রা খিলখিল করে হেসে বলল—'তুইও এবার ফাজিল হয়ে যাবি, আর গাম্ভীর্য চলবে না। বিয়ে হলেই মেয়েরা ফাজিল হয়ে যায়।'

দীপা কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। কিন্তু যেমন করে হোক সত্যি কথা লুকিয়ে রাখতে হবে, মিথ্যে কথা বলে শুভ্রার চোখে ধুলো দিতে হবে। শুভ্রা যেন জানতে না পারে।

দীপা আকাশ-পাতাল ভাবছে শুভ্রার ঠাট্টার কি উত্তর দেবে, এমন সময় দোরের কাছে থেকে নকুলের গলা এল—'বউদি, চা জলখাবার আনি?'

দীপা যেন বেঁচে গেল। বলল—'হ্যাঁ নকুল, নিয়ে এস।'

নকুল নেমে গেল। দীপা বলল—'আয়, ভাই, বসি। তারপর হিমানী সুপ্রিয়া কেমন আছে বল্। মনে হচ্ছে যেন কত দিন তাদের দেখিনি!'

শুভ্রা চেয়ারে বসে বলল—'হিমানী সুপ্রিয়ার কথা পরে বলব, আগে তুই নিজের কথা বল। বরের সঙ্গে কেমন ভাব হল?'

দীপা ঘাড় হেঁট করে অর্ধস্ফুট স্বরে বলল—'ভাল।'

শুভ্রা বলল—'তোর বরটি ভাই দেখতে বেশ। কিন্তু দেখতে ভাল হলেই মানুষ ভাল হয় না। মানুষটি কেমন?'

দীপা বলল—'ভাল।'

শুভ্রা বিরক্ত হয়ে বলল—'ভাল আর ভাল, কেবল এক কথা! তুই কি কোনো দিন মন খুলে কিছু বলবি না?'

'বললুম তো, আর কি বলব?'

'একটুকু বললেই বলা হল? আমার যখন বিয়ে হয়েছিল আমি ছুটে ছুটে আসতুম তোর কাছে, সব কথা না বললে প্রাণ ঠান্ডা হত না। আর তুই মুখ সেলাই করে বসে আছিস। গা জ্বলে যায়।'

দীপা তার হাত ধরে মিনতির স্বরে বলল—'রাগ করিসনি, ভাই! জানিস তো, আমি কথা বলতে গেলেই গলায় কথা আটকে যায়। মনে মনে বুঝে নে না। সবই তো জানিস।'

শুভ্রা বলল—'সবায়ের কি এক রকম হয়? তাই জানতে ইচ্ছে করে। যাক গে, তুই যখন বলবি না তখন মনে মনেই বুঝে নেব। আচ্ছা, আজ উঠি তোর বিয়ে পুরনো হোক তখন আবার একদিন আসব।'

দীপা কিন্তু শক্ত করে তার হাত ধরে রইল, বলল—'না, তুই রাগ করে চলে যেতে পাবি না।'

শুভ্রার রাগ অমনি পড়ে গেল, সে হেসে বলল—'তুই হদ্দ করলি। বরের কাছেও যদি এমনি মুখ বুজে থাকিস বর ভুল বুঝবে। ওরা ভুল-বোঝা মানুষ।'

নকুল চায়ের ট্রে নিয়ে এল, সঙ্গে স্তূপাকৃতি প্যাসট্রি। দীপা চা ঢেলে শুভ্রাকে দিল, নিজে নিল; দু'জনে চা আর প্যাসট্রি খেতে খেতে সাধারণভাবে গল্প করতে লাগল। শাড়ি ব্লাউজ, গয়নার নতুন ফ্যাশন, সেন্ট স্নো পাউডার-এর দুর্মূল্যতা, এই সব নিয়ে গল্প। শুভ্রাই বেশী কথা বলল, দীপা সায় উত্তর দিল।

আধ ঘণ্টা পরে চা খাওয়া শেষ হলে নকুল এসে ট্রে তুলে নিয়ে গেল, দীপা তখন বলল—'শুভ্রা, তুই এবার একটা গান গা, অনেক দিন তোর গান শুনিনি।'

শুভ্রা বলল—'কেন, এই তো কানে কানে গান শুনলি। আর কী শুনবি? মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি, সখি জাগো?'

'না না, ওসব নয়। আধুনিক গান।'

'আধুনিক গানের কথায় মনে পড়ল, পরশু গ্রামোফোনের দোকানে গিয়েছিলুম, প্রবাল গুপ্তর একটা নতুন রেকর্ড শুনলাম। ভারি সুন্দর গেয়েছে। রেকর্ডখানা কিনেছি। তুই শুনেছিস?'

দীপা অলসভাবে বলল—'শুনেছি। রেডিওতে প্রায়ই বাজায়। সিনেমার গানের কোনো নতুন রেকর্ড বেরিয়েছে নাকি?'

শুভ্রা বলল—'শুনিনি। কিন্তু একটা নতুন ছবি বেরিয়েছে, 'দীপ্তি' সিনেমায় দেখাচ্ছে; ছবিটা নাকি খুব ভাল হয়েছে। সুজন হিরো, জোনাকি রায় হিরোইন।'

দীপা একটু নড়েচড়ে বসল, কিছু বলল না। শুভ্রা বলল—'দীপা, ঘরে বসে কি করবি, চল ছবি দেখে আসি। আমার সঙ্গে যদি ছবি দেখতে যাস, তোর বর নিশ্চয় রাগ করবে না।' কব্জির ঘড়ি দেখে বলল—'সওয়া চারটে বেজেছে।

তোর বর কাজ থেকে ফেরে কখন?'

'পাঁচটার সময়।'

'তবে তো ঠিকই হয়েছে। তুই সেজেগুজে তৈরি হতে হতে তোর বর এসে পড়বে, তখন তাকে জানিয়ে আমরা ছবি দেখতে চলে যাব। আর তোর বর যদি সঙ্গে যেতে চায় তাহলে তো আরো ভাল।'

দীপার ইচ্ছে হল শুভ্রার সঙ্গে ছবি দেখতে যায়। দেবাশিস কোনো আপত্তি তুলবে না তাও সে জানে। তবু তার মনের একটা অংশ তার ইচ্ছাকে পিছন থেকে টেনে ধরে রইল, তাকে যেতে দেবে না। সে কাঁচুমাচু হয়ে বলল—'আজ থাক ভাই, আর একদিন যাব।'

শুভ্রা আরো কিছুক্ষণ পীড়াপীড়ি করল, কিন্তু দীপা রাজী হল না। শুভ্রা তখন বলল—'বুঝেছি, তুই বর-হ্যাংলা হয়েছিস, বরকে ছেড়ে নড়তে পারিস না। বিয়ের পর কিছু দিন আমারও হয়েছিল।' সে নিজের বর-হ্যাংলামির গল্প বলতে লাগল। তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল—'পাঁচটা বাজে, আমি পালাই এখনই তোর বর এসে পড়বে। আমি থাকলে তোদের অসুবিধে হবে। আবার একদিন আসব।' শুভ্রা হাসতে হাসতে চলে গেল।

তাকে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে দীপা ভাবতে লাগল, কি আশ্চর্য, মনের কথা খুলে ফুটে না বললে কি কেউ বুঝতে পারে না! সবাই ভাবে, যা গতানুগতিক তাই সত্যি!

তারপর দিন কাটছে।

একদিন বেশ গরম পড়েছে। গুমোট গরম, বাতাস নেই; তাই মনে হয় শীগ্‌গিরই ঝড়বৃষ্টি নামবে। দেবাশিস বিকেলবেলা ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এসে দেখল, দীপা আর পদ্মলোচন দড়ি ধরে বাগান মাপজোক করছে। দেবাশিসকে দেখে দীপা দড়ি ফেলে তাড়াতাড়ি তার গাড়ির কাছে এল, বেশ উত্তেজিতভাবে বলল—'ঈস্টার লিলিতে কুঁড়ি ধরেছে। দেখবে?'

দেবাশিস গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল—'তাই নাকি! কোথায় ঈস্টার লিলি?'

'এস দেখাচ্ছি।'

বাগানের এক ধারে গিয়ে দীপা আঙুল দেখাল। দেবাশিস দেখল, ভূমিলগ্ন ঝাড়ের মাঝখান থেকে ধ্বজার মত ডাঁটি বেরিয়েছে, তার মাথায় তিন-চারটি কুঁড়ির পতাকা। স্নিগ্ধ হেসে দেবাশিস দীপার প্যানে চাইল—'তোমার বাগানের প্রথম ফুল।'

হাসতে গিয়ে দীপা থেমে গেল। 'তোমার বাগানের—', বাগান কি দীপার? হঠাৎ তার মনটা বিকল হয়ে গেল, প্রথম মুকুলোদ্‌গম দেখে যে আনন্দ হয়েছিল তা নিবে গেল।

সন্ধ্যের পর নৃপতির আড্ডায় গিয়ে দেবাশিস দেখল আড্ডাধারীরা প্রায় সকলেই উপস্থিত, বেশ উত্তেজিতভাবে আলোচনা চলছে। তাকে দেখে সকলে কলরব করে

উঠল—'ওহে শুনেছ?'

সুজন থিয়েটারী পোজ দিয়ে বলল—'আবার শজারুর কাঁটা!'

নৃপতি বলল—'এস, বলছি। তুমি কাগজ পড় না, তাই জান না। মাসখানেক আগে একটা ভিখিরিকে কেউ শজারুর কাঁটা ফুটিয়ে মেরেছিল মনে আছে?'

দেবাশিস বলল—'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'পরশু রাত্রে একটা মজুর লেকের ধারে বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, তার হৃদ্‌যন্ত্রে শজারুর কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়ে কেউ তাকে খুন করেছে।'

দেবাশিস বলল—'কে খুন করেছে, জানা যায়নি?'

নৃপতি একটু হেসে বলল—'না, পুলিস তদন্ত করছে।'

কপিল বলল—'পুলিস অনন্তকাল ধরে তদন্ত করলেও আসামী ধরা পড়বে না। অবশ্য স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ভিখিরি এবং মজুরের হত্যাকারী একই লোক। এ ছাড়া আর কেউ কিছু বুঝতে পেরেছ কি?'

খঙ্গ বাহাদুর বলল—'দুটো খুনই আমাদের পাড়ায় হয়েছে, সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে হত্যাকারী আমাদের পাড়ার লোক।'

নৃপতি বলল—'তা নাও হতে পারে। 'হত্যাকারী হয়তো টালার লোক।'

এই সময় কফি এল। প্রবাল এতক্ষণ পিয়ানোর সামনে মুখ গোমড়া করে বসে ছিল, আলোচনার হল্লায় বাজাতে পারছিল না; এখন উঠে এসে এক পেয়ালা কফি তুলে নিল। কপিল তাকে প্রশ্ন করল—'কি হে মিঞা তানসেন, তোমার কি মনে হয়?'

প্রবাল কফির পেয়ালায় একবার ঠোঁট ঠেকিয়ে বলল—'আমার মনে হয় হত্যাকারী উন্মাদ এবং তোমরাও বদ্ধ পাগল।'

সবাই হইহই করে উঠল—'আমরা পাগল কেন?'

প্রবাল বলল—'তোমরা হয় পাগল নয় ভণ্ড। একটা কুলিকে যদি কেউ খুন করে থাকে তোমাদের এত মাথাব্যথা কিসের? কুলির শোকে তোমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে এই কথা বোঝাতে চাও?'

অতঃপর তর্ক উদ্দাম এবং উত্তাল হয়ে উঠল।

দেবাশিস তর্কাতর্কি বাগ্‌যুদ্ধ ভালবাসে না। সে কফি শেষ করে চুপিচুপি পালাবার চেষ্টায় ছিল, নৃপতি তা লক্ষ করে বলল-'কি হে দেবাশিস, চললে নাকি?'

দেবাশিস বলল—'হ্যাঁ, আজ যাই নৃপতিদা।'

নৃপতি বলল—'আচ্ছা, এস। সাবধানে পথ চলবে। দক্ষিণ কলকাতার পথে-ঘাটে এখন দলে দলে পাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

এক ধমক হাসির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে দেবাশিস বেরিয়ে এল। সে দু'চার পা চলেছে, এমন সময় শুনতে পেল দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে গোঁ গোঁ মড়্‌মড়্‌ আওয়াজ আসছে। চকিতে আকাশের দিকে চোখ তুলে সে দেখল মেঘ ছুটে আসছে; গুমোট ফেটে ঝড় বেরিয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে একঝাঁক জেট বিমানের মতন ঝড় এসে পড়ল; বাতাসের প্রচণ্ড দাপটে চারদিক এলোমেলো হয়ে গেল।

দেবাশিস হাওয়ার ধাক্কায় টাল খেতে খেতে একবার ভাবল, ফিরে যাই, নৃপতিদার বাড়ি বরং কাছে; তারপর ভাবল, ঝড় যখন উঠেছে তখন নিশ্চয় বৃষ্টি নামবে, কতক্ষণ ঝড়-বৃষ্টি চলবে ঠিক নেই; সুতরাং বাড়ির দিকে যাওয়াই ভাল,

হয়তো বৃষ্টি নামার আগেই বাড়ি পৌঁছে যাব।

দেবাশিস ঝড়ের প্রতিকূলে মাথা ঝুঁকিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু বেশী দূর চলতে হল না, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল; বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা তার সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিল।

বাড়িতে ফিরে দেবাশিস সটান উপরে চলে গেল। দীপা নিজের ঘরে ছিল, বন্ধ জানলার কাঁচের ভিতর দিয়ে বৃষ্টি দেখছিল; দেবাশিস জোরে টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই সে ফিরে দাঁড়িয়ে দেবাশিসের সিক্ত মূর্তি দেখে সশঙ্ক নিঃশ্বাস টেনে চক্ষু বিস্ফারিত করল। দেবাশিস লজ্জিত ভাবে 'ভিজে গেছি' বলে বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

দশ মিনিট পরে শুকনো জামাকাপড় পরে সে বেরিয়ে এল, তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে দেখল, দীপা যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল—'নৃপতিদার বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আর ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। চল, খাবার সময় হয়েছে।'

পরদিন সকালে গায়ে দারুণ ব্যথা নিয়ে দেবাশিস ঘুম থেকে উঠল। বৃষ্টিতে ভেজার ফল, সন্দেহ নেই; হয়তো ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় দাঁড়াবে। দেবাশিস ভাবল আজ আর কাজে যাবে না। কিন্তু সারা দিন বাড়িতে থাকলে বার বার দীপার সংস্পর্শে আসতে হবে, নিরর্থক কথা বলতে হবে; সে লক্ষ করেছে রবিবারে দীপা যেন শঙ্কিত আড়ষ্ট হয়ে থাকে। কী দরকার? সে গায়ের ব্যথার কথা কাউকে বলল না, যথারীতি খাওয়াদাওয়া করে ফ্যাক্টরি চলে গেল।

বিকেলবেলা সে গায়ে জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরল। জলখাবার খেতে বসে সে নকুলকে বলল—'নকুল, আমার একটু ঠাণ্ডা লেগেছে, রাত্তিরে ভাত খাবো না।'

নকুল বলল—'কাল রাত্তিরে যা ভেজাটা ভিজেছ, ঠাণ্ডা তো লাগবেই। তা ডাক্তারবাবুকে খবর দেব?'

দেবাশিস বলল—'আরে না না, তেমন কিছু নয়। গোটা দুই অ্যাসপিরিন্‌ খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

রাত্রে সে খেতে নামল না। খাবার সময় হলে দীপা নীচে গিয়ে নকুলকে বলল—'নকুল, ওর খাবার তৈরি হয়ে থাকে তো আমাকে দাও, আমি নিয়ে যাই।'

নকুল একটা ট্রে-র উপর সুপের বাটি, টোস্ট্‌ এবং স্যালাড সাজিয়ে রাখছিল, বলল—'সে কি বউদি, তুমি দাদাবাবুর খাবার নিয়ে যাবে! আমি তা হলে রয়েছি কি কত্তে? নাও, চল।'

ট্রে নিয়ে নকুল আগে আগে চলল, তার পিছনে দীপা। দীপার মন ধুকপুক করছে। ওপরে উঠে নকুল যখন দীপার ঘরের দিকে চলল, সে তখন ক্ষীণ কুণ্ঠিত স্বরে বলল—'ওদিকে নয় নকুল, এই ঘরে।'

নকুল ফিরে দাঁড়িয়ে দীপার পানে তীক্ষ্ম চোখে চাইল, তারপর অন্য ঘরে গিয়ে দেখল দেবাশিস বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে। নকুল খাটের পাশে গিয়ে সন্দেহভরা গলায় বলল—'তুমি এ ঘরে শুয়েছ যে, দাদাবাবু!'

দেবাশিস কৈফিয়ত তৈরি করে রেখেছিল, বিছানায় উঠে বসে বলল—'কি জানি, হয়তো ইনফ্লুয়েঞ্জা ধরেছে তাই আলাদা শুয়েছি। ছোঁয়াচে রোগ, শেষে দীপাকেও ধরবে।'

সন্তোষজনক কৈফিয়ত। দীপা নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। নকুলও আর কিছু

বললো না, কিন্তু তার চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে রইল। সে যেন বুঝেছে, যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি হচ্ছে না, কোথাও একটু গলদ রয়েছে।

ঘণ্টা তিনেক পরে দীপা নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, দোরে ঠুকঠুক শব্দ শুনে তাব ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম-চোখে উঠে দোর খুলেই সে প্রায় আঁতকে উঠল। দেবাশিস বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার শবীর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল—'বুকে দারুণ ব্যথা, জ্বরও বেড়েছে.. ডাক্তারকে খবর দিতে হবে।' এই বলে সে টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

আকস্মিক বিপৎপাতে মানুষের মন ক্ষণকালের জন্য অসাড় হয়ে যায়। তারপর সংবিৎ ফিরে আসে। দীপা স্বস্থ হয়ে ভাবল, ডাক্তার ডাকতে হবে; কিন্তু এ বাড়ির বাঁধা ডাক্তার কে তা সে জানে না, তাঁকে ডাকতে হলে নকুলকে পাঠাতে হবে; তাতে অনেক দেরী হবে। তার চেয়ে যদি সেনকাকাকে ডাকা যায়—

দীপা ডাক্তার সুহৃৎ সেনকে টেলিফোন করল। ডাক্তার সেন দীপার বাপের বাড়ির পারিবারিক ডাক্তার।

একটি নিদ্রালু স্বর শোনা গেল—'হ্যালো।'

দীপা বলল—'সেনকাকা! আমি দীপা।'

'দীপা! কী ব্যাপার?'

'আমি—আমার—' দীপা ঢোঁক গিলল—'আমার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এখনই ডাক্তার চাই। আমি জানি না এঁদেব ডাক্তাব কে, তাই আপনাকে ডাকছি। আপনি এক্ষুনি আসুন সেনকাকা।'

'এক্ষুনি যাচ্ছি। কিন্তু অসুখের লক্ষণ কি?'

'বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লেগেছিল—তারপব—'

'আচ্ছা, আমি আসছি।'

'বাড়ি চিনে আসতে পারবেন তো?'

'খুব পারব! এই তো সেদিন তোমাব বউভাতের নেমন্তন্ন খেয়েছি।'

মিনিট কুড়ির মধ্যে ডাক্তার সেন এলেন, ওপরে গিয়ে দেবাশিসের পরীক্ষা শুরু করলেন। দীপা দোরের চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

প্রথমে কয়েকটা প্রশ্ন করে ডাক্তার বোগীব নাড়ী দেখলেন, টেম্পারেচার নিলেন; তারপর স্টেথস্কোপ কানে লাগিযে বুক পবীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষা করতে করতে তাঁর চোখ হঠাৎ বিস্ফারিত হল, তিনি বলে উঠলেন—'এ কি!'

দেবাশিস ক্লিষ্ট স্বরে বলল—'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আমার সবই উল্টো।'

দীপা সচকিত হয়ে উঠল, কিন্তু দেবাশিস আর কিছু বলল না। ডাক্তার কেবল ঘাড় নাড়লেন।

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার বললেন—'বুকে বেশ সর্দি জমেছে। আমি ইনজেকশন দিচ্ছি, তাতেই কাজ হবে। আবার কাল সকালে আমি আসব, যদি দরকার মনে হয় তখন রীতিমত চিকিৎসা আরম্ভ করা যাবে।'

ইনজেকশন দিয়ে দেবাশিসের মাথায় হাত বুলিয়ে ডাক্তার সস্নেহে বললেন—'ভয়ের কিছু নেই, দু' চার দিনের মধ্যেই সেরে উঠবে। আচ্ছা, আজ ঘুমিয়ে পড় বাবাজি, কাল ন'টার সময় আবার আমি আসব। তোমার বাড়ির ডাক্তারকেও

খবর দিও।'

ডাক্তার ঘর থেকে বেরুলেন, দীপা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ডাক্তার সেন দীপাকে বললেন—'একটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম—'

'কি দেখলেন?'

ডাক্তার যা দেখেছেন দীপাকে বললেন।

দিন দশেকের মধ্যে দেবাশিস আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। এই দশটা দিন অসুখের সময় হলেও দেবাশিসের পক্ষে বড় সুখের সময়। দীপা ঘুরে ফিরে তার কাছে আসে, খাটের কিনারায় বসে তার সঙ্গে কথা বলে; তার খাবার সময় হলে নীচে গিয়ে নিজের হাতে খাবার নিয়ে আসে, নকুলকে আনতে দেয় না। রাত্রে ঘুম থেকে উঠে চুপিচুপি এসে তাকে দেখে যায়; আধ-জাগা আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় দেবাশিস জানতে পারে।

একদিন দেবাশিস তখন বেশ সেরে উঠেছে, বিকেলবেলা পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে বিছানায় আধ-বসা হয়ে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে, দীপা দুধ-কোকোর পেয়ালা নিয়ে ঘরে ঢুকল। দেবাশিস হেসে তার হাত থেকে পেয়ালা নিল, দীপা খাটের পায়ের দিকে গিয়ে বসল। বলল—'দাদা ফোন করেছিল, সন্ধ্যার পর আসবে।'

দেবাশিস উত্তর দিল না, কোকোর কাপে ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে দীপার পানে চেয়ে রইল। বলা বাহুল্য, গত দশ দিনে দীপার বাপের বাড়ি থেকে রোজই কেউ না কেউ এসে তত্ত্ব-তল্লাশ নিয়ে গেছে। দীপার মা গোড়ার দিকে দু' রাত্রি এসে এখানে ছিলেন। কিন্তু দীপা তার মা'র এখানে থাকা মনে মনে পছন্দ করেনি।

দেবাশিস কাপে চুমুক দিচ্ছে আর চেয়ে আছে, দীপা একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। একটা কিছু বলবার জন্যে সে বলল—'বাগানে বোধ হয় আরো কিছু ক্রোটন দরকার হবে।'

এবারও দেবাশিস তার কথায় কান দিল না। খিন্ন-মধুর স্বরে বলল—'দীপা, তুমি আমাকে ভালবাস না, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।'

নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাতের মত অপ্রত্যাশিত কথা। দীপার মুখ রাঙা হয়ে উঠল, তারপরই ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে দোরের দিকে পা বাড়িয়ে স্খলিত স্বরে বলল—'বোধ হয় মালী এসেছে, যাই, দেখি সে কি করছে।'

পিছন থেকে দেবাশিস ডাকল—'দীপা, শোনো।'

দীপা দুরুদুরু বুকে ফিরে এসে দাঁড়াল। দেবাশিসের মুখের সেই খিন্ন-করুণ ভাব আর নেই, সে খালি পেয়ালা দীপাকে দিয়ে সহজ সুরে বলল—'আমার কয়েকজন বন্ধুকে চায়ের নেমন্তন্ন করতে চাই। চার-পাঁচ জনের বেশি নয়।'

দীপা মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বলল—কবে?'

'তাড়া নেই। আজ রবিবার, ধরো আসছে রবিবারে যদি করা যায়?'

'আচ্ছা।'

'বাজারের খাবার কিন্তু একটিও থাকবে না। সব খাবার তুমি আর নকুল তৈরি করবে।'

'আচ্ছা।'

তারপর দিন কাটছে। দেবাশিস আবার ফ্যাক্টরি যেতে আরম্ভ করল। শনিবার সন্ধ্যায় নৃপতির আড্ডায় গেল। অনেক দিন পরে তাকে দেখে সবাই খুশী। এমন কি প্রবাল পিয়ানোয় বসে একটা হাল্কা হাসির গৎ বাজাতে লাগল। নৃপতি বলল—'একটু রোগা হয়ে গেছ।'

খঙ্গা বাহাদুর বলল—'ভাই দেবু, ঠেসে শিককাবার খাও, দু' দিনে ইয়া লাশ হয়ে যাবে।'

কপিল বলল—'খঙ্গা, তুই থাম! তুই তো দিনে দেড় কিলো শিককাবাব খাস, তবে গায়ে গত্তি লাগে না কেন?'

খঙ্গা বলল—'আমি যে ফুটবল খেলি, যারা ফুটবল খেলে তারা কখনো মোটা হয় না। মোটা ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছিস?'

সুজন বলল—'কুস্তিগীর পালোয়ানেরা কিন্তু মোটা হয়। শুনেছি তারা হরদম পেস্তা আর বেদানার রস খায়।'

এই সময় বিজয়মাধব এল। দেবাশিসকে দেখে তার কাছে এসে বলল—'অসুখের পর এই প্রথম এলে, না?'

দেবাশিস বলল—'হ্যাঁ।'

'এখন তাহলে এক্কেবারে ঠিক হয়ে গেছ?'

'হ্যাঁ।'

দেবাশিসের কাছে কথা বলার বিশেষ উৎসাহ না পেয়ে বিজয় বিরস মুখে তক্তপোশের ধারে গিয়ে বসল। দেবাশিস তখন সকলের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল—'তোমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছি। কাল রবিবার সাড়ে পাঁচটার পর যখন ইচ্ছে আসবে। কেমন, কারুর অসুবিধে নেই তো?'

কারুর অসুবিধে নেই। সবাই সানন্দে রাজী। কেবল খঙ্গা বাহাদুর বলল—'কাল আমার খেলা আছে। তবু আমি যত শীগ্‌গির পারি যাব। চায়ের সঙ্গে শিককাবাব খাওয়াবে তো?'

কপিল বলল—'তুই জ্বালালি। চায়ের সঙ্গে কেউ শিককাবাব খায়? শিক-কাবাবের অনুপান হচ্ছে বোতল।'

দেবাশিস প্রবালের দিকে চেয়ে বলল—'তুমি আসবে তো?'

প্রবাল বলল—'যাব। বড়মানুষের বাড়িতে নেমন্তন্ন আমি কখনো উপেক্ষা করি না। কিন্তু উপলক্ষটা কি? রোগমুক্তির উৎসব?'

দেবাশিস বলল—'আমার বউয়ের হাতের তৈরি খাবার তোমাদের খাওয়াব। বিজয়, তুমিও এস।'

'যাব।'

পরদিন সন্ধ্যেবেলা দেবাশিসের বাড়িতে অতিথিরা একে একে এসে উপস্থিত হল। এমন কি খঙ্গা বাহাদুরও ঠিক সময়ে এল, বলল—'খেলা হল না, ওআক্-ওভার পেয়ে গেলাম।'

নীচের তলার বসবার ঘরে আড্ডা জমল। সকলে উপস্থিত হলে দেবাশিস এক ফাঁকে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, দীপা খাবারের প্লেট সাজাচ্ছে আর নকুল দুটো বড় বড় টি-পটে চা তৈরি করছে। দেবাশিস দীপাকে বলল—'ওরা সবাই এসে

গেছে। দশ মিনিট পরে চা জলখাবার নিয়ে তুমি আর নকুল যেও।'

'আচ্ছা।' দীপা জানত না কারা নিমন্ত্রিত হয়েছে, তার মনে কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। অস্পষ্টভাবে ভেবেছিল, হয়তো ফ্যাক্টরির সহকর্মী বন্ধু।

বসবার ঘরে আলোচনা শুরু হয়েছে, আজকের কাগজে নতুন শজারুর কাঁটা হত্যার খবর বেরিয়েছে তাই নিয়ে। এবার শিকার হয়েছে এক দোকানদার, গুণময় দাস। এবারও অকুস্থল দক্ষিণ কলকাতা।

আলোচনায় নতুনত্ব বিশেষ নেই। হত্যাকারী হয় পাগল, নয় পাকিস্তানী, নয় চীনেম্যান। সুজন বলল—'একটা জিনিস লক্ষ করেছ? প্রথমে ভিখিরি, তারপর মজুর, তারপর দোকানদার। হত্যাকারী স্তরে স্তরে উঁচু দিকে উঠছে। এর পরের বারে কে শিকার হবে ভাবতে পার?'

প্রবাল গলার মধ্যে অবজ্ঞাসূচক শব্দ করল। কপিল বলল—'সম্ভবত নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড়।'

খড়্গ বাহাদুর বলল—'কিংবা নামজাদা সিনেমা অ্যাক্টর।'

সুজন বলল—'কিংবা নাম-করা গাইয়ে।'

প্রবাল বলল—'নাম-করা লোককেই মারবে এমন কী কথা আছে? পয়সাওয়ালা লোককেও মারতে পারে। যেমন নৃপতিদা কিংবা কপিল, কিংবা—'

এই সময় দীপা খাবারের ট্রে হাতে দোরের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রবালের কথা শেষ হল না, সবাই হাসিমুখে উঠে দীপাকে মহিলার সম্মান দেখাল। দীপা একবার ত্রাস-বিস্ফারিত চোখ সকলের দিকে ফেরাল, তার মুখ সাদা হয়ে গেল। প্রবল চেষ্টায় সে নিজের দেহটাকে সামনে চালিত করে টেবিলের ওপর খাবারের ট্রে রাখল।

কপিল মৃদু ঠাট্টার সুরে বলল—'নমস্কার, মিসেস ভট্ট।'

দীপা বোধ হয় শুনতে পেল না, সে ট্রে রেখেই পিছু ফিরল। তার পিছনে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে নকুল ছিল, তাকে পাশ কাটিয়ে দীপা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দেবাশিস অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। সে আশা করেছিল, দীপা সকলকে চা ঢেলে দেবে, সকলেই বিয়ের আগে থেকে পরিচিত, তাদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলবে, তাদের খাওয়ার তদারক করবে। কিন্তু দীপা কিছুই করল না। দেবাশিস নিজেই সকলকে চা ঢেলে দিল। ট্রে'র ওপর থেকে খাবারের প্লেট নামিয়ে তাদের সামনে রাখল। দীপা আজ নকুলের সাহায্যে অনেক রকম খাবার তৈরি করেছিলঃ চিংড়ি মাছের কাটলেট, হিঙের কচুরি, ডালের ঝালবড়া, রাঙালুর পুলি, জমাট ক্ষীরের বরফি ইত্যাদি। অতিথিরা খেতে খেতে আবার তর্কবিতর্কে মশগুল হয়ে উঠল। দীপার ব্যবহারের সামান্য অস্বাভাবিকতা কেউ লক্ষও করল কিনা বলা যায় না।

আলোচনা যখন বেশ জমে উঠেছে তখন দেবাশিস অতিথিদের দৃষ্টি এড়িয়ে রান্নাঘরে গেল। দেখল, দীপা টেবিলের ওপর কনুই রেখে আঙুল দিয়ে দুই রগ টিপে বসে আছে। দেবাশিস তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে হতাশ চোখ তুলে বলল—'বড্ড মাথা ধরেছে।'

দেবাশিসের মন মুহূর্তমধ্যে হাল্কা হয়ে গেল। সে সহানুভূতির সুরে বলল—'ও—আগুনের তাতে মাথা ধরেছে। তুমি আর এখানে থেকো না, নিজের

ঘরে চলে যাও, মাথায় অডিকলোন দিয়ে শুয়ে থাকো গিয়ে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মাথাধরা সেরে যাবে।'

দীপা উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে বলল—'আচ্ছা।'

দেবাশিস বসবার ঘরে ফিরে গিয়ে বলল—'দীপার খুব মাথা ধরেছে। আমি তাকে মাথায় অডিকলোন দিয়ে শুয়ে থাকতে বলেছি। আজ সারা দুপুর উনুনের সামনে বসে খাবার তৈরি করেছে।'

সকলেই সহানুভূতিসূচক শব্দ উচ্চারণ করল। বিজয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'আমি যাই, দীপাকে একবার দেখে আসি।'

দেবাশিস বলল—'যাও-না, সোজা ওপরে চলে যাও।'

বিজয় দোতলায় গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দীপার শোবার ঘরের দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দীপা চোখ বুজে শুয়ে ছিল, সাড়া পেয়ে ঘাড় তুলে বিজয়কে দেখল, তারপর আবার বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজল।

বিজয় খাটের পাশে এসে দাঁড়াল, কটমট করে দীপার পানে চেয়ে থেকে চাপা তর্জনে বলল—'আমার সঙ্গে চালাকি করিসনে. তোর মাথাধরার কারণ আমি বুঝেছি।'

দীপা উত্তর দিল না, চোখ বুজে পড়ে রইল।

বিজয় তর্জনী তুলে বলল—'আজ যারা এসেছে তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে তোর ইয়ে—।'

দীপার কাছ থেকে সাড়াশব্দ নেই।

'তার নাম কি, বল।'

দীপার মুখে কথা নেই, সে যেন কালা হয়ে গেছে।

'বলবি না?'

এইবার দীপা ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বসল, তীব্র দৃষ্টিতে বিজয়ের পানে চেয়ে বলল—'না. বলব না।' এই বলে সে বিজয়ের দিকে পিছন ফিরে আবার শুয়ে পড়ল।

দাঁতে দাঁত চেপে বিজয় বলল—'বলবিনে! আচ্ছা আমিও দেখে নেব। যেদিন ধরব তাকে, চৌ-রাস্তার ওপর টেনে এনে জুতোপেটা করব।'

বিজয় নীচে নেমে গেল। ভাই-বোনের ঝগড়ার মূলে যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন হাস্যকর হয়ে দাঁড়াল—

তারপর আবার দিন কাটছে।

প্রত্যেক মানুষের দুটো চরিত্র থাকে; একটা তার দিনের বেলার চরিত্র, অন্যটা রাত্রির। বেরালের চোখের মতঃ দিনে একরকম, রাত্রে অন্যরকম।

এই কাহিনীতে যে ক'টি চরিত্র আছে তাদের মধ্যে পাঁচজনের নৈশ জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। হয়তো অপ্রত্যাশিত নতুন তথ্য জানা যাবে।

একটি রাত্রির কথাঃ

সাড়ে দশটা বেজে গেছে। নৃপতি নৈশাহার শেষ করে নিজের শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল। জোড়া-খাটের ওপর চওড়া বিছানা; তার বিবাহিত

জীবনের খাট-বিছানা। এখন সে একাই শোয়। শুয়ে বই পড়ে, বই পড়তে পড়তে ঘুম এলে বই বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দেয়।

আজ কিন্তু বই পড়তে পড়তে তার মন ছটফট করছে, পড়ায় মন বসছে না। প্রায় আধ ঘণ্টা বইয়ে মন বসাবার বৃথা চেষ্টা করে সে উঠে পড়ল, আলো নিবিয়ে জানলার নীচে আরাম-চেয়ারে এসে বসল। আকাশে চাঁদ আছে, বাইরে জ্যোৎস্নার প্লাবন। সে সিগারেট ধরালো।

আজ কোন্ তিথি? পূর্ণিমা নাকি? হপ্তা দুই আগে নৃপতি যখন গভীর রাত্রে বেরিয়েছিল তখন কৃষ্ণপক্ষ ছিল, বোধ হয় অমাবস্যা। মানুষের মনের সঙ্গে তিথির কি কোনো সম্পর্ক আছে? একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমাতে বাতের ব্যথা বাড়ে, একথা আধুনিক ডাক্তারেরাও স্বীকার করেন। নৃপতি গলার মধ্যে মৃদু হাসল। বাতের ব্যথাই বটে।

'বাবু!'

নৃপতির খাস চাকর দিননাথ তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। নৃপতি পাশের দিকে ঘাড় ফেরাল। দিনু বলল—'আপনার ঘুম আসছে না, এক কাপ ওভালটিন তৈরি করে দেব?'

নৃপতি একটু ভেবে বলল—'না, থাক। আমি বেরুব, তুই শেষ রাত্রে দোর খুলে রাখিস।'

'আচ্ছা, বাবু।'

দিনু প্রভুভক্ত চাকর; সে জানে নৃপতি মাঝে মাঝে নিশাভিসারে বেরোয়, কিন্তু কাউকে বলে না। বাড়ির অন্য চাকর-বাকর ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না।

দিনু চলে যাবার পর নৃপতি উঠে আলো জ্বালল; ওয়ার্ডরোব থেকে এক সেট ধূসর রঙের বিলিতি পোশাক বের করে পরল, পায়ে রবার-সোল জুতো পরল; স্টীলের কাবার্ড থেকে একটা চশমার খাপের মত লম্বাটে পার্স নিয়ে বুক-পকেটের ভিতর দিকে রাখল। তারপর ছ'ফুট লম্বা আয়নায় নিজের চেহারা একবার দেখে নিয়ে আলো নিবিয়ে দিল। বাড়ির পিছন দিকে চাকরদের যাতায়াতের জন্যে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নীচে নেমে গেল।

নৃপতি কোথায় যায়? সে বিপত্নীক, তার কি কোন গুপ্ত প্রণয়িনী আছে?

আর একটি রাত্রির কথা:

গোল পার্ক থেকে যে ক'টা সরু রাস্তা বেরিয়েছে তারই একটা দিয়ে কিছুদূরে গেলে একটা পুরনো দোতালা বাড়ি চোখে পড়ে; এই বাড়ির একতলায় গোটা তিনেক ঘর নিয়ে প্রবাল গুপ্ত থাকে। পুরনো বাড়ির পুরনো ভাড়াটে; ভাড়া কম দিতে হয়।

বাসাটি মন্দ নয়। কিন্তু প্রবালের প্রকৃতি একটু অগোছালো, তাই তার স্ত্রী মারা যাবার পর বাসাটি শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। সদরের বসবার ঘরে মেঝের ওপর শতরঞ্জি পাতা। দেয়াল ঘেঁষে এক জোড়া বাঁয়াতবলা, হারমোনিয়াম এবং তাল রাখার একটা ছোট যন্ত্র। প্রবাল যে সঙ্গীতশিল্পী, বাসায় এ ছাড়া তার অন্য কোনো নিদর্শন নেই।

রাত্রি সাড়ে আটটায় সময় প্রবাল সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে

হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছিল। আজ সে নৃপতির আড্ডায় যায়নি। একটা গানে সুর লাগিয়ে তৈরি করছিল, আসছে হপ্তায় দমদমে গিয়ে সেটা রেকর্ড করতে হবে। সে নিজেই গানে সুর দেয়; আজ গানটাকে ঠিক রেকর্ডের মাপে তৈরি করছিল। তিন মিনিট কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে গান গেয়ে শেষ করতে হবে।

তালের যন্ত্রটাতে দম দিয়ে সে চালু করে দিল, যন্ত্রটা ঘড়ির দোলকের মত কট্‌কট্‌ শব্দ করে দুলতে লাগল। প্রবাল পকেট থেকে স্টপ্‌-ওয়াচ বের করে হারমোনিয়ামের ওপর রাখল, তারপর স্টপ্‌-ওয়াচের মাথা টিপে চালিয়ে দিয়ে মৃদুকন্ঠে গাইতে আরম্ভ করল. তার আঙুল খুব লঘু স্পর্শে হারমোনিয়ামের চাবির ওপর খেলে বেড়াতে লাগল।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্টপ্‌-ওয়াচ্‌ বন্ধ করল, দেখল তিন মিনিট একত্রিশ সেকেন্ড হয়েছে। সে তখন তালের যন্ত্রটাকে চাবি ঘুরিয়ে একটু দ্রুত করে দিয়ে আবার স্টপ্‌-ওয়াচ্‌ ধরে গাইতে শুরু করল।

এইভাবে প্রায় আধ ঘন্টা চলল। নিঃসঙ্গ গায়ক আপন মনে গেয়ে চলেছে।

দোরে খট্‌খট্‌ করে টোকা পড়ল। প্রবাল উঠে গিয়ে দোর খুলে দিল. একটা চাকর এক থালা অন্ন-ব্যঞ্জন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবালের বাসায় রান্নাবান্নার কোনো ব্যবস্থা নেই; কাছেই একটা হোটেল আছে, সেখান থেকে দু' বেলা তার খাবার দিয়ে যায়।

চাকরটা শতরঞ্জির এক কোণে থালা রেখে চলে গেল। প্রবাল দোর বন্ধ করে সেখানেই খেতে বসল। এমনিভাবে সে যেন দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে। হয়তো দূর ভবিষ্যতের ওপর দৃষ্টি রেখে সে চলেছে, তাই বর্তমান সম্বন্ধে তার মন সম্পূর্ণ উদাসীন।

নৈশাহার শেষ করে প্রবাল বাসায় তালা লাগিয়ে বেরুল। মোড়ের মাথায় একটা পানের দোকান আছে. সেখানে গিয়ে পান কিনে মুখে দিল, একটা গোল্ড ফ্লেক সিগারেট ধরালো। প্রবাল নিজের কাছে সিগারেট রাখে না, পাছে বেশী খাওয়া হয়ে যায়; প্রত্যহ রাত্রে দোকান থেকে একটি সিগারেট কিনে খায়। যারা পেশাদার গাইয়ে, গলা সম্বন্ধে তাদের সতর্কতার অন্ত নেই। বেশী ধূমপান করলে নাকি গলা খারাপ হয়ে যায়।

পানের দোকানে একটি ছোট্ট ট্রান্‌জিস্টার গুনগুন করে গান গেয়ে চলেছে। প্রবাল শুনল. তারই গাওয়া একটি গানের রেকর্ড বাজছে। সে ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ নিজের গাওয়া গান শুনল, তারপর সিগারেট টানতে টানতে এগিয়ে চলল।

সাদার্ন অ্যাভেনু্য তখন জনবিরল হয়ে এসেছে। প্রবাল রবীন্দ্র সরোবরের রেলিং-এর ধার দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলল। তার মগজের মধ্যে কখনও গানের কলি গুঞ্জন তুলছে... প্রেমের সাগর দুলে দুলে ওঠে সখি...। কখন একটা ক্রুদ্ধ ভোমরা ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে...দুনিয়ায় যার টাকা নেই সে কিসের লোভে বেঁচে থাকে?...

রবীন্দ্র সরোবরের রেলিং অনেক দূর এসে যেখানে পূব দিকে মোড় ঘুরেছে তার কাছাকাছি একটা খিড়কির ফটক আছে। প্রবাল সেই ফটক দিয়ে লেকের বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করল।

ঝিলিমিলি আবছা আলোয় কিছুদূর যাবার পর একটা গাছের তলায় শূন্য বেঞ্চি চোখে পড়ল। প্রবাল বেঞ্চিতে গিয়ে বসল, তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তার গলার মধ্যে অবরুদ্ধ হাসির মত শব্দ হল।...

সেরাত্রে প্রবাল যখন বাসায় ফিরল তখন বারোটা বাজতে বেশী দেরী নেই। কলকাতা শহরের চোখ তন্দ্রায় ঢুলুঢুলু।

আর একটি রাত্রির কথাঃ

খড়্গ বাহাদুর আজ আড্ডায় যায়নি; তার কারণ তার বাড়িতেই আজ আড্ডা বসবে। অবশ্য অন্যরকম আড্ডা; অতিথিরাও অন্য। এইরকম আড্ডা মাসে দু' তিন বার বসে।

খড়্গ বাহাদুর একটি ছোট ফ্ল্যাটে থাকে। ছোট হলেও ফ্ল্যাটটি তার পক্ষে যথেষ্ট। সে একলা থাকে, সঙ্গী একমাত্র স্বদেশী সেবক রতন সিং। রতন সিং একাধারে তার ভৃত্য এবং পাচক, ভাল শিককাবাব তৈরি করতে পারে।

সামনের ঘরটি পরিপাটিভাবে সাজানো, দেখলেই বোঝা যায় অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি। মাঝখানে একটি তাস খেলার টেবিল ঘিরে গোটা চারেক গদি-মোড়া চেয়ার, মাথার ওপর একশো ওয়াটের দুটো বাল্ব জ্বলছে। এই টেবিলের সামনে একলা বসে খড়্গ বাহাদুর এক প্যাক্ তাস নিয়ে ভাঁজছিল। আরো দুটো নতুন তাসের সীল-করা প্যাক্ পাশে রাখা রয়েছে। খড়্গ বাহাদুর অলসভাবে তাস ভাঁজছিল, কিন্তু তার মুখের ভাব কড়া এবং রুক্ষ। নৃপতির আড্ডায় তার যেমন হাসিখুশি মিশুক ভাব দেখা যায়, বাড়িতে ঠিক তেমন নয়। বাড়িতে সে প্রভু। মধ্যযুগীয় প্রভু।

পৌনে আটটা বাজলে খড়্গ বাহাদুর ডাকল—'রতন সিং!'

রতন সিং রান্নাঘরে ছিল, বেরিয়ে এসে প্রভুর সামনে দাঁড়াল। বেঁটেখাটো মানুষ, খাঁটি নেপালী চেহারা; ভাবলেশহীন তির্যক চোখে চেয়ে বলল—'জি।'

খড়্গ বাহাদুর বলল—'আটটার পরেই অতিথিরা আসবে। শিককাবাব কত দূর?'

রতন সিং বলল—জি, আধা তৈরি হয়েছে, আধা তৈরি হচ্ছে।'

খড়্গ বলল—'তিনজন অতিথি আসবে। তারা সকলে এলে প্রথম দফা শিককাবাব দিয়ে যাবে, এক ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় দফা দেবে! যাও।'

রতন সিং-এর মুখ দেখে নিঃসংশয়ে কিছু বোঝা যায় না; তবু সন্দেহ হয়, মালিকের অতিথিদের সে পছন্দ করে না। সে রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে আবার শিককাবাব রচনায় মন দিল। মালিক যা করেন তাই অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে হয়, কিন্তু জুয়া খেলে টাকা ওড়ানো ভাল কাজ নয়। দেশ থেকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা আসে, অথচ মাসের শেষে এক পয়সাও বাঁচে না।

বাইরের ঘরে তাস ভাঁজতে ভাঁজতে খড়্গ বাহাদুর ভাবছিল—আজ যদি হেরে যাই, রক্তদর্শন করব।

গত কয়েকবার সে ক্রমাগত হেরে আসছে।

আটটার সময় একে একে তিনটি অতিথি এল। তিনজনেই যুবক, সাজ-পোশাক দেখে বোঝা যায়, তিনজনেই বড়মানুষের ছেলে। একজন সিন্ধী, দ্বিতীয়টি পাঞ্জাবী, তৃতীয়টি পার্শী।

সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণের পর সকলে টেবিল ঘিরে বসল। রতন সিং চারটি প্লেটে প্রায় সের খানেক শিককাবাব এনে রাখল; সঙ্গে রাই-বাটা এবং ছুরি-কাঁটা।

কথাবার্তা বেশী হল না, চারজনে প্লেট টেনে নিয়ে ছুরি-কাঁটার সাহায্যে খেতে আরম্ভ করল। রতন সিং-এর শিককাবাব অতি উপাদেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই চারটি প্লেট শূন্য হয়ে গেল। সকলে রুমালে মুখ মুছে সিগারেট ধরাল। পার্শী যুবকও সিগারেট খায়, আধুনিক যুবকেরা ধর্মের নিষেধ মানে না।

তারপর সাড়ে আটটার সময় তাসের নতুন প্যাক্ খুলে খেলা আরম্ভ হল। তিন তাসের খেলা, জোকার নেই। নিম্নতম বাজি পাঁচ টাকা, ঊর্ধ্বতম বাজি কুড়ি টাকা।

চারজনেই পাকা খেলোয়াড়। কিন্তু রানিং ফ্লাশ্ খেলায় ক্রীড়ানৈপুণ্যের বিশেষ অবকাশ নেই, ভাগ্যই বলবান। কদাচিৎ ব্লাফ্ দিয়ে দু'এক দান জেতা যায়। আসলে হাতের জোরের ওপরেই খেলার হার-জিত।

সাড়ে দশটার সময় আর এক দফা শিককাবাব এল। এবার মাত্রা কিছু কম। সঙ্গে কফি। পনেরো মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ করে আবার নতুন তাসের প্যাক্ খুলে খেলা আরম্ভ হল।

খেলা শেষ হল রাত্রি সাড়ে বারোটার সময়। হিসেবনিকেশ করে দেখা গেল, অতিথিরা তিনজনেই জিতেছে, খড়্গ বাহাদুর হেরেছে প্রায় সাত শো টাকা।

অতিথিরা হাসিমুখে সহানুভূতি জানিয়ে চলে গেল। খড়্গ বাহাদুর অন্ধকার মুখে অনেকক্ষণ একলা টেবিলের সামনে বসে রইল, তারপর হঠাৎ উঠে শোবার ঘরে গেল। বেশ পরিবর্তন করে মাথায় একটা কাউ-বয় টুপি পরে বেরিয়ে এল। রতন সিংকে বলল—'আমি বেরুচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি, তুমি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জেগে থাকবে।'

রতন সিং বলল—'জি।'

খড়্গ বাহাদুর বেরিয়ে গেল। রতন সিং-এর মঙ্গোলীয় মুখ নির্বিকার রইল বটে, কিন্তু তার ছোট ছোট চোখ দু'টি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। মালিক আজও হেরেছেন। তাস খেলায় হেরে মালিক কোথায় যান? ফিরে আসেন সেই শেষ রাত্রে। কখনও আটটার আগেই বেরিয়ে যান, ফিরতে রাত হয়। কোথায় থাকেন? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান? কিংবা—

আর একটি রাত্রির কথাঃ

কপিলের বাড়িতে নৈশ আহার শেষ হয়েছিল। কর্তা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন; কপিলের ছোট দুই ভাইবোনও নিজের নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। ড্রয়িংরুমে এসে বসেছিল কপিল, তার দাদা আর বউদিদি এবং তার দিদি ও জামাইবাবু। কর্তা বিপত্নীক, পুত্রবধূই বাড়ির গিন্নি। মেয়ে-জামাই দার্জিলিঙে থাকে, জামাইয়ের চায়ের বাগান আছে; আজ সকালে কয়েক দিনের জন্যে তারা কলকাতায় এসেছে।

কপিলদের বাড়িটা তিনতলা। নীচের তলায় একটা বড় ব্যাঙ্কের শাখা, উপরের দু'টি তলায় কপিলেরা থাকে। সবার উপরে প্রশস্ত খোলা ছাদ।

ড্রয়িংরুমে যাঁরা সমবেত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কপিলের দাদা গৌতমদেব বয়সে বড়। পৈতৃক সলিসিটার অফিসের তিনি এখন কর্তা। অত্যন্ত নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক; বাড়িতে কারুর সাতে-পাঁচে থাকেন না। তাঁর স্ত্রী রমলার প্রকৃতি

কিন্তু অন্যরকম। তার বয়স ত্রিশের বেশী নয়, কিন্তু সে বুদ্ধিমতী, গৃহকর্মে নিপুণা, সংসারের কোনো ব্যাপারেই নির্লিপ্ত নয়। উপরন্তু তার বুদ্ধিতে একটু অম্লরস মেশানো আছে, যার ফলে সকলেই তার কাছে একটু সতর্ক হয়ে থাকে।

কপিলের দিদি অশোকার বয়সও আন্দাজ ত্রিশ। তার সাত বছরের একটি-মাত্র ছেলে স্কুলের বোর্ডিং-এ থাকে। অশোকার চরিত্র সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সে বড়মানুষের মেয়ে, বড়মানুষের বউ। পৃথিবীর অধিকাংশ জীব-কেই সে করুণার চক্ষে দেখে, কারুর সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বলে না। তার স্বামী শৈলেনবাবু কিন্তু মজলিসী লোক; আসর জমিয়ে গল্প করতে ভালবাসেন, তর্ক করার দিকে ঝোঁক আছে এবং সুযোগ পেলে অযাচিত উপদেশও দিয়ে থাকেন।

তিনি প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত একটি পাইপের মুণ্ড মুঠিতে ধরে ধূমপান করছেন। গৌতমদেব একটি মোটা সিগারেট ধরিয়েছেন। কপিলের নাকে তামাকের সুগন্ধ ধোঁয়া আসছে; কিন্তু সে গুরুজনদের সামনে ধূমপান করে না, তাই নীরবে বসে উস্‌খুস্‌ করছে। বাড়ির নিয়ম, নৈশাহারের পর সকলে অন্তত পনেরো মিনিটের জন্যে একত্র হবে। আগে কর্তাও এসে বসতেন; এখন তাঁর বয়স বেড়েছে, খাওয়ার পরই শুয়ে পড়েন। বাড়ির অন্য সকলের জন্যে কিন্তু নিয়ম জারি আছে।

জামাই শৈলেনবাবু পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কপিলকে নিরীক্ষণ করছিলেন, গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন—'কপিল, তুমি কি নাম-মাহাত্ম্যে সাধু-সন্নিসি হয়ে যাবার মতলব করেছ?'

কপিল সমান গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর দিল—'আপাতত সে রকম কোনো মতলব নেই।'

শৈলেনবাবু বললেন—'তবে বিয়ে করছ না কেন? সংসার-ধর্ম করতে গেলে বিয়ে করা দরকার। তোমার বিয়ে করার উপযোগী বুদ্ধি না থাকতে পারে কিন্তু বয়স তো হয়েছে।'

কপিল ভ্রূ একটু তুলে বলল—'বিয়ে করার জন্যে কি খুব বেশী বুদ্ধি দরকার?'

রমলা হেসে উঠল। কপিল ও শৈলেনবাবুর মধ্যে গাম্ভীর্য-ঢাকা গূঢ় পরিহাসের সঙ্গে বাড়ির সকলেই পরিচিত। রমলা বলল—'বিয়ে করার জন্যে যদি বেশী বুদ্ধির দরকার হত তাহলে বাংলাদেশে কারুর বিয়ে হত না। আসলে ঠিক উল্‌টো। ঠাকুরপোর বড্ড বেশী বুদ্ধি, তাই বিয়ে হচ্ছে না।'

'তাই নাকি!' শৈলেনবাবু অবিশ্বাস-ভরা চক্ষু বিস্ফারিত করে কপিলের পানে চাইলেন—'এত বুদ্ধি কপিলের! কিন্তু আর একটু পরিষ্কার করে না বললে কথাটা হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।'

রমলা বলল—'ওকেই জিজ্ঞেস করুন না। আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই, তবু ও বিয়ে করে না কেন?'

শৈলেনবাবু প্রতিধ্বনি করলেন—'কেন?'

কপিল পকেটে হাত দিল, সিগারেটের কেস হাতে ঠেকল, কেসটা অজ্ঞাতসারে বার করে আবার সে পকেটে রেখে দিল।

গৌতমদেব উঠে পড়লেন—'আমি উঠলাম, কাল ভোরেই আবার আমাকে—' কথা অসমাপ্ত রেখে তিনি প্রস্থান করলেন। নিজের উপস্থিতি দ্বারা কারুর

অসুবিধা ঘটাতে তিনি চান না।

কপিল জামাইবাবুকে লক্ষ করে বলল—'বিয়ে করা একটা সিরিয়াস কাজ এ কথা আপনি মানেন?'

শৈলেনবাবু নিজের গৃহিণীর প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত করে বললেন—'মানি বইকি। খুব সিরিয়াস কাজ।'

অশোকা সূক্ষ্ম হাস্যরস বোঝে না, কিন্তু খোঁচা দিয়ে কথা বললে যত সূক্ষ্ম খোঁচাই হোক ঠিক বুঝতে পারে। সে স্বামীর দিকে বিরক্তিসূচক কটাক্ষ হেনে বলল—'আমি শুতে চললুম। বাজে কথার কচকচি শুনতে ভাল লাগে না।'

অশোকা চলে যাবার পর কপিল পকেট থেকে সিগারেট বার করে রমলাকে বলল—বউদি, সিগারেট খেতে পারি!'

রমলা বলল—আহা, ন্যাকামি দেখে বাঁচি না। আমার সামনে যেন সিগারেট খাও না!'

কপিল বলল—'খাই, কিন্তু অনুমতি নিয়ে খাই।'

রমলা বলল—'আচ্ছা, অনুমতি দিলুম, খাও।'

কপিল সিগারেট ধরাল। তারপর শালা-ভগিনীপতির তর্ক আবার আরম্ভ হয়ে গেল। রমলা ঠোঁটের কোণে কৌতুক-হাসি নিয়ে শুনতে লাগল।

কপিল বলল—'বিয়ে করা যখন সিরিয়াস ব্যাপার তখন খুব বিবেচনা করে বিয়ে করা উচিত।'

শৈলেনবাবু বললেন—'অবশ্য, অবশ্য। কিন্তু কী বিবেচনা করবে?'

'বিবেচনা করতে হবে, আমি কি চাই!'

'কী চাও তুমি? রূপ? গুণ? বিদ্যা? বুদ্ধি?'

'রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি থাকে ভাল, না থাকলেও আপত্তি নেই। আসলে চাই—মনের মিল।'

'হুঁ, মনের মিল। কিন্তু বিয়ে না হলে বুঝবে কি করে মনের মিল হবে কিনা।'

'ওইখানেই তো সমস্যা। তবে আজকাল স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে মেয়েদের মন বুঝতে বেশী দেরী হয় না।'

রমলা বলল—'তুমি তা হলে মেয়েদের মন বুঝে নিয়েছ?'

কপিল বলল—তা বুঝে নিয়েছি। কিন্তু বুঝলেই যে পছন্দ হবে তার কোনো মানে নেই।'

রমলা বলল—'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

শৈলেনবাবু বললেন—'তা হলে যতদিন মনের মতন মন না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন অনুসন্ধান চলবে?'

কপিল মুচকি হাসল, উত্তর দিল না।

শৈলেনবাবু সন্দিগ্ধস্বরে বললেন—'আসল কথাটা কি? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ না তো?'

'তার মানে?'

'মানে কোনো সধবা কিংবা বিধবা যুবতীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়নি তো?'

কপিল চকিত চোখে চাইল, তারপর উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল, বলল—'বউদি, জামাইবাবুর মাথা গরম হয়েছে। ঠাণ্ডা দেশ থেকে গরম দেশে এসেছেন, হবারই

কথা। তুমি ওঁর জন্যে আইস্-ব্যাগের ব্যবস্থা কর, আমি শুতে চললাম।'

হাসি-মস্করার মধ্যে রাত্রির মত সভা ভঙ্গ হল। কপিল নিজের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করল।

কপিলের ঘরটি বেশ বড়, লম্বাটে ধরনের। এক পাশে খাট-বিছানা, অন্য পাশে টেবিল-চেয়ার। কাঁচে ঢাকা টেবিলের ওপর কাঁচের নীচে আকাশের একটি মানচিত্র: নীল জমির ওপর সাদা নক্ষত্রপুঞ্জ ফুটে আছে। কপিল রাত্রিবাস পরল, ঢিলা পা-জামা আর হাত-কাটা ফতুয়া। তারপর একটা বই নিয়ে টেবিলের সামনে পড়তে বসল।

ইংরেজী গণিত জ্যোতিষের বই, লেখকের নাম ফ্রেড্ হয়েল। পড়তে পড়তে কপিল ঘড়ি দেখছে, আবার পড়ছে। বিশ্ব-রহস্য উদ্ঘাটক জ্যোতিষগ্রন্থের প্রতি তার গভীর অনুরাগ; কিন্তু আজ তার মন ঠিক বইয়ের মধ্যে নেই, যেন সে সময় কাটাবার জন্যেই বই পড়ছে।

কব্জির ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজল। কপিল বই বন্ধ করে উঠল, দেয়ালের একটা আলমারির কপাট খুলে একটি দূরবীন যন্ত্র বার করল। যন্ত্রটি আকারে দীর্ঘ নয় কিন্তু তিন পায়ার ওপর ক্যামেরার মত দাঁড় করানো যায়, আবার ইচ্ছামত পায়া গুটিয়ে নেওয়া যায়। কপিল দূরবীনটি বগলে নিয়ে ঘরের আলো নেবালো, তারপর সন্তর্পণে বাইরে এল।

ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক পা গেলেই ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। কপিল পা টিপে টিপে সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত গিয়েছে এমন সময় সামনের একটা দরজা খুলে রমলা বেরিয়ে এল। তার মুখে খরশান ব্যঙ্গের হাসি। কপিল তাকে দেখে থতমত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রমলা বলল—'কী ঠাকুরপো, এত রাত্রে দূরবীন নিয়ে কোথায় চলেছ?'

কপিল চাপা গলায় বলল—'আস্তে বউদি, বাবার ঘুম ভেঙে যাবে।'

রমলা গলা নীচু করল—'তোমার মতলব ভাল ঠেকছে না ঠাকুরপো।'

কপিল বলল—'কি মুশকিল। আমি তো প্রায়ই আকাশের তারা দেখবার জন্যে ছাদে উঠি। তুমি জান না?'

রমলা বলল—'জানি। কিন্তু সে তো সন্ধ্যের পর। আজ রাত দুপুরে কোন্ তারা দেখবে বলে ছাদে উঠছ?'

কপিল বলল—আজ রাত্রি পৌনে বারোটার সময় মঙ্গলগ্রহ ঠিক মাথার ওপর উঠবে। মঙ্গলগ্রহ এখন পৃথিবীর খুব কাছে এসেছে, তাই তাকে ভাল করে দেখবার জন্যে ছাদে যাচ্ছি।'

রমলা মুখ গম্ভীর করে বলল—'হুঁ, মঙ্গলগ্রহ। কোন্ গ্রহ-তারা তোমার ঘাড়ে চেপেছে তুমিই জান। কিন্তু একটা কথা বলে দিচ্ছি, আমাদের বাড়ির চার পাশে যাদের বাড়ি তারা গরমের সময় জানলা খুলে শুয়েছে, তুমি যেন তাদের জানলা দিয়ে গ্রহ-তারা দেখতে যেও না।'

কপিল মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে হাসল, বলল—'বউদি, তোমার মনটা ভারি সন্দিগ্ধ। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি এত রাত্রি পর্যন্ত ঘুমোওনি কেন?'

রমলা বলল—'তোমার দাদা বিছানায় শুয়ে আইনের বই পড়ছেন, হঠাৎ তাঁর কফি খাবার শখ হল। তাই কফি তৈরি করতে চলেছি। তুমি খাবে?'

'আমার সময় নেই।' কপিল চুপি চুপি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। হয়তো মঙ্গলগ্রহই দেখবে।

আর একটি রাত্রির কথাঃ

সিনেমার শিল্পক্ষেত্রে যারা কাজ করে তারা সাধারণত দল বেঁধে থাকে, নিজেদের শিল্পীগোষ্ঠী নিয়ে একটা সমাজ তৈরি করে নিয়েছে, বাইরের লোকেব সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখে না। সুজন মিত্র কিন্তু দলে থেকেও ঠিক দলের পাখি নয়। যতক্ষণ সে স্টুডিওর সীমানার মধ্যে থাকে ততক্ষণ সকল শ্রেণীর সহকর্মী ও সহকর্মিণীর সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে। তরুণী অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই এই সুদর্শন নবোদিত অভিনেতাটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সুজন্ কারুর কাছে ধরা দেয়নি। পাঁকাল মাছেব মত হাত পিছলে বেরিয়ে যাবার কৌশল তার জানা ছিল।

সিনেমার গণ্ডীর বাইরে তার প্রধান বন্ধুগোষ্ঠী ছিল নৃপতির আড্ডার ছেলেরা; এখানে এসে সে যেন সমভূমিতে পদার্পণ করত। তার বংশপরিচয় কেউ জানে না তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী কেউ আছে কিনা সে পরিচয়ও কেউ কোনো দিন পায়নি, কিন্তু তার বন্ধু-নির্বাচন থেকে অনুমান করা যায় যে তার বংশপবিচয় যেমনই হোক, সে নিজে উচ্চ-মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষিত মার্জিত চরিত্রের মানুষ।

একদিন স্টুডিওতে তার শুটিং ছিল, কাজ শেষ হতে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে মুখের রঙ পবিষ্কার করে বেরুতে আরো ঘণ্টাখানেক কাটল। সুজনের একটি ছোট মোটর আছে, তাইতে চড়ে সে যখন স্টুডিও থেকে বেরুল তখন রাত্রি হয়ে গেছে।

মাইল দেড়েক চলবার পর মোটর একটি হোটেলের সামনে এসে থামল। সুজন হোটেলেই খায়। তার বাসায় রান্নার আয়োজন নেই। কিন্তু রোজ একই হোটেলে খায় না। যখন যা খাবার ইচ্ছে হয় তখন সেই রকম হোটেলে যায়, কখনো বা মিষ্টান্নের দোকানে গিয়ে দই-সন্দেশ খেয়ে পেট ভরায়। যেদিন শুটিং থাকে সেদিন দুপুরে স্টুডিওর ক্যান্টিনে খায়।

হোটেলের পাশে গাড়ি পার্ক করে সে যখন হোটেলে ঢুকল, তখন তার নাকের নীচে একজোড়া শৌখিন গোঁফ শোভা পাচ্ছে। গোঁফ জোড়া অকৃত্রিম নয় সুজন কোনো প্রকাশ্য স্থানে গেলেই মুখে গোঁফ লাগিয়ে ছদ্মবেশ পরিধান করে। তার মুখখানা সিনেমার প্রসাদে জনসাধারণের খুবই পরিচিত, তাকে সশরীরে দেখলে সিনেমা-পাগল লোকেরা বিরক্ত করবে এই আশঙ্কাতেই হয়তো সে গোঁফের আড়ালে স্বরূপ লুকিয়ে রাখে।

হোটেলে আহার শেষ করে সুজন মোটর চালিয়ে নিজের বাসার দিকে চলল। বাসাটি পাড়ার এক প্রান্তে একটি সরু রাস্তার ওপর; ছোট বাড়ি কিন্তু গাড়ি রাখার আস্তাবল আছে।

গ্যারাজে গাড়ি রেখে সুজন চাবি দিয়ে দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকল, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে শোবার ঘরে গিয়ে আলো জ্বালল। একসঙ্গে গোটা তিনেক দ্যুতিমান বাল্ব জ্বলে উঠল।

চৌকশ ঘরটি বেশ বড। তাতে খাট-বিছানা আছে, টেবিল-চেয়ার আলমারি

আছে, এমন কি স্টোভ, চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতিও আছে। মনে হয়, সুজন এই একটি ঘরের মধ্যে তার একক জীবনযাত্রার সমস্ত উপকরণ সঞ্চয় করে রেখেছে।

একটি লম্বা আরাম কেদারায় অঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে সে পকেট থেকে সিগারেট বার করল, সিগারেট ধরিয়ে পিছনে মাথা হেলিয়ে দিয়ে উজ্জ্বল একটা বাল্‌বের দিকে দৃষ্টি রেখে মৃদুমন্দ টান দিতে লাগল। এখন আর তার মুখে গোঁফ নেই, নগ্ন মুখখানা ছুরির মত ধারাল।

সিগারেট শেষ করে সুজন কব্জির ঘড়ি দেখল—ন'টা বেজে কুড়ি মিনিট। সে উঠে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল; সাড়ে ছ' ফুট উঁচু আয়নায় তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজের দেহ মুখ পরীক্ষা করল; একবার হাসল, একবার ভ্রূকুটি করল, তারপর আড়মোড়া ভেঙে আলমারির কাছে গেল।

আলমারি থেকে সে দু'টি জিনিস বার করল, একটি হুইস্কির বোতল এবং বড় চৌকো আকারের একটি পুরু লাল কাগজের খাম। প্রথমে সে গেলাসে ছোট পেগ্‌ মাপের হুইস্কি ঢেলে তাতে জল মেশালো, তারপর গেলাস আর খাম নিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসল। গেলাসে ছোট একটি চুমুক দিয়ে চেয়ারের হাতার ওপর রেখে আগ্‌ফা'র খাম থেকে একটি ফটো বার করল।

ক্যাবিনেট আয়তনের ফটো, একটি যুবতীর আ-কটি প্রতিকৃতি, যুবতী হাসি-হাসি মুখে দর্শকের পানে চেয়ে আছে। মনে হয়, সে সিনেমার অভিনেত্রী নয়, মুখে বা দেহভঙ্গিতে কৃত্রিমতা নেই। কিন্তু সে কুমারী কি বিবাহিতা, ফটো থেকে বোঝা যায় না।

সুজন থেকে থেকে গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ছবিটি দেখতে লাগল। চোখে তার প্রগাঢ় তন্ময়তা, পলকের তরেও ছবি থেকে চোখ সরাতে পারছে না। এক ঘণ্টা কেটে গেল, গেলাসের পানীয় নিঃশেষ হল; কিন্তু সুজনের চিত্রদর্শন-পিপাসা মিটল না। সে ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে আবার সিগারেট ধরালো। তার ঠোঁট নড়তে লাগল, যেন চুপি চুপি ছবির সঙ্গে কথা কইছে। তারপর ছবিটি নিজের গালের ওপর চেপে ধরে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

পৌনে এগারোটার সময় সে ছবিটি আবার খামে পুরে আলমারিতে তুলে রাখল, আয়নার সামনে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আলো নিবিয়ে আবার বাড়ি থেকে বেরুল। মোটর নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা দক্ষিণ কলকাতার নগরগুঞ্জনক্লান্ত পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে শেষে রবীন্দ্র সরোবরের ঘেরার মধ্যে রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর গাড়ি দাঁড় করাল। গাড়ি থেকে যখন নামল, দেখা গেল নকল গোঁফ তার নাকের নীচে ফিরে এসেছে। গাড়ি লক করে সে লেক থেকে বেরুল, বড় রাস্তা পার হয়ে একটা সরু রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল।

রাস্তার দু' পাশে বাড়ির আলো নিবে গেছে। সুজন একটি ল্যাম্প-পোস্টের নীচে এসে দাঁড়াল। রাস্তার ওপারে একটা বাড়ি, তার দোতলার একটা জানলা দিয়ে নৈশদীপের অস্ফুট আলো আসছে। সুজন সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ল্যাম্প-পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে রইল। ল্যাম্প-পোস্টের নীচে দাঁড়ালে মাথার ওপর আলো পড়ে, মানুষটাকে দেখা যায় বটে, কিন্তু মুখ চেনা যায় না।

কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও জানলায় কাউকে দেখা গেল না। সুজন যাকে চোখের দেখা দেখতে চায় সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা অন্য একজনের

বাহুবন্ধনের মধ্যে শুয়ে জেগে আছে।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্। সুজন আগুনের হলকার মত তপ্ত নিশ্বাস ফেলল, তারপর ফিরে চলল।

আর একটি রাত্রির কথাঃ

দেবাশিস আর দীপা একসঙ্গে টেবিলে বসে রাত্রির আহার সম্পন্ন করল। নকুলকে শুনিয়ে দীপা বাগানের কথা বলল; মালনী পদ্মলোচন বুগেন্‌ভিলিয়া লতাকে বাইগনবিল্লি বলে শুনে দেবাশিস খানিকটা হাসল, তারপর ফ্যাক্টরির একটা মজার ঘটনা বলল। বাইরের ঠাট বজায় রইল। খাওয়া শেষ হলে দুজনে ওপরে গিয়ে নিজের-নিজের ঘরে ঢুকল। তৃতীয় ব্যক্তির সামনে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করতে তারা বেশ অভ্যস্ত হয়েছে; কিন্তু যখন তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকে না, যখন অভিনয় করার দরকার নেই, তখনই বিপদ।

দীপা ঘরে গিয়ে নৈশ দীপ জ্বেলে খানিকক্ষণ খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। আজ বাইরে হাওয়া নেই, গ্রীষ্মের রাত্রি যেন নিশ্বাস রোধ করে আছে। দীপা পাখা চালিয়ে দিয়ে ব্লাউজ খুলে শুয়ে পড়ল। ঘুম কখন আসবে তার ঠিক নেই কিন্তু যথাসময় বিছানায় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর তো কোনো কাজও নেই। শুয়ে শুয়ে সে মাথার মধ্যে দেবাশিসের একটা কথা প্রতিধ্বনির মত শুনতে লাগল—দীপা, তুমি আমাকে ভালবাস না, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

দেবাশিস নিজের ঘরে খাটের পাশে পড়ার আলো জ্বেলে একখানা ইংরেজী বিজ্ঞানের বই নিয়ে শুয়েছিল। তার গায়ে জামা নেই, পাখাটা ছাদ থেকে বনবন করে ঘুরছে। দেবাশিস বইয়ে মন বসাতে পারছিল না, মনটা যেন তপ্ত বাষ্প হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মাথায় ঠাণ্ডা জল থাবড়ে দিয়েও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হল না। আধ ঘণ্টা পরে সে বই রেখে আলো নিবিয়ে দিল। উজ্জ্বল আলোটাই যেন ঘরের বাতাসকে আরো গরম করে তুলেছে।

অন্ধকার ঘরে দেবাশিস চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে আছে। পাখার হাওয়া সত্ত্বেও বিছানাটা যেন রুটি-সেঁকা তাওয়ার মত তপ্ত। এ-পাশ ও-পাশ করেও নিষ্কৃতি নেই, বালিশের ওপর মাথাটা গরম হয়ে উঠছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনও গরম হচ্ছে, কিন্তু সেটা অগোচরে। শেষে হঠাৎ গভীর রাত্রে এই মানসিক উষ্মা মাটি ফুঁড়ে আগ্নেয়গিরির মতন উৎসারিত হল। দেবাশিস ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে চাপা গর্জনে বলল- 'God damn it, she is my wife!'

অন্ধকারে দেবাশিস কিছুক্ষণ স্নায়ুপেশী শক্ত করে বসে রইল তারপর বিছানা থেকে নেমে ঘর থেকে বেরুল। বসবার ঘরের আলো জ্বালতেই সুইচে কটাস করে শব্দ হল, মনে হল ঘরটা যেন চমকে উঠল। দেবাশিসও একটু চমকালো, হঠাৎ জ্বলে-ওঠা আলোর দীপ্তি চোখে আঘাত করল। সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে দীপার বন্ধ দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দরজায় খিল দেওয়া কি শুধুই ভেজানো, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। হয়তো একটু ঠেললেই খুলে যাবে। দীপা নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। দেবাশিস কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দরজায় টোকা দেবার জন্যে হাত তুলল, ঘুমন্ত দীপার ঘরে অনাহূত

দোর ঠেলে প্রবেশ করতে পারল না। তারপর টোকা দিতেও পারল না, আর উদ্যত হাত নেমে পড়ল। 'কাপুরুষ!' মনের গভীরে নিজেকে কঠোর ধিক্কার দিয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

দীপা তখনো ঘুমোয়নি, জেগেই ছিল। কিন্তু সে কিছু জানতে পারল না।

দেবাশিস আর দীপার বিয়ের পর দু'মাস কেটে গেল। যেদিনের ঘটনা নিয়ে কাহিনী আরম্ভ হয়েছিল, সেই যেদিন দেবাশিস ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এসে দীপাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু দীপা যায়নি, দীর্ঘ পশ্চাদ্দৃষ্টির পর আমরা সেইখানে ফিরে এলাম।

দেবাশিস পায়ে হেঁটে নৃপতির বাড়ির দিকে যেতে যেতে মাঝ-রাস্তায় থমকে দাঁড়াল। তার মনটা তিক্ত হয়েই ছিল, এখন নৃপতির বাড়িতে গিয়ে হালকা ঠাট্টা-তামাশা, উদ্দেশ্যহীন গল্পগুজব করতে হবে, প্রবালের পিয়ানো বাজনা শুনতে হবে ভাবতেই তার মন বিমুখ হয়ে উঠল। অনেক দিন পড়াশুনো করা হয়নি, অথচ তার যে কাজ তাতে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে পৃথিবীর কোথায় কি কাজ হচ্ছে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। তার কাছে কয়েকটা বিলিতী বিজ্ঞান-পত্রিকা নিয়মিত আসে, কিন্তু গত দু'মাস তাদের মোড়ক পর্যন্ত খোলা হয়নি। দেবাশিস আবার বাড়ি ফিরে চলল। আজ আর আড্ডা নয়, আগের মতন সন্ধ্যেটা পড়াশুনো করেই কাটাবে।

দীপা রেডিও চালিয়ে দিয়ে চোখ বুজে আরাম-চেয়ারে বসে ছিল, দেবাশিসকে ফিরে আসতে দেখে রেডিও বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল, উদ্বিগ্ন প্রশ্নভরা চোখে তার পানে চাইল। দেবাশিস যথাসম্ভব সহজ গলায় বলল—'ফিরে এলাম। অনেক দিন পড়াশুনো হয়নি, আজ একটু পড়ব।'

টেলিফোন টেবিলের নীচের থাকে বিলিতী পত্রিকাগুলো জমা হয়েছিল, দেবাশিস সেগুলো নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল; সেখানে পত্রিকার মোড়ক খুলে তারিখ অনুযায়ী সাজাল, তারপর বিছানায় শুয়ে পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করল।

ও ঘরে দীপা আস্তে আস্তে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা দ্রুত নিবিড় হয়ে আসছে। পদ্মলোচন বাগানে জল দিচ্ছে। আজ দীপা বাগানে যায়নি। বিকেলবেলা সে সিনেমায় যাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবার পর দেবাশিস আহত লাঞ্ছিত মুখে চলে গেল, দীপার মনটাও কেমন একরকম হয়ে গেল। যত দিন যাচ্ছে তার জীবনটা এমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে যে, মনে হয় কোনো দিনই এ জট ছাড়ানো যাবে না। মনের মধ্যে একটা নতুন সমস্যা জন্ম নিয়েছে, তার কোনো সমাধান নেই।

বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে, পদ্মলোচন বাগানের কাজ শেষ করে চলে গেল। দীপা তখন জানলা থেকে ফিরে নিঃশব্দে দেবাশিসের ঘরের দিকে গেল। দেবাশিস তখন আলো জেলেছে, বিছানায় বালিশ ঠেসান দিয়ে পড়ায় নিমগ্ন। দীপা কিছুক্ষণ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল; কিন্তু দেবাশিস

তাকে দেখতে পেল না। দীপা তখন একেবারে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দেবাশিস চমকে চোখ তুলল।

দীপা বলল—'চা খাবে?'

দেবাশিস একটু হাসল। দীপা বিকেলবেলার রূঢ়তার জন্যে অনুতপ্ত হয়েছে। সে বলল—'তুমি যদি খাও আমিও খাব।'

'এক্ষুনি আনছি।' দীপা হরিণীর মত ছুটে চলে গেল। দেবাশিস কিছুক্ষণ দোরের দিকে চেয়ে থেকে আবার পড়ায় মন দিল।

দীপা রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, নকুল রান্না চড়িয়েছে। সে বলল—'নকুল, তুমি সরো, আমি চা তৈরি করব।'

নকুল বলল- চা তৈরি করবে? দাদাবাবু খাবেন বুঝি? তা তুমি কেন করবে বউদি, আমি করে দিচ্ছি।'

'না, আমি করব। তুমি সরো।'

নকুল মনে মনে খুশী হল—'আচ্ছা বউদি, তুমিই কর।'

নকুলের ছায়াচ্ছন্ন মন অনেকটা পরিষ্কার হল। এই দু'মাস দেখেশুনে তাব ধারণা জন্মেছিল, গোড়াতে কোনো কারণে এদের মনের মিল হয়নি, এখন আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে আসছে। ঘি আর আগুন একসঙ্গে কত দিন ঠাণ্ডা থাকবে!

দীপা চা তৈরি করে ট্রে-র ওপর টি-পট, দু'টি পেয়ালা প্রভৃতি বসিয়ে ওপরে উঠে গেল বসবার ঘরে ট্রে রেখে দেবাশিসের দোরের কাছে এসে বলল- চা এনেছি।'

দেবাশিস তৎক্ষণাৎ উঠে এসে চায়ের টেবিলে বসল। দীপা চা পেয়ালায় ঢেলে একটি পেয়ালা দেবাশিসের দিকে এগিয়ে দিল, নিজের পেয়ালাটি হাতে তুলতে গিয়ে খানিকটা চা চলকে পিরিচে পড়ল।

আজ দেবাশিস হঠাৎ ফিরে আসার পর দীপাব শরীরটাও যেন শাসনের বাইরে চলে গেছে। থেকে থেকে বুকের মধ্যে আনচান করে উঠছে, মাথার মধ্যে যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, কান্নায় গলা বুজে আসছে। সে কাঁদুনে মেয়ে নয়, এত দিনের দীর্ঘ পরীক্ষা সে পরম দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে আজ তাব এ কী হল?

এক চুমুক চা খেয়ে দেবাশিস বলল—'আঃ! খাসা চা হয়েছে। কে করল— নকুল?'

'না—আমি।' দীপার গলাটা কেঁপে গেল, মনে হল শরীরের অস্থিমাংস নরম হয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে বসে পড়ল।

দেবাশিস আর কিছু বলল না, কেবল একটু প্রশংসাসূচক হাসল। দীপা দু' চুমুক চা খেয়ে নিজেকে একটু চাঙ্গা করে নিল, তারপর যেন গুনে গুনে কথা বলছে এমনিভাবে বলল—'কাল তুমি আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে?'

দেবাশিস চকিত চোখে তার পানে চাইল, ক্ষণেক নীরব থেকে বলল—'তোমার যদি ইচ্ছে না থাকে, আমার মন রাখার জন্যে সিনেমা দেখার দরকার নেই।'

'না, আমি দেখতে চাই।'

চায়ের পেয়ালা শেষ করে দেবাশিস উঠে দাঁড়াল—'বেশ, তা হলে নিয়ে যাব।'

দেবাশিস নিজের ঘরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে এমন সময় ঘরের কোণে টেলিফোন বাজল।

দীপার বুক আশঙ্কায় ধক্‌ধক্‌ করে উঠল। কার টেলিফোন!

দেবাশিস গিয়ে টেলিফোন ধরল—হ্যালো।'

অন্য দিক থেকে কে কথা বলছে, কী কথা বলছে, দীপা শুনতে পেল না, কেবল দেবাশিসের কথা একাগ্র হয়ে শুনতে লাগল, 'ও...কী খবর?...না, আজ বাড়িতেই আছি. না, শরীর ভাল আছে...এখন?...ও বুঝেছি, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি...না না, কষ্ট কিসের...আচ্ছা—'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে দেবাশিস কব্জির ঘড়ির দিকে তাকালো, আটটা বেজে গেছে। 'আমাকে একবার বেরুতে হবে। হেঁটেই যাব। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব।'

সে বেরিয়ে গেল। দীপা কোনো প্রশ্ন করল না; সে জানতে পারল না; দেবাশিস কোথায় যাচ্ছে। একলা বসে বসে ভাবতে লাগল, কে দেবাশিসকে টেলিফোন করেছিল?

দেবাশিস আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরল না। তারপর আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। নকুল নীচে থেকে এসে বলল—'হ্যাঁ বউদি, দাদাবাবু কোথায় গেল? কখন ফিরবে?'

দীপা বলল—'তা তো জানি না নকুল। কোথায় গেছেন বলে যাননি, শুধু বললেন আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরবেন।'

নকুল বলল—'আধ ঘণ্টা তো কখন কেটে গেছে। খাবার সময় হল। কখনো তো এমন দেরি করে না।' নকুল চিন্তিতভাবে বিজ্‌বিজ্‌ করতে করতে নীচে নেমে গেল।

একজনের উদ্বেগ অন্যের মনে সঞ্চারিত হয়। দীপার মনও উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল; নানারকম বাস্তব-অবাস্তব সম্ভাবনা তার মাথার মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

ন'টা বেজে পাঁচ মিনিটে টেলিফোন বেজে উঠতেই দীপা চমকে উঠে দাঁড়াল, ভয়ে ভয়ে গিয়ে টেলিফোন তুলে কানে ধরল, ক্ষীণস্বরে বলল—'হ্যালো।'

অপর প্রান্ত থেকে স্বর এল—'আমি। গলা শুনে চিনতে পারছ?'

দীপার গলার আওয়াজ আরো ক্ষীণ হয়ে গেল—'হ্যাঁ।'

'তোমার স্বামী বাড়িতে আছে?'

'না।'

'খবর সব ভাল?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার স্বামী কোনো গোলমাল করেনি?'

'না।'

'তুমি যেমন ছিলে তেমনি আছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম কাউকে বলনি?'

'না।'

'মা-কালীর নামে দিব্যি করেছ, মনে আছে?'

'আছে।'

''আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। সাবধানে থেকো। আবার টেলিফোন করব।'

দীপার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না, সে টেলিফোন রেখে আবার এসে বসল; মনে হল, তার দেহের সমস্ত প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে চেয়ারে পড়ে রইল।

সাড়ে ন'টার সময় নকুল আবার এসে বলল—'বউদি, দাদাবাবু এখনো এল না, আমার ভাল ঠেকছে না—'

এই সময় তৃতীয় বার টেলিফোন বাজল। দীপার মুখ সাদা হয়ে গেল; সে সমস্ত শরীর শক্ত করে উঠে গিয়ে ফোন ধরল। মেয়েলী গলার আওয়াজ শুনল—'হ্যালো, এটা কি দেবাশিস ভট্টের বাড়ি?'

দীপার বুক ধড়ফড় করে উঠল, সে কোনো মতে উচ্চারণ করল—'হ্যাঁ।'

'আপনি কি তাঁর স্ত্রী?'

'হ্যাঁ।'

'দেখুন, আমি হাসপাতাল থেকে বলছি। আপনি একবার আসতে পারবেন?

'কেন? কী হয়েছে?'

'ইয়ে—আপনার স্বামীর একটা অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে, তাঁকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। আপনি চট্ করে আসুন।'

দীপার মুখ থেকে বুক-ফাটা প্রশ্ন বেরিয়ে এল—'বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ। এই কিছুক্ষণ আগে জ্ঞান হয়েছে।'

'আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। কোন্ হাসপাতাল?'

'রাসবিহারী হাসপাতাল, এমারজেন্সি ওয়ার্ড।'

ফোন রেখে দিয়ে দীপা ফিরল; দেখল নকুল তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নকুল ব্যাকুল চোখে চেয়ে বলল—'বউদি—?'

নকুলের শঙ্কাবিবশ মুখ দেখে দীপা হঠাৎ নিজের হৃদয়টাও দেখতে পেল। আজকের দীপা আর দু' মাস আগের দীপা নেই, সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। তার মাথাটা একবার ঘুরে উঠল। তারপর সে দৃঢ়ভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—'তোমার দাদাবাবুর অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।'

নকুল আস্তে আস্তে মেঝের ওপর বসে পড়ল। দীপা বলল—'না নকুল, এ সময় ভেঙে পড়লে চলবে না। চল, এখুনি হাসপাতালে যেতে হবে।'

দীপা নকুলকে হাতে ধরে টেনে দাঁড় করালো।

অনুক্রম

ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু যখন হাসপাতালে পৌঁছুলেন তখন রাত্রি দশটা। হাসপাতালের দরদালানে লোক কমে গেছে। এক পাশে এক বেঞ্চিতে একটি যুবতী শরীর শক্ত করে বসে আছে, তার পায়ের কাছে জবুথবু হয়ে বসে আছে একটি বুড়ো চাকর। যুবতীর চোখে বিভীষিকাময় সম্ভাবনার আতঙ্ক।

একটি নার্স ব্যোমকেশকে দেখে এগিয়ে এল। রাখালবাবু বললেন—'থানা থেকে আসছি।'

'আসুন।' নার্স তাঁদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে বসাল। বলল—'একটু

বসুন, ডাক্তার গুপ্ত আপনাদেরই জন্য অপেক্ষা করছেন।'

নার্স চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে ডাক্তার গুপ্ত এলেন। মধ্যবয়স্ক মধ্যমাকৃতি মানুষ, বিশ বছর ধরে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেও ক্লান্ত হননি, বরং প্রাণশক্তি আরো বেড়েছে। রাখালবাবু নিজের এবং ব্যোমকেশের পরিচয় দিলে ডাক্তার হেসে বললেন—'আরে মশাই, আজ দেখছি অসাধারণ ঘটনা ঘটার দিন। ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গেও পরিচয় হল। বসুন, বসুন।'

তিনজনে বসলেন। রাখালবাবু বললেন—'ব্যাপার কি বলুন দেখি।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন—'আরে মশাই, আশ্চর্য ব্যাপার, অভাবনীয় ব্যাপার। আমি বিশ বছর ডাক্তারি করছি, এমন প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার দেখিনি। অবশ্য ডাক্তারি কেতাবে দু'-চারটে উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু স্বচক্ষে দেখা—কোটিকে গুটিক মিলে।'

ব্যোমকেশ হেসে বলল—'রহস্য নিয়েই আমার কারবার, আপনি আমাকেও অবাক করে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে, একটা মনের মতন রহস্য এতদিনে পাওয়া গেছে। আপনি গোড়া থেকে সব কথা বলুন।'

ডাক্তার বললেন—'বেশ, তাই বলছি। আজ রাত্রি সাড়ে আটটার সময় তিনটি ছোকরা একজন অজ্ঞান লোককে ট্যাক্সিতে নিয়ে এখানে এল। তারা রবীন্দ্র সরোবরে বেড়াতে গিয়েছিল, দেখল একটা গাছের তলায় বেঞ্চির পাশে মানুষ পড়ে আছে। দেশলাই জ্বেলে মানুষটাকে দেখল, তার পিঠের বাঁ দিকে শজারুর কাঁটা বিঁধে আছে। লোকটা কিন্তু মরেনি, অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ওদের মধ্যে একজন লোকটিকে চিনতে পারল, তাদের ফ্যাক্টরির মালিক দেবাশিস ভট্ট। তখন তারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে এল।

'ছোকরাকে টেবিলে শুইয়ে পরীক্ষা করলাম। শজারুর কাঁটা দিয়ে হত্যা করার কথা সবাই জানে; আমি ভাবলাম এ ক্ষেত্রে কাঁটা বোধ হয় হার্ট পর্যন্ত পৌঁছয়নি। কিন্তু হার্ট পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি—অবাক কাণ্ড। হার্ট নেই! তারপর বুকের ডান দিকে হার্ট খুঁজে পেলাম। প্রকৃতির খেয়ালে ছোকরা ডান দিকে হার্ট নিয়ে জন্মেছে।

'শজারুর কাঁটা হার্টকে বিঁধতে পারেনি বটে, কিন্তু বাঁ দিকের ফুসফুসে বিঁধেছে। সেটাও কম সিরিয়াস নয়। যতক্ষণ কাঁটা বিঁধে আছে ততক্ষণ রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে না, কিন্তু কাঁটা বার করলেই ফুসফুসের মধ্যে রক্তপাত হয়ে মৃত্যু হতে পারে।

'যা হোক, খুব সাবধানে পিঠ থেকে কাঁটা বার করলাম। ছ' ইঞ্চি লম্বা কাঁটা, তার দু'ইঞ্চি বাইরে বেরিয়ে ছিল, বাকিটা সোজা ফুসফুসের মধ্যে ঢুকেছিল। এই দেখুন সেই কাঁটা।'

ডাক্তার পকেট থেকে একটি শজারুর কাঁটা বার করে ব্যোমকেশের হাতে দিলেন। শজারুর কাঁটা অনেকেই দেখেছেন, সবিস্তারে বর্ণনার প্রয়োজন নেই। এই কাঁটাটি নরুনের মত সরু, কাঁচের কাঠির মত অনমনীয় এবং ডাক্তারি শল্যের মত তীক্ষ্ণাগ্র। মারাত্মক অস্ত্রটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ব্যোমকেশ রাখালবাবুর হাতে দিল, বলল—'তারপর বলুন।'

ডাক্তার বললেন—'কাঁটা বার করলাম। ছোকরার বরাত ভাল ফুসফুসের মধ্যে রক্তপাত হল না। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হল, নিজের ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে

স্ত্রীর কাছে খবর পাঠাতে বলল। তার পর তাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ালাম। ওর স্ত্রী যখন এল তখন ও ঘুমুচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলল--'বাইরে একটি মেয়ে বসে আছে, সেই কি—?'

ডাক্তার বললেন—'হ্যাঁ, দেবাশিসের স্ত্রী। ও স্বামীর কাছে থাকতে চায়, কিন্তু এখন তো তা সম্ভব নয়। ওকে বললাম, বাড়ি ফিরে যাও; কিন্তু ও যাবে না।'

'ওকে স্বামীর কাছে যেতে দেওয়া হয়েছিল?'

'একবার ঘরে গিয়ে স্বামীকে দেখে এসেছে। আমরা আশ্বাস দিয়েছি, আশঙ্কার বিশেষ কারণ নেই, তুমি বাড়ি যাও, কাল সকালে আবার এস। কিন্তু ও কিছুতেই যাবে না।'

ব্যোমকেশ উঠবার উপক্রম করে বলল—'আচ্ছা, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।'

ডাক্তার বললেন—'বেশ তো, দেখুন না। কিন্তু একটা কথা। ওর স্বামীকে কেউ খুন করবার চেষ্টা করেছিল এ কথা ওকে বলা হয়নি, বলা হয়েছে অ্যাক্-সিডেণ্টে বুকে চোট লেগেছে। আপনারাও তাই বলবেন। মেয়েটি এমনিতেই শক্ পেয়েছে, ওকথা শুনলে আরো বেশী শক্ পাবে।'

'না, বলব না।'

রাখালবাবু বললেন—শজারুর কাঁটা আমি রাখলাম। এই নিয়ে চারটে হল।'

দীপা বেঞ্চির ওপর ঠিক আগের মতই সোজা হয়ে বসে ছিল, ব্যোমকেশ আর রাখালবাবু তার কাছে যেতেই সে উঠে দাঁড়াল। রাখালবাবু বললেন 'আমি পুলিসের লোক। ইনি শ্রীব্যোমকেশ বক্সী।'

ব্যোমকেশের নাম দীপার মনে কোনো দাগ কাটল না। তার শঙ্কাভরা চোখ একবার এর মুখে একবার ওর মুখে যাতায়াত করতে লাগল।

ব্যোমকেশ নরম সুরে বলল—'আপনি ভয় পাবেন না। আপনার স্বামীর গুরুতর আঘাত লেগেছিল বটে, কিন্তু জীবনের আশঙ্কা আর নেই।

দীপা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বোধ করি নিজেকে সংযত করল। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় বলল—'আমাকে ও ঘরে থাকতে দিচ্ছে না কেন?'

ব্যোমকেশ বলল 'দেখুন, আপনার স্বামীকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে এ সময় আপনি তাঁর কাছে থেকে কী করবেন? তার চেয়ে—'

দীপা বলল--না, আমাকে যদি ওঁর কাছে থাকতে না দেওয়া হয়, আমি সারা রাত্রি এখানে বসে থাকব।'

ব্যোমকেশ বলল—'কিন্তু রুগীর ঘরে ডাক্তার আর নার্স ছাড়া এসময় অন্য কারুর থাকা নিষেধ।'

দীপা বলল—'আমি কিচ্ছু করব না, খাটের একপাশে চুপটি করে বসে থাকব।'

ব্যোমকেশ আরো কিছুক্ষণ দীপাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাকে টলাতে পারল না। তখন সে মাথা চুলকে বলল—'আচ্ছা, ডাক্তারবাবুকে বলে দেখি। দেবাশিসবাবুর কি অন্য কোনো আত্মীয় এখানে নেই?'

'না ওঁর অন্য কোনো আত্মীয় নেই।'

'আপনার নিশ্চয় আত্মীয়স্বজন আছেন। তাঁরা কোথায় থাকেন, তাঁদের খবর দেওয়া হয়েছে?'

দীপা বলল—'তাঁরা কাছেই থাকেন, কিন্তু তাঁদের খবর দিতে ভুল হয়ে গেছে।'

ব্যোমকেশ বলল—'ঠিকানা দিন, আমরা তাঁদের খবর দিচ্ছি।'

দীপা ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দিল। ব্যোমকেশ তখন ডাক্তার গুপ্তের কাছে ফিরে গিয়ে বলল—'ডাক্তারবাবু, বউটিকে স্বামীর কাছে থাকতে দিন। ও বুদ্ধিমতী বলেই মনে হল, কিন্তু বড় ভয় পেয়েছে।'

ডাক্তারবাবু দু' একবার আপত্তি করলেন, স্ত্রীজাতি বড় ভাবপ্রবণ, আবেগের বশে যদি স্বামীকে আঁকড়ে ধরে, ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী হলেন। ব্যোমকেশ দীপাকে ডেকে এনে যে ঘরে দেবাশিস ছিল সেই ঘরে নিয়ে গেল। দীপা পা টিপে টিপে গিয়ে খাটের পাশে দাঁড়াল, সামনের দিকে ঝুঁকে ব্যগ্র চোখে দেবাশিসের মুখ দেখল। দেবাশিস পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, তার মুখের ভাব শান্ত প্রসন্ন। দীপা তার মুখের ওপর চোখ রেখে অতি সন্তর্পণে খাটের পাশে বসল। একজন নার্সও সঙ্গে এসেছিল, সে ঠোঁটে আঙুল রেখে দীপাকে সতর্ক করে দিল।

রাত্রি এগারোটার সময় হাসপাতাল থেকে বেরুবার পথে রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে চাইলেন—'বউটির বাপের বাড়িতে টেলিফোন করতে হবে।'

ব্যোমকেশ বলল—'না, সশরীরে সেখানে উপস্থিত হওয়া দরকার। আজ রাত্রে তোমার বিশ্রাম নেই।'

রাখালবাবু বললেন—'আমি বিশ্রামের জন্যে ব্যস্ত নই।

পুলিসের গাড়িতে দীপার বাপের বাড়িতে পৌঁছুতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। রাস্তা নিরালা, বাড়ির সদর দোর বন্ধ। রাখালবাবু সজোরে কড়া নাড়লেন। কিছুক্ষণ পরে বিজয় ঘুম-চোখে দরজা একটু ফাঁক করে বলল 'কে? কি চাই?'

রাখালবাবু বললেন—'ভয় নেই, দোর খুলুন। আমরা পুলিসের লোক।'

ইতিমধ্যে নীলমাধব উপস্থিত হয়েছেন। বিজয় দোর খুলে দিল, রাখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ভিতরে এসে প্রশ্ন করলেন—'দেবাশিস ভট্ট আপনাদের কে?'

নীলমাধব বললেন—'আমার জামাই। কি হয়েছে?'

রাখালবাবু বললেন—'একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে, আপনার জামাই বুকে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আছেন। আপনার মেয়েও খবর পেয়ে সেখানে গিয়েছেন।'

নীলমাধব বললেন—'অ্যাঁ! কোন্ হাসপাতালে?'

'রাসবিহারী হাসপাতালে। ভয় পাবেন না, আঘাত গুরুতর হলেও জীবনের আশঙ্কা নেই।'

'আমরা এখনি যাচ্ছি। বিজয়, তুমি এদের বসাও, আমি তোমার মা'কে নিয়ে যাচ্ছি।'

তিনি ছুটে বাড়ির ভিতর চলে গেলেন। ব্যোমকেশ বিজয়কে প্রশ্ন করল—'দেবাশিসবাবু আপনার ভগিনীপতি?'

'হ্যাঁ। আমিও হাসপাতালে যাব।'

'না। আপনার সঙ্গে আমাদের একটু আলোচনা আছে।'

খানিক পরে নীলমাধব আধ-ঘোমটা টানা স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

রাখালবাবু বললেন—'আপনারা পুলিসের গাড়িতেই যান। গাড়ি আপনাদের পেঁৗছে দিয়ে ফিরে আসবে। ততক্ষণ আমরা এখানেই আছি।'

তাঁদের রওনা করে দিয়ে তিনজনে বৈঠকখানায় এসে বসলেন। ব্যোমকেশ বিজয়কে প্রশ্ন করল—'আপনার বোনের কত দিন বিয়ে হয়েছে?'

বিজয় বলল—'দু'মাসের কিছু বেশী।'

আপনার ভগিনীপতি কী কাজ করেন?'

বিজয় 'প্রজাপতি প্রসাধন ফ্যাক্টরি'র কথা বলল।

'তাঁর আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?'

'যতদূর জানি, কেউ নেই!'

'বন্ধুবান্ধব?'

'অন্য বন্ধুবান্ধবের কথা জানি না, কিন্তু নৃপতিদার আড্ডায় যারা যায় তাদের সঙ্গে দেবাশিসের ঘনিষ্ঠতা আছে।' নৃপতি লাহার আড্ডার পরিচয় দিয়ে বিজয় বলল—'কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন?'

ব্যোমকেশ একবার রাখালবাবুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে বলল—'আপনাকে বলছি, আপনি উপস্থিত অন্য কাউকে বলবেন না. দেবাশিসবাবুকে কেউ খুন করবার চেষ্টা করেছিল।'

বিজয়ের চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠল, সে উত্তেজিত হয়ে বলল—'আমি জানতাম।'

ব্যোমকেশের দৃষ্টি তীক্ষ্ন হয়ে উঠল—'কী জানতেন?'

'জানতাম যে. এই ঘটবে।'

'জানতেন এই ঘটবে! কী জানতেন সব কথা বলুন।'

উত্তেজনার ঝোঁকে কথাটা বলে ফেলেই বিজয় থমকে গেল। আর কিছু বলতে চায় না. এ-কথা সে-কথা বলে আসল কথাটা চাপা দিতে চায়। ব্যোমকেশ তখন গম্ভীরভাবে বলল—'দেখুন. দেবাশিসবাবুর শত্রু তাঁকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল. দৈবক্রমে তাঁর প্রাণ বেঁচে গেছে। আপনি যদি আসামীকে আড়াল করবার চেষ্টা করেন তা হলে সে আবার চেষ্টা করবে। আপনি কি চান, আপনার বোন বিধবা হন?'

তখন বিজয় বলল—'আমি যা জানি বলছি। কিন্তু কে আসামী. আমি জানি না।'

বিজয় দীপার প্রেম-কাহিনী শোনাল। শুনে ব্যোমকেশ একটু চুপ করে রইল, তারপর বলল—মনে হয়, আপনার বোনের ছেলেমানুষী ভালবাসার নেশা কেটে গেছে। আচ্ছা, আজ আমরা উঠলাম। কাল বিকেলবেলা আমরা নৃপতিবাবুর বাড়িতে যাব। আপনিও উপস্থিত থাকবেন।'

ইতিমধ্যে পুলিসের গাড়ি ফিরে এসেছিল। ব্যোমকেশ গাড়িতে উঠে রাখালবাবুকে বলল—'আজ এই পর্যন্ত। কাল সকালে আবার হাসপাতালে যাব।'

হাসপাতালে রাত্রি আড়াইটের সময় দেবাশিসের ঘুম ভাঙল। চোখ চেয়ে দেখল, একটি মুখ তার মুখের পানে ঝুঁকে অপলক চেয়ে আছে। ভারি মিষ্টি মুখখানি। দেবাশিস আস্তে আস্তে বলল—'দীপা, কখন এলে?'

দীপা উত্তর দিতে পারল না, দেবাশিসের কপালে কপাল রেখে চুপ করে রইল।

'দীপা!'

'উঁ'

'ক্ষিদে পেয়েছে।'

দীপা ত্বরিত মাথা তুলল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, নার্স ঘরে প্রবেশ করছে। নার্স ইতিপূর্বে আরো কয়েকবার ঘরে এসে রুগীকে দেখে গেছে। বলল—'কি খবর? ঘুম ভেঙেছে?'

দীপা বলল—'হ্যাঁ। বলছেন, ক্ষিদে পেয়েছে।'

নার্স হেসে বলল—'বেশ। আমি ওভালটিন তৈরি করে রেখেছি, এখনি আনছি। আগে একবার নাড়ীটা দেখি।' নাড়ী দেখে নার্স বলল—'চমৎকার! আমি এই এলুম বলে।'

নার্সের সঙ্গে সঙ্গে দীপা দোর পর্যন্ত গেল। নকুল তখনো দোরের পাশে বসেছিল, উঠে দাঁড়াল। বলল- 'বউদি, দাদাবাবু খেতে চাইছে?'

দীপা বলল—'হ্যাঁ।'

'জয় জগদীশ্বর! তা হলে আর ভয় নেই। বউদি, তুমিও তো কিছু খাওনি। তোমার ক্ষিদে পায়নি?'

দীপা একটু চুপ করে থেকে বলল—'পেয়েছে। নকুল, তুমি বাড়ি যাও। নিজে খেয়ো, আর আমার জন্যে কিছু নিয়ে এসো।'

'আচ্ছা বউদি।'

নকুল চলে গেল। নার্স ফীডিং কাপে ওভালটিন এনে দেবাশিসকে খাওয়াল। তারপর দেবাশিস তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে দীপার একটি হাত মুঠির মধ্যে নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হলে দীপার মা বাবা বিজয় সকলে আবার এলেন। দেবাশিস তখন ঘুমোচ্ছে। দীপার মা দীপাকে বললেন -দীপা, আমরা এখানে আছি, তুই বাড়ি যা, সেখানে স্নান করে একটু কিছু মুখে দিয়ে আবার আসিস।'

দীপা দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলল—'না। নকুল আমার জন্যে খাবার এনেছিল, আমি খেয়েছি।'

বেলা আন্দাজ দশটার সময় ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু হাসপাতালে এলেন। ডাক্তার গুপ্ত একগাল হেসে বললেন—'ভাল খবর। ছোকরা এ যাত্রা বেঁচে গেল। সকালে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তবু এখনো অন্তত দু'তিন দিন হাসপাতালে থাকতে হবে।'

রাখালবাবু বললেন—ভাল। আমরা তা হলে তার সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

ডাক্তার বললেন—'পারেন। কিন্তু দশ মিনিটের বেশী নয়।'

ব্যোমকেশ বলল—'আপাতত দশ মিনিটই যথেষ্ট।'

দেবাশিস তখন পাশ ফিরে বিছানায় শুয়ে ছিল, আর দীপা তার মুখের কাছে ঝুকে চুপি চুপি কথা বলছিল। ব্যোমকেশ আর রাখালবাবুকে আসতে দেখে লজ্জিতভাবে উঠে দাঁড়াল।

ব্যোমকেশ স্মিতমুখে দীপাকে বলল—'আপনি কাল থেকে এখানে আছেন,

একবার অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্যে যেতে হবে। আমরা ততক্ষণ দেবাশিসবাবুর কাছে আছি।'

দেবাশিস ক্ষীণকন্ঠে বলল—'আমিও তো সেই কথাই বলছি।'

দীপা একটু ইতস্তত করল, তারপর অনিচ্ছা-ভরে ঘরে থেকে বেরিয়ে গেল। বলে গেল—'আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসব।'

ব্যোমকেশ আর রাখালবাবু তখন দেবাশিসের সামনে চেয়ার টেনে বসলেন, রাখালবাবু নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন—'আমরা আপনাকে দু'চারটি প্রশ্ন করব।'

দেবাসিশ বলল—'বেশ তো, করুন।'

অতঃপর প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হল।

'আপনি কাল সন্ধ্যের পর লেকে বেড়াতে গিয়েছিলেন?'

'ঠিক বেড়াতে যাইনি, তবে গিয়েছিলাম।'

'কেন গিয়েছিলেন?'

'একজন বন্ধু টেলিফোন করে ডেকেছিল।'

'কে বন্ধু? নাম কি?'

'খড়্গ বাহাদুর।'

খড়্গ বাহাদুর! নেপালী নাকি?'

'হ্যাঁ। নাম-করা ফুটবল খেলোয়াড়।'

'ও সেই! তা লেকের ধারে ডেকেছিল কেন?'

'ব্যক্তিগত কারণ। যদি না বললে চলে—'

'চলবে না। বলুন।'

'ওর কিছু টাকার দরকার হয়েছিল, তাই আমার কাছে ধার চাইবার জন্য ডেকেছিল।'

'আপনার বাড়িতে আসেনি কেন?'

'তা জানি না। বোধ হয় বাড়িতে আসতে সংকোচ হয়েছিল, যদি কেউ জানতে পারে।'

'হুঁ। কত টাকা চেয়েছিল?'

'এক হাজার।'

'আপনি টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'না না, খড়্গ টেলিফোনে টাকার কথা বলেনি। শুধু বলেছিল জরুরী দরকার আছে।'

'তারপর?'

গিয়ে দেখলাম, সে বড় ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে; দু'জনে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসলাম। খড়্গ টাকার কথা বলল; আমি রাজী হলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর খড়্গ চলে গেল, তার অন্য একজনের সঙ্গে দেখা করবার ছিল। আমি একলা বসে রইলাম। হঠাৎ পিঠে দারুণ যন্ত্রণা হল। তারপর আর মনে নেই।'

'পিছন দিকে কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন?'

'না।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে তাকালেন। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল—'আপনার

হৃৎপিণ্ড যে শরীরের ডান দিকে একথা আপনার স্ত্রী নিশ্চয় জানেন?'

দেবাশিস চোখ বুজে একটু চুপ করে রইল, শেষে বলল—'না, ও বোধ হয় জানে না।'

'আপনার বন্ধুরা জানেন?'

'না, আমার বন্ধু বড় কেউ নেই, সহকর্মী আছে। সম্প্রতি মাস দুয়েক থেকে আমি নৃপতিদার বাড়িতে যাই, সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে।'

'নৃপতিবাবুর বাড়ির বন্ধুরা কেউ জানে?'

'না।'

'কেউ জানে না?'

'বাবা জানতেন আর ডাক্তারবাবুরা জানেন।'

'এমন কেউ আছে আপনার মৃত্যুতে যার লাভ হবে?'

'কেউ না।'

'আচ্ছা, আজ আর আপনাকে বেশী প্রশ্ন করব না। আপনি সেরে উঠুন, তারপর যদি দরকার হয় তখন দেখা যাবে।'

সন্ধ্যের পর নৃপতির ঘরে আড্ডাধারীরা সকলেই উপস্থিত হয়েছিল। বিজয়ও ছিল। সকলের মুখেই উদ্বেগের গাম্ভীর্য। আজ প্রবাল পিয়ানো বাজাচ্ছে না, তক্তপোশের ওপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে। বিজয়ের মুখে দেবাশিসের কথা শোনার পর সকলেই মুহ্যমান। খবরেব কাগজের দুঃসংবাদ হঠাৎ নিজের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রবাল মুখ তুলে প্রশ্ন করল— ব্যোমকেশ বক্সী কে?'

কপিল মুখের একটা ব্যঙ্গ-বঙ্কিম ভঙ্গী করল। বিজয় উত্তর দেবার জন্যে মুখ খুলল কিন্তু উত্তর দেবার দরকার হল না, সদর দরজার বাইরে জুতোর শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু প্রবেশ করলেন।

সকলে উঠে দাঁড়াল। নৃপতি এগিয়ে গিয়ে বলল- আসুন, আমরা আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। আমার নাম নৃপতি লাহা। এ'রা -' নৃপতি একে একে কপিল, প্রবাল, সুজন ও খঙ্গ বাহাদুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, তারপর চেয়ারে বসিয়ে সিগারেট দিল--'বিজয়ের মুখে আমরা সবই শুনেছি।'

ব্যোমকেশ একটু ভর্ৎসনার চোখে বিজয়ের পানে চাইল, বিজয় কুণ্ঠিতভাবে বলল -'হ্যাঁ ব্যোমকেশবাবু, এরা ছাড়ল না, শজারুর কাঁটার কথা এদের বলেছি।'

খঙ্গ বাহাদুর বলল -'আচ্ছা ব্যোমকেশবাবু, এই যে শজারুর কাঁটা নিয়ে ব্যাপার, এটা কী? আপনার কি মনে হয় এসব একটা পাগলের কাজ?'

ব্যোমকেশ বলল—'পাগলের কাজ হতে পারে, আবার পাগল সাজার চেষ্টাও হতে পারে।'

সুজন বলল—'সেটা কিরকম?'

ব্যোমকেশ বলল—'পাগল সাজলে অনেক সময় খুনের দায়ে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বড় জোর পাগলা গারদে বন্ধ করে রাখে, ফাঁসি হয় না, এই আর কি। আপনারা দেবাশিসবাবুর বন্ধু, তাঁর জীবন সম্বন্ধে নিশ্চয় অনেক কিছু জানেন।'

নৃপতি বলল—'দেবাশিসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশী দিনের নয়।

আমাদের মধ্যে কেবল প্রবাল তাকে আগে থেকে চিনত।' বলে প্রবালের দিকে আঙুল দেখাল।

ব্যোমকেশ প্রবালের দিকে চাইল। প্রবাল গলা পরিষ্কার করে বলল—'স্কুলে দেবাশিসের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছিলাম। তার সঙ্গে পরিচয় ছিল কিন্তু বন্ধুত্ব ছিল না।'

বন্ধুত্ব ছিল না!'

'বন্ধুত্ব ছিল না, অসদ্ভাবও ছিল না। তারপর ও পাস করে দিল্লী চলে গেল, অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। মাস দু-এক আগে এই ঘরে তাকে আবার দেখলাম।'

'ও'– ব্যোমকেশ সিগারেটে দু' তিনটে টান দিয়ে খঙ্গা বাহাদুরের দিকে চোখ ফেরাল। বলল—'কাল রাত্রে আন্দাজ আটটার সময় আপনি দেবাশিসবাবুকে টেলিফোন করেছিলেন?'

খঙ্গা বাহাদুর বোধ হয় প্রশ্নটার প্রতীক্ষা করছিল, সংযত স্বরে বলল—হ্যাঁ।'

'কোথা থেকে টেলিফোন করেছিলেন?'

'এখান থেকে। নৃপতিদার টেলিফোন আছে। আমরা সকলেই দরকার হলে ব্যবহার করি। কাল আমরা সকলেই এখানে ছিলাম, দেবাশিস ছাড়া। তার আশায় অনেকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করলাম। কিন্তু সে যখন এল না তখন তাকে টেলিফোন করেছিলাম।'

'তারপর লেকে দেখা হয়েছিল। এখন একটা কথা বলুন দেখি, আপনি যখন দেবাশিসবাবুকে ছেড়ে চলে আসেন তখন আশেপাশে কাউকে দেখেছিলেন?'

'দেখে থাকলেও লক্ষ করিনি। আমরা একটা গাছের তলায় বেঞ্চিতে বসেছিলাম। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, লোকজন বেশী ছিল না।'

ব্যোমকেশ তখন নৃপতিকে বলল—'আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। আমরা আপনাদের পৃথকভাবে প্রশ্ন করতে চাই। আমরা একটা ঘরে গিয়ে বসব, আর আপনারা একে একে আসবেন। ছোট একটা ঘর পাওয়া যাবে কি?'

নৃপতি বলল—'পাশেই ছোট ঘর আছে, আসুন দেখাচ্ছি।'

পরদা-ঢাকা দরজা দিয়ে নৃপতি তাদের পাশের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটি ছোট, কয়েকটি চেয়ারের মাঝখানে একটি গোল টেবিল, টেবিলের ওপর টেলিফোন যন্ত্র।

ব্যোমকেশ বলল—'এই তো ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম। রাখাল, তুমি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত কর। নৃপতিবাবু, আপনি বাকি সকলকে বসতে বলে আসুন। আগে আপনার জেরা শেষ করে একে একে ওঁদের ডাকব।'

ছোট্ট ঘরটিতে এজলাস বসল। প্রশ্নোত্তর চলল। চাকর কফি দিয়ে গেল। একে একে সকলে সাক্ষী দিল। সকলের শেষে এল বিজয়। ব্যোমকেশ তাকে বলল—'বিজয়বাবু, আপনার বোনের আইবুড়ো বেলার বই-খাতা জিনিসপত্র নিশ্চয় এখনো আপনাদের বাড়িতে আছে? বেশ। কাল আমরা যাব, একটু নেড়ে-চেড়ে দেখব যদি দরকারী কিছু পাওয়া যায়।'

বিজয় বলল—'আচ্ছা।'

অতঃপর সভা ভঙ্গ হল। দশটা বাজতে তখন বেশী দেরি নেই।

পরদিন সকাল আটটার সময় বিজয় নিজেদের বাড়িতে অপেক্ষা করছিল, ব্যোমকেশ আর রাখালবাবু আসতেই তাঁদের দোতলায় দীপার ঘরে নিয়ে গেল। বলল—'এইটে দীপার ঘর। এই ঘরেই তার যা কিছু আছে, বিশেষ কিছু নিয়ে যায়নি।'

বেশ বড় ঘর। জানলার পাশে খাট বিছানা, অন্য পাশে টেবিল চেয়ার বই-এর আলমারি। পিছনের দেয়ালে একটি এস্রাজ ঝুলছে। টেবিলের মাঝখানে ছোট্ট একটি জাপানী ট্রান্‌জিস্টার রাখা আছে। ব্যোমকেশ ঘরের চারদিকে একবার সন্ধানী চোখ ফিরিয়ে বলল—'দীপা দেবীর দেখছি গানবাজনার শখ আছে।'

বিজয় বলল—'হ্যাঁ, একটু-আধটু এস্রাজ বাজাতেও জানে। নিজের চেষ্টাতে শিখেছে।'

'লেখাপড়া কত দূর শিখেছেন?'

স্কুলের পড়া শেষ পর্যন্ত পড়েছে। কলেজে দেওয়া হয়নি।'

'আপনার বাবা বাড়িতে আছেন?'

'না। বাবা মা হাসপাতালে গেছেন।'

'দেবাশিসবাবু ভাল আছেন। আমি টেলিফোনে খবর নিয়েছিলাম। বোধ হয় দু-তিন দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে।'

হ্যাঁ। আপনারা চা খাবেন?'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর দিকে একবার তাকিয়ে বলল—'আপত্তি কি? একবার হয়েছে, কিন্তু অধিকন্তু ন দোষায়।'

'আচ্ছা, আমি চা নিয়ে আসছি, আপনারা দেখুন। বই-এর আলমারির চাবি খুলে দিয়েছি। খাটের তলায় দুটো ট্রাঙ্ক আছে, তার চাবিও খোলা।'

বিজয় বেরিয়ে যাবার পর ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে বলল—'ঘরে তল্লাশ করার মত বিশেষ কিছু নেই দেখছি। আমি বই-এর আলমারিটা দেখি, তুমি ততক্ষণ ট্রাঙ্ক দুটো হাঁটকাও।'

রাখালবাবু খাটের তলা থেকে ট্রাঙ্ক দুটো টেনে বার করলেন, ব্যোমকেশ আলমারি খুলে বই দেখতে লাগল। বইগুলি বেশ পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো; প্রথম সারিতে কবিতা আর গানের বইঃ সঞ্চয়িতা গীতবিতান দ্বিজেন্দ্রগীতি নজরুল-গীতিকা প্রভৃতি। দ্বিতীয় থাকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কয়েক ভল্যুম গ্রন্থাবলী। নীচের থাকে স্কুল-পাঠ্য বই। দীপা স্কুলে পড়ার সময় যে বইগুলি পড়েছিল সেগুলি যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে।

ব্যোমকেশ বইগুলি একে একে খুলে দেখল, কিন্তু কোথাও এমন কিছু পেল না যা থেকে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আধুনিক কোনো লেখকের বই আলমারিতে নেই, এমন কি শরৎচন্দ্রের বইও না; এ থেকে পারিবারিক গোঁড়ামির পরিচয় পাওয়া যায়, দীপার মানসিক প্রবণতার কোনো ইশারা তাতে নেই।

'ব্যোমকেশদা, একবার এদিকে আসুন।'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি একটা খোলা ট্রাঙ্কের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন, সামনে মেয়েলী জামাকাপড়ের স্তূপ, হাতে পোস্টকার্ড আয়তনের একটি সুদৃশ্য বাঁধানো খাতা। খাতাটি ব্যোমকেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে রাখালবাবু বললেন—'কাপড়-চোপড়ের তলায় ছিল। পড়ে দেখুন।'

অটোগ্রাফের খাতা। বেশীর ভাগ পাতাই খালি, সামনের কয়েকটি পাতায়

উদয়মাধব প্রভৃতি বাড়ির কয়েকজনের হস্তাক্ষর, দু'-একটি মেয়েলী কাঁচা হাতের নাম দস্তখত। তারপর একটি পাতায় একজনের স্বাক্ষরের ওপর একটি কবিতার ভগ্নাংশ—তোমার চোখের বিজলী-উজল আলোকে, পরাণে আমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে।—তারপর আর সব পৃষ্ঠা শূন্য।

অটোগ্রাফের খাতাটি যে দীপার তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, মলাটের ওপরেই তার নাম লেখা রয়েছে।

যিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা একটু মোচড় দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন তাঁর নামটি অপরিচিত নয়. তিনি বিশেষ একটি আড্ডার নিয়মিত সভ্য।

ব্যোমকেশ খাটো গলায় বলল—'হুঁ! আমাদের সন্দেহ তা হলে মিথ্যে নয়।'

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ব্যোমকেশ চট্ করে অটোগ্রাফের খাতাটি পকেটে পুরে রাখালবাবুকে চোখের ইশারা করল।

বিজয় দু'হাতে দু' পেয়ালা চা নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখল, বলল—'আসুন। কিছু পেলেন?'

রাখালবাবু কেবল গলার মধ্যে শব্দ করলেন. ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল—'সত্যান্বেষণের পথ বড় দুর্গম। কোথায় কোন কানা গলির মধ্যে সত্য লুকিয়ে আছে. কে বলতে পারে! যা হোক নিরাশ হবেন না. দু'চার দিনের মধ্যেই আসামী ধরা পড়বে।'

তারপর দু'জনে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় যেতে যেতে রাখালবাবু বললেন—'তা হলে এখন বাকি রইল শুধু আসামীকে গ্রেপ্তার করা। অবশ্য পাকা রকম সাক্ষী-সাবুদ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে পাকড়ানো যাবে না।'

ব্যোমকেশ বলল—'না, তাকে পাকড়াবার একটা ফন্দি বার করতে হবে। কিন্তু তার আগে নিঃসংশয়ভাবে জানা দরকার. দেবাশিসের স্ত্রী এ ব্যাপারে কতখানি লিপ্ত আছে।'

হাসপাতালে ডাক্তার গুপ্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। একটি নিভৃত ঘরে দীপার সঙ্গে ব্যোমকেশ ও রাখালবাবুর কথা হল। ব্যোমকেশ বলল—'আমরা আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। কেন প্রশ্ন করতে চাই এখন জানতে চাইবেন না, পরে আপনিই জানতে পারবেন।'

দীপা সহজভাবে বলল—'কি জানতে চান, বলুন।' তার মুখে আতঙ্কের ভাব আর নেই, সে তার স্বাভাবিক সাহস অনেকটা ফিরে পেয়েছে।

সওয়াল জবাব আরম্ভ হল। রাখালবাবু অচঞ্চল চোখে দীপার মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

ব্যোমকেশ বলল—'নৃপতি লাহা নামে একটি ভদ্রলোকের বাড়িতে যাঁদের নিয়মিত আড্ডা বসে তাঁদের আপনি চেনেন?'

দীপার চোখের দৃষ্টি সতর্ক হল, সে বলল—'হ্যাঁ, চিনি। ওঁরা সবাই আমার দাদার বন্ধু।'

'ওঁরা আপনার বাপের বাড়িতে যাতায়াত করেন?'

'বাড়িতে কাজকর্ম থাকলে আসেন।'

'এঁদের নাম নৃপতি লাহা, সুজন মিত্র, কপিল বসু, প্রবাল গুপ্ত, খগ

বাহাদুর। এঁদের ছাড়া আর কাউকে চেনেন?'

'না, কেবল এঁদেরই চিনি।'

'আচ্ছা, নৃপতি লাহা বিপত্নীক আপনি জানেন?'

'...যেন শুনেছিলাম।'

'এঁদের মধ্যে আর কারুর বিয়ে হয়েছে কিনা জানেন?'

'বোধ হয়...আর কারুর বিয়ে হয়নি।'

'প্রবাল গুপ্ত কি বিবাহিত?'

'ঠিক জানি না...বোধ হয় বিবাহিত নয়।'

'প্রবাল গুপ্ত বিবাহিত...সম্প্রতি স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে।'

'...আমি জানতাম না।'

যাক। কপিল বসু লোকটিকে আপনার কেমন লাগে?'

'ভালই তো।'

'ওর সম্বন্ধে কোনো কুৎসা শুনেছেন?'

'না।'

'আর সুজন মিত্র? সে সিনেমার আর্টিস্ট, তার সম্বন্ধে কিছু শোনেননি?'

'না, ও-সব আমি কিছু শুনিনি।'

'আপনি সিনেমা দেখতে ভালবাসেন?'

'হ্যাঁ।'

'সুজন মিত্রের অভিনয় কেমন লাগে?'

'খুব ভাল।'

'উনি কেমন লোক?'

'দাদার বন্ধু, ভালই হবেন। দাদা মন্দ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন না।'

'তা বটে। আপনি ফুটবল খেলা দেখেছেন?'

'ছেলেবেলায় দেখেছি, যখন স্কুলে পড়তুম।'

'খুদে বাহাদুরের খেলা দেখেছেন?'

'না...রেডিওতে খেলার কমেন্টারি শুনেছি।'

'এবার শেষ প্রশ্ন।—আপনার স্বামীর হৃদ্‌যন্ত্র বুকের ডান দিকে আপনি জানেন?'

'জানি।'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলে চাইল—'জানেন?'

হ্যাঁ, কিছুদিন আগে দুপুর রাত্রে আমার স্বামীর কম্প দিয়ে জ্বর এসেছিল। আমাকে ডাক্তার ডাকতে বললেন। আমি জানতুম না ওঁদের পারিবারিক ডাক্তার কে, তাই আমার বাপের বাড়ির ডাক্তারকে ফোন করলাম। সেনকাকা এসে ওঁকে পরীক্ষা করলেন, তারপর যাবার সময় আমাকে আড়ালে বলে গেলেন যে ওঁর হৃদ্‌যন্ত্র উল্টো দিকে। এরকম নাকি খুব বেশী দেখা যায় না।'

প্রকাণ্ড হাঁফ-ছাড়া নিশ্বাস ফেলে ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়াল, বলল—'আমার বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। আর কিছু জানবার নেই, আপনি স্বামীর কাছে যান।—চলো রাখাল।'

হাসপাতালের বাইরে এসে ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে প্রশ্ন করল—'কি দেখলে? কি বুঝলে?'

রাখালবাবু বললেন—'কোনো ভুল নেই, মেয়েটি নির্দোষ। প্রতিক্রিয়া যখন যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, ঠিক তেমনটি পাওয়া গেছে। এখন কিং কর্তব্য?'

ব্যোমকেশ বলল—'এখন তুমি থানায় যাও, আমি বাড়ি যাই। ভাল কথা, একটা বুলেট-প্রুফ গেঞ্জি যোগাড় করতে পার?'

'পারি। কী হবে?'

'একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। আজ রাত্রে গেঞ্জি নিয়ে আমার বাড়িতে এসো, তখন বলব।'

সন্ধ্যের পর ব্যোমকেশ একা নৃপতির আড্ডায় গেল। সকলেই উপস্থিত ছিল, ব্যোমকেশকে ছেঁকে ধরল। নৃপতি তার সামনে সিগারেটের কৌটো খুলে ধরে বলল—'খবর নিয়েছি দু' এক দিনের মধ্যেই দেবাশিসকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। ওর বিপন্মুক্তি উপলক্ষে আমি পার্টি দেব, আপনাকে আসতে হবে।'

ব্যোমকেশ বলল—'নিশ্চয় আসব।'

কপিল ব্যোমকেশের গা ঘেঁষে বসে আবদারের সুরে বলল—'আপনার সত্যান্বেষণ কত দূর অগ্রসর হল, বলুন না ব্যোমকেশবাবু।'

ব্যোমকেশ হেসে বলল—'দিল্লী দূরস্ত। শজারুর কাঁটার ওস্তাদটি কে তা এখনো জানা যায়নি। তবে একটা থিওরী খাড়া করেছি।'

সুজন গলা বাড়িয়ে বলল—'কি রকম থিওরী?'

ব্যোমকেশ সিগারেটে কয়েকটা ধীর মন্থর টান দিয়ে বলতে আরম্ভ করল—'ব্যাপারটা হচ্ছে এই। কোনো একজন অজ্ঞাত লোক শজারুর কাঁটা দিয়ে প্রথমে একটা ভিখিরিকে খুন করল, তারপর এক মজুরকে খুন করল, তারপর আবার খুন করল এক দোকানদারকে। এবং সর্বশেষে দেবাশিসবাবুকে খুন করবার চেষ্টা করল। চার বারই অস্ত্র হচ্ছে শজারুর কাঁটা। অর্থাৎ হত্যাকারী জানাতে চায় যে চারটি হত্যাকার্য একই লোকের কাজ।

'এখন হত্যাকারী যদি পাগল হয় তাহলে কিছুই করবার নেই। পাগল অনেক রকম হয়; এক ধরনের পাগল আছে যাদের পাগল বলে চেনা যায় না; তারা অত্যন্ত ধূর্ত, তাদের খুন করার কোনো যুক্তিসঙ্গত মোটিভ থাকে না। এই ধরনের পাগলকে ধরা বড় কঠিন।

'কিন্তু যদি পাগল না হয়? যদি পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্যে কেউ পাগল সেজে শজারুর কাঁটার ফন্দি বার করে থাকে? মনে করুন, দেবাশিসবাবুর এমন কোনো গুপ্ত শত্রু আছে যে তাঁকে খুন করতে চায়। সরাসরি খুন করলে ধরা পড়ার ভয় বেশী, তাই সে ভিখিরি খুন করে কাজ আরম্ভ করল; তারপর মজুর, তারপর দোকানদার, তারপর দেবাশিসবাবু। স্বভাবতই মনে হবে দেবাশিসবাবু হত্যাকারীর প্রধান লক্ষ্য নয়, একটা বিকৃতমস্তিষ্ক লোক যখন যাকে সুবিধে পাচ্ছে খুন করে যাচ্ছে। হত্যাকারী যে দেবাশিসবাবুকেই খুন করবার জন্যে এত ভণিতা করেছে তা কেউ বুঝতে পারবে না।—এই আমার থিওরী।'

কিছুক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর নৃপতি বলল—'কিন্তু মনে করুন এর পর আবার একটা খুন হল শজারুর কাঁটা দিয়ে! তখন তো বলা চলবে না যে দেবাশিসই হত্যাকারীর আসল লক্ষ্য।'

ব্যোমকেশ বলল—'না। তখন আবার নতুন রাস্তা ধরতে হবে।'

কপিল বলল—'খুনীকে কি ধরা যাবে?'

ব্যোমকেশ বলল—'চেষ্টার ত্রুটি হবে না।'

এমন সময় কফি এল। প্রবাল উঠে গিয়ে পিয়ানোতে মৃদু টুংটাং আরম্ভ করল। ব্যোমকেশ কফি শেষ করে আরো কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে বাড়ি ফিরে চলল।

ব্যোমকেশ বাড়ি ফিরে আসার কয়েক মিনিট পরে রাত্রি পৌনে ন'টার সময় রাখালবাবু এলেন। তাঁর হাতে একটি মোড়ক। ব্যোমকেশ বলল—'এনেছ?'

রাখালবাবু মোড়ক খুলে দেখালেন; ব্রোকেডের মত কাপড় দিয়ে তৈরি একটি ফতুয়া, কিন্তু সোনালী বা রুপালী জরির ব্রোকেড় নয়, স্টীলের জরি দিয়ে তৈরি ঘন-পিনদ্ধ লৌহ-জালিক। জামার ভিতরে পরলে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু এই কঠিন বর্ম ভেদ করা ছোরাছুরি তো দূরের কথা, পিস্তল রিভল্‌বারেরও অসাধ্য।

ব্যোমকেশ জামাটি নিয়ে নেড়েচেড়ে পাশে রাখল, বলল—'আমার গায়ে ঠিক হবে। এখন আর একটা কথা বলি; আমাদের শজারুর পিছনে লেজুড় লাগাবার ব্যবস্থা করেছ?'

রাখালবাবু বললেন—'সব ব্যবস্থা হয়েছে। আজ রাত্রি সাতটা থেকে লেজুড় লেগেছে, এক লহমার জন্যে তাকে চোখের আড়াল করা হবে না। দিনের বেলাও তার পিছনে লেজুড় থাকবে।'

ব্যোমকেশ বলল- 'বেশ। এখন এস পরামর্শ করি। আমি পুকুরে চার ফেলে এসেছি—'

খাটো গলায় দু'জনের মধ্যে অনেকক্ষণ পরামর্শ হল। তারপর সাড়ে ন'টা বাজলে রাখালবাবু ওঠবার উপক্রম করছেন, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

ব্যোমকেশ ফোন তুলে নিয়ে বলল—'হ্যালো।'

অপর প্রান্ত থেকে চেনা গলা শোনা গেল—'ব্যোমকেশবাবু? আপনি একলা আছেন?'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর দিকে সংকেত ভরা দৃষ্টিপাত করে বলল—'হ্যাঁ, একলা আছি। আপনি—'

'গলা শুনে চিনতে পারছেন না?'

'না। আপনার নাম?'

'যখন গলা চিনতে পারেননি তখন নাম না জানলেও চলবে। আজ সন্ধ্যের পর আপনি যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে আমি ছিলাম। একটা গোপন খবর আপনাকে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সকলের সামনে বলতে পারলাম না।'

'গোপন খবর! শজারুর কাঁটা সম্বন্ধে?'

'হ্যাঁ। আপনি যদি আজ রাত্রে রবীন্দ্র সরোবরের বড় ফটকের কাছে আসেন আপনাকে বলতে পারি।'

'বেশ তো, বেশ তো। কখন আসব বলুন।'

'যত শীগ্‌গির সম্ভব। আমি অপেক্ষা করব। একলা আসবেন কিন্তু। অন্য

কারুর সামনে আমি কিছু বলব না।'

'বেশ। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরুচ্ছি।'

টেলিফোন রেখে ব্যোমকেশ যখন রাখালবাবুর দিকে তাকাল তার চোখ দুটো জবলজবল করছে। পাঞ্জাবির বোতাম খুলতে খুলতে সে বলল--'টোপ ফেলাব সঙ্গে সঙ্গে মাছ টোপ গিলেছে। এত শীগ্‌গির ওষুধ ধরবে ভাবিনি। রাখাল, তুমি--'

ব্যোমকেশ পাঞ্জাবি খুলে ফেলল, রাখালবাবু তাকে বুলেট-প্রুফ ফতুয়া পরাতে পরাতে বললেন—'আমার জন্যে ভাববেন না, আমি ঠিক যথাস্থানে থাকব। শজারুর পিছনে লেজুড় আছে, তিনজনে মিলে শজারুকে কাবু করা শক্ত হবে না।'

'বেশ।' ব্যোমকেশ ফতুয়ার ওপর আবার পাঞ্জাবি পরল, তারপর রাখালবাবুর দিকে একবার অর্থপূর্ণ ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল। রাখালবাবু কব্জিতে ঘড়ি দেখলেন, দশটা বাজতে কুড়ি মিনিট। তিনিও বেরিয়ে পড়লেন। প্রচ্ছন্নভাবে যথাস্থানে যথাসময়ে উপস্থিত থাকতে হবে।

রবীন্দ্র সরোবরের সদর ফটকের সামনে লোক-চলাচল নেই; কদাচিৎ একটা বাস কিংবা মোটর হুস করে সাদার্ন অ্যাভেন্যু দিয়ে চলে যাচ্ছে।

ব্যোমকেশ দ্রুতপদে সাদার্ন অ্যাভেন্যু রাস্তা পেরিয়ে ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল; এদিক-ওদিক তাকালো কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। রবীন্দ্র সরোবরের ভিতরে আলো-আঁধারিতে জনমানব চোখে পড়ে না।

ব্যোমকেশ ফটকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খানিক ইতস্তত করল, তারপর ভিতর দিকে অগ্রসর হল। দু'চার পা এগিয়েছে, একটি লোক অদূরের গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল, হাত তুলে ব্যোমকেশকে ইশারা করে ডাকল। ব্যোমকেশ তার কাছে গেল, লোকটি বলল—'চলুন, ওই বেঞ্চিতে বসা যাক।'

জলের ধারে গাছের তলায় বেঞ্চি পাতা। ব্যোমকেশ গিয়ে বেঞ্চিতে ডানদিকের কিনারায় বসল। চারিদিকের ঝিকিমিকি আলোতে অস্পষ্ট ভাবে মুখে দেখা যায়, তার বেশী নয়। ব্যোমকেশ বলল--'এবার বলুন, আপনি কি জানেন।'

লোকটি বলল—'বলছি। দেখুন, যার কথা বলতে চাই সে আমার ঘনিষ্ঠ লোক, তাই বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। সিগারেট আছে?'

ব্যোমকেশ সিগারেটের প্যাকেট বার করে দিল; লোকটি সিগারেট নিয়ে প্যাকেট ব্যোমকেশকে ফেরত দিল, নিজের পকেট থেকে বোধকরি দেশলাই বার করতে করতে হঠাৎ বলে উঠল—'দেখুন, দেখুন কে আসছে!' তার দৃষ্টি ব্যোমকেশকে পেরিয়ে পাশের দিকে প্রসারিত, যেন ব্যোমকেশের দিক থেকে কেউ আসছে।

ব্যোমকেশ সেই দিক্ ঘুরে বসল। সে প্রস্তুত ছিল, অনুভব করল তার পিঠের বাঁ দিকে বুলেট-প্রুফ আবরণের ওপর চাপ পড়ছে। ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে পিছু ফিরল। লোকটি তার পিঠে শজারুর কাঁটা বিঁধিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল, পলকের জন্যে হতবুদ্ধির মত চাইল, তারপর দ্রুত উঠে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যোমকেশের বজ্রমুষ্টি লোহার মুগুরের মত তার চোয়ালে লেগে তাকে ধরাশায়ী করল।

ইতিমধ্যে আরো দু'টি মানুষ আলাদিনের জিনের মত আবির্ভূত হয়েছিল, তারা ধরাশায়ী লোকটির দু'হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল। রাখালবাবু তার হাত থেকে শজারুর কাঁটা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন—'প্রবাল গুপ্ত, তুমি তিনজনকে খুন করেছ এবং দু'জনকে খুন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছ। চল, এবার থানায় যেতে হবে।'

হপ্তা দুই পরে একদিন মেঘাচ্ছন্ন সকালবেলা ব্যোমকেশের বসবার ঘরে পারিবারিক চায়ের আসর বসেছিল। অজিত ছিল, সত্যবতীও ছিল। গত রাত্রি থেকে বর্ষণ আরম্ভ হয়েছে, মাঝে মাঝে থামছে, আবার আরম্ভ হচ্ছে। গ্রীষ্মের রক্তিম ক্রোধ স্নেহে বিগলিত হয়ে গেছে।

অজিত বলল—'এমন একটা গাইয়ে লোককে তুমি পুলিসে ধরিয়ে দিলে! লোকটা বড় ভাল গায়।—সত্যিই এতগুলো খুন করেছে?'

সত্যবতী বলল—'লোকটা নিশ্চয় পাগল।'

ব্যোমকেশ বলল—'প্রবাল গুপ্ত পাগল নয়, কিন্তু একেবারে প্রকৃতিস্থ মানুষও নয়। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ছিল, হঠাৎ দৈব-দুর্বিপাকে গরীব হয়ে গেল; দারিদ্র্যের তিক্ত রসে ওর মনটা বিষেয়ে উঠল। ওর চরিত্রে ষড়্‌রিপুর মধ্যে দুটো বলবান- [illegible] আর ঈর্ষা। দারিদ্র্যের আবহাওয়ায় এই দুটো রিপু তাকে প্রকৃতিস্থ থাকতে দেয়নি।'

সত্যবতী বলল—'সব কথা পরিষ্কার করে বল। তুমি বুঝলে কি করে যে প্রবাল গুপ্তই আসামী?'

ব্যোমকেশ পেয়ালায় দ্বিতীয়বার চা ঢেলে সিগারেট ধরালো। আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে অলস কণ্ঠে বলতে শুরু করল—

এই রহস্যের চাবি হচ্ছে শজারুর কাঁটা।

আততায়ী যদি পাগল হয় তাহলে আমরা অসহায়, বুদ্ধির দ্বারা তাকে ধরা যাবে না। কিন্তু যদি পাগল না হয় তখন ভেবে দেখতে হবে, সে ছোরা-ছুরি ছেড়ে শজারুর কাঁটা দিয়ে খুন করে কেন? নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে। কী সেই উদ্দেশ?

দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকবার আততায়ী শজারুর কাঁটা মৃতদেহে বিঁধে রেখে দিয়ে যায়, অর্থাৎ সে জানাতে চায় যে এই খুনগুলো একই লোকের কাজ। যে ভিখিরিকে খুন করেছে, সে-ই মজুরকে খুন করেছে এবং দোকানদারকেও খুন করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে—কেন?

আমার কাছে এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—ভিখিরি থেকে দোকানদার পর্যন্ত কেউ হত্যাকারীর আসল লক্ষ্য নয়, আসল লক্ষ্য অন্য লোক। কেবল পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্যে হত্যাকারী এলোপাথাড়ি তিনটে খুন করেছে, যাতে পুলিস কোনো মোটিভ খুঁজে না পায়।

তারপর চেষ্টা হল শজারুর কাঁটা দিয়ে দেবাশিসকে খুন করবার। দেবাশিস দৈব কৃপায় বেঁচে গেল, কিন্তু আততায়ী কে তা জানা গেল না।

আমার সত্যান্বেষণ আরম্ভ হল এইখান থেকে। দেবাশিসই যে হত্যাকারীর চরম লক্ষ্য তা এখনো নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কিন্তু মনে হয় তার ওপরে আর কেউ নেই। ভিখিরি থেকে শিল্পপতি, তার চেয়ে উঁচুতে আর কেউ না থাকাই সম্ভব।

যা হোক, তদারক করে দেখা যেতে পারে।

অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল, নৃপতির আড্ডায় যারা যাতায়াত করে তারা ছাড়া আর কারুর সঙ্গে দেবাশিসের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই; ফ্যাক্টরির লোকেরা তাকে ভালবাসে, ফ্যাক্টরিতে আজ পর্যন্ত একবারও স্ট্রাইক হয়নি। আর একটা তথ্য জানা গেল, বিয়ের আগে দীপা একজনের প্রেমে পড়েছিল, তার সঙ্গে পালাতে গিয়ে সে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তারপরে দেবাশিসের সঙ্গে দীপার বিয়ে হয়।

দীপার গুপ্ত প্রণয়ী কে ছিল দীপা ছাড়া কেউ তা জানে না। কে হতে পারে? দীপার বাপের বাড়িতে গোঁড়া সাবেকী চাল, অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেলামেশার অধিকার দীপার নেই, কেবল দাদার বন্ধুরা যখন বাড়িতে আসে তখন তাদের সঙ্গে সামান্য মেলামেশার সুযোগ পায়। সুতরাং তার প্রেমিক সম্ভবত তার দাদারই এক বন্ধু, অর্থাৎ নৃপতি কিংবা তার আড্ডার একজন।

এই সঙ্গে একটা মোটিভও পাওয়া যাচ্ছে। দীপার ব্যর্থ প্রেমিক তার স্বামীকে খুন করবার চেষ্টা করতে পারে যদি সে নৃশংস এবং বিবেকহীন হয়। যে-লোক শজারুর কাঁটা দিয়ে তিনটে খুন করেছে সে যে নৃশংস এবং বিবেকহীন তা বলাই বাহুল্য। নৃপতির আড্ডায় যারা আসত তাদের সঙ্গে দেবাশিসের আলাপ মাত্র দু'মাসের। কেবল একজনের সঙ্গে তার স্কুল থেকে চেনাশোনা ছিল, সে প্রবাল গুপ্ত। চেনাশোনা ছিল কিন্তু সম্প্রীতি ছিল না। প্রবাল গুপ্ত যদি দীপার প্রেমাস্পদ হয়—

বাকি ক'জনকেও আমি নেড়েচেড়ে দেখেছি। নৃপতির একটি স্ত্রীলোক আছে, তার কাছে সে মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে অভিসারে যায়। সুজন মিত্র ব্যর্থ প্রেমিক, সে যাকে ভালবাসে বছর খানেক আগে তার বিয়ে হয়ে গেছে। খঙ্গা বাহাদুর এবং কপিলের জীবনে নারী-ঘটিত কোনো জটিলতা নেই। খঙ্গা বাহাদুর শুধু ফুটবলই খেলে না জুয়াও খেলে। কপিল আদর্শবাদী ছেলে, পৃথিবীর চেয়ে আকাশেই তার মন বেশী বিচরণ করে।

কিন্তু আর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দরকার নেই, সাঁটে বলছি। দীপার বাপের বাড়িতে তার ঘর তল্লাশ করে পাওয়া গেল একটি অটোগ্রাফের খাতা; তাতে নৃপতির আড্ডার কেবল একটি লোকের হস্তাক্ষর আছে, সে প্রবাল গুপ্ত। প্রবাল লিখেছে— তোমার চোখের বিজলি-উজল আলোকে, পরাণে আমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে। তার কথায় কোনো অস্পষ্টতা নেই। আরো জানা গেল দীপা গান ভালবাসে, কিন্তু প্রবাল যে বিবাহিত তা সে জানে না। সুতরাং কে গানের ফাঁদ পেতে দীপাকে ধরেছে তা জানতে বাকি রইল না।

তারপর আর একটি কথা লক্ষ করতে হবে। যেদিন ভোর বেলা ভিখিরিকে শজারুর কাঁটা দিয়ে মারা হয় সেইদিন রাত্রে দীপার ফুলশয্যা। সমাপতনটা আকস্মিক নয়।

এবার প্রবালের দিক থেকে গল্পটা শোন।

যারা জন্মাবধি গরীব, দারিদ্র্যে তাদের লজ্জা নেই; কিন্তু যারা একদিন বড়মানুষ ছিল, পরে গরীব হয়ে গেছে, তাদের মনঃক্লেশ বড় দুঃসহ। প্রবালের হয়েছিল সেই অবস্থা। বাপ মারা যাবার পর সে অভাবের দারুণ দুঃখ ভোগ করেছিল, তার লোভী ঈর্ষালু প্রকৃতি দারিদ্র্যের চাপে বিকৃত হয়ে চতুর্গুণ লোভী এবং ঈর্ষালু হয়ে উঠেছিল। গান গেয়ে সে মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে পেরেছিল বটে,

কিন্তু তার প্রাণে সুখ ছিল না। একটা রুগ্ন মরণাপন্ন মেয়েকে বিয়ে করার ফলে তাঁর জীবন আরো দুর্বহ হয়ে উঠেছিল।

কিছুদিন আগে ওর বউ মারা গেল। বউ মরার আগে থাকতেই বোধ হয় ও দীপার জন্যে ফাঁদ পেতেছিল; ও ভেবেছিল বড় ঘরের একমাত্র মেয়েকে যদি বিয়ে করতে পারে, ওর অবস্থা আপনা থেকেই শুধরে যাবে। দীপার চরিত্র যতই দৃঢ় হোক, সে গানের মোহে প্রবালের দিকে আকৃষ্ট হল। মুখোমুখি দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ বেশী ছিল না। টেলিফোনে তাদের যোগাযোগ চলতে লাগল।

পালিয়ে গিয়ে দীপাকে বিয়ে করার মতলব প্রবালের গোড়া থেকেই ছিল: দীপা যে ঠাকুর্দার অনুমতি চাইতে গিয়েছিল সেটা নিতান্তই লোক-দেখানো ব্যাপার। প্রবাল জানত বুড়ো রাজী হবে না। কিন্তু পালিয়ে গিয়ে একবার বিয়েটা হয়ে গেলে আর ভয় নেই, দীপাকে তার বাপ-ঠাকুর্দা ফেলতে পারবে না।

দীপা বাড়ি থেকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি দেবাশিসের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হল।

প্রবালের মনের অবস্থাটা ভেবে দেখ। অন্য কারুর সঙ্গে দীপার বিয়ে হলে সে বোধহয় এমন ক্ষেপে উঠত না। কিন্তু দেবাশিস! হিংসেয় রাগে তার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলতে লাগল।

বিয়ের সম্বন্ধ যখন স্থির হয়ে গেল তখন সে ঠিক করল দেবাশিসকে খুন করে তার বিধবাকে বিয়ে করবে। দীপা তখন স্বাধীন হবে, বাপের বাড়ির শাসন আর থাকবে না। দীপাকে বিয়ে করলে দেবাশিসের সম্পত্তি তার হাতে আসবে। একসঙ্গে রাজকন্যে এবং রাজত্ব। দেবাশিসের আর কেউ নেই প্রবাল তা জানত।

কিন্তু প্রথমেই দেবাশিসকে খুন করা চলবে না। তাহলে সে যখন দীপাকে বিয়ে করবে তখন সকলের সন্দেহ তার ওপর পড়বে। ক্রূর এবং নৃশংস প্রকৃতির প্রবাল এমন এক ফন্দি বার করল যে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারবে না। শজারুর কাঁটার নাটকীয় খেলা আরম্ভ হল। তিনটে মানুষ বেঘোরে প্রাণ দিল।

যা হোক, প্রবাল দেবাশিসকে মারবার সুযোগ খুঁজছে। আমার বিশ্বাস সে সর্বদাই একটা শজারুর কাঁটা পকেটে নিয়ে বেড়াত; কখন সুযোগ এসে যায় বলা যায় না। একদিন হঠাৎ সুযোগ এসে গেল।

নৃপতির আড্ডাঘরের পাশের ঘরে টেলিফোন আছে। দোরের পাশে পিয়ানো, প্রবাল সেখানে বসে ছিল; শুনতে পেল খড়্গ বাহাদুর দেবাশিসকে টেলিফোন করছে, জানতে পারল ওরা রবীন্দ্র সরোবরের এক জায়গায় দেখা করবে। প্রবাল দেখল এই সুযোগ। শজারুর কাঁটা তার পকেটেই ছিল, সে যথাস্থানে গিয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। তারপর—

প্রবাল জানত না যে প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় খামখেয়ালির ফলে দেবাশিসের হৃৎপিণ্ডটা বুকের ডান পাশে আছে। দীপা অবশ্য জানত। কিন্তু প্রবাল যে দেবাশিসকে খুন করে তাকে হস্তগত করার মতলব করেছে তা সে বুঝতে পারেনি। হাজার হোক মেয়েমানুষের বুদ্ধি; বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'কখনো অর্ধেক বৈ পুরা দেখিলাম না।'

এই হল গল্প। আর কিছু জানবার আছে?

অজিত প্রশ্ন করল—'তোমাকে মারতে গিয়েছিল কেন?'

ব্যোমকেশ বলল—'আমি সেদিন ওদের আড্ডায় গিয়ে বলে এসেছিলাম যে শজারুর কাঁটা দিয়ে যদি আর খুন না হয়, তাহলে বুঝতে হবে দেবাশিসই আত-

তায়ীর প্রধান লক্ষ্য। তাই প্রবাল ঠিক করল আমাকে খুন করেই প্রমাণ করবে যে, দেবাশিস আততায়ীর প্রধান লক্ষ্য নয়; সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। আমি যে তাকে ধরবার জন্যেই ফাঁদ পেতেছিলাম তা সে বুঝতে পারেনি।'

সত্যবতী গভীর নিশ্বাস ফেলে বলল—'বাব্বা! কী রাক্কুসে মানুষ! দীপার কিন্তু কোনো দোষ নেই। একটা সহজ স্বাভাবিক মেয়েকে খাঁচার পাখির মত বন্ধ করে রাখলে সে উড়ে পালাবার চেষ্টা করবে না?'

খুট খুট করে সদর দরজায় টোকা পড়ল। ব্যোমকেশ উঠে গিয়ে দোর খুলল—'আরে দেবাশিসবাবু যে! আসুন আসুন।'

দেবাশিস সঙ্কুচিত ভাবে ঘরে প্রবেশ করল। সত্যবতী উঠে দাঁড়িয়েছিল, দেবাশিসের নাম শুনে পরম আগ্রহে তার পানে চাইল। দেবাশিসের চেহারা আবার আগের মত হয়েছে, দেখলে মনে হয় না সে সম্প্রতি যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছে। সে হাত জোড় করে বলল--'আজ রাত্রে আমার বাড়িতে সামান্য খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছি, আপনাদের সকলকে যেতে হবে।'

ব্যোমকেশ বলল--'বেশ বেশ। বসুন। তা উপলক্ষটা কী?'

দেবাশিস রুদ্ধ কণ্ঠে বলল—'ব্যোমকেশদা, আজ আমাদের সত্যিকার ফুলশয্যা। দীপাকে আমার সঙ্গে আনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে লজ্জায় আধমরা হয়ে আছে, এল না। বউদি, আপনি নিশ্চয় আসবেন, নইলে দীপার লজ্জা ভাঙবে না।'

বে ণী সং হা র

এক

সকালবেলা ব্যোমকেশ তার কেয়াতলার বাড়িতে চায়ের পেয়ালা এবং খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিল। শীতের সকাল, বেলা আন্দাজ আটটা। অজিত ইতিমধ্যেই তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বেরিয়ে গেছে, একজন প্রখ্যাত লেখকের বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে হবে। লেখক মহাশয় একটি নতুন বই দেবেন প্রতিশ্রুত হয়েছেন, কিন্তু প্রখ্যাত লেখকদের অনেক উমেদার, বইটা আগেভাগে হস্তগত করা দরকার।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের পাতাগুলি শেষ করে ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালা তুলে নিল। পেয়ালার অবশিষ্ট চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, সে এক চুমুকে পেয়ালা নিঃশেষ করে আবার কাগজ তুলে নিল। এবার খবর পড়তে হবে।

আজকাল খবরের কাগজ পড়লেই বোঝা যায় পৃথিবীর অবস্থা প্রকৃতিস্থ নয়। ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি তো আছেই, তা ছাড়া মানুষগুলোও যেন ক্ষেপে গেছে। যুদ্ধ বিপ্লব অন্তর্বিবাদ ধর্মঘট ঘেরাও বোমা কাঁদানে গ্যাস লাঠালাঠি। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে বলেই বোধ হয় কারুর প্রাণে শান্তি নেই। যেখানে এত গাদাগাদি ঠাসাঠাসি সেখানে শান্তি কোথা থেকে আসবে?

কাগজের পাতা ওলটাতে হলো না। প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখা গেল এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ। পরশু রাত্রে খুন হয়েছে, কাল সকালে জানাজানি হয়, আজ কাগজে বেরিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার ঘটনা, ব্যোমকেশের বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়; সদর রাস্তায় বেরিয়ে দক্ষিণে কিছু দূর গেলেই তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়িটা চোখে পড়ে, তার কপালের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা—বেণীমাধব। ব্যোমকেশ অনেকবার বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছে কিন্তু বাড়ির অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ ছিল না। কাগজ থেকে জানা গেল বাড়ির মালিক বৃদ্ধ বেণীমাধব চক্রবর্তী এবং তাঁর দেহরক্ষীকে কেউ নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

ব্যোমকেশ নিবিষ্ট মনে হত্যার বিবরণ পড়ল, তারপর অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরাল। পরশু রাত্রে পাড়াতে এমন একটা লোমহর্ষণ খুন হয়ে গেছে, অথচ সে খবর পায়নি। রাখাল এই এলাকার দারোগা, সে নিশ্চয় তদন্তের ভার নিয়েছে; কিন্তু ব্যোমকেশকে কিছু জানায়নি। হয়তো সোজাসুজি ব্যাপার, রহস্য বা জটিলতা কিছু নেই, তাই রাখাল আসেনি। আজকাল জটিল রহস্যও বড়ই দুর্লভ হয়ে পড়েছে—

টেলিফোন বেজে উঠল। ব্যোমকেশ হাত বাড়িয়ে ফোন কানের কাছে ধরতেই ওপার থেকে আওয়াজ এল—'ব্যোমকেশদা? আমি রাখাল। আজকের কাগজ পড়েছেন?'

ব্যোমকেশ বলল—'পড়েছি। বেণীসংহার?'

'কি বললেন—বেণীসংহার? ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, বেণীসংহারই বটে, তার সঙ্গে মেঘরাজ বধ। আমি অকুস্থল থেকে কথা বলছি।'

'কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার একটু প্যাঁচালো ঠেকছে। কাল সকাল থেকে তদন্ত শুরু করেছি। এখনো কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন?'

'না।'

'তা হলে একবারটি এদিকে আসবেন? আপনার বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা। বাড়ির নাম বেণীমাধব।'

'জানি।'

'কখন আসছেন?'

'অবিলম্বে।'

দুই

বেণীমাধব চক্রবর্তী সরকারি সামরিক বিভাগে কন্ট্রাক্টরি কাজ করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন। দক্ষিণ কলকাতায় সদর রাস্তার ওপর তাঁর প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িটা সেই অর্থের যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন।

বেণীমাধব সতর্ক বুদ্ধির মানুষ ছিলেন। দীর্ঘকাল ঠিকেদারি করার ফলে মনুষ্য জাতির সততায় তিনি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। কিন্তু সে জন্যে তাঁর হৃদয়ধর্ম সংকুচিত হয়নি। সংসারের এবং সেইসঙ্গে নিজের দোষত্রুটি তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলেন।

বেণীমাধবের পোষ্য বেশি ছিল না। যৌবন উত্তীর্ণ হবার পরই তিনি বিপত্নীক হয়েছিলেন; পত্নী রেখে যান একটি পুত্র ও একটি কন্যা। তারা বড় হলে বেণীমাধব তাদের বিয়ে দিলেন। ছেলে অজয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি আস্ত অকর্মার ধাড়ি; ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টা করে বাপের কিছু টাকা নষ্ট করে পিতৃ-স্কন্ধে আরোহণ করেছিল; বেণীমাধব আর তাকে কাজে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করেননি। তিনি বেশির ভাগ সময় বাইরে বাইরে থাকতেন, বাড়ির দ্বিতলে অজয় বাস করত তার স্ত্রী আরতি এবং পুত্রকন্যা মকরন্দ ও লাবণিকে নিয়ে। বেণী-মাধব তার সংসারের খরচ দিতেন।

মেয়ের বিয়ে বেণীমাধব ভালই দিয়েছিলেন; জামাই গঙ্গাধরের পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি ছিল। কিন্তু বড়মানুষ শ্বশুর পেয়ে তার মেজাজ চড়ে গেল, সে রেস খেলে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিল। মেয়ে গায়ত্রী বাপের কাছে এসে কেঁদে পড়ল। বেণীমাধব মেয়ে জামাই এবং দৌহিত্রী ঝিল্লীকে নিজের বাড়িতে তুললেন; ছেলেকে যেমন মাসহারা দিচ্ছেন মেয়ের জন্যেও তেমনি মাসহারা বরাদ্দ হলো।

বেণীমাধবের বাড়িটা তিনতলা, আগেই বলেছি। তেতলায় মাত্র তিনটি ঘর, বাকি জায়গায় বিস্তীর্ণ ছাদ। এই তেতলাটা বেণীমাধব নিজের জন্যে রেখেছিলেন, তিনি না থাকলে তেতলা তালাবন্ধ থাকত। দোতলায় আটটি ঘর, সামনে টানা বারান্দা; এই তলায় বেণীমাধব তাঁর ছেলে অজয় ও মেয়ে গায়ত্রীকে পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাদের হাঁড়ি হেঁশেল অবশ্য আলাদা। দুই সংসারে মনের মিল ছিল না; কিন্তু প্রকাশ্যে ঝগড়া করবার সাহসও কারুর ছিল না। ছেলেমেয়ের প্রতি বেণীমাধবের স্নেহ ছিল; কিন্তু তিনি রাশভারী লোক

ছিলেন, কড়া হতে জানতেন।

নীচের তলার প্রকাণ্ড একটি হলঘর বিলিতী আসবাব দিয়ে ড্রায়িং-রুমের মত সাজানো; মাঝখানে নীচু গোল টেবিল, তাকে ঘিরে দুটো সোফা এবং গোটা কয়েক গদি-মোড়া ভারী চেয়ার, তা ছাড়া আরো কয়েকটি কেঠো চেয়ার দেওয়ালের গায়ে সারি দিয়ে রাখা। কিন্তু ঘরটি বড় একটা ব্যবহার হয় না, কদাচিৎ কেউ দেখা করতে এলে অতিথিকে বসানো হয়। বাকি পাঁচখানা ঘর আগন্তুক অভ্যাগতদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকলেও অধিকাংশ সময় তালাবন্ধ থাকত।

কিন্তু বেশি দিন তালাবন্ধ রইল না। বেণীমাধবের দুই মামাতো ছোট বোন ছিল, বহুদিন মারা গেছে; তাদের দুই ছেলে সনৎ গাঙ্গুলি ও নিখিল হালদার—পরস্পর মাসতুতো ভাই—কলকাতায় চাকরি করত; তাদের ভাল বাসা ছিল না, তাই বেণীমাধব তাদের নিজের বাড়িতে এনে রাখলেন। নীচের দুটি ঘর নিয়ে তারা রইল।

দেখা যাচ্ছে, বেণীমাধবের ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী এবং দুই ভাগ্নে মিলে সাতজন পোষ্য। বাড়িতে চাকর নেই, দুটো দাসী দিনের বেলা কাজ করে দিয়ে সন্ধ্যের সময় চলে যায়।

নিতান্তই বৈচিত্র্যহীন পরিবেশ। শালা-ভগিনীপতির বয়স প্রায় সমান, তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ; কিন্তু তাদের মধ্যে মানসিক ঘনিষ্ঠতা নেই, দু'জনের আকৃতি প্রকৃতি দু'রকম। অজয় সুশ্রী ও শৌখিন গোছের মানুষ, গিলে-করা ধুতি-পাঞ্জাবি ও পালিশ করা পাম্প-শু ছাড়া সে বাড়ির বার হয় না। রোজ সকালে গড়িয়াহাটে বাজার করতে যাওয়াতে তার ঘোর আপত্তি, অধিকাংশ দিন তার স্ত্রী আরতিই বাজার করতে যায়। অজয় সন্ধ্যের পর ক্লাবে যায়, শখের থিয়েটারের প্রতি তার গাঢ় অনুরাগ। অভিনয় ভালই করে। ক্লাবটা শখের থিয়েটারেরই ক্লাব, প্রতি বছর তারা চার-পাঁচখানা নাটক অভিনয় করে।

গঙ্গাধরের চেহারাটা কাপালিক ধরনের; মুখে এবং দেহে মাংস কম, হাড় বেশি। চোখের দৃষ্টি খর। নিজের বিষয়সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে শ্বশুরের স্কন্ধে আরোহণ করার পর সে অত্যন্ত গম্ভীর এবং মিতভাষী হয়ে উঠেছে। সারাদিন বাড়ি থেকে বেরোয় না, সন্ধ্যের পর লাঠি হাতে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। ঘণ্টা দেড়েক পরে যখন ফিরে আসে তখন তার মুখ থেকে ভুর ভুর করে মদের গন্ধ বের হয়।

ননদ-ভাজের মধ্যে প্রকাশ্যত সদ্ভাব ছিল, যাওয়া-আসা গল্পগুজবও চলত; কিন্তু সুবিধে পেলে কেউ কাকে চিমটি কাটতে ছাড়ত না। গায়ত্রী হয়তো পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে বলল—'বৌদি, আজ কি রান্নাবান্না করলে?'

আরতি রান্নার ফর্দ দিয়ে বলত—'তুমি কি রাঁধলে ভাই?'

গায়ত্রী বলল—'রান্না আর হলো কই। ভাতের ফ্যান গেলে মাংস চড়াতে গিয়ে দেখি গরম মশলা নেই! জানো তো তোমার নন্দাই শাক-ভাত খেতে পারেন না। ওঁর মাছ না হলেও চলে কিন্তু রোজ মাংস চাই। তাই খোঁজ নিতে এলুম তোমার ভাঁড়ারে গরম মশলা আছে কিনা। নইলে আবার ঝিকে বাজারে পাঠাতে হবে।'

আরতি বলল—'আছে বৈকি, এই যে দিচ্ছি।'

গরম মশলা এনে দিয়ে আরতি হাসি-হাসি মুখে বলল—'নন্দাই মাংস ভালবাসেন তাতে দোষ নেই, কিন্তু ভাই, ও জিনিসটা না খেলেই পারেন।'

গায়ত্রীর দৃষ্টি অমনি কড়া হয়ে উঠল—'কোন জিনিস?'

আরতি ভালমানুষের মতন মুখ করে বলল—'তোমার দাদা বলছিলেন সেদিন সন্ধ্যের পর নন্দাই-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়েছিল, তা নন্দাই-এর মুখ থেকে ভক্ করে মদের গন্ধ বেরুল। নন্দাই-এর বোধহয় পুরনো অভ্যেস, ছাড়তে পারেন না, কিন্তু কথাটা যদি বাবার কানে ওঠে—'

গায়ত্রীর কঠিন দৃষ্টি কুটিল হয়ে উঠল, সে মুখে একটু বাঁকা হাসি টেনে এনে বলল—'বাবার কানে যদি কথা ওঠে তাহলে তোমরাই তুলবে বৌদি। কিন্তু সেটা কি ভাল হবে? তোমরা মেয়ের জন্য নাচের মাস্টার রেখেছ তাতে দোষ নেই, কিন্তু লাবণি রাত দুপুর পর্যন্ত মাস্টারের সঙ্গে সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরে সেটা কি ভাল? লাবণি কচি খুকি নয়, যদি একটা কেলেঙ্কারি করে বসে তাতে কি বাবা খুশী হবেন?' গায়ত্রী আঁচল ঘুরিয়ে চলে গেল।

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

লাবণি মেয়েটি দেখতে ভাল; ছিপছিপে লম্বা গড়ন, নাচের উপযোগী চেহারা। একটু চপল প্রকৃতি, লেখাপড়া স্কুলের সীমানা পার হবার আগেই শেষ হয়েছে: নৃত্যকলার প্রতি তার দুরন্ত অনুরাগ। অজয় মেয়ের মনের প্রবণতা দেখে তার জন্যে নাচের মাস্টার রেখেছিল। মাস্টারটি বয়সে তরুণ, সম্পন্ন ঘরের ছেলে, নাম পরাগ লাহা; হপ্তায় দু'দিন লাবণিকে নাচ শেখাতে আসত। বাপ-মায়ের চোখের সামনে লাবণি নাচের মহলা দিত। কদাচিৎ পরাগ বলত -'একটা নাচ-গানের বিলিতী ছবি এসেছে, দু'টো টিকিট কিনেছি রাত্রির শো'তে। লাবণিকে নিয়ে যাব? ছবিটা দেখলে ও অনেক শিখতে পারবে।'

গোড়ার দিকে আরতি রাজী হতো না। পরাগ বলত -'থাক, আমি অন্য কোনো ছাত্রীকে নিয়ে যাব।'

ক্রমে আপত্তি শিথিল হয়ে আসে, লাবণি পরাগের সঙ্গে ছবি দেখতে যায়; দুপুর রাত্রে পরাগ লাবণিকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

কালধর্মে সবই গা-সওয়া হয়ে যায়।

লাবণির দাদা মকরন্দ কলেজে পড়ে। কিন্তু পড়া নামমাত্র; কলেজে নাম লেখানো আছে এই পর্যন্ত। তার মনের দিগন্ত জুড়ে আছে রাজনৈতিক দলাদলি, দলগত প্রয়োজনে যদি কলেজে যাওয়া প্রয়োজন হয় তবেই কলেজে যায়। তার চেহারা ভাল, কিন্তু মুখে চোখে একটা উগ্র ক্ষুধিত অসন্তোষ। সে বাড়িতে বেশি থাকে না; বাড়ির সঙ্গে কেবল খাওয়া আর শোয়ার সম্পর্ক। মাঝে মাঝে আরতির সংসার-খরচের টাকা অদৃশ্য হয়; আরতি বুঝতে পারে কে টাকা নিয়েছে, কিন্তু অশান্তির ভয়ে চুপ করে থাকে। মকরন্দ তার থিয়েটার-বিলাসী বাপকে বিদ্বেষ করে, অজয়ও ছেলের চালচলন পছন্দ করে না; দু'জনে পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। মকরন্দ যেন তার বাপ-মায়ের সংসারে অবাঞ্ছিত অতিথি।

পাশের ফ্ল্যাটে সংসার ছোট, কেবল একটি মেয়ে ঝিল্লী। ঝিল্লী লাবণির সমবয়সী, লাবণির মত সুন্দরী নয়, কিন্তু পড়াশোনায় ভাল। চাপা প্রকৃতির মেয়ে, কলেজে ভর্তি হয়েছে, নিয়মিত কলেজে যায়, লেখাপড়া করে, অবসর পেলে মাকে সংসারের কাজে সাহায্য করে। তার শান্ত মুখ দেখে মনের খবর পাওয়া যায় না।

এই গেল দোতলার মোটামুটি খবর।

নীচের তলার দু'টি ঘরে সনৎ আর নিখিল থাকে। সনতের বয়স ত্রিশের ওপর,

নিখিলের ত্রিশের নীচে। চেহারার দিক থেকে দু'জনকেই সুপুরুষ বলা চলে। কিন্তু চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। সনৎ সংবৃতচিত্ত ও মিতবাক, বিবেচনা না করে কথা বলে না। নিখিলের মুখে খৈ ফোটে, সে চটুল ও রঙ্গপ্রিয়। দু'জনেই সাংবাদিকের কাজ করে। সনৎ প্রেস-ফটোগ্রাফার। নিখিল খবরের কাগজের সংবাদ সম্পাদন বিভাগে নিম্নতর নিউজ এডিটর-এর কাজ করে। সে নিশাচর প্রাণী।—দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন, দেবতা জাগিলে মোদের রাতি। ঋষ্যশৃঙ্গকে যারা প্রলুব্ধ করেছিল তাদেরই সমগোত্রীয়।

এরা কেউ বিয়ে করেনি। নিখিলের বিয়ে না করার কারণ, সে যা উপার্জন করে তাতে সংসার পাতা চলে না; কিন্তু সনতের সেরকম কোনো কারণ নেই। সে ভাল উপার্জন করে; মাতুলগৃহে তার বাস করার কারণ অর্থাভাব নয়, ভাল বাসার অভাব। তার বিবাহে অরুচির মূল অনুসন্ধান করতে হলে তার একটি গোপনীয় অ্যালবামের শরণ নিতে হয়। অ্যালবামে অনেকগুলি কুহকিনী যুবতীর সরস ফটো আছে। ফটোগুলি দেখে সন্দেহ করা যেতে পারে যে, সনৎ অবিবাহিত হলেও ব্রহ্মচারী নয়। কিন্তু সে অত্যন্ত সাবধানী লোক। সে যদি বিবাহের বদলে মধুকর-বৃত্তি অবলম্বন করে থাকে, তাহলে তা সকলের অজানতে।

এই সাতটি মানুষ বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা। বেণীমাধব ন'মাসে ছ'মাসে আসেন, দু'দিন থেকে আবার দিল্লী চলে যান। দিল্লীই তাঁর কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্র-বিন্দু।

হঠাৎ সাতষট্টি বছর বয়সে বেণীমাধবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হলো। তাঁর শরীর বেশ ভালই ছিল। অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় ভৃত্য এবং দীর্ঘদিনের অনুচর রামভজনের মৃত্যুর পর তিনি আর বেশি দিন খাড়া থাকতে পারলেন না। তিন মাসের মধ্যে তিনি ব্যবসা গুটিয়ে ফেললেন। তাঁর টাকার দরকার ছিল না, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কাজের ঝোঁকেই কাজ করে যাচ্ছিলেন। এখন দিল্লীর অফিস তুলে দিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। সঙ্গে এল নতুন চাকর মেঘরাজ।

রামভজনের মৃত্যুর পর বেণীমাধব মেঘরাজকে খাস চাকর রেখেছিলেন। মেঘরাজ ভারতীয় সেনাদলের একজন সিপাহী ছিল; চীন-ভারত যুদ্ধে আহত হয়ে তার একটা পা হাঁটু পর্যন্ত কাটা যায়। ভারতীয় সেনাবিভাগের পক্ষ থেকে তাকে কৃত্রিম পা দেওয়া হয়েছিল এবং সামান্য পেনসন দিয়ে বিদায় করা হয়েছিল। সে বেণীমাধবের দিল্লীর অফিসে দরোয়ানের কাজ পেয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছিল; রামভজনের মৃত্যুর পর বেণীমাধব তাকে খাস চাকরের কাজ দিলেন। মেঘরাজ অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং কড়া প্রকৃতির মানুষ; সে বেণীমাধবের একক সংসারের সমস্ত কাজ নিজের হাতে তুলে নিল; তাঁর দাড়ি কামানো থেকে জুতা বুরুশ পর্যন্ত সব কাজ করে। তার বয়স আন্দাজ চল্লিশ, বলিষ্ঠ চেহারা। কৃত্রিম পায়ের জন্য একটু খুঁড়িয়ে চলে।

যাহোক, বেণীমাধব এসে কলকাতার বাড়িতে অধিষ্ঠিত হলেন। তেতলার অংশে নিত্য ব্যবহারের সব ব্যবস্থাই ছিল, কেবল ফ্রিজ আর টেলিফোন ছিল না। দু'চার দিনের মধ্যে ফ্রিজ এবং টেলিফোনের সংযোগ স্থাপিত হলো। ইতিমধ্যে

মেয়ে গায়ত্রী এসে আবদার ধরেছিল—'বাবা, এবার আমি তোমার খাবার ব্যবস্থা করব। আগে তুমি যখনই আসতে দাদার কাছে খেতে। আমরা কি কেউ নই?'

বেণীমাধব বলেছিলেন—'আমি তো একলা নই, মেঘরাজ আছে।'

'মেঘরাজ বুঝি নতুন চাকরের নাম? আহা, বুড়ো রামভজন মরে গেল। তা মেঘরাজকেও আমি খাওয়াব।'

বেণীমাধব বিবেচনা করে বললেন—'বেশ, কিন্তু তাতে তোমার খরচ বাড়বে। আমি তোমার মাসিক বরাদ্দ আরো দেড়শো টাকা বাড়িয়ে দিলাম।'

গায়ত্রী হেসে বলল—'সে তোমার যেমন ইচ্ছে।' তার বোধহয় মনে মনে এই মতলবই ছিল; সে মাসে সাড়ে সাতশো টাকা পেত, এখন নশো টাকায় দাঁড়াল।

কলকাতায় এসেই বেণীমাধব তার পুরনো বন্ধু ডাক্তার অবিনাশ সেনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ডাক্তার অবিনাশ সেন নামকরা ডাক্তার, বয়সে বেণীমাধবের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। তিনি একদিন বেণীমাধবকে নিজের ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন; এক্স-রে, ই সি জি প্রভৃতি যান্ত্রিক পরীক্ষা হলো। তারপর ডাক্তার সেন বললেন—'দেখুন, আপনার শরীরে সিরিয়াস কোনো ব্যাধি নেই, যা হয়েছে তা হলো বার্ধক্যের স্বাভাবিক সর্বাংগীন অবক্ষয়। আমি আপনাকে ওষুধ বিষুধ কিছু দেব না, কেবল শরীরের গ্রন্থিগুলোকে তাজা রাখবার জন্যে মাসে একটা করে ইনজেকশন দেব। আসলে আপনি বয়সের তুলনায় বড় বেশি পরিশ্রম করছিলেন। এখন থেকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম, বই পড়ুন, রেডিও শুনুন, রোজ বিকেলে একটু বেড়ান। এখনো অনেক দিন বাঁচবেন।'

বেণীমাধব ইনজেকশন নিয়ে সানন্দে বাড়ি ফিরে এলেন।

তারপর দিন কাটতে লাগল। গায়ত্রী নিজের হাতে থালা সাজিয়ে এনে বাপকে খাইয়ে যায়। অন্য সকলে আসা-যাওয়া করে। মকরন্দ বড় একটা আসে না, এলেও দু' মিনিট থেকে চলে যায়। নাতনীরা থাকে, বেণীমাধবের সংগে গল্প করে। ঝিল্লী পড়াশুনোয় ভালো জেনে বৃদ্ধ সুখী হন; লাবণি নাচ শিখছে শুনেও তিনি অপ্রীত হন না। তিনি বয়সে প্রবীণ হলেও প্রাচীনপন্থী নন। সব মেয়েই যখন নাচছে তখন তাঁর নাতনী নাচবে না কেন?

দিন কুড়ি-পঁচিশ কাটবার পর হঠাৎ একদিন বেণীমাধবের শরীর খারাপ হলো; উদরাময়, পেটের যন্ত্রণা। ডাক্তার সেন এলেন, পরীক্ষা করে বললেন—'খাওয়ার অত্যাচার হয়েছে, খাওয়া সম্বন্ধে ধরা-বাঁধার মধ্যে থাকতে হবে।'

বাড়ির সকলেই উপস্থিত ছিল। গায়ত্রী শুকনো মুখে বলল—'কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি তো বাবাকে এমন কিছু খেতে দিইনি যাতে ওঁর শরীর খারাপ হতে পারে।'

ডাক্তার কোনো কথা বললেন না, ওষুধের প্রেসক্রিপশন ও পথ্যের নির্দেশ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—'কেমন থাকেন আমি টেলিফোন করে খবর নেব।'

ডাক্তার চলে যাবার 'পর বেণীমাধব আরতির পানে চেয়ে বললেন—'বৌমা, আমার পথ্য তৈরি করার ভার তোমার ওপর রইল।'

আরতি বিজয়োল্লাস চেপে বলল—'হ্যাঁ বাবা।'

তিন চার দিনের মধ্যে বেণীমাধব সেরে উঠলেন, তাঁর পেট ধাতস্থ হলো। পথ্য ছেড়ে তিনি স্বাভাবিক খাদ্য খেতে লাগলেন। আরতিই তাঁর জন্যে রান্না করে চলল।

কিন্তু বেণীমাধবের মন শান্ত নয়। চিরদিন নানা লোকের সঙ্গে নানা কাজে দিন কাটিয়েছেন, এখন তাঁর জীবন বৈচিত্র্যহীন। সকালে মেঘরাজ তাঁর দাড়ি কামিয়ে দেয়, তিনি স্নানাদি করে চা খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসেন। তাতে ঘণ্টাখানেক কাটে। তারপর রেডিও চালিয়ে খানিকক্ষণ গান শোনেন। গান বেশিক্ষণ ভাল লাগে না, রেডিও বন্ধ করে বই এবং সাময়িক পত্রিকার পাতা ওলটান।

একদিন কলকাতার পুরনো বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যায়। টেলিফোন ডিরেক্টরি খুঁজে তাঁদের নাম বার করেন, টেলিফোন করে কাউকে পান না কাউকে পান; কিছুক্ষণ পুরনো কালের গল্প হয়। এগারোটার পর আরতি ভাতের থালা নিয়ে আসে। আহারের পর তিনি ঘণ্টাখানেক বিছানায় শুয়ে দিবানিদ্রায় কাটান।

বিকেলবেলা ঝিল্লী কিংবা লাবণি আসে, তাদের সঙ্গে খানিক গল্প করেন। লাবণিকে বলেন—'কেমন নাচতে শিখেছিস দেখা।'

লাবণি বলে—'আমি এখনো ভাল শিখিনি দাদু, ভাল শিখলে তোমাকে দেখাব।'

বেণীমাধব বলেন—'তোর মাস্টার ভাল শেখাতে পারে?'

লাবণি গদ্‌গদ হয়ে বলে—'খু-ব ভাল শেখাতে পারেন। এত ভাল যে—' লজ্জা পেয়ে সে অর্ধপথে থেমে যায়।

বেণীমাধব প্রশ্ন করলেন—'কত বয়স মাস্টারের?'

'কি জানি! হবে ছাব্বিশ-সাতাশ। যাই, মা ডাকছে।' লাবণি তাড়াতাড়ি চলে যায়।

সূর্যাস্তের পর বেণীমাধব খোলা ছাদে অনেকক্ষণ পায়চারি করেন। ইচ্ছে হয় রবীন্দ্র সরোবরে গিয়ে লোকজনের মধ্যে খানিক বেড়িয়ে আসেন; কিন্তু তিনতলা সিঁড়ি ভাঙা তাঁর পক্ষে কষ্টকর, তাই ছাদে বেড়িয়েই তাঁর ব্যায়াম সম্পন্ন হয়।

রাত্রি ন'টার সময় আহার সমাপন করে তিনি শয়ন করেন। এই তাঁর দিনচর্যা। মেঘরাজ হামেহাল তাঁর কাছে হাজির থাকে; কখনো ঘরের মধ্যে কখনো দোরের বাইরে। তিনি শয়ন করলে মেঘরাজ নীচে গিয়ে আহার সেরে আসে; বেণীমাধবের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার বাইরে আগড় হয়ে বিছানা পেতে শোয়।

এইভাবে দিন কাটছে। একদিন এক অধ্যাপক বন্ধুকে টেলিফোন করে বেণীমাধবের মুখ গম্ভীর হলো। টেলিফোন রেখে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর মেঘরাজকে ডেকে বললেন—'তুমি নীচে গিয়ে মকরন্দকে ডেকে আনো।'

কয়েক মিনিট পরে মকরন্দ এসে দাঁড়াল। চাকরের মুখে তলব পেয়ে সে খুশী হয়নি, অপ্রসন্ন মুখে প্রশ্ন নিয়ে পিতামহের মুখের পানে চাইল। বেণীমাধব কিছুক্ষণ তার উস্কখুস্ক চেহারার পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি কলেজে ঢুকেছ, লেখাপড়া কেমন হচ্ছে?'

মকরন্দর মুখ ভ্রূকুটি-গভীর হলো—'হচ্ছে এক রকম।

বেণীমাধব বললেন—'শুনলাম তুমি ক্লাসে যাও না, দল পাকিয়ে পলিটিক্স করে বেড়াও, এ কথা সত্যি?'

উদ্ধত স্বরে মকরন্দ বলল—'কে বলেছে?'

বেণীমাধব কড়া সুরে বললেন—'কে বলেছে সে কথায় তোমার দরকার নেই। কথাটা সত্যি কিনা?'

'হ্যাঁ সত্যি।' মকরন্দ চোখ লাল করে ঠাকুরদার পানে চেয়ে রইল।

'বটে!' বেণীমাধবের চোখেও রাগের ফুলকি ছিটকে পড়ল—'তুমি বেয়াদবি করতে শিখেছ।—মেঘরাজ!'

মেঘরাজ দোরের বাইরে ছিল, ঘরে ঢুকল। বেণীমাধব আঙুল দেখিয়ে বললেন—'এই ছোঁড়ার কান ধরে গালে একটা থাবড়া মারো, তারপর ঘাড় ধরে বার করে দাও।'

মেঘরাজ সিপাহী ছিল, সে হুকুমের চাকর। যথারীতি মকরন্দর কান ধরে গালে চড় মারল। মকরন্দর মনে যতই ধৃষ্টতা থাক, মেঘরাজের সঙ্গে হাতাহাতি করবার সাহস বা দৈহিক শক্তি তার নেই, সে ধাক্কা খেতে খেতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কথাটা চাপা রইল না। অজয় আর আরতি ছুটে এসে বেণীমাধবের কাছে ক্ষমা চাইল। বেণীমাধব গম্ভীর হয়ে রইলেন, শেষে বললেন 'বংশে একটা মাত্র ছেলে, সে বেল্লিক বেয়াদব হয়ে উঠেছে। দোষ তোমাদের, তোমরা ছেলে শাসন করতে জানো না।'

ব্যাপারটা কিন্তু আর বেশি দূর গড়াল না।

তারপর একদিন বিকেলবেলা সনৎ এল মামার সঙ্গে দেখা করতে। সনৎ আর নিখিল মাঝে মাঝে এসে মামার কাছে বসে, সসম্ভ্রমে মামার কুশল প্রশ্ন করে চলে যায়। আজ সনৎ তার ক্যামেরা নিয়ে এসেছে, বলল 'মামা, আপনার একটা ছবি তুলব।'

বেণীমাধব হেসে বললেন—'আমি বুড়ো মানুষ, আমার ছবি তুলে কি হবে!'

সনৎ বলল—'আমার অ্যালবামে রাখব।'

'কিন্তু এখন আলো কমে গেছে, এ আলোতে ছবি তোলা যাবে?'

'যাবে। আমি ফ্ল্যাশ বালব্ এনেছি।'

'বেশ, তোলো।' বেণীমাধব একটি হেলান দেওয়া চেয়ারে বসলেন।

সনৎ ছবি তোলার উপক্রম করছে এমন সময় নিখিল এসে দাঁড়াল। সনৎ এদিক ওদিক ঘুরে শেষে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ছবি তুলল, বালবটা একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেল। নিখিল বলল—'সনৎদা, ছবি তৈরি হলে আমাকে একখানা দিও, আমি কাগজে ছাপব। মামা কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন, কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে আছেন, খবরটা প্রকাশ করা দরকার।'

বেণীমাধব মনে মনে ভাগ্নেদের ওপর খুশী হলেন।

পরদিন সনৎ ছবি এনে বেণীমাধবকে দেখাল। ছবিটি ভাল হয়েছে, বেণীমাধবের জরাক্রান্ত মুখ শিল্পীর নৈপুণ্যে শান্ত কোমল ভাব ধারণ করেছে। সনৎ যে কৌশলী শিল্পী তাতে সন্দেহ নেই।

বেণীমাধব বললেন—'বেশ হয়েছে। এটাকে বাঁধিয়ে কোথাও টাঙিয়ে রাখলেই হবে।'

সনৎ বলল—'আমি এনলার্জ করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে এনে দেব। নিখিলকে এক কপি দিয়েছি, সে কাগজে ছাপবে।'

অতঃপর বেণীমাধবের কর্মহীন মন্থর দিনগুলি কাটছে। সনৎ বড় ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। কাগজে তাঁর ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় বেরিয়েছে। এরকম অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে মানুষ শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা লাভ করে। কিন্তু বেণীমাধবের মনে শান্তি স্বচ্ছন্দতা আসছে না। ছেলে ও মেয়ের পরিবারের

সঙ্গে একটানা সান্নিধ্য তিনি উপভোগ করতে পারছেন না। পারিবারিক জীবনের স্বাদ ভুলে গিয়ে যারা দীর্ঘ কাল একলা পথে চলেছে তাদের বোধহয় এমনিই হয়।

ওদিকে ছেলে এবং মেয়ের পরিবারেও সুখ নেই। গায়ত্রীর মেজাজ সর্বদাই তিরিক্ষি হয়ে থাকে। গঙ্গাধর সারাদিন বসে একা একা তাস খেলে, সলিটেয়ার খেলা; সন্ধ্যের সময় চুপি চুপি বেরিয়ে যায়, আবার বেশি রাত্রি হবার আগেই ফিরে আসে। অজয় ক্লাবে গিয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আড্ডা জমাত কিংবা রিহার্সেল দিত; এটা ছিল তার জীবনের প্রধান বিলাস। এখন তাকে রাত্রি ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হয়, কারণ কর্তার হুকুম—ন'টার পর সদর দরজা খোলা থাকবে না। ন'টার পর বাড়ি ফিরে দোর ঠেলাঠেলি করলে তেতলায় শব্দ যাবে, সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। সকলেরই একটা চোখ এবং একটা কান তেতলার দিকে সতর্ক হয়ে থাকে। আরতি যদিও সর্বদাই শ্বশুরকে খুশী করবার চেষ্টা করছে, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

নিশ্চিন্ত আছে কেবল দোতলায় দু'টি মেয়ে, লাবণি আর ঝিল্লী, এবং নীচের তলায় সনৎ ও নিখিল। ঝিল্লী আর লাবণির বয়স মাত্র আঠারো, বিষয়বুদ্ধি এখনো পরিপক্ক হয়নি। সনৎ আর নিখিলের বেলায় পরিস্থিতি অন্যরকম; মামা তাদের বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তারা মামার কাছে অর্থ-প্রত্যাশী নয়। সনতের গোপন নৈশাভিসারের কথা বেণীমাধব জানতে পারবেন এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। নিখিলের ওসব দোষ নেই, উপরন্তু কয়েক মাস থেকে সে এক নতুন ব্যাপারে মশগুল হয়ে আছে।

বেণীমাধব কলকাতায় এসে বসবার আগে একদিন নিখিল হঠাৎ ডাকে একটা চিঠি পেল, খামের চিঠি। তাকে চিঠি লেখবার লোক কেউ নেই, সে একটু আশ্চর্য হয়ে চিঠি খুলল। এক পাতা কাগজের ওপর দু'ছত্র লেখা আছে –

আমি একটি মেয়ে। তোমাকে ভালবাসি।--

চিঠির নীচে লেখিকার নাম নেই।

নিখিল কিছুক্ষণ বোকার মত চেয়ে রইল। তারপর তার মুখে গদ্‌গদ হাসি ফুটে উঠল। একটা মেয়ে তাকে ভালবাসে! বা রে! ভারি মজা তো!

কিন্তু কে মেয়েটা?

নিখিল খামের ওপর পোস্ট অফিসের শিলমোহর পরীক্ষা করল; শিলমোহরের ছাপ জেবড়ে গেছে, তবু কলকাতায় চিঠি ডাকে দেওয়া হয়েছে এটুকু বোঝা যায়। কলকাতার মেয়ে। কে হতে পারে? চিঠিই বা লিখল কেন? ভালবাসা জানাবার আরো তো অনেক সোজা উপায় আছে। মুখে বলতে লজ্জা হয়েছে তাই চিঠি! কিন্তু নিজের নাম লেখেনি কেন?

নিখিল অনেক মেয়েকে চেনে। তার অফিসেই তো গোটা দশেক আইবুড়ো মেয়ে কাজ করে। তাছাড়া বন্ধুবান্ধবের বোনেরা আছে। মেয়েরা তার চটুল রঙ্গপ্রিয় স্বভাবের জন্যে তার প্রতি অনুরক্ত, তাকে দেখলেই তাদের মুখে হাসি ফোটে। কিন্তু কেউ তাকে চুপিচুপি ভালবাসে বলেও তো মনে হয় না। আর এত লজ্জাবতীও কেউ নয়।

হাতে চিঠি নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিখিল এইসব ভাবছে এমন সময় পিছন দিক থেকে লাবণির গলা শুনতে পেল - 'কি নিখিল কাকা, কার চিঠি পড়ছ?'

নিখিল ফিরে দাঁড়াল। ঝিল্লী আর লাবণি কখন দোতলা থেকে নেমে এসেছে;

তাদের হাতে কয়েকখানা বই। তারা একসঙ্গে লাইব্রেরীতে যায় বই বদল করতে।

নিখিল হাত উঁচুতে তুলে চিঠি নাড়তে নাড়তে বলল—'কার চিঠি! একটি যুবতী আমাকে চিঠি লিখেছে।' বলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল

লাবণি বলল—'যুবতী লিখেছে! কী লিখেছে!'

নিখিল বলল—'হুঁ হুঁ, দারুণ ব্যাপার, গুরুতর ব্যাপার। লিখেছে সে আমাকে ভালবাসে।'

লাবণি আর ঝিল্লী অবাক হয়ে পরস্পরের পানে তাকাল, তারপর হেসে উঠল। লাবণি বলল—'কেন গুল মারছ নিখিল কাকা। তোমাকে আবার কোন্ যুবতী ভালবাসবে?'

নিখিল চোখ পাকিয়ে বলল—'কেন, আমাকে কোনো যুবতী ভালবাসতে পারে না! দেখেছিস আমার চেহারাখানা।'

'দেখেছি। এখন বলো কার চিঠি।'

'বললাম না যুবতীর চিঠি!'

ঝিল্লী প্রশ্ন করল—'যুবতীর নাম কি?'

নিখিল মাথা চুল্‌কে বলল—'নাম! জানি না। চিঠিতে নাম নেই।'

ঝিল্লী আর লাবণি আবার হেসে উঠল। লাবণি বলল—'তোমার একটা কথাও আমরা বিশ্বাস করি না। নিশ্চয় পাওনাদারের চিঠি।'

'পাওনাদারের চিঠি! তবে এই দ্যাখ।' নিখিল চিঠিখানা তাদের নাকের সামনে ধরল।

দু'জনে চিঠি পড়ল। লাবণি বলল—'হুঁ। কিন্তু চিঠি পড়েও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, একটা মেয়ে তোমাকে প্রেম নিবেদন করেছে। আমার মনে হয় কেউ তোমার ঠ্যাং ধরে টেনেছে, মানে লেগ-পুলিং।'

নিখিল একটু গরম হয়ে বলল—'যা যা, তোরা এসব কী বুঝবি! এসব গভীর ব্যাপার। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, শুনেছিস কখনো?'

'শুনেছি।' ঝিল্লী আর লাবণি মুখ টিপে হাসতে হাসতে চলে গেল।

এর পর থেকে যখনি কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় নিখিল উৎসুক চোখে তার পানে তাকায় কিন্তু কোনো সাড়া পায় না। তার মন আরো ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কে মেয়েটা? নিশ্চয় তার পরিচিত। তবে এমন লুকোচুরি খেলছে কেন?

মাস খানেক পরে দ্বিতীয় চিঠি এল। এবার একটু বড়—

আমি একটি মেয়ে। তোমাকে ভালবাসি। আমাকে চিনতে পারলে না?

চিঠি পেয়ে নিখিলের মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। লাবণি আর ঝিল্লী হাতের কাছে নেই, কিন্তু কাউকে না বলেও থাকা যায় না, তাই সে ঝোঁকের মাথায় সনতের ঘরে গেল।

সনতের ঘরটি বেশ বড়; এই একটি ঘরের মধ্যে তার একক জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সজ্জিত আছে। এক পাশে খাটের ওপর পুরু গদির বিছানা পাতা; খাটের শিথানের কাঠের ওপর বিচিত্র জাফ্‌রির কারুকার্য। ঘরের অন্য-পাশে জানালার সামনে দেরাজযুক্ত টেবিল, তার ওপর ফটোগ্রাফির নানা সরঞ্জাম সাজানো; তিনটি হাতে-তোলা ক্যামেরা, তার মধ্যে একটি সিনে-ক্যামেরা। ঘরে একটি আয়নার কবাটযুক্ত আলমারিও আছে। ঘরটি ছিমছাম ফিটফাট, দেখে বোঝা যায় সনৎ গোছালো এবং শৌখিন মানুষ।

নিখিল যখন ঘরে ঢুকল তখন সনৎ টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে একটা ক্যামেরার যন্ত্রপাতি খুলে পরীক্ষা করছিল, চোখ তুলে চেয়ে আবার কাজে মন দিল। নিখিল গম্ভীর মুখে বলল—'সনৎদা, গুরুতর ব্যাপার।'

সনৎ একবার চকিতে চোখ তুলল, বলল—'তোমার জীবনে গুরুতর ব্যাপার কী ঘটতে পারে! আমাশা হয়েছে?'

নিখিল বলল—'আমাশা নয়, একটা মেয়ে আমার প্রেমে পড়েছে।'

এবার সনৎ বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। শেষে বলল—'আমাশা নয়, দেখছি তোমার মাথার ব্যারাম হয়েছে। বাংলা দেশে এমন মেয়ে নেই যে তোমার প্রেমে পড়বে।'

নিখিল বলল—'বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ চিঠি। মাসখানেক আগে আর একটা পেয়েছি।'

চিঠি নিয়ে সনৎ একবার চোখ বুলিয়ে ফেরত দিল, প্রশ্ন করল—'মেয়েটাকে চেনো না?'

'না, সেই তো হয়েছে মুশকিল।'

সনৎ একটু চুপ করে রইল, তারপর বলল—'বুঝেছি। তোমার চেনা-শোনার মধ্যে কোনো কালো কুচ্ছিত মেয়ে আছে?'

নিখিল হেসে বলল—'বেশির ভাগই কালো কুচ্ছিত সনৎদা।'

সনৎ বলল—'তাহলে ওই কালো কুচ্ছিত মেয়েদের মধ্যেই একজন বেনামী চিঠি লিখে রহস্য সৃষ্টি করছে। তোমাকে তাতাবার চেষ্টা করছে। তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে ওদের এড়িয়ে চলবে।''

কিন্তু এড়িয়ে চলার ক্ষমতা নিখিলের নেই। তাছাড়া কালো কুচ্ছিত মেয়ের প্রতি তার বিরাগ নেই। তার বিশ্বাস কালো কুচ্ছিত মেয়েরা ভালো বৌ হয়। সে চতুর্গুণ আগ্রহে অনামা প্রেমিকাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

তারপর বেণীমাধব এলেন, বাড়ির আবহাওয়া বদলে গেল। কিন্তু নিখিলের কাছে নিয়মিত চিঠি আসতে লাগল। তৃতীয় চিঠিতে লেখা হয়েছে—

আমি তোমাকে ভালবাসি। আমাকে চিনতে পারলে না? আমি কিন্তু সুন্দর মেয়ে নই।

নিখিল ভাবল, সনৎদা ঠিক ধরেছে। কিন্তু সে দমল না। তার জীবনে এক অভাবিত রোমান্স এসেছে; একে তুচ্ছ করার সাধ্য তার নেই।

ওদিকে বেণীমাধব হপ্তা তিনেক পুত্রবধূর হাতের রান্না খেয়ে বেশ ভালই রইলেন। তারপর একদা গভীর রাত্রে ওঁর ঘুম ভেঙে গেল; পেটে দারুণ যন্ত্রণা। যাতনায় ছটফট করতে করতে মেঘরাজকে ডাকলেন। বেণীমাধব দু'হাতে পেট চেপে ধরে বসেছিলেন, বললেন—'মেঘরাজ, শীগ্‌গির ডাক্তার সেনকে ফোন করো, বলো আমি পেটের যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি, এখনি যেন আসেন।'

মেঘরাজ ফোন করল, আধ ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার সেন এলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। পেটের প্রদাহ কিন্তু সহজে উপশম হলো না; রাত্রি পাঁচটা পর্যন্ত ধস্তাধস্তির পর ব্যথা শান্ত হলো। বেণীমাধব নির্জীব দেহে বিছানায় শুয়ে বিস্ফারিত চোখে ডাক্তারের পানে চাইলেন—'ডাক্তার, কেন এমন হলো বলতে পার?'

ডাক্তার গম্ভীর মুখে ক্ষণেক চুপ মেরে রইলেন, তারপর অনিচ্ছাভরে বললেন—

নিঃসংশয়ে বলা শক্ত। অ্যালারজি হতে পারে, শূল ব্যথা হতে পারে, কিংবা—'

'কিংবা -?'

'কিংবা বিষের ক্রিয়া। আমি বলি কি, আপনি কিছুদিন আমার নার্সিং হোমে থাকবেন চলুন। চিকিৎসা পথ্য দুইই হবে।'

বেণীমাধবের কিন্তু নার্সিং হোমে বিশ্বাস নেই; তাঁর ধারণা যারা একবার নার্সিং হোমে ঢুকেছ তারা আর ফিরে আসে না। তিনি যথাসম্ভব দৃঢ়স্বরে বললেন- 'না ডাক্তার, আমি বাড়িতেই থাকব।'

ডাক্তার উঠলেন—'আচ্ছা, এখন চলি। যদি আবার কোনো গণ্ডগোল হয় তৎক্ষণাৎ খবর দেবেন। কাল আর পরশু স্রেফ দই খেয়ে থাকবেন।'

মেঘরাজ ডাক্তারের সঙ্গে নীচে পর্যন্ত গিয়ে সদর দরজা খুলে দিল, ডাক্তার চলে গেলেন। মেঘরাজ দরজা বন্ধ করে আবার ওপরে উঠে এল। বাড়ির অন্য মানুষগুলো তখনো ঘুমোচ্ছে, ডাক্তারের আসা-যাওয়া জানতে পারল না।

বিছানায় শুয়ে বেণীমাধব তখন শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে চিন্তা করছিলেন। দুরূহ দুর্গম চিন্তা। পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতি। একবার নয়, দু-দু'বার এই ব্যাপার হলো...ছেলে আর মেয়ে অপেক্ষা করে আছে আমি কবে মরব...আমি মরছি না দেখে অধীর হয়ে উঠেছে! কিন্তু ছেলে মেয়ে জামাই পুত্রবধূ এমন কাজ করতে পারে? কেন করবে না, সংসারে টাকাই খাঁটি জিনিস, আর যা-কিছু সব ভুয়ো। ডাক্তারের মনেও সন্দেহ ঢুকেছে...

সকাল সাতটার সময় বেণীমাধব বিছানায় উঠে বসলেন, মেঘরাজ তাঁর দাড়ি কামিয়ে দিল। তারপর তিনি তার হাতে টাকা দিয়ে বললেন- 'যাও, বাজার থেকে দই কিনে নিয়ে এসো। এক সের ভাল দই।'

টাকা নিয়ে মেঘরাজ চলে গেল। সে সৈনিক, হুকুম তামিল করে, কথা বলে না। তার মুখ দেখেও কিছু বোঝা যায় না।

সাড়ে সাতটার সময় আরতি এল, তার সঙ্গে ঝি ট্রে'র ওপর চা ও প্রাতরাশ নিয়ে এসেছে। ঘরে ঢুকেই আরতি চমকে উঠল; বেণীমাধব বিছানায় বসে এক দৃষ্টে তার পানে চেয়ে আছেন। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল- 'বাবা—'

বেণীমাধব ধীর স্বরে বললেন—'বৌমা, খাবার ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আজ থেকে আমার খাবার ব্যবস্থা আমি নিজেই করব।'

আরতির মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল—'কেন বাবা?'

বেণীমাধব গত রাত্রির ঘটনা বললেন। আরতি শুনে মুখ কালি করে চলে গেল।

কথাটা ঝিয়ের মুখে অচিরাৎ প্রচারিত হলো। শুনে গায়ত্রী ছুটতে ছুটতে বাপের কাছে এল—'বাবা, বৌদির রান্না তোমার সহ্য হবে না আমি জানতুম। আজ থেকে আমি আবার রাঁধব।'

বেণীমাধব মেয়েকে আপাদমস্তক দেখে কড়া সুরে বললেন—'না—'

বেলা তিনটের সময় তিনি কর্তব্য স্থির করে বিছানায় উঠে বসে ডাকলেন— 'মেঘরাজ!'

মেঘরাজ এসে দাঁড়াল—'জি।'

বেণীমাধব প্রশ্ন করলেন- 'তোমার বৌ আছে?'

মেঘরাজ ভ্রূ তুলে খানিক চেয়ে রইল, যেন প্রশ্নের তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করছে 'জি, আছে।'

'ছেলেপুলে?'

'জি, না।'

'স্ত্রী নিশ্চয় রসুই করতে জানে?'

'জি, জানে।'

'বেশ। এখন আমার প্রস্তাব শোনো। তুমি দেশে গিয়ে তোমার ঔরৎকে নিয়ে এসো। নীচের তলায় খালি ঘর আছে, তার একটাতে তোমরা থাকবে। তোমার ঔরৎ আমার রসুই করবে। আমি তোমার মাইনে ডবল্ করে দিলাম। তুমি কাল সকালে প্লেনে দিল্লী চলে যাও, বৌকে নিয়ে যত শীগ্গির পার ফিরে আসবে; প্লেনের ভাড়া ইত্যাদি সব খরচ আমি দেবো। কেমন?'

'জি।'

'বেশ, নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু তুমি যতদিন ফিরে না আসছ ততদিনের জন্যে আমার রসদ দরকার। এই নাও টাকা, বাজারে গিয়ে আরো সের দুই দই, কড়া পাকের সন্দেশ, গোটা দুই বড় পাঁউরুটি, মাখন, মারমালেড, টিনের দুধ, আঙুর আপেল এই সব কিনে নিয়ে এসো ফ্রিজে থাকবে। তুমি বাজারে যাও, আমি ইতিমধ্যে টেলিফোনে তোমার এয়ার টিকিটের ব্যবস্থা করছি।'

পরদিন মেঘরাজ চলে গেল। বেণীমাধব একলা রইলেন। দই এবং অন্যান্য সাত্ত্বিক আহারের ফলে দু-তিন দিনের মধ্যেই তাঁর পেট সুস্থ হলো। তিনি অবসর বিনোদনের জন্য ডাক্তার সেন ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে টেলিফোনে গল্প করেন। ঘরের মধ্যে কারুর যাওয়া-আসা নেই। দরজা সর্বদা বন্ধ থাকে।

চতুর্থ দিনে মেঘরাজ ফিরে এল। সঙ্গে বৌ।

বৌ এর পরনে রঙীন শাড়ি, মুখে ঘোমটা। মেঘরাজ বেণীমাধবের ঘরে গিয়ে বৌ-এর মুখ থেকে ঘোমটা সরিয়ে দিল। বেণীমাধব দেখলেন, একটি মিষ্টি হাসি-হাসি মুখ। রঙ ময়লা, কাজল-পরা চোখে যৌবনের মাদকতা। মেঘরাজের অনুপাতে বয়স অনেক কম, কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। বৌ দু'হাত দিয়ে বেণীমাধবের পা ছুঁয়ে নিজের মাথায় ঠেকাল।

বেণীমাধব প্রসন্ন হয়ে বললেন 'বেশ বেশ। কি নাম তোমার?'

বৌ বলল- 'মৌদিনী।'

অতঃপর বেণীমাধবের স্বাধীন সংসারযাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। নীচের তলায় কোণের একটা ঘরে মেঘরাজ ও মৌদিনীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হলো। তেতলায় একটা ঘর রান্নাঘরে পরিণত হয়েছে, বাসনকোসন এসেছে; সকালবেলা মৌদিনী নীচের ঘর থেকে ওপরে উঠে এসে বেণীমাধবের চা টোস্ট তৈরি করে দেয়। ইতিমধ্যে মেঘরাজ গড়িয়াহাট থেকে বাজার করে আনে। রান্না আরম্ভ হয়; তিন জনের রান্না। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে মৌদিনী নীচে নিজের ঘরে চলে যায়, মেঘরাজ ওপরে পাহারায় থাকে। বিকেলবেলা থেকে আবার চা ও রান্নার পর্ব আরম্ভ হয়; রাত্রি আটটার সময় সকলের নৈশাহার শেষ হলে মৌদিনী রাত্রির মত নীচে চলে যায়; বেণীমাধব তুষ্ট মনে শয্যা আশ্রয় করেন, মেঘরাজ দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার সামনে নিজের বিছানা পাতে।

এই হলো তাদের দিনচর্যা।

মেদিনীর দুপুরবেলা কোনো কাজ নেই, সেই অবসরে সে বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট; বিশেষত পুরুষেরা। তার আচরণে শালীনতা আছে সংকোচ নেই; তার কথায় সরসতা আছে প্রগল্ভতা নেই। সকলেই তার কাছে স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে। সে আসার পর থেকে বাড়িতে যেন নতুন সজীবতা দেখা দিয়েছে। গায়ত্রী এবং আরতির মন আগে থাকতে মেদিনীর প্রতি বিমুখ ছিল, কিন্তু ক্রমশ তাদের বিমুখতা অনেকটা দূর হয়েছে। কেবল মকরন্দ মেদিনীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন; মেদিনীর যখন অবসর মকরন্দ তখন বাড়িতে থাকে না।

বাড়িতে আস্তে আস্তে সহজ ভাব ফিরে ছল। বেণীমাধব এখন নিজেকে অনেকটা নিরাপদ বোধ করছেন। তবু তাঁর মনের ওপর যে ধাক্কা লেগেছে তার জের এখনো কাটেনি। গভীর রাত্রে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে তিনি ভাবেন—আমার নিজের ছেলে নিজের মেয়ে আমার মৃত্যু কামনা করে। এ কি সম্ভব, না আমার অলীক সন্দেহ? অনেকক্ষণ জেগে তিনি নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে ওঠেন, নিঃশব্দে ভেজানো দরজা একটু ফাঁক করে দেখেন, বাইরে মেঘরাজ দরজা আগলে ঘুমোচ্ছে। আশ্বস্ত মনে তিনি বিছানায় ফিরে যান।

মেদিনী আসার পর আর একটা সুবিধা হয়েছে। কলকাতার রেওয়াজ অনুযায়ী সদর দরজা সব সময়েই বন্ধ থাকে, কেবল যাতায়াতের সময় খোলা হয়। আগে বাইরে থেকে কেউ এলে দোর-ঠেলাঠেলি হাঁকাহাঁকি করতে হতো, এখন তা করতে হয় না। মেদিনীর ঘর সদব দরজার ঠিক পাশেই, রাত্রিবেলা বাইরে থেকে কেউ দরজায় টোকা দিলেই মেদিনী এসে দরজা খুলে দেয়।

মহাকবি কালিদাস লিখেছেন—হ্রদের প্রসন্ন উপরিভাগ দেখে বোঝা যায় না তার গভীর তলদেশে হিংস্র জলজন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মাসখানেক কাটল। ইতিমধ্যে বাড়িতে ছোটখাটো কয়েকটা ঘটনা ঘটেছিল যা উল্লেখযোগ্য—

নিখিল আবার অদৃশ্য নায়িকার চিঠি পেয়েছে—আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি হাসতে জানো, হাসাতে জানো। আমাদের বাড়িতে কেউ হাসে না। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

চিঠি পেয়ে নিখিল আহ্লাদে প্রায় দড়ি-ছেঁড়া হয়ে উঠল; চিঠি হাতে নিযে কিছুক্ষণ নিজের ঘরে পাগলের মত দাপাদাপি করল, তারপর সনতের ঘরে গেল। নিখিলের ঘরটা আকারে-প্রকারে সনতের অনুরূপ, কিন্তু অত্যন্ত অগোছালো। তক্তপোশের ওপর বিছানাটা তাল পাকিয়ে আছে, টেবিলের ওপর ধুলোর পুরু প্রলেপ। দেখে বোঝা যায়—এ ঘরে গৃহিণীর করস্পর্শের প্রয়োজন আছে।

সনৎ তখন ক্যামেরা নিয়ে বেরুচ্ছিল। নিখিল বলল—'এ কি সনৎদা, সজ্জিত-গুজ্জিত হয়ে চলেছ কোথায়?'

সনৎ বলল—'গ্র্যান্ড হোটেলে পার্টি আছে। হাতে ওটা কি?'

নিখিল চিঠি তুলে ধরে বলল—'আবার চিঠি পেয়েছি, পড়ে দেখ। এ মেয়ে কালো কচ্ছিত হোক, কানা খোঁড়া হোক, একেই আমি বিয়ে করব।'

সনৎ চিঠি পড়ে বলল—'হুঃ, কানা-খোঁড়াই মনে হচ্ছে। তা বিয়ে করতে চাও কর-না, কে তোমাকে আটকাচ্ছে। কিন্তু তার আগে মেয়েটাকে খুঁজে বার করতে

হবে তো!'

সনৎ নিজের ঘরে তালা বন্ধ করল। মেঘরাজের ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখল মেদিনী ঘরে রয়েছে। সনৎ একবার দাঁড়িয়ে বলল—'মেদিনী, আজ আমার ফিরতে দেরি হবে। একটা পার্টিতে ফটো তুলতে যাব, কখন ফিরব ঠিক নেই। আমি দোরে টোকা দিলে দোর খুলে দিও।'

মেদিনী নিজের দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে এখন বাংলা ভাষা বেশ বুঝতে পারে, কিন্তু বলতে পারে না। চোখ নীচু করে সে নম্রস্বরে বলল—'জি।'

সনৎ বেরিয়ে যাওয়ার পর নিখিল মেদিনীর কাছে এসে দাঁড়াল, বলল—'মেদিনী, তুম জানতা হ্যায়, একঠো লেড়কি হামকো ভালবাসামে গির গিয়া। হাম উসকে শাদি করেগা।'

মেদিনীর চোখে কৌতুক নেচে উঠল, সে আঁচল দিয়ে হাসি চাপা দিতে দিতে দোর ভেজিয়ে দিল।

মেদিনী আসার পর থেকে গঙ্গাধরের চিত্ত চঞ্চল হয়েছে। বয়সটা খারাপ: যৌবন বিদায় নেবার আগে মরণ-কামড় দিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গাধর যখন বিকালবেলা বাইরে যায় তখন মেদিনীর দোরের দিকে তাকাতে তাকাতে যায়, কদাচ মেদিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হলে চোখ সরিয়ে নেয় না, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে; মেদিনী চৌকাঠে ঠেস দিয়ে চোখ নীচু করে তার দৃষ্টিপ্রসাদ গ্রহণ করে। পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টিতে সে অভ্যস্ত।

অজয়ের ভাবভঙ্গী একটু অন্যরকম। সে যেন মেদিনীকে দেখে বাৎসল্য স্নেহ অনুভব করে; তার সঙ্গে পাটিচাটি গল্প করে, তার দেশের খবর নেয়। মেদিনী সরলভাবে কথা বলে, মনে মনে হাসে।

মকরন্দ প্রথমদিকে কিছুদিন মেদিনীকে দেখেনি। একবার তিন-চারদিন সে বাড়ি ফিরল না; জানা গেল পুলিস ভ্যান লক্ষ্য করে ইঁট ছোঁড়ার জন্যে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। চতুর্থ দিন সে মুক্তি পেয়ে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় এসে বাড়ির সদর দরজায় ধাক্কা দিল। মেদিনী গিয়ে দোর খুলল। মকরন্দর চেহারা শুকনো, জামা ছেঁড়া, চুল উস্কখুস্ক; সে তীব্র দৃষ্টিতে মেদিনীর পানে চেয়ে রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল—'তুমি কে?'

'আমি মেদিনী।'

'অ- মেঘরাজের বৌ!' কুটিলভাবে মুখ বিকৃত করে সে মেদিনীকে আপাদ-মস্তক দেখল, তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল। মেদিনী জানত মকরন্দ কে, সে মুখ টিপে হেসে নিজের ঘরে ফিরে গেল।—

তিন মাস কেটে যাবার পরও যখন বেণীমাধবের পেটের আর কোনো গণ্ডগোল হলো না তখন তিনি নিঃসংশয়ে বুঝলেন তাঁর পেটের কোনো দোষ নেই, হজম করার শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে। পুত্রবধূ এবং মেয়ের প্রতি তাঁর সন্দেহ নিশ্চয়তায় পরিণত হলো। তারপর একদা গভীর রাত্রে বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন ছুরি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তার গলা কাটছে।

তারপর তিনি আর ঘুমোতে পারলেন না। বাকি রাত্রিটা চিন্তা করে কাটালেন। মৃত্যুভয়ে জড়িত ঐহিক চিন্তা।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় তিনি তাঁর সলিসিটারকে টেলিফোন করলেন—'সুধাংশুবাবু, আমি উইল করতে চাই। বেশি নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই,

আপনি একবার আসবেন?'

বেণীমাধব পুরনো মক্কেল, মালদার লোক। সুধাংশুবাবু বললেন—'বিকেলবেলা যাব।'

বিকেলবেলা সুধাংশুবাবু এলেন। দোর বন্ধ করে দু'জনে প্রায় দেড় ঘণ্টা উইলের শর্তাদি আলোচনা করলেন; সুধাংশুবাবু অনেক নোট করলেন। শেষে বললেন—'পরশু আমি উইল তৈরি করে নিয়ে আসব, আপনি উইল পড়ে দস্তখৎ করে দেবেন। দু'জন সাক্ষীও আমি সঙ্গে আনব।'

সন্ধ্যের পর সনৎ আর নিখিল বেণীমাধবের কাছে এসে বসল, কুশল প্রশ্ন করল। মেদিনী পাশের ঘরে রান্না করছিল; বেণীমাধব ভাগনেদের চা ও আলু ভাজা খাওয়ালেন।

ওরা চলে যাবার পর বেণীমাধব মেঘরাজকে ডেকে বললেন—'দোতলা থেকে সকলকে ডেকে নিয়ে এসো।'

দোতলায় মকরন্দ ছাড়া আর সকলেই ছিল, সমন পেয়ে ছুটে এল। ঝিল্লী আর লাবণিও এল। বেণীমাধব খাটের ধারে বসেছিলেন, দুই নাতনীকে ডেকে নিজের দু' পাশে বসালেন, তারপর ছেলে-বৌ মেয়ে-জামাই-এর পানে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—'আমি উইল করতে দিয়েছি। উইলের ব্যবস্থা আগে থাকতে তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই।'

সকলে সশঙ্ক মুখে চেয়ে রইল। বেণীমাধব ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—'আমার মৃত্যুর পর আমার নগদ সম্পত্তি তোমরা হাতে পাবে না। অ্যানুইটির ব্যবস্থা করেছি; তোমরা এখন যেমন মাসহারা পাচ্ছ তেমনি পাবে। কোনো অবস্থাতেই যাতে তোমাদের অর্থকষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে মাসহারার টাকার অঙ্ক ধার্য করেছি। বাড়িটা যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে ততদিন সমান ভাগ করে ভোগ করবে, বিক্রি করতে পারবে না।'

চারজনে মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে রইল। বেণীমাধব দুই নাতনীর কাঁধে হাত রেখে বললেন—'ঝিল্লী আর লাবণির জন্যে আমি আগে থেকেই মেয়াদী বীমা করে রেখেছি, একুশ বছর বয়স পূর্ণ হলে ওরা প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে। তাছাড়া আমি ঠিক করেছি ওদের বিয়ে দিয়ে যাব। তোমাদের মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হবে না। লাবণির জন্যে একটি ভাল পাত্র আছে; ছেলেটি মিলিটারিতে লেফটেনেণ্ট। ঝিল্লীর জন্যে মনের মত পাত্র এখনো পাইনি, পেলেই একসঙ্গে দু'জনের বিয়ে দেব।' তাঁর মুখে একটু প্রসন্নতার ভাব এসেছিল, আবার তা মুছে গেল; তিনি ভ্রূকুটি করে বললেন—'মকরন্দকেও আলাদা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে বড় অসভ্য বেয়াদব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে কিছু দেব না।'

বেণীমাধব চুপ করলেন, তাঁর শ্রোতারাও চুপ করে রইল। কারুর মুখে কথা নেই। শেষে গঙ্গাধর একটু কেশে অস্পষ্টভাবে বলল—'আপনার সম্পত্তি আপনি যেমন ইচ্ছে ব্যবস্থা করুন, আমাদের বলবার কিছু নেই। তবে টাকার দর আজ এক রকম কাল এক রকম—'

গায়ত্রী স্বামীর কথায় বাধা দিয়ে ভারী গলায় বলল—'বাবা, তুমি যা দেবে তাই মাথা পেতে নেব। উইল কি সই হয়ে গেছে?'

বেণীমাধব কারুর দিকে তাকালেন না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—

'উকিলকে উইল তৈরি করতে দিয়েছি, কাল পরশু সই দস্তখৎ হবে। হ্যাঁ, একটা শর্তের কথা তোমাদের বলা হয়নি। উইলের শর্ত থাকবে, যদি আমার অপঘাত মৃত্যু হয় তাহলে তোমরা কেউ আমার এক পয়সা পাবে না, সব সম্পত্তি পাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।'

এই কথা শুনে সকলে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রি হলো। যথাসময়ে বেণীমাধব নৈশাহার সম্পন্ন করে শয্যা নিলেন। মেঘরাজ ও মোদিনী পাশের ঘরে খাওয়াদাওয়া করল; মেঘরাজ সামনের দরজা ভেজিয়ে দরজা আগলে বিছানা পাতল, মোদিনী নিজের ঘরে গেল।

ওদিকে দোতলায় থমথমে ভাব। লাবণির নাচের মাস্টার এসেছিল, কিন্তু বাড়িতে কারুর নাচের প্রতি রুচি নেই। পরাগ আর লাবণি আড়ালে কথা বলল, তারপর চুপিচুপি নিঃশব্দে সিনেমা দেখতে চলে গেল। কেউ তাদের যাওয়া লক্ষ্য করল কিনা সন্দেহ।

নিখিল সন্ধ্যের পরই কাজে চলে গিয়েছিল; সে নিশাচর মানুষ, সারারাত কাজ করে, সকালবেলা ফিরে আসে।

রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় সনৎ ক্যামেরা নিয়ে বেরুল, মোদিনীর দোরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—'মোদিনী, আমি বর্ধমানে যাচ্ছি, কাল সকালে সেখানে একটা নাচগানের মজলিশ আছে। কাল বিকেলের দিকে কোনো সময় ফিরব। আমার জন্যে আজ রাত্রে তোমাকে দোর খুলতে হবে না।' বলে একটু হাসল।

মোদিনী ক্ষণকাল তার চোখে চোখ রেখে বলল 'জি।'

সনৎ চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে মকরন্দ এল, মোদিনীকে কড়া সুরে বলল 'দোর বন্ধ করে দাও। রাত্রে কেউ যদি বাইরে থেকে এসে আমার খোঁজ করে, বলবে আমি বাড়ি নেই।' উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ওপরে চলে গেল। মোদিনী সদর দরজায় খিল লাগাল।

তারপর বাড়ির ওপর রাত্রির রহস্যময় যবনিকা নেমে এল।

পরদিন ভোরবেলা মোদিনী সদর দরজা খুলতে গিয়ে দেখল, কবাট ভেজানো আছে কিন্তু খিল খোলা। সে ভুরু কুঁচকে একটু ভাবল, তারপর কবাট একটু ফাঁক করল; বাইরে নিখিলকে দেখা গেল, সে কাজ শেষ করে ফিরছে। মোদিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে হেসে বলল—'তোমরা কাম শুরু হুয়া হামরা কাম শেষ হুয়া। এবার খুব ঘুমায়গা।'

নিখিল নিজের ঘরে চলে গেল। মোদিনী দরজা ফাঁক করে রাখল, কারণ দোতলায় ঝি কাজ করতে আসবে। তারপর, সে কর্তার চা তৈরি করার জন্যে সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় চলল।

মিনিটখানেক কাটতে না কাটতে তিনতলা থেকে স্ত্রীকণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ এল, তারপর ধপ করে শব্দ। নিখিল তার ঘরে গায়ের জামা খুলে গেঞ্জি খোলবার উপক্রম করছিল, তীব্র চীৎকার শুনে সেই অবস্থাতেই ওপরে ছুটল। দোতলা থেকেও সকলে বেরিয়ে এসেছিল, সকলে প্রায় একসঙ্গে তেতলায় গিয়ে পৌঁছল। তারপর বেণীমাধবের দোরের সামনে ভয়াবহ দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মেঘরাজ বিছানার ওপর ঊর্ধ্বমুখে পড়ে আছে, তার গলা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত কাটা; বালিশ এবং বিছানার ওপর পুরু হয়ে রক্ত জমেছে। মোদিনী তার

পায়ের দিকে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ কারুর মুখ দিয়ে কথা সরল না, তারপর নিখিল চেঁচিয়ে উঠল—'মামা—মামা বেঁচে আছেন তো?'

গায়ত্রী, আরতি এবং ঝিল্লী কেঁদে উঠল, অজয় এবং গঙ্গাধর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল; কারুর যেন নড়বার শক্তি নেই। নিখিল তখন মেঘরাজকে ডিঙিয়ে বন্ধ দোরে ঠেলা দিল। দোর খুলে গেল; খোলা দোর দিয়ে দেখা গেল, বেণীমাধব খাটের ওপর শুয়ে আছেন, তাঁর গলার নীচে গাঢ় রক্তের চাপ জমা হয়ে আছে। মেঘরাজকে যেভাবে যে-অস্ত্র দিয়ে গলা কাটা হয়েছে বেণীমাধবকে ঠিক সেইভাবে সেই অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

কান্নার একটা কলরোল উঠল। নিখিল ক্ষণিকের জন্য জড়বৎ দাঁড়িয়ে থেকে ধবেব মধ্যে ছুটে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিল। প্রথমে নিজের সংবাদপত্রের অফিসে ফোন করল, তাবেপর থানায়।

তিন

ব্যোমকেশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখল, সদর দরজায় পুলিস পাহারা। কনস্টেবল ব্যোমকেশকে দেখে স্যালুট করল, বলল—'ইন্সপেক্টর সাহেব নীচের তলায় বসবার ঘরে আছেন।'

প্রশস্ত ড্রয়িংরুমে ইন্সপেক্টর রাখাল সরকার এবং দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর উপস্থিত ছিলেন, মধ্য টেবিল ঘিরে একটা ফাইল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ব্যোমকেশ প্রবেশ করতেই রাখালবাবু তার কাছে এসে দাঁড়ালেন, করুণ হেসে বললেন 'জড়িয়ে পড়েছি ব্যোমকেশদা। বেণীসংহার নামটা আপনি ঠিকই দিয়েছেন। বেণীসংহার শব্দের আসল মানে শুনেছি খোঁপা বাঁধা; মেয়েরা প্রথমে চুলের বিনুনি করে, তারপর বিনুনি জড়িয়ে খোঁপা বাঁধে। এ ব্যাপাবও অনেকটা সেই রকম; এমন জটিল কুটিল তার বাঁধুনি যে বেণীসংহার উন্মোচন কবা দুষ্কব হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুনের মোটিভ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সন্দেহভাজন লোকেব সংখ্যাও পাঁচ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ; তবু ঠিক কোন্ লোকটি এ কাজ করেছে তা ধরা যাচ্ছে না।'

'এসো বসা যাক।' দু'জনে দুটো চেয়ারে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসলেন—'এবার বলো।'

রাখালবাবু কাল থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা ব্যোমকেশকে শোনালেন, প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়েও কয়েকটি তথ্য প্রকাশ পেল। ব্যোমকেশ বলল—'মোটিভ কি?'

'বুড়োর অগাধ টাকা। ছেলে এবং মেয়েকে মাসহারা দিত, কিন্তু তাতে তাদের মন উঠত না। ডাক্তার অবিনাশ সেন সন্দেহ করেন, মেয়ে এবং পুত্রবধূ বিষাক্ত খাবার খাইয়ে বুড়োকে মারবার চেষ্টা করছিল। তা যদি হয় তাহলে ছেলে এবং জামাইয়ের মধ্যে ষড় আছে। যা দিনকাল পড়েছে কিছুই অসম্ভব নয়।'

'মেঘরাজকে মারবার উদ্দেশ্য কি?'

'মেঘরাজ রাত্রে বেণীমাধবের দোরের সামনে বিছানা পেতে শুতো। দোর

ভেজানো থাকত, যাতে বেণীমাধব ডাকলেই সে ঘরে ঢুকতে পারে। সুতরাং তাকে বধ না করে ঘরে ঢোকা যায় না। তাকে ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকতে গেলে সে জেগে উঠবে। তাই তাকে আগে মারা দরকার হয়েছিল।'

'মারণাস্ত্রটা পাওয়া যায়নি?'

'না। তবে ময়না তদন্ত থেকে জানা গেছে যে, অস্ত্রটা খুব ধারালো ছিল। একই অস্ত্র দিয়ে দু'জনকে মেরেছে। অস্ত্রের এক টানে গলা দু'ফাঁক হয়ে গেছে।'

'হত্যার সময়টা জানা গেছে?'

'স্থূল ভাবে রাত্রি বারোটা থেকে তিনটের মধ্যে।'

'হুঁ। সন্দেহভাজন পাঁচজন কারা?'

'অজয় ও তার স্ত্রী আরতি, গায়ত্রী ও তার স্বামী গঙ্গাধর। এবং অজয়ের ছেলে মকরন্দ। মকরন্দকে মেঘরাজ একদিন বেণীমাধবের হুকুমে চড় মেরেছিল। ঝিল্লীকে বাদ দেওয়া যায়, সে ছেলেমানুষ, তার কোনো মোটিভ নেই।'

'মকরন্দ ছেলেটা করে কি?'

'পলিটিক্সের হুজুগ করে। কলেজে নাম লেখানো আছে, এই পর্যন্ত। সে-রাত্রে আন্দাজ ন'টার সময় বাড়িতে এসেছিল, তারপর রাত্রেই কখন বেরিয়ে গেছে কেউ জানে না। সেই যে পালিয়েছে আর ফিরে আসেনি। তার নামে হুলিয়া জারি করেছি।'

'বাড়িতে এখন কে কে আছে?'

'অজয় আরতি গঙ্গাধর গায়ত্রী ঝিল্লী নিখিল রায় সনৎ গাঙ্গুলী আর মেঘরাজের বিধবা মেদিনী। অজয়ের মেয়ে লাবণি সে-রাত্রে তার নাচের মাস্টারের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি। নিখিল আর সনৎ রাত্রে কাজে বেরিয়েছিল, তারা পরদিন ফিরে এসেছে। যারা বাড়িতে আছে তাদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।'

'সকলের আঙুলের ছাপ নিয়েছ নিশ্চয়।'

'তা নিয়েছি।'

'খানাতল্লাশ করে কিছু পেলে?'

'সন্দেহজনক কিছু পাইনি।'

'বেশ, এবার জবানবন্দীর নথিটা দেখি।'

'এই যে।' রাখালবাবু টেবিল থেকে ফাইল তুলে নিয়ে ব্যোমকেশকে দিলেন। এই সময় সদর দরজায় কনস্টেবল এসে জানাল যে, সলিসিটার সুধাংশু বাগচী নামে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান। রাখালবাবু বললেন—'নিয়ে এসো।'

সুধাংশুবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন, হাতে পাট করা খবরের কাগজ। রাখালবাবুর পানে চেয়ে বললেন—'আমি বেণীমাধববাবুর সলিসিটার। আজ খবরের কাগজ খুলেই দেখলাম—'

'বসুন।'

সুধাংশুবাবু একটি চেয়ারে বসলেন। রাখালবাবু তাঁর সামনে দাঁড়ালেন, ব্যোমকেশও এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন—'বেণীমাধববাবুর সঙ্গে কবে আপনার শেষ দেখা হয়েছিল?'

সুধাংশুবাবু বললেন—'পরশু। আমরা অনেকদিন ধরে তাঁর বৈষয়িক কাজ-

কর্ম দেখাশোনা করে আসছি। পরশু তিনি আমাকে ফোন ক'রে জানালেন যে, তিনি উইল করতে চান। আমি বিকেলবেলা এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উইলে কি কি শর্ত থাকবে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন। আমি উইল তৈরি করে আজ তাঁকে দলিল দেখিয়ে সহি-দস্তখৎ করিয়ে নেব বলে সব ঠিক করে রেখেছিলাম, তারপর আজ সকালে কাগজ খুলে এই সংবাদ পেলাম।'

রাখালবাবু চকিতে একবার ব্যোমকেশের পানে চেয়ে বললেন—'উইলে কি কি শর্ত আছে আমাদের বলতে বাধা আছে কি?'

সুধাংশুবাবু বললেন—'অন্য সময় নিশ্চয় বাধা থাকত, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বাধা নেই। বরং আপনাদের সুবিধা হতে পারে।'

তিনি উইলের শর্তগুলি শোনালেন; অপঘাতে মৃত্যু হলে সমস্ত সম্পত্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাবে সে কথাও উল্লেখ করলেন।

বেলা এগারটা নাগাদ তিনি উঠলেন, বলে গেলেন 'যদি আমার কাছ থেকে আরো কিছু জানতে চান কিংবা উইল পড়ে দেখতে চান, আমার অফিসে খবর দেবেন।'

তিনি চলে যাবার পর রাখালবাবু বললেন—'মোটিভ আরো পাকা হলো। বুড়োকে আর দু'দিন বাঁচতে দিলেই এত বড় সম্পত্তিটা বেহাত হয়ে যেত।'

ব্যোমকেশ বলল—'হুঁ। আমি এবার উঠব। কিন্তু আগে বেণীমাধবের ঘরটা দেখে যেতে চাই।'

'চলুন।'

দোতলার সিঁড়ির মাথায় একজন কনস্টেবল। তেতলায় বেণীমাধবের দরজায় তালা লাগানো, উপরন্তু একজন কনস্টেবল টুলে বসে পাহারা দিচ্ছে। মেঘরাজের রক্তাক্ত বিছানা পরীক্ষার জন্য স্থানান্তরিত হয়েছে।

রাখালবাবু পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুললেন, দু'জনে ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের মাঝখানে খাটের ওপর বিছানা নেই, আর সব যেমন ছিল তেমনি আছে। ব্যোমকেশ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে চোখ ফেরাল, তারপর অস্ফুট স্বরে বলল—'তোমরা অবশ্য সবই দেখেছ, তবু—'

রাখালবাবু ঘাড় নাড়লেন—'অধিকন্তু ন দোষায়।'

'লোহার সিন্দুকের চাবি কোথায় ছিল?'

'লোহার সিন্দুকের গায়ে লাগানো ছিল। সিন্দুকের মধ্যে তিনখানা একশো টাকার নোট ছিল, পাঁচ টাকা দশ টাকার নোট বা খুচরো টাকা পয়সা একটাও ছিল না। মনে হয় খুনী সিন্দুক খুলে খুচরো টাকা পয়সা নিয়েছে কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে নম্বরী নোট নেয়নি।'

'হুঁ। সিন্দুকে আর কী ছিল?'

'কিছু দলিল-পত্র, কিছু রসিদ, ব্যাঙ্কের খাতা ও চেকবুক। দুটো ব্যাঙ্কে টাকা আছে, সাকুল্যে প্রায় চল্লিশ হাজার। তাছাড়া শেয়ার সার্টিফিকেট ও fixed deposit, আছে আন্দাজ এগারো লাখ টাকার। মালদার লোক ছিলেন। ছেলে আর মেয়েকে সাড়ে সাত শো টাকা হিসেবে মাসহারা দিতেন। তাঁর নিজের খরচ ছিল সাত শো টাকা, মেঘরাজকে মাইনে দিতেন আড়াই শো টাকা। চেকবুকের counterfoil থেকে এইসব খবর জানা যায়।'

'সিন্দুকের ভিতরে কি বাইরে বেণীমাধব ছাড়া অন্য কারুর আঙুলের ছাপ

আছে?'

'কারুর আঙুলের ছাপ নেই, একেবারে লেপা-পোঁছা।'

'হুঁ, আততায়ী লোকটি বেশ হুঁশিয়ার।' ব্যোমকেশ সিন্দুক খুলল না, ফ্রিজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল—'ফ্রিজে কারুর আঙুলের ছাপ ছিল?'

'ছিল। বেণীমাধব, মেঘরাজ এবং মেদিনী—তিনজনের আঙুলের ছাপ ছিল। আর কারুর ছাপ পাওয়া যায়নি।'

হাতল ধরে ব্যোমকেশ ফ্রিজ খুলল, ভিতরে আলো জ্বলে উঠল; ফ্রিজ চালু আছে। ভেতরে নানা জাতের ফলমূল। সারি সারি ডিম, মাছ, মাংস, দুধের বোতল রয়েছে। ব্যোমকেশ আবার দোর বন্ধ করে দিল।

ঘরের পিছন দিকের দেয়ালে একটা লম্বা ধরনের আয়না টাঙানো ছিল, তার নীচে তাকের ওপর চিরুনী বুরুশ চুলের তেল ও দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। দাড়ি কামাবার সরঞ্জামের বিশেষত্ব এই যে, ক্ষুরটা সেফটি রেজর নয়, সাবেক কালের ভাঁজ-করা লম্বা ক্ষুর। ব্যোমকেশ সন্তর্পণে খাপসুদ্ধ ক্ষুর তুলে নিয়ে বলল—'ক্ষুরটা বের করে দেখেছে নাকি?'

রাখালবাবু চক্ষু একটু বিস্ফারিত করলেন, বললেন—'না। বেণীমাধব নিজের হাতে দাড়ি কামাতেন না, মেঘরাজ রোজ সকালে দাড়ি কামিয়ে দিত।'

ব্যোমকেশ সাবধানে ক্ষুরটি খাপ থেকে বার করে দু' আঙুলে ধরে জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে উলটে-পালটে দেখতে লাগল। তারপর বিস্মিত স্বরে বলল—'আশ্চর্য!'

ব্যোমকেশ ক্ষুরটি তাঁর হাতে দিয়ে বলল—'দেখ, কোথাও আঙুলের ছাপ নেই।'

ক্ষুর নিয়ে রাখালবাবু পুঙখানুপুঙখ পরীক্ষা করলেন, তারপর ক্ষুর ব্যোমকেশকে ফেরত দিয়ে তার মুখের পানে চাইলেন; দু'জনের চোখ বেশ কিছুক্ষণ পরস্পর আবদ্ধ হয়ে রইল। তারপর ব্যোমকেশ ক্ষুরটি খাপের মধ্যে পুরে নিজের পকেটে রাখল, বলল—'এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'কি করবেন?'

'দাড়ি কামাব।'

তেতলার অন্য ঘর দু'টিতে দর্শনীয় কিছু ছিল না। তবু ব্যোমকেশ ঘর দু'টিতে ঘুরেফিরে দেখল; তারপর নীচের তলায় নেমে এসে রাখালবাবুকে বলল—'আমি এখন চললাম। বিকেলবেলা আবার আসব। জবানবন্দীর ফাইলটা দাও, বাড়ি গিয়ে পড়ব।'

রাখালবাবু বললেন—'আমাকে একবার থানায় যেতে হবে, চলুন আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই। কি রকম মনে হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ মুচকি হেসে বলল—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—'

রাখালবাবু জবানবন্দীর ফাইল ব্যোমকেশকে দিলেন, তাকে নিয়ে পুলিস ভ্যানে চলে গেলেন। দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন নিম্নতর কর্মচারী বাড়িতে মোতায়েন রইল।

বিকেল তিনটের সময় ব্যোমকেশ ফিরে এল। রাখালবাবু আগেই ফিরেছিলেন, তাঁকে ক্ষুর আর জবানবন্দীর নথি ফেরত দিয়ে ব্যোমকেশ একটা চেয়ারে বসল। রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন—'কেমন দাড়ি কামালেন?'

ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে বলল—'ভাল নয়।'

'আর জবানবন্দী?'

'মেদিনীর জবানবন্দী সবচেয়ে তথ্যপূর্ণ। তাকে আরো কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

'বেশ তো, তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। সে নিজের ঘরেই আছে।'

কিন্তু মেদিনীকে ডেকে পাঠাবার আগেই দু'জন সাদা পোশাকের পুলিস কর্মচারী মকরন্দকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। মকরন্দর কাপড়-জামা ছিঁড়ে গেছে, গায়ে মুখে ধুলোবালি, চোখ জবাফুলের মত লাল। বেশ বোঝা যায় সে স্বেচ্ছায় বিনা যুদ্ধে পুলিসের হাতে ধরা দেয়নি। একজন সাদা পোশাকের পুলিস বলল—'মকরন্দ চক্রবর্তীকে ধরেছি স্যার।'

রাখালবাবু মকরন্দর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন—'ইনিই মকরন্দ চক্রবর্তী! কোথায় ধরলে?'

'ঘোড়দৌড়ের মাঠে। রেস খেলছিল স্যার। পকেটে অনেক টাকা ছিল। এই যে।'

এক তাড়া পাঁচ টাকা ও দশ টাকার নোট। রাখালবাবু গুনে দেখলেন, পৌনে দু' শো টাকা। তিনি মকরন্দকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করলেন—'তোমার নাম মকরন্দ চক্রবর্তী?'

মকরন্দ রক্তরাঙা চোখে চেয়ে রইল, উত্তর দিল না। রাখালবাবু আবার প্রশ্ন করলেন—'তুমি পৌনে দু' শো টাকা কোথায় পেলে?'

উদ্ধত উত্তর হলো—'বলব না।'

'যে রাত্রে তোমার ঠাকুরদা খুন হন সে রাত্রে ন'টার সময় তুমি বাড়ি এসেছিলে, তারপর শেষরাত্রে চুপিচুপি দোর খুলে বেরিয়ে গিয়েছিলে—'

'মিছে কথা। মেদিনী মিছে কথা বলেছে।'

'মেদিনী বলেছে জানলে কি করে?'

মকরন্দ অধর দংশন করল, উত্তর দিল না। রাখালবাবু আবার প্রশ্ন করলেন—'কত রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে?'

'বলব না।'

'তারপর আর বাড়ি ফিরে আসনি কেন?'

'বলব না।'

রাখালবাবু তার খুব কাছে এসে বললেন—'একদিন বেণীমাধববাবুর হুকুমে মেঘরাজ তোমার কান ধরে গালে চড় মেরেছিল, গলাধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল।'

'মিছে কথা।'

'বাড়িসুদ্ধ লোক মিছে কথা বলছে?'

'হ্যাঁ।'

রাখালবাবু ফিরে এসে ব্যোমকেশের পাশে বসলেন, গলা খাটো করে বললেন—'এটাকে নিয়ে কী করা যায় বলুন দেখি?'

ব্যোমকেশও নীচু গলায় বলল—'যুগধর্মের নমুনা। ওকে বাড়িতেই আটক করে রাখ।'

'তাই করি।' রাখালবাবু উঠে গিয়ে মকরন্দকে কড়া সুরে বললেন—'যাও,

দোতলায় নিজের ঘরে থাকো গিয়ে। বাড়ি থেকে বেরুবার চেষ্টা কোরো না, চেষ্টা করলে হাজতে গিয়ে লাপ্সি খেতে হবে। যাও।'

সাদা পোশাকের পুলিস দু'জন মকরন্দকে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। রাখালবাবু বললেন—'মোদিনীকে ডেকে পাঠাই?'

ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'না, চল আমরাই তার ঘরে যাই। এখানে অনেক বাধাবিঘ্ন।'

মোদিনীর দোরে টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল মোদিনী মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে আছে। ব্যোমকেশ ও রাখালবাবুকে দেখে সে উঠে বসল। তার পরনে ধূসর রঙের একটা শাড়ি, কপালে সিঁদুর নেই, হাতে গলায় কানে গয়না নেই। মুখের ভাব একটু ফুলো ফুলো: শোকের চিহ্ন এখনো মুখ থেকে মুছে যায়নি, কিন্তু শোকের অধীরতা দূর হয়েছে। সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্নভরা চোখে দু'জনের পানে চাইল।

রাখালবাবু সদয় কণ্ঠে বললেন—'মোদিনী, ইনি আমার বন্ধু। আমি তোমাকে যেসব প্রশ্ন করেছি তার ওপর ইনি আরো দু-চারটে সওয়াল করতে চান।'

মোদিনী ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল—'জি।'

ব্যোমকেশ একদৃষ্টে মোদিনীর মুখের পানে চেয়ে ছিল, আরো কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—'কতদিন আগে মেঘরাজের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল?'

মোদিনী অস্ফুট কণ্ঠে বলল—'পাঁচ বছর আগে।'

'তুমিই তার প্রথম স্ত্রী?'

'জি, না। আগে একজন ছিল, সে মারা গেছে।'

'হুঁ।' ব্যোমকেশ ঘরের চারদিকে চাইল। ঘরে ফার্নিচারের মধ্যে একটা তক্তপোশ, একটা কাঠের আলমারি এবং একটা খাড়া আলনা। তক্তপোশের তলায় গোটা দুই বড় তোরঙ্গ দেখা যাচ্ছে। বাইরের দিকের জানালার পাটার ওপর একটি কাঠের চ্যাপটা বাক্স। পশ্চিমা মেয়েরা প্রসাধনের জন্যে এই ধরনের বাক্স ব্যবহার করে; বাক্সের মধ্যে সিঁদুর কৌটো চিরুনী তেল কাজল প্রভৃতি থাকে, ডালা খুললে ডালার গায়ে আয়না বেরিয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে নিতান্ত মামুলি পরিবেশ।

ব্যোমকেশ এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করল—'বাড়ির সকলকেই তুমি চেন। কে কেমন মানুষ বলতে পার?'

মোদিনী একটু চুপ করে থেকে হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল—'বুড়া বাবা বড় ভাল আদমি ছিলেন, দিলদার লোক ছিলেন। তাঁর ছেলে আর দামাদও ভাল লোক। মেয়ে আর পুতহু আমাকে পছন্দ করেন না। ঝিল্লী দিদি আর লাবণি দিদি ভারি ভাল মেয়ে।'

'আর মকরন্দ?'

মোদিনী চকিতে চোখ তুলেই আবার নীচু করল—'উনি আমাকে দেখতে পারেন না। ভারি কড়া জবান।'

'মেঘরাজ তাকে চড় মেরেছিল তুমি জানো?'

'জি হাঁ, আমি তখন পাশের ঘরে ছিলুম।'

'নিখিল আর সনৎ?'

'নিখিলবাবু মজাদার লোক, খুব ঠাট্টা তামাসা করেন। আর সনৎবাবু গম্ভীর মেজাজের মানুষ। কিন্তু দু'জনেই খুব ভদ্র।'

'আচ্ছা, ও কথা থাক। মেঘরাজ সেন্যদলের সিপাহী ছিল, তার সিপাহী-জীবন সংক্রান্ত কাগজপত্র নিশ্চয় তোমার কাছে আছে?'

'জি আছে, তার বাক্সের মধ্যে আছে।'

'আমি একবার কাগজপত্রগুলো দেখতে চাই।'

'এই যে বার করে দিচ্ছি।'

সে গিয়ে তক্তপোশের তলা থেকে একটা ট্রাঙ্ক টেনে বার করল, আঁচল থেকে চাবি নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ট্রাঙ্ক খুলতে লাগল। ব্যোমকেশ ইতিমধ্যে ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানলার ওপর প্রসাধনের বাক্সটা রাখা রয়েছে। ব্যোমকেশ একটু ইতস্তত করে বাক্সের ডালা তুলল। বাক্সের মধ্যে মেয়েলি প্রসাধনের দ্রব্য ও টুকিটাকি; আয়নার এক কোণে মেদিনীর একটি ছবি আঁটা রয়েছে। পোস্টকার্ড আধখানা করলে যত বড় হয় তত বড় ছবি; মেদিনী খাটের ধারে বসে রয়েছে। নিতান্তই ঘরোয়া ছবি, মেদিনীর মুখের প্রাণখোলা হাসিটি ব্যোমকেশের গায়ে কাঁটার মত বিঁধল। মেদিনীর বর্তমান চেহারা দেখে ভাবা যায় না সে এমন ভাবে হাসতে পারে। ব্যোমকেশ নিঃশব্দে বাক্স বন্ধ করল।

মেদিনী ট্রাঙ্ক থেকে কাগজপত্র নিয়ে যখন ফিরে এল তখন ব্যোমকেশ রাখালবাবুর কাছে ফিরে এসে নিম্নস্বরে কথা বলছে, মেদিনীর হাত থেকে কাগজপত্র নিয়ে সে মন দিয়ে পড়ল। রাখালবাবুও সঙ্গে সঙ্গে পড়লেন। তারপর কাগজ মেদিনীকে ফেরত দিয়ে ব্যোমকেশ মেদিনীকে বলল—'এগুলো যত্ন করে রেখে দাও, হয়তো পরে দরকার হবে। চল রাখাল।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাখালবাবু ব্যোমকেশের দিকে চোখ বেঁকিয়ে তাকালেন—'কি মনে হলো?'

ব্যোমকেশ বলল—'খুব ভাল। এবার বাড়ির বাকি লোকগুলিকেও একে একে দেখতে চাই। সবাই বাড়িতেই আছে তো?'

'সবাই আছে, কেবল অজয়ের মেয়ে লাবণি ছাড়া। যে-রাত্রে খুন হয়, লাবণি সেদিন সন্ধ্যের সময় তার নাচের মাস্টারের সঙ্গে পালিয়েছে, এখনো তার সন্ধান পাইনি। অন্য যারা আছে তাদের মধ্যে আগে কাকে দেখতে চান?'

'আমার কোনো পক্ষপাত নেই। নীচের তলা থেকেই আরম্ভ করা যাক।'

নিখিলের দোরে রাখালবাবু টোকা দিলেন, নিখিল এসে দোর খুলে দাঁড়াল। তার গালে সাবানের ফেনা, হাতে সেফ্‌টি রেজর; সে ফেনায়িত হাসি হাসল—'আসুন দারোগাবাবু।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, প্রশ্ন করলেন—'বিকেল বেলা দাড়ি কামাচ্ছেন?'

নিখিল বলল—'আমি নিশাচর কিনা তাই বিকেলবেলা দাড়ি কামাই। যারা দিনের বেলা কাজ করে তারা সকালবেলা দাড়ি কামায়।' তারপর সে ব্যগ্রস্বরে বলল—'দারোগাবাবু, এক ঘণ্টার জন্য আমাকে ছেড়ে দিন, একবারটি অফিস ঘুরে আসি। মাইরি বলছি পালাব না। বিশ্বাস না হয় দু'জন পেয়াদা আমার সঙ্গে দিন।'

রাখালবাবু হেসে বললেন—'অফিসে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? বেশ তো আছেন।'

নিখিল বলল—'না দারোগাবাবু, বেশ নেই। কাজের নেশা আমাকে অফিসের

দিকে টানছে, রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না। তা'ছাড়া—'

'তা ছাড়া আবার কি?'

নিখিল একটু সলজ্জভাবে বলল—'অফিসে অনেকগুলো আইবুড়ো মেয়ে কাজ করে, তাদের মধ্যে একটাকে আমি খুঁজছি, পেলেই তাকে বিয়ে করব।'

'ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় ঠেকছে।'

'ঠেকবেই তো। ঘোর রহস্যময় ব্যাপার।'

'ঘোর রহস্যময় যদি হয় তা হলে এ'র শরণাপন্ন হোন। ইনিই হলেন শ্রীব্যোমকেশ বক্সী।'

নিখিলের গালে সাবানের ফেনা শুকিয়ে ঝরে ঝরে পড়ছিল, সে প্রকাণ্ড হাঁ করে ব্যোমকেশের পানে তাকাল—'অ্যাঁ, আপনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী! এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি।' সেফ্‌টি রেজরসুদ্ধ হাত জোড় করে বলল—'আমার রহস্যটা আপনাকে ভেদ করতেই হবে ব্যোমকেশবাবু। নইলে আমার প্রাণের আশা নেই।'

'সব কথা খুলে বলুন।'

নিখিল তড়বড় করে এক নিশ্বাসে তার রহস্য শোনাল। শুনে ব্যোমকেশ বলল—'চিঠিগুলো দেখি।'

নিখিল বিছানার কাছে গিয়ে বালিশের তলা থেকে কয়েকখানা খাম এনে ব্যোমকেশকে দিল। ব্যোমকেশ খামগুলি খুলে একে একে চিঠি বার করে পড়ল, তারপর আবার খামের মধ্যে পুরে নিজের পকেটে রাখল—'এগুলো আমি রাখলাম। দেখি যদি সন্ধান পাই। আপনি আপাতত এই বাড়িতেই থাকুন ,আমি আপনার অফিসে খোঁজখবর নেব।—ভাল কথা, আপনার বর্ষাতি আছে?'

'বর্ষাতি—ওয়াটারপ্রুফ? আছে একটা। কেন বলুন তো?'

'দেখি একবার।'

নিখিল সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে একটা পুরনো খাকি রঙের বর্ষাতি নিয়ে এল। ব্যোমকেশ সেটা রাখালবাবুর হাতে দিয়ে বলল—'এটাও আমরা নিয়ে চললাম। এটা আপনি শেষবার কবে ব্যবহার করেছেন?'

নিখিল কিছুই বুঝতে পারেনি এমনিভাবে মাথা চুলকে বলল—'গত বর্ষাকালে, মানে পাঁচ ছয় মাস আগে। আপনি যে ভেলকি লাগিয়ে দিলেন, ওয়াটারপ্রুফ থেকে আমার—মানে মেয়েটার ঠিকানা বার করবেন নাকি?'

ব্যোমকেশ কেবল মুখ টিপে হাসল, বলল—'আপনি দেখছি সেফ্‌টি রেজর দিয়ে দাড়ি কামান।'

'তবে কি দিয়ে দাড়ি কামাব?'

'ঠিক কথা। আপনি যখন দাড়ি কামাতে আরম্ভ করেছেন তখন সাবেক ক্ষুরের রেওয়াজ উঠে গেছে।—আচ্ছা।'

ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পানে বক্র কটাক্ষপাত করল। রাখালবাবু অপ্রতিভভাবে বললেন—'খেয়াল হয়নি। হওয়া উচিত ছিল। যে-লোক ছুরি কিংবা ক্ষুর দিয়ে গলা কাটতে যাচ্ছে ,সে জানে গলা কাটলে চারদিকে রক্ত উথলে পড়বে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। তার নিজের গায়েও রক্ত লাগবে। তাই সে বর্ষাতি কিংবা ওই রকম একটা কিছু গায়ে দিয়ে খুন করতে যাবে, যাতে সহজে রক্ত ধুয়ে ফেলা যায়।'

এই সময় সদর দোরের কনেস্টবল এসে একখানা পোস্টকার্ড রাখালবাবুর

হাতে দিয়ে বলল—'পিওন দিয়ে গেল।'

রাখালবাবু নির্দ্বিধায় পোস্টকার্ড পড়লেন। অজয় চক্রবর্তীর নামে চিঠি, তারিখ আজ সকালের, ঠিকানা টালিগঞ্জ। চিঠিতে কয়েক ছত্র লেখা আছে—

শ্রীচরণেষু মা,

কাল রাত্তিরে আমাদের বিয়ে হয়েছে। তোমরা রাগ কোরো না। আমার শ্বশুর শাশুড়ী খুব ভাল লোক। পরশু রাত্রে আমি শাশুড়ীর কাছে শুয়েছিলাম। দাদু অন্য একজনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছিলেন তাই আমরা লুকিয়ে বিয়ে করেছি।

প্রণতা
লাবণি

চিঠিতে চোখ বুলিয়ে রাখালবাবু ব্যোমকেশের হাতে চিঠি দিলেন, ব্যোমকেশ সেটা পড়ে ফেরত দিল। বলল—'বোধহয় ঠাকুরদার মৃত্যু-সংবাদ পায়নি। যাক, বিয়ে করেছে ভালই করেছে, নইলে—'

চিঠি পকেটে রেখে রাখালবাবু একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে ডাকলেন—'এই বর্ষাতিটা রাখো। আরো বোধহয় জুটবে; সবগুলো জড় হলে পরীক্ষার জন্যে পাঠাতে হবে। এটাতে টিকিট সেঁটে রাখ—'নিখিল হালদার।'

তারপর তিনি সনতের দোরে টোকা দিলেন। সনৎ এসে দোর খুলল; তার হাতে একটা ইংরেজী রহস্য উপন্যাস পাতা ওলটানো অবস্থায় রয়েছে। রাখাল-বাবুকে দেখে বলল—'ইন্সপেক্টরবাবু, আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে, এক টিন আনিয়ে দেবেন? গোল্ড ফ্লেক।'

"নিশ্চয়। টাকা দিন আনিয়ে দিচ্ছি।'

সনৎ একটা দশ টাকার নোট পকেট থেকে বার করে দিল। রাখালবাবু টাকা সাব-ইন্সপেক্টরের হাতে দিয়ে বললেন—'এক টিন গোল্ড ফ্লেক সিগারেট সামনের দোকান থেকে আনিয়ে দাও।'

তিনি ব্যোমকেশকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। সনৎ বলল—'আর কতদিন ঘরে বন্ধ করে রাখবেন? কাজকর্ম আটকে রয়েছে। তা ছাড়া মামা মারা যাবার পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা এখানে আর থাকতে দেবে না, মাথা গোঁজবার একটা জায়গা খুঁজতে হবে তো।'

'থাকতে দেবে না কি করে জানলেন?'

'আজ দুপুরবেলা গায়ত্রীর স্বামী গঙ্গাধর এসেছিল, বলল—এবার পাততাড়ি গোটাতে হবে।'

'তাই নাকি!—বেশি দিন আপনাদের কষ্ট দেব না, দু'এক দিনের মধ্যে ছাড়া পাবেন। ইনি ব্যোমকেশ বক্সী, প্রখ্যাত সত্যান্বেষী।'

সনৎ নির্লিপ্ত চোখে ব্যোমকেশের পানে চাইল, নীরস স্বরে বলল—'নাম শুনেছি, বই পড়িনি। বাংলা রহস্য কাহিনী আমি পড়ি না—বসুন।'

ব্যোমকেশের চোখ ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে অলসভাবে বলল—'আপনার বর্ষাতি আছে?'

সনৎ ভ্রূ তুলে একটু বিস্ময় প্রকাশ করল—'আছে। এটা বর্ষাকাল নয় তাই

তুলে রেখেছি। দেখতে চান?'

'হ্যাঁ।'

সনৎ আলমারি খুলে একটা প্ল্যাস্টিকের মোড়ক বার করল। মোড়কের মধ্যে একটি শৌখিন স্বচ্ছ বর্ষাতি পাট করা রয়েছে। রাখালবাবু সেটি নিয়ে মোড়ক থেকে বার করলেন, তারপর লম্বা করে ঝুলিয়ে দেখলেন। দামী বর্ষাতি, প্রায় নতুন। তিনি সেটিকে পাট করে আবার মোড়কের মধ্যে রেখে বললেন—'এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি, দু' দিন পরে ফেরত পাবেন। রসিদ দিচ্ছি।'

সনৎ অপ্রসন্ন উদাস কণ্ঠে বলল—'রসিদ কি হবে! আপনাদেরই রাজত্ব, যা ইচ্ছে করুন।'

ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করল—'আপনার জবানবন্দীতে দেখলাম যে-রাত্রে বেণীমাধববাবু খুন হন সে-রাত্রে আপনি বর্ধমান গিয়েছিলেন। কোন ট্রেনে গিয়েছিলেন?'

সনৎ বলল—'রাত্রি সাড়ে দশটার ট্রেনে।'

'পরদিন ভোরের ট্রেনে না গিয়ে রাত্রির ট্রেনে গেলেন কেন?'

'ভোরের ট্রেনে গেলে ঠিক সময়ে পেঁছুতে পারতাম না। সকাল বেলায় মজলিশ ছিল।'

'বর্ধমানে আপনার কোনো আস্তানা আছে?'

'না' স্টেশনের বেঞ্চিতে বসে রাত কাটিয়েছি।'

'চায়ের স্টলে গিয়ে চা খেয়েছিলেন নিশ্চয়?'

'চা আমি খাই না।'

'তা হলে আপনি যে সাড়ে দশটার গাড়িতে বর্ধমান গিয়েছিলেন তার কোনো সাক্ষি-সাবুদ নেই?'

সনতের ভুরু আবার উঁচু হলো—'সাক্ষি-সাবুদের কী দরকার? আপনাদের কি সন্দেহ আমি মামাকে খুন করেছি?'

ব্যোমকেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—'তা নয়। কিন্তু সকলের সম্বন্ধেই আমাদের নিঃসংশয় হওয়া দরকার।'

সনৎ শুকনো গলায় বলল—'মামাকে খুন করে যাদের লাভ আছে তাদের অ্যালিবাই খুঁজুন গিয়ে। তাতে কাজ হবে।'

'তা বটে। চল রাখাল, এবার দোতলায় যাওয়া যাক।'

প্রথমে ড্রইংরুমে গিয়ে রাখালবাবু সনতের বর্ষাতি সাব-ইন্সপেক্টরকে সমর্পণ করে বললেন—'টিকিট মারো—সনৎ গাঙ্গুলী।' তারপর ব্যোমকেশকে নিয়ে দোতলায় উঠলেন।

অজয় সামনের ঘরে বসে সায়াহ্নিক চা জলখাবার খাচ্ছিল, সশঙ্ক মুখে উঠে দাঁড়াল। তার মুক্তকচ্ছ অশৌচের বেশ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। রাখালবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—'আপনার একখানা চিঠি এসেছে।' তিনি পোস্টকার্ড পকেট থেকে নিয়ে অজয়কে দিলেন।

ব্যোমকেশ নিবিষ্ট চোখে অজয়ের পানে চেয়ে ছিল; সে দেখল চিঠি পড়তে পড়তে অজয়ের মুখের ওপর দিয়ে দ্রুত পরম্পরায় বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি খেলে গেল ঃ আশঙ্কা—বিস্ময়—স্বস্তি—উৎফুল্লতা। তার মধ্যে স্বস্তির আরামই বেশি। অজয়ের মত প্রকৃতির লোকের পক্ষে এটাই বোধহয় স্বাভাবিক; বিনা খরচে বিনা

ঝাঝাটে যদি মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় তাহলে আনন্দ হবারই কথা।'

কিন্তু সে যখন মুখ তুলল তখন তার মুখে একটি বিষণ্ণ করুণ ভাব, তাতে রঙ্গমঞ্চের আভাস পাওয়া যায়। সে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল—'মেয়ে! দারোগাবাবু, আমার একমাত্র মেয়ে পালিয়ে গিয়ে একজনকে বিয়ে করেছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা বড় নিষ্ঠুর, বড় স্বার্থপর, তারা বাপ-মায়ের কথা ভাবে না। যাক, যা করেছে ভালই করেছে। তবু যদি জাতের মধ্যে বিয়ে করত। যাক, ভাল হলেই ভাল।' সে আবার নাটকীয় দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রাখালবাবু বোধকরি অভিনয়ের পালা শেষ করার জন্যেই বললেন—'ইনি ব্যোমকেশ বক্সী। বোধহয় নাম শুনেছেন।'

অজয় তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে রইল; তার ভাব-ভঙ্গিতে ভয় কিংবা বিস্ময় কিংবা আনন্দ কোনটা প্রকাশিত হলো ঠিক বোঝা গেল না। তারপর সে গদ্‌গদ স্বরে বলে উঠল—'নাম শুনিনি! বলেন কি আপনি, নাম শুনিনি! আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার। ব্যোমকেশবাবু এসেছেন, এবার বাবার মৃত্যু রহস্যের একটা কিনারা হবে।' সে অন্দরের দরজার দিকে ফিরে গলা চড়িয়ে বলল—'ওগো শুনছ, শীগ্‌গির দু' পেয়ালা চা নিয়ে এসো।—বসুন বসুন, আমি নিজেই দেখছি।' সে দ্রুত অন্দরের দিকে অন্তর্হিত হলো।

সমাদরের আতিশয্য দেখে ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পানে মুখ টিপে হাসল. দু'জনে পাশাপাশি চেয়ারে উপবিষ্ট হলেন।

কিছুক্ষণ পরে অজয় ফিরে এল, তার পিছনে মাথায় আধ-ঘোমটা দিয়ে আরতি; আরতির হাতে থালার ওপর দু' পেয়ালা চা এবং বিস্কুট। তার মুখ ভয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে, সে থালাটি ব্যোমকেশের সামনে রেখেই ফিরে যাচ্ছিল, অজয় বলল—'ওকি, চলে যাচ্ছ কেন? ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে কথা কও।'

আরতি থমকে দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশের দিকে ফিরল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ব্যোমকেশ তার অবস্থা লক্ষ্য করে সদয় কণ্ঠে বলল—'না না, উনি কাজকর্ম করুন গিয়ে, ওঁকে আমার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।'

আরতি চলে গেল। অজয় আমতা আমতা করে বলল—'আমার স্ত্রী বড় লাজুক, কিন্তু আমরা দু'জনেই আপনার ভক্ত—' অজয় আরো অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল, ব্যোমকেশ বাধা দিয়ে বলল—'আপনার ছেলে মকরন্দ বাড়িতেই আছে তো?'

অজয় চকিত হয়ে বলল—'আছে বৈকি। তাকে ডাকব?'

ব্যোমকেশ বলল—'ডাকবার বোধহয় দরকার হবে না। সে কলেজে পড়ে, বর্ষাকালে নিশ্চয় তার বর্ষাতি দরকার হয়। তার বর্ষাতিটা একবার দেখতে চাই।'

অজয় একটু চিন্তা করে বলল—'বছর দেড়েক আগে তাকে একটা ওয়াটার-প্রুফ কিনে দিয়েছিলাম। আছে নিশ্চয়, আমি দেখছি।'

অজয় অন্দরের দিকে চলে গেল। ব্যোমকেশ ও রাখালবাবু চায়ের পেয়ালা তুলে নিলেন। মিনিট পাঁচেক পরে অজয় ফিরে এসে বিমর্ষ মুখে বলল—'ওয়াটারপ্রুফটা খুঁজে পেলাম না। মকরন্দকে জিজ্ঞেস করলাম, সে বলল—জানি না।'

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালা রেখে মুখ মুছতে মুছতে বলল—'আপনার নিজের ওয়াটারপ্রুফ আছে?'

'আছে। এনে দেব?'

'আপনার স্ত্রীর এবং মেয়ের ওয়াটারপ্রুফ?'

'মেয়েদের জন্যে একটাই মেয়েলি ওয়াটারপ্রুফ আছে।'

'দয়া করে ও দুটো এনে দিন, আমরা নিয়ে যাব। দু'চার দিনের মধ্যেই ফেরত পাবেন।'

'নিয়ে যাবেন, বেশ তো, তা এনে দিচ্ছি।'

অজয় অন্দরে গিয়ে দু'হাতে দুটি ওয়াটারপ্রুফ ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরে এল। রাখালবাবু সে দুটি পাট করে বগলে নিলেন, বললেন—'আচ্ছা, আজ উঠি। চায়ের জন্যে ধন্যবাদ।'

অজয় কাঁচুমাচু হয়ে ব্যোমকেশকে বলল—'চললেন? একটা অনুরোধ ছিল সাহস করে বলতে পারছি না—'

'কি অনুরোধ?'

'আপনার একটা ফটো তুলব। আমার ক্যামেরা আছে, যদি অনুমতি করেন একটা তুলে নিই। আপনার ছবি এনলার্জ করে ঘরে টাঙিয়ে রাখব।'

ব্যোমকেশ হেসে উঠল—'ফটো তুলবেন! তা—আপত্তি কি। আমার ছবি এনলার্জ করে ঘরে টাঙিয়ে রাখার আগ্রহ আজ পর্যন্ত কারুর দেখা যায়নি।'

অজয় দ্রুত গিয়ে ক্যামেরা নিয়ে এল। সাধারণ বক্স-ক্যামেরা। সে বলল—'এখনো যথেষ্ট আলো আছে। আপনি জানলার কাছে দাঁড়ান, আমি ছবি তুলে নিচ্ছি।'

ব্যোমকেশ জানলার পাশে পড়ন্ত আলোয় দাঁড়াল। ক্যামেরায় ক্লিক করে শব্দ হলো।

'ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! অশেষ ধন্যবাদ।' শুনতে শুনতে ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

বাইরে এসে দু'জনের কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে কথা হলো; তারপর ব্যোমকেশ বর্ষাতি দুটো নিয়ে নীচে নেমে গেল, রাখালবাবু তেতলায় উঠে গেলেন। ওপরে কনস্টেবল টুলের ওপর বসেছিল, উঠে দাঁড়াল।

চাবি দিয়ে ঘরের দোর খুলে রাখালবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন, কয়েকবার এদিক ওদিক ঘুরলেন। তারপর দোরের বাইরে ফিরে এসে দেখলেন, মেদিনী ক্লান্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন—'মেদিনী, তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি তাই ডেকেছি।'

মেদিনী ব্যায়ত বিহ্বল চোখে চাইল, তারপর চোখের ওপর আঁচল চাপা দিল। রাখালবাবু বললেন—'বলো দেখি সেদিন সকালে তুমি যখন তোমার স্বামীর মৃতদেহ প্রথম দেখলে তখন সে কি চিৎ হয়ে শুয়েছিল?'

অবরুদ্ধ উত্তর এল—'জি, হাঁ।'

রাখালবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—'আচ্ছা আচ্ছা, ও কথা থাক। এবার একবার ঘরের মধ্যে এসো।'

মেদিনী চোখের জল মুছে থমথমে মুখ নিয়ে ঘরের মধ্যে এল। রাখালবাবু চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে বললেন—'ঘরটা ভাল করে দেখ। তুমি আগে অনেকবার দেখেছ। কোথাও কোনো তফাত বুঝতে পারছ?'

মেদিনী বলল—'খাটের ওপর বিছানা নেই।'

'তাছাড়া আর কিছু?'

মেদিনী চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মাথা নাড়ল—'আর কোনো তফাত বুঝতে পারছি না।'

'হুঁ। আচ্ছা হয়েছে, এবার নীচে চল।'

মেদিনীকে নিয়ে রাখালবাবু নীচে নেমে গেলেন। মেদিনী নিজের ঘরে চলে গেল। রাখালবাবু ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করে দেখলেন ব্যোমকেশ একটা চেয়ারে অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানছে। দুজনের চোখাচোখি হলো। ব্যোমকেশ বাঁকা হেসে ঊর্ধ্বদিকে ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর খাড়া হয়ে বসে বলল—'শুভকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। রাখাল, এবার আমি বাড়ি ফিরব। তোমার কতদূর?'

রাখালবাবু বললেন—'গঙ্গাধর ঘোষালকে দর্শন করবেন না?'

'ওহো তাই তো, গঙ্গাধরকে দর্শন করা হলো না। আজ থাক, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, তিনি হয়তো ভূমানন্দে আছেন। কাল সকালে তাঁকে দর্শন করা যাবে।' ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়াল, পকেট থেকে নিখিলের চিঠিগুলি নিয়ে রাখালবাবুর হাতে দিয়ে বলল—'এগুলোতে মেয়েলি আঙুলের ছাপ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখো। আজ চলি।'

'চলুন, আমিও যাই। বর্ষাতিগুলো পরীক্ষা কবতে হবে।'

পরদিন বেলা ন'টার সময় ব্যোমকেশ বেণীমাধবের বাড়িতে গিয়ে দেখল, রাখালবাবু সদর বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিখিল এবং সনতের সঙ্গে কথা বলছেন। ব্যোমকেশ যেতেই তিনি বললেন—'শুনেছেন ব্যোমকেশদা, মেদিনীর ঘর থেকে একটা বাক্স চুরি গেছে, 'টয়লেটের বাক্স।'

ব্যোমকেশ ভুরু উঁচু করে বলল—'টয়লেট-বক্স। সে কি, কি করে চুরি গেল?'

'তা ঠিক বলতে পারছে না। তবে কাল সন্ধ্যেবেলা মেদিনীকে আমি তেতলায় ডেকেছিলাম, ওর ঘর খোলা ছিল, সেই সময় হয়তো কেউ সরিয়েছে। তাই এঁদেব জিজ্ঞেস করছিলাম এঁরা কিছু জানেন কিনা।'

সনৎ বলল—'আমি কি করে জানব বলুন। মেদিনীর ঘরের মধ্যে কখনো পদার্পণ করিনি, কোথায় কী আছে, কোত্থেকে জানব?'

নিখিল বলল—'দোহাই দারোগাবাবু, আমি টয়লেট-বক্স চুরি করিনি। আমার ঘরে চুল বেঁধে টিপ পরার মানুষ নেই।'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে প্রশ্ন করল—'মকরন্দকে জেবা করেছিলে?'

'করেছিলাম। তাদেব ফ্ল্যাট আবার খানাতল্লাশ করেছিলাম, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না।'

'এঁদের ঘর?'

'এইবার করব।' রাখালবাবু একজন জমাদারকে এবং সাব-ইন্সপেক্টরদের ডেকে বললেন—'তোমরা এঁদের ঘর দুটো আবার ভাল করে খানাতল্লাশ কর, মেদিনীর চুল বাঁধার বাক্সটা পাও কিনা দেখ। আমরা দোতলায় গঙ্গাধরবাবুর ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।'

সনৎ অপ্রসন্ন মুখে বলল—'করুন করুন, যত ইচ্ছে খানাতল্লাশ করুন, কিন্তু আমার দামী ক্যামেরাগুলো ভাঙবেন না।'

ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু ওপরে উঠে গেলেন।

দোতলায় উঠে তাঁরা দেখলেন বারান্দার অপর প্রান্তে গঙ্গাধরের ফ্ল্যাটে সদর দরজা খুলে তার মেয়ে ঝিল্লী বেরিয়ে এল, দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দু'পা এসে তাঁদের দেখে সংকুচিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাখালবাবু তার কাছে এসে ব্যোমকেশকে বললেন—'এর নাম ঝিল্লী, গঙ্গাধরবাবুর মেয়ে।—তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

ঝিল্লী সলজ্জ অস্ফুটস্বরে বলল—'মামীমা ডেকে পাঠিয়েছেন।'

ব্যোমকেশ ঝিল্লীর সংকোচনম্র কমনীয় মুখের পানে চেয়ে হাসল—'আমাদের দেখে এত লজ্জা কিসের? আমরা বাঘ-ভাল্লুক নয়, কামড়ে দেব না।'

ঝিল্লী একটু হেসে চোখ তুলল। ব্যোমকেশ দেখল চোখ দুটি সুন্দর এবং বুদ্ধিদীপ্ত। রাখালবাবু পরিচয় দিলেন—'ইনি ব্যোমকেশ বক্সী।'

ঝিল্লীর চোখে উৎসুক আলো ফুটে উঠল, তারপর আস্তে আস্তে তার মুখের ওপর অরুণাভা ছড়িয়ে পড়ল। সে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছে দেখে ব্যোমকেশ বলল—'ঝিল্লী, একটু দাঁড়াও, তোমার কাছে কিছু জানবার আছে।'

ঝিল্লী দাঁড়াল, কিন্তু ব্যোমকেশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রইল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল—'লাবণির সঙ্গে তোমার খুব ভাব ছিল?'

একটু দ্বিধার পর ঝিল্লী ঘাড় নাড়ল।

'সে তোমাকে নিজের মনের কথা বলত, তুমি তাকে নিজের মনের কথা বলতে। কেমন?'

ঝিল্লী উত্তর দিল না, সতর্কভাবে অপেক্ষা করে রইল।

'লাবণি নিশ্চয় তোমাকে বলেছিল সে তার নাচের মাস্টার পরাগ লাহাকে ভালবাসে।'

ঝিল্লী ঘাড় নীচু করে অস্ফুটস্বরে বলল—'বলেছিল।'

'সে পালিয়ে গিয়ে পরাগকে বিয়ে করবে বলেছিল?'

ঝিল্লী উৎফুল্ল চোখ তুলল—'লাবণি ওকে বিয়ে করেছে!'

'হ্যাঁ। তুমি দেখছি জানতে না।'

'না।'

'কিন্তু জানতে পেরে খুব খুশী হয়েছ।'

ঝিল্লী হেসে ফেলল।

ঝিল্লীকে ছেড়ে গঙ্গাধরের দোরের দিকে যেতে যেতে রাখালবাবু খাটো গলায় বললেন—'আপনার মন বিচিত্র কুটিল পথে চলেছে, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি।'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসল। রাখালবাবু গঙ্গাধরের দোরে টোকা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে কড়া আওয়াজ এল—'কে? ভেতরে এসো।'

দু'জনে ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের মাঝখানে গোল টেবিল, তার সামনে চেয়ারে বসে গঙ্গাধর তাস নিয়ে সলিটেয়ার খেলছিল, রাখালবাবুর দিকে বিরক্ত চোখে চেয়ে বলল—'আবার কি চাই?'

গঙ্গাধরের ভাবভঙ্গী এখন অন্যরকম। নিজের টাকাকড়ি উড়িয়ে শ্বশুরের গলগ্রহ হবার পর সে কচ্ছপের মত হাত-পা গুটিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু শ্বশুরের মৃত্যুর পর হালের আইন অনুযায়ী সে অর্ধেক রাজত্ব পাবে এই অনিবার্য সম্ভাবনার ফলে সে আবার নিজ মূর্তি ধারণ করেছে, তার আচার-আচরণে বনেদী বড় মানুষের মজ্জাগত আত্মম্ভরিতা আবার ফুটে উঠেছে।

তার কথা বলার ভঙ্গিতে ব্যোমকেশের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল, তারপর

রাখালবাবু যখন বললেন—'ইনি আমার সহকারী শ্রীব্যোমকেশ বক্সী' তখন গঙ্গাধর উদ্ধতকণ্ঠে বলে উঠল—'তাতে কী হয়েছে? So what?'

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল, সে গঙ্গাধরের মুখোমুখি চেয়ারে বসে বলল—'আপনার নাম গঙ্গাধর ঘোষাল, কয়েক বছর আগে আপনি রেস কোর্সের এক জকিকে ঘুষ খাওয়াবার চেষ্টা করার জন্যে আইনের হাতে পড়েছিলেন?'

গঙ্গাধর আরক্ত চোখে গর্জে উঠল—'তাতে আপনার কি?'

ব্যোমকেশ আঙুল তুলে বলল—'আপনি দাগী আসামী, আপনাকে খুনের সন্দেহে গ্রেপ্তার করা যায়। আপনার শ্বশুর উইল দস্তখৎ করার আগের রাত্রে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। কে তাঁকে খুন করেছে?'

বেগবান ঘোড়া হোঁচট লেগে যেন ডিগ্‌বাজি খেয়ে পড়ল। গঙ্গাধরের দম্ভস্ফীত মুখ তুবড়ে গেল, সে ভীতস্বরে বলল—'আমি কি জানি! আমি কি জানি!'

ব্যোমকেশ এবার একটু ঠান্ডা হলো, বলল—'বেণীমাধববাবুকে খুন করার স্বার্থ আপনারও আছে, অজয়বাবুরও আছে; কিন্তু আপনি জামাতা, দশম গ্রহ।'

উত্তরে গঙ্গাধর দু'বার কথা বলবার জন্যে মুখ খুলল, কিন্তু তার মুখ দিযে কথা বেরুল না। ব্যোমকেশ তখন সহজ সুরে বলল—'আপনার মাথার ওপব খাঁড়া ঝুলছে, বেশি তেজ দেখাবেন না।'

এই সময় গায়ত্রী ভিতর দিক থেকে ঘরে প্রবেশ করল। আঁচলটা কোমরে জড়ানো, চোখে তীব্র দৃষ্টি, যুদ্ধং দেহি ভাব। সে একটা চেয়ারে বসে ব্যোমকেশকে কড়া সুরে বলল—'কি জানতে চান আমাকে বলুন।'

ব্যোমকেশ গায়ত্রীকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল—'আপনি বেণীমাধববাবুর মেয়ে গায়ত্রী দেবী। আপনাকেও কিছু প্রশ্ন আছে। —আপনাব বাবা উইল সই করবার আগেই কেউ তাঁকে খুন করেছে। কিন্তু তাঁর আগের কোনো উইল আছে কিনা আপনি জানেন?'

এতক্ষণে গঙ্গাধর কতকটা ধাতস্থ হয়েছে, সে বলে উঠল—'আমার শ্বশুর ইন্‌টেস্‌টেট্ মারা গেছেন।'

গায়ত্রী অমনি ধমক দিয়ে উঠল—'তুমি চুপ করো।—আমার বাবার অন্য কোনো উইল নেই। তিনি যা রেখে গেছেন নতুন আইনের জোরে তার অর্ধেক আমি পাব।'

'বেণীমাধববাবু বিষয়ী লোক ছিলেন, এত বয়স পর্যন্ত তিনি উইল করেননি এ কি সম্ভব? হয়তো পুরনো উইল বেরুবে, যাতে তিনি অন্য কাউকে যথাসর্বস্ব দিয়ে গেছেন। হয়তো আপনার জন্যে মাসহারা বরাদ্দ করে বাকি সব টাকা অজয়-বাবুকে দিয়ে গেছেন।'

ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে গায়ত্রী প্রায় চীৎকার করে উঠল—'না না না, বাবা কখনো আমাকে বঞ্চিত করবেন না। তিনি দাদার চেয়ে আমাকে ঢের বেশি ভালবাসতেন।'

'বসুন বসুন। আমি বলছি না যে, বেণীমাধববাবুর অন্য উইল আছেই। কিন্তু তিনি ভাগনেদেরও ভালবাসতেন, বাড়িতে এনে রেখেছিলেন; তাদের কি কিছুই দিয়ে যাননি?'

গায়ত্রী আবার চেয়ারে বসে বলল—'ওরা বাবার আসল ভাগনে নয়, মাসতুত বোনেব ছেলে। সনতের বাপ দুশ্চরিত্র ছিল, স্ত্রীকে খুন করে ফাঁসি যায়;

নিখিলের বাপ সার্কাসের পেশাদার ক্লাউন ছিল। ওদের কেন বাবা টাকা দিয়ে যাবেন?'

'আচ্ছা, ও কথা থাক। বলুন দেখি আপনার বাড়িতে ক'টা বর্ষাতি আছে।'

গায়ত্রী হঠাৎ যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল, কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—'দুটো আছে। একটা ওঁর, একটা ঝিল্লীর।'

'ও দুটো বার করে দিন, আমরা নিয়ে যাব।'

'নিয়ে যাবেন! কেন?'

'দরকার আছে। দু'চার দিন পরে ফেরত পাবেন।'

গায়ত্রী আবার কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ উঠে চলে গেল, বলল—'কি দরকার জানি না। এনে দিচ্ছি।'

নীচে নেমে এসে রাখালবাবু ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করলেন—'এবার?'

ব্যোমকেশ বলল—'চল আমার বাড়ি। নিভৃতে পরামর্শ করা যাক। একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।'

'চলুন।'

বাড়িতে এসে ব্যোমকেশ চায়ের ফরমাস দিল। সত্যবতী চা এবং আলুর চপ রেখে গেল। অতঃপর পানাহার এবং সিগারেট সহযোগে পরামর্শ শুরু হলো।

এক ঘণ্টা পরে রাখালবাবু বললেন—'বেশ, এই কথা রইল। পুলিস ডিপার্টমেণ্ট থেকে আপনার রাহা খরচ ইত্যাদি দেওয়া হবে, আমি তার ব্যবস্থা করব। আজ বিকেলে পাকা খবর পাবেন।'

রাখালবাবু চলে যাবার পর সত্যবতী ঘরে ঢুকল, ব্যোমকেশের চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসুক স্বরে বলল—'হ্যাঁ গা, কী তোমাদের এত ষড়যন্ত্র হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে আলস্য ভাঙল।—'আমাকে বোধহয় কয়েক দিনের জন্যে বাইতে যেতে হবে।'

'কোথায় যাবে?'

'তা কি জানি!'

'তুমি জানো না তা কি কখনো হয়। নিশ্চয় জানো।'

ব্যোমকেশ সত্যবতীর কাঁধে হাত রেখে মৃদু হেসে বলল—'বেশ, জানি কিন্তু বলব না।'

সত্যবতী রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বিকেল চারটের সময় রাখালবাবুর ফোন এল—'সব ঠিক। আপনি একটা সুটকেস নিয়ে সটান থানায় চলে আসুন।'

ব্যোমকেশের অনুপস্থিতিকালে বেণীমাধবের বাড়ির কমসূচী আগের মতই বলবৎ রইল। কারুর বাইরে যাবার হুকুম নেই। একজন সাব-ইন্সপেক্টর, একজন জমাদার এবং চারজন কনস্টেবল হামেহাল মোতায়েন রইল। রাখালবাবু দু'বেলা এসে পরিদর্শন করে যেতে লাগলেন। বেণীমাধবের মৃত্যু সম্বন্ধে নতুন কোনো তথ্য আবিষ্কৃত হলো না। মেদিনীর সাজের বাক্সটা অদৃশ্য হয়েছিল, অদৃশ্যই রয়ে গেল।

একদিন লাবণি তার স্বামীকে নিয়ে বাপ-মা'র সঙ্গে দেখা করতে এল।

রাখালবাবু তাদের দেখা করতে দিলেন। বন্ধ দরজার অন্তরালে অজয়-পরিবার কী ভাবে মেয়ে-জামাইয়ের সংবর্ধনা করল তা জানা গেল না। লাবণিরা যখন বেরিয়ে এল তখন লাবণির মুখে হাসি চোখে জল। বারান্দায় ঝিল্লীর সঙ্গে লাবণির দেখা হলো: দুই বোন পরস্পর গলা জড়িয়ে চুমু খেল, তারপর হাত ধরাধরি করে নীচে নেমে এল। নীচের বারান্দায় নিখিল ছিল, সে নব দম্পতিকে দেখে হো হো করে হেসে বলল—'এই যে পলাতক আর পলাতকা! দু'জনে মিলে খুব নাচছ তো?'

পরাগ কপট বিষণ্ণতায় ম্রিয়মান মুখভঙ্গী করে বলল—'দু'জনে মিলে নাচা হচ্ছে কই? এখন আমি নাচছি, লাবণি নাচাচ্ছে।'

লাবণিরা চলে যাবার পর নিখিল ঝিল্লীকে বলল—'কী, তুমি আর দেরি করছ কেন? একজন তো নাচিয়েকে নিয়ে কেটে পড়ল, এবার তুমি একটা গাইয়েকে নিয়ে কেটে পড়।'

ঝিল্লী ভুরু বেঁকিয়ে নিখিলের পানে তাকাল- 'আমি কেটে পড়ব না। কিন্তু তোমার খবর কি? যে তোমাকে চিঠি লেখে তাকে ধরতে পারলে?'

নিখিল বলল—'ধরিনি এখনো কিন্তু আর বেশি দেরি নেই। ব্যোমকেশবাবু বলেছেন শীগ্‌গির ধরে দেবেন। যেই ধরব অমনি পটাস করে বিয়ে করে ফেলব। আমার সঙ্গে চালাকি নয়।'

'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।' মুচকি হেসে ঝিল্লী ওপরে চলে গেল।

পাঁচ দিন পরে ব্যোমকেশ ফিরে এল, তার সঙ্গে একটি মানুষ। নিম্নশ্রেণীর পশ্চিমা যুবক। ব্যোমকেশ যুবককে নিয়ে সোজা থানায় উপস্থিত হলো, রাখাল-বাবুর সঙ্গে কথা বলল। তারপর যুবককে রাখালবাবুর জিম্মায় রেখে বাড়ি গেল। রাখালবাবুকে বলে গেল—'আজ বিকেল চারটের সময় বেণীমাধবের ড্রয়িংরুমে থিয়েটার বসবে, তুমি হবে তার স্টেজ ম্যানেজার।'

বিকেল চারটের সময় ব্যোমকেশ বেণীমাধবের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখল, ড্রয়িংরুমে বাড়ির ন'জন লোক উপস্থিত আছে; অজয় আরতি মকরন্দ একটা সোফায় বসেছে, অন্য সোফায় বসেছে গঙ্গাধর গায়ত্রী আর ঝিল্লী। সনৎ আর নিখিল দুটো চেয়ারে দূরে দূরে বসেছে; আর মেদিনী মেঝের ওপর দেয়াল ঠেস দিয়ে উদাসভাবে বসে আছে। সকলের মুখেই বিরক্তি ও অবসাদের ব্যঞ্জনা। ড্রয়িং-রুমের দোরে ও বারান্দায় পুলিস গিজগিজ করছে। রাখালবাবু একটা ছোট সুটকেস হাতে নিয়ে অধীরভাবে বারান্দায় পায়চারি করছেন।

ব্যোমকেশ পৌঁছুতেই রাখালবাবু তাকে বললেন—'সব তৈরি, এবার তবে আরম্ভ করা যাক।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল—'হিম্মৎলাল?'

রাখালবাবু বললেন—'তাকে লুকিয়ে রেখেছি। যথাসময়ে সে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে।'

'বেশ, এসো তাহলে। তোমার হাতে ওটা—? ও বুঝেছি।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলেন। সকলে নড়েচড়ে বসল, মকরন্দর মুখের ভ্রূকুটি গভীরতর হলো। রাখালবাবু মাঝখানের নীচু টেবিলটাকে এক পাশে টেনে এনে দুটো হাল্কা চেয়ার তার সামনে রাখলেন;

হাতের সুটকেস টেবিলের ওপর রেখে ব্যোমকেশকে বললেন—'বসুন।' নিজে সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ব্যোমকেশ হাসিমুখে একবার সকলের মুখের দিকে তাকাল, বলল—'আপনারা শুনে সুখী হবেন বেণীমাধববাবুর হত্যাকারী কে তা আমরা জানতে পেরেছি, আততায়ীর বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণও পেয়েছি। আসামী এই ঘরেই আছে, এখনি তার পরিচয় পাবেন।'

সকলে সন্দেহভরা চোখে পরস্পর তাকাতে লাগল; বেশি দৃষ্টি পড়ল গঙ্গাধরের ওপর। ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে বলে চলল—'আমরা গোড়াতেই একটা ভুল করেছিলাম, ভেবেছিলাম বেণীমাধববাবুই আসামীর প্রধান লক্ষ্য। ভুলটা অস্বাভাবিক নয়; বেণীমাধববাবু বড় মানুষ ছিলেন, তিনি এমন উইল করতে যাচ্ছিলেন যাতে তাঁর উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা ছিল; মেঘরাজ ছিল বেণীমাধবের দ্বাররক্ষী, বেণীমাধবকে যে ব্যক্তি মারতে চায় সে মেঘরাজকে না মেরে ঘরে ঢুকতে পারবে না তাই তাকে মেরেছে। মেঘরাজের মত লোক যে হত্যাকারীর প্রধান লক্ষ্য হতে পারে তা ভাবাই যায় না।

'আমি একদিন বেণীমাধববাবুর ঘরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম তাঁর ক্ষুর রয়েছে; সাবেক কালের লম্বা ক্ষুর, যে-ক্ষুর দিয়ে মেঘরাজ তাঁর দাড়ি কামিয়ে দিত। ক্ষুরটা খাপ থেকে বের করে পরীক্ষা করলাম, তাতে কোথাও একটিও আঙুলের ছাপ নেই; কে যেন খুব সাবধানে ক্ষুরটি মুছে খাপের মধ্যে রেখেছে। কিন্তু কেন? স্বাভাবিক অবস্থায় অন্তত মেঘরাজের আঙুলের ছাপ তাতে থাকা উচিত।

'সন্দেহ হলো। সেই ক্ষুর দিয়ে আমি নিজে দাড়ি কামাতে গিয়ে দেখলাম ক্ষুর একেবারে ভোঁতা, তা দিয়ে দাড়ি কামানো দূরের কথা, পেন্সিল কাটাও যায় না। তখন আর সন্দেহ রইল না যে, এই ক্ষুর দিয়েই দু'জন লোকের গলা কাটা হয়েছে এবং তার ফলেই ক্ষুরটি ভোঁতা হয়ে গেছে। ডাক্তারি পরীক্ষাতেও প্রমাণ হলো যে, ওই ক্ষুর দিয়েই দু'জনের গলা কাটা হয়েছিল।

'কিন্তু ক্ষুর ছিল ঘরের মধ্যে, আসামী এসেছিল বাইরে থেকে; ঘরে ঢোকবার আগেই সে ক্ষুর পেল কোথা থেকে? নিশ্চয় কেউ ক্ষুরটি আগেই ঘর থেকে সরিয়েছিল।

'কে সরাতে পারে? সেদিন সকালে মেঘরাজ ওই ক্ষুর দিয়ে বেণীমাধবের দাড়ি কামিয়ে দিয়েছিল; তারপর সারাদিনে তাঁর ঘরে যারা এসেছিল তারা কেউ ক্ষুরের কাছে যায়নি। ও ঘরে নিত্য আসে যায় কেবল দু'জন ঃ মেঘরাজ আর মেদিনী। মেঘরাজ নিজের গলা কাটবার জন্যে ক্ষুর চুরি করবে না। তাহলে বাকি রইল কে?

সকলের দৃষ্টি মেদিনীর ওপর গিয়ে পড়ল। মেদিনী দেয়ালে ঠেস দিয়ে আগের মতই বসে আছে, মাথার ওপরকার আঁচলটা দু' হাতে একটু তুলে ধরে নির্নিমেষ চোখে ব্যোমকেশের পানে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ সনৎ কথা বলল—'একটা কথা বুঝতে পারছি না। হত্যাকারী মামার ক্ষুর দিয়ে গলা কাটতে গেল কেন? অন্য অস্ত্র কি ছিল না?'

ব্যোমকেশ বলল—'আসামী লোকটা ভারি ধূর্ত। সে জানে যে-অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয় সে-অস্ত্রকে বেবাক লোপাট করে দেওয়া সহজ নয়। তাই সে মতলব করেছিল, বেণীমাধবের ক্ষুর দিয়ে গলা কাটবার পর ক্ষুরটি ভাল করে মুছে

যথাস্থানে রেখে দেবে, ওই ক্ষুর দিয়ে যে খুন হয়েছে একথা কারুর মনেই আসবে না, পুলিস অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াবে। বুঝতে পেরেছেন?'

'পেরেছি। এবার আপনার বক্তৃতা শেষ করুন।'

ব্যোমকেশ আবার নির্লিপ্ত স্বরে বলতে আরম্ভ করল—'মেদিনী ছোট ঘরের মেয়ে, কিন্তু পুরুষের চোখ দিয়ে যারা ওর পানে তাকিয়েছে তারাই জানে কী প্রচণ্ড ওর দেহের চৌম্বক শক্তি। সে সুচরিত্রা মেয়ে কিনা তা আমরা জানি না। যদি কুচরিত্রা হয় তাহলে মনে রাখতে হবে যে, মেঘরাজ ও বৃদ্ধ বেণীমাধব ছাড়া বাড়িতে আরো পাঁচজন সমর্থ পুরুষ আছে। স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ আসক্তির ফলে অসংখ্য ট্র্যাজেডি ঘটেছে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

'আমরা মেদিনীর ঘরে গিয়ে তাকে জেরা করেছিলাম; মেঘরাজের সৈনিক জীবনের দলিলপত্র থেকে তার দিল্লীর ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। তারপর একটা অপ্রত্যাশিত জিনিস পেলাম। মেদিনীর একটি চুল-বাঁধার কাঠের বাক্স ছিল, তার ডালা খুলে দেখলাম আয়নার ওপর একটা ফটো আঁটা রয়েছে। মেদিনীর ফটো, সাম্প্রতিক ছবি। সে খাটের ধারে বসে হাসছে। আমি আবার বাক্সের ডালা বন্ধ করে দিলাম, মেদিনী কিছু জানতে পারল না। পরদিন শুনলাম বাক্সটা চুরি গিয়েছে।' ব্যোমকেশ ঘাড় তুলে রাখালবাবুর পানে চাইল।

রাখালবাবু টেবিলের ওপরে সুটকেসটা খুলতে খুলতে অবিচলিত মুখে বললেন—'চুরি গিয়েছিল, আমরা খুঁজে বার করেছি।' তিনি সুটকেস থেকে প্রসাধনের বাক্সটা বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

ব্যোমকেশ বলল—'ছবিটা আছে নিশ্চয়।'

রাখালবাবু ডালা খুলে বললেন—'আছে।' কে চুরি করেছিল, কোথায় পাওয়া গেল এ সম্বন্ধে তিনি নীরব রইলেন। মনে হয়--চুরির ব্যাপারটা নিছক ধোঁকার টাটি।

ব্যোমকেশ বলল—'বেশ। তারপর আমরা বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে একে একে দেখা করলাম। বাড়িতে যতগুলো বর্ষাতি ছিল সংগ্রহ করলাম; কেবল মকরন্দর বর্ষাতি পাওয়া গেল না। মকরন্দ সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখা দরকার—বেণীমাধবের হুকুমে মেঘরাজ তার গালে চড় মেরেছিল; অর্থাৎ দু'জনেরই ওপর তার গভীর আক্রোশ। সে-রাত্রে ন'টার সময় সে বাড়িতে এসেছিল, তারপর গভীর রাত্রে কখন চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কেউ জানে না। সে যখন রেস-কোর্সে ধরা পড়ল তখন তার পকেটে পৌনে দু'শো টাকা ছিল। কোথা থেকে সে এত টাকা পেল তা বলতে চায় না।

'যা হোক, বর্ষাতি কেন সংগ্রহ করলাম সেই কথা বলি। যারা মতলব এঁটে ঘুমন্ত লোকের গলা কাটতে যায় তারা জানে এই উপায়ে নিঃশব্দে খুন করা যায় বটে, কিন্তু আততায়ীর নিজের কাপড়-চোপড়ে প্রচুর রক্ত লাগার সম্ভাবনা। কাপড়-চোপড়ে রক্ত লাগলে সহজে ধোয়া যায় না, রক্তের দাগ থেকে যায়। তাই পাশ্চাত্ত্য দেশে খুন করবার সময় খুনী গায়ে বর্ষাতি চড়িয়ে নেয়; বর্ষাতির তেলা গায়ে যেটুকু রক্ত লাগে তা সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়। পাশ্চাত্ত্য রহস্য রোমাঞ্চের বই যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই একথা জানেন। আমরা বর্ষাতিগুলোকে মালিকের নামের টিকিট মেরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দিলাম।

'তারপর আমি গেলাম দিল্লী। এতক্ষণে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম আসামী

কে, কিন্তু আরো পাকা প্রমাণের দরকার ছিল। দিল্লীতে গিয়ে যে-বস্তিতে মেঘরাজ থাকত, সেখানে খোঁজখবর নিতেই অনেক কথা বেরিয়ে পড়ল। মেদিনী মেঘরাজের স্ত্রী নয়। মেঘরাজ বিপত্নীক ছিল; বেণীমাধব যখন তাকে বললেন, স্ত্রীকে নিয়ে এসো, তখন সে দিল্লী গিয়ে মেদিনীকে স্ত্রী সাজিয়ে নিয়ে এল। মেদিনীর স্বামী আছে, কিন্তু তার চরিত্র ভাল নয়; মেঘরাজের সঙ্গে আগে থাকতেই তার ঘনিষ্ঠতা ছিল; সে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে এল। বুঝে দেখুন মেদিনী কি রকম মেয়েমানুষ।'

মেদিনীর চোখ আতঙ্কে ভরে উঠেছিল, সে হঠাৎ চীৎকার করে উঠল—'না না, ঝুট বাত।'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পানে চোখ তুলল, তিনি দোরের দিকে চেয়ে হাঁক দিলেন —'হিম্মৎলাল!'

যে পশ্চিমা যুবককে ব্যোমকেশ দিল্লী থেকে সঙ্গে এনেছিল সে ঘরে প্রবেশ করল; চুড়িদার পায়জামা ও শেরোয়ানী পরা ক্ষীণকায় যুবক। ব্যোমকেশ তার দিকে আঙুল দেখিয়ে মেদিনীকে জিজ্ঞেস করল—'একে চিনতে পার?'

মেদিনী তড়িৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়িয়েছিল, ভয়ার্ত চোখে হিম্মৎলালের দিকে একবার চেয়ে আবার মাটিতে আছড়ে পড়ল, মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

'হিম্মৎলাল, মেদিনী তোমার কে?'

'জি, মেদিনী আমার বিয়াহী ঔরৎ, আমাকে ছেড়ে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল।'

'আচ্ছা, তুমি এখন বাইরে যাও।'

হিম্মৎলাল মেদিনীর পানে বিষদৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল—'দেখা যাচ্ছে মেদিনীই যত নষ্টের গোড়া। সে স্বামীকে ছেড়ে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল, তারপর এখানে এসে আর একজন উচ্চতর বর্গের মানুষকে তার মোহময় কুহকজালে জড়িয়ে ফেলল। কিন্তু মেঘরাজ কড়া প্রকৃতির লোক, সে জানতে পারলে মেদিনীর উচ্চাশা ধূলিসাৎ হবে; তাই তাকে সরানো দরকার হয়ে পড়ল। কিন্তু একলা মেঘরাজকে খুন করলে ধরা পড়ার ভয় আছে, তাই মেঘরাজের সঙ্গে বেণীমাধবকেও খুন করে পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। বেণী-মাধবের সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েদের বিরোধ যে বেশ ঘনিয়ে উঠেছে তা মেদিনীর অজানা ছিল না।

'কিন্তু সত্যিই কি মেদিনী নিজের হাতে দু'জনের গলা কেটেছে? ছোরা ছুরি ক্ষুর মেয়েদের অস্ত্র নয়, মেয়েদের অস্ত্র বিষ; বিষ খাওয়াবার সুযোগ থাকলে তারা ছোরা ছুরি ব্যবহার করে না। মেদিনীর বিষ খাওয়াবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, সে বেণীমাধব ও মেঘরাজের খাবার নিজের হাতে রান্না করত।

'দেখা যাক, মেদিনীর সহকারী কে।—মেদিনী, তোমার চুল বাঁধার বাক্সে আয়নার গায়ে একটা ফটো লাগানো আছে। কে ফটো তুলেছিল?'

মেদিনী উত্তর দিল না, মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। ব্যোমকেশ তখন সনতের দিকে ফিরে বলল—'সনৎবাবু, আপনি ফটোগ্রাফির বিশেষজ্ঞ, দেখুন তো একবার ছবিটা।'

সনৎ ব্যোমকেশের পানে সন্দেহভরা ভ্রূকুটি করল, তারপর অনিচ্ছাভরে উঠে

এল। রাখালবাবু বাক্সের ডালা খুলে ধরলেন। সনৎ সামনে ঝুঁকে ছবিটা দেখল, তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। সে অবরুদ্ধ স্বরে বলল—'মেদিনীর ছবি।'

ব্যোমকেশ বলল—'কে ছবি তুলেছে বলতে পারেন?'

'তা কি করে বলব!'

'ভাল করে দেখুন। মেদিনীকে খাটে বসিয়ে ছবি তোলা হয়েছে, মেদিনীর পেছনে খাটের মাথায় কারুকার্য দেখা যাচ্ছে। কার খাট চিনতে পারছেন না?'

সনতের চোখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—'কি বলতে চান আপনি?'

ব্যোমকেশ বলল—আপনি নিজের ঘরে রাত্তির বেলা ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে মেদিনীর ছবি তুলেছিলেন। আপনি মেদিনীর গুপ্ত প্রণয়ী। মেঘরাজ যখন বেণীমাধবের দোরের সামনে শুয়ে ঘুমোত তখন মেদিনী আপনার ঘরে যেত।

সনৎ কিছুক্ষণ জবাফুলের মত লাল চোখে চেয়ে রইল, শেষে বিকৃত গলায় বলল—তাতে কি প্রমাণ হয় আমি মামাকে খুন করেছি?

'সনৎবাবু, আপনি মেদিনীর মোহে পড়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়েছিলেন মেঘরাজকে খুন করে মেদিনীর ওপর একাধিপত্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। আপনার বোধহয় প্ল্যান ছিল খুনের মামলা মিটে গেলে মেদিনীকে নিয়ে অন্য কোথাও বাসা বাঁধবেন।'

'আমি খুন করিনি।'

'আপনার দেহে খুনীর রক্ত আছে আপনার বাবা আপনার মাকে খুন করে ফাঁসি গিয়েছিলেন।'

'আমি খুন করিনি। খুন করেছে ওই মেদিনী।'

মেদিনী ধড়মড়িয়ে হাঁটুর ওপর উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল 'নেহি নেহি নেহি—'

ব্যোমকেশ বলল ঠিক কথা। মেদিনী নিজের হাতে খুন করেনি। খুন করেছেন আপনি।

'প্রমাণ আছে?'

'ছোট্ট একটা প্রমাণ আছে। খুন করার পর আপনি বর্ষাতিটাকে খুব ভাল করেই ধুয়েছিলেন কিন্তু পকেটের মধ্যে কয়েক ফোঁটা রক্ত রয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষা করে দেখা গেছে রক্তটা বেণীমাধববাবুর ব্লাড গ্রুপের রক্ত।

মেদিনী বলে উঠল—'হাঁ হাঁ সনৎবাবু খুন করেছে আমি কিছু জানি না আমি বেকসুর।'

হঠাৎ সনৎ বুনো মোষের মত ঘাড় নীচু করে চাপা গর্জন করতে করতে মেদিনীর দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু দুজন সাব ইন্সপেক্টর ইতিমধ্যে সনতের দু'পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তারা সনতকে ধরে ফেললেন। রাখালবাবু তার হাতে হাতকড়া পরালেন। সনতের ক্ষিপ্র উন্মত্ততা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দুই প্রহরীর মাঝখানে সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেদিনী আবার বলে উঠল—'আমি কিছু জানি না, আমি বেকসুর।'

ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে বলল—'না মেদিনী তুমি বে-কসুর নও। বেণীমাধব বাবুর ক্ষুর চুরি করে তুমিই সনৎবাবুকে দিয়েছিলে। তারপর সে যখন গভীর রাত্রে ফিরে এসে সদর দোরে টোকা দিয়েছিল তখন তুমি দোর খুলে তাকে ভিতরে

এনেছিলে; সে কাজ সেরে চলে যাবার পর তুমি দোর বন্ধ করে দিয়েছিলে। তোমরা দু'জন সমান অপরাধী।'

মেদিনী আবার মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। আসামী দু'জনকে চালান করে দিয়ে রাখালবাবু বাড়ির ওপর থেকে অবরোধ তুলে নিয়েছেন। বাইরে ঘনায়মান সন্ধ্যা। রাখালবাবু সনতের ঘরে গিয়ে তার আলমারি খুলে অ্যালবামের সারি থেকে একটি একটি অ্যালবাম খুলে পাতা উলটে দেখছিলেন। ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানতে টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

রাখালবাবু অবশেষে একটি অ্যালবাম হাতে নিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন, নিবিষ্ট মনে অ্যালবামের ছবিগুলি দেখতে লাগলেন। প্রতি পৃষ্ঠায় একটি শিথিলবসনা তরুণীর ছবি। শিকারী যেমন বাঘ শিকার করে তার চামড়া দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে, সনৎ যেন প্রকারান্তরে তাই করেছে।

অ্যালবাম শেষ করে রাখালবাবু একটি নিশ্বাস ফেললেন, সিগারেট ধরিয়ে বললেন 'সনৎ গাঙ্গুলির রক্তে হয়তো পাগলামির বীজ আছে, কিন্তু সে যে একটি রসিক চূড়ামণি তাতে সন্দেহ নেই।'

ব্যোমকেশ কাছে এসে অ্যালবামের পাতা উলটে দেখল, তারপর বলল—'শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলেছেন, নারী নরকের দ্বার। সনৎ নরকের অনেকগুলো দ্বার খুলেছিল, তাই শেষ পর্যন্ত তার নরক প্রবেশ অনিবার্য হয়ে পড়ল।'

'কিন্তু সনৎ মেদিনীর মতন মেয়ের জন্যে এমন ভয়ঙ্কর কাজ করল ভাবতে আশ্চর্য লাগে।'

'রাখাল, মেদিনীর মতন মেয়েকে তুচ্ছজ্ঞান কোরো না। যুগে যুগে এই জাতের মেয়েরা জন্মগ্রহণ করেছে কখনো ধনীর ঘরে কখনো দরিদ্রের ঘরে—পুরুষের সর্বনাশ করার জন্যে। দ্রৌপদী এই জাতের মহিলা ছিলেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূলে আছেন দ্রৌপদী। ইলিয়ডের হেলেনও তাই। এ যুগেও এই জাতের মেয়ের অভাব নেই। ওরা সকলেই যে চরিত্রহীনা তা নয়, কিন্তু ওদের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা পুরুষকে বিশেষত সনতের মত দুশ্চরিত্র পুরুষকে—ক্ষেপিয়ে দিতে পারে, কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মত্ত করে তুলতে পারে। জ্যেষ্ঠ আলেকজাণ্ডার দ্যুমা একটা বড় দামী কথা বলেছিলেন, cherchez la femme: যেখানে এই ধরনের ব্যাপার ঘটে সেখানে মেয়েমানুষ খুঁজবে, মূলে মেয়েমানুষ আছে।'

'তা বটে।' রাখালবাবু উঠলেন—'দেখা যাচ্ছে বেণীমাধবের মেয়ে এবং পুত্রবধূ তাঁকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করেনি, বৃদ্ধের জীর্ণ পাকযন্ত্রই দায়ী। চলুন, এবার যাওয়া যাক। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এক পেয়ালা গরম চায়ের জন্যে প্রাণ কাঁদছে।'

'চল আমার বাড়িতে, তরিবৎ করে চা খাওয়া যাবে।'

'উত্তম প্রস্তাব।'

ঘরের বাইরে এসে রাখালবাবু দোরে তালা লাগালেন, তারপর সদর দরজার দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন ঝিল্লী সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে, তার পিছনে প্রকাণ্ড ট্রে'র ওপর চায়ের সরঞ্জাম এবং কচুরী-নিমকির প্লেট নিয়ে দাসী আসছে। ব্যোমকেশ বলল—'রাখাল, তোমার প্রাণের কান্না ভগবান

শুনতে পেয়েছেন। চল ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসা যাক।'

রাখালবাবু সাবধানী লোক, বললেন—'দাঁড়ান, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।'

ঝিল্লী তাদের কাছে এসে সলজ্জ স্বরে বলল—'মা আপনাদের জন্যে চা জলখাবার পাঠিয়ে দিলেন।'

'দেখলে তো?' সকলে ড্রয়িংরুমে গেল। ঝি টেবিলের ওপর ট্রে রেখে চলে গেল; ঝিল্লীও তার অনুগমন করছিল, ব্যোমকেশ বলল—'ঝিল্লী, আমরা বড় ক্লান্ত; তুমি আমাদের চা ঢেলে দাও, আমরা বসে বসে খাই।'

ঝিল্লী ফিরে এসে টি-পট থেকে তাদের চা ঢেলে দিল, জলখাবারের প্লেট তাদের সামনে রাখল। ব্যোমকেশ অর্ধমুদিত চোখে কচুরি চিবোতে চিবোতে দেখল, ঝিল্লী গুটি গুটি দোরের দিকে যাচ্ছে।

'ঝিল্লী শোনো, চলে যেও না। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ঝিল্লী থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর আস্তে আস্তে ফিরে এসে ব্যোমকেশের পাশে দাঁড়াল। ব্যোমকেশ সংকেতভরা চোখে রাখালবাবুর পানে তাকাল; রাখালবাবু অলসভাবে চায়ের পেয়ালা শেষ করে একটি গানের কলি গুঞ্জন করতে করতে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

ঝিল্লী ব্যোমকেশের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তার যে বুক ঢিবঢিব করছে তা তার মুখ দেখে বোঝা যায় না। ব্যোমকেশ খাটো গলায় একটু হাসল, বলল 'সম্পর্কে নিখিল তোমার মামা হয় বটে। কিন্তু অনেক দূরের সম্পর্ক, আইনত বিয়ে আটকায় না।'

ঘরের ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দেখা গেল না ঝিল্লীর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। তারপর তার ক্ষীণস্বর শোনা গেল—'কি করে জানলেন?'

ব্যোমকেশ বলল—'বোকা মেয়ে! সবগুলো চিঠিতেই তোমার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।—আচ্ছা, তুমি এখন কোণের চেয়ারে গিয়ে বোসো। আরো কথা আছে।'

ঝিল্লী নেংটি ইঁদুরের মত ঘরের অন্ধকার কোণে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘরে যেন ব্যোমকেশ ছাড়া আর কেউ নেই।

বাইরে দু'জোড়া জুতোর শব্দ শোনা গেল। রাখালবাবু নিখিলকে নিয়ে ফিরে এলেন।

'রাখাল, আলোটা জেলে দাও।'

দোরের পাশে সুইচ। রাখালবাবু সুইচ টিপলেন, কয়েকটা উজ্জ্বল বাল্‌ব্‌ জ্বলে উঠল। নিখিল কোনোদিকে না তাকিয়ে ব্যোমকেশের পাশে গিয়ে বসল, অনুরাগপূর্ণ চোখে তার পানে চেয়ে বলল—'ব্যোমকেশদা, আপনি ভেলকি জানেন। সনৎদা আমার মাসতুত ভাই, তাকে সারা জীবন দেখছি, কিন্তু সে যে এমন মানুষ তা ভাবতেও পারিনি।'

ব্যোমকেশ বলল—'নিখিল, মুখ দেখে যদি মানুষের মনের কথা জানা যেত তাহলে আইন, আদালত, পুলিস, সত্যান্বেষী কিছুই দরকার হতো না; তুমিও মুখ দেখেই বুঝতে পারতে কোন্ মেয়েটি তোমাকে বেনামী চিঠি লেখে।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।' নিখিল ব্যোমকেশের আর একটু কাছে ঘেঁষে বসল, ষড়যন্ত্রকারীর মত ফিসফিস করে বলল—'আপনি কিছু বুঝতে পেরেছেন নাকি?'

ব্যোমকেশ হাসল—'আগে তুমি বলো দেখি মেয়েটির সন্ধান যদি পাওয়া যায় তুমি কি করবে!'

নিখিলের চোখ উদ্দীপনায় জ্বলজ্বল করে উঠল—'কী করব? বিয়ে করব। কানা হোক, খোঁড়া হোক, কাফ্রি হোক, হাবসী হোক, তাকে বিয়ে করব।'

ব্যোমকেশ বলল—'তাহলে সন্ধান পাওয়া গেছে।—ঝিল্লী, এদিকে এসো।'

নিখিল চকিত হয়ে দোরের দিকে চাইল। ওদিকে ঘরের কোণে ঝিল্লীর সাড়া-শব্দ নেই, সে চেয়ারের পিছনে লুকিয়েছে। নিখিল ব্যোমকেশের দিকে ফিরে উত্তেজিত স্বরে বলল—'কাকে ডাকলেন?'

'এই যে দেখাচ্ছি—' ব্যোমকেশ উঠে গিয়ে ঝিল্লীর হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল, তাকে হাত ধরে নিখিলের কাছে এনে বলল—'এই নাও তোমার ঝিঁঝি পোকা! ঝিঁঝি পোকাকে চোখে দেখা যায় না, কেবল ঝংকার শোনা যায়। আমরা কিন্তু ধরেছি।'

নিখিলের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম করল। সে দু' হাত তুলে চীৎকার করল 'আাঁ! ঝিল্লী—ঝিল্লী আমাকে চিঠি লেখে! ঝিল্লী আমাকে ভালবাসে! কিন্তু - কিন্তু ও যে আমার ভাগনী!'

ব্যোমকেশ হেসে বলল—'ভয় নেই, ভয় নেই। ঝিল্লী ভারি সেয়ানা মেয়ে, অপাত্রে হৃদয় সমর্পণ করেনি। তোমাদের যা সম্পর্ক তাতে বিয়ে আটকায় না।'

ঝিল্লীর মুখ অবনত, ঠোঁটের কোণে ভীরু হাসির যাতায়াত। নিখিলের মুখে ক্রমে ক্রমে একটি প্রকাণ্ড হাসি ফুটে উঠল, সে বলল—'উঃ, কী সাংঘাতিক আজ-কালকার মেয়ে দেখেছেন ব্যোমকেশদা, আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছিল। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। বিয়েটা হয়ে যাক--'

এই সময় দোরের সামনে গঙ্গাধরকে দেখা গেল। লাঠি হাতে সে বোধহয় সায়াহ্নিক নিত্যকর্ম করতে বেরুচ্ছিল। ঘরের মধ্যে গলার আওয়াজ শুনে ঘরে ঢুকেছে। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মেজাজ আবার সপ্তমে চড়ে গিয়েছে, সে রাখালবাবুকে লক্ষ্য করে কড়া সুরে বলল—'এখানে আপনার কাজ শেষ হয়েছে, এখনো এখানে রয়েছেন কেন?' রাখালবাবু উত্তর দেবার আগেই তার চোখ পড়ল ঝিল্লীর ওপর, অমনি ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করে সে বলল—'ঝিল্লী! তুই এখানে পুরুষদের মধ্যে কি করছিস-'

বাপকে দেখে ঝিল্লী একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, এখন চমকে উঠে ব্যোমকেশের পিছনে লুকোবার চেষ্টা করল। গঙ্গাধর বলল—'ধিঙ্গি মেয়ে! পুরুষ-ঘেঁষা স্বভাব হয়েছে। চাবকে লাল করে দেব।'

নিখিল হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল, এক লাফে গঙ্গাধরের সামনে গিয়ে বলল—'মুখ সামলে কথা বলুন। ঝিল্লীকে আমি বিয়ে করব।'

গঙ্গাধর প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল, তারপর তারস্বরে চিৎকার ছাড়ল—'কী, আমার মেয়েকে বিয়ে করবি তুই, হতভাগা ছাপাখানার ভূত! ঠেঙিয়ে তোর হাড় ভেঙে দেব না!' সে লাঠি আস্ফালন করতে লাগল।

এইবার গায়ত্রী ঘরে ঢুকল, উগ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে বলল—'কি হয়েছে, এত চেঁচামেচি কিসের?'

গঙ্গাধর কর্ণপাত করল না, চেঁচিয়ে বলল—'বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। ছোট মুখে বড় কথা। আমার মেয়েকে তুই বিয়ে করবি!'

ঝিল্লী ছুটে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল, কানে কানে বলল—'মা, তুমি যদি অমত কর আমি বিষ খেয়ে মরব।' চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ঝিল্লীর মুখ ফুটেছে।

গায়ত্রী একবার নিখিলকে ভাল করে দেখল, যেন আগে কখনো দেখেনি। নিখিল গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিল। বলল-'দিদি, ঝিল্লীকে আমি—মানে আমাকে ঝিল্লী বিয়ে করতে চায়। ব্যোমকেশদা বলেছেন সম্পর্কে বাধে না।'

গায়ত্রী ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করল--'সত্যি সম্পর্কে বাধে না?'

ব্যোমকেশ বলল—'না, ওরা first cousin নয়, সম্পর্কে বাধে না।'

গঙ্গাধর আরো গলা চড়িয়ে চীৎকার করল—'শুনতে চাই না, কোনো কথা শুনতে চাই না। বেরিয়ে যাও তোমরা আমার বাড়ি থেকে, এই দণ্ডে বেরিয়ে যাও—'

গায়ত্রী ধমক দিয়ে উঠল—'থামো তুমি। বাড়ি তোমার নয়, বাড়ি আমার। আমি সুধাংশুবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি; বাবা উইল করার আগেই মারা গেছেন, আইনত তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক আমার, এ বাড়িরও অর্ধেক আমার। তুমি বাইরে যেখানে যাচ্ছিলে যাও-না। যা করার আমি করব।'

গঙ্গাধর পিন ফোটানো খেলনার বেলুনের মত চুপসে গেল, তারপর ঘাড় হেঁট করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো।

গায়ত্রী ঝিল্লীর বাহুবন্ধন থেকে গলা ছাড়িয়ে তার হাত ধরে সোফায় বসল, নিখিলের দিকে চেয়ে হাকিমের মত হুকুম করল-'কি কাণ্ড বাধিয়েছ তোমরা এবার বলো শুনি।'

নিখিল বলল—'আমি কিছু জানি না দিদি, ওই ওকে জিজ্ঞেস করো? ব্যোমকেশদা, চিঠিগুলো কোথায়?'

ব্যোমকেশ পকেট থেকে চিঠি বের করে দিয়ে বলল--'রাখাল, চল এবার আমাদের যাবার সময় হয়েছে। গায়ত্রী দেবী, চায়ের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নিখিল, তুমি যে বৌ পেলে অনেক ভাগ্যে এমন বৌ পাওয়া যায়। ঝিল্লী, তুমিও কম ভাগ্যবতী নও। জীবনে যে-জিনিস সবচেয়ে দুর্লভ, সেই দুর্লভ হাসি তুমি পেলে। তোমাদের জীবনে হাসির ঢেউ খেলতে থাকুক। এসো রাখাল।'

লোহার বিস্কুট

কমলবাবু বললেন, 'আমি পাড়াতেই থাকি, হিন্দুস্থান পার্কের কিনারায়। আপনাকে অনেকবার দেখেছি, আলাপ করবার ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু সাহস হয় নি। আজ একটা সূত্র পেয়েছি, তাই ভাবলাম এই ছুতোয় আলাপটা করে নিই। আমার জীবনে একটি ছোট্ট সমস্যা এসেছে—'

'সমস্যা!' ব্যোমকেশ সিগারেটের কৌটো এগিয়ে দিয়ে বলল 'বলুন বলুন অনেকদিন ও বস্তুর মুখদর্শন করি নি।'

গ্রীষ্মের একটি রবিবার সকালে ব্যোমকেশের কেয়াতলার বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। কমলবাবুর চেহারাটি নাড়ুগোপালের মত, কিন্তু মুখের ভাব চটপটে বুদ্ধিসমৃদ্ধ। তিনি হাসিমুখে একটি সিগারেট নিয়ে ধরালেন, তারপর গল্প আরম্ভ করলেন, 'আমার নাম কমলকৃষ্ণ দাস, কাছেই ভারত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শাখা আছে, আমি সেখানকার ক্যাশিয়ার। বছর দেড়েক আগে পুরুলিয়া থেকে বদলি হয়ে এখানে এসেছি।

'কলকাতায় এসেই মুশকিলে পড়ে গেলাম; কোথাও বাসা খুঁজে পাই না। শেষ পর্যন্ত একটি লোক তার বাড়ির নিচের তলায় একটি ঘর ছেড়ে দিল। ফ্যামিলি আনা হল না, স্ত্রী আর মেয়েকে পুরুলিয়ায় রেখে একলা বাসায় উঠলাম।

'বাড়িওয়ালার নাম অক্ষয় মণ্ডল। বাড়িটি দোতলা; নিচের তলায় দুটি ঘর, ওপরে দুটি; যাতায়াতের রাস্তা আলাদা। অক্ষয় মণ্ডল দোতলায় একলা থাকে, কিন্তু তার কাছে লোকজনের যাতায়াত আছে। মিষ্টভাষী লোক, কিন্তু কী কাজ করে বুঝতে পারলাম না। মাঝে মাঝে আমার ঘরে এসে গল্পসল্প করত, কিন্তু আমাকে কোনদিন দোতলায় ডাকত না। পড়শীদের সঙ্গেও যাতায়াত ছিল না। আমাদের ব্যাঙ্কে ওর একটা চালু খাতা ছিল।

'যা হোক, এইভাবে মাস তিনেক কাটার পর একদিন একটা ছুটির দিনে আমার অফিসের একজন সহকর্মী বন্ধুর বাড়িতে রাত্রে নেমতন্ন ছিল। ফিরতে রাত হয়ে গেল। বাসায় ফিরে দেখি অক্ষয় মণ্ডল দোতলা থেকে নেমে এসে সিঁড়ির দরজায় তালা লাগাচ্ছে, তার পায়ের দু'পাশে দুটি সুটকেশ। বললাম, 'একি, এত রাত্রে কোথায় চললেন?'

'আমায় দেখে অক্ষয় মণ্ডল কেমন হকচকিয়ে গেল; তারপর সুটকেশ দুটো দু'হাতে নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল, একটু গাঢ় গলায় বলল, 'কমলবাবু, আমাকে হঠাৎ বাইরে যেতে হচ্ছে। কবে ফিরব কিছু ঠিক নেই।'

'দেখলাম তার চোখ দুটো লাল হয়ে রয়েছে। বললাম, 'সে কি, কোথায় যাচ্ছেন?'

'তার মুখে হাসির মতন একটা ভাব ফুটে উঠল। সে বলল, 'অনেক দূর। আচ্ছা চলি।'

'আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়াল

তারপর ফিরে এসে বলল, 'কমলবাবু, আপনি সজ্জন, ব্যাঙ্কে চাকরি করেন; আপনাকে একটা কথা বলে যাই। সাত দিনের মধ্যে আমি যদি ফিরে না আসি, আপনি আমার পুরো বাড়িটা দখল করবেন। আপনাদের ব্যাঙ্কে আমার অ্যাকাউন্ট আছে, মাসে মাসে দেড়শো টাকা ভাড়া আমার খাতায় জমা দেবেন। —আচ্ছা।'

'অক্ষয় মণ্ডল চলে গেল। আমি স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বিস্ময়ের চটকা ভেঙে খেয়াল হল, অক্ষয় মণ্ডল তার দোরের চাবি আমাকে দিয়ে যায় নি।

'সে যা হোক, আস্ত বাড়িটা পাওয়া যেতে পারে এই আশায় মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মনে হল অক্ষয় মণ্ডল অগস্ত্য যাত্রা করেছে, আর শীগ্‌গির ফিরবে না।

'পরদিন সকালে স্ত্রীকে চিঠি লিখে দিলাম—সংসার গুটিয়ে তৈরি থাকো, বাসা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

'আশায় আশায় দুটো দিন কেটে গেল। তিন দিনের দিন গন্ধ বেরুতে আরম্ভ করল। বিকট গন্ধ, মড়া-পচা গন্ধ। গরমের দিনে মাছ মাংস পচে গিয়ে যে-রকম গন্ধ বেরোয় সেই রকম গন্ধ আসছে।

'সন্দেহ হল, পুলিসে খবর দিলাম। পুলিস এসে তালা ভেঙে ওপরে উঠল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। গিয়ে দেখি বীভৎস কাণ্ড। ঘরের মেঝের ওপর একটা মড়া হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে, তার কপালে একটা ফুটো। সে রাত্রে আমি যখন নেমতন্ন খেতে গিয়েছিলাম, সেই সময় অক্ষয় মণ্ডল লোকটাকে গুলি করেছে, তারপর দামী জিনিসপত্র টাকাকড়ি সুটকেশে পুরে নিয়ে কেটে পড়েছে।

'দেখতে দেখতে একপাল পুলিস এসে বাড়ি ঘিরে ফেলল। লাশ ময়না তদন্তের জন্যে পাঠানো হল। দারোগাবাবু আমাকে জেরা করল। তারপর খানা-তল্লাশ আরম্ভ হল। নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসেবে পাড়ার একটি ভদ্রলোক এবং আমি সঙ্গে রইলাম।

'খানাতল্লাশে কিন্তু বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। কেবল একটা দেরাজের মধ্যে কয়েকটা লোহার পাত দিয়ে তৈরি কৌটোর মতন জিনিস পাওয়া গেল; সিগারেটের প্যাকেটে রুপোলি তবকের মধ্যে যেমন সিগারেট মোড়া থাকে, অনেকটা সেই রকম লম্বাটে ধরনের তবক, খুব পাতলা লোহা দিয়ে তৈরি, কিন্তু তার অভ্যন্তর ভাগ শূন্য। দারোগাবাবু সেগুলো নিয়ে চিন্তিতভাবে নাড়াচাড়া করলেন, কিন্তু হালকা লোহার মোড়ক কোন্ কাজে লাগে বোঝা গেল না।

'যা হোক, সেদিনকার মতন তদন্ত শেষ হল, পুলিস চলে গেল। আমার মনে কিন্তু অস্বস্তি লেগে রইল। তিন-চার দিন পরে থানায় গেলাম। সেখানে গিয়ে খবর পেলাম মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা গেছে; আঙুলের ছাপ ও অন্যান্য দৈহিক চিহ্ন থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে মৃত ব্যক্তির নাম হরিহর সিং, দাগী আসামী ছিল, মাদকদ্রব্য এবং সোনারুপোর চোরা কারবার করত। অক্ষয় মণ্ডলের সঙ্গে কোন্ সূত্রে তার যাতায়াত ছিল, তা জানা যায়নি। অক্ষয় মণ্ডলের নামে হুলিয়া জারী হয়েছে; কিন্তু সে এখনো ধরা পড়েনি, কর্পূরের মত উবে গেছে।

'থানা থেকে ফেরার সময় ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম, 'পুরো বাড়িটা তাহলে আমি দখল করতে পারি?'

'দারোগাবাবু বললেন, 'স্বচ্ছন্দে। আসামী যখন ফেরার হবার আগে আপনাকে

তার বাড়ির জিম্মাজতে রেখে গেছে, তখন আপনি থাকবেন বৈকি। তবে একটা কথা, যদি আসামীর সাড়াশব্দ পান, তৎক্ষণাৎ থানায় খবর দেবেন।'

'তারপর প্রায় বছর খানেক ভাবি আরামে কেটেছে। স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে এলাম, সারা বাড়িটা দখল করে দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে বাস করছি। বাড়ির ভাড়া মাসে মাসে অক্ষয় মণ্ডলের খাতায় জমা করে দিই। তার টেবিল চেয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করি বটে কিন্তু আলমারি বাক্স কাবার্ডে হাত দিই না, পুলিস খানাতল্লাশ করার পর যেমনটি ছিল তেমনি আছে।

'হঠাৎ মাস দুই আগে এক ফ্যাসাদ উপস্থিত হল। সকালবেলা নিচের ঘরে বসে কাগজ পড়ছি, একজন অপরিচিত লোক এল, তার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক। ভদ্রশ্রেণীর মধ্যবয়স্ক পুরুষ, স্ত্রীলোকটি সধবা। পুরুষ স্ত্রীলোকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এ হচ্ছে অক্ষয় মণ্ডলের স্ত্রী, আমি ওর বড় ভাই। এতদিন আমি ওকে পুষেছি কিন্তু আর আমার পোষবার ক্ষমতা নেই। এবার ও স্বামীর বাড়িতে থাকবে। আপনাকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।'

'মাথায় বজ্রাঘাত। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। তারপর বুদ্ধি গজালো, বললাম, 'অক্ষয়বাবুর স্ত্রী আছেন, তা কোনদিন শুনি নি। যদি আপনার কথা সত্যি হয়, আপনি আদালতে গিয়ে নিজের দাবী প্রমাণ করুন, তারপর দেখা যাবে।'

'কিছুক্ষণ বকাবকি কথা-কাটাকাটির পর তারা চলে গেল। আমার সন্দেহ হল, এরা দাগাবাজ জোচ্চোর, ছলছুতো করে বাড়িটা দখল করে বসতে চায়। আজকাল বাসাবাড়ির যে রকম ভাড়া দাঁড়িয়েছে, ফোকটে বাসা পেলে কে ছাড়ে!

'থানায় গিয়ে খবরটা জানিয়ে এলাম। দারোগাবাবু বললেন, 'অক্ষয় মণ্ডলের স্ত্রী আছে কিনা আমাদের জানা নেই। যাহোক, আবার যদি আসে, ছলছুতো করে থানায় নিয়ে আসবেন। আমরাও বাড়ির ওপর নজর রাখব।'

'আমার পিস্তল আছে, তাছাড়া একটা কুকুর পুষেছি। হিংস্র পাহাড়ী কুকুর, নাম ভুটো; আমার হাতে ছাড়া কারুর হাতে খায় না। আমি ব্যাঙ্কে যাবার সময় তার শেকল খুলে দিই, রাত্তিরে তাকে ছেড়ে দিই, সে বাড়ি পাহারা দেয়। ভুটো ছাড়া থাকতে বাড়িতে চোর-ছ্যাঁচড় ঢোকার ভয় নেই, ভুটো তাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। তবু এই ঘটনার পর মনে একটা অস্বস্তি লেগে রইল। অক্ষয় মণ্ডল লোক ভাল নয়, হয়তো নিজে আড়ালে থেকে কোন কুটিল খেলা খেলছে।

'দিন দশেক পরে একখানা বেনামী চিঠি পেলাম, 'পাড়া ছেড়ে চলে যাও, নইলে বিপদে পড়বে।'—পাড়া মানেই বাড়ি। থানায় গিয়ে চিঠি দেখালাম। দারোগাবাবু বললেন, 'চেপে বসে থাকুন, নড়বেন না। আপনার বাসার ওপর পাহারা বাড়িয়ে দিচ্ছি।'

'তারপর থেকে এই দেড় মাস আর কেউ আসে নি, উড়ো চিঠিও পাঠায় নি। এখন বেশ নিরাপদ বোধ করছি। কিন্তু একটি সমস্যার উদয় হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যেই আপনার কাছে আসা। দারোগাবাবুর কাছে যেতে পারতাম, কিন্তু তিনি হয়তো এমন উপদেশ দিতেন যা আমাদের পছন্দ হত না।

'ব্যাপারটা এই ঃ ব্যাঙ্ক থেকে আমার এক মাসের ছুটি পাওনা হয়েছে। আমার স্ত্রীর অনেক দিন থেকে তীর্থে যাবার ইচ্ছে। হরিদ্বার, হৃষিকেশ এইসব। ব্যাঙ্কের

একটি সহকর্মীও আমার সঙ্গেই ছুটি নিয়ে কুণ্ডু স্পেশালে বেড়াতে বেরুচ্ছেন, আমাকেও তিনি সঙ্গে যাবার জন্যে চাপাচাপি করছেন। দল বেঁধে গেলে অনেক সুবিধে হয়। আমার স্ত্রী খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। আমার উৎসাহও কম নয়। কিন্তু—

'যেতে হলে বাড়িতে তালা বন্ধ করে যেতে হবে। ভুটোকেও মাস খানেকের জন্যে একটা কেনেলে ভর্তি করে দিতে হবে। বাড়ি অরক্ষিত থাকবে। মনে করুন, এই ফাঁকে অক্ষয় মণ্ডলের বৌ মানে, ওই স্ত্রীলোকটা যদি তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে বাড়ি দখল করে বসে, তখন আমি কি করব? অক্ষয় মণ্ডলের মৌখিক অনুমতি ছাড়া আমার তো কোন হক নেই। তবে আমি দখলে আছি, আমাকে বেদখল করতে হলে ওদের আদালতে যেতে হবে। কিন্তু ওরা যদি দখল নিয়ে বসে, তখন আমি কোথায় যাব?

'এই আমার সমস্যা। নিতান্তই ঘরোয়া সমস্যা। আপনার নিরীক্ষার উপযুক্ত নয়। তবু রথ-দেখা কলা-বেচা দুই-ই হবে, এই মতলবে আপনার কাছে এসেছি। এখন বলুন, বাড়িখানি রেখে আমাদের তীর্থযাত্রা করা উচিত হবে কিনা।'

ব্যোমকেশ খানিকক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে রইল, শেষে বলল, 'আপনাদের তীর্থযাত্রায় বাধা দিলে পাপ হবে, আবার বাড়িটা বেহাত হয়ে যাওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। আপনার জানাশোনার মধ্যে এমন মজবুত লোক কি কেউ নেই, যাকে বাড়িতে বসিয়ে তীর্থযাত্রা করতে পারেন?'

'কই, সে রকম কাউকে তো দেখছি না। সকলেরই বাসা আছে। যাদের নেই তাদের বসাতে সাহস হয় না, শেষে খাল কেটে কুমীর আনব।'

'তাহলে চলুন, আপনার বাসাটা দেখে আসি।' ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়াল।

কমলবাবু উৎফুল্ল চোখে চাইলেন, 'যাবেন! কী সৌভাগ্য! চলুন চলুন, বেশি দূর নয়—'

'একটু বসুন। বেশি দূর না হলেও রোদ বেশ কড়া। একটা ছাতা নিয়ে আসি।'

ব্যোমকেশ ভিতরে গিয়ে ছাতা নিয়ে এল। ছাতাটি ব্যোমকেশের প্রিয় ছাতা, অতিশয় জীর্ণ, লোহার বাঁট এবং কামানিতে মরচে ধরেছে, কাপড় বিবর্ণ এবং বহু ছিদ্রযুক্ত। এই ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তায় বেরুলে নিজে অদৃশ্য থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তির অনুসরণ করা যায়: ফুটো দিয়ে বাইরের লোককে দেখা যায়, কিন্তু বাইরের লোক ছাতাধারীর মুখ দেখতে পায় না। সত্যান্বেষীর উপযুক্ত ছাতা।

'চলুন।'

কমলবাবুর বাসা ব্যোমকেশের বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। মাঝে মাঝে এ পথ দিয়ে যাবার সময় বাড়িটি ব্যোমকেশের চোখে পড়েছে, ছোট দোতলা বাড়ি; কিন্তু একটি বিশেষত্বের জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে: সমস্ত ছাদ লোহার ডাণ্ডা-ছত্রী দিয়ে ঢাকা, যেন প্রকাণ্ড একটা লোহার খাঁচা। বাইরে থেকে কোন মতেই ছাদে ওঠা সম্ভব নয়।

'আসুন।'

ছাতা মুড়ে ব্যোমকেশ বাড়িতে ঢুকল। কমলবাবু প্রথমে তাকে নিচের তলার

বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি শতরঞ্জি-ঢাকা তক্তপোশ ও দু'টি ক্যাম্বিসের চেয়ার ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে চোখ ফেরালো। সে যেন একটা সূত্র খুঁজছে, কিন্তু এই নগ্নপ্রায় ঘরে কোন অঙ্গুলি-নির্দেশ পাওয়া গেল না। সে বলল, 'নিচের তলায় আর একটা ঘর আছে, না?'

'আছে। ঘরটা অক্ষয় মণ্ডলের আমলে ব্যবহার হত না, আমি ওটাকে রান্নাঘর করেছি। দেখবেন?'

'দরকার নেই। আপনার স্ত্রী বোধ হয় এখন রান্নাবান্না করছেন। চলুন, ওপর তলাটা দেখা যাক।'

'চলুন।'

ঘরের লাগাও একটা সরু বারান্দার শেষে ওপরে ওঠার সিঁড়ি, সিঁড়ির মাথায় দরজা। দরজার মাথার ওপরকার দেয়ালে ঘোড়ার ক্ষুরের নালের মতন লোহার একটা জিনিস তিনটে পেরেকের মাঝখানে আটকানো রয়েছে। ব্যোমকেশ সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাত তুলে সেই দিকে নির্দেশ করে বলল 'ওটা কি?'

'ওটা ঘোড়ার নাল। বিলিতি কুসংস্কার অনুযায়ী দোরের মাথায় ঘোড়ার নাল টাঙিয়ে রাখলে নাকি অনেক টাকা হয়।'

ব্যোমকেশের হাতের ডগা ঘোড়ার নালে আটকে গিয়েছিল, সে টেনে সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'এটা কি আপনি লাগিয়েছেন নাকি?'

'না, অক্ষয় মণ্ডলের আমল থেকে আছে।'

ব্যোমকেশ ঘোড়ার নালের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। কমলবাবু ডাকলেন, 'ভেতরে আসুন।'

ঘরের ভিতর কমলবাবুর দশ বছরের মেয়ে মেঝেয় মাদুর পেতে বসে লেখা পড়া করছিল, তার কাছে মাদুরের বাইরে একটা ভীষণদর্শন কুকুর থাবা পেতে বসেছিল, ব্যোমকেশের পানে মণিহীন নীলাভ চোখ তুলে চাইল। কমলবাবু বললেন, 'খুকু, যাও তোমার মাকে চা তৈরি করতে বল, আর কিছু ভাজাভুজি।'

ব্যোমকেশ একটু আপত্তি করল, কিন্তু কমলবাবু শুনলেন না। খুকু নিচে চলে গেল, ভুটো সঙ্গে সঙ্গে গেল।

অতঃপর ব্যোমকেশ ঘরটি চক্ষু দিয়ে সমীক্ষা করল। বলল, 'এ ঘরে অক্ষয় মণ্ডলের কোন আসবাবপত্র আছে?'

কমলবাবু বললেন, 'ছিল, আমি পাশের ঘরে নিয়ে গেছি। খাট এবং একটা দেরাজওয়ালা টেবিল। এই যে।'

পাশের ঘরটি অপেক্ষাকৃত বড়; জানলার দিকে খাট, অন্য কোণে টেবিল। ব্যোমকেশ টেবিলের কাছে গিয়ে বলল, 'সেই যে পুলিসের খানাতল্লাশে লোহার মোড়ক পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো কি পুলিস নিয়ে গিয়েছে?'

'একটা মোড়ক পুলিস নিয়ে গিয়েছিল, বাকিগুলো দেরাজে আছে।' কমলবাবু নিচের দিকের একটা দেরাজ খুলে বললেন, 'এই যে!

দেরাজের পিছন দিকে কয়েকটা মোড়ক পড়ে ছিল, ব্যোমকেশ একটা বের করে নেড়েচেড়ে দেখল। আকৃতি-প্রকৃতি সিগারেট প্যাকেটের অভ্যন্তরস্থ তবকের মতই বটে। সেটা রেখে দিয়ে সে হাসিমুখে বলল, 'ভারি মজার জিনিস তো! এর ভেতর গোটা দুই বিস্কুট রেখে সুতো দিয়ে বেঁধে দিলে নিশ্চিন্দি। চলুন, এবার ছাদটা

'দেখে আসা যাক।'

'ছাদে কিন্তু কিছু নেই!'

'তা হোক। শূন্যতাই হয়তো অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।'

'তাহলে আসুন।'

ছাদে সত্যিই কিছু নেই। লোহার ঘেরাটোপ ঢাকা ছাদটা বাঘের শূন্য খাঁচার মতন দাঁড়িয়ে আছে। এক কোণে উঁচু পাদপীঠের ওপর লাল রঙের লোহার চৌবাচ্চা; এই চৌবাচ্চা থেকে বাড়িতে কলের জল সরবরাহ হয়। ব্যোমকেশ ছাদের চারদিক সন্দিগ্ধভাবে পরিক্রমণ করে বলল, 'ছাদটা আপনারা ব্যবহার করেন না?'

কমলবাবু বললেন, 'বেশি গরম পড়লে ছাদে এসে শুই। বেশ নিরাপদ জায়গা, চোর ঢুকবে সে উপায় নেই।'

'হুঁ। চলুন, আমার দেখা শেষ হয়েছে।'

নিচে নেমে এলে পর খুকু এসে বলল, 'বাবা, বসবার ঘরে চা দিয়েছি।'

নিচের তলার ঘরে পাঁপর ভাজা ও গরম বেগুনী সহযোগে চা পান করতে করতে ব্যোমকেশ বলল, 'থানার যে দারোগাবাবুর কাছে আপনার যাওয়া-আসা, তাঁর নাম কি?'

কমলবাবু বললেন, 'তাঁর নাম রাখাল সরকার।'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসল। চা শেষ করে সে ছাতা নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি।'

কমলবাবু বললেন, 'কিন্তু আমাদের তীর্থযাত্রার কি হবে, যাওয়া উচিত হবে কি না, কিছু বললেন না তো?'

'নিশ্চয় তীর্থযাত্রা করবেন। কবে থেকে আপনার ছুটি?'

'সামনের শনিবার থেকে।'

'তাহলে আর দেরি করবেন না, টিকিট কিনে ফেলুন। কোন ভয় নেই, আপনার বাসা বেদখল হবে না, আমি জামিন রইলাম।—আচ্ছা, চলি।'

'অ্যাঁ—তাই নাকি! ধন্যবাদ ব্যোমকেশবাবু। চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ব্যোমকেশ বলল, 'তার দরকার নেই, আমি এখন থানায় যাব। রাখালের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে হবে।'

শনিবার সকালবেলা কমলবাবুর বাসা থেকে পুলিসের পাহারা তুলে নেওয়া হল। কমলবাবু ভুটোকে একটা কেনেলে রেখে এলেন। পুলিস ছাড়াও অন্য একটি পক্ষ বাসার ওপর নজর রেখেছিল, তারা সব লক্ষ্য করল।

বিকেলবেলা কমলবাবু তাঁর স্ত্রী মেয়ে এবং পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বাসায় চাবি দিয়ে চলে গেলেন, যাবার পথে থানায় রাখালবাবুকে চাবি দিয়ে বলে গেলেন, 'খিড়কির দোর ভেজিয়ে রেখে এসেছি। এখন আমার বরাত আর আপনাদের হাত-যশ।'

সারাদিন বাড়িটা শূন্য পড়ে রইল।

রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু কমলবাবুর

বাসার দিকে গেলেন। দু'জনের পকেটেই পিস্তল এবং বৈদ্যুতিক টর্চ।

সরজমিন আগে থাকতেই দেখা ছিল, পাশের বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে দু'জনে কমলবাবুর খিড়কি দিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন, খিড়কির দরজা বন্ধ করে দিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেন। কান পেতে শুনলেন, বাড়ি নিস্তব্ধ।

রাখালবাবু পলকের জন্যে দোরের মাথায় টর্চের আলো ফেলে দেখলেন, ঘোড়ার ক্ষুর যথাস্থানে আছে। তিনি তখন ফিসফিস করে বললেন, 'চলুন, ছাদে গিয়ে অপেক্ষা করলেই বোধহয় ভাল হবে।'

ব্যোমকেশ তাঁর কানে কানে বলল, 'না। আমি ছাদে যাচ্ছি, তুমি এই ঘরে লুকিয়ে থাকো। দু'জনেই ছাদে গেলে ছাদের দোর এদিক থেকে বন্ধ করা যাবে না, আসামীর সন্দেহ হবে।'

'বেশ, আপনি ছাদে গিয়ে লুকিয়ে থাকুন, আমি দোর বন্ধ করে দিচ্ছি।'

ব্যোমকেশ ছাদে উঠে গেল, রাখালবাবু দরজায় হুড়কো লাগিয়ে নেমে এলেন। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ঠিক নেই, এমন কি আসামী আজ নাও আসতে পারে। তিনি দোতলার ঘরের ভিতর ঢুকে দোরের পাশে লুকিয়ে রইলেন।

ছাদের ওপর ব্যোমকেশ এদিক ওদিক ঘুরে জলের চৌবাচ্চা থেকে দূরের একটা কোণে আলসের পাশে গিয়ে বসল। আকাশে চাঁদ নেই, কেবল তারাগুলো ঝিকমিক করছে। ব্যোমকেশ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষা। বনের মধ্যে ছাগল বা বাছুর বেঁধে মাচার ওপর বসে বাঘের প্রতীক্ষা করার মত। রাত্রি দুটো বাজতে যখন আর দেরি নেই, তখন রাখালবাবুর মন বন্ধ ঘরের মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, আজ আর শিকার আসবে না। ঠিক এই সময় তিনি দোরের বাইরে মৃদু শব্দ শুনতে পেলেন; মুহূর্তে তাঁর স্নায়ুপেশী শক্ত হয়ে উঠল। তিনি নিঃশব্দে পকেট থেকে পিস্তল বার করলেন।

যে মানুষটি নিঃসাড়ে বাড়িতে প্রবেশ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসেছিল, তার বাঁ-হাতে ছিল একটি ক্যাম্বিসের থলি, আর ডান হাতে ছিল লোহা-বাঁধানো একটি ছড়ি। ছড়ির গায়ে তিন হাত লম্বা মুগার সুতো জড়ানো, মাছ-ধরা ছিপের গায়ে যেমন সুতো জড়ানো থাকে সেই রকম।

লোকটি দোরের মাথার দিকে লাঠি বাড়িয়ে ঘোড়ার ক্ষুরটি নামিয়ে আনল, তারপর মুগার সুতোর ডগায় সেটি বেঁধে নিয়ে তেতলার সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেল। দু'টি মানুষ যে বাড়ির দু' জায়গায় ওৎ পেতে আছে, তা সে জানতে পারল না।

ছাদের দরজায় একটু শব্দ শুনে ব্যোমকেশ সতর্ক হয়ে বসল। নক্ষত্রের আলোয় একটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল, সোজা ট্যাঙ্কের কাছে গিয়ে আলসের ওপর উঠে ট্যাঙ্কের মাথায় চড়ল। ধাতব শব্দ শোনা গেল। সে ট্যাঙ্কের ঢাকনি খুলে সরিয়ে রাখল, তারপর লাঠির আগায় সুতো-বাঁধা ঘোড়ার নাল জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল।

লোকটা যেন আবছা অন্ধকারে বসে ছিপ ফেলে চুনো মাছ ধরছে। ছিপ ডোবাচ্ছে আর তুলছে। মাছগুলি ব্যাগের মধ্যে পুরে আবার ছিপ ফেলছে।

কুড়ি মিনিট পরে লোকটি মাছ ধরা শেষ করে ট্যাঙ্ক থেকে নামল। এক হাতে ব্যাগ অন্য হাতে ছিপ নিয়ে যেই পা বাড়িয়েছে, অমনি তার মুখের ওপর দপ করে টর্চ জ্বলে উঠল, ব্যোমকেশের ব্যঙ্গ-স্বর শোনা গেল, 'অক্ষয় মণ্ডল, কেমন মাছ

ধরলে?'

অক্ষয় মণ্ডলের পরনে খাকি প্যাণ্ট ও হাফ-সার্ট, কালো মুষ্কো চেহারা। সে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আস্তে আস্তে থলিটি নামিয়ে রেখে ক্ষিপ্রবেগে পকেটে হাত দিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমকেশের টর্চ গদার মতন তার চোয়ালে লাগল, অক্ষয় মণ্ডল ছাদের ওপর চিতিয়ে পড়ল।

রাখালবাবু নিচে থেকে উঠে এসেছিলেন, তিনি অক্ষয় মণ্ডলের বুকের ওপর বসে বললেন, 'ব্যোমকেশদা, ওর পকেটে পিস্তল আছে, বের করে নিন।'

ব্যোমকেশ অক্ষয় মণ্ডলের পকেট থেকে পিস্তল বার করে নিজের পকেটে রাখল। রাখালবাবু আসামীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে বললেন, 'অক্ষয় মণ্ডল, হরিহর সিংকে খুন করার অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।'

ব্যোমকেশ অক্ষয় মণ্ডলের থলি থেকে কয়েকটা ভিজে লোহার প্যাকেট বার করে তার ওপর টর্চের আলো ফেলল। 'বাঃ! এই যে, যা ভেবেছিলাম তাই। লোহার মোড়কের মধ্যে চকচকে বিদেশী সোনার বিস্কুট।'

পরদিন সকালবেলা সত্যবতী ব্যোমকেশকে বলল, 'ভাল চাও তো বল কোথায় রাত কাটালে।'

ব্যোমকেশ কাতর স্বরে বলল, 'দোহাই ধর্মাবতার, রাখাল সাক্ষী আমি কোনো কুকার্য করি নি।'

'শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। গল্পটা বলবে?'

'বলব, বলব। কিন্তু আগে আর এক পেয়ালা চা দিতে হবে। এক পেয়ালা চা খেয়ে রাত জাগার গ্লানি কাটে নি।'

সত্যবতী আর এক পেয়ালা কড়া চা এনে ব্যোমকেশের সামনের চেয়ারে বসল, 'এবার বল, টর্চটা ভাঙলে কি করে? মারামারি করেছিলে?'

ব্যোমকেশ বলল, 'মারামারি নয়, শুধু মারা।' চায়ে একটি চুমুক দিয়ে সে বলতে আরম্ভ করল :

'অক্ষয় মণ্ডল সোনার চোরা কারবার করে অনেক টাকা করেছিল। নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ভদ্র পাড়ায় একটি বাড়ি করেছিল, বাড়ির ছাদ লোহার ডাণ্ডা-ছত্রী দিয়ে এমনভাবে মুড়ে রেখেছিল যে ওদিক দিয়ে বাড়িতে চোর ঢোকার উপায় ছিল না। ছাদটাকে নিরাপদ করা তার বিশেষ দরকার ছিল।

'অক্ষয় মণ্ডলের পেশা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যেসব চোরাই সোনা আসে তাই সংগ্রহ করা এবং সুযোগ মত বাজারে ছাড়া। সে বাড়িতেই সোনা রাখত, কিন্তু লোহার সিন্দুকে নয়। সোনা লুকিয়ে রাখার এক বিচিত্র কৌশল সে বার করেছিল।

'অক্ষয় মণ্ডল বাড়িতে একলা থাকত, তার স্ত্রী আছে কিনা তা এখনো জানা যায় নি। সে পাড়ার লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করত না, কিন্তু পাছে পড়শীরা কিছু সন্দেহ করে, তাই কমল দাস নামে একটি ভদ্রলোককে নিচের তলায় একটি ঘর ভাড়া দিয়েছিল। বাজারে সোনা ছাড়বার জন্যে সে কয়েকজন লোক রেখেছিল, তাদের মধ্যে একজনের নাম হরিহর সিং।

'হরিহর সিং বোধ হয় অক্ষয় মণ্ডলকে ফাঁকি দিচ্ছিল। একদিন দু'জনের

ঝগড়া হল, রাগের মাথায় অক্ষয় মণ্ডল হরিহর সিংকে খুন করল। তারপর মাথা ঠাণ্ডা হলে তার ভাবনা হল, মড়াটা নিয়ে সে কি করবে। একলা মানুষ, ভদ্র পাড়া থেকে মড়া পাচার করা সহজ নয়। সে স্থির করল, মড়া থাক, বাড়িতে যা সোনা আছে, তাই নিয়ে সে নিজে ডুব মারবে।

'কিন্তু সব সোনা সে নিয়ে যেতে পারল না। সোনা ধাতুটা বিলক্ষণ ভারি লোহার চেয়েও ভারি। তোমরা স্ত্রী জাতি সারা গায়ে সোনার গয়না বয়ে বেড়াও, কিন্তু সোনার ভার কত বুঝতে পারো না। দশ হাত কাপড়ে কাছা নেই।

সত্যবতী বলল 'আচ্ছা, আচ্ছা তারপর বল'।

অক্ষয় মণ্ডল ডুব মারবার কয়েক দিন পরে লাশ বেরুল, পুলিস এল, কিন্তু খুনের কিনারা হল না। অক্ষয় মণ্ডল খুন করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে নিরুদ্দেশ। কমলবাবু সারা বাড়িটা দখল করে বসলেন।

'অক্ষয় মণ্ডল নিশ্চয় কলকাতাতেই কোথাও লুকিয়ে ছিল, কয়েক মাস চুপ-চাপ রইল। কিন্তু বাড়িতে যে সোনা লুকোন আছে যেগুলো সে সরাতে পারেনি সেগুলো উদ্ধার করতে হবে। কাজটি সহজ নয়। কমলবাবুর স্ত্রী এবং মেয়ে সর্বদা বাড়িতে থাকে, তাছাড়া একটা ভয়ংকর হিংস্র কুকুর আছে। অক্ষয় মণ্ডল ভেবে চিন্তে এক ফন্দি বার করল।

একটা স্ত্রীলোককে বউ সাজিয়ে এবং একটা পেটোয়া লোককে তার ভাই সাজিয়ে অক্ষয় মণ্ডল কমলবাবুর কাছে পাঠাল। বউকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। অক্ষয় মণ্ডল যেরারী খুনী হতে পারে কিন্তু তার বউ তো কোনো অপরাধ করেনি কমলবাবু কিন্তু শুনলেন না, তাদের হাঁকিয়ে দিলেন। অক্ষয় মণ্ডল তখন বেনামী চিঠি লিখে ভয় দেখাল কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না, কমলবাবু নড়লেন না।

অক্ষয় মণ্ডল তখন অন্য রাস্তা ধরল।

আমার বিশ্বাস ব্যাংকের যে সহকর্মীটি কমলবাবুকে তীর্থে যাবার জন্যে তাগাচ্ছিলেন তার সঙ্গে অক্ষয় মণ্ডলের যোগাযোগ আছে। দু চার দিনের জন্যেও যদি কমলবাবুকে সপরিবারে বাড়ি থেকে তফাৎ করা যায় তাহলেই অক্ষয় মণ্ডলের কার্যসিদ্ধি। কাজটা সে বেশ গুছিয়ে এনেছিল কিন্তু একটা কারণে কমলবাবুর মনে খটকা লাগল বাড়ি যদি বেদখল হয়ে যায়! তিনি আমার কাছে পরামর্শ নিতে এলেন।

তার গল্প শুনে আমার সন্দেহ হল বাড়িটার ওপর আমি বাড়ি দেখতে গেলাম। দেখাই যাক না। অকুস্থলে গেলে অনেক ইশারা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'গেলাম বাড়িতে। কড়া রোদ ছিল তাই ছাতা নিয়ে গিয়েছিলাম। দোতলায় উঠে দেখলাম দোরের মাথায় ঘোড়ার নাল তিনটে পেরেকের মাঝখানে আলগা ভাবে আটকানো রয়েছে। ঘোড়ার নালটা এক নজর দেখলে ঘোড়ার নাল বলেই মনে হয় বটে কিন্তু ঠিক যেন ঘোড়ার নাল নয়। আমি ছাতাটা সেইদিকে বাড়িয়ে দিলাম অমনি ছাতাটা আপনা থেকেই গিয়ে ঘোড়ার নালে জুড়ে গেল।

'বুঝলাম, ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম, ঘোড়ার নাল নয় একটি বেশ শক্তিমান চুম্বক ছাতার লোহার বাঁট পেয়ে টেনে নিয়েছে। প্রশ্ন করে জানলাম চুম্বকটা অক্ষয় মণ্ডলের। মাথার মধ্যে চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল কেন? অক্ষয় মণ্ডল চুম্বক নিয়ে কি করে? দোরের মাথায় টাঙিয়েই বা রেখেছে কেন যাতে মনে হয় ওটা ঘোড়ার নাল? মনে পড়ে গেল, পুলিসের খানাতল্লাশে দেরাজের মধ্যে কয়েকটা

লোহার মোড়ক পাওয়া গিয়েছিল। রহস্যটা ক্রমশ পরিষ্কার হতে লাগল।

'তারপর যখন ঘেরাটোপ লাগানো ছাদে গিয়ে জলের ট্যাঙ্ক দেখলাম, তখন আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। চুম্বক যত জোরালোই হোক, সোনাকে টানবার ক্ষমতা তার নেই। তাই সে সোনার বিস্কুট লোহার প্যাকেটে মুড়ে ট্যাঙ্কের জলে ফেলে দেয়। তারপর যেমন যেমন দরকার হয়, ট্যাঙ্কে চুম্বকের ছিপ ফেলে জল থেকে তুলে আনে। হরিহর সিংকে খুন করে পালাবার সময় সে সমস্ত সোনা নিয়ে যেতে পারে নি। এখন বাকি সোনা উদ্ধার করতে চায়। পালাবার সময় সে ভাবে নি যে ব্যাপারটা পরে এত জটিল হয়ে উঠবে।'

'যা হোক, সোনার সন্ধান পেলাম; সমুদ্রের তলায় শুক্তির মধ্যে যেমন মুক্তো থাকে, ট্যাঙ্কের তলায় তেমনি লোহার পাতে মোড়া সোনা আছে। কিন্তু কেবল সোনা উদ্ধার করলেই তো চলবে না, খুনী আসামীকে ধরতে হবে। আমি কমলবাবুকে বললাম আপনি সপরিবারে তীর্থযাত্রা করুন। তারপর রাখালের সঙ্গে পরামর্শ করে ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা করলাম।

'কাল সকালে কমলবাবুরা তীর্থযাত্রা করলেন। বাড়িব ওপর অক্ষয় মণ্ডল নজর রেখেছিল, সে জানতে পারল, রাস্তা সাফ।

'কাল সন্ধ্যের পর রাখাল আর আমি বাড়িতে গিয়ে আড্ডা গাড়লাম। কালই যে অক্ষয় মণ্ডল আসবে এতটা আশা করি নি, তবু পাহাবা দিতে হবে। বলা তো যায় না। রাত্রি দুটোর সময় শিকার ফাঁদে পা দিল। তাবপর আর কি! টর্চের একটি ঘায়ে ধরাশায়ী।'

সত্যবতী ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কত সোনা পাওয়া গেল?'

সিগারেট ধরিয়ে ব্যোমকেশ বলল, 'সাতান্নটি লোহার মোড়ক, প্রত্যেকটি মোড়কের মধ্যে দুটি করে সোনাব বিস্কুট, প্রত্যেকটি বিস্কুটের ওজন পঞ্চাশ গ্রাম। কত দাম হয় হিসেব করে দেখ।'

সত্যবতী কেবল একটি নিশ্বাস ফেলল।

বিশু পাল বধ

১

কালীচরণ দাসকে পাড়ার লোকে আড়ালে শালীচরণ দাস বলে উল্লেখ করত। শুধু হাস্যরস সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য গভীরতর। নামের আদ্যক্ষর বদল করে কোনো রসিক ব্যক্তি কালীচরণ দাসের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছিলেন। আমরা এই কাহিনীতে তাকে শালীচরণ দাস বলেই উল্লেখ করব।

চৌদ্দ বছর আগে শালীচরণ কলকাতার দক্ষিণাংশে বাস করত এবং সামান্য কাজকর্ম করত। বাড়িটি ছোট হলেও দোতলা, শালীচরণ ওপর তলাটা একজনকে ভাড়া দিয়েছিল, নীচের তলায় নিজে সস্ত্রীক থাকত। তার স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা। সংসারে আর কেউ ছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন বৌ মরে গেল।

কিন্তু সংসার করতে হলে ঘরে একটি স্ত্রীলোক দরকার। শালীচরণের বয়স তখন ত্রিশ বছর, কিন্তু সে আর বিয়ে করল না; ভেবেচিন্তে একটি বিধবা এবং অনাথা শালীকে এনে ঘরে বসাল। দূর সম্পর্কের শালী, নাম মালতী, বয়স কম, মাঝারি রকমের সুন্দরী, স্বভাব একটু চপল-চটুল; কিন্তু সংসারের কাজকর্মে নিপুণা।

মাসখানেক যেতে না যেতেই পাড়ায় কানাঘুষো আরম্ভ হয়ে গেল। শালীচরণের বৌ যতদিন বেঁচে ছিল নিজে গড়িয়াহাটে গিয়ে বাজার করত, পাড়া-পড়শির বাড়িতে যাতায়াত করত, কিন্তু শালী করে না কেন? শালীচরণ শালীকে ঘরের বাইরে যেতে দেয় না, নিজে বাজার করে কেন? বৌএর চেয়ে শালীর আদর কখন বেশি হয়?

তারওপর শালীচরণের বাড়ির দোতলায় যে ভাড়াটে ছিল তাদের বাড়ির মেয়েরা একটা নতুন খবর বিতরণ করল। নীচের তলায় তাদের যাতায়াত ছিল। তারা বলল, শালী যখন প্রথম আসে তখন দুটো ঘরে দুটো আলাদা খাট বিছানা ছিল, এখন কেবল একটা ঘরে একটা বিছানা। ব্যাস্, আর যায় কোথায়! কালীচরণ দাস শালীচরণ দাসে পরিণত হল।

কিন্তু অপবাদ যে ভিত্তিহীন নয় তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হল মাস ছয়েক পরে। শালীচরণের বাড়ির পাশের বাড়িতে একটা মেস ছিল, সেখানে বিশ্বনাথ পাল নামে এক যুবক থাকত। তার চেহারা যেমন বলবান তেমনি লাবণ্যময়, শালীচরণের মত বৈশিষ্ট্যহীন নয়। বিশ্বনাথ পাল ভাল অভিনয় করত, যাত্রা এবং সখের থিয়েটার দলে যোগ দিয়েছিল। তার সঙ্গে শালীচরণের শালীর নাম সংযুক্ত হয়ে নতুন করে কানাঘুষো আরম্ভ হল। দুপুরবেলা পুরুষেরা যখন কাজে বেরিয়ে যায় এবং মেয়েরা খাওয়াদাওয়ার পর দিবানিদ্রায় নিমগ্ন হয় তখন নাকি বিশ্বনাথ পাল খিড়কির দোর দিয়ে শালীচরণের বাড়িতে যায়। এইভাবে কিছুদিন দিবাভিসার চলল। শালীচরণের বোধহয় সন্দেহ হয়েছিল, কিম্বা পাড়ার চ্যাংড়া ছোঁড়ারা হয়তো ব্যঙ্গবিদ্রূপ পূর্ণ ইশারা করেছিল। সে একদিন দুপুরবেলা আচমকা খিড়কি দিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

অতঃপর যে দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হল–তা উহ্য রাখাই ভাল। মোটকথা আদিরস ও রুদ্ররস মিলে নাইট্রোগ্লিসারিনের মত বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে পরিণত হল। শালীচরণ মেঘগর্জনের মত শব্দ করে অপরাধীদের আক্রমণ করল। কিন্তু বিশ্বনাথ পালের শরীরে অনেক বেশি শক্তি থাকা সত্ত্বেও তার মনে পাপ ছিল, সে পদাহত পথ-কুক্কুরের মত পালিয়ে গেল। বাকি রইল শুধু মালতী। শালীচরণ তখন বিকট চীৎকার করে মালতীর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তার গলা টিপে ধরল।

হুড়োহুড়ি চেঁচামেচিতে দোতলা থেকে লোক ছুটে এল, অল্পবয়স্ক বালক বালিকা ও স্ত্রীলোক। দৃশ্য দেখে তারা চীৎকার করে রাস্তার লোক ডাকল। রাস্তা থেকে দু'চার জন লোক এসে অতি কষ্টে শালীচরণের হাত থেকে মালতীর গলা ছাড়ালো। কিন্তু মালতী তখন দম বন্ধ হয়ে মরে গেছে।...

আদালতে শালীচরণের বিচার হল। সে অপরাধ অস্বীকার করল না। শালীর সঙ্গে অবৈধ সহবাসের অভিযোগও মেনে নিল। হাকিম বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, মানুষের হৃদয়ের খবর রাখতেন। শালীচরণের ফাঁসি হল না, গুরুতর আকস্মিক প্ররোচনা বিধায় চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ড হল।

শান্তভাবে শালীচরণ জেলে গেল। জেলে যাবার আগে ব্যবস্থা করে গেল ঃ তার বাড়ির দোতলার ভাড়া সলিসিটার আদায় করে ব্যাঙ্কে রাখবেন, একতলা বন্ধ থাকবে। শালীচরণের বিষয়সম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর আর কিছু ছিল না।

বিশ্বনাথ পাল সেই যে পালিয়েছিল, কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে রইল। শালীচরণ জেলে চলে যাবার পর সে আবার আত্মপ্রকাশ করল। তার চেহারা ভাল, উপরন্তু যথেষ্ট অভিনয় নৈপুণ্য থাকায় সে অল্পকালের মধ্যেই চলচ্চিত্র ও রঙ্গ-মঞ্চের নামজাদা অভিনেতা হয়ে দাঁড়াল। চিত্রপটের চেয়ে রঙ্গালয়ের দিকেই তার ঝোঁক্ বেশি; সে দল গঠন করে একটি রঙ্গমঞ্চের অধিকারী হয়ে বসল।

ওদিকে শালীচরণ জেল খাটছিল, যথাকালে মেয়াদ পূর্ণ হলে মুক্তি পেয়ে বেরুল। জেলখানায় সুবোধ বালক হয়ে থাকলে কিছু রেয়াৎ পাওয়া যায়। শালীচরণ চৌদ্দ বছর পূর্ণ হবার আগেই বেরুল। এই ক'য় বছরে তার বয়স যেমন বেড়েছে তেমনি চেহারারও পরিবর্তন ঘটেছে; আগে সে ছিল রোগা পট্‌কা, এখন বেশ চাকন চিকন হয়েছে। সবচেয়ে পরিবর্তন হয়েছে তার মনে। মুক্তি পেয়েই সে সটান নবদ্বীপে চলে গেল, সেখানে মাথা মুড়িয়ে কণ্ঠি ধারণ করে মালা জপ করতে করতে বাড়ি এল।

ইতিমধ্যে পাড়ার পুরনো বাসিন্দারা অনেকে পাড়া ছেড়ে চলে গেছে, দোতলার ভাড়াটেও বদল হয়েছে, তাই শালীচরণ জেল থেকে ফেরার পর বিশেষ হৈ চৈ হল না। সেও কারুর সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করল না। একলা থাকে, স্বপাক নিরামিষ খায় আর মালা জপ করে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যের পর বেড়াতে বেরোয়। তার অর্থ উপার্জনের দরকার নেই। বারো বছর ধরে যে বাড়ি ভাড়া জমেছে তাই তার পক্ষে যথেষ্ট। উপরন্তু মাসে মাসে দোতলা থেকে ভাড়া আসে।

একটা শনিবার বিকেলে ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সত্যবতী দাদার কাছে গিয়েছে, অজিত নিরুদ্দেশ, আমার হাতে কাজ নেই, তাই নিরুপায় হয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।'

প্রতুলবাবু বললেন, 'শ্রীমতী সত্যবতীর দাদার কাছে যাওয়া বুঝলাম, মেয়েদের মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি যাওয়ার বাসনা দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু অজিতবাবু নিরুদ্দেশ হলেন কেন?'

ব্যোমকেশ একটু বিমনাভাবে বলল, 'কি জানি। কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি, ভোর হতে না হতে অজিত বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে রাত ন'টার পর। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না, মিটিমিটি হাসে।'

'প্রেমে পড়েন নি তো?'

'অজিতের হৃদয়ে প্রেম নেই, আছে কেবল অর্থলিপ্সা। তাছাড়া প্রেমে পড়ার বয়স পেরিয়ে গেছে।'

'তা বটে। চলুন তাহলে থিয়েটার দেখে আসি।'

'থিয়েটার?'

'হ্যাঁ। কয়েক মাস থেকে একটা নতুন নাটক চলছে। বিশু পালের দল করছে। খুব ভাল রিপোর্ট পাচ্ছি। চলুন না দেখে আসা যাক।'

'মন্দ কথা নয়। বোধহয় ত্রিশ বছর থিয়েটার দেখিনি। নাটকের নাম কি?'

'কীচক বধ।'

'অ্যাঁ—পৌরাণিক নাটক!'

'না না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। নামটা কীচক বধ বটে কিন্তু পরিস্থিতি আধুনিক; একজন নবীন নাট্যকার লিখেছেন। বর্তমান যুগেও যে কীচকের অভাব নেই, বরং এ যুগের কীচকেরা সে-যুগের কীচকের কান কেটে নিতে পারে, এই হচ্ছে প্রতিভাবান নাট্যকারের প্রতিপাদ্য। স্বয়ং বিশু পাল কীচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।'

'বিশু পাল কে?'

'নটকেশরী বিশু পালের নাম জানেন না। দুর্ধর্ষ অ্যাক্টর। চলুন চলুন, দেখে আসবেন।'

'নিতান্তই যদি আপনার রোখ চেপে থাকে—চলুন। নেই কাজ তো খই ভাজ।'

'আচ্ছা, আমি তাহলে টেলিফোনে দুটো সীট রিজার্ভ করে আসি।' প্রতুলবাবু পাশের ঘরে গেলেন।

ব্যোমকেশ কেয়াতলার বাড়িতে আসার পর প্রতুলবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। দু'জনেই বুদ্ধিজীবী; উপরন্তু প্রতুলবাবু হৃদয়বান পুরুষ, সত্যবতীকে একটি মোটর কিনিয়ে দেবার জন্যে ব্যোমকেশের পিছনে লেগেছিলেন। সত্যবতীর বয়স বাড়ছে, এখন তার পক্ষে পায়ে হেঁটে বাজার করা কিম্বা সিনেমা দেখতে যাওয়া কষ্টকর; এই সব যুক্তি দেখিয়ে তিনি ব্যোমকেশের মন গলাবার চেষ্টা করছিলেন। ফলে তিনি সত্যবতীর হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন কিন্তু ব্যোমকেশকে বিগলিত করতে পারেন নি। ব্যোমকেশের আপত্তি, মোটর কেনার টাকা না হয় কষ্টে সৃষ্টে যোগাড় করা যায়, ছয় সাত হাজার টাকায় একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ি পাওয়া

যেতে পারে। কিন্তু তারপর? গাড়ি চালাবে কে? একটা ড্রাইভার রাখতে গেলে মাসে দেড়শো দু'শো টাকা খরচ। ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে বেশি বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মাথায় চুল নেই লম্বা দাড়ি অত্যন্ত অশোভন।

'সীট পাওয়া গেছে। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।' প্রতুলবাবু নিজের মোটরে ব্যোমকেশকে নিয়ে যাত্রা করলেন। অনেক দূর যেতে হবে, শহরের অন্য প্রান্তে। প্রতুলবাবু প্রচণ্ড পণ্ডিত হলে কি হয়, সেই সঙ্গে প্রগাঢ় থিয়েটার প্রেমিক।

এ'রা যখন রঙ্গালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন সেই সময় কলেজ স্কোয়ারের এক কোণে গাছের তলায় একটি ভদ্রশ্রেণীর লোক দাঁড়িয়ে কারুর প্রতীক্ষা করছিল। তার হাতে একটি ছোট ব্যাগ, ব্যাগের মধ্যে এক সেট জামা কাপড়। লোকটি অধীরভাবে ঘন ঘন কব্জির ঘড়ি দেখছিল। যদিও এ পাড়ায় তার চেনা লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা কম, তবু লোকটি রুমাল দিয়ে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। এই সময় এখানে ছাত্রদের ভীড় হয়, ছাত্ররা জলভ্রমির মত পুকুরের চারিপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, তন্ময় হয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। তবু বলা যায় না, পরিচিত কোনো ছাত্র তাকে দেখে চিনে ফেলতে পারে।

গলা খাঁকারির শব্দে চমকে উঠে লোকটি ঘাড় ফেরাল, দেখল অলক্ষিতে কখন একটা লোক তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে অজস্র দাড়ি গোঁফ, হাতে একটা মোটা লাঠি। লোকটি বলল, 'এনেছি।'

প্রথম ব্যক্তি বলল, 'কোথায়?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি পাশের পকেট থেকে একটি রুমালের মত ন্যাকড়া বার করল। ন্যাকড়ার এক কোণে গিঁট বাঁধা, যেন সুপুরির মত একটা কিছু বাঁধা রয়েছে। প্রথম ব্যক্তি সেটি ভালভাবে দেখে বলল, 'এতে কাজ হবে?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, 'হবে। খুব পাতলা কাঁচের অ্যাম্পুল। একটু ঠোকা পেলেই ফেটে যাবে।'

আর কোন কথা হল না। প্রথম ব্যক্তি ব্যাগ থেকে কয়েকটা নোট বার করে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি টাকা পকেটে রেখে অ্যাম্পুলটি ভাল করে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে প্রথম ব্যক্তিকে দিল। প্রথম ব্যক্তি সেটি সযত্নে জামা কাপড়ের মধ্যে রেখে দিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির পানে চাইল। দ্বিতীয় ব্যক্তির ঝাঁকড়া গোঁফের আড়াল থেকে এক ঝলক হাসি বেরিয়ে এল। সে বলল, 'শুভমস্ত।'

তারপর দু'জনে ভিন্ন দিকে চলে গেল।

প্রতুলবাবু ব্যোমকেশকে পাশে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহের প্রথম সারিতে বসেছিলেন। আশেপাশে কয়েকটা সীট খালি ছিল, কিন্তু পিছন দিক একেবারে ভরাট।

সাহেববেশী একটি লোক সামনের সারিতে এসে বসল। তার হাতে একটি ব্যাগ। বসবার পর সে দেখতে পেল পাশেই প্রতুলবাবু; অপ্রস্তুতভাবে একটু হেসে বলল, 'কেমন আছেন?'

প্রতুলবাবু বললেন, 'ভাল। আপনি কেমন?'

দু' এক মিনিট শিষ্টতা বিনিময়ের পর লোকটি উঠে পড়ল, বলল, 'যাই। এদিকে একটা কেসে এসেছিলাম, ভাবলাম দাদাকে দেখে যাই।—আচ্ছা।'

লোকটি ব্যাগ হাতে চলে যাবার পর প্রতুলবাবু বললেন, 'বিশু পালের ছোট ভাই। ডাক্তারি করে।'

ব্যোমকেশ বলল, 'কিন্তু পসার ভাল নয়।'

'না, কষ্টেসৃষ্টে চালায়। কি করে বুঝলেন?'

'ভাবভঙ্গী পোষাক পরিচ্ছদ দেখে বোঝা যায়।'

ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় পর্দা উঠল, নাটক আরম্ভ হল। সাড়ে ন'টা পর্যন্ত চলবে। মাত্র তিনটি অঙ্ক।

গল্পটি মহাভারতের বিরাট পর্ব থেকে অপহৃত হলেও একেবারে মাছিমারা অনুকরণ নয়, যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। বস্তুত নাটকের শেষ অঙ্কে ঠিক উল্টো ব্যাপার ঘটেছে. অর্থাৎ বর্তমান কালের কীচক বর্তমান কালের ভীমকে বধ করে দ্রৌপদীকে দখল করেছে। নাটকের চরিত্রগুলির অবশ্য আধুনিক নাম আছে. পাঠকের সুবিধার জন্যে পৌরাণিক নামই রাখা হল।

নাটকের অভিনয় হয়েছে উৎকৃষ্ট। ক্রূর নায়ক কীচকের ভূমিকায় বিশু পালের অভিনয় অতুলনীয়। দ্রৌপদীর চরিত্রে সুলোচনা নাম্নী যশস্বিনী অভিনেত্রী চমৎকার অভিনয় করেছে, তাছাড়া ভীম অর্জুন সুদেষ্ণা উত্তরা প্রভৃতির চরিত্রও ভাল অভিনীত হয়েছে। সব মিলিয়ে এই নাটকটিতে চিরন্তন মনুষ্য সমাজের বিচিত্র আলেক্ষ্য যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মোপদেশ বা নীতিকথা শোনাবার চেষ্টা নেই।

প্রতুলবাবু পরমানন্দে থিয়েটার দেখছেন, ব্যোমকেশও আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। নাটক ক্রমশ তৃতীয় অঙ্কে এসে পেঁছিল। এবার চরম পরিণতি।

শেষ দৃশ্যটি হচ্ছে একটি শয়নকক্ষ। কক্ষে আসবাব কিছু নেই, কেবল একটি পালঙ্ক। এটি দ্রৌপদীর শয়নকক্ষ। ভীম পালঙ্কের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, কীচক আসবে।

ইতিপূর্বে ভীমের সঙ্গে দ্রৌপদীর পরামর্শ হয়েছে. দ্রৌপদী কীচককে তার ঘরে ডেকেছে। ভীম দ্রৌপদীর বদলে বিছানায় শুয়ে আছে. কীচক এলেই ক্যাঁক করে ধরবে।

নাটকের পরিসমাপ্তি এই রকম ঃ ভীমের সঙ্গে কীচকের মল্লযুদ্ধ হবে; কীচক পরাজিত হয়ে মৃত্যুর ভান করে পালঙ্কের পায়ের কাছে পড়ে যাবে, ভীম তখন দ্রৌপদীকে ডাকতে যাবে। মিনিট খানেকের জন্যে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে। তারপর অস্পষ্ট সবুজ আলো জ্বলবে। আস্তে আস্তে আলো উজ্জ্বল হবে। দ্রৌপদীকে নিয়ে ভীম ফিরে আসবে; কীচক ছুরি নিয়ে পিছন থেকে ভীমকে আক্রমণ করবে। ছুরিকাহত ভীম মরে যাবে। কীচক তখন পৈশাচিক হাস্য করতে করতে দ্রৌপদীকে পালঙ্কের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। যবনিকা।

যাহোক, এবার দৃশ্যের আরম্ভের দিকে ফিরে যাওয়া যাক। ভীম পালঙ্কে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে; ঘরের আলো খুব উজ্জ্বল নয়, তবে অন্ধকারও নয়। কীচক পা টিপে টিপে প্রবেশ করল, পা টিপে টিপে পালঙ্কের কাছে গেল। তারপর এক ঝটকায় চাদর সরিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

যিনি ভীম সেজেছেন তাঁর বপুটিও কম নয়, শালপ্রাংশু মহাভুজ। কীচক পরমা কমনীয়া যুবতীর পরিবর্তে এই ষণ্ডামার্কা পালোয়ানকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল, সেই ফাঁকে ভীম দাঁত কড়মড় করে তাকে আক্রমণ করল। কীচকের পকেটে ছুরি ছিল (পরস্ত্রী লোলুপ লম্পটেরা নিরস্ত্রভাবে অভিসারে যায় না) কিন্তু সে তা বের করবার অবকাশ পেল না। দুজনে ঘোর মল্লযুদ্ধ বেধে গেল।

স্টেজের ওপর এই মরণান্তক কুস্তি সত্যিই প্রেক্ষণীয় দৃশ্য। মনে হয় না এটা অভিনয়। যেন দুটো ক্ষ্যাপা মোষ শিংএ শিং আটকে যুদ্ধ করছে; একবার এ ওকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, একবার ও একে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। লোমহর্ষণ লড়াই। শুধু এই লড়াই দেখবার জন্যেই অনেক দর্শক আসে।

শেষ পর্যন্ত কীচকের পরাজয় হল, ভীম তাকে পালঙ্কের পাশে মাটিতে ফেলে বুকে চেপে বসে তার গলা টিপতে শুরু করল। কীচকের হাত-পা এলিয়ে পড়ল, জিভ বেরিয়ে এল, তারপর সে মরে গেল।

ভীম তার বুক থেকে নেমে চোখ পাকিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলল, ঘাড় চুলকে ভাবল, শেষে স্টেজ থেকে বেরিয়ে দ্রৌপদীকে খবর দিতে গেল।

ভীম নিষ্ক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্টেজ ও প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার হয়ে গেল। এই নাটকে আলোর কৌশলে গল্পের নাটকীয়তা বাড়িয়ে দেবার নৈপুণ্য ভারি চমকপ্রদ। শেষ অঙ্কের চরম মুহূর্তে আলো সম্পূর্ণ নিভিয়ে দিয়ে পরিচালক বিশু পাল দর্শকের মনে উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে।

মিনিট খানেক পরে দপ করে আবার সব আলো জ্বলে উঠল। দেখা গেল কীচক পূর্ববৎ খাটের খুরোর কাছে পড়ে আছে।

দ্রৌপদীকে নিয়ে ভীম প্রবেশ করল। ভীমের ভাবভঙ্গীতে উদ্ধত বিজয়োল্লাস, দ্রৌপদীর মুখে উদ্বেগ। তাদের মধ্যে হ্রস্বকণ্ঠে যে সংলাপ হল তা সংক্ষেপে এই রকম—

দ্রৌপদী ঃ এখন মড়া নিয়ে কী করবে?

ভীম ঃ কিছু ভেবোনা, শেষ রাত্রে মড়া রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসব।

নাটকের নির্দেশ, এই সময় কীচক মাটি থেকে চুপি চুপি উঠে ভীমের পিঠে ছুরি মারবে। কিন্তু কীচক যেমন পড়েছিল তেমনি পড়ে রইল, নড়ন চড়ন নেই। ছুরি মারার শুভলগ্ন অতিক্রম হয়ে যাবার পর ভীম উস্খুস্ করতে লাগল, দু' চারটে সংলাপ বানিয়ে বলল, কিন্তু কোনো ফল হল না। ভয়ানক সত্য আবিষ্কার করল প্রথমে দ্রৌপদী। শঙ্কিত মুখে কীচকের কাছে গিয়ে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠল, 'অ্যাঁ—একি! একি—!'

কীচক অর্থাৎ বিশু পাল সত্যি সত্যিই মরে গেছে।

৩

নাটক শেষ হবার পাঁচ মিনিট আগে যবনিকা পড়ে গেল। যে সব দর্শকেরা আগে নাটক দেখেছিল তারা বিস্মিত হল, যারা দেখেনি তারা ভাবল এ আবার কি! কিন্তু কেউ কোনো গোলমাল না করে যে যার বাড়ি চলে গেল।

থিয়েটারের অন্দর মহলে তখন কয়েকজন মানুষ স্টেজের ওপর, কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। কেবল দ্রৌপদী, অর্থাৎ সুলোচনা নাম্নী অভিনেত্রী মূর্ছিত হয়ে কীচকের পায়ের কাছে পড়ে ছিল। দারোয়ান প্রভুনারায়ণ সিং দরজা ছেড়ে স্টেজের উইংসে দাঁড়িয়ে অনিমেষ চোখে মৃত কীচকের পানে চেয়েছিল।

স্টেজের দরজা অরক্ষিত পেয়ে ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুকে নিয়ে ঢুকে পড়েছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়, গুরুতর কিছু ঘটেছে সন্দেহ নেই; সুতরাং অনুসন্ধান দরকার।

স্টেজ থেকে তীব্র আলো আসছে। একটি লোক ব্যাগ হাতে বেরিয়ে দোরের দিকে যাচ্ছিল, প্রতুলবাবু তাকে থামিয়ে প্রশ্ন করলেন—'কী হয়েছে, ডাক্তার পাল?'

অমল পাল, যে প্লে আরম্ভ হবার আগে তাদের পাশে গিয়ে বসেছিল, উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলল, 'দাদা নেই, দাদা মারা গেছেন।'

'মারা গেছেন? কী হয়েছিল?'

'জানি না, বুঝতে পারছি না। আমি পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছি।' অমল পাল দোরের দিকে পা বাড়াল।

এবার ব্যোমকেশ কথা কইল, 'কিন্তু—আপনি বাইরে যাচ্ছেন কেন? যতদূর জানি টেলিফোন আছে।'

অমল পাল থমকে ব্যোমকেশের পানে চাইল, ধন্ধ লাগাভাবে বলল, 'টেলিফোন! হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে বটে অফিস ঘরে—'

এই সময় দারোয়ান প্রভুনারায়ণ সিং এসে দাঁড়াল। লম্বা চওড়া মধ্যবয়স্ক লোক, থিয়েটারের পিছন দিকে কয়েকটা কুঠুরীতে সপরিবারে থাকে আর থিয়েটার বাড়ি পাহারা দেয়। সে অমল পালের পানে চেয়ে ভারী গলায় বলল, 'সাব মালিক তো গুজর গয়ে। আব্ ক্যা করনা হ্যায়?'

অমল পাল একটা ঢোক গিলে প্রবল বাষ্পোচ্ছাস দমন করল, কোনো উত্তর না দিয়ে টেলিফোনের উদ্দেশ্যে অফিস ঘরের দিকে চলে গেল। প্রভু সিং ব্যোমকেশের পানে চাইল, ব্যোমকেশ বলল, 'তুমি দারোয়ান? বেশ, দোরে পাহারা দাও। পুলিস যতক্ষণ না আসে কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে দিও না।'

প্রভু সিং চলে গেল। সে সচ্চরিত্র প্রভুভক্ত লোক; তার সংসারে স্ত্রী আর একটি বিধবা বোন ছাড়া আর কেউ নেই। বস্তুত থিয়েটারই তার সংসার। বিশেষত অভিনেত্রী জাতীয়া স্ত্রীলোকদের সে একটু বেশি স্নেহ করে। এই তার চরিত্রের একটি দুর্বলতা; কিন্তু নিঃস্বার্থ দুর্বলতা।

ব্যোমকেশ ও প্রতুলবাবু যখন মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন তখন তিনজন পুরুষ দ্রৌপদীকে অর্থাৎ অভিনেত্রী সুলোচনাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে গ্রীনরুমে নিয়ে যাচ্ছে। তারা চলে গেলে স্টেজে রয়ে গেল দুটি লোক: একটি ছেলেমানুষ গোছের মেয়ে, সে উত্তরার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল; সে পালঙ্কের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে বিভীষিকা-ভরা চোখে মৃত বিশু পালের মুখের পানে চেয়েছিল। সে এখনো উত্তরার সাজ পোষাক পরে আছে, তার মোহাচ্ছন্ন অবস্থা দেখে মনে হয় সে আগে কখনো অপঘাত মৃত্যু দেখেনি। তার নাম মালবিকা।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যুবাপুরুষ, সে পালঙ্কের শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল এবং ক্রমান্বয়ে একবার মৃতের মুখের দিকে একবার মেয়েটির মুখের পানে চোখ ফেরাচ্ছিল। তার খেলোয়াড়ের মত দৃঢ় সাবলীল শরীর এবং সংযত নিরুদ্বেগ

ভাব দেখে মনে হয় না যে সে এই থিয়েটারের আলোকশিল্পী। তার নাম মণীশ, বয়স আন্দাজ ত্রিশ।

ব্যোমকেশ ও প্রতুলবাবু স্টেজে প্রবেশ করে পালঙ্কের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মৃতের মুখে তীব্র আলো পড়েছে। মুখে মৃত্যু যন্ত্রণার ভান সত্যিকার মৃত্যু যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে। কিম্বা—

'মুখের কাছে ওটা কী?' প্রতুলবাবু মৃতের মুখের দিকে আঙুল দেখিয়ে খাটো গলায় প্রশ্ন করলেন।

ব্যোমকেশ সামনের দিকে ঝুঁকে দেখল, রুমালের মত এক টুক্‌রো কাপড় বিশু পালের চোয়ালের কাছে পড়ে আছে। সে বলল, 'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রুমাল নয়। যখন লড়াই হচ্ছিল তখন ওটা চোখে পড়েনি।'

'আমারও না।'

ব্যোমকেশ সোজা হয়ে বলল, 'কোনো গন্ধ পাচ্ছেন?'

'গন্ধ?' প্রতুলবাবু দু'বার আঘ্রাণ নিয়ে বললেন, 'সেন্ট-পাউডার, ম্যাক্‌স-ফ্যাক্‌টর, সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ। আর তো কিছু পাচ্ছি না।'

'পাচ্ছেন না? এইদিকে ঝুঁকে একটু ওঁকে দেখুন তো।' ব্যোমকেশ মৃত-দেহের দিকে আঙুল দেখাল।

প্রতুলবাবু সামনে ঝুঁকে কয়েকবার নিশ্বাস নিলেন, তারপর খাড়া হয়ে ব্যোমকেশের সঙ্গে মুখোমুখি হলেন, ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন। বাদাম তেলের ক্ষীণ গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে—'

যারা সুলোচনাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তারা ফিরে এল। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে ব্রজদুলাল, অর্থাৎ ভীম; দ্বিতীয় ব্যক্তিটি থিয়েটারের প্রম্‌প্‌টার, নাম কালীকিঙ্কর; তৃতীয় ব্যক্তির নাম দাশরথি, সে কমিক অভিনেতা, নাটকে বিরাটরাজার পার্ট করেছে।

তিনজনে অস্বস্তিপূর্ণভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল; মাঝে মাঝে মৃত-দেহের পানে তাকাচ্ছে। এ অবস্থায় কি করা উচিত বুঝতে পারছে না। ভীমের হাতে তার ব্যাগ ছিল (পরে দেখা গেল অভিনেতা অভিনেত্রীরা সকলেই বাড়তি কাপড় চোপড় এবং প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে অভিনয় করতে আসে)। ভীম ব্যাগটি স্টেজের ওপর রেখে নিজে সেখানে বসল, ব্যাগ খুলে আস্ত একটা হুইস্কির বোতল ও গেলাস বার করল, একবার সকলের দিকে চোখ তুলে গভীর স্বরে বলল, 'কেউ খাবে?'

কেউ সাড়া দিল না। ভীম তখন গেলাসে খানিকটা মদ ঢেলে মালবিকার পানে চাইল। মালবিকার মুখ পাংশু, মনে হয় যেন তার শরীর অল্প অল্প টল্‌ছে। স্নায়ুর অবসাদ এসেছে, এখনি হয়তো মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। ভীম মণীশকে বলল, 'মণীশ, মালবিকার অবস্থা ভাল নয়, এই নাও, একটু জল মিশিয়ে খাইয়ে দাও। নইলে ও যদি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে, নতুন ঝামেলা শুরু হবে—'

মণীশ তার হাত থেকে গেলাস নিয়ে বলল, 'সুলোচনাদিদির জ্ঞান হয়েছে?'

ভীম বলল, 'এখনো হয়নি। নন্দিতাকে বসিয়ে এসেছি। মণীশ, তুমি মালবিকাকে ওঘরে নিয়ে যাও। ওষুধটা জল মিশিয়ে খাইয়ে দিও, তারপর খানিকক্ষণ শুইয়ে রেখো। দশ মিনিট শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

মণীশ এক হাতে মালবিকার পিঠ জড়িয়ে অন্য হাতে হুইস্কির গেলাস নিয়ে

গ্রীনরুমের দিকে চলে গেল। ভীম তখন নিজের পুরুষ্টু গোঁফ জোড়া ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে হুইস্কির বোতলের গলায় ঠোঁট জুড়ে চুমুক মারল।

আমাদের দেশের যাত্রা থিয়েটারে ভীমের ইয়া গোঁফ ও গালপাট্টা দেখা যায়, যদিও মহাভারতে বেদব্যাস ভীমকে তুবর বলেছেন। অর্থাৎ ভীম মাকুন্দ ছিল। অবশ্য বর্তমান নাটকে ভীম মাকুন্দ না হলেও ক্ষতি নেই; এ-ভীম সে-ভীম নয়, তার অর্বাচীন বিকৃত ছায়ামাত্র।

লম্বা এক চুমুকে প্রায় আধাআধি বোতল শেষ করে ভীম বোতল নামিয়ে রাখল, প্যাঁচার মত মুখ করে কিছুক্ষণ বোতলের পানে চেয়ে রইল। তার গোঁফ-বর্জিত মুখখানা অন্য রকম দেখাচ্ছে, ন্যাড়া হাড়গিলের মত। সে কতকটা নিজের মনেই বলল, 'ভীম-কীচকের লড়াইএর পর আমার রোজই এক গেলাস দরকার হয়, নৈলে গায়ের ব্যথা মরে না। আজ এক বোতলেও শানাবে না।'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল শুনছিল। এখন শান্তস্বরে প্রশ্ন করল, 'বিশু পাল মদ খেতেন?'

ভীম তার পানে আরক্ত চোখ তুলে চাইল, তারপর মৃতদেহের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে বলল, 'না। ওর দরকার হত না। লোহার শরীর ছিল। কিসে যে মারা গেল—। ডাক্তার অমলকে দেখেছিলাম, সে কোথায় গেল?'

ব্যোমকেশ বলল, 'তিনি পুলিসকে টেলিফোন করতে অফিসে গেছেন। পুলিস এখনি এসে পড়বে। তার আগে আমি আপনাদের দু' একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

ভীম বোতলে আর এক চুমুক দিয়ে বলল, 'করুন প্রশ্ন। আপনি কে জানি না, কিন্তু প্রশ্ন করার হক সকলেরই আছে।'

প্রতুলবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী। থিয়েটার দেখতে এসেছিলাম একসঙ্গে, তারপর এই দুর্ঘটনা।'

ভীমের চোখের দৃষ্টি একটু সতর্ক হল, অন্য দু'জন ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। ব্যোমকেশ বলল, 'আজ আপনারা এখানে ক'জন উপস্থিত আছেন?'

ভীম বলল, 'শেষ দৃশ্য অভিনয় হচ্ছিল। সাধারণত শেষ দৃশ্যে যাদের কাজ নেই তারা বাড়ি চলে যায়। আজ বিশু সুলোচনা আর আমি ছিলাম। আর কারা ছিল না ছিল খবর রাখি না।'

কমিক অভিনেতা দাশরথি বলল, 'আমি আর আমার স্ত্রী নন্দিতা ছিলাম।'

ব্যোমকেশ সপ্রশ্ন নেত্রে চাইল। দাশরথির এখন কমিক ভাব নেই, চোখে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। সে ইতস্তত করে বলল, 'বিশুবাবুর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল, তাই নাটক শেষ হবার অপেক্ষায় ছিলাম। তৃতীয় অঙ্কে আমার প্রবেশ নেই।'

'আর কেউ ছিল?'

'আর মালবিকা ছিল। টেক্‌নিশিয়ানদের মধ্যে মণীশ আর তার সহকারী কাঞ্চনজঙ্ঘা ছিল—'

'কাঞ্চনজঙ্ঘা!'

'তার নাম কাঞ্চন সিংহ, সবাই কাঞ্চনজঙ্ঘা বলে।'

'ও, তিনি কোথায়?'

দাশরথি এদিক ওদিক চেয়ে বলল, 'দেখছি না। কোথাও পড়ে ঘুম দিচ্ছে বোধহয়।'

'আর কেউ?'

এতক্ষণে তৃতীয় ব্যক্তি কথা বলল, 'আর আমি ছিলাম। আমি প্রম্পটার, শেষ পর্যন্ত নিজের জায়গায় ছিলাম।'

'আপনার জায়গা কোথায়?'

প্রম্পটার কালীকিঙ্কর দাস আঙুলে দেখিয়ে বলল 'ওই যে উইংসের খাঁজের মধ্যে টুল পাতা রয়েছে ঐখানে।'

স্টেজের ওপর যে ঘরের সেট তৈরি হয়েছিল তার প্রবেশদ্বার মাত্র দুটি : একটি পিছনের দেয়ালে, অন্যটি বাঁ পাশে, কিন্তু প্রোসিনিয়ামের দু'পাশ থেকে এবং আরো কয়েকটি উইংসের প্রচ্ছন্ন পথে যাতায়াত করা যায়। প্রম্পটার যেখানে দাঁড়ায় সেখানে যাওয়া আসার সংকীর্ণ পথ আছে; বিপরীত দিকে আলোর কল-কব্জা ও সুইচ বোর্ড যেখানে দেয়ালের সারা গায়ে বিছিয়ে আছে সেদিক থেকে স্টেজে প্রবেশের সোজা রাস্তা। আলোকশিল্পীকে সর্বদা স্টেজের ওপর চোখ রাখতে হয়, মাঝখানে আড়াল থাকলে চলে না।

এই সময় পিছনের দরজা দিয়ে মণীশ মালবিকার বাহু ধরে স্টেজে প্রবেশ করল। মালবিকার ফ্যাকাশে মুখে একটু সজীবতা ফিরে এসেছে। ওরা মৃতদেহের দিকে চোখ ফেরালো না। মণীশ বলল, 'ব্রজদুলালদা, এই নিন আপনার গেলাস। মালবিকা এখন অনেকটা সামলেছে, ওকে এবার বাড়ি নিয়ে যাই?'

ভীম বলল, 'এখনি যাবে কোথায়! এখনো পুলিস আসেনি।'

মণীশ সপ্রশ্ন চোখে ব্যোমকেশ ও প্রতুলবাবুর পানে চাইল। ব্যোমকেশ মাথা নাড়ল, 'আমরা পুলিস নই। কিন্তু আপনাকে তো অভিনয় করতে দেখিনি—'

ভীম বলল, 'ও অভিনয় করে না। ও আমাদের আলোকশিল্পী। মণীশ ভদ্রর নাম শুনেছেন নিশ্চয়—বিখ্যাত সাঁতারু।'

মণীশ বলল, 'আপনিও কম বিখ্যাত নন, ব্রজদুলালদা। এক সময় ভারতবর্ষের চ্যাম্পিয়ান মিড্‌ল-ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন।'

ভীম গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে বলল 'সে-সব দিন গেছে ভায়া। বোসো বোসো, আজ রাত দুপুরের আগে কেউ ছাড়া পাচ্ছে না।'

মণীশ বলল, 'কিন্তু কেন? পুলিস আসবে কেন? বিশুবাবুর মৃত্যু কি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়? আমার তো মনে হয় ওঁর হার্ট ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়েছিল, লড়াইএর ধকল সহ্য করতে পারেন নি, হার্ট ফেল করে গেছে।'

ভীম বলল, 'যদি তাই হয় তবু পুলিস তদন্ত করবে।'

মৃণীশ আর মালবিকা পাশাপাশি স্টেজের ওপর বসল। কিছুক্ষণ কোনো কথা হল না। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ঠিক নেই; কমিক অভিনেতা দাশরথি ওরফে বিরাটরাজ পকেট থেকে সিগারেট বার করে মৃতদেহের পানে কটাক্ষপাত করে সিগারেট আবার পকেটে পুরল।

ব্যোমকেশ বলল, 'আচ্ছা, একটা কথা। মণীশবাবু এবং শ্রীমতী মালবিকা হলেন স্বামী-স্ত্রী—কেমন? ওঁরা এক সঙ্গে এই থিয়েটারে কাজ করেন। এই রকম স্বামী-স্ত্রী এ থিয়েটারে আরো আছেন নাকি?'

ভীম গেলাসে এক চুমুক দিয়ে বলল, 'দেখুন, আমাদের এই থিয়েটার হচ্ছে একটি ঘরোয়া কারবার। যারা এখানে কাজ করে, মেয়ে-মদ্দ কাজ করে। যেমন মণীশ আর মালবিকা, বিশু আর সুলোচনা, দাশরথি আর নন্দিতা। আমি অ্যাকটিং করি, আমার স্ত্রী শান্তি মিউজিক মাস্টার—গানে সুর বসায়। শান্তির কাজ শেষ

হয়েছে, সে রোজ আসে না। আজ আসেনি। এমনি ব্যবস্থা। ছুট্ লোক বড় কেউ নেই।'

ব্যোমকেশ বলল, 'বুঝলাম। এখন বলুন দেখি বিশুবাবু মানুষটা কেমন ছিলেন?'

ভীম মদের গেলাস মুখে তুলল। দাশরথি উত্তেজিত হয়ে বলল, 'সাধু ব্যক্তি ছিলেন। উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি যেমন অগাধ টাকা রোজগার করতেন তেমনি দু'হাতে টাকা খরচ করতেন। মণীশকে নতুন মোটর কিনে দিয়েছিলেন, আমাদের সকলের নামে লাইফ্-ইনসিওর করে-ছিলেন। নিজে প্রিমিয়াম দিতেন। এ রকম মানুষ পৃথিবীতে ক'টা পাওয়া যায়?'

ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে বলল, 'তাহলে বিশুবাবুর মৃত্যুতে আপনাদের সকলেরই লাভ হয়েছে।' একথার উত্তরে হঠাৎ কেউ কিছু বলতে পারল না, মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। শেষে ভীম বলল, 'তা বটে। বিশু নিজের নামে জীবনবীমা করেছিল, কিন্তু উত্তরাধিকারী করেছিল আমাদের। তার মৃত্যুতে বীমার টাকা আমরাই পাব। কিন্তু সামান্য ক'টা টাকার জন্যে বিশুকে খুন করবে এমন পাষণ্ড এখানে কেউ নেই।'

'তাহলে বিশুবাবুর শত্রু কেউ ছিল না?'

কেউ উত্তর দেবার আগেই বাঁ দিকের দোর দিয়ে ডাক্তার অমল পাল প্রবেশ করল। তার পিছনে একটি হিপি-জাতীয় ছোকরা। মাথার চুলে কপাল ঢাকা, দাড়ি গোঁফে মুখের বাকি অংশ সমাচ্ছন্ন; আসলে মুখখানা কেমন বাইরে থেকে আন্দাজ করা যায় না। সে মৃতদেহের দিকে একটি বঙ্কিম কটাক্ষ নিক্ষেপ করে চুপিচুপি মণীশের পাশে গিয়ে বসল।

দাশরথি বলল, 'এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা! কোথায় ছিলে হে তুমি?'

কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন শুনতে পায়নি এমনিভাবে মণীশকে খাটো গলায় বলল, 'ভীষণ মাথা ধরেছিল, মণীশদা! থার্ড অ্যাক্টে আমার বিশেষ কাজ নেই তাই সীন্ ওঠার পর আমি কলঘরে গিয়ে মাথায় খুব খানিকটা জল ঢাল্লাম। তারপর অফিস ঘরে গিয়ে পাখাটা জোরে চালিয়ে দিয়ে টেবিলে মাথা রেখে একটু চোখ বুজেছিলাম। অফিসে কেউ ছিল না, তাই বোধহয় একটু ঝিম্‌কিনি এসে গিয়েছিল—'

মণীশ বিরক্ত চোখে তার পানে চাইল। দাশরথি বলল, 'এত কাণ্ড হয়ে গেল কিছুই জানতে পারলে না।'

এবারও কাঞ্চনজঙ্ঘা কোনো কথায় কর্ণপাত না করে মণীশের কাছে আরো খাটো গলায় বোঁধকরি নিজের কার্যকলাপের কৈফিয়ৎ দিতে লাগল।

ব্যোমকেশ হঠাৎ গলা চড়িয়ে তাকে প্রশ্ন করল, 'আপনার জন্যে বিশুবাবু কত টাকার বীমা করে গেছেন?'

কাঞ্চনজঙ্ঘা চকিতভাবে মুখ তুলল, 'আমাকে বলছেন? বীমা! কৈ আমার জন্যে তো বিশুবাবু জীবনবীমা করেন নি!'

ব্যোমকেশ বলল, 'করেন নি? তবে যে শুনলাম—'

ভীম বলল, 'ওর চাকরির এক বছর পূর্ণ হয়নি, প্রোবেশনে কাজ করছে, কাঁচা চাকরি—তাই—'

কাছেই প্রতুলবাবু ও অমল পাল দাঁড়িয়ে নিম্নস্বরে কথা বলছিলেন, ব্যোমকেশ

কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আর কোনো প্রশ্ন না করে সেইদিকে ফিরল। অমল পাল অস্বস্তিভরা গলায় বলছিল, 'দাদার সঙ্গে সুলোচনার ঠিক—মানে—ওরা অনেক-দিন স্বামী-স্ত্রীর মতই ছিল—'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল, 'বিশুবাবু বিয়ে করেন নি?'

'করেছিলেন বিয়ে। কিন্তু অল্পকাল পরেই বৌদি মারা যান। সে আজ দশ বারো বছরের কথা। ছেলেপুলে নেই।'

স্টেজের দোরের বাইরে মোটর হর্ণ শোনা গেল। একটা পুলিস ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছে। আট দশজন পোষাকী পুলিস ভ্যান থেকে নেমে প্রভু সিংএর সঙ্গে কথা বলল। তারপর পিল্‌পিল্‌ করে স্টেজে ঢুকল। একজন অফিসার ব্যোমকেশদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি ইন্সপেক্‌টর মাধব মিত্র, থানা থেকে আসছি। কে টেলিফোন করেছিলেন?'

'আমি—ডক্টর অমল পাল। আমার দাদা—'

'কি ব্যাপার সংক্ষেপে বলুন।'

অমল পাল স্খলিত স্বরে আজকের ঘটনা বলতে আরম্ভ করলেন, ইন্সপেক্‌টর মাধব মিত্র ঘাড় একটু কাত করে শুনতে শুনতে স্টেজের চারিদিকে চোখ ফেরাতে লাগলেন; মৃতদেহ থেকে প্রত্যেক মানুষটি তাঁর দৃষ্টি প্রসাদে অভিষিক্ত হল। বিশেষত তাঁর অনুসন্ধিৎসু চক্ষু প্রতুলবাবু ও ব্যোমকেশের পাশে বারবার ফিরে আসতে লাগল। মাধব মিত্রের চেহারা ভাল, মুণ্ডিত মুখে চাতুর্য ও সতর্কতার আভাস পাওয়া যায়; তিনি কেবলমাত্র তাঁর উপস্থিতির দ্বারা যেন সমস্ত দায়িত্বের ভার নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন।

ডাক্তার পালের বিবৃতি শেষ হলে ইন্সপেক্‌টর বললেন, 'মৃতদেহ সরানো হয়নি?'

ব্যোমকেশ বলল, 'না। কাউকে কিছুতে হাত দিতে দেওয়া হয়নি। যাঁরা ঘটনাকালে মঞ্চে ছিলেন তাঁরাও সকলেই উপস্থিত আছেন।'

ইন্সপেক্‌টর ব্যোমকেশের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা—?' তিনি বোধহয় অনুভব করেছিলেন যে এঁরা দুজন থিয়েটার সম্পর্কিত লোক নন।

প্রতুলবাবু ব্যোমকেশের পরিচয় দিলেন, সহজাত বিনয়বশত নিজের পরিচয় উহ্য রাখলেন। মাধব মিত্রের মুখ এতক্ষণ হাস্যহীন ছিল, এখন ধীরে ধীরে তাঁর অধর-প্রান্তে একটু মোলায়েম হাসি দেখা দিল। তিনি বললেন 'আপনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী! আপনার যে থিয়েটার দেখার শখ আছে তা জানতাম না।'

ব্যোমকেশ বলল, 'আর বলেন কেন, পণ্ডিত ব্যক্তির পাল্লায় পড়ে এই বিপত্তি। ইনি হলেন—'

ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর পরিচয় দিল। তারপর বলল, 'মাধববাবু, আমরা মৃতদেহের কাছে একটা গন্ধ পেয়েছি। এই বেলা আপনি সেটা শুঁকে নিলে ভাল হয়। গন্ধটা বোধহয় স্থায়ী গন্ধ নয়।'

মাধববাবু ত্বরিতে ফিরে মৃতদেহের কাছে গেলেন, একবার তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে পাশে নতজানু হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে মৃতের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলেন।

'বিশ্বাস, শীগ্‌গির ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এস।'—মাধব মিত্র উঠে দাঁড়িয়ে

ব্যোমকেশের দিকে ফিরলেন। তরুণ সাব-ইন্সপেক্টর বিশ্বাস প্রায় দৌড়তে দৌড়তে বাইরে চলে গেল। পুলিসের ডাক্তার পুলিস ভ্যানে অপেক্ষা করছিলেন।

'আপনারা ঠিক ধরেছেন, গন্ধটা সন্দেহজনক।—এই যে ডাক্তার, একবার এদিকে আসুন তো—'

ব্যাগ হাতে প্রৌঢ় ডাক্তার মৃতের কাছে গেলেন, মাধববাবু ক্ষিপ্রস্বরে তাঁকে ব্যাপার বুঝিয়ে দিলেন।

পাঁচ মিনিট পরে শব পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন।

'খুব ক্ষীণ গন্ধ, কিন্তু সায়ানাইড সন্দেহ নেই। এখনি মর্গে নিয়ে গিয়ে অটপ্সি করতে হবে, নইলে সায়ানাইডের সব লক্ষণই লুপ্ত হয়ে যাবে।'

'সায়ানাইড কি করে প্রয়োগ করা হল, ডাক্তার?'

ডাক্তার মৃতের কাছ থেকে ন্যাক্ড়ার ফালিটা তুলে ধরে বললেন, 'এই কাপড়ের এক কোণে গিঁট বাঁধা রয়েছে দেখছেন? ওর মধ্যে কাঁচের একটা অ্যাম্পুল ছিল, তার মধ্যে তরল সায়ানাইড ছিল। যখন স্টেজ অন্ধকার হয়ে যায় সেই সময় আততায়ী স্টেজে ঢুকে ন্যাক্ড়ার খুঁট ধরে মাটিতে আছাড় মারে, অ্যাম্পুল ভেঙে যায়। তারপর—বুঝেছেন? হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড খুব ভোলাটাইল—মানে--'

'বুঝেছি'—মাধব মিত্র হাত নেড়ে পরিচরদের হুকুম দিলেন। তারা কীচকের মরদেহ ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গেল। ডাক্তার ন্যাক্ড়ার ফালি ব্যাগে পুরে কীচকের অনুগামী হলেন।

অমল পালের গলার মধ্যে একটা চাপা শব্দ হল, যেন সে প্রবল কান্নার বেগ রোধ করবার চেষ্টা করছে।

মাধব মিত্র একবার চারিদিকে তাকালেন, ভীম প্রমুখ কয়েকটা লোক স্টেজের মধ্যে প্রস্তর পুত্তলিকার মত বসে আছে। ভীমের বোতল ব্যাগের মধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে। মালবিকার চোখে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি। মাধব মিত্র ব্যোমকেশের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আজ বোধহয় এজাহার নিতে রাত কাবার হয়ে যাবে। আপনাদের অতক্ষণ আটকে রাখব না। কী দেখেছেন বলুন।'

ব্যোমকেশ বলল, 'দেখলাম আর কই। যা কিছু ঘটেছে অন্ধকারে ঘটেছে।'

প্রতুলবাবু বললেন, 'যেমন তেমন অন্ধকার নয়, নীরন্ধ্র অন্ধকার, সূচীভেদ্য অন্ধকার। আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ ছিলাম।'

মাধববাবু নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে আপনাদের আট্কে রেখে লাভ নেই। আজ আসুন তবে। যদি কোনো দরকারী কথা মনে পড়ে দয়া করে আমাকে স্মরণ করবেন। আচ্ছা, নমস্কার।'

ব্যোমকেশের ইচ্ছে ছিল আরো কিছুক্ষণ থেকে পরিস্থিতির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে, কিন্তু এ রকম বিদায় সম্ভাষণের পর আর থাকা যায় না। দু'জনে দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হলেন। ব্যোমকেশ যেতে যেতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ইন্সপেক্টর অমল পালের সঙ্গে কথা কইছেন।

দোরের কাছে প্রভু সিং দাঁড়িয়েছিল। ব্যোমকেশ লক্ষ্য করল, দোরের বাইরে থেকে একটি মেয়ে ব্যগ্র চক্ষে স্টেজের দিকে উঁকি মারছে। যুবতী মেয়ে, মুখশ্রী ভাল, শাড়ি পরার ভঙ্গী ঠিক বাঙালী মেয়ের মত নয়। ব্যোমকেশদের আসতে দেখে সে সুট্ করে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যোমকেশ প্রভু সিংএর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, 'ও মেয়েটি কে?'

প্রভু সিং একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, 'জি—ও আমাব ছোট বোন সোমরিয়া। আমার কাছেই থাকে, থিয়েটারের কাজকর্ম করে, ঝাঁটপাট ঝাড়পোছ—এই সব। মালিক ওকে খুব স্নেহ করতেন—'

'হুঁ, সধবা মেয়ে মনে হল। তোমার কাছে থাকে কেন?'

প্রভু সিং বিব্রত হয়ে বলল, 'জি, ওর মরদের সঙ্গে বনিবনাও নেই, তাই আমি নিজের কাছে এনে রেখেছি।'

'তোমার সংসারে আর কেউ আছে?'

'জি, ঔরৎ আছে, বাচ্চা মেয়ে আছে। থিয়েটারের হাতার মধ্যেই আমরা থাকি।'

প্রতুলবাবুর মোটর রাস্তার ধারে পার্ক করা ছিল। সেইদিকে যেতে যেতে ব্যোমকেশ দেখল থিয়েটারের হাতার মধ্যে পুলিসের ভ্যান ছাড়াও আবো দু'টি মোটব দাঁড়িয়ে আছে। একটি সম্ভবত বিশু পালেব গাড়ি, আকারে বেশ বড় বিলিতি গাড়ি, খুব নতুন নয়, অন্য গাড়িটি কাব অনুমান করা শক্ত। ভীমেব হতে পারে, যদি ভীমের গাড়ি থাকে; অমল পাল ডাক্তার, তার গাড়ি হতে পাবে. কিম্বা মণীশ ভদ্র'র হতে পাবে। বিশু পাল মণীশকে গাড়ি কিনে দিয়েছিল—

এই সব চিন্তার মধ্যে ব্যোমকেশ অনুভব করল সে প্রতুলবাবুব গাড়িতে চড়ে বাড়ির দিকে ফিরে চলেছে। সে অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে, পাশেব অন্ধকার থেকে প্রতুলবাবু বললেন, 'আমি অন্ধকারের মধ্যে স্টেজেব ওপর কিছু দেখিনি সত্য, কিন্তু মনে হয কিছু শুনেছি।'

'কি শুনেছেন?' ব্যোমকেশ তাঁর দিকে ঘাড় ফেরাল।

'একটা মিহি শব্দ।'

'কি রকম মিহি শব্দ?'

'ঠিক বর্ণনা করে বোঝানো শক্ত। এই ধরুন মেয়েবা হাত ঝাড়লে যেমন চুড়িব আওয়াজ হয়, সেই রকম।'

'কাঁচের চুড়ি, না সোনার চুড়ি?'

'তা বলতে পারি না। আপনি কিছু শুনতে পাননি?'

'আমাব কান ওদিকে ছিল না।'

পথে আব কোন কথা হল না।

৩

পরদিন সকাল আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় ব্যোমকেশ বসবার ঘরে খবরেব কাগজটা মুখের সামনে উঁচু করে ধরে গত রাত্রের থিয়েটারে খুনের বিবরণ পড়ছিল। সত্যবতী সকালে বাড়ি ফিরেছে, ব্যোমকেশকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে গড়িয়াহাটে বাজার করতে গেছে, ফিরে এসে ব্যোমকেশকে আর এক পেয়ালা চা ও প্রাতরাশ দেবে। বাড়িতে কেবল অজিত আছে।

অন্দরের দিকের দরজা থেকে অজিত উঁকি মারল, দেখল ব্যোমকেশ মুখের সামনে কাগজের পর্দা তুলে দিয়ে খবর পড়ছে। অজিত নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে গুটি গুটি সদর দোরের দিকে অগ্রসর হল। সে প্রায় দোর পর্যন্ত পৌঁচেছে পিছন

থেকে শব্দ হল,—'সাত সকালে চলেছ কোথায়?'

ধরা পড়ে গিয়ে অজিত দাঁড়াল, ভারিক্কিভাবে বলল, 'দরকারি কাজে বেরুচ্ছি, টুকে দিলে তো?'

ব্যোমকেশ কাগজ নামিয়ে বলল, 'বইএর দোকানের কাজ?'

গাম্ভীর্য বর্জন করে অজিত মুখ টিপে হাসল।

ব্যোমকেশ বলল, 'তোমার কার্য-কলাপ গতিবিধি ক্রমেই সন্দেহজনক হয়ে উঠছে। বিকাশকে ডেকে তোমার পিছনে টিকটিকি লাগাতে হবে দেখছি।'

'সাত দিন ধৈর্য ধরে থাকো, তারপর আমি নিজেই সব বলব।' অজিত বেরিয়ে গেল।

ব্যোমকেশ আবার কাগজ তুলে নিল। থিয়েটারে পুলিস প্রায় দেড়টা পর্যন্ত ছিল, থিয়েটারের আগাপাস্তলা তন্ন তন্ন করেছে; থিয়েটার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় স্ত্রী পুরুষের জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে। কেবল খ্যাতনামা অভিনেত্রী সুলোচনা শোকাভিভূত থাকার জন্য এজাহার দিতে পারেননি। লাশ রাত্রেই ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিল, লাশ-পরীক্ষক ডাক্তার বলেন মৃতের শ্বাসনালী ও ফুসফুসের মধ্যে সাইনোজেন গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে, ওই ভয়ংকর বিষই মৃত্যুর কারণ। মামলার পুলিস ইন-চার্জ ইন্সপেক্টর মাধব মিত্র মনে করেন, বিশু পালের মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, কেউ তাকে খুন করেছে। কিন্তু চিন্তার কারণ নেই, পুলিস তৎপর আছে, শীঘ্রই আসামী ধরা পড়বে। ওকুস্থলে অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহে ব্যোমকেশ ও প্রতুলবাবু উপস্থিত ছিলেন কাগজে সে কথারও উল্লেখ আছে।

বাইরে সত্যবতীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সে বাজার করে ফিরেছে। তার পিছনে প্রতুলবাবু দু'হাতে দুটি পরিপুষ্ট থলে নিয়ে আসছেন, মুখে একটু অপ্রতিভ হাসি। সত্যবতী ঘরে ঢুকে বলল, 'ওগো দ্যাখো কে এসেছেন। উনিও গড়িয়াহাটে বাজার করতে গিয়েছিলেন—ধরে নিয়ে এলুম।'

ব্যোমকেশ হেসে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'বাঃ, বেশ!—সত্যবতী ঝাঁকামুটের কাজটা আপনাকে দিয়েই করিয়ে নিয়েছে দেখছি।'

'যাঃ, তা কেন? উনি নিজেই আমার হাত থেকে থলি কেড়ে নিলেন।—আপনারা বসে গল্প করুন, আমি চা তৈরি করে আনছি।' নিজের থলি প্রতুলবাবুর হাত থেকে নিয়ে সত্যবতী ভেতরে চলে গেল।

প্রতুলবাবু নিজের থলিটি নামিয়ে রেখে ব্যোমকেশের সামনের চেয়ারে বসলেন, বললেন, 'কাগজে কালকের কীচক বধের খবর পড়ছেন দেখছি। আমিও পড়েছি।—আচ্ছা, কাল থিয়েটার থেকে ফিরতে ফিরতে আপনাকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে?'

'কি কথা, চুড়ির ঝনাৎকার?'

'হ্যাঁ, কাল থেকে চিন্তাটা মনের পিছনে লেগে আছে, পুলিসকে এ কথা জানানো উচিত কিনা।'

ব্যোমকেশ একটু নীরব থেকে প্রশ্ন করল, 'ঝনাৎকার শব্দ স্টেজ থেকে এসেছিল এ বিষয়ে আপনি ষোল আনা নিঃসংশয়?'

প্রতুলবাবু বললেন, 'দেখুন, অন্ধকারে বসে থাকলে কোন্ দিক থেকে আওয়াজ আসছে সব সময় ধরা যায় না। তবু, স্টেজ থেকে যে আওয়াজটা এসেছিল এ বিষয়ে আমি বারো আনা নিঃসংশয়।'

'তাহলে পুলিসকে বলা উচিত। ওরা যদি তা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—'

এই সময় সদর দোরের কাজ থেকে আওয়াজ এল—'আসতে পারি?'

ব্যোমকেশ মুখ তুলে বলল, 'এস এস, রাখাল। তোমাদের কথাই হচ্ছিল।'

ইন্সপেক্টর রাখাল সরকার প্রবেশ করলেন, হেসে বললেন, 'দু'জন আসামীই উপস্থিত আছেন দেখছি।'

ব্যোমকেশ বলল, 'বসো। তোমার কি কাজকর্ম নেই, সকালবেলাই থানা ছেড়ে বেরিয়েছ যে!'

রাখালবাবু বললেন, 'কাজকর্ম ঢিমে। কাগজে আপনাদের দু'জনের নাম দেখলাম। আপনারা আমার এলাকার লোক, তাই ভাবলাম তদারক করে আসি।'

সত্যবতী ট্রে'র ওপর দু' পেয়ালা চা ও রাশীকৃত চিঁড়ে ভাজা নিয়ে এল। রাখালবাবু বললেন, 'বৌদি, আমিও আছি। আর একটা পেয়ালা চাই।'

আর এক পেয়ালা চা এল। তিনজনে চায়ের অনুপান সহযোগে চিঁড়ে ভাজা খেতে খেতে গত রাত্রির থিয়েটারি হত্যাকাণ্ডের আলোচনা করতে লাগলেন।

চিঁড়ে ভাজা নিঃশেষ হলে রাখালবাবু চায়ের পেয়ালায় অন্তিম চুমুক দিয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'ব্যোমকেশদা, এ পাড়ায় শালীচরণ দাস নামে কাউকে চেনেন?'

ব্যোমকেশ বলল, 'শালীচরণ দাস! নামের একটি মহিমা আছে বটে কিন্তু আমি চিনি না। কে তিনি?'

রাখালবাবু বললেন, 'বছর বারো আগে আমি এই থানাতেই সাব-ইন্সপেক্টর ছিলাম। তখন শালীচরণকে নিয়ে বেশ কিছুদিন হৈ চৈ চলেছিল।'

'হৈ চৈ কিসের? কী করেছিলেন তিনি?'

'শালীকে খুন করেছিল।'

'শালীচরণ শালীকে খুন করেছিল।'

'এবং বিশু পালের সঙ্গে এই ঘটনার কিছু যোগাযোগ আছে।'

'তাই নাকি! বল বল, শুনি।—প্রতুলবাবু আপনার গল্প শুনতে আপত্তি নেই তো?'

প্রতুলবাবু বললেন, 'গল্প শুনতে কার আপত্তি হতে পারে? আমি এ পাড়ার পুরনো বাসিন্দা, শালীচরণ নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আজ রবিবার, ভেবেছিলাম সকালবেলা একটু লেখাপড়া করব। তা গল্পই শোনা যাক।'

অতঃপর রাখালবাবু শালীচরণের অতীত কাহিনী বললেন। গল্প শুনে ব্যোমকেশ বলল, 'শালীচরণ এখন কোথায়? জেল থেকে বেরিয়েছে?'

রাখালবাবু বললেন, 'মাস খানেক হল। জেলখাটা কয়েদীদের খবরাখবর আমাদের রাখতে হয়—'

'কোথায় আছে?'

'নিজের বাড়ির একতলায় উঠেছিল। আজ কোথায় আছে জানি না। খোঁজ নিতে পারি।'

ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বলল, 'আজ ছুটির দিন, একটু সত্যান্বেষণে বেরুলে কেমন হয়? শালীচরণ আমার মনোহরণ করেছে! যাবেন তার বাড়িতে তত্ত্বতল্লাশ নিতে?'

প্রতুলবাবু বললেন, 'বেশ তো, চলুন না। আমি কখনো খুনী আসামী দেখিনি, একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। উঠুন তাহলে। আমার গাড়ি রয়েছে, তাতেই যাওয়া যাক।'

তিনজনে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। রাখালবাবু ড্রাইভারকে পথ নির্দেশ করার জন্যে সামনের সীটে বসলেন।

যেতে যেতে ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা রাখাল, মাধব মিত্তিরকে তুমি চেন?'

রাখালবাবু ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'চিনি। ওঁর সঙ্গে কিছুদিন একসঙ্গে কাজ করেছি।'

'লোকটি কেমন বল তো?'

রাখালবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'খুব হুঁশিয়ার কাজের লোক, আর ভারি মুখমিষ্টি। কিন্তু নিজের এলাকায় কাউকে নাক গলাতে দেন না।'

'হুঁ।' ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর পানে চেয়ে একটু হাসল।

পাঁচ মিনিট পরে রাখালবাবুর নির্দেশ অনুসরণ করে মোটর একটি বাড়ির সামনে থামল। অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তার ওপর ছোট দোতলা বাড়ি; বাড়ির গায়ে জীর্ণতার ছাপ পড়েছে। তিনজনে মোটর থেকে অবতীর্ণ হয়ে বাড়ির সদরে এসে দেখলেন দরজায় তালা ঝুলছে।

তিনজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। বাড়িতে তালা লাগিয়ে কালীচরণ কোথায় গেল? বাজারে?

সদর দোরের মাথায় দোতলায় একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যালকনি ছিল, এক ভদ্রলোক সেখান থেকে নীচে উঁকি মারলেন, 'কাকে চান?'

নীচে তিনজন ঊর্ধ্বমুখ হলেন। রাখালবাবু বললেন, 'কালী—মানে কালীচরণ দাস আছেন?'

ত্রিশঙ্কুর মত ভদ্রলোক বললেন, 'না, তিনি বাইরে গেছেন।'

'কোথায় গেছেন?'

'দাঁড়ান, আমি আসছি।' ত্রিশঙ্কু ব্যালকনি থেকে অদৃশ্য হলেন।

অল্পক্ষণ পরে বাড়ির পাশের দিক থেকে ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। মধ্যবয়স্ক লোক, কিন্তু ভাবভঙ্গিতে চটুলতার আভাস বয়সের অনুকূল নয়। বললেন, 'আমি কালীচরণবাবুর ভাড়াটে। ওপরতলায় থাকি। আপনারা কি তাঁর বন্ধু?'

ব্যোমকেশ হেসে বলল, 'অন্তত শত্রু নয়; দর্শনার্থী বলতে পারেন। তিনি কোথায়?'

ভদ্রলোক হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'তিনি বোষ্টুমীকে নিয়ে বৃন্দাবন গেছেন।'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলে বলল, 'বৃন্দাবন! বোষ্টুমী!'

ভদ্রলোকের মুখের হাসি আর একটু প্রকট হল, 'আজ্ঞে। আমার বাসায় একটি কমবয়সী ঝি কাজ করত, দেখতে শুনতে ভাল, বোধহয় বিধবা। কাজকর্ম ভালই করছিল, তারপর কালীচরণবাবু জেল থেকে ফিরে এলেন। একলা মানুষ হলেও তাঁর একজন ঝি দরকার, চপলা—মানে আমার ঝি তাঁর কাজও করতে লাগল। কিছুদিন যেতে না যেতেই চপলা আমার কাজ ছেড়ে দিল, কেবল কালী-চরণবাবুর কাজ করে। তারপর দেখলাম চপলা গলায় কণ্ঠি পরে বৈষ্ণবী হয়েছে। ক্রমে সন্ধ্যার পর নীচের তলা থেকে খঞ্জনীর আওয়াজ আসে; যুগল-কণ্ঠে গান

শোনা যায়—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—

'দিন দশেক আগে একদিন সন্ধ্যেবেলা কালীচরণবাবু এক থালা মালপো আর পরমান্ন নিয়ে দোতলায় এলেন, সলজ্জভাবে জানালেন চপলা বোষ্টুমীকে তিনি কণ্ঠিবদল করে বিয়ে করেছেন।'

নিঃশব্দ হাসিতে ভদ্রলোকের মুখ ভরে গেল।

ব্যোমকেশ চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে বলল, 'তাই তো। কবে বাইরে গেলেন?'

'কাল সকালে।'

'সকালে?'

'আজ্ঞে। ভোরবেলা ওপর তলায় এসে আমাকে নীচের তলার চাবি দিয়ে বললেন, আমরা বৃন্দাবন যাচ্ছি বেলা দশটার ট্রেনে, হপ্তা দুই পরে ফিরব। এই বলে বোষ্টুমীকে ট্যাক্সিতে তুলে চলে গেলেন। বৃন্দাবনে নাকি কোন্ আখড়ায় মোচ্ছব আছে।'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল, প্রতুলবাবু বললেন, 'এটা বোধহয় বৈষ্ণবীয় হনিমুন।'

তারপর রসিক ভদ্রলোকটিকে ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে তিনজনে গাড়িতে এসে উঠলেন। প্রতুলবাবু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'খুনী আসামী দেখা আমার ভাগ্যে নেই।'

পাঁচ—ছয় দিন বিশুপাল বধ সম্বন্ধে আর কোনো নতুন খবর পাওয়া গেল না সংবাদপত্রে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠা ছেড়ে অন্দর মহলে গা-ঢাকা দিয়েছে। মাধব মিত্রের সাড়াশব্দ নেই। ভাবগতিক দেখে মনে হয় তিনি মামলার কোনো কিনারা করতে পারেন নি, আসামী এখনো অজ্ঞাত।

ব্যোমকেশের হাতে অন্য কোনো কাজ ছিল না, তাই তার মনটা থিয়েটারি হত্যার দিকে পড়ে থাকত। শনিবার বিকেলবেলা সে প্রতুলবাবুকে ফোন করবে মনস্থ করেছে এমন সময় ফোন বেজে উঠল। স্বয়ং প্রতুলবাবু ফোন করছেন। তিনি বললেন, 'এইমাত্র ইন্সপেক্টর মাধব মিত্রের পরোয়ানা এসেছে। তিনি আমার বাসায় আসছেন। আপনাকেও হাজির থাকতে হবে। বোধহয় হালে পানি পাচ্ছেন না।'

ব্যোমকেশ বলল, 'হুঁ। আপনি তাঁকে কঙ্কণ ঝনাৎকারের কথা বলেছেন নাকি?'

'না। তিনি এলে বলব।'

'আর শালীচরণ দাসের রোমান্স?'

'না, দরকার বোধ করেন আপনি বলবেন।'

'আচ্ছা, আমি এখনি বেরুচ্ছি।'

'গাড়ি পাঠাব?'

'না না; দরকার নেই। দশ মিনিটের তো রাস্তা।'

'গাড়ি থাকলে দু' মিনিটে আসা যেত।'

ব্যোমকেশ হেসে বলল, 'হুঁ। বুঝেছি আপনার ইঙ্গিত।'

পনেরো মিনিট পরে ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর বাড়িতে দোতলার বারান্দায় গিয়ে বসতে না বসতেই মাধব মিত্র উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে একটি চামড়ার মোটা ফাইল। টেবিলের ওপর ফাইল রেখে তিনি বিনীত হাস্য করলেন, 'বিরক্ত করতে

এলাম। ভেবেছিলাম আপনাদের কষ্ট দেব না, কিন্তু গরজ বড় বালাই। আপনারা সে-রাত্রে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন; যদিও চোখে কিছু দেখেন নি, তবু আপনাদের উপস্থিতিই আমার কাছে মূল্যবান। আপনারা জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি, পরম পণ্ডিত। আপনাদের মানসিক সহযোগিতা পেলেই আমরা কৃতার্থ হয়ে যাব।'

লোকটির মিষ্টি কথা বলবার ক্ষমতা আছে বটে। কিন্তু ব্যোমকেশও হার মানবার পাত্র নয়। সে বলল, 'সে কি কথা! পুলিসকে সাহায্য করা তো প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। তাছাড়া আপনি যে রকম মিষ্টভাষী সজ্জন ব্যক্তি আপনাকে সাহায্য করা তো গৌরবের কথা। আমরা কি করতে পারি বলুন। সে-রাত্রে থিয়েটার থেকে চলে আসার পর কী ঘটেছিল আমরা কিছুই জানি না; খবরের কাগজে যা পড়েছি তা ধর্তব্য নয়। এইটুকু শুধু জানি যে অজ্ঞাত আসামী এখনো সনাক্ত হয়নি।'

প্রতুলবাবু ইতিমধ্যে চা ফরমাস করেছিলেন, সঙ্গে এক প্লেট প্যাস্ট্রি। মাধববাবু এক চুমুক চা খেয়ে প্যাস্ট্রিতে কামড় দিলেন, চিবোতে চিবোতে বললেন, 'না, সনাক্ত হয়নি। তবে জাল খানিকটা গুটিয়ে এনেছি। ঘটনাকালে যে দশজন মঞ্চে উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে ছাঁটাই করে গুটি তিনেক লোককে দাঁড় করান গেছে। মুশকিল কি হয়েছে জানেন, ওদের সকলেরই একটা না একটা মোটিভ আছে। তাহলে গোড়া থেকে বলি শুনুন—

'আপনারা চলে আসবার পর থিয়েটারের মঞ্চ গ্রীনরুম অডিটোরিয়াম, তারপর হাতার মধ্যে প্রভুনারায়ণের কোয়ার্টার—সব খানাতল্লাশ করালাম; স্টেজের দোরের কাছে দুটো মোটর ছিল একটা বিশু পালের, দ্বিতীয়টা মণীশ ভদ্রের। সে দুটোও খুঁজে দেখলাম, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। আর্টিস্টরা সবাই ব্যাগ হাতে করে অভিনয় করতে আসে, তাদের ব্যাগের মধ্যেও সাধারণ কাপড় চোপড় পাউডার লিপস্টিক ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। কেবল মালবিকার ব্যাগে একটা নরুনের মত ধারালো ছুরি আর ব্রজদুলালের ব্যাগে এক বোতল হুইস্কি পাওয়া গেল। তারপর নিষ্ফল বডি সার্চ।'

মাধব মিত্র চায়ের পেয়ালা শেষ করে রুমালে মুখ মুছলেন, বললেন, 'অতঃপর সাক্ষিদের জবানবন্দী নিতে শুরু করলাম। প্রথমে বিশু পালের ভাই ডাক্তার অমল পাল—'

ব্যোমকেশ হাত তুলে বলল, 'জবানবন্দী মুখে বলতে গেলে অনেক কথা বাদ পড়ে যাবে। তারচেয়ে যদি জবানবন্দীর নথি আপনার কাছে থাকে—'

মাধববাবু ফাইলের ওপর হাত রেখে একটু দ্বিধাভরে বললেন, 'আছে। একটা কপি সর্বদাই সঙ্গে থাকে। কিন্তু—মুশকিল কি জানেন, ফাইল হাতছাড়া করার নিয়ম নেই। যাহোক, এক করা যেতে পারে আমি বসছি আপনি ফাইলে চোখ বুলিয়ে নিন্। আপনার পড়াও হবে, নিয়ম রক্ষেও হবে। কি বলেন?'

ব্যোমকেশ নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'দেখুন, আমার কোনো আগ্রহ নেই। আপনার যদি আগ্রহ থাকে, তবেই জবানবন্দী পড়ব।'

মাধববাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না না, সে কি কথা! আমার আগ্রহ আছে বলেই না আপনার কাছে এসেছি।' তিনি ফাইল থেকে টাইপ করা ফুলস্ক্যাপ কাগজের একটা নথি বার করে ব্যোমকেশের দিকে এগিয়ে দিলেন, 'এই নিন্।

'আপনি পড়ুন, আমি না হয় ততক্ষণ প্রতুলবাবুর সঙ্গে পাশের ঘরে বসে গল্প করি।'

ব্যোমকেশ নথি টেনে নিয়ে বলল, 'মন্দ কথা নয়। প্রতুলবাবু আপনাকে কিছু নতুন খবর দিতে পারবেন। আমিও একটা খবর দেব। আগে জবানবন্দী পড়ি। ডাক্তারের ময়না তদন্তের রিপোর্ট নথিতে আছে নাকি?'

'আছে। তিনি ডাক্তারী পরিভাষার কচ্‌কচি রিপোর্টে যথাসম্ভব সরল করে দিয়েছেন।'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরিয়ে জবানবন্দীর নথির পাতা খুলে পড়তে আরম্ভ করল।

থিয়েটারের অফিস ঘরে বসে মাধব মিত্র একের পর এক সাক্ষী ডেকে তাদের এজাহার নিয়েছিলেন। একজনের এজাহার নেবার সময় অন্য কোনো সাক্ষী উপস্থিত ছিল না।

অমল পাল। বয়স ৩৯। জীবিকা—ডাক্তারী। ঠিকানা— * * গোলাম মহম্মদ রোড, দক্ষিণ কলিকাতা।

মৃত বিশ্বনাথ পাল আমার দাদা ছিলেন। আমরা দুই ভাই; আমি কনিষ্ঠ। দাদা আমার পড়ার খরচ দিয়ে ডাক্তারী পড়িয়েছিলেন। আমি দক্ষিণ কলকাতায় প্র্যাক্‌টিস করি, দাদা থিয়েটারের কাছে থাকার জন্যে শ্যামবাজারে থাকতেন। তিনি বিপত্নীক ও নিঃসন্তান ছিলেন। শ্যামবাজারের বাসায় অভিনেত্রী সুলোচনা তাঁর সঙ্গে থাকত। আমার সুযোগ হলে আমি থিয়েটারে এসে কিম্বা শ্যামবাজারের বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। তাঁর সঙ্গে আমার পরিপূর্ণ সদ্ভাব ছিল, তিলমাত্র মনোমালিন্য কোন দিন হয়নি।

দাদা উদার চরিত্রের মানুষ ছিলেন, পরোপকারী ছিলেন। তিনি পনরো হাজার টাকার লাইফ ইন্‌সিওর করে আমাকে তার ওয়ারিশ করেছিলেন। শুনেছি থিয়েটারের আরো অনেক লোককে লাইফ ইন্‌সিওরের ওয়ারিশ করেছিলেন। কাউকে দশ হাজার, কাউকে পাঁচ হাজার। তিনি অজস্র টাকা রোজগার করতেন, কোনো বদ্‌খেয়াল ছিল না; যাদের ভালবাসতেন তাদের দু'হাতে ভরে দিতেন।

নৈতিক চরিত্র? তিনি আমার গুরুজন ছিলেন, তাঁর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই। সুলোচনার সঙ্গে ওঁর বিবাহিত সম্বন্ধ না থাকলেও ওঁরা স্বামী-স্ত্রীর মতই থাকতেন।

দাদার শত্রু? শত্রু কেউ ছিল বলে তো মনে হয় না। সকলেই তাঁর অনুগৃহীত, শত্রুতা কে করবে?

আমি আজ এ পাড়ায় একটা 'কল'এ এসেছিলাম ভাবলাম দাদার সঙ্গে দুটো কথা বলে যাই; তাই থিয়েটারে এসেছিলাম। আমার ডাক্তারী প্র্যাক্‌টিস মোটের ওপর মন্দ নয়। আমি বিবাহিত; তিনটি মেয়ে দু'টি ছেলে।

আজ নাটক শেষ হবার ঠিক আগে যখন এক মিনিটের জন্যে আলো নিভিয়ে দেওয়া হল তখন আমি স্টেজের পিছন দিকে একটা টুলের ওপর বসে সিগারেট টানছিলাম। তখন কে কোথায় ছিল, নিজের জায়গা থেকে নড়েছিল কিনা আমি লক্ষ্য করিনি। আলো জ্বলার পরে আবার অভিনয় আরম্ভ হল, কিছুক্ষণ পরে

চীৎকার কান্না হৈ হৈ, ড্রপসীন পড়ে গেল। তখন আমি স্টেজে এসে দেখলাম—

আমি ডাক্তার; কিন্তু দাদার মৃত্যুর কারণ আমি বুঝতে পারিনি। এত অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু হার্ট ফেলিওর হতে পারে। কিন্তু দাদার হার্ট দুর্বল ছিল না কয়েক দিন আগে আমি পরীক্ষা করেছি। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ পোস্ট-মর্টেমে জানা যাবে। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, এখনো ঠিক ধারণা করতে পারছি না।

দাদা যদি উইল করে গিয়ে থাকেন তাহলে কে তাঁর উত্তরাধিকারী আমি জানি না, সলিসিটার সিংহ-রায়ের অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা যাবে। যদি উইল না থাকে তাহলে সম্ভবত আমিই তাঁর উত্তরাধিকারী। তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কী আছে আমি জানি না।

ব্রজদুলাল ঘোষ। বয়স ৪২। জীবিকা নাট্যাভিনয়। ঠিকানা: শ্যামপুকুর লেন।

ইন্সপেক্টরবাবু, আপনি সুলোচনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে এখনো সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়নি। আপনি আগে আমাকে প্রশ্ন করুন। আমার এজাহার শেষ হলে সুলোচনা আসবে।

প্রশ্ন: আপনি এই নাটকে ভীমের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন?

উত্তর: হ্যাঁ। বিশু যতগুলি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল সব নাটকেই আমি অভিনয় করেছি।

প্রশ্ন: কতদিন তার সঙ্গে আছেন?

উত্তর: তা প্রায় দশ বছর। বিশু যখন নিজের দল তৈরি করে আসরে নামল তখন থেকে আমি ওর সঙ্গে আছি।

প্রশ্ন: আপনার মত আর কেউ গোড়া থেকে আছে?

উত্তর: গোড়া থেকে আছে। কমিক অভিনেতা দাশরথি চক্রবর্তী আর ওর বৌ নন্দিতা। অন্য যারা ছিল তারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন: আপনাদের কারুর সঙ্গে বিশু পালের অসদ্ভাব ছিল?

উত্তর: দেখুন, কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে বাস করা যায় না। কার মনে কি আছে জানি না, কিন্তু বাইরে কোনো অসদ্ভাব ছিল না। বিশু ছিল দিলদরিয়া মেজাজের লোক, দলের লোককে সে ঘরের লোক বলে মনে করত। এমন অমায়িক চরিত্র দেখা যায় না।

প্রশ্ন: বিশু পালের চরিত্রে কোনো দোষ ছিল না?

উত্তর: একটু আধটু দোষ কার না থাকে? ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড়। বিশু মরে গেছে, কিন্তু আমি গলা ছেড়ে বলতে পারি সে উঁচু মেজাজের সজ্জন ব্যক্তি ছিল। যারা তার দলে কাজ করেছে তারা সপরিবারে কাজ করেছে। সমস্ত থিয়েটারটাই একটা পারিবারিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন আমাদের সকলের এজমালি থিয়েটার। এখন সে মরে গেছে, এরপর কী হবে জানি না।

প্রশ্ন: আচ্ছা, এবার আপনার ঘরের কথা কিছু জিজ্ঞেস করি। আপনার পরিবারে কে কে আছে?

উত্তর: বুড়ি পিসি আছেন। আমার স্ত্রী শান্তি আছে আর একটি মেয়ে আছে। মেয়ে স্কুলে পড়ে। শান্তি আমাদের থিয়েটারে গান বাজনা শেখায়।

প্রশ্ন ঃ তিনি আজ আসেন নি?

উত্তব ঃ না। নতুন নাটকেব যখন মহড়া আবম্ভ হয় তখন সে আসে, নাচ-গান শেখায়, নাটক একবাব চালু হলে তাব কাজ থাকে না, তখন আব বড় একটা আসে না। বাড়িতে একটা নাচ-গানেব কোচিং ক্লাস খুলেছে তাইতে শেখায়।

প্রশ্ন ঃ আপনি থিযেটাবে যোগ দেবাব আগে কোনো কাজ কবতেন কি?

উত্তব ঃ হ্যাঁ, আমি মুষ্টিযোদ্ধা ছিলাম। একবাব ভাবতেব মিডল-ওয়েট চাম্পিযান হযেছিলাম। একটা জিমনেসিযামে বক্সিং শেখাতাম। কিন্তু থিযেটাবেব শখ ববাববই ছিল একটা সুযোগ পেযে চলে এলাম।

প্রশ্ন ঃ আজ স্টেজেব ওপব বিশু পালেব সঙ্গে আপনাব মল্লযুদ্ধ হযেছিল তখন আপনি বিশু পালেব শবীবে কোনো দুর্বলতা লক্ষ্য কবেছিলেন

উত্তব ঃ না। ঠিক অন্য দিনেব মত।

প্রশ্ন ঃ কখন জানতে পাবলেন বিশু পালেব মৃত্যু হযেছে?

উত্তব ঃ আমি জানতে পাবিনি। লাইট অফ হযে যাবাব পব আমি আব সুলোচনা পিছন দিকেব দোবেব বাইবে দাঁড়িযে ছিলাম আলো জ্বললে স্টেজে এসে অ্যাকটিং আবম্ভ কবলাম এই সময় বিশুব মাটি থেকে উঠে আমাব পিঠে ছুবি মাববাব কথা কিন্তু বিশু উঠল না। তাবপবই সুলোচনা চীৎকাব কবে তাব ওপব ঝাঁপিযে পড়ল। তখন আমি বুঝতে পাবলাম।

প্রশ্ন ঃ এব বেশি আপনি কিছু জানেন না, আচ্ছা আজ আপনি বাড়ি যান। যদি নতুন কিছু মনে পড়ে জানাবেন।

সুলোচনা। বযস ৩৫। জীবিকা নাট্যাভিনয। ঠিকানা * * * শ্যামবাজাব উত্তব কলিকাতা।

সুলোচনা মুখেব বঙ অনেকটা পবিষ্কাব কবেছে তবু কানে ও গলায় কিছু পেন্ট লেগে আছে। তাব গাযেব বঙ ফবসা শবীবেব গড়ন ভাল কিন্তু আকস্মিক বিপর্যয়ে একেবাবে যেন ভেঙে পড়েছে। অফিস ঘবে এসে মাথা নিচু কবে সামনে চেযাবে সে বসে পড়ল, তাবপব নিজেই প্রথমে প্রশ্ন কবল কে একাজ কবল দাবোগাবাবু?

উত্তবে দাবোগা প্রশ্ন কবলেন কোন কাজ?

সুলোচনাব চোখ দাবোগাব মুখেব ওপব স্থিব হল গলাব স্ববে তীক্ষ্ণতা এল। সে বলল আপনি জানেন না কোন কাজ? ওব শবীবে কোনো বোগ ছিল না ওব মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। কেউ ওকে খুন কবেছে।

প্রশ্ন ঃ এ বিষযে এখনো ডাক্তাবেব বিপোর্ট পাওয়া যাযনি তবে আপনাব অনুমান সত্যিও হতে পাবে। যদি সত্যি হয কে খুন কবেছে আপনি বলতে পাবেন?

উত্তব ঃ তা কি কবে বলব। কিন্তু ওব কোনো শত্রু ছিল না।

প্রশ্ন ঃ শত্রু না থাকলেও বিশু পালেব মৃত্যুতে অনেকেব লাভ ছিল। যাদেব উদ্দেশ্যে উনি লাইফ ইনসিওব কবেছিলেন তাঁব মৃত্যুতে তাদেব সকলেবই লাভ নয কি?

উত্তব ঃ তা সত্যি। কিন্তু এমন কে আছে কযেকটা টাকাব জন্যে চিবজীবনেব

উপকারী বন্ধুকে খুন করবে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কাউকে সন্দেহ করেন না?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ বাইরের কেউ হতে পারে না?

উত্তর ঃ বাইরের লোক! তা জানি না। তিনি থিয়েটারের বাইরের অনেক লোককে চিনতেন, কার মনে কী আছে কেমন করে জানব?

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা যাক। আপনার সঙ্গে বিশুবাবুর কতদিনের পরিচয়?

উত্তর ঃ প্রায় পাঁচ বছর।

প্রশ্ন ঃ কোথায় পরিচয় হয়েছিল? কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল?

উত্তর ঃ এই থিয়েটারে পরিচয় হয়েছিল। ব্রজদুলালবাবু আগে থাকতে আমাকে চিনতেন, তিনিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ আগেও থিয়েটার করতেন নাকি?

উত্তর ঃ নিয়মিত নয়, মাঝে মাঝে করতাম।

প্রশ্ন ঃ আপনার পারিবারিক পরিস্থিতি কিছু জানতে চাই।

উত্তর ঃ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। কম বয়সে বিধবা হয়েছিলুম। থিয়েটারের দিকে ঝোঁক ছিল। সুযোগ পেয়ে চলে এলুম।

প্রশ্ন ঃ এ থিয়েটারে আসার পর থেকে বিশুবাবুর সঙ্গে আছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। বিয়ে হয়নি, কিন্তু উনিই আমার স্বামী।

প্রশ্ন ঃ বাপের বাড়ির সঙ্গে আর আপনার কোনো সম্বন্ধ নেই?

উত্তর ঃ না। আমার মা বাবা নেই, দাদা খবর রাখেন না।

প্রশ্ন ঃ ডাক্তার অমল পালের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?

উত্তর ঃ ভাল। সে তার দাদাকে শ্রদ্ধা করত। বাড়িতে বড় একটা আসত না, দরকার হলে এখানে এসে দাদার সঙ্গে দেখা করত।

প্রশ্ন ঃ কিসের দরকার টাকার?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। বেশির ভাগই টাকা। ওর ডাক্তারী ভাল চলে না। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে

প্রশ্ন ঃ বিশু পালের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এখন কে পাবে আপনি জানেন?

উত্তর ঃ যতদূর জানি উনি উইল করে যাননি। স্থাবর সম্পত্তির কথাও কখনো শুনিনি। ব্যাংকে কিছু টাকা আছে, আর মোটর গাড়িটা আছে। ব্যাংকের টাকা কে পাবে তা জানি না, তবে গাড়িটা আমার নামে আছে, সম্ভবত আমার নামেই থাকবে।

প্রশ্ন ঃ এবার শেষ প্রশ্ন। আজ অভিনয়ের সময় এমন কিছু দেখেছেন কিম্বা শুনেছেন কি যা আমাদের কাজে লাগতে পারে?

সুলোচনা একটু চিন্তা করে বলল, 'সন্দেহজনক কিছু নয়, তবে সোমরিয়াকে উইংসের বাইরে এক কোণে লুকিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। সে মাঝে মাঝে ভিতরে এসে থিয়েটার দেখে।

প্রশ্ন ঃ সোমরিয়া কে?

উত্তর ঃ দারোয়ান প্রভু সিংএর বোন।

ইন্সপেক্টর ঃ আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত।

মণীশ ভদ্র। বয়স—২৯। জীবিকা—থিয়েটারের আলোকযন্ত্র পরিচালনা। ঠিকানা * * আমহার্স্ট স্ট্রীট।

মণীশ ঘরে ঢুকে একবার কব্জির ঘড়ির দিকে তাকালো। রেডিয়াম লাগানো ঘড়ি, অন্ধকারেও সময় দেখা যায়। সে চেয়ারে বসে বলল, 'পৌনে এগারটা। দারোগাবাবু, বড্ড রাত হয়ে গেছে, একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন? হোটেল সব বন্ধ হয়ে গেছে, আজ আর বোধহয় কিছু জুটবে না—'

মাধববাবু বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার এজাহার পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না।'

মণীশ বলল, 'আমি একলা নয়, বৌও আছে।—দু'জনের এজাহার একসঙ্গে নিলে হয় না?'

মাধববাবু বললেন, 'না তা হয় না। আপনারা দু'জন দু' জায়গায় ছিলেন।—আচ্ছা, বলুন দেখি, আলো নেভাবার পর আপনি কী করলেন?'

উত্তর ঃ সুইচের ওপর হাত রেখে ঘড়ির পানে তাকিয়ে রইলাম, পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পরে সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম।

প্রশ্ন ঃ আপনার বোর্ডে অনেকগুলি সুইচ, কোনটা কোথাকার সুইচ সব আপনার নখদর্পণে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তবু সাবধান থাকা ভাল, তাই এই দৃশ্যে সুইচে হাত রাখি।

প্রশ্ন ঃ ঠিক পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড কেন?

উত্তর ঃ বিশুবাবু সময় ধার্য করে দিয়েছিলেন, পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড হাউস অন্ধকার থাকবে।

প্রশ্ন ঃ আপনার একজন সহকারী আছে না?

উত্তর ঃ আছে। কাঞ্চন সিংহ। সে আমার সঙ্গে সুইচ বোর্ডে ছিল না। তার মাথা ধরেছিল--

প্রশ্ন ঃ তার প্রায়ই মাথা ধরে?

মণীশ চুপ করে রইল।

প্রশ্ন ঃ সে কোথায় ছিল আপনি জানেন

উত্তর ঃ পরে শুনেছি সে অফিস ঘরে ঘুমোচ্ছিল।

প্রশ্ন ঃ কার মুখে শুনলেন?

উত্তর ঃ তার নিজের মুখে।

প্রশ্ন ঃ ও। বিশুবাবুর সঙ্গে আপনি কতদিন কাজ করছেন?

উত্তর ঃ প্রায় চার বছর।

প্রশ্ন ঃ আপনার স্ত্রীও?

উত্তর ঃ না, তখন আমার বিয়ে হয়নি। মালবিকা থিয়েটারে যোগ দিয়েছে বছর খানেক, এই নাটক ধরবার পর থেকে। বিশুবাবু উত্তরার পার্ট করার জন্যে কম বয়সী মেয়ে খুঁজছিলেন; শেষ পর্যন্ত মালবিকাকে রাখেন।

প্রশ্ন ঃ আপনার নামে বিশুবাবু জীবনবীমা করেননি?

উত্তর ঃ না। আমি বলেছিলাম জীবনবীমা চাই না, মাইনে বাড়িয়ে দিন। তা তিনি জীবনবীমাও করলেন না, মাইনেও বাড়ালেন না। সাতশো টাকা ছিল, সাতশো টাকাই রইল।

প্রশ্ন ঃ তার বদলে বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ি

কিনে দিলেন?

উত্তর ঃ গাড়ির একটা ইতিহাস আছে। বিশুবাবু যখন মাইনে বাড়িয়ে দিলেন না তখন আমি বাইরে কাজ খুঁজতে লাগলাম। এই নাটক আরম্ভ হবার কয়েক-দিন আগে আমি মাদ্রাজ থেকে একটা ভাল অফার পেলাম। একটা বিখ্যাত সিনেমা কোম্পানী আলোকশিল্পী চায়; মাইনে দেড় হাজার, তাছাড়া বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি। বিশুবাবুকে গিয়ে চিঠি দেখালাম। তিনি বে-কায়দায় পড়ে গেলেন, কিন্তু তবু নিজের জিদ ছাড়লেন না। আমাকে গাড়ি কিনে দিলেন। আর মালবিকাকে যে একশো টাকা হাত খরচ হিসেবে দিতেন তা বাড়িয়ে দু'শো টাকা করে দিলেন। তখন আমি মাদ্রাজের অফারটা ছেড়ে দিলাম। দেশ ছেড়ে কে বিদেশে যেতে চায়?

দারোগাবাবু বললেন, 'তা বটে। তাহলে আপনি বিশু পালের মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো হদিস দিতে পারেন না? আচ্ছা এবার তাহলে আপনার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিন।'

মালবিকা ভদ্র। বয়স -২০। জীবিকা—নাট্যাভিনয়। ঠিকানা * * আমহার্স্ট স্ট্রীট।

নোট ঃ বিশু পালের আকস্মিক মৃত্যুতে সাক্ষী প্রথমটা খুব শক্ খেয়েছিল, এখন সুস্থ হয়েছে। বয়স কম, দেখতেও সুন্দরী; কিন্তু চোখের ঋজু দৃষ্টি ও চিবুকের মজবুত গড়ন থেকে চরিত্রের দৃঢ়তা অনুমান করা যায়।

প্রশ্ন ঃ নাটকে আপনি উত্তরার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নাটকের শেষ দৃশ্য পর্যন্ত আপনার অভিনয় আছে?

উত্তর ঃ না। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে আমার অভিনয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নাটক শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার স্বামীকে থাকতে হয়, তাই আমিও থাকি।

প্রশ্ন ঃ আজ যখন শেষ অঙ্কে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

উত্তর ঃ সাধারণ অভিনেত্রী মেয়েদের জন্যে একটা আলাদা সাজঘর আছে। আমি সেই সাজঘরে গায়ের মুখের রঙ সবেমাত্র তুলতে আরম্ভ করেছিলুম।

প্রশ্ন ঃ সেখানে আর কেউ ছিল?

উত্তর ঃ লক্ষ্য করিনি। একবার বোধহয় নন্দিতাদিদি ঘরে এসেছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনি কবে থেকে অভিনয় করছেন?

উত্তর ঃ এই নাটকের আরম্ভ থেকে। প্রায় বছর ঘুরতে চলল।

প্রশ্ন ঃ অভিনয়ের দিকে আপনার ঝোঁক আছে?

উত্তর ঃ খুব বেশি নয়। আমার স্বামী চেয়েছিলেন, কিছু টাকাও আসছিল, তাই থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলুম।

প্রশ্ন ঃ আপনি বোম্বাই কিম্বা মাদ্রাজে গিয়ে সিনেমায় অভিনয় করলে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারতেন। করেন নি কেন?

উত্তর ঃ বাংলা দেশের বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া আমি গেরস্ত ঘরের মেয়ে, ঘরকন্না করতেই ভালবাসি। আমার মা সহমৃতা হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ সহমৃতা! আজকালকার দিনে—!

উত্তর ঃ বাবা মারা যাবার এক ঘণ্টা পরে মা হার্টফেল করে মারা যান।

প্রশ্ন ঃ ও—বুঝেছি। আচ্ছা, বিশু পাল কেমন লোক ছিলেন?

উত্তর ঃ খুব মিশুকে লোক ছিলেন। দরাজ হাত ছিল। সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন।

প্রশ্ন ঃ মেয়েদের সঙ্গেও?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। কিন্তু কখনো কোনো রকম বেচাল দেখান নি।

ইন্সপেক্টর ঃ আচ্ছা, এবার আপনি বাড়ি যান।

৮. কাঞ্চন সিংহ। বয়স—২৬। জীবিকা—থিয়েটারের আলোকশিল্পীর সহকারী। ঠিকানা—মাণিকতলা স্ট্রীটের একটি মেস।

নোট ঃ লোকটির ভাবভঙ্গী একটু খ্যাপাটে গোছের; মাঝে মাঝে আবোল তাবোল এলোমেলো কথা বলে। কতখানি খাঁটি কতখানি অভিনয় বলা যায় না।

প্রশ্ন ঃ আপনি হিপি, না বিট্‌লে, না অবধূত?

উত্তর ঃ আজ্ঞে আমি বাঙালী।

প্রশ্ন ঃ আপনার সাজপোষাক বাঙালীর মত নয়। দাড়ি গোঁফও প্রচুর। কোনো কারণ আছে কি?

উত্তর ঃ আমার ভাল লাগে। তাছাড়া থিয়েটার করার সময় পরচুলো পরতে হয় না।

প্রশ্ন ঃ আপনি এখানে আসার আগে কী কাজ করতেন?

উত্তর ঃ বাউণ্ডুলে ছিলাম। বাপ কিছু টাকা রেখে গিয়েছিল, মেসে থাকতাম আর শখের থিয়েটার করতাম।

প্রশ্ন ঃ তাহলে চাকরিতে ঢুকলেন কেন?

উত্তর ঃ বাপের পয়সায় শাক-চচ্চড়ি খাওয়া চলে, রসগোল্লা খাওয়া চলে না।

প্রশ্ন ঃ তাহলে রসগোল্লা খাওয়ার জন্যেই চাকরিতে ঢুকেছিলেন?

উত্তর ঃ শুধু রসগোল্লা নয়, অন্য মতলবও ছিল। জানেন, আমি খুব ভাল অ্যাক্ট করতে পারি। শিবাজির পার্ট, ঔরংজেবের পার্ট প্লে করেছি। বিশুবাবু আমার চেহারা দেখে চাকরিতে নিলেন, কিন্তু কাজ দিলেন আলো জ্বালা আর আলো নেভানোর। যদি অভিনয় করতে দিতেন আগুন ছুটিয়ে দিতাম।

প্রশ্ন ঃ তা বটে। এখন বলুন দেখি, আলো নেভানোর সময় আপনি সুইচের কাছে ছিলেন না কেন?

উত্তর ঃ আলো নেভানোর সময় সুইচবোর্ডে একজন লোকেরই দরকার হয়। মণীশদা ছিলেন, তাই আমি—

প্রশ্ন ঃ কোথায় ছিলেন?

উত্তর ঃ মাথা ধরেছিল, তাই আমি অফিস ঘরে গিয়ে টেবিলে মাথা রেখে একটু বসে ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ স্টেজের ওপর খুন হল। অসময়ে প্লে বন্ধ হয়ে গেল...এ সব কিছুই জানতে পারেন নি?

উত্তর ঃ এঁ—একটু ঝিমকিনি এসে গিয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনি নেশাভাঙ করেন?

উত্তর ঃ নেশা ভাঙ! নাঃ, পয়সা কোথায় পাব!

প্রশ্ন ঃ কোন্‌ নেশা করেন?

উত্তর ঃ এঁ—নেশা করি না—মাঝে মাঝে ভাঙ্‌ খাই। মানে - -

প্রশ্ন ঃ মানে মারিওয়ানা সিগারেট খান। কে যোগান দেয়? পান কোথায়?

উত্তর ঃ যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। ঠেলাগাড়িতে পানের দোকানে। আপনার চাই?

ইন্সপেক্‌টর ঃ আপনি এখন যেতে পারেন। মেস ছেড়ে কোথাও যাবেন না। কলকাতাতেই থাকবেন।

দাশরথি চক্রবর্তী। বয়স ৪৫। জীবিকা -নাট্যাভিনয়। ঠিকানা বেহালা।

ভাল মানুষের মতন ভাবভংগী, কিন্তু কথা বলার ধরন সোজা নয়। সরলভাবে চোখ মিট্‌মিট্‌ করে তাকায়, কিন্তু চোখের গভীরে প্রচ্ছন্ন দুর্ষ্টতার ইঙ্গিত লোকটি কমিক অ্যাক্‌টর, খোঁচা দিয়ে কথা বলতে পারে। কিন্তু খোঁচা বুঝতে একটু সময় লাগে।

প্রশ্ন ঃ আপনি গোড়া থেকে বিশুবাবুর সঙ্গে ছিলেন?

উত্তর ঃ ছিলাম। বিশুর সঙ্গে যথেষ্ট সদ্ভাবও ছিল। তাই বুঝতে পারছি না যাবার সময় সে আমাকে এমনভাবে দয়ে মজিয়ে গেল কেন?

প্রশ্ন ঃ সেটা কি রকম?

উত্তর ঃ ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেছে। এত রাতে যদি ট্যাক্সি না পাই পেটে কিল মেরে এখানেই শুয়ে থাকত হবে।

ইন্সপেক্‌টর ঃ আপনি বেহালায় থাকেন তো? কিছু ভাববেন না, আমি পুলিস ভ্যানে আপনাকে আর আপনার স্ত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

দাশরথি ঃ ধন্যবাদ। এবার যত ইচ্ছে প্রশ্ন করুন।

প্রশ্ন ঃ বিশু পালের সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল?

উত্তর ঃ কারুর সঙ্গে আমার অসদ্ভাব নেই। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা যায় না।

প্রশ্ন ঃ বিশু পালের কোন শত্রু ছিল?

উত্তর ঃ শত্রুর কথা শুনিনি। তবে কি জানেন, যেখানে মেয়েমানুষ সেখানেই গণ্ডগোল।

প্রশ্ন ঃ তার মানে? সুলোচনার কথা বলছেন?

উত্তর ঃ (ক্ষণেক নীরব থাকার পর) সুলোচনা খুব ভাল অভিনয় করে, কিন্তু সে খানদানী অ্যাক্‌ট্রেস নয়, গেরস্তঘরের মেয়ে। ব্রজদুলাল প্রথম ওকে মানে--থিয়েটারে নিয়ে আসে। তারপর বিশুর সঙ্গে সুলোচনার জোটপাট হয়ে গেল—

প্রশ্ন ঃ ও বুঝেছি। তা নিয়ে বিশুবাবুর সঙ্গে ব্রজদুলালবাবুর কোনো মনোমালিন্য হয়নি?

উত্তর ঃ অমন হেরফের হামেশাই হয়ে থাকে, কেউ গায়ে মাখে না। কে যাবে কেউটে সাপের লেজ মাড়াতে।

প্রশ্ন ঃ হুঁ। অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিশু পালের ঘনিষ্ঠতা ছিল?

উত্তর ঃ তা কি করে জানব। কেউ তো ঢাক পিটিয়ে এসব কাজ করে না।

অবশ্য থিয়েটারে নানা রকম মেয়ের যাতায়াত আছে; কোন্ অ্যাক্টরের কখন কোন্ মেয়ের ওপর নজর পড়বে কে বলতে পারে। এই যে দারোয়ান প্রভুনারায়ণের একটা বোন আছে—সোমরিয়া, উচক্কা বয়স, রূপও আছে। সে থিয়েটারে চাকরানীর কাজ করে; কারুর নজর এড়িয়ে চলা তার স্বভাব নয়। বিশুও সকাল বিকেল নিয়ম করে থিয়েটার তদারক করতে আসত—

প্রশ্ন ঃ অর্থাৎ, সোমরিয়ার সঙ্গে বিশু পালের—?

উত্তর ঃ ভগবান জানেন। তবে সুযোগ সুবিধে সবই ছিল।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, ও কথা যাক্।—বিশু পালের সঙ্গে বাইরের কোনো লোকের শত্রুতা ছিল?

উত্তর ঃ এক থিয়েটারের অধিকারীর সঙ্গে অন্য থিয়েটারের অধিকারীর রেষারেষি থাকে। বিশুর থিয়েটার খুব ভাল চলছিল, অনেকের চোখ টাটিয়েছিল; একে যদি শত্রুতা বলেন, বলতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ এবার নিজের কথা বলুন।

উত্তর ঃ নিজের কথা আর কি বলব? ছেলেবেলা থেকে থিয়েটারে ঢুকেছি, অনেক ঘাটের জল খেয়েছি। স্ত্রীকে নিয়ে বেহালায় থাকি, ছেলেপুলে নেই। বেশি উচ্চাশাও নেই। যেমনভাবে দিন কাটছিল তেমনিভাবে কেটে গেলেই খুশী থাকতাম। কিন্তু বিশু মরে গেল, ওর দল টিকবে কিনা কে জানে। হয়তো ভেঙে যাবে, তখন আবার অন্য দলে গিয়ে ভিড়তে হবে।

প্রশ্ন ঃ আজ দ্বিতীয় অঙ্কে আপনার আর আপনার স্ত্রীর অভিনয় শেষ হয়ে গিয়েছিল, বাড়ি যান নি কেন?

উত্তর ঃ দ্বিতীয় অঙ্কের পর বাড়ি যাব বলে বেরুচ্ছি, বিশু বলল, 'একটু থেকে যাও, তোমার সঙ্গে কথা আছে। নাটক শেষ হলে বলব।'

প্রশ্ন ঃ কি কথা?

উত্তর ঃ তা জানি না, বিশু বলেনি।

প্রশ্ন ঃ সেখানে অন্য কেউ উপস্থিত ছিল

উত্তর ঃ না, আমরা একলা ছিলাম। বিশুর ড্রেসিংরুমে কথা হয়েছিল।

ইন্সপেক্টর ঃ হুঁ। আজ এই পর্যন্ত। আপনার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিন।

নন্দিতা চক্রবর্তী। বয়স—৪৪। জীবিকা—নাট্যাভিনয়। ঠিকানা- বেহালা।

নোট ঃ মহিষমর্দিনী চেহারা, দাশরথির চেয়ে মুঠিখানেক মাথায় উঁচু। লালচে চোখ, বড় বড় দাঁত, কিন্তু গলার স্বর মিষ্টি। আচরণ শিষ্ট ও শালীন।

প্রশ্ন ঃ আপনার স্বামী নামকরা কমিক অ্যাক্টর, আপনিও কি কমিক অ্যাক্টিং করেন?

উত্তর ঃ ও মা, অ্যাক্টিংএর আমি কি জানি। আগে আমি থিয়েটারের পোষাক আশাকের ইন্-চার্জ ছিলুম। একদিন বিশুবাবু আমাকে একটা ছোট পার্টে নামিয়ে দিলেন। সেই থেকে (হেসে) আমার চেহারার মানান সই পার্ট থাকলে আমি করি।

প্রশ্ন ঃ বিশুবাবু কেমন লোক ছিলেন?

উত্তর ঃ দিল্‌দরিয়া লোক ছিলেন। টাকা তাঁর হাতের ময়লা ছিল, যেমন

রোজগার করতেন তেমনি খরচ করতেন। কিন্তু মদ খেতেন না, বদখেয়ালি ছিল না।

প্রশ্ন ঃ প্রভুনারায়ণের বোনের সঙ্গে কিছু ছিল?

উত্তর ঃ ও সব বাজে গুজব, আমি বিশ্বাস করি না।

প্রশ্ন ঃ সুলোচনা কেমন মানুষ?

উত্তর ঃ (একটু থেমে) সুলোচনা ভাল অভিনয় করে, মেয়েও ভাল, কিন্তু মনের কথা কাউকে বলে না। ভারি চাপা প্রকৃতির মেয়ে।

প্রশ্ন ঃ আর মালবিকা?

উত্তর ঃ মালবিকা ছেলেমানুষ, কিন্তু ওর মনে ছুঁই-ছুং আছে। ভালভাবে কারুর সঙ্গে মেশে না, একটু দূরত্ব রেখে চলে। তবে মেয়ে ভাল।

প্রশ্ন ঃ আর ওর স্বামী?

উত্তর ঃ মণীশ? একটু গম্ভীর প্রকৃতি, কিন্তু ভাল ছেলে। আর ওর কাজের তুলনা নেই, আলো ফেলে নাটকের চেহারা বদলে দিতে পারে। আগে সাঁতারু ছিল, কিন্তু সাঁতারে তো পয়সা নেই, তাই থিয়েটারে ঢুকেছে।'

প্রশ্ন ঃ আর ব্রজদুলালবাবু?

উত্তর ঃ মদ-টদ খান বটে কিন্তু ভারি বিজ্ঞ লোক। এক সময় মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন, এখনো গায়ে অসুরের শক্তি। ওঁর স্ত্রী শান্তিও ভারি গুণের মেয়ে, নাচতে জানে, গাইতে জানে, গানে সুর দিতে জানে। এখানকার মিউজিক্ মাস্টার।

প্রশ্ন ঃ স্বামী-স্ত্রীতে সদ্ভাব আছে?

উত্তর ঃ তা আছে বৈ কি। তবে যে-যার নিজের কাজে থাকে, কেউ কারুর বড় একটা খবর রাখে না।

প্রশ্ন ঃ আজ যখন আলো নেভানো হয় আপনি কোথায় ছিলেন?

উত্তর ঃ আমার স্বামী আর আমি স্টেজের পিছন দিকে একটা বেঞ্চিতে বসেছিলুম।

ইন্সপেক্টর একজন জমাদারকে ডেকে বললেন, 'ইনি বেহালায় থাকেন। এঁকে আর এঁর স্বামীকে পুলিসের গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দাও।'

কালীকিঙ্কর দাস। বয়স—৪০। জীবিকা—থিয়েটারের প্রম্পটার। ঠিকানা—কৈলাস বোস লেন।

অসমাপ্ত

জীবনকথা

গ্রন্থসূচী

ব্যোমকেশের কথা

ব্যোমকেশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

জী ব ন ক থা

বংশ পরিচয় : বাল্যকাল ।। ১৩০৫ সনের ১৭ই চৈত্র, ইংরাজী ৩০ মার্চ ১৮৯৯, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা চতুর্থী, বিশাখা নক্ষত্র, সন্ধ্যা ৭·১৪ মিনিটে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর শহরে মাতামহালয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। মাতামহ বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় জৌনপুরে মুন্সেফ ছিলেন।

শরদিন্দুর পিতার নাম তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা বিজলীপ্রভা দেবী।

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের আদি নিবাস কলকাতার উত্তরে বরানগর কুঠিঘাট অঞ্চলে। শরদিন্দুর পিতামহ শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পূর্ণিয়া কোর্টের সেরেস্তাদার। শ্রীনাথের ছোট ভাই গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পূর্ণিয়ার বিশিষ্ট উকিল। তারাভূষণের চৌদ্দ বছর বয়সে শ্রীনাথের মৃত্যু হয়: তখন গোবিন্দ পুত্রস্নেহে ভ্রাতুষ্পুত্রকে পালন করেন।

১৮৯৩ সালে আইন পাশ করে তারাভূষণ পূর্ণিয়াতেই ওকালতি শুরু করেন; পরে মাসে মাত্র পঞ্চাশ টাকা বাঁধা আয়ে বানালি স্টেটের উকিল করে গোবিন্দ তাঁকে মুঙ্গেরে পাঠান। কিছুকাল পরে তারাভূষণ স্টেট থেকে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার অনুমতি পান এবং শীঘ্রই ওকালতিতে বিপুল প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। একটানা পঞ্চাশ বছর তিনি মুঙ্গের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন।

তারাভূষণ ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন। জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর-বাড়িতে সরলা দেবীর সঙ্গে একই সঙ্গে তিনি গান শিখতেন। গানের ভিতর দিয়েই তাঁর মনে সাহিত্যপ্রীতি দেখা দেয়।

১৯৪৩ সালে ৭২ বছর বয়সে তারাভূষণ পরলোকগমন করেন।

বিজলীপ্রভা দেবীর ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ। তিনি বই পড়তে খুব ভালবাসতেন। বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সব বই ছাড়াও দীনবন্ধু, মাইকেল, হেমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের গ্রন্থাবলীও ছিল। এ ছাড়া ডাকে বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী এবং হিতবাদী আসত। বিজলীপ্রভা এই সব বই ও পত্রিকা প্রতিদিন দুপুরে নিয়মিত পড়তেন। মা-ই পুত্রকে মেঘনাদ বধ পড়ে শুনিয়েছিলেন; পুত্রের বয়স তখন তের-চৌদ্দ বছর।

ছাত্র জীবন : সাহিত্য-প্রীতি ।। দশ বছর বয়সে শরদিন্দু মুঙ্গের ট্রেণিং অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন; সেকেন্ড ক্লাসে উঠে ভর্তি হলেন মুঙ্গের জেলা স্কুলে। স্কুলে পড়ার চেয়ে ফুটবল ও হকি খেলাতেই তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল।

জেলা স্কুলের শিক্ষক পূর্ণ চক্রবর্তী ছাত্রদের লেখায় খুব উৎসাহ দিতেন। তিনি সর্বদাই বলতেন—কবিতা লেখো। তাঁরই আগ্রহে শরদিন্দু একটি কবিতা লেখেন। এই তাঁর প্রথম লেখা—১৯১৩ সাল। শরদিন্দুর বয়স তখন চৌদ্দ বছর।

জেলা স্কুল থেকে ১৯১৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে শরদিন্দু কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন। কলকাতায় প্রথমে কিছুদিন তিনি কেশব সেন স্ট্রীটের ওয়াই. এম. সি. এ-তে ছিলেন; তারপর বাদুড়বাগানের একটি মেসে এবং শেষে ৯৩, হ্যারিসন রোডের একটি মেসের তিনতলায় ছাদের একটি ঘরে ছোট ভাইএর সঙ্গে।

হ্যারিসন রোডের মেসের এই ঘরটিই সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের প্রথম যুগের আস্তানার পটভূমি বলা যেতে পারে।

ওয়াই. এম. সি. এ-তে অজিত সেন নামে কাব্য সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগী এক যুবকের সঙ্গে শরদিন্দুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। অজিতের আগ্রহে পাশের এক প্রেস থেকে শরদিন্দুর প্রথম বই 'যৌবনস্মৃতি' নামে কবিতাগ্রন্থ ছাপা হয়ে বেরয় ১৩২৫ সালে। বাইশটি ছোট ছোট কবিতার সমষ্টি; গ্রন্থকার নিজেই প্রকাশক, মূল্য পাঁচ আনা। 'প্রবাসী'তে (অগ্রহায়ণ ১৩২৮) এই বইএর সমালোচনা করেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী। সমালোচক লিখেছেন : "ভূমিকায় লেখক স্বয়ং ঠিকই বলিয়াছেন 'ইহাতে অসাধারণত্ব কিছুই নাই'। না থাকুক, তবুও ছন্দোচাতুর্য ও ভাবমাধুর্য সব কবিতা-গুলিকেই বেশ সুখপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। ভাষাও সর্বত্রই সুললিত ও সুমার্জিত। বেশীর ভাগ কবিতাতেই মৃদু বিষাদের করুণ আভাস ধ্বনিয়া উঠিয়াছে—যৌবনের স্মৃতিই বোধহয় তাহার কারণ। হাল্কা হাসির সুরেও দুই-তিনটি কবিতা রচিত। ইঁহার কবিতাতে চিন্তার গভীরতার বিশেষ কোন পরিচয় নাই, তবে সূক্ষ্ম রসানুভূতি আছে। প্রকৃতি-বর্ণনায় কবির নিপুণতা সুস্পষ্ট। যৌদন, ছেলেমানুষ, তড়াগ, আব কতদূর, যৌবন, আলোক-আঁধার, সঙ্গীহীন, তারা, এই কয়টি কবিতা আমাদের বেশ লাগিয়াছে। তড়াগের শেষ তিনটি স্তবক তুলিয়া দেওয়া হইল—

ক্রমে সন্ধ্যাকালে—
সূর্য যবে রক্ত মুখে নেমে যায় ধরণীর নীচে
লুক্কায়িত অন্ধকার সুভ্রূকুটি ছুটে আসে পিছে,
অস্ফুট ভীতির স্বরে পাখীগণ দিয়ে উঠে সাড়া,
গোধূলি-মলিন মুখে অশ্রুজলে হাসে সন্ধ্যাতারা
আকাশের ভালে
তখন তোমার [তড়াগের]—
কূলে কূলে কৃষ্ণরেখা হয়ে আসে স্পষ্টতর,
শীর্ণ তালবৃক্ষছায়া কাল জলে কাঁপে থর থর,
শীতবায়ু-স্পর্শে গাত্রে শিহরণ উঠে অহরহ;—
শীতল স্মৃতিতে যেন মনে কার মরণ-বিরহ
জাগে বার বার।
নিশা তমোময়ী—
তোমার সজলবুকে পূরে দেয় নিবিড় আঁধার,
তারাতে ছায়াতে করে দূরত্বের দ্বিগুণ বিস্তার;
তুমি দৃষ্টিহীন চক্ষু মেলে থাক অসীমের পানে,
বুকের শূন্যতা ভরে নিতে চাও অন্ধকার দানে
বিরাট প্রণয়ী।"

ছাত্রাবস্থায় ১৯১৮ সালের ২৯শে জুন (১৪ই আষাঢ়) মুঙ্গেরের উকিল জীবন-কৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী পারুল দেবীর সঙ্গে শরদিন্দুর বিবাহ হয়। পাত্রীর বয়স তখন এগার।

১৯১৯ সালে বি. এ. পাশ করে শরদিন্দু ল কলেজে ভর্তি হন। পিতার ইচ্ছাতেই

আইন পড়া; কিন্তু শরদিন্দুর আইনের দিকে আদৌ ঝোঁক ছিল না। পড়া ছেড়ে তিনি মুঙ্গেরে ফিরে আসেন। পরবর্তী আড়াই বছর বাড়িতে বসে মনের আনন্দে কবিতা ও গল্প লেখা, থিয়েটার করা আর ফুটবল খেলা। ফুটবলে ছিল প্রচণ্ড নেশা। তিনি ছিলেন দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড ও ক্যাপ্টেন।

পিতার আগ্রহে শরদিন্দু আবার পড়তে রাজী হন; এবার পাটনায় ভর্তি হলেন। এই সময় ১৯২৫ সালে 'প্লেগ' ও 'রূপসী' নামে দুটি ছোট একপাতার গল্প সচিত্র শিশিরে ছাপা হয়। এরপর সাত-আট বছর আর কোন গল্প বেরয়নি। সাহিত্য তখন অন্যান্য কর্মতৎপরতার একটি অংশ মাত্র।

১৯২৬ সালে পাটনা থেকে আইন পাশ করে পিতার জুনিয়াররূপে শরদিন্দু ওকালতি ব্যবসায় যোগ দেন। কাজে আদৌ মন নেই; বার লাইব্রেরির আড্ডার দিকেই টান বেশী। তখন শরদিন্দুকে গল্পের নেশায় ধরেছে; তিনি সনেট ও গল্প লিখতে থাকেন। কাজে মন নেই দেখে পিতা পুত্রের আশা ছেড়ে দিলেন।

সাহিত্যচর্চা ।। ১৯২৯ সালে ওকালতি ছেড়ে শরদিন্দু সাহিত্যকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৮ সালে বোম্বাই যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি মনের আনন্দে গল্প লিখেছেন; অবসর সময়ে খেলা, থিয়েটার; আর বাণীমন্দিরে কনসার্ট পার্টিতে হারমোনিয়াম বাজাতেন।

গল্প লিখে ডাকে কলকাতায় বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় পাঠাতেন। অপরিচিত নতুন লেখকের লেখা কেউ ছাপত, কেউ ফেরত দিত। এমনও হয়েছে একজনের ফেরত দেওয়া গল্প অন্যে ছেপেছে। বড় বড় মাসিক পত্রিকার পরিচালকগোষ্ঠীর সঙ্গে এইভাবে শরদিন্দুর পরিচয় হয়—বসুমতীর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষের হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসীর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুত সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের জন্যে শরদিন্দুকে বিশেষ 'কোন স্ট্রাগল করতে হয়নি' বলা চলে। মুঙ্গের থেকে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন, গল্প সঙ্গে থাকত; সম্পাদকরা কেউ না কেউ তা নিয়ে নিতেন।

উল্লেখযোগ্য প্রথম গল্প হল 'রক্তসন্ধ্যা' (১৯৩০)। প্রথম গল্প গ্রন্থ 'জাতিস্মর' (১৩৩৯)। প্রথম উপন্যাস 'বিষের ধোঁয়া' (১৩৩৭-১৩৩৯)।

রঙমহলে ডিটেকটিভ মঞ্চাভিনয় উপলক্ষ্যে পাবলিক থিয়েটারের সঙ্গে শরদিন্দুর প্রথম পরিচয় ঘটে।

সেনোলা কোম্পানী তাঁর কয়েকটি পালা—ডিটেকটিভ, উমার বিবাহ ও মিলন-অভিসার রেকর্ড করেন।

বোম্বাই প্রবাস ।। ১৯৩৮ সালে বোম্বে টকিজের কর্ণধার হিমাংশু রায়ের আহ্বানে সিনারিও লেখার কাজ নিয়ে শরদিন্দু বোম্বাই যাত্রা করেন। কলকাতায় এই কাজের জন্যে তাঁকে মনোনীত করেন হিমাংশু রায়ের আত্মীয় সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

১৯৪১ সালের ২৭শে জুন বোম্বে টকিজের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে আচারিয়া আর্ট প্রোডাকশনে বছর দেড়েক কাজ করেন। তারপর থেকে ফ্রী লান্স—১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। সিনারিও লিখে রাখতেন; সিনেমাওলারা পছন্দমত কিনে নিয়ে যেত।

বোম্বাইএ থাকার সময় শরদিন্দুর মন প্রধানত সিনেমাতেই নিবিষ্ট ছিল। সাহিত্য রচনার দিক থেকে এই বছরগুলি একরকম নিষ্ফল বলা যায়। ১৩৪৭ সালে দুটি;

১৩৪৯, ১৩৫০ সালে মাত্র একটি করে গল্প লিখেছেন। প্রকাশকেরা গল্প চেয়েছে দিতে পারেননি। হঠাৎ একদিন তাঁর 'জ্ঞানোদয় হল—এ আমি কি করছি। হংস মধ্যে বকো যথা বসে আছি।' তিনি আবার সাহিত্যক্ষেত্রে ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন। সিনেমা জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তিনি 'ছায়াপথিক' উপন্যাসে লিখেছেন। সিনেমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে শরদিন্দু বোম্বাই থেকে পুণায় আসেন ১৯৫২ সালের ৫ই নভেম্বর। পুণার জলহাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল হওয়ায় পুণাতেই স্থায়ীভাবে বাস করবেন স্থির করেন। ১৯৫৩ সালে বাড়ি তৈরি হল, ১৫ই আগস্ট 'মিথিলা'য় গৃহপ্রবেশ।

শরদিন্দুর জীবনের শেষ কয়েক বছর পুণাতেই কেটেছে। ১৯৭০ সালে ৯ই জুলাই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন; পরে তাঁকে বোম্বাইএ পুত্রের বাসভবনে নিয়ে আসা হয়। ১৩৭৭ সালে ৫ই আশ্বিন, ইংরাজী ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০, মঙ্গলবার সকাল ৮·১৫ মিনিট সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

রচনা প্রসঙ্গ ।। সাহিত্য রচনার রীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে শরদিন্দু ডায়েরীতে লিখেছেন (২৮ ভাদ্র, ১৩৪০) :

"অখণ্ড মনোযোগ না দিলে লেখা ভাল হয় না।

"ফরমাসী বা পরের মন-যোগানো লেখা ভাল হয় না।

"লিখিবার সময় পাঠক খুশী হইবে কিনা একথা ভাবিবে না। নিজের যাহা ভাল বোধ হইবে তাহাই লিখিবে।

"Style দেখাইবার চেষ্টা করিবে না। মনের ভাবটিকে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দিবার চেষ্টা করিবে। তাহা হইলেই style আসিয়া পড়িবে।

"অকারণে একটি শব্দও ব্যবহার করিবে না। রস সৃষ্টিই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য, রস বর্জিত সত্যও সাহিত্য নয়। যাঁহারা কেবল সত্য উদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত তাঁহারা ঋষি হইতে পারেন কিন্তু সাহিত্যিক নহেন।

"জোর করিয়া কোনো রস—যথা হাস্য বা করুণা—ফুটাইবার চেষ্টা করিবে না। বিষয়বস্তুতে যদি সে রসের উপাদান থাকে, রস আপনি ফুটিবে। বিষয়বস্তুর মধ্যেই মনকে নিবিষ্ট রাখিবে।

" Digression অতিশয় বিপজ্জনক; মাঝে মাঝে প্রয়োজন হইলেও যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সারিবে।

"প্রকৃতির বর্ণনা কোথাও দশ পংক্তির বেশী করিবে না। যাহা সকলেই চোখে দেখিতে পায় তাহার দীর্ঘ বর্ণনা করা ক্লান্তিকর।

"বর্ণনীয় বিষয়ের চিত্রটি স্পষ্টভাবে মনের পটে আঁকা না থাকিলে বর্ণনা অস্পষ্ট হইবে। প্রত্যেক দৃশ্যটি visualise করিবে।

"যে চরিত্রটি আঁকিবে তাহাকে উলঙ্গ করিয়া দেখিয়া লইবে। হয়তো সে চরিত্র সম্বন্ধে সব কথা লেখার প্রয়োজন নাই, তবু তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিয়া লওয়া চাই।

"যে বিষয়ে লিখিবে সে বিষয়টি ভাল করিয়া পড়িয়া লইবে—আন্দাজে যাহোক একটা লিখিয়া দিবে না। পাঠকের বুদ্ধি, জ্ঞান ও রসবোধের উপর শ্রদ্ধা রাখিবে। অন্যথা ঠকিতে হইবে।

"সাময়িক রচনা (topical) পুস্তকাকারে বাহির করিবে না। বিরুদ্ধ সমালোচনায় অধীর হইবে না। সাহিত্যক্ষেত্রে কাহারও সহিত মতভেদ হইলে

প্রতিদ্বন্দ্বীর বুদ্ধি-বিবেচনা সম্বন্ধে কখনো কটাক্ষপাত করিবে না। পারতপক্ষে উত্তর দিবে না। যদি নিতান্তই উত্তর দেওয়া প্রয়োজন হয়, ধীর ও সংযতভাবে দিবে।

"বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর্শ বলিয়া জানিবে। তিনি ভিন্ন বাংলায় অন্য আদর্শ নাই।"

নিজের রচনা সম্পর্কে আলোচনা কালে শরদিন্দু ১৯৭০ সনের মার্চ মাসে বলেছিলেন—

"কোনান ডয়েল এবং জ্যাক লণ্ডন-এর লেখা পড়ে জাতিস্মর বা অতীতকাল সম্বন্ধে লেখার অনুপ্রেরণা পাই। পড়ে মনে হয়েছিল, দেখি আমিও লিখতে পারি কিনা। All my life I have had an awareness of Time and Places— এই কথাটা আমায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

"ডিটেকটিভ গল্পের ক্ষেত্রেও তাই। কোনান ডয়েল, এডগার অ্যালান পো থেকে শুরু করে এডগার ওয়ালেস, আগাথা খ্রিস্টি পর্যন্ত সবায়ের লেখা পড়ে ডিটেকটিভ গল্প লেখার বাসনা হয়। ডিটেকটিভ বা রহস্য গল্প সম্বন্ধে বাংলাদেশে কম লোকই গভীরভাবে ভেবেছেন। অনেকের ধারণা এ যেন অন্ত্যজ শ্রেণীর সাহিত্য। আমি তা মনে করি না।

"ভূতের গল্প সম্বন্ধে আমার একটু দুর্বলতা আছে। বরদা চরিত্র কাল্পনিক। নতুন কোন আইডিয়া না পেলে ভৌতিক গল্প আর লিখব না। আসলে বরদাই আমাকে ছেড়ে গেছে, আমি বরদাকে ছাড়িনি।

"স্কুলে আমি ইতিহাসের ভাল ছাত্র ছিলাম না, তবে ইতিহাস সম্পর্কে একটা মোহ ছিল। ঐতিহাসিক গল্প লেখার প্রেরণা পাই বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি ভাষার মধ্যেই বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায়—বিশেষ করে ঐতিহাসিক বাতাবরণ। ইতিহাস থেকে চরিত্রগুলো কেবল নিয়েছি; কিন্তু গল্প আমার নিজের। সর্বদা লক্ষ্য রেখেছি কি করে সেই যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায়। যে সময়ের গল্প তখনকার রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার, পোশাক, অস্ত্র, আহার, বাড়িঘর ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব না জানলে যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। এরপর আছে ভাষা। ঐতিহাসিক গল্পের ভাষাও হবে যুগোপযোগী।

"ইতিহাসের গল্প লিখেই বেশী তৃপ্তি পেয়েছি। মনে কেমন একটা সেন্স অব ফুলফিলমেণ্ট হয়। গৌড়মল্লার ও তুঙ্গভদ্রার তীরে লেখার পর খুব তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

"চুয়াচন্দন লিখেও তাই হয়েছিল। মুঙ্গেরে স্কুলের টিচার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে একটি বই পড়তে দেন। সেটি পড়েই চৈতন্যের গোড়ার জীবন নিয়ে গল্প লেখার ইচ্ছা হয়। চুয়াচন্দন ছ'বার লিখেছিলাম। যতক্ষণ না লিখে তৃপ্তি হচ্ছে শান্তি নেই।

"ব্যোমকেশ লিখে কিন্তু এমন বোধ হয়নি। পাঠকদের দাবী অবশ্য ব্যোমকেশের জন্যই বেশী।

"ছোট গল্পটাই আমার হাতে বেশী আসে। গল্প লেখার সময় সর্বদা মনে রাখি— Brevity is the soul of wit. যাই লিখি না কেন যত্ন করে লিখতে হয়।

"প্রায় সব গল্পের পিছনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা দৃষ্ট লোকের ছায়া পড়েছে। তবে তা সম্পূর্ণ বায়োগ্রাফিকাল নয়—সিনথেটিক সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে হয়েছে। 'মরণ দোলা' নিজের চোখে দেখা ঘটনা—মুঙ্গেরে ভূমিকম্পের সময়। নাম বদল করে সত্যি ক্যারেকটার অনেক গল্পে আছে; যেমন কিস্টোলাল। 'ফকীর-বাবা'কে দেখেছিলাম

মুঙ্গেরে, 'চিড়িকদাস'কে পুণার বাড়িতে।'

"কুমরাহারে প্রাচীন পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর সময় জঞ্জাল-স্তূপের মাঝে একটি মাটির প্রদীপ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম; মুখের কাছে একটু যেন পোড়া দাগ লেগে রয়েছে। খননকারীরা হয়তো এটা ফেলে গেছেন, কিম্বা তাঁদের নজরে আসেনি। সেটি কুড়িয়ে এনে বাড়িতে টেবিলের ওপর রেখে দিলাম এবং রাত্রে সেটি জ্বাললাম। কয়েকদিন ওই জ্বলন্ত প্রদীপটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে 'মৃৎ-প্রদীপ' গল্পটি মাথায় আসে।

"আমার জীবনের সবচেয়ে shocking experience বেহারী বন্ধু কেদারনাথ শর্মার সঙ্গে একবার duck শিকার। গুলি খেয়ে পাখী নদীর ধারে বালির ওপর পড়েছে। শর্মার ছোট ভাই গেল পাখিটা তুলে আনতে। চোরাবালি ছিল কেউ জানত না। আস্তে আস্তে সে ডুবে যেতে লাগল বালিতে; আমরা দাঁড়িয়ে দেখছি। হঠাৎ শর্মা নিজের কাপড় খুলে তার দিকে ছুঁড়ে দিল। সেই কাপড় ধরে সে প্রাণে বাঁচল। 'চোরাবালি' গল্পে এই অভিজ্ঞতার কথা আছে।

"ভল্লু সর্দারের প্রীতি আমার দুর্বলতা ছিল। ভল্লুর প্রেম বলে একটা গল্প লেখার ইচ্ছেও হয়েছিল। প্ল্যানও করেছিলাম; তবে লেখার মুড আর আসেনি।

"প্রিজনার অব জেন্ডা বার দশেক পড়েছি। গল্পটি আমাকে চেপে ধরে। পনের বছর পরে মনের মধ্যে যা ছিল তা বেরয়।

"বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কতবার যে পড়েছি ঠিক নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের স্টাইল খুব ভাল লাগত। গোরা পড়েছি পনের-কুড়ি বার। রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে পরিচয় ছেলেবেলা থেকেই; কখন যে তিনি মনের মধ্যে এসে গেছেন টের পাইনি। রবীন্দ্রনাথকে দু' একবার দেখেছি—তাও দূর থেকে। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কখনও হয়নি। তারপর শরৎচন্দ্র দীর্ঘকাল আমায় আচ্ছন্ন করে ছিলেন। তিনি একেবারে শেষ গুরু। এ তিনজন ছাড়া আমার প্রিয় লেখক হলেন রাজশেখর বসু। রাজশেখরবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।"

জ্যোতিষ-চর্চা ।। সাহিত্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয়ে শরদিন্দু সুদীর্ঘকাল—১৯২২ সাল থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত—গভীরভাবে অধ্যয়ন ও চর্চা করেছেন; সেটি হল জ্যোতিষ-গ্রন্থ পাঠ ও জ্যোতিষ-চর্চা। জ্যোতিষ-চর্চা তাঁর জীবনের একটি প্রধান বিষয়। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে 'It has become a part of my life.' বিশ্বাস করি ছক যদি ঠিক হয়, সময় ও স্থান যদি ঠিক থাকে, শতকরা আশীভাগ মেলান যায়।' প্ল্যানচেটেও তাঁর বিশ্বাস ছিল। প্ল্যানচেট টেবিলে অনেক বিদেহী আত্মার মুখে বিস্ময়কর কথা শুনেছেন, অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা পরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রিয় পাঠ্য-বিষয় ।। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্য ছাড়া শরদিন্দু মনের আনন্দে পড়েছেন সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য, বিশেষ করে কালিদাস, ছন্দমঞ্জরী, ছন্দকৌস্তুভ; আর্কিওলজি, অ্যাস্ট্রনমি, গ্রহ ও তারকা সম্বন্ধে বড় বড় পণ্ডিতদের বই—জেমস জিনস থেকে ফ্রেড হয়েল, লিওনার্ড উলি থেকে মর্টিমার হুইলার পর্যন্ত; ভারত-বর্ষের ইতিহাস—প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের শেষ ছিল না। মানব জাতির দিশারী যাঁরা—কালি-দাস, শীলভদ্র, দীপঙ্কর, মহাপ্রভু—তাঁরাই তাঁর প্রিয়।

ছদ্মনাম ।। সাহিত্যক্ষেত্রে শরদিন্দুর ছদ্মনাম 'চন্দ্রহাস'।

পুরস্কার ।। সাহিত্যকর্মের জন্য শরদিন্দু অমৃতবাজার ও যুগান্তর পত্রিকা প্রদত্ত মতিলাল পুরস্কার প্রথম লাভ করেন (১৯৫৮)। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস স্বাধীনতা সপ্তাহ উৎসব অনুষ্ঠানে এবং কলকাতার রবীন্দ্রমেলার কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁকে সংবর্ধনা জানান (১৯৬২, ১৯৬৪)। তুঙ্গভদ্রার তীরে উপন্যাসটির জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন (১৯৬৭)। এ ছাড়া ১৯৬০ সালে 'সদাশিবের তিনকান্ড' বইটির জন্য ভারত সরকার প্রদত্ত পুরস্কার ও ১৯৬৬ সালে নাগপুরে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রদত্ত পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৭ সালে তাঁকে শরৎ-স্মৃতি পুরস্কার দানে সম্মানিত করেন।

অনুবাদ ।। গুজরাটি ভাষায় শরদিন্দুর ছোট গল্পের একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে।

হিন্দিতে অনূদিত হয়েছে ঝিন্দের বন্দী ও শজারুর কাঁটা। মারাঠী, তামিল ও কান্নাড়িতেও কয়েকটি গল্পের অনুবাদ বেরিয়েছে।

গ্রন্থসূচী

যৌবনস্মৃতি (১৩২৫); জাতিস্মর (১৩৩৯); ব্যোমকেশের ডায়েরী (১৩৪০); ব্যোমকেশের কাহিনী (১৩৪০); রাতের অতিথি (১৩৪১); চুয়াচন্দন (১৩৪২); টিকিমেধ (১৩৪২); ডিটেকটিভ (১৩৪৪); ব্যোমকেশের গল্প (১৩৪৪); বন্ধু (১৩৪৪); লালপাঞ্জা (১৩৪৪); বুমেরাং (১৩৪৫); বিষের ধোঁয়া (১৩৪৫); ঝিন্দের বন্দী (১৩৪৫); বিষকন্যা (১৩৪৭) [ধরণী যখন তরুণী ছিল (১৩৭২)]; পথ বেঁধে দিল (১৩৪৮); কাঁচা মিঠে (১৩৪৯); কালিদাস (১৩৫০); কালকূট (১৩৫১); দন্তরুচি (১৩৫২); পঞ্চভূত (১৩৫২); গোপন কথা (১৩৫২); বিজয়লক্ষ্মী (১৩৫৩); শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৪); যুগে যুগে (১৩৫৪); শাদা পৃথিবী (১৩৫৫); ছায়াপথিক (১৩৫৬); কালের মন্দিরা (১৩৫৮); কানামাছি (১৩৫৯); সরস গল্প (১৩৫৯); দুর্গ রহস্য (১৩৫৯); চিড়িয়াখানা (১৩৬০); গৌড়মল্লার (১৩৬১); কানু কহে রাই (১৩৬২); আদিম রিপু (১৩৬২); মায়াবন (১৩৬৩); ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৬৩); বহ্নি-পতঙ্গ (১৩৬৩); আলোর নেশা (১৩৬৫); তুমি সন্ধ্যার মেঘ (১৩৬৫); মায়াকুরঙ্গী (১৩৬৫); সদাশিবের তিনকান্ড (১৩৬৬); সর্সোমিরা (১৩৬৬); রিমঝিম (১৩৬৭); বহু যুগের ওপার হতে (১৩৬৭); সদাশিবের হৈ হৈ কান্ড (১৩৬৮); রাজদ্রোহী (১৩৬৮); কহেন কবি কালিদাস (১৩৬৮); এমন দিনে (১৩৬৯); হসন্তী (১৩৬৯); তনুমন (১৩৬৯); ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন (১৩৬৯); ব্যোমকেশের ছ'টি (১৩৬৯); শঙ্খকঙ্কণ (১৩৬৯); কুমারসম্ভবের কবি (১৩৭০); মৈনাক (১৩৭০); রঙীন নিমেষ (১৩৭২); তুঙ্গভদ্রার তীরে (১৩৭৩); শজারুর কাঁটা (১৩৭৪); বেণীসংহার (১৩৭৫); কল্পকুহেলী (১৩৭৬); উত্তম অধম (১৩৭৭); শরদিন্দু অম্নিবাস—প্রথম খন্ড (১৩৭৭); ভূমিকম্পের পটভূমি (১৩৭৭); শৈলভবন (১৩৭৭)।

৩১ মে ১৯৭১

শোভন বসু

ব্যো ম কে শে র ক থা

রচনাকাল অনুসারে ব্যোমকেশ সিরিজের প্রথম গল্প 'পথের কাঁটা' (৭ই আষাঢ় ১৩৩৯)। তারপর 'সীমন্তহীরা' (৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৯)। 'এই দু'টি গল্প লেখার পর', শরদিন্দুবাবুর নিজের কথায়, 'ব্যোমকেশকে নিয়ে একটি সিরিজ লেখার কথা মনে হয়। তখন 'সত্যান্বেষী' গল্পে (২৪শে মাঘ ১৩৩৯) ব্যোমকেশ চরিত্রটিকে এস্ট্যাব্লিস করি। পাঠকদের সুবিধার জন্য অবশ্য 'সত্যান্বেষী'কেই ব্যোমকেশের প্রথম গল্প বলে ধরা হয়।'

এই তিনটি গল্প মাসিক বসুমতীতে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৩৩৯ সন থেকে ১৩৪৩ সন পর্যন্ত ব্যোমকেশকে নিয়ে দশটি গল্প লেখার পর দীর্ঘকাল শরদিন্দুবাবু সত্যান্বেষীর কথা ভাবেন নি। পাঠকদের আর হয়তো ব্যোমকেশকে ভাল লাগবে না, এই ভেবে ব্যোমকেশকে তিনি গোয়েন্দাগিরি থেকে অব্যাহতি দেন। এরপর প্রায় পনের বছর কেটে গেছে। এই সময় একবার তিনি বোম্বাই থেকে কলকাতায় আসেন। পরিমল গোস্বামীর বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে অভিযোগ করেন—কেন আপনি ব্যোমকেশকে নিয়ে আর লিখছেন না? একথা শুনে তাঁর মনে হয় এখনকার ছেলেমেয়েরা তাহলে ব্যোমকেশকে চায়। প্রধানত এই তরুণ পাঠকদের অনুরোধেই শরদিন্দুবাবু আবার ডিটেকটিভ গল্পে হাত দেন; দীর্ঘ বিরতির পর ১৩৫৮ সনের ৮ই পৌষ 'চিত্রচোর' গল্পটি লেখেন। সেই থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্যোমকেশ তাঁর সঙ্গী। গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে ব্যোমকেশ সিরিজে মোট ৩২টি কাহিনী তিনি রচনা করেছেন।

মৃত্যুর মাস ছয়েক পূর্বে শরদিন্দুবাবু আর একটি ব্যোমকেশের গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। কাহিনীর নাম বিশুপাল বধ। এটি অবশ্য তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। সেই অসমাপ্ত রচনাটি অমনিবাসের দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রচনাকাল অনুসারে ব্যোমকেশ গল্প-কাহিনীর তালিকা মুদ্রিত হল; এই তারিখগুলি গ্রন্থকারের ডায়েরি থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.	পথের কাঁটা	৭	আষাঢ়	১৩৩৯
২.	সীমন্তহীরা	৩	অগ্রহায়ণ	১৩৩৯
৩.	সত্যান্বেষী	২৪	মাঘ	১৩৩৯
৪.	মাকড়সার রস	১৫	বৈশাখ	১৩৪০
৫.	অর্থমনর্থম	৬	অগ্রহায়ণ	১৩৪০
৬.	চোরাবালি	১২	শ্রাবণ	১৩৪০
৭.	অগ্নিবাণ	৫	বৈশাখ	১৩৪২
৮.	উপসংহার	১২	অগ্রহায়ণ	১৩৪২
৯.	রক্তমুখী নীলা	২৪	ভাদ্র	১৩৪৩
১০.	ব্যোমকেশ ও বরদা	১৩	কার্তিক	১৩৪৩

১১.	চিত্রচোর	৮	পৌষ	১৩৫৮
১২.	দুর্গরহস্য	২০	জ্যৈষ্ঠ	১৩৫৯
১৩.	চিড়িয়াখানা	২০	জুলাই	১৯৫৩
১৪.	আদিম রিপু	৮	জানুয়ারী	১৯৫৫
১৫.	বহ্নি-পতঙ্গ	১৫	ফেব্রুয়ারী	১৯৫৬
১৬.	রক্তের দাগ	২৪	আষাঢ়	১৩৬৩
১৭.	মণিমণ্ডন	১৮	মাঘ	১৩৬৫
১৮.	অমৃতের মৃত্যু	৬	জ্যৈষ্ঠ	১৩৬৬
১৯.	শৈলরহস্য	২০	আষাঢ়	১৩৬৬
২০.	অচিন পাখী	১৩	বৈশাখ	১৩৬৭
২১.	কহেন কবি কালিদাস		বৈশাখ	১৩৬৮
২২.	অদৃশ্য ত্রিকোণ	১	ভাদ্র	১৩৬৮
২৩.	খুঁজি খুঁজি নারি	২১	ভাদ্র	১৩৬৮
২৪.	অদ্বিতীয়	২০	ফাল্গুন	১৩৬৮
২৫.	মগ্নমৈনাক	২৮	ফেব্রুয়ারী	১৯৬৩
২৬.	দুষ্টচক্র	১	জুলাই	১৯৬৩
২৭.	হেঁয়ালির ছন্দ	২৩	জানুয়ারী	১৯৬৪
২৮.	রুম নম্বর দুই	১৩	জুলাই	১৯৬৪
২৯.	ছলনার ছন্দ	১৬	নভেম্বর	১৯৬৫
৩০.	শজারুর কাঁটা	১৫	মার্চ	১৯৬৭
৩১.	বেণীসংহার	১৫	মে	১৯৬৮
৩২.	লোহার বিস্কুট	৫	মে	১৯৬৯
৩৩.	বিশুপাল বধ		জুলাই	১৯৭০

ব্যোমকেশ-চরিত্র-সংবলিত গ্রন্থ

ব্যোমকেশের কাহিনীগুলি যে সব গ্রন্থে প্রথম সন্নিবেশিত হয় তাদের পরিচয় এখানে দেওয়া হল। সব গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি. গ্রন্থের যে সংস্করণ পাওয়া গেছে তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কতকগুলি গল্প পরে অন্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়; তাও যথাসাধ্য নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্যোমকেশের ডায়েরী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ কাল মুদ্রিত নাই। পৃ [৬]+১৮১। মূল্য দেড় টাকা।

প্রথম প্রকাশ—১৩৪০। প্রকাশক পি সি সরকার এণ্ড কোং।

উৎসর্গ ।। মানু ও মিহির।

সূচী ।। সত্যান্বেষী; পথের কাঁটা; সীমন্তহীরা; মাকড়সার রস।

"অনেকে জানিতে চাহেন আমার এ গল্পগুলি কোনো বিদেশী গল্পের নকল কি না। সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে এগুলি আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা।

"ডিটেকটিভ গল্প সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে—যেন উহা অন্ত্যজ শ্রেণীর সাহিত্য। আমি তাহা মনে করি না। Edgar Allan Poe,

Conan Doyle, G. K. Chesterton যাহা লিখিতে পারেন, তাহা লিখিতে অন্ততঃ আমার লজ্জা নাই।" —ভূমিকা

এই চারটি গল্প পরে 'ব্যোমকেশের ছ'টি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়

'মাকড়সার রস' গল্পটি শ্রেষ্ঠ গল্পেও যুক্ত।

ব্যোমকেশের কাহিনী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৬০। পৃ. [২]+১৩৬। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

প্রথম প্রকাশ—১৩৪০।

সূচী ।। চোরাবালি; অর্থমনর্থম।

এই দুইটি গল্প পরে 'ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ব্যোমকেশের গল্প। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৫৩। পৃ. [২]+১৮৮। মূল্য দুই টাকা।

প্রথম প্রকাশ—১৩৪৪।

সূচী ।। রক্তমুখী নীলা; অগ্নিবাণ; উপসংহার; ব্যোমকেশ ও বরদা।

'অগ্নিবাণ' গল্পটি শ্রেষ্ঠ গল্পেও যুক্ত।

দুর্গরহস্য। বাক্-সাহিত্য। তৃতীয় প্রকাশ, চৈত্র ১৩৭১। পৃ. [৪]।২০০। মূল্য পাঁচ টাকা।

প্রথম প্রকাশ—পৌষ ১৩৫৯।

উৎসর্গ ।। আধুনিক কালের যে সকল তরুণ-তরুণীর নির্বন্ধে সতেরো বছর পরে আবার ব্যোমকেশের গল্প লিখলাম, বইখানি তাহাদের হাতেই উৎসর্গ করা হল।

সূচী ।। চিত্রচোর; দুর্গরহস্য।

চিড়িয়াখানা। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। নিউ এজ (তৃতীয়) সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৬, আগস্ট ১৯৫৯। পৃ. [২]+১৪৫। মূল্য তিন টাকা।

প্রথম প্রকাশ—১৩৬০।

আদিম রিপু। গ্রন্থ প্রকাশ। গ্রন্থ প্রকাশ সংস্করণ। অগ্রহায়ণ ১৩৭৩। পৃ. [২]+১৫৪। মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রথম প্রকাশ—১৩৬২।

বহ্নি-পতঙ্গ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। দ্বিতীয় প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৬৮। পৃ. [৪]+২১৬। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রথম প্রকাশ—১৩৬৩।

সূচী ।। বহ্নি-পতঙ্গ; রক্তের দাগ।

'বহ্নি-পতঙ্গ' গল্পটি শ্রীমতী শীলা গঙ্গোপাধ্যায় তিন অঙ্কের নাটকে রূপান্তরিত করেন। শ্রীগুরু লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ, রাসপূর্ণিমা ১৩৬৪। পৃ. [২]+১২০। মূল্য দুই টাকা।

মগ্নমৈনাক। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৮৮৮ শকাব্দ। পৃ. [৪]+১৪২। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রথম প্রকাশ—চৈত্র ১৮৮১ শকাব্দ [১৩৬৬ সন]।

সূচী ।। মণিমণ্ডন; অমৃতের মৃত্যু; শৈলরহস্য।

কহেন কবি কালিদাস। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৭৪। পৃ. [৪]+১৩৬। মূল্য তিন টাকা।

ব্যোমকেশের কথা

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৬৮।

সূচী ।। কহেন কবি কালিদাস; আঁচন পাখি।

মুখবন্ধে উদ্ধৃতি :

কহেন কবি কালিদাস হেঁয়ালির ছন্দ,
জানলা দিয়ে ঘর পালালো গেরস্ত রইল বন্ধ।

—প্রচলিত ছড়া।

ব্যোমকেশের ছক্কা। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট্‌ লিঃ। প্রথম সংস্করণ, ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৪ শকাব্দ [১৩৬৯ সন]। পৃ [৬]+২২৭। মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সূচী ।। সত্যান্বেষী; পথের কাঁটা; সীমন্তহীরা; মাকড়সার রস; খুঁজি খুঁজি নারি; অদৃশ্য ত্রিকোণ।

"মাছের মুড়ার সহিত ল্যাজা জুড়িয়া দিলে আস্ত মাছটা পাওয়া যায়। ব্যোমকেশের গোড়ার চারটি গল্পের সহিত শেষের দুইটি গল্প এই গ্রন্থে সংযুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা মাছের মুড়া ভালবাসেন তাহারা এই বইটি পড়িয়া আনন্দ পাইতে পারেন; এবং ল্যাজার প্রতি যাঁহাদের আসক্তি আছে ভরসা করি তাঁহারাও নিরাশ হইবেন না।"—ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রথম চারটি গল্প পূর্বে 'ব্যোমকেশের ডায়েরী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন। করুণা প্রকাশনী। দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৩৬৯। পৃ [২]+১৫২। মূল্য চার টাকা।

প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ ১৩৬৯।

সূচী ।। চোরাবালি; অর্থমনর্থম; অদ্বিতীয়।

"প্রবীণের সঙ্গে নবীনের সংযোগ সর্বদাই বাঞ্ছনীয় মনে করি। তাতে প্রবীণের গায়ে লাগে যৌবনের স্পর্শ, আর নবীনের বুদ্ধিতে লাগে নিষ্কতার ছোঁয়াচ। এই বইখানিতে দুটি প্রবীণ এবং একটি নবীন ব্যোমকেশের কথা সংযুক্ত হয়েছে। ব্যোমকেশকে যাঁরা ভালবাসেন আশা করি এই যোগাযোগ তাঁদের আনুকূল্য লাভ করবে।"—ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রথম দু'টি গল্প পূর্বে 'ব্যোমকেশের কাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মগ্নমৈনাক। মিত্র ও ঘোষ। দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রকাশ কাল মুদ্রিত নাই। পৃ ১৬১। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

প্রথম প্রকাশ—চৈত্র ১৩৭০।

সূচী ।। মগ্নমৈনাক; দুষ্টচক্র; হেঁয়ালির ছন্দ।

শজারুর কাঁটা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম প্রকাশ, ১৪ই আষাঢ় ১৩৭৪। পৃ [৬]+১৩৬। মূল্য চার টাকা।

উৎসর্গ ।। কীর্তিমান তরুণ লেখক শ্রীমণিশংকর মুখোপাধ্যায় স্নেহাস্পদেষু।

[ভূমিকা] : 'এই কাহিনীতে ব্যোমকেশ আছে, রহস্য আছে, খুন-জখম আছে, রহস্যভেদ আছে, তবু এটা রহস্য-কাহিনী কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। পাঠক-পাঠিকা বিচার করবেন।'

বেণীসংহার। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৬৮ [১৩৭৫]। পৃ [৪]+১৪০। মূল্য চার টাকা।

সূচী ।। ছলনার ছন্দ; রুম নম্বর দুই; বেণীসংহার।

[ভূমিকা] : "অজিতকে দিয়ে ব্যোমকেশের গল্প লেখানো আর চলছে না। একে তো তার ভাষা সেকেলে হয়ে গেছে, এখনো চলতি ভাষা আয়ত্ত করতে পারেনি, এই আধুনিক যুগেও 'করিতেছি' 'খাইতেছি' লেখে। উপরন্তু তার সময়ও নেই। পুস্তক প্রকাশকের কাজে যে-লেখকেরা মাথা গলিয়েছেন তাঁরা জানেন, একবার মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ পেলে মা-সরস্বতীর দিকে আর নজর থাকে না। তাছাড়া সম্প্রতি অজিত আর ব্যোমকেশ মিলে দক্ষিণ কলকাতায় জমি কিনেছে, নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে; শীগ্‌গিরই তারা পুরনো বাসা ছেড়ে কেয়াতলায় চলে যাবে। অজিত একদিকে বইয়ের দোকান চালাচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ি তৈরির তদারক করছে; গল্প লেখার সময় কোথায়?

"দেখে শুনে অজিতকে নিষ্কৃতি দিলাম। এখন থেকে আমিই যা পারি লিখব।"

লোহার বিস্কুট গল্পটি 'রোমাঞ্চ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৭৬ সন) প্রকাশিত হয়।

এখনও কোন্ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

বিশুপাল বধ গল্পটি অসমাপ্ত রচনা। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে লেখা শুরু হয়। এই অসমাপ্ত কাহিনীটিই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ রচনা।

৩১ মে ১৯৭১ **শোভন বসু**

ব্যোমকেশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

আমি এইমাত্র ব্যোমকেশের সঙ্গে দেখা করে এলাম। হ্যাঁ, ব্যোমকেশ বক্সী, সত্যান্বেষী এবং সত্যবতী-পতি। ব্যোমকেশ যাঁকে আপনারা সকলেই চেনেন এবং কেউ দেখেননি—সেই ব্যোমকেশ।

ভগবানের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ভক্তকে ধরতে হয়, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁর পি-একে আগে ধরা চাই। অশরীরী আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার—তাও দরকার মিডিয়ামের। তেমনি গল্প উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে গেলে খোদ তার স্রষ্টাকে ধরতে হবে।

আমি তাই ধরলাম শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ব্যোমকেশের দেখা পেয়ে গেলাম।

ব্যোমকেশকে আমি দেখেছিলাম একটি বাংলা ছবিতে। শরদিন্দুবাবুকে বলতেই তিনি বললেন, আরে দূর ওই ব্যোমকেশ নাকি? ব্যোমকেশ কস্মিনকালে চোখে চশমা পরেনি, আর সে হচ্ছে বক্সী, কায়স্থর সন্তান, সে আবাব বাঁড়ুজ্যে হল কবে? তা বাদে ব্যোমকেশের নাক হল ধারালো, বেশ লম্বা, নাতিস্থূল চেহারা।

বাধা দিয়ে বললাম, এমন চেহারা কোথাও দেখেছেন, না অর্ধেক মানব আর অর্ধেক কল্পনা?

—কল্পনা ঠিক নয়। শরদিন্দুবাবু বললেন, বলতে পারেন সেল্ফ প্রজেকশান। নিজেরই আত্মকৃতি।

আমি এবার তাকালাম শরদিন্দুবাবুর দিকে—হ্যাঁ, এই তো সত্যিকারের ব্যোমকেশ। লম্বা নাতিস্থূল চেহারা। ইস্পাতের ফলার মত ধারালো নাক। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। বয়স হয়েছে। তবু এখনও ঋজু।

—ব্যোমকেশ কি আপনারই বয়সী?

—না। আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। তার বয়স এখন ষাট। বেণীসংহারে তার বয়স এই ষাট বছরই। আমি শিল্পীকে নির্দেশ দিয়েছি ব্যোমকেশকে যখন আঁকবেন মনে রাখবেন তার বয়স এখন ষাট।

—ব্যোমকেশ কাহিনী কীভাবে আপনার মাথায় এল?

—সে এক ইতিহাস। ষোল-সতের বছর বয়স থেকে ডিটেকটিভ গল্প পড়তে শুরু করি। আগাথা ক্রিসটি ও কোনান ডয়েলের আমি দারুণ ভক্ত ছিলাম। তবে নিজে লিখব কোনদিন ভাবিনি। ১৯২৯ সালে যখন লিখতে শুরু করলাম তখন মনে হল এত ডিটেকটিভ বই পড়েছি, টেকনিকটা আয়ত্ত হয়েছে। এবার নিজে গোয়েন্দা কাহিনী লিখলে কেমন হয়। ১৯৩৩ সালে প্রথম গোয়েন্দা গল্পে হাত দিলাম। তখন থেকেই ব্যোমকেশের সঙ্গে পরিচয়।

—ব্যোমকেশ যে বক্সী হলেন তা কি নামের অনুপ্রাসের সুবিধার জন্য?

—তা ঠিক নয়। তবে চেয়েছিলাম ব্যোমকেশ নিজে যেমন অসাধারণ, নামটির মধ্যে তেমনি যেন অসাধারণত্ব থাকে। অনেক নাম মনে এসেছিল। কোনটিই আর পছন্দ হয়

না। শেষে ব্যোমকেশ বক্সী পছন্দ হল। নায়কের নামটিও ব্যক্তিত্বপূর্ণ হওয়া চাই। ধরুন, শার্লক হোমস না হয়ে নাম যদি হত ডেভিড হোমস, তাহলে কি অমন ব্যক্তিত্ব আসত? নায়কের একটা 'ক্যাচি' নাম দেওয়া আমাদের লেখকদের পুরনো ট্রিক।

—ব্যোমকেশকে ব্রাহ্মণ না করে কায়স্থ করলেন কেন?

হাসতে হাসতে শরদিন্দুবাবু বললেন, আমার ধারণা কায়স্থরা ব্রাহ্মণদের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি ধরে।

—ব্যোমকেশের সহকারী আজতকে পেলেন কোথায়?

—অজিত সিনথিটিক চরিত্র। আমার বাল্যবন্ধু অজিত সেনের নামে নাম।

—ব্যোমকেশ গোয়েন্দাগিরি শিখল কোথা থেকে? তার কি কোন ট্রেনিং ছিল?

না। স্রেফ ইনটিউশন। ব্যোমকেশ অঙ্কে খুব দড়। তার বাবাও ছিলেন বড় ম্যাথামেটিসিয়ান। মা বৈষ্ণব বংশের মেয়ে। এই দুয়ের সংমিশ্রণে ব্যোমকেশের বুদ্ধি খুব দঢ় হয়েছে। এই বুদ্ধি দিয়েই সে জটিল রহস্যের জট ছাড়ায়।

—অন্যান্য বাঙালী গোয়েন্দার মত ব্যোমকেশকে তো গুলি চালাতে দেখি না? ব্যোমকেশ কাহিনীতে ভায়োলেনট অ্যাকশন নেই বললেই চলে। এর কারণটা কি?

—আমার মেজাজের সঙ্গে গুলি গোলা খাপ খায় না। তাছাড়া গোয়েন্দা কাহিনীকে আমি ইনটেলেকচ্যুয়াল লেভেলে রেখে দিতে চাই। ওগুলি নিছক গোয়েন্দা কাহিনী নয়। প্রতিটি কাহিনীকে আপনি শুধু সামাজিক উপন্যাস হিসাবেও পড়তে পারেন। কাহিনীর মধ্যে আমি পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। মানুষের সহজ সাধারণ জীবনে কতগুলি সমস্যা অতর্কিতে দেখা দেয়—ব্যোমকেশ তারই সমাধান করে। কখনও কখনও সামাজিক সমস্যাও এর মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'চোরাবালি' গল্পে আছে বিধবার পদস্খলন। একটি কথা, জীবনকে এড়িয়ে কোনদিন গোয়েন্দা গল্প লেখার চেষ্টা করিনি।

—ব্যোমকেশবাবু এখন কোথায় আছেন?

—আগে হ্যারিসন রোডে ছিলেন। এখন কেয়াতলাতে বাড়ি করে সেখানে আছেন।

—কেয়াতলাতে বাড়ি করলেন কেন? নিউ আলিপুর কিংবা যোধপুর পার্ক তো আরও খানদানি জায়গা?

শরদিন্দুবাবু হাসতে হাসতে বললেন, কেয়াতলাতে যে আমি কিছুদিন ছিলাম। বেশ পরিচিত জায়গা। ব্যোমকেশকেও তাই এখানে এনে ফেললাম।

তাছাড়া ব্যোমকেশের বাড়ি করারও একটা ইতিহাস আছে।

আমার বন্ধু প্রতুল গুপ্ত প্রায়ই আমাকে তাগাদা দিতেন, সত্যবতীকে একটা বাড়ি তৈরি করে দিতেই হবে। ও'র অনুরোধেই ব্যোমকেশের বাড়ি হল। এখন আবার প্রতুলবাবু ধরেছেন, সত্যবতীকে একখানা গাড়ি কিনে দিতে হবে। গাড়ি না হলে সত্যবতী গড়িয়াহাটে বাজারে যাবে কী করে। আমি বলছি, হেঁটে যাবে। ব্যোমকেশ গাড়ি কেনার টাকা পাবে কোথায়? আমি কিছুতেই রাজী হচ্ছি না। প্রতুলবাবুও চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন।

—ব্যোমকেশবাবু কি গোয়েন্দাগিরি থেকে রিটায়ার করবেন?

—ব্যোমকেশের দশম গল্পে সত্যবতীর সঙ্গে তার বিয়ে হল। আমি ভাবলাম বিয়ে হলে বাঙালীর ছেলের আর পদার্থ থাকে না, তাই ব্যোমকেশকে তখনই রিটায়ার করিয়ে দিয়েছিলাম। ষোল বছর আর লিখিনি। তারপর কলকাতায় এসেছিলাম কিছুদিন। সে সময় অনেকে আমাকে ধরলেন আবার লিখুন। যখন দেখলাম, আজকালকার ছেলে-

মেয়েরা চায়। তখন আবার লিখতে আরম্ভ করলাম।

—ব্যোমকেশবাবু বিয়ে করলেন কেন? ওঁর মত ক্যারেকটরের লোকের তো ঠিক সংসারী হওয়া সাজে না।

—কী আর করবে—বেচারা প্রেমে পড়ে গেল।

—ওঁর সন্তানাদি কি?

—এক ছেলে। একবার একটি বইয়ে তার উল্লেখ আছে। ছেলেকে সাধারণত আমি সামনে আনিনি।

—ব্যোমকেশ সত্যবতীর জীবনে দাম্পত্য কলহ আছে?

—তা আর নেই। অদ্বিতীয় গল্প তো এই দাম্পত্য কলহ দিয়েই শুরু

—অন্য কোন সমস্যা আছে?

—থাকলেও সেটা আনিনি।

—কিছু মনে করবেন না, যদিও ব্যক্তিগত প্রশ্ন, ব্যোমকেশবাবুর এখন প্রাপ্তি-যোগ কেমন?

—ব্যোমকেশ ও অজিত মিলে একটি পাবলিশিং ফারম খুলেছে। অজিতই ফারমটি দেখাশোনা করে। তা থেকে ওদের বেশ আয় হচ্ছে।

শরদিন্দুবাবু বললেন, এইবার ব্যোমকেশকে একটু ছুটি দিন। অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। কি খাবেন বলুন কফি না চা?

আমি বললাম, না, এইমাত্র চা খেয়ে আসছি।

তাহলে কফিই হোক। তারপর কফি আসতে দেরি দেখে নিজেই ভেতরে ঢুকে দু-কাপ কফি হাতে করে ঢুকলেন। একটা চিনি ছাড়া। সেটি নিজের জন্য।

কফি খেতে খেতে ব্যক্তিগত কথা। নিজের জীবনের কথা। আধুনিক সাহিত্যের কথা। সেসব আলোচনা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক এখানে। ঘুরে ফিরে সেই ব্যোমকেশেই এসে পড়লাম আবার। জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যোমকেশ চরিত্র কি আপনাকে কখনও হন্ট করে?

—সব চরিত্রই লেখককে হন্ট করে। লেখক যাকে জীবন দিয়ে গড়েছেন, যত্ন করে এঁকেছেন, সব চরিত্রই এসে তাঁকে নাড়া দেয়। ৩১টি গল্প লিখেছি ব্যোমকেশকে নিয়ে। এক-একটা গল্পের কথা ভেবেছি। কীভাবে এগুবো, যখন বুঝে উঠতে পারছি না, তখন ব্যোমকেশ এসে আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। এটা কোন ভৌতিক ব্যাপার নয়, সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক। যারা একই চরিত্র নিয়ে অনেক গল্প লেখে, তাদের এমন হয়।

—ব্যোমকেশ গল্পের প্লট কীভাবে সংগ্রহ করেন?

—অনেক ভেবে। খবরের কাগজ থেকে পাই। ইংরাজী গল্প থেকেও আইডিয়া পাই। তারপর তা নিয়ে ভাবতে থাকি। তারপর গল্পের প্রথম লাইন মাথায় এসে গেলে তখন লিখতে বসি।

—ব্যোমকেশবাবুর শরীর এখন কেমন?

—ষাট বছর বয়সেও দৈহিক ও মস্তিষ্কের দিক থেকে কোন অবক্ষয় তার হয়নি। তবে সে এখন নিজে বেশি কিছু করে না। তার সহকারীরাই কাজকর্ম করে। ব্যোমকেশ শুধু নির্দেশ দেয়।

এবার আমি বলি, ব্যোমকেশবাবুকে কবে ছুটি দেবেন?

শরদিন্দুবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন, আমি তো এখনই ছুটি দিতে চাই। বারবার ভাবি ব্যোমকেশের ষাট বছর বয়স হয়ে গেল। এবার ওকে ছুটি দেওয়া উচিত। কিন্তু

তখনই দেশসুদ্ধ পাঠকের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আবার ভাবি এদের নিরাশ করব?

একদিকে সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি মায়া, অন্যদিকে পাঠকের দাবি—এই দুয়ের টানা-পোড়েনে ব্যোমকেশের স্রষ্টা আজ দ্বিধাগ্রস্ত।

তারপর বললেন, এক সময়ে হঠাৎ ছেড়ে দেব। পাঠকরা চাইলেও ব্যোমকেশের প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে তো। সে আর কত পারবে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়